Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ২য় সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, রবিবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯
29th April, 1928.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে জীবনবিধাতা, তুমি যে কেন আমাদিগকে এ সংসারে এবং বিশেষভাবে তোমার এই পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়াছ, তাহা আমরা এখনও সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না যে, তোমাকে জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু ও কর্ত্তা করিয়া সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইয়া চলাই আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কাজ—ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে আপনার ইচ্ছা অভিরুচিকে বিসর্জ্জন দিয়া তোমার পবিত্র ইচ্ছাকে অনুসরণ করিয়া চলিতে না পারিলে আমাদের সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম অর্থহীন, জীবন ব্যর্থ। তাই আমরা আপনার ভাবে, আপনার খেয়ালে, নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে বাহিরের অনেক ভাল কাজ করিয়া গেলেও তাহাতে আমাদের জীবন ও সমাজ সুস্থ সুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠে না, শক্তিশালী হয় না। আমরাও তোমার ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ ও শিক্ষার কথা ভুলিয়া উহাকে অনেকটা বাহিরের ব্যাপার করিয়াই রাখিয়াছি। হে জ্ঞানস্বরূপ, তুমি এবার আমাদিগকে নব চৈতন্য প্রদান কর, আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, জীবনগতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করি এবং তোমাকেই জীবনের একমাত্র প্রভু ও কর্ত্তা করিয়া তোমার প্রকৃত দাস ও সন্তান হই। তোমার বলে বলী হইয়া জীবনে তোমার কার্য্য সাধন করি। তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

নিন্দা ও অপমানে—মানুষ মানুষকে যেমন ভালবাসে ও প্রশংসা করে, তেমনি আবার অনেক লোক আছে যারা অনর্থক অপরের গ্লানি করে, অপমান করে, কুৎসা রটনা করে। সংসারের লোক তাহা সহ্য কর্‌তে পারে না; তারা আপনাদের সমর্থন করিবার জন্য, যে নিন্দা করে, কুৎসা করে, তার প্রতিশোধ লইবার জন্য, নানারূপ চেষ্টা করে,—সমাজের নিকট, রাজপুরুষের নিকট, অভিযোগ করে। কিন্তু সাধনার্থী তুমি, তুমি যদি ধর্ম্ম চাও, প্রেম চাও, তোমাকে ভিন্ন পথ অবলম্বন কর্‌তে হবে। সংসারের লোক যে পথে চলে, সে পথে তোমাকে চল্‌তে হবে না; তুমি নিন্দা গ্লানি অপমানকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ব'লে গ্রহণ কর্‌বে, তুমি আপনাকে সমর্থন কর্‌বে না; যার যা ইচ্ছা ব'লে যাক্, তুমি তাহা ঈশ্বরকে জানাবে, আর কাহারও নিকট অভিযোগ কর্‌বে না। নিন্দার পরিবর্ত্তে প্রেম দিবে; যে নিন্দা করে, অপমান করে, কুৎসা রটনা করে, তারও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা কর্‌বে; তার যে এই অধোগতি সে জন্য প্রাণে ব্যথা অনুভব কর্‌বে, তাঁর কল্যাণ-চিন্তা কর্‌বে, প্রেমদানে তাকে আপনার ক'রে নিবে। আপনাকে সমর্থন কর্‌বে না, অন্যের নামে অভিযোগ কর্‌বে না। প্রেম, কল্যাণচিন্তা, কল্যাণচেষ্টা, ভগবানের চরণে প্রার্থনা, ইহাই অপ্রেমের প্রতিদান।

করুণার ধারা—কত ভাবে যে তাঁর করুণার ধারা আমাদের জীবনে প্রবাহিত হয়, তা নির্ণয় করা যায় না। এই জীবন তাঁর করুণায়ই পূর্ণ; একটি ঘটনা ঘটে না, এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়ে না, যার ভিতরে তাঁরই করুণার পরিচয় পাওয়া না যায়। জীবনের সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে,

উত্থানে পতনে দেখি, তিনিই দয়া ক'রে হাতখানি ধ'রে নিয়ে চলেছেন। কখনও একটি ঘটনা ঘটিল, আর তাঁর করুণার পরিচয় পেলাম, কখনও বা অনেক দিন পরে, অনেক অবস্থার পরিবর্ত্তনের পরে, বুঝা যায় তিনিই হাত ধ'রে নিয়ে এসেছেন। পাহাড়ে উঠিতে দেখি, পাহাড়ীরা খাড়া পথ দিয়ে উঠে; প্রতি পাদবিক্ষেপে তারা বুঝতে পারে উপরে উঠ্‌ছে। আমরা সাধারণতঃ সরকারী রাস্তা দিয়ে উঠি; আস্তে আস্তে পথ উঁচু হ'য়ে গিয়াছে। চারিদিক ঘুরে পথ চলেছে। যখন চলি সব সময় মনে হয় না যে উপরে উঠ্‌ছি। অনেকক্ষণ পরে দেখি যে অনেক উপরে এসেছি। অনেকের জীবন ঘটনা-বহুল; তাঁরা প্রতি ঘটনায় তখনই ঈশ্বরের করুণা দেখতে পান। কিন্তু অনেকের জীবনের গতি অন্যরূপ। তারা প্রতি পাদবিক্ষেপে কিছু বুঝতে পারেন না। কতদূর যেয়ে দেখেন, ভগবান্‌ হাত ধ'রে তাঁদের নিয়ে এসেছেন; তখন তাঁদের প্রাণ থেকে সঙ্গীত উঠে,—

করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়া কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
আমি সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমারই দুয়ারে।

তিনি নিয়ে চলেছেন—পরমহংস দেব বল্‌তেন সংসারে দুইপ্রকার ধর্ম্ম মানুষ স্বীকার করে—বাঁদরছানার ধর্ম্ম, আর বিড়ালছানার ধর্ম্ম; বাঁদরছানা মায়ের গলা জড়িয়ে বুকে লেগে থাকে, বাঁদরমাতা এই ছানা নিয়ে লাফিয়ে চলে; কিন্তু বিড়ালমাতা ছানাটিকে মুখে ক'রে নানা স্থানে ল'য়ে যায়। যারা মনে করে আপনার বলে, আপনার সাধনায়, সিদ্ধিলাভ করবে, তাঁদের ধর্ম্ম ঐ বাঁদর-ছানার ধর্ম্ম। কিন্তু তিনি কৃপা না করলে নিজের সাধনায় মানুষ কিছু করতে পারে না। তিনিই ঐ বিড়াল-মাতার ন্যায় মুখে ক'রে আমাদিগকে নিয়ে চলেছেন। তাঁর করুণা, তাঁর প্রেমই আমাদের সম্বল; আমরা পুরুষকারদ্বারা কতকটা অগ্রসর হ'তে পারি। কিন্তু যদি প্রকৃত ধর্ম্মজীবন চাই, তবে তাঁর প্রেমে আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে; তিনিই হাত ধ'রে আনন্দ-লোকের দিকে নিয়ে যাবেন। আমার কি করবার আছে? কেবল ঐ প্রেমের স্রোতে গা ঢেলে দিব; ঐ স্রোতে আমি বাধা দিব না। তিনি বুকে জড়িয়ে ধ'রে আমাকে নিয়ে যাবেন। ইহাই সার ধর্ম্ম, ইহাই কৃপার ধর্ম্ম, ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম।

সম্পাদকীয়

আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধ শতাব্দীর ও ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী ও শক্তিবৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে অনেকের প্রাণেই অল্পাধিক পরিমাণে বিবিধ প্রকার চিন্তালহরী খেলিতেছে—নানা আলোচনাদিও হইতেছে। সাধারণতঃ প্রায় সকলেই চিন্তার প্রসার যথাসাধ্য বর্দ্ধিত করিয়া যতদূর সম্ভব বৃহৎ পরিকল্পনাতেই আপনার শক্তি নিয়োগ করিতেছেন; কিন্তু তাহার মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি ভাব লক্ষিত হয়। আমাদের মধ্যে যে আজ কাল নানা শ্রেণীর লোকই রহিয়াছে এবং তাহাদের কাহারও কাহারও নিকট যে বিবিধ প্রকার জনহিতকর কার্য্য অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম কিছু নাই, এমন কি থাকিতেও পারে না, একথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয়ের কোনও প্রয়োজন নাই। তাঁহারা অন্য বিষয়ে, উপাসনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে, উদাসীন থাকিতে পারেন, কিন্তু কোনও প্রকার বিরোধিতা করেন এরূপ কথা বলিতে পারি না। আবার এরূপ লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা একমাত্র যোগ ভক্তি উপাসনা সংকীর্ত্তনাদিকেই ধর্ম্ম মনে করেন এবং সকল প্রকার বাহিরের কার্য্য বিষয়ে বিরোধিতা না করিলেও কতকটা যে উদাসীন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দুইটি ভাব যে পরস্পরবিরোধী এরূপ কথা বোধ হয় কেহই বলেন না, এই দুই এর সামঞ্জস্য যে সম্ভবপর এবং তাহাই যে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ সে কথা উভয়েই স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয়। তবে জীবনে সে সামঞ্জস্য দেখিতে না পাওয়াতে একে অন্যের অপূর্ণতা যে স্পষ্টতররূপে দেখিয়া থাকেন এবং পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে কিছু অশ্রদ্ধার ভাবও যে পোষণ না করেন এমন নহে। ইহা বাঞ্ছনীয় না হইলেও অনেকটা স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা, মহৎ আদর্শই এই অশ্রদ্ধার মূলে কার্য্য করিতেছে—কার্য্যগত জীবনের সহিত তাহার তুলনাতেই উহার অসম্পূর্ণতা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এক শ্রেণী বলেন, যাঁহারা উপাসনা কীর্ত্তনাদিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাঁহাদের জীবনে সেরূপ পবিত্রতা ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখা যায় না, জীবন ও চরিত্রে কোনও প্রকার উন্নতি লক্ষিত হয় না, বরং নানা গলদই দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তাঁহাদের উপাসনাদির কোনও মূল্য নাই, তাহাতে যোগ দিয়া কোনও উপকার পাওয়া যায় না, তৎপরিবর্ত্তে নানা প্রকার সমালোচনার ভাব প্রাণে জাগ্রত হওয়াতে অনিষ্টই সাধিত হয়। অপর শ্রেণী বলেন, যাঁহারা নানা বাহিরের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত তাঁহাদের জীবনে আধ্যাত্মিকতার কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না, শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয় প্রভৃতির পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা অহংকার ঔদ্ধত্য কর্ত্তৃত্বস্পৃহাদিই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, ঈশ্বরে বিশ্বাস নির্ভর ও আত্মসমর্পণ না থাকাতে কার্য্যসকলও নিষ্ঠার সহিত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না, আপনাকে ভুলিয়া মঙ্গলবিধাতার কল্যাণময় রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যে কার্য্যোৎসাহটাও অধিক দিন স্থায়ী হয় না, অতি সহজেই লুপ্ত হইয়া যায়—উৎসাহ ও অভিনিবিষ্ট বিশুদ্ধতাও সকল সময় রক্ষিত হয় না। কার্য্যের মূল প্রস্রবণই শুষ্ক হইয়া যায়। সুতরাং বিশুদ্ধ ব্রহ্মপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের প্রয়োজনীয়তা, সকল বিষয়ে ব্রহ্মানুগত জীবন যাপনের আবশ্যকতা উভয় শ্রেণীই স্বীকার করেন। যদিও এক মাত্র উপাসনার দ্বারাই ইহা লাভ করা সম্ভবপর, তথাপি নিজের জীবনে এই উপাসনার কোনও অভিজ্ঞতা না থাকাতে এবং অপরের জীবনেও সকল সময় সত্য উপাসনার পরিচয় না পাওয়াতে যে স্বভাবতঃই অনেকের প্রাণে এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত

হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এজন্য তাহাদিগকে বেশী দোষী করা যায় না। ইহাতে তাঁহাদের শিক্ষার অভাবই সূচিত হইতেছে। সুতরাং ইহার জন্য তাঁহাদের অপেক্ষা তাহাদের অভিভাবকগণ ও সমাজের নেতৃবর্গই অধিকতর দোষী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালাভ সম্পূর্ণ নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর না করিলেও, তাহার জন্য প্রত্যেককেই নিজে কিছু করিতে হয় সত্য, কিন্তু সেই দিকে আগে প্রবৃত্তি না জন্মিলে কিছুতেই সেরূপ চেষ্টায় কেহ নিযুক্ত হইতে পারে না। আর কোনও কোনও স্থলে অজ্ঞাত কারণে সেরূপ প্রবৃত্তি জন্মিলেও তাহার জন্য যে প্রধানতঃ অপরের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত এক প্রকার অপরিহার্য্য তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপেই বলিতে পারা যায়। এই শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের জন্য যে অভিভাবকগণ ও নেতৃবর্গই দায়ী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অধিকাংশ অভিভাবকই যে সেরূপ কোনও শিক্ষা দেন না, একথা বলিলে কোনও প্রকার সত্যের অপলাপ হইবে মনে হয় না। সন্তানদের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য আগ্রহ ও চেষ্টা অতি অল্প সংখ্যক অভিভাবকেরই আছে বলিয়া অনুমিত হয়। আচার্য্য ও নেতৃস্থানীয়গণ উপদেশ বক্তৃতা আলোচনাদিতে উপাসনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক সময় বলিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাদের সেই কথা শোনা আবশ্যক তাহাদের কয় জনের কাণে তাহা পৌঁছে সে কথা বলা কিছু কঠিন। কেননা, তাহাদের অধিকাংশই এই সকল স্থানে উপস্থিত হয় না। আর যাহারা তাহা শুনিয়া থাকে তাহারাও যে তাহাদ্বারা বেশী আকৃষ্ট হয় না, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধেও উল্লিখিত হইয়াছে যে কথার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে না পাওয়াতে তাহার দ্বারা কেহ বড় একটা প্রভাবান্বিত হয় না, বরং অনেকের উপর তাহা হইতে বিপরীত ফলই প্রসূত হয়। উপদেশবাক্য অপেক্ষা দৃষ্টান্ত যে অধিক কার্য্যকারী তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যুক্তি বিচার অপেক্ষা চাক্ষুষ প্রমাণই সহজে লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে। উপাসনা হইতে যেরূপ ফল পাওয়া যায় বলিয়া আমরা বলি, তাহা যদি আমাদের জীবনে মূর্ত্তিমান দেখিতে পায় তবে সে বিষয়ে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহা না দেখিলে অথবা আমাদের জীবনে তাহার বিপরীত ফল দেখিলে, শুধু আমাদের কথায় বিশ্বাস করিবে কেন? বরং উপাসনা করিয়া কোনও ফল হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত করাই ত তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সাধনবিষয়ে আমাদের কোনও ব্যক্তিগত ত্রুটি বশতঃও যে উক্তরূপ হইতে পারে, বাস্তবিকই উহা নিরর্থক কি না নিজেদের সাধনদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, এরূপ চিন্তা সাধারণতঃ তাহাদের মনে না আসিবার কারণ উক্ত বিষয়ক আগ্রহের অভাব বা ঔদাসীন্য। আমাদের জীবনে ফলটা প্রত্যক্ষ করিলে কিন্তু এই ঔদাসীন্য থাকিতে পারিত না, সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া পারিত না। অপরের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের নিজেরও সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, ধর্ম্মের অন্যান্য বাহিক অনুষ্ঠানের ন্যায় উপাসনাটাও একটা প্রাণহীন বাহিক অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে এবং সেরূপ হইলে আমরাও আমাদের অবলম্বিত ধর্ম্ম হইতে চ্যুতই হইলাম। কেননা জীবনের সমগ্র গতিকে নিয়ন্ত্রিত করাই ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান কাজ বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি—যাহা তাহা করে না তাহাকে আমরা কিছুতেই সত্য ধর্ম্ম মনে করিতে পারি না, শুধু কতকগুলি বিশুদ্ধ মত বা অনুষ্ঠানকে আমরা কোনও প্রকারেই ধর্ম্ম আখ্যা দিতে পারি না। শুধু বিমল তত্ত্বজ্ঞান বা প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসও ধর্ম্ম নয়। সত্য ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে জানিলে অনিবার্য্যরূপেই তাঁহার প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি জাগিবে, হৃদয়ের ভাবপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ, সকল বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছার অনুসরণ দ্বারা জীবনের প্রত্যেক কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার উদয় হইবে। কিছুতেই এই স্বাভাবিক ক্রমের বিপর্য্যয় ঘটে না; সেরূপ কিছু ঘটিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে তাহার মধ্যে কোনও প্রকার মিথ্যা ও কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলাম আর তাঁহাকে ভালবাসিলাম না, অথবা তাঁহাকে ভাল বাসিলাম অথচ তাঁহার অনুগত না হইয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিলাম, এরূপ কখনও হইতে পারে না। কাজেই এই অবস্থায় স্বভাবতঃই সকল প্রকার সংস্কার ও সদনুষ্ঠান জীবনে প্রকাশ পায়। তাহা না আসিয়াই পারে না। আর ইহা হইতে যে জীবনে সর্ব্বপ্রকার পূর্ণতা আসে, কোনও প্রকার অভাব অপূর্ণতাই থাকিতে পারে না, অর্থাৎ জীবন অনন্ত উন্নতি ও বিকাশের পথেই অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ইহা হইতে জীবনে যাহা কিছু পাইবার বা হইবার আছে সবই লব্ধ হয়—আর কিছুই বাকী থাকে না। আর জীবনে যদি এই পরিবর্ত্তনই না আসে তবে সবই বৃথা, কোনও প্রকার লাভই হইল না। সুতরাং সে ধর্ম্ম কোনও কাজেরই নয়। এই জন্যই জীবনের এই পরিবর্ত্তনকেই ধর্ম্মের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আর যাহা কিছু সমস্তই আনুষঙ্গিক বা অবান্তর। অতএব এই দিকেই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ইহার পশ্চাতেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা যত্ন প্রধানভাবে নিয়োগ করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, কণ্টকময়ই। এই পথে সংসারের লোকের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। এই দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মজ্ঞান সংসারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া চলিতে পারিয়াছে, এখনও সেই পন্থা অবলম্বন করিলে কোনও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান ধর্ম্মের দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে গেলেই মিথ্যা দুর্নীতি প্রভৃতিকে বিদূরিত করিবার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অপরকে সংশোধন করিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া শুধু আপনার জীবনকে জীবন-বিধাতার ইচ্ছানুগত করিয়া চালাইতে গেলেও সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, অপরের নিকট হইতে বিবিধ প্রকার বাধা আসিবে। কিন্তু তাহাতে ভীত হইলে চলিবে না। নির্ভীকভাবে বিধাতা-প্রদর্শিত পথেই চলিয়া যাইতে হইবে। তাহাতে যেমন নিজের কল্যাণ তেমনি অপর সকলেরও কল্যাণ। বিশেষতঃ তাহা না করিয়া আমাদের গত্যন্তর নাই। তাহা না করিলে আমরা ধর্ম্ম হইতেই ভ্রষ্ট হইব, সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইতেই বিচ্যুত হইব,

মৃত্যুর দিকেই ধাবিত হইব। কাজেই কোন অবস্থাতেই, কোনও প্রকারেই আমরা বিন্দুপরিমাণেও এই কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেককে এই খাঁটি ব্রহ্মানুগত জীবন-যাপন করিতে এবং অপর সকলকেও সেই ভাবে গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সাহায্য করিতে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। করুণাময় পিতা আমাদিগকে বুদ্ধি ও বল বিধান করুন, আমরা তাঁর অনুগত জীবন যাপন করিয়া তাঁহার ধর্ম্মকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করি। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

২রা জ্যৈষ্ঠের উৎসব—অপর স্তম্ভে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসুর পত্রখানার প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিনটা যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ও আমাদের জীবনের পক্ষে একটা বিশেষ স্মরণীয় দিন তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার জন্য করুণাময় পিতার নিকট হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন যেমন একটী অতি পবিত্র কর্ত্তব্য, তেমনি আমাদের কল্যাণের জন্যও একান্ত আবশ্যক। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে কিছু লিখিবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না—সর্ব্বত্র সকলেই ইহার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইবেন, এবং নানাস্থানে উৎসবের আয়োজন হইবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৬ই এপ্রিল (২৪শে চৈত্র) শুক্রবার—

আচার্য্য কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জীবনে ব্রহ্মকৃপালাভ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে সাক্ষ্য প্রদান করেন:—

জীবনে ঈশ্বরের করুণা ছাড়া আর যে কিছু আছে তাহাই অনুভব করিতে পারি না। আমার পিতা স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই বাল্যকালেই ব্রাহ্মধর্ম্মের হাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম, অপর দিকে বাড়ীতে হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামিও যথেষ্ট ছিল। শ্রীহট্টে থাকিতে পিতা ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। তৎপরে গৌহাটী আসি। সেখানে পারিবারিক রোগে বিপদে একদিন মনের ভার যখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং কাঁদিতেছিলাম, তখন মা বল্লেন "ভয় কি? ঈশ্বর আছেন।" এই ভাবে ভগবান বুঝাইয়া দিলেন তিনি সহায় হইয়া আছেন। যখন ১৩ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ঢাকা পড়িতে যাই, তখন অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত লিখিয়া নিয়াছিলাম। সেখানে কয়েকটী ব্রাহ্ম-বন্ধুও জুটিলেন। উপাসনার মধ্যে মহা সংগ্রাম চলিল—ব্রাহ্মরা যাহা জানেন, বলেন, তাহা করেন, আমি তাহা করিতে পারি না, যাহা সত্য জানি তাহা আমি করি না—ভগবানকে রুদ্ররূপে দেখিতে লাগিলাম। তথাপি তখনও হিন্দুই ছিলাম, গলায় উপবীত ছিল। একদিন পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের গ্যালারীর উপরে শুয়ে আছি, একটি ছোট ছেলে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ব্রাহ্মণ?" আমি বলিলাম "আমি ব্রাহ্মণ নই।" "তবে গলায় পৈতে কেন?" "উহা না থাকলেও হয়।" "তবে আমি ছিঁড়ে ফেলি?" এই বলিয়া সে ছিঁড়ে ফেলিল। অভিভাবক জানিতে পারিয়া প্রহার করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। একাকী কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। আমার নিকটে ৫ম সংস্করণের একখানা ব্রহ্মসঙ্গীত ছিল, তাহাতে ১৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ঠিকানা জানিয়াছিলাম। আর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নাম জানিতাম। ব্রাহ্মসমাজের আর কাহাকেও জানিতাম না। শিয়ালদহ হইতে একাকী হাটিয়া ১৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিয়া ছাপাখানার মত মনে হইল না, সাহস করিয়া ভিতরে যাইতে পারিলাম না। কিছু সময় পরে পরলোকগত হরিমোহন ঘোষাল মহাশয় বাহির হইয়া আসিলেন ও আমাকে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিয়া আমার সকল অবস্থা জানিলেন ও অতি স্নেহের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন।

কিছু দিন পর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে আবার ঢাকা যাইতে হইল। তখন মা সেখানে আসিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখীন যখন হইলাম তখন আরো কঠিন পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এই ভাবে মার নিকটে থাকা বিপদজনক বোধ হইতে লাগিল। পরীক্ষা দিয়াই পালাইয়া ময়মনসিংহ চলিয়া গেলাম; ধরা পড়িবার ভয়ে ১৩ মাইল রাস্তা হাটিয়া টঙ্গীতে যাইয়া গাড়ীতে উঠি। নির্ম্মমভাবে পিতামাতার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিতে হইল। শেষে আবার কিন্তু পিতামাতার স্নেহ সবই পাইয়াছিলাম। মা আমার এখানে আসিয়া আমার নিকট বাস করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবেই পরম পিতা সকল ক্ষত শুকাইয়া দেন।

রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়াই আমাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। এক একটিকে জয় করিয়া চরিত্র গঠন করিতে হইয়াছে। কঠিন সংগ্রামের মধ্যে ভগবান বলিলেন মানুষের কাছে সকল খুলিয়া বল, তাহাতেই পবিত্র হবে; অন্তরের সকল কলুষ খুলিয়া বলিলাম, তাহাতে বল পাইলাম, কলুষমুক্ত হইতে পারিলাম।

রোগেও তাঁহার দয়া। মস্তিষ্কের কঠিন পীড়া হইল, অসহ্য যন্ত্রণায় নিদ্রা নাই, দার্জ্জিলিং গেলাম, সেইখানেও নিদ্রা নাই, ভিজে গামোছা মাথায় বাঁধিয়া রাখিতাম, দরজায় পড়িয়া থাকিতাম, সকলে ভয় দেখাইত অন্য কঠিন রোগ হইবে। কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা নাই, যন্ত্রণার অবসান নাই। একদিন এক ঝরণার নিকট বসিয়া থাকিতে থাকিতে প্রাণে অপূর্ব্ব করুণার পরিচয় পাইলাম, সকল যন্ত্রণা চলিয়া গেল, শরীর মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল। বহু ক্ষণ সেই ভাবে কাটিয়া গেল। সেই দিন হইতে সুনিদ্রা আরম্ভ হইল, শরীর সুস্থ হইল।

শোকেও তাঁহার দয়া। প্রথম সন্তান যখন পরলোকে চলিয়া যায়, পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারি নাই, ডাক্তারও বুঝিতে পারেন নাই—অন্য ঘরে ছিলাম, হঠাৎ ক্রন্দন শুনিয়া ছুটিয়া আসিলাম,

পত্নী অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি দেখিলাম, প্রাণে কি অনুভব করিলাম, আমাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহার প্রকাশে মৃত্যুর যবনিকা ভেদ করিয়া পরলোক উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইল।

হরিশ্চন্দ্র দত্ত—কি প্রকারে ব্রাহ্মসমাজে আসেন তাহা বর্ণন করিয়া বিশেষ ভাবে দুঃখ বিপদে অর্থাভাবে প্রার্থনার ফল বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর—কি প্রকারে বিলাসিতা ও পতনের পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ মাঘোৎসবের উপাসনায় আসিয়া পরিবর্তিত হইয়া গেলেন, তাহার পর জীবনে সংগ্রাম আরম্ভ হইল, যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুইটি এই পথে আসিয়াছিল তাহারাও নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন, নিজে ভগ্নস্বাস্থ্য হইলেন, এই সকল বর্ণনা করিয়া সাক্ষ্য দিলেন ভগবান একদিনের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই, এক দিনের জন্যও দুঃখ আসে নাই, এই দেহই তাঁহার দয়ার বিশেষ পরিচয়।

শ্রীমতী সারদামঞ্জরী দত্ত—বাল্যকালে কি প্রকারে "হীরা-প্রভা" নামক একখানা পুস্তক পড়িয়া প্রাণে সাধুসঙ্কল্প জাগে এবং প্রার্থনাকে অবলম্বন করেন তাহার বর্ণনা করিয়া, সন্তান হারাইয়া শোকের যাতনার মধ্যে কি প্রকারে সান্ত্বনা পাইলেন যে কান্না করিয়া তাহাকে পাওয়া যাইবে না, ঈশ্বরের জন্য কাঁদিলে তাঁহাকে পাইতে পারিবেন, তাহা বলিয়া বলিলেন "তত্ত্ব-কৌমুদী" পাঠে নাম সাধনে কথা জানিয়া তাহা অবলম্বনে বল ও শান্তি পাইলেন। যখন তিন সন্তানের মা তখন সিলেটে যাইয়া রাজচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে উঠিবেন ঠিক করাতে তাঁহার ভাসুর নৌকায় আসিয়া বলিয়াছিলেন, পা ভাঙ্গিয়া দিবেন। তথাপি ভগবানের কৃপায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তখন প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে পারিয়াছিলেন।

বেলা অধিক হওয়াতে অপর একদিন (সোমবার প্রাতে) এ বিষয়েও আরও অনেকে সাক্ষ্য দিবেন এরূপ স্থির হইল। অনন্তর আচার্য্য প্রার্থনা করেন এবং "দয়াময়ী মাগো আমার" ইত্যাদি সংগীতটি গীত হইয়া এই বেলার কার্য্য শেষ হইল।

অপরাহ্ণ—৩॥ ঘটিকায় "ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি" বিষয়ে আলোচনা হয়। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি সংক্ষেপে বিষয়টা অবতারণা করিলে পর, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত নিজে প্রকাশিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আলোচনা উপস্থিত করেন :—

ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনার ভার আমার উপরে অর্পিত হয়েছে। কাজটি একটু কঠিন ব'লেই মনে হচ্ছে। সত্য বটে, এখন জাগরণেরই সময়। যেন স্বয়ং ঈশ্বরই মানুষকে ডেকে প্রাচীন ঋষিদিগের ভাষায় বলছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।" তোমরা উঠ, তোমরা জাগ; সকলেই আপনাদের শক্তিশালী কর এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হও।' কিন্তু বোধ হয় সমস্ত দেশের অধিকাংশ লোকই ধর্ম্মকে অনাবশ্যক মনে করে। একপাশে সরা'য়ে রেখে, শুধুই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বিষয়-বাণিজ্যের উন্নতির দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি ক'রে জাগ্রত হবে চেষ্টা করছেন। এই জন্যই সকল দেশেই ধর্ম্ম যেন অধিকাংশ মানুষের অবজ্ঞার তলে পড়ে গিয়েছে। এই ত কিছুদিন পূর্ব্বে একটি বাঙ্গালা মাসিকপত্রে পড়েছিলুম, এমেরিকার একজন মস্ত বড় ধর্ম্মযাজক আক্ষেপ ক'রে বল্ছেন সর্ব্বত্রই যেন ধর্ম্মের প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে: দেশের তরুণ এবং তরুণীগণ যেন ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। আমার ত কল্পনায় মনের কাছে এই ছবিই জেগে উঠে যে আমাদের চারদিকে ঈশ্বরবিরোধী ভাবের সমুদ্র; তার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ অতি ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের মতন মাথা উঁচু করে আছে; সে কেমন ক'রে সাগরের ঢেউয়ের ধাক্কা সহ্য ক'রে মাথা উঁচু ক'রে উন্নত হবে? ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি না হ'লে, তার জন্য আমরা আপনাদিকেই দোষী করব বই কি? কিন্তু সমস্ত দোষই নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, আপনাদিগকে একেবারেই শক্তিহীন ও অকর্ম্মন্য লোক মনে করলে ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যে প'ড়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরেই বিশ্বাস হারাবার ভয় আছে।

যা হোক, আজকের আলোচনার মধ্যে এই বিষয়ে বেশী কিছু বল্লে নিতান্তই অনাবশ্যক বিষয়ের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। তাই আমি আসল আলোচনার কথাটি নিয়েই কিছু বলতে চেষ্টা করব। আমাদের চারদিকের বিস্তর লোক যেন বল্ছেন, তোমরা কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে মাথা খুঁড়ে মারা যাচ্ছ? তিনি থাকেন ত চিরদিনই তিনি আপনাকে রহস্যে আচ্ছন্ন ক'রে আপনার কাজ করুন, তোমরাও দেশের হিত প্রভৃতি মহৎ কার্য্যে ব্রতী হও। ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে ডেকে কে বা তাঁকে দেখেছে? কে বা তাঁকে পেয়েছে? দেশের বিস্তর শিক্ষিত লোকেরই মনের ভাব যখন এই রকম, তখন ত ব্রাহ্ম-সমাজেরই দায়িত্ব অতি গুরুতর। একমাত্র ব্রাহ্মসমাজের নর-নারীকেই সাধনের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ ক'রে, ঈশ্বরলাভের দ্বারা মহৎকার্য্যে আপনাদিগকে অর্পণ ক'রে, মহৎ কার্য্যের দ্বারা সমাজকে শক্তিশালী ক'রে, বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হ'য়ে, এই কথাই বলতে হবে যে, হে ঈশ্বরবিরোধী লোকসকল তোমরা কি বলছ? ঈশ্বরকে ডাকলে কেহ পায় না? তাঁকে পেলে জীবন ধন্য হ'য়ে যায় না? দেখ ত আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা তাঁকে ডেকেছি, ডেকে পেয়েছি, পেয়ে শক্তিশালী হয়েছি, তাই ত দেশের কল্যাণকর সুমহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করতে সাহসী হয়েছি। নচেৎ, যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, আমাদের হস্ত দুর্নীতিতে মলিন, ততক্ষণ আমরা কিরূপে আপনাদিগকে পুণ্যময়ী দেশমাতার সেবার উপযুক্ত ব'লে মনে করব?

আমার ত মনে হয়, যদিও কাজ অত্যন্ত কঠিন, তবুও দেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান ভারই ব্রাহ্মসমাজের উপরে। তা হ'লে সকলেই একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি করা কতই প্রয়োজন।

কিন্তু শুধু কি দেশের অথবা অন্য লোকের জন্যই আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করা আবশ্যক? তা কেন? আমাদের প্রত্যেকের জীবন মৃত্যু যে ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধির উপরই নির্ভর করে। ব্রাহ্মসমাজকে আমরা সবল ক'রে তুলতে না পারলে আমরা

কোথায় গিয়ে শক্তিলাভ কর্‌ব? আমাদের আত্মার উন্নতি ও পরিতৃপ্তি এবং সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুতেই হবার উপায় নাই। শুধু কি তাই? ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথাও সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। বিপুল প্রাচীন ধর্ম্মসমাজের পার্শ্বে যখন একটি ক্ষুদ্র নূতন ধর্ম্মসমাজের উৎপত্তি হয়, তখন তাঁর জনবল, অর্থবল খুব বেশী নাও থাকৃতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আধ্যাত্মিক শক্তি, নৈতিক বল এবং ত্যাগের জীবন্ত ভাব না থাকে তবে সেই সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করা একরকম অসম্ভব হয়েই উঠে। আমরা যে দিক হ'তেই চিন্তা করি না কেন, সকল দিক হ'তেই অনুভব কর্‌তে পারি, আমাদের ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। আর তা আবশ্যক মনে কর্‌লে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দীয় জুবিলী এবং ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষেই প্রত্যেক ব্রাহ্মের উক্ত কার্য্যের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজন ও আবশ্যক।

ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি কর্‌তে হলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শের অনুরূপ ধর্ম্মজীবন লাভ এবং সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্য সাধনের জন্য আমাদের সকলেরই প্রাণে প্রাণে মিলিত হওয়া প্রয়োজন। সেই পুরাতন কথা আমরা সকলেই জানি যে, ক্ষুদ্র তৃণ যতক্ষণ স্বতন্ত্র ততক্ষণ সে অতি তুচ্ছ এবং শক্তিহীন। কিন্তু উহারই রাশি রাশি তৃণ একত্র ক'রে রজ্জু প্রস্তুত কর্‌লে তার কতই শক্তি? তখন সেই রজ্জুদ্বারা বলবান হস্তিকেও বেঁধে রাখা যায়। তেমনি আমরা বৃদ্ধ ব্রাহ্ম, যুবক ব্রাহ্ম, আমরা পুরুষ ও নারী যতক্ষণ স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন অস্তিত্বের সীমানার মধ্যে বাস কর্‌তে থাক্‌ব, ততক্ষণ আমাদের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কোন সুমহৎ কার্য্যত সম্পন্ন হইবেই না, তাহা ছাড়া আমরা উৎসাহের সহিত সাধন করিতে অথবা উচ্চতর ধর্ম্মজীবন লাভ কর্‌তেও সমর্থ হব না। নানা প্রকার সংগ্রামময় সাধনের পথে চলিতে, ধর্ম্মলাভ করিতে এবং অন্তরে আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত ক'রে ব্রাহ্মসমাজের সেবা কর্‌তে সহৃদয় ধর্ম্মবন্ধুদিগের সাহায্যের কতই যে প্রয়োজন, তাহা ত আমরা খুব ভাল করেই জানি।

আমাদের মধ্যে ছোট ছোট বিষয়ে মতের পার্থক্য আছে, এই স্বাধীনচিন্তার যুগে তা থাক্‌বেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি আমরা সকলের উদ্দেশ্যের উপরে ভাল ভাব রক্ষা ক'রে, উদার ভাবে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ কর্‌তে পারি, আমরা যদি আমাদের অন্যায় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণভাব দূর ক'রে হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতির আবেগে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব ও হৃদয়ের যোগ রক্ষা কর্‌তে পারি, তা হ'লে পরস্পরের সাহায্যে আমাদের ধর্ম্মজীবন গঠন, সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য পালন এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবায় স্বার্থত্যাগ অনেক পরিমাণে সহজ হ'তে পারে।

আমাদের প্রাণে প্রাণে মিলিত হবার এক প্রধান উপায়ই ব্রহ্মমন্দিরের সমবেত উপাসনায় যোগদান করা। আমরা ত মন্দিরে উপাসনায় এসেই প্রথমে বিস্তর ব্রাহ্মের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছি, তার পরেই এখানকার সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া পরস্পরের সঙ্গে একটি আত্মীয়তা ও যোগ অনুভব করেছি। এই সমবেত উপাসনায় ব্যাকুলভাবে যোগদান করা ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধির একটি উৎকৃষ্ট উপায়, তাহা অস্বীকার করার যো নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে আদিব্রাহ্মসমাজে, তাহার পরে মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মিলিত উপাসনায় যে কিরূপ ঈশ্বরের করুণার ও প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইত, সে দৃশ্য অনেকে দেখেছেন, যাঁরা দেখেন নাই তাঁরাও তার বিবরণ শুন্‌তে পেয়েছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গতসভার অপূর্ব্ব কাহিনী উপন্যাসের ঘটনার মতনই চিত্তাকর্ষক। সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সাধনে, কি প্রচারে, কি জনহিতকর কার্য্যে যেরূপ জমাট বেঁধেছিল, ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল, তেমন বুঝি আর হয় নাই। তার পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যখন অভ্যুদয় হ'ল, যখন এ সমাজের জ্ঞানিগণ, সাধকগণ, কর্ম্মিগণ, পরম উৎসাহের সহিত উপাসনায়, বক্তৃতায় ও আলোচনায় এবং সভাসমিতিতে ও কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত হইতেন, এই সমাজের সকল কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন কর্‌বার জন্য মিলিত হ'তেন, তখনও এই সমাজের শক্তি দর্শন ক'রে দেশের এবং বিদেশের লোকও বিস্মিত হয়েছিলেন।

যা হোক, সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার এক প্রাণ হ'য়ে ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা কর্‌তে হ'লে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মিলিত-উপাসনায়, আলোচনায় বক্তৃতায় এবং সভাসমিতিতে যে সকলেরই উৎসাহের সহিত মিলিত হওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এজন্য, আমাদের মিলিত উপাসনা, আলোচনা এবং সভাসমিতিগুলি যাহাতে প্রাণশূন্য রাশি রাশি শুষ্ক অসার কথার ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায় সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রাণশূন্য শুষ্ক কথার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ালে শুধুই কর্ত্তব্যজ্ঞানে কয়দিন আর মানুষ ঐ সকল ব্যাপারের সঙ্গে যোগরক্ষা কর্‌তে পারবে? আমাদের মিলিত উপাসনায় সঙ্গীত, উপাসনা এবং উপদেশ যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী এবং প্রাণস্পর্শী হয়, হৃদয়ে যাহাতে এরূপ ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার হয়, সে বিষয়ে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে হবে।

একপ্রাণ হয়ে, পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি ক'রে ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা কর্‌তে হলেই আমাদের সহানুভূতি ও প্রীতির ভাব যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহা করা আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজের মতন একটি ক্ষুদ্র সমাজে এই সহানুভূতি ও প্রীতির বড়ই প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে কত পুরুষ ও নারী ঘরকে পর ক'রে অসহায়ের মত ব্রাহ্মসমাজে এসেছেন। এখানে এসে কত পরীক্ষা কত প্রলোভন, কত নির্য্যাতন, কত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস কর্‌তে হয়। এই অবস্থায় সমাজের প্রত্যেক নরনারী প্রত্যেক ব্রাহ্মের নিকট কতই সহানুভূতি সাহায্য এবং স্নেহপ্রীতির আশা ক'রে থাকেন। আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দীয় এবং ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসবে যদি আর কিছুই কর্‌তে না পারি, তবুও যেন এই সংকল্প করি, আমরা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সহানুভূতি ও প্রীতি, উদারতা এবং সকল অবস্থায় ব্রাহ্মের সঙ্গেই মিলনের ভাব বাড়াইয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ব। তা হ'লে নিশ্চয়ই আমাদের সমাজের শক্তিবৃদ্ধি হবে।

আমি একটু আগেই প্রসঙ্গক্রমে আমাদের সমবেত উপাসনার বিষয়ে কিছু বলেছি। যেমন মন্দিরের সমবেত উপাসনা ও আলোচনা, তেমনি নির্জ্জন সাধন এবং পারিবারিক উপাসনা ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি কিসের জন্য? নিশ্চয়ই দলবৃদ্ধির জন্য নয়। আমরা যে জন্য প্রাচীন সমাজ ত্যাগ ক'রে ব্যাকুল হ'য়ে ব্রাহ্মসমাজে এসেছি, সেই উচ্চতর ধর্মজীবন লাভ করার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে সবল ক'রে তুল্‌তে চাই। প্রত্যেক বৃদ্ধের, প্রত্যেক যুবকের, প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর ধর্মজীবন—বিশ্বাস ও ভক্তিতে এবং কর্ম্মজীবন নিঃস্বার্থ সেবার ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লেই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে এবং সেই উন্নতিতেই ব্রাহ্মসমাজ শক্তিশালী হ'য়ে উঠিবে। ইহার জন্য সাধন এবং ত্যাগের ভাবকেই বুকে জড়ায়ে ধরা আবশ্যক।

আমাদের সাধনে প্রবৃত্ত হ'তে হ'লেই নির্জ্জনে গিয়ে আত্মচিন্তা এবং আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা কর্‌তে হবে। আমার ত মনে হয়, ঈশ্বরের সত্য অনুভূতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ ক'রে তুল্‌তে হ'লেই বিশেষভাবে ধ্যানের প্রয়োজন। ধ্যানের পক্ষে নির্জ্জন সাধন যেমন সহায়, এমন আর কি? এই নির্জ্জন-ধ্যানের প্রতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেমন দৃষ্টি রেখেছিলেন, তেমন হয় ত আর কেহই রাখ্‌তে পারেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে যেন নির্জ্জন ধ্যানের অভাবেই আমাদের ধর্ম্ম জীবন আশানুরূপ গভীর হয়ে উঠ্‌ছে না।

সমবেত উপাসনার বিষয় আগেই বলেছি। এখন পারিবারিক সাধনের বিষয় কিছু বল্‌তে চাই। এই দিকে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের যেমন দৃষ্টি ছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বোধ হয়, তেমন দৃষ্টি নাই। আমরা সমবেত উপাসনায় ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে, নির্জ্জনে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, স্বীয় আত্মায় এবং পরিবারে প্রিয়জনের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন কর্‌ব। এই তিনটিই আমাদের সাধনের স্থান। এই তিনকেই আমাদের সাধনের এবং ধর্মলাভের অনুকূল ক'রে নিতে হবে। আমাদের পরিবার যদি ধর্মলাভের অনুকূল না হ'য়ে প্রতিকূলই হ'য়ে থাকে, তবে ত ধর্ম্মলাভের জন্য অরণ্যে যাওয়াই আবশ্যক হয়ে উঠে। এজন্য প্রাণপণে পরিবারে উপাসনা এবং ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ক'রে স্ত্রী পুত্র প্রিয়জনকে ধর্ম্মজীবন লাভের সহায় ক'রে নিতে হবে। সকলে নির্জ্জন সাধন এবং পারিবারিক সাধন বিষয়ে কল্পনা করে মনের সাম্‌নে একখানি ছবি এঁকে তুলুন। মনে করুন, একজন সাধক নির্জ্জনে ব'সে প্রথমে দুই চক্ষু ভরে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ কর্‌ছেন। তার পরে সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যেই অসীম সুন্দরের আভাস পেয়ে আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। আরাধনা হ'তে ধ্যানের অবস্থায় গিয়ে পৌঁছিলেন, তারপরে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতির মধ্যে প্রাণ নিমগ্ন হ'য়ে যেতে লাগ্‌লো! তখন কি পুলক! কি প্রীতি! কি আনন্দের উচ্ছ্বাস!

তেমনি পারিবারিক সাধন বিষয়েও কল্পনায় মনের মধ্যে একখানি ছবি অঙ্কিত করুন। একটি ভক্ত পরিবারে পারিবারিক উপাসনাগৃহে বাড়ীর সকলে মিলিত হয়েছেন। ছেলে মেয়েরা মধুর কণ্ঠে ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত কর্‌ছেন, ভক্ত অন্তরে ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব ক'রে বিগলিত হ'য়ে সুমধুর উপাসনা কর্‌ছেন, উপাসনার পরে ভক্তের ভক্তিমতী পত্নী নয়নজলে সিক্ত হইয়া ঈশ্বরের চরণে ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য প্রার্থনা করছেন;—সে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য। আমি বাঁকিপুরে ভক্ত প্রকাশচন্দ্রের গৃহে এই বর্ণনার অনুরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি ব'লেই, এত সব কথা বল্‌তে সমর্থ হচ্ছি।

যথার্থই মণ্ডলীর সমবেত সাধন, নির্জ্জন ও পারিবারিক সাধন প্রতিষ্ঠার উপরেই প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করে। তাই বলি, এজন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সাধন ভিন্ন কি রূপে আমাদের ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিবে? কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি হইবে?

সাধনের পরেই ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মের উল্লেখ কর্‌তে চাই। আধ্যাত্মিক উন্নতিই যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্য, তখন স্বীকার কর্‌তেই হবে যে ধর্ম্মশিক্ষা, ধর্ম্মপ্রচার, উপাসনা, সঙ্গীত এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানসকল সম্পন্ন করা ইহার প্রধান কাজ। এই সকলের জন্য প্রচারক, আচার্য্য, গায়ক ও কর্ম্মী আবশ্যক। এই সকল প্রচারক আচার্য্য ও কর্ম্মীদিগের সাধনপরায়ণ ত হইতেই হইবে। কিন্তু শুধু তাহাতেই চলিবে না। তাঁদের শিক্ষিত, চিন্তাশীল এবং সাহিত্যিক হওয়াও আবশ্যক। নচেৎ কিছুতেই তাঁরা এই জ্ঞানপ্রধান যুগে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে, আচার্য্য ও প্রচারকের কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন কর্‌তে পার্‌বেন না। সকল কার্য্যই খুব ভাল ক'রে করাই আবশ্যক। ইহাই ত ঈশ্বরের নিয়ম। স্বয়ং ঈশ্বরের কাজগুলি কি সুন্দর! আর তা সুন্দর ক'রে কর্‌তে না পার্‌লে মানুষের অন্তরে ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপিত করাও সহজ হবে না। এই জন্যই এই সকল কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হওয়া চাই।

এই সকল ধর্ম্মকার্য্য সাধারণতঃ প্রচারকের উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের সম্মুখে প্রচারকের যে আদর্শ আছে, সেই আদর্শের অনুরূপ প্রচারক হওয়া বড়ই কঠিন কার্য্য। প্রচারব্রতে ব্রতী হ'য়ে পদে পদে আপনার অক্ষমতা দেখেই এই কাজটি কিরূপ গুরুতর তা অনুভব কর্‌তে পার্‌ছি। তা যে জন্যই হোক, প্রচারকার্য্যে লোক আর বড় অগ্রসর হচ্ছেন না। অথচ ধর্ম্মশিক্ষা, ধর্ম্মবিস্তার, উপাসনা ইত্যাদি ধর্ম্মকার্য্যগুলি সম্পন্ন না করিলেও নয়। উহার উপরেই ত ব্রাহ্মসমাজের শক্তি নির্ভর করে। কাজেই, রীতিমত প্রচারক না পেলেও প্রচারকের মতই কতকগুলি কর্ম্মী চাই। যেমন আমাদের ভক্তিভাজন হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ললিতমোহন দাস, রজনীকান্ত গুহ, বরদাকান্ত বসু, প্রভৃতি রীতিমত প্রচারক না হ'য়েও পরম শ্রদ্ধেয় কর্ম্মীরূপে ব্রাহ্মসমাজের নানা প্রকার ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন কর্‌ছেন। এঁদের জীবনের দৃষ্টান্তের অনুসরণ ক'রে ব্রাহ্মযুবক এবং সুশিক্ষিতা নারীগণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দণ্ডায়মান না হ'লে, কে ব্রহ্মসমাজের কার্য্যসকল সম্পন্ন করবে? কি রূপে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি বৃদ্ধি হবে?

তার পরে আমাদের সমাজের নানা কার্য্যের জন্য টাকা কড়িরও

যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। প্রচারকের বৃত্তি, মফস্বলে ধর্ম্মপ্রচারের পাথেয়, গ্রন্থাদি এবং পত্রিকা প্রচার এই সকলের জন্যই ত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সমাজের মধ্যে এবং দেশে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভাব জাগ্রত ক'রে তুল্‌তে হইলেই ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যকে শক্তিশালী ক'রে তোলা প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ ও উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র মানব মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত কর্‌বার এক প্রধান অবলম্বন। ব্রাহ্মসমাজ যদি জ্ঞানগর্ভ ও আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ গ্রন্থ ও মাসিক পত্র প্রকাশ কর্‌তে না পারেন, তা হ'লে সমাজের শক্তিবৃদ্ধিও কর্‌তে পারবো না। অতএব সকলে একবার চিন্তা ক'রে দেখুন ঐ সকলের জন্য কত অর্থের প্রয়োজন তাই বলি আমাদের মধ্যে যাহাতে ত্যাগের ভাব বর্দ্ধিত হয়, আমরা যাহাতে সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য ক'রে ব্রাহ্মসমাজের কাজগুলিকে সবল ক'রে তুল্‌তে পারি, সেজন্য চেষ্টা কর্‌তে হবে।

এই জন্যই আমার শেষ কথা এই যে, এবার উৎসবের পরে আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মদিগের গৃহে গৃহে গমন ক'রে ধর্ম্মসাধন, আত্মত্যাগ ও ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের জন্য পুরুষ এবং নারী সকলের অন্তরে একটা উদ্দীপনা এবং সাধনের ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগাতে চেষ্টা করুন। উহাতে যদি অন্ততঃ একদল যুবক ও সুশিক্ষিতা নারী ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনে এবং ব্রাহ্মসমাজের মহৎ কার্য্যে বদ্ধপরিকর হন, তা হ'লে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

অনন্তর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন, চারিদিকের জমিতে সার নাই, ধর্ম নাই, ব্রাহ্মসমাজে জমি প্রস্তুত করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বলেন, বিষয়ী হইয়া পড়িলে চলিবে না, স্বার্থনাশ চাই, ত্যাগ চাই, সহানুভূতি চাই। ভাই সীতারাম বলেন আপনাকে হারাইলেই আপনাকে পাওয়া যায়, জীবনই জীবন প্রদান করে; শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গবিহারী লাল বলেন, নিজের মধ্যে জীবন না থাকাতেই অপরকে জীবন দেওয়া যাইতেছে না; শ্রীযুক্ত সুব্বারুল্লায় বলেন, ভালরূপ কার্য্যব্যবস্থা (organisation) চাই, তাহার অভাবে বৃথা শক্তি ক্ষয় হয়। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর বলেন, এই দেশে সন্ধিস্থাপন করিয়া চলার (compromise) ভাবটা ধারাবাহিক ভাবে চলিয়াছে, তাই সুবিধাবাদীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ ধর্ম্মমণ্ডলী, পারিবারিক ব্যবস্থায় ধর্ম্মকে সকলে বড় করিয়া ধরিতে হইবে, উপাসনাকে বড় করিয়া অবলম্বন করিতে হইবে, ব্রাহ্ম উপাসনায় যাবে না, পূর্ব্বে এ কথা কল্পনাও করা যায় নাই। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন বিষয়সেবায় শক্তি ক্ষয় হইতেছে, আমাদের দোষ দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে হইবে, ছেলেরাও আমাদের দোষ ত্রুটি ধরিতে পারে, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ সমালোচক।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ত্তা" বিষয়ে একটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

৭ই এপ্রিল (২৫শে চৈত্র) শনিবার—যুবকদিগের উৎসব। ঊষাকীর্ত্তনান্তে মন্দিরে কিছু সময় কীর্ত্তন হয়। তৎপরে উপাসনা; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

সাজ সত্যের সংগ্রামে
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে।

যখন আমি স্কুল কলেজে পড়িতাম, এমন কি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবারও পূর্ব্বে, ব্রাহ্ম এবং যাহারা ব্রাহ্ম নন, তাঁহাদের মুখে এই গানটি প্রায়ই শুনিতাম। তখন সত্যের সংগ্রাম অনেক দিন আরম্ভ হইয়াছে, সত্য যাহা, শাশ্বত যাহা, মানবের কল্যাণের জন্য যাহা, ঈশ্বরের অভিপ্রেত যাহা, তাহা নিজ জীবনে পালন কর্‌তে হবে; সমাজে দেশে তাহা প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হবে। তাতে অপর দিকে অসত্য, কুসংস্কার, অধর্ম্ম, দুর্নীতি, পাপ সব পরিত্যাগ কর্‌তে হবে; বাধা বিঘ্ন অনেক, তাতে দুঃখ বরণ ক'রে লইতে হয়, তাতে সমাজ উৎপীড়ন করে, পিতা মাতা অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু উপায় নাই। আমরা ঈশ্বরের সৈনিক, সত্যের সংগ্রামে আমরা সৈনিক, অসত্য কুসংস্কার পাপ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সৈনিক; যুবকগণ সৈনিক, বৃদ্ধগণ সৈনিক, পুরুষ নারী সকলেই সৈনিক। সকলকে আহ্বান ক'রে বলা হইতেছে, সৈন্যগণ, ঈশ্বরের সৈন্যগণ, সত্যের সংগ্রাম উপস্থিত, অসত্য অধর্ম্ম দুর্নীতি অশিক্ষা কুশিক্ষা, পাপ কুসংস্কার দেশকে, মানবসমাজকে, নরকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তোমরা প্রস্তুত হও। ভয় নাই। তোমরা দুর্ব্বল? তোমরা সহায়হীন? তবুও ভয় নাই; ঐ বিশ্বপতি তোমাদের সেনাপতি সেজে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। এই ছিল সে যুগের বাণী। এ সত্য নিত্য সত্য, শাশ্বত সত্য, যাহাতে মানুষকে মৃত্যুময় জীবন হ'তে অমৃতময় জীবনে নিয়ে যায়, যাহাতে মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়, এ সে সত্য। আজকাল সত্যের আর একটা যে ব্যাখ্যা শুনি— যে ভাব মনে উদয় হয় তাহার অনুসরণ করাই সত্যের অনুসরণ করা, যে বাসনা প্রাণে জাগে তাহার দিকে ছুটে যাওয়াই সত্য পথে চলা—এ সে সত্য নয়। এ সত্য সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হ'তে এসেছে, মানুষকে অমৃতের পথে, মুক্তির পথে, নিয়ে যেতে এসেছে। যে সময়ে এই সত্যের সংগ্রাম চলেছিল, সে সময় সত্যের সংগ্রামে অনেক যুবক বৃদ্ধ, পুরুষ নারী অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন; আমার এক শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয় বলিতেন—তিনি ঢাকাতে থাকিয়া পড়িতেন, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে যেতেন —তিনি বল্‌তেন "যখন ব্রাহ্মগণ গান করিতেন 'হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন,' তখন আমার মনে হতো নবকান্ত বাবু যেন যেয়ে সব পৈতা গুলি ছিঁড়ে ফেলে দিতেছেন, সকল পাপ কুসংস্কার ছিন্ন কর্‌ছেন"। এই কথাদ্বারা সংগ্রামের একটা দিক প্রকাশ পেতেছে; এই রূপ সংগ্রাম চলিতেছিল। সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে। সেই যে সত্যের সংগ্রাম আরম্ভ হলো, সেই যে পাপ তাপ অসত্য কুসংস্কার, অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল, সেই যে মানবের মনুষ্যত্ব জাগাবার, সকলের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম আরম্ভ হলো, সেই যে বিজয়পতাকা উত্থিত করা হইল, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়পতাকা হস্তে অগ্রসর হলেন দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ, প্রতাপচন্দ্র, আনন্দমোহন, দুর্গামোহন, দ্বারকানাথ, শিবচন্দ্র আরও কত বীর পুরুষ। আপনাদের জীবনের রক্ত বিন্দু বিন্দু দান ক'রে সত্যের সংগ্রামে অগ্রসর হলেন; পুণ্যব্রতে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিলেন। তাঁরা যখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁরা সকলেই যুবক ছিলেন। রামমোহন সত্যের জন্য ১৬ বৎসর বয়সে গৃহ হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে, সেই বিপদসঙ্কুল সময়ে—রেল ষ্টীমার নাই, এরোপ্লান নাই সে সময়ে—হিমালয় লঙ্ঘন ক'রে সুদূর তিব্বতে উপস্থিত হলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র, ভোগৈশ্বর্য্যে রত, দেবেন্দ্রনাথ ১৮ বৎসর বয়সে ঈশ্বরের আলোক দেখিয়া অগ্রসর হলেন। অল্প বয়সে কেশবচন্দ্র সত্যের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; শিবনাথ ছাত্রাবস্থাতেই সত্যের নিশান হাতে করিয়া অগ্রসর হইলেন। বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, আনন্দমোহন, দ্বারকানাথ সকলেই যৌবনকালেই সেনাপতি বিশ্বপতির আহ্বানে সত্যের নিশান ধরিয়া সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন।

প্রীতিভাজন তরুণ তরুণীগণ, তোমাদিগকেও বলি,— তোমাদিগকে আমি স্নেহ করি, তোমাদের উপর আমার আশা আছে, তোমরাও আমাকে প্রীতি কর, সেই দাবীতেই

তোমাদিগকে বলি,—তোমাদের এই উৎসবমন্দিরে ভগবানের চরণতলে ব'সে বলি, তোমরাও শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, ব্রাহ্মধর্মের নিশান, সত্যের নিশান দৃঢ় হস্তে ধরিয়া নবীনতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, তোমরাও আবার সেই বাণী শুনিয়া অগ্রসর হও—

সাজ সত্যের সংগ্রামে
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে।

তোমরা আবার গগনভেদী স্বরে বল—

হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন।

তোমাদের হুঙ্কারে সব পাপ কুসংস্কার অসত্য দূর হউক, সত্য প্রেম পবিত্রতা, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হউক, তোমরা আত্মত্যাগী বীর হ'য়ে ঈশ্বরের পতাকা হস্তে অগ্রসর হও। সুখের বিষয়, আজ ব্রাহ্মসমাজের তরুণগণ ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে অগ্রসর হইয়াছেন; তাঁহারা কৃতী, তাঁহাদের জ্ঞান আছে, বিদ্যাবুদ্ধি আছে, চরিত্রবল আছে, নানা প্রকার শক্তি আছে; তাহারা যদি ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে অগ্রসর হয়, তাহারা যদি ঈশ্বরপ্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের নিজের ও দেশের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্ম আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইবে, দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে লোকে বড়ই ভুল করে। লোকের কথা বার্ত্তায়, আলাপ আলোচনায়, মনে হয়, এ দেশে যে নানা প্রকার ধর্ম্ম আছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাদেরই মত' একটী সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম; সুতরাং এই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য, আপনাদের দল বৃদ্ধি করবার জন্যই ব্রাহ্মগণ চেষ্টা করিতেছেন। বাস্তবিক দলবৃদ্ধি করাই আমাদের লক্ষ্য নহে। আমাদের লক্ষ্য এদেশে সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা; আমরা মরিয়া যাই, আমরা অযোগ্য হ'লে আমরা অপদস্থ হই, আমরা কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত হই,—তাহাতে আমাদের দুঃখ হবে, আমরা এমন ধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝিলাম না ব'লে বেদনা হবে—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? দেশের ও মানবের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। সে আদর্শ কি? তরুণ তরুণীগণ, তোমরাও এই আদর্শ স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লও। সে আদর্শ আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ এক মন্ত্রে বলিয়া গিয়াছেন—তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপাসনাই সেই আদর্শ। উপাসনার দুই অঙ্গ—এক অঙ্গ সত্য-স্বরূপ প্রেমস্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে প্রীতি সাধন—কোনও পুরো-হিতের সাহায্যে নয়, মধ্যবর্ত্তীর সাহায্যে নয়, কোনও ফল নৈবেদ্য পশুবলি প্রভৃতি উপাচারে নয়, প্রেম ভক্তি দ্বারা সাক্ষাৎ-ভাবে, তিনি আর আমি এই ভাবে, তাঁর অর্চ্চনা করা, ধ্যান করা, বন্দনা করা, তাঁর পুণ্যময় নামকীর্ত্তন করা; আর অপর অঙ্গ—অকপট প্রীতিদ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন করা, লোকশ্রেয়ঃ সাধন করা, দেশের ও মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা; দুঃখ দারিদ্র্য দূর করা, পাপ কুসংস্কার দূর করা, নারী জাতিকে, অস্পৃশ্য জাতিকে মনুষ্যত্বের অধিকার দেওয়া, দেশে রাজনীতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। ব্রাহ্মগণ চিরদিন এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই আদর্শ নিজের জীবনে ও দেশে প্রতিষ্ঠা করতে যাইয়া কত অপমান নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন, কত দুঃখ দারিদ্র্যে ক্লেশ পেয়েছেন। তরুণ ও তরুণীগণ, তোমাদেরই অনেকের পিতা মাতা এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ হইতে, পিতা-মাতার স্নেহের বক্ষ হইতে, কাঁদিতে কাঁদিতে তাড়িত হয়েছেন, কত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন। ঐ একেশ্বরের পূজা করতে যাইয়া কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন—একটু উপাসনা করিবেন, ভগবানের চরণে বসিবেন, তারও স্থান পান নাই। অনেকে যে উপনিষদের গৌরব করা হয়, সেই উপনিষদপ্রতিপাদ্য সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের পূজা করতে যাইয়া তাঁহারা লাঞ্ছিত হইয়াছেন! এখনও দেখ্‌ছি এই ব্রহ্মপূজা হিন্দুধর্ম্মবিরোধী বলিয়া লোকে প্রচার করিতেছে। আর ঐ লোকশ্রেয়ঃ সাধন, পাপ কুসংস্কার দূর, নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, জাতিভেদ দূর এবং রাজনীতিক আন্দোলন করতে যাইয়াও কত নির্য্যাতন কত অপমান তাঁহাদিগকে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার।" কেবল ধর্ম্মক্ষেত্রে নয়, সমাজে, পরিবারে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে সকল জাতীয় নর নারীর সমান অধিকার। ব্রহ্ম সকলের মধ্যে বিরাজিত, সকলেই মানুষ, সকলের মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলিতে হবে, মানুষের অধিকার জাতি বর্ণ, পুরুষ স্ত্রী নির্ব্বিশেষে সকলকে দিতে হবে। ব্রাহ্মণ শূদ্র, শ্বেত কৃষ্ণ, আর্য্য অনার্য্য, পুরুষ স্ত্রী ভেদ রহিত করিয়া ঈশ্বরের আদেশে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্র ঘোষণা করিতে হইবে। এই উদার ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করতে যাইয়া তাঁহারা দেশবাসীর নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছেন। সুখের বিষয়, এই আদর্শের কতকটা দেশ গ্রহণ করিয়াছে। নারী জাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, অস্পৃশ্যতা নিবারণ প্রভৃতি কতক পরিমাণে প্রাচীন সমাজ আবশ্যক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। লোকের দুঃখ দৈন্য অশিক্ষা কুশিক্ষা নিবারণের জন্যও চারিদিকে চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এখনও তাদের দৃষ্টির দিক (angle of vision) পরিবর্ত্তিত হয় নাই। দেশের উন্নতির জন্য, রাজনীতিক কল্যাণের জন্য তাঁহারা কতকটা সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য দিক দিয়া দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ সকলের মধ্যে ব্রহ্ম বিদ্যমান বলিয়া নর নারী সাধারণের সমান অধিকার ঘোষণা করেন। এতদিন যে তাহাদের অধিকার হইতে নারী জাতিকে, পতিতকে, অস্পৃশ্য লোককে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে তাতে ঘোরতর অপরাধ হইয়াছে—সেই অপ-রাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সেই অপরাধে আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। আজ ঈশ্বরে দৃষ্টি রাখিয়া এই প্রশ্নটি দেখিলে সব জাতীয় সমস্যার সমাধান হবে—হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ, নারীজাতির উন্নতি, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, রাজনীতিক স্বাধীনতা প্রভৃতি সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। এই গুরুতর কার্য্য ব্রাহ্মসমাজের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। যে সকল ধর্ম্মবীর ব্যক্তি এই মহাসাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে পরপারে গিয়াছেন, যাঁহারা এখনও এ পারে আছেন তাঁহারাও বৃদ্ধ, ভগ্নস্বাস্থ্য,—কেহ চোক্ষে দেখেন না, কেহ চলিতে পারেন না, এই অবস্থায় আছেন। এঁদের কাজের ভার কে গ্রহণ করিবে? বাণী আসিয়াছে "সাজ সত্যের সংগ্রামে"—ঊর্দ্ধ হইতে বাণী আসিতেছে—"হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন"—এ বাণী, এ ডাক কে শুনিবে? ব্রাহ্মসমাজের তরুণ তরুণীগণ, ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ আশা তোমরা, তোমরা কি সেই বাণী শুনিতেছ—তোমাদের প্রাণে কি সাড়া আসিতেছে, তোমাদের হৃদয়তন্ত্রী কি বাজিয়া উঠিয়াছে? তোমরা কি এই সত্যের নিশান দৃঢ়হস্তে গ্রহণ ক'রে সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে প্রস্তুত হইয়াছ?

যদি ডাক শুনে ভাই এসেছ রে,
তবে ফিরে আর যেও না রে,
পরব্রহ্ম তোমার আছেন সাথে
আর ভয় নাই।

যদি প্রাণে সাড়া পেয়ে থাক, যদি আলোক স্পষ্ট ক'রে দেখে থাক, যদি ঊর্দ্ধ হইতে বাণী শু'নে থাক, তবে পরব্রহ্ম সহায় আছেন, তিনি সেনাপতি হ'য়ে আছেন—এই জেনে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। প্রশ্নটি তোমাদের মানসপটে আবার অঙ্কিত করতে চেষ্টা কর। প্রশ্ন এ নয়, এক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম

প্রতিষ্ঠা হবে, না, আর এক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা হবে। প্রশ্নটি এই—পুরোহিতের সাহায্যে কল্পিত দেবদেবীর ফুল ফল নৈবেদ্য পশুবলিদ্বারা পূজা হবে, না, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দ-রূপমমৃতম্ যিনি, প্রেম ভক্তি দ্বারা সাধক সাক্ষাৎভাবে তাঁর পূজা করিবেন। প্রশ্নটি এই, নারী জাতিও যে মানুষ, তাঁরও ভিতরে ব্রহ্ম আছেন, শিক্ষা স্বাধীনতা ধর্ম্ম সকল বিষয়ে তিনিও পুরুষের সমান, ইহাই স্বীকৃত হবে, তাঁর মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তাঁর গৌরব রক্ষা করিতে হইবে, এই আদর্শ দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে, না, নারীদের জ্ঞানে স্বাধীনতায় বঞ্চিত রাখিয়া পুরুষের সুখ সুবিধা বিধানের জন্যই তাঁরা আছেন, এই মত প্রতিষ্ঠিত থাক্‌বে। প্রশ্ন এই, এই যে কোটী কোটী লোক অসহায় হইয়া, হীন হইয়া রহিয়াছে—শিক্ষা নাই, উন্নতি নাই, রাস্তায় চলিবার, দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই—তাহারা সেই অবস্থায় থাকিবে, না, তাহাদিগকে ব্রহ্মসন্তান বলিয়া গ্রহণ করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া, তাহাদের সকল অধিকার প্রদান করিতে হইবে, মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলিতে হবে, পূর্ব্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ভাই ব'লে তাহাদের আলিঙ্গন কর্‌তে হবে। প্রশ্ন এই, হাঁচি টিকটিকী মঘা অশ্লেষা, এই সকল ও অন্য রূপ কুসংস্কার দূর্ণীত ধর্ম্মের নামে দেশে প্রবর্ত্তিত থাকিবে, না, তাহা দূরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ মত ও সংস্কার ও অনুষ্ঠান-সকল প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রশ্ন এই, মানুষ সত্য প্রেম পবিত্রতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের কার্য্যে, স্বাধীনতার সংগ্রামে অগ্রসর হবে, না, অসত্য পথ পাপের পথ অবলম্বন করিয়া নরকের দ্বার উন্মুক্ত কর্‌বে। ব্রাহ্মসমাজের তরুণ তরুণীগণ, তোমাদের কর্ত্তব্য বুঝিয়া লও—এবং ঈশ্বরের ডাক শুনিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হও।

তোমাদের একটা কথা বলি—এই যে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র, এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ বাণী প্রচার করা, ইহার জন্য বিদ্যা, বুদ্ধি, পরামর্শ আলোচনার প্রয়োজন আছে; কিন্তু তাহাতেই কাজ সম্পন্ন হয় না। ত্যাগ ব্যতীত কোনও কাজ কোনও দিন সম্পন্ন হয় নাই। তাইত ঋষি বলিয়াছেন—ন ধনেন, ন প্রজয়া, ন ইজ্যায়া, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ—ধন দ্বারা নহে, যাগ যজ্ঞ বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। বিদ্যার প্রয়োজন, বুদ্ধির প্রয়োজন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন ত্যাগের। এই ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই পূর্ব্বের ব্রাহ্মগণ, অল্প সংখ্যক হইয়াও, ধনে মানে পদে নগণ্য হইয়াও, দেশে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা 'নাই'ক অন্ন গৃহবাস, ছিন্ন কন্থা অঙ্গবাস' হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ আদর্শ আপনাদের জীবনে দেশে ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রভাবে দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল; দেশ তখন সত্যের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিল। ফাঁক দিয়া মিথ্যা অবলম্বনে ক্ষণিক সুবিধা পাওয়া যায়; কিন্তু ব্রাহ্মগণ খাঁটি নিখুঁত সত্য পথ অবলম্বন করিয়া ত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দেখাইলেন, এই যে খাঁটি পথ, এই যে শ্রেয়ের পথ, ইহাতেই দেশের কল্যাণ, মানবের কল্যাণ। ফাঁকি দিয়া ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা চলে না; নিজের যোল আনা স্বার্থ বজায় রাখিয়া আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় না। আজ চারিদিকে সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই ত ত্যাগের আবির্ভাব দেখিতেছি। আমাদের চক্ষের সম্মুখে, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে, কত কাজে, দেশের জন্য, তাদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য, কত পণ্ডিত লোক, কত উচ্চ পদের লোক, সব ত্যাগ ক'রে ফকির সাজিলেন; দীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া লোক-শ্রেয়ঃ সাধনে জীবন উৎসর্গ করিলেন। আমাদের চক্ষের সম্মুখে এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত কি দেখিতেছি না? আমরা যে এই মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিব, ইহার জন্য কি মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি? আমরা কি বলিব ঐ রাজনৈতিক দলে ত্যাগী লোকের প্রয়োজন, ঐ শিক্ষা ক্ষেত্রে, ঐ দেশসেবায়, ঐ নানা প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ত্যাগের প্রয়োজন আর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারে ত্যাগের প্রয়োজন নাই? আমরা কি কেবল সভ্যতার পশ্চাতেই ছুটিব, মোটর গাড়ী করিব, দোতলা তেতলা বাড়ী করিব, ব্যাঙ্কে টাকা রাখিব, আর সুখশয্যায় শয়ন করিয়া বলিব, 'আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ খুব উচ্চ, দেশবাসিগণ, তোমরা ইহা গ্রহণ কর'? আমরা যদি আমাদের আদর্শের মূল্য না বুঝি, আমরা যদি ইহার জন্য ত্যাগস্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত না হই, তবে লোকের কাছে এই আদর্শ উপস্থিত কর্‌ব কিরূপে? এই যে বর্ত্তমানে সিটিকলেজের গোলমাল—অনেকে এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধ লেগেছেন, তাহাদের সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার প্রবৃত্তি নাই। আমি আমাদিগকে বলি, এই প্রতি-ষ্ঠানটি রক্ষা করা যদি আমরা প্রয়োজন বোধ করি, এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সহায় ব'লে মনে করি, তবে ইহাকে রক্ষার জন্য আমরা কি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি? কলেজটিতে যদি ছাত্রসংখ্যা আশানুরূপে না হয়, তবে অর্থকষ্ট হইবে। আমরা কি শিক্ষক ও অর্থ প্রদান করিয়া কলেজটিকে রক্ষা করিতে পারি না? দুই লক্ষ তিন লক্ষ টাকা কি খুব বেশী? আমাদের মধ্যে কি শিক্ষক হবার উপযুক্ত লোক নাই? আমরা কি ইহার জন্য ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছি? আমরা কি অকাতরে অর্থ দিতে, বিনা বেতনে অথবা অল্প বেতনে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি? এক সময় কি অনেক শিক্ষক বিনা বেতনে এই সিটিকলেজে কাজ করেন নাই? অল্প বেতনে কত লোক কাজ করেছেন। আজ আমাদের ভয় কেন? ত্যাগ চাই, আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন চাই। কেবল পরামর্শ নয়, কেবল আলোচনা নয়, ত্যাগ ত্যাগ ত্যাগ, অর্থ আসুক, লোক আসুক। কেবল সিটিকলেজ কেন? আমাদের কত প্রতিষ্ঠান মৃতপ্রায় হ'য়ে আছে! দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবনে খাটিবার লোকের অভাব হয়, অর্থের অভাব হয়। কেন এরূপ হয়? তাই আজ বলি, তোমরা যে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছ, খুব আনন্দের কথা; কিন্তু তোমাদিগকে ত্যাগশীল হ'তে হবে, সভ্যতার মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিও না; গজ্জ সিংহের চালে আমাকে তোমাকেও চলিতে হবে, তাহা ভাবিও না; সভ্যতার পশ্চাতে যথেষ্ট আমরা ছুটেছি, যথেষ্ট তার শাস্তিও পেয়েছি; আর নয়, মুখ একটু ফিরাও, ঋষিবাক্য শোন—এই শ্রেয়ের পথ, ঐ প্রেয়ের পথ, এই নিবৃত্তির পথ, ঐ প্রবৃত্তির পথ, এই ত্যাগের পথ, ঐ বিলাসিতার পথ, এই আনন্দ-ময় জীবনের পথ, ঐ মৃত্যুময় জীবনের পথ। তুমি কোন্ পথে যাবে? হে ব্রাহ্মসমাজের তরুণ ও তরুণীগণ, তোমাদের আজ পথ বাছিয়া লইতে হইতেছে। পৃথিবী তোমাদিগকে ভোগৈশ্বর্য্য লইয়া, বিলাস বিভ্রম লইয়া, সভ্যতার চাকচিক্য লইয়া ডাকিতেছে; অপর দিকে স্বয়ং ভগবান্ তোমাদিগকে ত্যাগের পথে, দুঃখের পথে, বৈরাগ্যের পথে, সংযমের পথে, যাতে অমৃতত্ব লাভ হয় সেই পথে ডাকিতেছেন। তোমরা কোন্ পথে যাবে? যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা চাও, যদি নিজের ও দেশের কল্যাণ চাও, তবে তোমাকে ত্যাগের পথে চলিতে হইবে। কিন্তু ত্যাগ আসে কি প্রকারে? এই প্রলোভনময় সংসারে সুখের দিকেইত লোক ছুটিতেছে; প্রবৃত্তিরই ত অনুসরণ করিতেছে; ত্যাগের মন্ত্র ত কাণে পৌঁছায় না। প্রেম না থাকিলে ত্যাগ আসে না। যেখানে প্রেম সেখানে কষ্ট সহিবার ক্ষমতা, সেখানে স্বার্থত্যাগের ইচ্ছা। যাকে আমি ভালবাসি, তার জন্য কি সুখ না বিসর্জ্জন দিতে পারি? কি ক্লেশ না সহ্য করিতে পারি? প্রেমের জন্য মানুষ আনন্দে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পারে, ত্যাগ-স্বীকার কর্‌তে পারে। যে দেশকে ভাল বাসে, সে দেশের জন্য জীবন পাত কর্‌তে পারে, বিন্দু বিন্দু ক'রে শরীরের শোণিত দান করিতে পারে, চির দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করিতে পারে; আত্মবিলোপ করিয়া দেশের সেবা করিতে পারে। প্রেম

মানুষকে সহনশীল করে, ত্যাগী করে; প্রেম মানুষকে সংযম আনিয়া দেয়, প্রেম মানুষের প্রাণে দুঃখ বরণ ক'রে নিতে উৎসাহ জাগায়। আজ যদি ত্যাগের প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, এমন এক-দল লোকের প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, যারা আপনাদের মান অভিমান, সুখ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া নিজের সময়, শক্তি, অর্থ ধর্মের মুক্তিপ্রদ আদর্শ প্রতিষ্ঠাতে নিয়োগ করিতে প্রস্তুত, তবে তাহাদিগের প্রাণে আগে প্রেম জাগ্রত করতে হবে। ব্রাহ্ম-ধর্মের আদর্শের প্রতি প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জাগ্রত করতে হবে। প্রীতিসাধন না হ'লে প্রিয়কার্য্যসাধনের জন্য ত্যাগ আসে না। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ যে আপনার সুখ স্বার্থ ভুলে, সামান্য আহার বিহারে সন্তুষ্ট থেকে ব্রাহ্ম-সমাজের ও দেশের সেবায় নিযুক্ত হ'তে পেরেছিলেন, সেবা করতে যেয়ে কত দুঃখ ক্লেশ নির্য্যাতন অম্লান বদনে সহ্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার মূলমন্ত্র কোথায়? তার উৎস কোথায়? সে ঐ ব্রহ্মপ্রীতিসাধন; ব্রহ্মের চরণে বসা, তাঁর স্পর্শ পাইবার জন্য আকুল সাধনা, তাঁর নামকীর্ত্তন, তাঁর ধ্যান, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা। ব্যক্তিগতভাবে, নির্জ্জনে বিরলে একান্তে তাঁর চরণে বসা, তাঁর স্বরূপ ধ্যান, তাঁর নাম কীর্ত্তন। আর দশজন সমসাধকের সঙ্গে একত্রে সকলে তাঁর অর্চ্চনা বন্দনা। তোমরা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সেবাব্রতে ব্রতী হইতে চাও, তবে তোমাদিগকেও ব্রহ্ম-চরণে সজনে ও নির্জ্জনে বসিতে হইবে। কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য নয়, বিক্ষিপ্ত মনে নয়, স্থিরচিত্তে বসিতে হইবে। মন যদি না বসে, প্রাণে যদি ভাবের সঞ্চার না হয়, চিত্ত যদি বিক্ষিপ্ত হয়, তবুও বসিতে হবে

হরিসে লাগি রহয়ে ভাই
তেরা বনত বনত বনি যাই।

হরিনামে লেগে থাক—"রইলাম তোমার নামে প'ড়ে" ব'লে ঐ চরণে থাক, নাম করতে করতে প্রাণে তাঁর প্রেমের সরস বরষা এসে নামিবে।

গাহি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে
আশা করি, প্রাণ পণে
তোমার প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে,
ভরে দিবে তুমি তোমার অমৃতে
সেই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান।
সংসার যদি মন কেড়ে নেয়
জাগে না যখন প্রাণ
তখনও নাথ, প্রাণমি তোমায় গাহি ব'সে তব গান।

আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের ভিতরে জ্ঞানে চরিত্রে উন্নত এত তরুণ তরুণীদের দেখা যাইতেছে। অনেকের কর্ম্মে উৎসাহ আছে, অনেকের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে, অনেকের, দেশবাসীর নিকট প্রতিষ্ঠা আছে। তাহারা যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। আমরা তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইতেছি। কিন্তু একটা কথা বলি, এই দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা হ'তে একটা কথা বলি—এ ধর্ম্ম-সমাজের কাজ। এখানে বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন, এখানে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন, এখানে বিশুদ্ধ মতের প্রয়োজন, পরামর্শ আলোচনার প্রয়োজন, সুশৃঙ্খল কর্ম্মপ্রণালীর প্রয়োজন আছে; কিন্তু ইহার কোনও একটা কিম্বা সবগুলি থাকিলেই ধর্ম্মসমাজের কাজ হয় না। ধর্ম্মসমাজের কাজ করতে হ'লে ত্যাগ চাই, বৈরাগ্য চাই, ঈশ্বরনিষ্ঠা চাই, ঈশ্বরের প্রীতি সাধন চাই, তাঁর চরণে বসা চাই। পাপ অপরাধ কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইবার জন্য [illegible] ঈশ্বরের [illegible] চাই। [illegible]

হেতু। সেই আনন্দময়ের সঙ্গ লাভ ক'রে, তাঁর রসসাগরে ডুবে আনন্দ লাভ করতে হবে।

"স মোদান্ মোদনীয়ং হি লব্ধা"—সেই আনন্দময় দেবতাকে লাভ করে আনন্দী হওয়া যায়। সুতরাং আনন্দময় দেবতাকে প্রাণে পেলে আনন্দী হ'তে হবে, জগৎ আনন্দময় দেখতে হবে, জীবনের প্রতি ঘটনা আনন্দে আপ্লুত হবে, সকল সম্পর্কগুলি আনন্দে মধুর হ'য়ে উঠবে। কিন্তু আমোদই আনন্দ নয়। নেচে গেয়ে বেড়ানই আনন্দময়ের স্পর্শ অনুভব করা নয়। এই আনন্দময়কে পেতে হ'লে তপস্যা চাই। অনুতাপের অশ্রুজলে হৃদয়কে ধৌত করা চাই, বৈরাগ্যের পথ দিয়া চলা চাই। যাঁরা আনন্দময়কে পেয়েছেন, পরজীবনে দিন রাত্রি আনন্দে বিভোর হ'য়ে রয়েছেন, তাঁহারাও সাধনের প্রারম্ভে অনুতাপের ভিতর দিয়া গিয়াছেন। মহর্ষির জীবনে বিষাদকালিমা এসেছিল, ব্রহ্মানন্দের জীবনে, বিজয়কৃষ্ণের জীবনে, শিবনাথের জীবনে, নগেন্দ্রনাথের জীবনে অনুতাপের মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভূত হয়েছিল। তাঁদের বাণীতে, তাঁদের সঙ্গীতে তাহা প্রকাশ পায়। আনন্দের উপাসক রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন—

"হৃদয়-বেদনা বহিয়া প্রভু এসেছি তব দ্বারে"।

তিনিই লিখেছেন—

আমারেও কর মার্জ্জনা,
আমারেও দিতে হবে অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি ম্লান বেশে,
আমার হৃদয়ে কর আসন রচনা।
জানি আমি আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান,
আপনি ডুবেছি পাপে, পুড়িতেছি মনস্তাপে,
শুনগো আমার এই মরমবেদনা।

অনুতাপের অনলে দগ্ধ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁর চরণে উপস্থিত হইতে হইবে। প্রার্থনা দিয়ে জীবন আরম্ভ করতে হবে, ক্রমে প্রেম জাগিবে, ত্যাগ আসিবে, জগৎ ব্রহ্মের সত্তায় পূর্ণ দেখিবে, তাঁর সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিবে, তাঁর জন্য দুঃখ বরণ করিতে ইচ্ছা হইবে। তখনই প্রকৃত ভাবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর প্রিয়কার্য্য জ্ঞানে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবে। তাই আজ এই উৎসবের দিনে বলি,

যদি তাঁর ডাক শুনে এসে থাক, এই মন্দিরে তাঁর চরণে এসে থাক, ব্যাকুল চিত্তে ভক্তসঙ্গে, ব্যাকুলচিত্ত সাধকগনের সঙ্গে, প্রভুর চরণে আত্মনিবেদন করতে এসে থাক, এ শুভদিনে ঐ চরণেই বসে থাক, আর ফিরে যেও না, আর প্রেমের আহ্বানে ছুটে যেও না; তাঁর প্রীতিসাধনায় প্রবৃত্ত হও, তাঁর প্রেমে মগ্ন হও; চিত্ত শুদ্ধ কর, পবিত্র কর, অনুতাপের অশ্রুতে হৃদয় ধৌত কর, তাঁর নাম গান কর, তাঁর স্বরূপ ধ্যান কর, তাঁর চরণে আত্মনিবেদন কর, তবেই ত্যাগ আসিবে, আদর্শসাধনায় ত্যাগ আসিবে, তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধনে সেবা আসিবে, আত্ম-বিসর্জ্জনের, আত্মবিলোপের ইচ্ছা জাগ্রত হইবে; অক্লান্ত দেহ মনে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হইতে আনন্দ হবে। তবেই ব্রাহ্মসমা-জের মুখ উজ্জ্বল হবে দেশের কল্যাণ হবে। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—

অসত্য হইতে সত্যে জাগ্রত হও, অপ্রেম হইতে প্রেমে জাগ্রত হও, প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিতে জাগ্রত হও, মৃত্যু হইতে অমৃতে জাগ্রত হও, পাপ হইতে পুণ্যে জাগ্রত হও, জড়তা হইতে সেবাতে জাগ্রত হও। তপসা ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মে প্রীতি হইলেই তোমাদের কর্ম্ম সফল হবে, দেশের গতি পরিবর্ত্তিত হবে, অমৃতময় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এই পৃথিবী আনন্দময় হবে। তবে আবার বলি—

"সাজ সত্যের সংগ্রামে, সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে।"

প্রেরিত পত্র

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় ভাই বোন, আমরা সমবেত ভাবে প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব কলিকাতা নগরীতে সম্পন্ন করিয়া লাভবান হইয়াছি। এখন আমার নিবেদন, সেই তিথি—সেই ২রা জ্যৈষ্ঠ—আমরা ভুলিব না। আমাদের প্রত্যেক সমাজে, ঐ দিনে স্থানে স্থানে জন্মোৎসবের আয়োজন করিতে হইবে। স্থানীয় সমাজের জন্য বিশেষ প্রার্থনা সমবেতভাবে নিবেদন করিতে হইবে। কি ভাবে স্থানীয় সমাজের অভাব বিমোচন হয়, কোন কাজ কি ভাবে গ্রহণ করা বিশেষ আবশ্যক, তাহার আলোচনা প্রতি স্থানে করিতে হইবে এবং তদ্বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। তদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য পৃথকভাবে স্থানীয় উৎসবের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। বিশেষ উপাসনা প্রার্থনা মিলিত ভাবে এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য মিলিতকণ্ঠে সামাজিক প্রার্থনা সমাবেশ হইলে বড়ই ভাল হয়। যেখানে যেখানে সম্ভাবনা আছে—নগরসংকীর্ত্তনের সাহায্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুসংবাদ নগরে নগরে ঘোষণা করা প্রয়োজন। ইহাই মনে হইতেছে।

প্রণত: অশ্বিনীকুমার বসু

ব্রাহ্মসমাজ।

বর্ষশেষ ও নববর্ষোৎসব—পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসবের অব্যবহিত পরেই বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব উপস্থিত হওয়াতে পূর্ববর্ত্তী উৎসবের ভাবটিকে গ্রহণ করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইয়াছে। বিদেশাগত বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—

৩১শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল) শুক্রবার—সায়ংকালে "মানবের শ্রেষ্ঠ নিবেদন" বিষয়ে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল) শনিবার—প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে কীর্ত্তন ও উপাসনা। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২রা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল) রবিবার—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে জীবনে ভগবানের করুণার সাক্ষ্যদান করিবার জন্য যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই উপদেশরূপে পাঠ করেন। সায়ংকালে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

কৃতিত্ব—শ্রীযুক্ত হীরালাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হীরেন্দ্রনাথ ভারতীয় (ইম্পিরিয়াল) পুলিশ সার্ভিসের প্রতিযোগী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গলা দেশের উক্ত বিভাগে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই উপলক্ষে মাতা শ্রীমতী সরোজিনী সরকার নানা বিভাগে ১০০৲ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৩ই এপ্রিল রেঙ্গুন নগরীতে বাবু শিবপদ দাস ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

বিগত ১৬ই এপ্রিল লাহোর নগরীতে বরিশালের শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসুর দ্বিতীয় পুত্র সুশীলকুমার পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি প্রথম বিভাগে বাঙ্গলা ভাষাতে এম্ এ পাশ করিয়াছিলেন। সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মসমাজের কাজও কিছু কিছু করিতেছিলেন।

বিগত ২৪শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ শীলের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম জীবনী বর্ণনা ও প্রার্থনা এবং শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গাঙ্গুলী প্রার্থনা করেন। সায়ংকালেও কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইয়াছিল।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ১৬ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দেবের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া রমলা ও পরলোকগত মিঃ উপেন্দ্রমোহন দাসের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান সুরেশরঞ্জনের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৮ই বৈশাখ ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত শিরীষচন্দ্র মজুমদারের কন্যা কল্যাণীয়া শেফালী ও পরলোকগত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মহিমাপ্রকাশের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার ফণ্ডে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। এ দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুন।

উষাকীর্ত্তন—আগামী শতবার্ষিক উৎসবের জন্য প্রস্তুতি উদ্দেশ্যে প্রতি রবিবার প্রাতে সাড়ে পাঁচটার সময় কলিকাতার পথে পথে উষাকীর্ত্তন হইবে। ২৯শে এপ্রিল উষাকীর্ত্তনের দল গোলদীঘি হইতে মন্দিরে গিয়াছিলেন। ৬ই মে হেদুয়া হইতে মন্দির পর্য্যন্ত যাইবেন। আশা করি সকলে, বিশেষতঃ যাঁহারা গান করিতে পারেন তাঁহারা, কীর্ত্তনে যোগদান করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবের সময়ে নিম্নলিখিত রচনাগুলির সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখক লেখিকাদিগকে কতকগুলি মেডেল ও অন্যান্য উপহার দেওয়া হইবে।

১। ব্রাহ্মসমাজ ও রামমোহন রায়—(১২ বা তাহার নীচের বালক বালিকাদিগের জন্য)।

২। গত একশত বৎসরে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য—(স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণের জন্য)।

৩। ভারতের জাতীয় উন্নতি বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব—(কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণের জন্য)।

নিম্নলিখিত ভাষাগুলির মধ্যে যে কোন ভাষায় প্রবন্ধ গৃহীত হইবে:—

বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি, উর্দ্দু, মারহাট্টি, গুজরাটি, তেলুগু, তামিল, মালয়ালাম্, কানাড়ী, উড়িয়া এবং খাশি।

৩০শে জুন বা তাহার পূর্ব্বে নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

ষোল বৎসর বা তাহার নিম্ন বয়ঃক্রমের যে কোন বালক বালিকা ব্রাহ্মসমাজ সেণ্টিনারী ফণ্ডে —চাঁদা তুলিয়া বা নিজে অন্যূন একটাকা জমা দিবেন—ব্রাহ্মসমাজ সেণ্টিনারী কমিটি তাঁহাদিগকে রামমোহন রায়ের চিত্র অঙ্কিত একটি মেডেলিয়াম উপহার দিবেন।

৩১শে জুলাই বা তাহার পূর্ব্বে টাকা নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট পাঠাইতে হইবে।

২১০।৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহেমচন্দ্রসরকার।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২২শে বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত

৫১ম ভাগ। ১লা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

৩য় সংখ্যা। 15th May, 1928. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে চিরকল্যাণময় বিশ্ববিধাতা, আমাদের কল্যাণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তুমি নিয়ত তোমার অসীম স্নেহে তাহার ব্যবস্থা করিতেছ। তুমি যে আমাদিগকে তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়াছ, তাহাই ত তোমার অসংখ্য করুণাপ্রদানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। দুঃখের বিষয়, তোমাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিয়া, ভালবাসিয়া, অনুগত সন্তান ও দাস রূপে তোমার কার্য্য সাধন করিয়া, জীবনকে ধন্য করিবার যে উচ্চ অধিকার আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহার সম্যক্ মূল্য আমরা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা নানা ক্ষুদ্র বিষয়ে মত্ত থাকিয়া এই উচ্চ অধিকার ও দায়িত্বের কথা প্রায় ভুলিয়াই চলি। ইহাতে আমরা যে কত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি এবং তোমার এই প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেও কত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। ইহার জীবনের অর্দ্ধ শতাব্দী ত চলিয়া গেল। নূতন বৎসরে যাহাতে নূতন উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত ইহার সেবাতে নিযুক্ত হইয়া আমরা আমাদের জীবনকে সার্থক করিতে পারি, এক মাত্র তোমাকেই জীবনের প্রভু ও চালক করিয়া তোমার নির্দ্দেশ অনুসারে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হই, হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান কর। তুমি আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতা জান। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার উপযুক্ত দাস ও সন্তান করিয়া লও—আমাদের দ্বারা তোমার পবিত্র ধর্ম্মের গৌরবকে কোনও প্রকারে খর্ব্ব হইতে দিও না। তুমি আমাদের সকল বিরুদ্ধগমন রুদ্ধ করিয়া দেও—সমস্ত উদাসীনতা অবহেলা ও স্বেচ্ছাচারিতা দূর কর। তোমার ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেক জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

কাছে আছেন—তিনি সর্ব্বদা আমার কাছে আছেন, এক মুহূর্ত্তও ত তিনি সঙ্গ ছাড়া হন না। আমার চিন্তা কার্য্য ভাব, আমার গতিবিধি, সব স্নেহের সহিত তিনি দেখিতেছেন। এই কথাটি যখন অনুভব করি, তখন আমার প্রাণে কত বল আসে, আশা আসে, উৎসাহ আসে! কত সুখ ও আনন্দ জাগে! তিনি সঙ্গে আছেন, কাছে ব'সে সব দেখ্‌ছেন। তবে আর ত দোষ করতে পারি না, কুচিন্তা পোষণ করতে পারি না! যিনি আমার প্রভু, আমাকে যিনি এত ভালবাসেন, তাঁর সম্মুখে ব'সে অন্যায় কার্য্য করি কি রূপে? অন্যায় চিন্তা পোষণ করি কি রূপে? কেবল তা ত নয়—তিনি আমার দুঃখ বেদনা জানেন, আমি যে সংগ্রামে গলদঘর্ম্ম হচ্ছি, একবার উঠি আবার পড়ি, তাহা তিনি দেখেন; আমাকে "ভয় নাই" ব'লে উৎসাহ দেন। আমি কোন নির্জ্জন কক্ষে, কোন অজানা প্রদেশে ব'সে কাজ করি—আমার কোনও বন্ধু কাছে নাই, কেহ একটা উৎসাহ-বাক্য দিতেছে না—তখনও তিনি আমার কাছে আছেন। লোকচক্ষুর অগোচরে আমার যে শুভ কর্ম্ম, শুভ সঙ্কল্প তাহা তিনি দেখ্‌ছেন—কাছে থেকে দেখ্‌ছেন। তাঁর যে এই দেখা, তাঁর যে একটু উৎসাহবাক্য, একটু হাসি, তাহা আমাকে কত বল আশা ও আনন্দ দেয়! সকলে যখন নিন্দা করে, তখনও প্রিয়জনের একটু মৃদু হাসি, একটা উৎসাহবাক্য, কত আনন্দ ঢেলে দেয়! তিনি যে প্রিয়তর, প্রিয়তম! তাঁর হাসি ও উৎসাহবাক্য প্রাণে কত আশা বল আনন্দ জাগায়! তিনি সঙ্গে আছেন, কাছে আছেন, [illegible] দেখ্‌ছেন, এখানেই আমার ভরসা।

সত্যেন [illegible]—সত্য পথে চল, সত্য বাক্য বল, সত্য চিন্তা [illegible]মার সমগ্র জীবন সত্য হউক। কেবল সত্য কথা নয়, সত্য আচরণ, সত্য ব্যবহার, সত্য চিন্তা, সত্য

অনুসরণ চাই। সত্যস্বরূপের উপাসক তোমরা, সত্য দেবতা তোমাদের প্রাণে আছেন। জীবনে যখন সংগ্রাম আসে, তখন মন প্রলুব্ধ হয়, একটু সত্যপথ হ'তে বিচলিত হ'লে সুবিধা হয়! সাবধান, তখন যীশুর মত বল্‌বে, get thee behind me, Satan—সয়তান, স'রে যাও আমার সম্মুখ হ'তে। অসত্যের উপর জীবন গড়ে না—ব্যক্তিগত জীবন গড়ে না, জাতীয় জীবন গড়ে না। আজকাল তোমরা যাকে সত্য বল, তাহা সত্য নয়; উহা প্রবৃত্তির অনুসরণ। মনে একটা বাসনা জাগ্‌ল, তারই অনুসরণ কর্‌লাম আর সত্যের অনুসরণ করা হলো ভাবলাম! আমার মনে কোনও দ্রব্য লইবার ইচ্ছা হলো, তাই লইলাম,—মনে ভাবলাম সত্যের অনুসরণ কর্‌লাম। ইহা সত্যের অনুসরণ নয়। অন্যায় বাসনা, অন্যায় আকাঙ্ক্ষা, জাগ্রত হ'লে তাকে সংযত কর্‌তে হয়। সংযম জীবনগঠনের সহায়। সত্য যাহা, তাহা শাশ্বত, তাহা নিত্য, তাহা সত্যস্বরূপ হ'তে প্রসূত। তাহা অনাবিল। সেই চিরন্তন, নিত্য শাশ্বত, কল্যাণপ্রসূ সত্যের অনুসরণ কর্‌বে, নতুবা মৃত্যু। সত্যের অনুসরণে পুণ্যজীবন লাভ হয়, পুণ্যময়ের সংস্পর্শ ঘটে।

নীরব প্রতিবাদ—আমরা কত তর্ক করি, কলহ করি! হয়ত কোনও স্বার্থের জন্য নয়, কোনও বিষয় লইয়া নয়, কিন্তু সত্যের জন্য, নানা ভাবে তর্ক বিতর্ক হয়। অনেক সময় তর্ক করিতে করিতে আপনাকে ভুলে যাই—ক্রোধের সঞ্চার হয়—সময় সময় আরও দূরে যাই। আমরা মনে করি সৎসাহস দেখান হলো, অন্যায়ের প্রতিবাদ হলো। অন্যায় মত, অন্যায় কাজ, তার প্রতিবাদ করাই ত কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল তর্ক ও ঝগড়াতেই প্রতিবাদ হয় না। অনেক সময় তাতে উপকার না হ'য়ে অনিষ্টই হয়। তর্কে মানুষের জেদ জন্মে, মন বিকারপ্রাপ্ত হয়। তাতে অসত্যের সম্যক প্রতিবাদ হয় না। অনেক সময় নীরব থাকিলেই অন্যায়ের সম্যক্ প্রতিবাদ হয়। লোকে উৎসাহসহকারে একটা কথার আলোচনা করিতেছে, তুমি নীরবে ব'সে আছ—মুখে কথা নাই, একটু হাসি নাই, কোনও উৎসাহ দিতেছ না। তারা অস্বস্তি বোধ কর্‌বে—তোমার এই নীরব প্রতিবাদ শত তর্ক হ'তে শ্রেষ্ঠ। প্রিয়জন অন্যায় কাজ কচ্ছে, অন্যায় পথে চলেছে, তুমি ক্ষান্ত; তুমি নীরবে আছ—তুমি বিমর্ষ হয়েছ, তোমার মুখে কথা নাই, কিন্তু হাসিও নাই, আনন্দও নাই—সে বুঝিতেছে কি তীব্র প্রতিবাদ! অনেক সময়ে তর্ক ক'রে সভা গরম কর্‌তে হয় না, নীরবে প্রতিবাদ ক'রে যেতে হয়। মানুষ প্রকাশ্য প্রতিবাদ সইতে পারে, কিন্তু নীরব প্রতিবাদ সহ্য করা বড়ই কঠিন।

সম্পাদকীয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অসাধারণত্ব—আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একপঞ্চাশত্তম বৎসরে পদার্পণ করিবে। আশা করি, এই দিন স্মরণ করিয়া নানা স্থানে উৎসবাদি হইবে এবং নূতন বৎসর হইতে যাহাতে ইহা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার জন্য সকলে প্রার্থনা ও সংকল্পগ্রহণ করিবেন। এই সময়ে উহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়াই অনুমিত হয়। সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক সত্যের অনুসরণই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অসত্য ও কুসংস্কারাদির সহিত বিন্দুপরিমাণে সন্ধিস্থাপন করিতে গেলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়—উহার বিনাশসাধনেরই আয়োজন করা হয়। সুতরাং কোথাও এরূপ ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটু ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিলে বিশ্বস্ত সেবকগণ যে উহার প্রাণরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন এবং সেই প্রাণঘাতী সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই। এই স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই যে ব্রাহ্মসমাজে বিভিন্ন দলের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই—ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস তাহা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। তিন শাখার পার্থক্য বা বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমরা আজ কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। ইহারা তিনটিই একটি বৃক্ষের শাখা, না, ইহাদের কোনটি বৃক্ষ আর অপর দুইটি শুধু শাখা, অথবা কোনটি পূর্ণ পরিণতি, সে বিচারেও প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। আজকাল সকল ধর্ম্মেরই গতি উদার বিশ্বজনীনতা ও সার্ব্বভৌমিকতার দিকে—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসমূহও এই দিকে বহুদূর অগ্রসর হইতেছে। কার্য্যগত জীবনে ইহা কে কতটা রক্ষা করিতেছে, সে বিচারেও প্রবৃত্ত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহা প্রত্যেকে নিজে নিজে বিচার করিয়া দেখিবেন। সকলেই সে আদর্শকে পূর্ণ ভাবে আপনাদের মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছেন দেখিলে আমরা বিশেষ সুখীই হইব—কাহাকেও কোনও প্রকারে খর্ব্ব করিবার ইচ্ছা আমাদের মোটেই নাই, আর তাহাতে কোনও লাভও নাই। জিনিষ যদি এক হয়, তবে যিনি যে নাম ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হন, তিনি তাহাই করিতে পারেন। অপরে আমাদের নাম গ্রহণ না করাতে কিছুমাত্র ক্ষোভের কারণ নাই। তবে আমাদের যে একটা বিশেষত্ব আছে এবং নামের সঙ্গে তাঁহার যে একটা সম্বন্ধ আছে, সে আলোচনার একটু প্রয়োজন রহিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নাম শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বেশ ভালই হইয়াছে, আদি ব্রাহ্মসমাজ কালে আবদ্ধ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থানে আবদ্ধ, আর তোমরা দেশকালের অতীত হইয়া সর্ব্বসাধারণের হইয়াছ।" তিনি কি ভাবে এই কথা বলিয়াছিলেন এবং ইহার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে, সে বিচারেও আমরা প্রবৃত্ত হইব না। অপরের সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—অপরের সম্বন্ধে এখানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যতীত অন্য কোনও ভিত্তি যদি না থাকে, তবে আমরা বিন্দুপরিমাণে দুঃখিত না হইয়া সুখীই হইব। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামের মধ্য দিয়া উহার যে বিশালত্ব ও বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, শুধু তাহার দিকেই আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কোনও প্রকার প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়া আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ইহাতে কার্য্যতঃ যে ভাবে সকলের সমান স্বামিত্ব ও অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, আর কোথাও তাহা হয় নাই। এক সময় ছিল যখন ব্যক্তিগত ভাবেও ধর্ম্মবিষয়ে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। সুখের বিষয়, সকল সম্প্রদায় হইতেই দিন দিন সেই ভ্রান্ত ভাব বিদূরিত হইতেছে। বিশ্ববিধাতা যে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ অধিকার দিয়াছেন, অপর কাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, এ কথা আর আজ কাল কোনও সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলেন না। ভগবান সকলের মধ্যেই আছেন, সকলেই তাঁহাকে লাভ করিবার অধিকারী, সাধারণতঃ এই কথা সর্ব্বত্রই জ্ঞানিগণ স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্মসমাজের কার্য্যব্যবস্থায়ও সকলের সমান অধিকার আছে, এরূপ কথা আর কোথাও স্বীকৃত হইতে দেখা যায় না—কার্য্যতঃ ত কুত্রাপি অবলম্বিত হয়ই নাই। এ বিষয়ে 'সাধারণ' ব্রাহ্মসমাজ যে একেবারে 'অসাধারণ' তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আর কোনও ধর্ম্মসমাজই উহার পরিচালনে এই ভাবে সকলকে সমান অধিকার দিতে প্রস্তুত নহে—তাহা নিতান্ত বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে। ইহাতে কোনও প্রকার বিপদের আশঙ্কা আছে কি না, আমরা এ স্থলে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না—আশঙ্কার কিছুমাত্র কারণ নাই, এরূপ কথাও বলিতে চাহি না। যদি কোনও আশঙ্কা থাকে, তবে তাহা নিতান্তই ক্ষণিক, এবং স্থায়ী কল্যাণের তুলনায় উপেক্ষণীয় বলিয়াই আমরা মনে করি। সকলে হয়ত সে কথা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু এই কথা নিঃসন্দিগ্ধরূপেই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহাতে মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবে, তাহার দেবত্বে ও মহত্ত্বে এবং বিশ্ববিধাতার অমোঘ মঙ্গল নিয়মে, যে প্রকার গভীর বিশ্বাস ও নির্ভর সূচিত হইতেছে, আর কোথাও তাহা দেখা যায় না। মানুষ যে অনেক সময় তাহার ক্ষমতা ও অধিকারের, তাহার স্বাধীনতার, অপব্যবহার করে, তাহা কে না জানে? ইহার দ্বারা যে অনেক সময় অনেক অনিষ্টও সাধিত হয়, তাহাও আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। তথাপি ইহা যে তাহার স্বভাব নহে, এই বিকৃতি যে চির দিন থাকিবে না, ইহার সংশোধনের ব্যবস্থা যে তাহার ভিতরে ও বিশ্ববিধাতার জগৎব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে, তাহার অসংখ্য পরিচয়ও আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই হেতু শত আশঙ্কা সত্ত্বেও বিশ্ববিধাতা তাহাকে স্বাধীনতা হইতে, সেই ক্ষমতা ও অধিকার হইতে, কখনও বঞ্চিত করেন না। পরিণামে তাঁহারই জয় হইবে জানিয়া ধৈর্য্যের সহিত তিনি তাহার পরিবর্ত্তনের জন্যই প্রতীক্ষা করেন। আমরাও এই বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, প্রত্যেক মানবের সকল প্রকার বিকৃতি, শক্তি ও স্বাধীনতার অপব্যবহার,—তাহা অজ্ঞানতা বা দুর্ব্বলতা প্রসূতই হউক আর স্বেচ্ছাকৃতই হউক—সকল বিপদ-আপদ, যথা সময়ে নিরাকৃত হইবেই, তাহা হইতে পরিণামে নিশ্চয়ই কল্যাণ প্রসূত হইবে; সত্য ও ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী, অসত্য পাপ অধর্ম্মের রাজত্ব কখনও এখানে চির প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। মতে এই তত্ত্ব স্বীকার করিলেও অপর কোনও [illegible] পর্য্যন্ত ইহার উপর কার্য্যব্যবস্থা স্থাপিত করেন নাই। এখানেই 'সাধারণ' ব্রাহ্মসমাজের 'অসাধারণত্ব'। এ কথা বিস্তারিত ভাবে প্রমাণ করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু আমরা যদি শুধু এই অসাধারণত্বের গৌরব লইয়া সন্তুষ্ট থাকি, তবে তাহাতে আমাদেরও কল্যাণ নাই, সমাজেরও কল্যাণ নাই। অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব ব্যতীত অধিকারের কোনও ভিত্তিই নাই। কর্ত্তব্যপালনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া আপনার উন্নতি ও মহত্ত্ব সাধন, জীবনের সার্থকতাসম্পাদন অপেক্ষা উচ্চতর অধিকারও কিছু নাই। সুতরাং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে যে অসাধারণ অধিকার দিয়াছেন, তাহাকে যদি আমরা কর্ত্তৃত্বস্পৃহা চরিতার্থ করিবার একটা সুযোগ মাত্র মনে করি, তাহা হইলে আমরা আমাদের উচ্চ অধিকারের অপব্যবহারই করিব এবং তাহার ফলে আপনার ও সমাজের শুধু অকল্যাণই সাধিত হইবে। সমাজের সেবা করিয়া যে আপনার মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ববিকাশের ও সমাজের কল্যাণসাধনেরই অধিকার আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সমাজের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত—জীবনবিধাতার ইচ্ছানুসরণকেই একমাত্র লক্ষ্য স্থানে রাখিয়া—সম্পাদন না করিলে যে নিজেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট সাধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও অকল্যাণ করা হয়, ইহাই আমাদিগকে বিশেষ ভাবে সকল কার্য্যের মধ্যে স্মরণে রাখিতে হইবে। এ কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথা ভুলিয়া চলিলে আমাদের দ্বারা শুধু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরই অগৌরব সাধিত হইবে না, আমরা মনুষ্য নামেরও অযোগ্য বিবেচিত হইব। কেন না, কোনও প্রকার প্রভুত্বে বা কর্ত্তৃত্বে নয়, উচ্চ পদে মানেও নয়, একমাত্র জীবন-বিধাতার নির্দ্দেশ মানিয়া জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কর্ত্তব্য-পালনে আপনার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়োগেই, মানবজীবনের সার্থকতা—তাহা না করিলে কেহ মনুষ্য নামেরই বাচ্য হইতে পারে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নূতন বর্ষে আমাদিগের প্রত্যেককে বিশেষ ভাবে এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। তাহা হইলেই ইহার বিশেষত্ব বা 'অসাধারণত্ব' সুরক্ষিত হইবে, আমাদেরও সকলের কল্যাণ সাধিত হইবে। করুণাময় পিতা আমাদের সকলকে সে বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান করুন। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

ভগবৎ প্রসঙ্গই প্রধান কাজ

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।

(২৪এ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩, বৃহস্পতিবার সাধনাশ্রমে শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত।)

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

ধর্ম্মসমাজের পক্ষে ধর্ম্মভাবই প্রধান চালক, উহাই মিলনের ভূমি। সেই সমাজই প্রকৃত ধর্ম্মসমাজ, যাহার লোকদিগের শক্তি ধর্ম্মভাবে, ধর্ম্মচিন্তাই যাহাদের প্রধান কাজ, যাহাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হ'লে ধর্ম্মজীবনের কথাই চলে। তাই গীতায় ভগবানের মুখে কথিত হইয়াছে, তাহাদের চিত্ত আমাতে নিবদ্ধ, তাহারা পরস্পরকে আমার কথাই বলে। তাহারা ঈশ্বরের গুণগানে আনন্দিত হয়, তাঁহার স্বরূপবর্ণনে তৃপ্তি লাভ করে। ইহাই তাহাদের প্রধান কাজ। তাহারা জ্ঞানালোচনা করে, আমোদ করে, সংসারের কাজ করে, সবই করে; কিন্তু প্রধান বিষয় ঐ ধর্ম; তাহাদের সকলই ধর্ম্মের অধীন, ধর্ম্মানুমোদিত। তাহাদের প্রধান চিন্তা ধর্ম্ম, ঈশ্বরের গুণ ও স্বরূপ। ইহাই ধর্ম্মমণ্ডলীর আদর্শ। যখন ধর্ম্মভাব আমাদের চালক ও নেতা হবে, তখনই এই মণ্ডলী ধর্ম্মমণ্ডলীতে পরিণত হইবে। যখন দেখা হ'লেই, পরনিন্দার পরিবর্ত্তে, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হবে, তখনই —তখনই প্রকৃত ধর্ম্মমণ্ডলী হবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৭ই এপ্রিল (২৫শে চৈত্র) শনিবার—

মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন। অনন্তর ১৲ ঘটিকায় যুবকদিগের আলোচনা সভা। "ব্রাহ্মসমাজের সমস্যাসকল ও যুবকদিগের কর্ত্তব্য" বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সভাপতির কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত জি ওয়াই চিৎনীশ, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রকাশ লাল, শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন চাটার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত বালাস এবং সভাপতি নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করেন।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বালকবালিকাসম্মিলন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর প্রার্থনা করেন। "ব্রাহ্মসমাজ এদেশের জন্য কি করিয়াছেন" এবং "স্বর্গগত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন কথা" বিষয়ে যে কয়খানা রচনা পাওয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে কলিকাতার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র, মিঃ পি এন দত্তের কন্যা ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাসের পুত্র এবং চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাসের পুত্র, কাঁথির পরলোকগত তারাচাঁদ রায়ের পুত্র ও গিরিডির শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন খাস্তগীরের কন্যা যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার প্রথম প্রবন্ধটি এখানে পঠিত হয়। তাহাদিগের প্রথম ও দ্বিতীয়কে রৌপ্য পদক ও তৃতীয়কে পুস্তক পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের দৌহিত্রী (শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর কন্যা) "উৎসর্গ" নামক কবিতাটি আবৃত্তি করেন। এই জন্য তাহাকে একটি রৌপ্য পদক প্রদত্ত হয়। পরে বালকবালিকাদিগকে জলযোগ করান হয়। বৃষ্টি হওয়াতে কার্য্যের অনেকটা অসুবিধা হইয়াছিল। শ্রীমতী সুশীলা ঘোষাল, শ্রীমতী অবন্তী ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী সান্ত্বনা রায়, শ্রীমতী সুষমা সেন, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসু রৌপ্যপদকগুলি এবং শ্রীমতী সুবালা হালদার ও শ্রীমতী সুদেবী মুখোপাধ্যায় পুস্তকগুলি দান করেন।

সায়ংকালে সংকীর্ত্তনান্তে "ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য" বিষয়ে বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জি ওয়াই চিৎনীশ ও শ্রীযুক্ত ই সুব্বাকৃষ্ণায় বক্তৃতা করেন।

৮ই এপ্রিল (২৬শে চৈত্র) রবিবার—

কীর্ত্তনান্তে উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি "ব্রহ্ম প্রকাশের" জন্য প্রার্থনা করিয়া এবং কি প্রকারে সাধুভক্তদের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপ্রকাশের সহায়তা হয় তাহার উল্লেখ করিয়া উদ্বোধন করেন। উপাসনান্তে কোনও উপদেশ প্রদান করেন না। বলা বাহুল্য যে, উপাসনা গভীর ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। তৎপর হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এবং মুসলমান সমাজের বাহাই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকের একজন বংশধর প্রার্থনা করেন এবং ইউনিটেরীয়ান সম্প্রদায়ের মিঃ বালাস কিছু বলেন। অনন্তর আচার্য্য প্রার্থনা করেন। শিখসম্প্রদায়ের কয়েকজন "ভজন" গান করেন। সংকীর্ত্তনান্তে এ বেলার কার্য্য শেষ হয়।

অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় মহিলাদের আলোচনা সভা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং "ভারত মহিলা সমিতির পুনর্গঠন" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীমতী প্রতিভা দত্ত একটি সঙ্গীত করিলে পর সভাপতি প্রার্থনা করেন এবং নারীশক্তি সমাজের কার্য্যে উৎসর্গীকৃত না হইলে সমাজে যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যাইবে না, নারী শক্তি যে পরিবারে ও সমাজে ধর্ম্মকে রক্ষা করে, নারীর ভক্তি প্রেম ও সেবা যে জনসমাজকে পুণ্যময় করিয়া তোলে, এই ভাব তিনি তাঁহার সরস ও উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষাতে ব্যক্ত করেন। অনন্তর শ্রীমতী কামিনী রায়, শ্রীমতী সুশীলা বসু, শ্রীমতী সুবালা হালদার, পাটনার শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী রায়, শিলং এর শ্রীমতী সারদামঞ্জরী দত্ত, এবং শ্রীমতী অবন্তী দেবী ভারত মহিলা সমিতির ও নারীগণের কার্য্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করেন। ইহার পর যাঁহারা ভারত মহিলা সমিতি সভ্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করা হয়। অতঃ শ্রীমতী কামিনী রায় ভারত মহিলা সমিতির সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন।

অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় হেদুয়া হইতে ৪ দলে বিভক্ত হইয়া বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বহির্গত হয়। সকলে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ প্রার্থনা করেন। ৪ দলের জন্য ৪ প্রকার সংকীর্ত্তন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরস্পর হইতে কিছু দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহারা কীর্ত্তন করেন। যুবক ও বালকদিগের দল সর্ব্বাগ্রে গমন করে। দ্বিতীয়তঃ রাজকুমার ঘোষ প্রভৃতির নেতৃত্বাধীনে প্রধান দল। তৃতীয়তঃ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরীর

নেতৃত্বাধীনে বরাহনগর শ্রমজীবীদের এক দল এবং চতুর্থতঃ শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দের নেতৃত্বাধীনে বরাহনগর শ্রমজীবীদিগের অপর আর এক দল গমন করেন। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্পার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে উপস্থিত হইলে, কিছু সময় পর পর পৃথক ভাবে ও শেষে সকলে সম্মিলিত ভাবে কীর্ত্তন করেন। অনন্তর রাত্রিকালীন উপাসনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। আশা ও বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া মধুর উপাসনা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন :—

ব্রাহ্মসমাজ যদি প্রতিষ্ঠিত না হইত—একবার এ কথা মনেও ভাবিতে পারি না—ব্রাহ্মসমাজ যদি প্রতিষ্ঠিত না হইত, তবে নরনারী কেহ কি ব্রহ্মকে জানিতে পারিত? এ দেশের প্রাচীন কথা, পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করি—কি দুর্গতি ছিল—তবে ব্রহ্মকে কেহ জানিতে পারিত না। যদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত না হইত, তবে ব্রহ্মোপাসনা আজ দেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইত না, তবে যে সকল শাস্ত্র ব্রহ্মের কথা বলে, ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করে, সে সকল শাস্ত্র শতবৎসর মধ্যেও প্রকাশিত হইত না। ব্রাহ্মসমাজ কি আশ্চর্য্য সংবাদই জগতের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন—ব্রহ্ম আছেন, ব্রহ্মোপাসনা করিলে মানবজীবন সার্থক হইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত না হইলে কোথায় থাকিত গীতা, কোথায় থাকিত উপনিষদ্। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, তাই দেশ কৃতার্থ হইল। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত না হইলে এই একশত বৎসরেও শাস্ত্র প্রকাশের সম্ভাবনা থাকিত না। সেজন্য ব্রাহ্মসমাজের নিকট দেশ কত কৃতজ্ঞ, আর আমরা কত কৃতজ্ঞ! আমরা দেখিয়াছি, উপাসনা করিতে করিতে শোক দূর হইয়া যায়, মৃত পুত্রকে প্রাণে পাওয়া যায়। জগতের মধ্যে এই কি পরম কৃপার সমাচার প্রকাশিত হইয়াছে! মৃত্যু চলিয়া গিয়াছে। মৃত্যু নাই, মৃত্যুভয় নাই। এ পার ও পার নদীর এ কূল ও কূল, মধ্যে ব্রহ্ম সেতুস্বরূপ হইয়া মানবকে উদ্ধার করিতেছেন। এ কি সহজ কথা? মানুষ আসক্তি হইতে মুক্ত হইবার জন্য কত জ্ঞানালোচনা করে! সব ব্যর্থ হইয়া যায়। উপাসনায় নিমগ্ন হইলে সব বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। তিনি প্রাণময় জীবন্ত জাগ্রত পুরুষ। তিনি অপার করুণা লইয়া সকলের নিকট বর্ত্তমান। তাঁহার নিকট উপস্থিত না হইলে আসক্তি হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় না। তিনি পুরুষ—মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ—তিনি ব্যক্তি। তাই পাপীর পরিত্রাণ সম্ভবপর হইল। কত পাপীর পরিত্রাণের কথা আমরা শুনিয়াছি, দেখিয়াছি, আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। "গভীর পাপের কালি ঘুচিবার নয় বিনা তাঁরি কৃপাবারি জানিও নিশ্চয়।" তাঁহার কৃপা ভিন্ন পাপের গভীর কালিমা ঘুচিতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, নিজের বলে যত ধুইতে চাহিয়াছি তত কালিমা গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে, সকল কালি হইয়া গিয়াছে। আমার দ্বারা হইল না বলিয়া যখন তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, প্রার্থনা করিয়াছি "দয়াময়, পাপের বন্ধন ছিন্ন কর," তখন দেখি তিনি কৃপা করিয়া প্রাণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন আর বহুদিনের কালিমা চলিয়া গেল। এই ভাবে হাজার হাজার লোক পরিত্রাণ পাইয়াছে। কে উদ্ধার করে, এই পরিত্রাতা ব্যতীত? ব্রাহ্মসমাজ এই আশার বাণী প্রচার করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ না হইলে কে এই তত্ত্ব জানিত? মানুষ ব্রহ্মকে ভুলিয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশ করিল, ঘরে ঘরে তিনি বর্ত্তমান, তিনি সর্ব্বত্র, তিনি সকলের গতি করেন। এই কৃপা না হইলে উপায় ছিল না। আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম নাম লুপ্ত হইয়াছিল। এখন সকলে সেই নাম করিতে পারিয়া ধন্য হইতেছে।

আবার দেখিতেছি কি ছিল জ্ঞান? ভাল গ্রন্থ ছিল না, অনেকেই লেখাপড়া জানিত না। উচ্চ জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল, মানুষের চিত্ত কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা লুপ্ত হইয়াছিল। ভূমণ্ডলের সকল জ্ঞান আনিতে হইবে, কে প্রচার করিল? ব্রাহ্মসমাজই তাহা প্রচার করিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ আর কি করিয়াছেন? মানবের অন্তরে বিবেক আছে, সেই বিবেক লুপ্ত হইয়াছিল। লোকাচার দেশাচার মানিয়া চলাতেই ধর্ম্ম ছিল। শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধ চৈতন্য নানক যে বিবেকের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা লুপ্ত হইয়াছিল। মানবের অন্তরে যে ধর্ম্ম বর্ত্তমান, তাহার আদেশেই সকলে বড় হইয়াছে; কিন্তু সে ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ বলিল, হৃদয়স্থিত সেই দেবতার বাণী শুন। আর কি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল! লোকে কেবল চিরন্তন প্রথার অনুসরণ করিতেছিল। কে বলিল সত্যকে অন্বেষণ কর, সত্যকে পাইবার চেষ্টা কর, তিনি সত্যের মূল? সত্যের আদেশ আসিল, আর সকল শৃঙ্খল ছিন্ন হইল, সকলে স্বাধীন হইল। ব্রাহ্মসমাজ স্বাধীনতার কথা বলিয়া এক যুগান্তর উপস্থিত করিল। বিবেকের শাসনে সমাজ পরিবর্ত্তিত হইল, রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত হইল।

মাদক দ্রব্যের ব্যবহার প্রবল হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ বলিলেন ইহা পাপ, তাই তাহা সকলে পরিত্যাগ করিল। লোকের মধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। চারিদিকে প্রচার হইল, ব্রাহ্মসমাজের লোকে মদ ত দূরের কথা, তামাক পর্য্যন্ত খায় না।

ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রী জাতির পরাধীনতা সব দূর করিয়া দিল। মানবের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না; উজ্জ্বল বিবেক ভগবানের বাণী প্রচার করিল—নারীর মধ্যেও ভগবান আছেন। তুমি কি বল? নারীর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই? ব্রাহ্মসমাজ না হইলে নারীগণের কি দশাই হইত! বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ রহিত এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইল। ব্রাহ্মসমাজ না হইলে কি হইত? একজনের শত স্ত্রী ছিল। এই পরিবর্ত্তন কি ব্রাহ্মসমাজ না হইলে সম্ভবপর হইত?

যে সঙ্গীতে মানবের চিত্তে ভগবানের অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা গুরুজনের সম্মুখে করিতে পারা যাইত না, স্ত্রীলোকেও করিতে পারিত না। সঙ্গীতের কি দুর্গতিই ছিল! তাহা উন্নত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ কি পরিবর্ত্তনই না সাধন করিয়াছে!

মানুষের দ্বারা মানুষ জন্মিতেছে, ভগবানের দাস গঠিত

হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ বলিতেছে "সংসার হবে তব ধাম, জীবনে ধ্বনিবে তব নাম।" সমস্ত সংসার ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে—চক্ষু বলিবে ব্রহ্ম এই, কর্ণ বলিবে ব্রহ্ম এই, সর্ব্বাঙ্গ বলিবে ব্রহ্ম এই, আত্মা বলিবে ব্রহ্ম এই। পরিবার পরিজন সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরের ধাম হইবে, জীবনে ধ্বনিবে সেই নাম। আমি ঘুমাইয়া থাকিব না। "তুমি হবে মোর প্রভু, দাস হ'য়ে র'ব পদে লাগি"। এই আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ, তুমি ধন্য, তুমি এমন কথা প্রচার করিয়াছ! তোমার সম্মুখে, আমি করযোড়ে বলি আর প্রতীক্ষা করি "তোমার কি আদেশ বল।" মানবের কণ্ঠ হইতে কি কথাই বাহির হইয়াছে! "আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই, পরে সুখী ক'রে সুখী হ'তে চাই।" মানবের প্রাণে কি মহৎ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছে! এই যে স্বর্গধাম!

একজন লোক বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিল। তাহার প্রাণ কেন মানুষের জন্য ব্যস্ত হইল—মানুষ ধর্ম্মকে জানে না, তারা কি দুঃখে আছে! সমস্ত ছাড়িয়া মানুষকে ধর্ম্মের কথা বলিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইল। উচ্চ কর্ম্মচারী বলিলেন, সবুর কর। তিনি আর সবুর করিতে পারিলেন না। পঞ্জাব হইতে ভাই প্রকাশদেব সব ছাড়িয়া প্রচারের জন্য চলিয়া আসিলেন। লোকে বলে "খাটিয়া মরিলাম।" এই লোক কি বলে? না, "খাটিয়া বাঁচিব, খাটিয়া মরিব।" নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য খাটিব, ঈশ্বরের কাজ করিব। ব্রাহ্মসমাজ কি করিয়াছে! একজন নয়, বহু জনকে এই করিয়া দিয়াছে। বিলাসের মধ্যে বাঁচিতে হয় না। এই ডাক শুনিতে পাইতেছি—জগতের লোক দুঃখ পাইতেছে, পাপ তাপে কষ্ট পাইতেছে, আর তুই ঘরে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুখে থাক্‌বি? তাহা হবে না। ব্রহ্ম বলিতেছেন, "স্বদেশ বিদেশ নাই, সকল লোককে আমার সন্তান ভাবিতে হইবে।" লোকে বলে গ্রীক বার্বেরিয়ান, য়িহুদেন খৃষ্টান, কাফের মুসলেম, হিন্দু যবন। ইহা নয়। সকলে ভাইবোন, তাহাদের সকলের জন্য খাটিতে হইবে। তাহা না হইলে মরিবে। লোকে বলে অবনত শ্রেণীর লোক মূর্খ থাকে তাহাতে তোমাদের কি? ব্রহ্ম বলিয়াছেন—তাহা হইলে তোরাও যে মরিবি। তাহাদিগকে তুলতে হবে। স্বদেশের সেবা কি? ব্রহ্মকে দেখাইয়া দেওয়া, ইহা অপেক্ষা মহত্তর সেবা আর কিছু নাই। লোকে বলে ব্রাহ্মগণ জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে আছে। মানুষের প্রাণে যদি দয়া মমতা পবিত্রতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া না দিতে পার, তবে জাতীয় উন্নতি কি করিলে? খায় ত সকলেই। তাহাতে মানুষ বাঁচে না। "প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যেন।" ভগবান মানুষকে দয়া প্রেম সদিচ্ছা পবিত্রতা নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি দিয়াছেন। এ সব হৃদয়ে জাগাইতে না পারিলে মানুষ হয় না। মানবের ধর্ম্মকে রক্ষা কর, স্নেহ মমতা রক্ষা কর, বর্দ্ধিত কর, ইহা অপেক্ষা বড় সেবা নাই। পুণ্য প্রাণদ, মনুষ্যে পুণ্য না থাকিলে সংসার চলে না, সমস্ত অচল হইয়া যায়। এই পুণ্য, এই ঈশ্বরে ভক্তি যদি না দিতে পার, সব সম্বন্ধকে যদি ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পার, তবে সেবা থাকিবে না। সংসার চলিবে না, সমাজ চলিবে না, জাতীয় উন্নতি হইবে না, সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবা আর কিছু নাই। কত কাজে কত জন রক্ত দান করিতেছে! কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় কাজ আর কিছু নাই।

পবিত্র হও, পাপকে বর্জ্জন কর, কে এ কথা বলে? ব্রহ্মের দ্বারা যে অনুপ্রাণিত সে এই কথা না বলিয়া পারে না। ব্রাহ্ম-সমাজ এই কথা বলিতেছে। ইহা অপেক্ষা উত্তম সেবা কিছু নাই। অন্নদান করিবে? সে ভাল, তাহাতে শুধু দেহই রক্ষা পাইবে। কিন্তু আত্মাকে রক্ষা করিতে হইবে। এই আত্মাকে যদি রক্ষা না করা যায়, তবে সবই বিনষ্ট হয়, সবই বৃথা হইয়া যায়। শুধু দেহ রক্ষা করিয়া কোনই লাভ হয় না। এই আত্মাকে কি করিয়া রক্ষা করিবে? যদি ভগবানের সঙ্গে আত্মার যোগ হয়, তবেই আত্মা রক্ষা পায়—তিনিই আত্মার জীবন। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই আত্মার মৃত্যু। আত্মা বিনষ্ট হইলে সবই গেল। ঈশ্বরকে ভালবাস কি না, 'সব ছাড়িয়া তাঁহাকে লইয়া থাকিতে পারি' এরূপ কথা বলিতে পার কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। প্রাণের মধ্যে ব্রহ্ম আছেন। তাঁহাকে জান, তাঁহাকে ভাল বাস, তাঁহার অনুসরণ কর। তবেই জীবন পাইবে, আত্মা বাঁচিবে। তাঁহাকে জানিলে, ভালবাসিলে, পাপ মলিনতা ছাড়িবার ইচ্ছা হয়, আর যাহা কিছু মহৎ তাহা করিবার জন্য উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা জাগে। ঈশ্বরকে জানিলে, আপনার গলাটি দিয়াও অপরের প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়।

মানব সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী পাপের জন্য, ঈশ্বরের বিদ্রোহিতার জন্য। ব্রাহ্মসমাজ এই জন্যই খাটিতেছে। কত জন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বলিল ধন চাই না, মান চাই না, অনাদরেই দিন কাটাইব, তবু ঈশ্বরের নিকট থাকিব, তাঁহার সেবায় দিন কাটাইব। ব্রাহ্মসমাজ এই শিক্ষাই দিতেছেন—ইন্দ্রিয়লালসা ছাড়, পাপ পরিত্যাগ কর, পবিত্র জীবন যাপন কর, ব্রহ্মকে অনুসরণ কর।

করুণাময় পিতা, অনেকের প্রাণে যে এই শুভ ইচ্ছা হইতেছে, ইহাই তোমার করুণা। নানা দুঃখে আমাদের দিন কাটিতেছে। আমরা যেন 'তাহার হাত হইতে উদ্ধার কর' এরূপ আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা না করি। বুক পাতিয়া দুঃখকে বরণ করি, ক্লেশ লাঞ্ছনা তোমার কৃপার দান বলিয়া যেন গ্রহণ করিতে পারি, তোমাকে যেন কিছুতেই পরিত্যাগ না করি। তোমার অধীন হইয়া, তোমার আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, তোমার ইচ্ছার জয় হউক বলিয়া, যেন জীবন যাপন করিতে পারি। এই ৫০ বৎসরে কত কৃপা পাইয়াছি, কত আলোক প্রকাশ করিয়াছ, তোমাকে পাইবার জন্য চিত্তকে লালায়িত করিয়াছ। কি বলিয়া তাহার পরিচয় দিব? সকলকে তোমার কর। আমাদিগকে তোমার দাস দাসী করিয়া লও। এই দেশকে তোমার করিয়া লও। তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক, তোমার রাজ্যই সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক।

অনন্তর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী একটি গান করিলে অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

৯ই এপ্রিল (২৭শে চৈত্র) সোমবার— প্রাতে উষাকীর্ত্তনান্তে উপাসনা। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী

আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের মধ্যে ইহুদি জাতির ইতিহাসে, নানকের ও Stanleyএর জীবনে ভগবানের করুণার নানা কথা বলিয়া তিনি নিজ জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাহা সকল হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। তৎপরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আপনাদের জীবনে ভগবানের অপূর্ব্ব করুণার সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁহারা কি প্রকারে ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন, নানা দুঃখ কষ্ট সংগ্রামে তিনি কিরূপ রক্ষা করিয়াছেন তাহার বর্ণনা করেন। মনোমোহন বাবু ও রাজকুমার বাবু একটু বিস্তারিত ভাবেই বলেন; কিন্তু শুধু স্মৃতি হইতে তাহার অসম্পূর্ণ মর্ম্ম প্রকাশ করা সঙ্গত মনে হইতেছে না। তাঁহাদের নিকট হইতে লিখিত মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিলে পরে প্রকাশ করিব। এই সকল সাক্ষ্য সকলের হৃদয়কেই দ্রবীভূত ও বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল।

মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন। অনন্তর ৩ ঘটিকার সময় "প্রচার" বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আলোচনা উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়, রায় যোগেশচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুব্বারুষ্ণায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রকাশ দাস, শ্রীযুক্ত জি ওয়াই চিৎনীশ, শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস্ বালাস স্ব স্ব বক্তব্য প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। সতর্কতার সহিত কর্ম্মী বাছিয়া লইবার জন্য এবং সকল স্থানের প্রচার বিষয়ক আয়োজন গুলিকে এক ব্যবস্থায় আনয়ন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুব্বারুষ্ণায় একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন ও তাহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতির মন্তব্যান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

সায়ংকালে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপাসনা উপদেশ ও সঙ্গীতে সকল প্রাণ বিশেষ ভাবে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। তাহা পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

কিছু সময় সংকীর্ত্তন হইয়া অদ্যকার কার্য্য এবং এই উৎসবেরও কার্য্য শেষ হইল। অনন্তর পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনাদি করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনেকেই অনুভব করিতে লাগিলেন আরও কয়েকদিন উৎসব চলিলে ভাল হইত। সকলেই উৎসবের মধ্যে করুণাময়ের বিশেষ করুণা অনুভব করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন, নূতন আশা ও বল লাভ করিয়াছেন। তাহা কোনও বর্ণনার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এখানেই আমরা আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিলাম। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকল কার্য্যে পূর্ণ হউক। তিনিই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

শতবার্ষিক মহোৎসবে আমাদের কর্ত্তব্য।

যে ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকা ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে পরিত্রাতা পরমেশ্বরের কৃপার দান বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহার পক্ষে শতবার্ষিক মহোৎসব এক অতি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বিশেষ আশা ও আনন্দের ব্যাপার রূপেই আসিয়াছে। সত্য বটে ব্রাহ্মধর্ম্ম নানা ভাবে সহস্র সহস্র নরনারীর কল্যাণ সাধন করিতেছে, কিন্তু এ ধর্ম্ম যে তাঁহার নিজের প্রাণে ঈশ্বরানুরাগ জাগাইয়াছে, তাঁহাকে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত করাইয়াছে, তাঁহাকে অদৃশ্যলাভের জন্য দৃশ্যলাভকে পরিত্যাগ করিতে শিখাইয়াছে, এজন্য তিনি আপনাকে এ ধর্ম্মের নিকট বিশেষভাবে ঋণী বলিয়া অনুভব করেন। কেবল ঋণী বলিলে ব্রাহ্মের মনের প্রকৃত ভাবটী প্রকাশ পায় না; তিনি আপনাকে এ ধর্ম্মের নিকট বিক্রীত বলিয়াই অনুভব করেন। সুতরাং এ ধর্ম্মের শতবৎসর পূর্ণ হওয়া তাঁহার নিকট এক বিশেষ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আনন্দের ব্যাপার। এমন দিন এমন বৎসর তাঁহার জীবনে আর আসে নাই, আসিবে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে অর্দ্ধশতাব্দীয় মহোৎসব সে দিন হইয়া গেল, তাহাকে যদি 'অর্দ্ধোদয় যোগ' বলা যায়, তবে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক-মহোৎসবকে 'পূর্ণোদয় যোগ' বলিতে হইবে। এই যোগ শতবৎসরের পূর্ব্বে আর আসিবে না। পঞ্চাশ বৎসর পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব আসিবে বটে; কিন্তু আমাদের আশা করা উচিত যে, এই সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা একই আশা ও আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পরের এমন নিকট হইবেন যে, কোন এক বিশেষ শাখার বিশেষত্বের উপর জোর দিয়া পৃথক উৎসব করিবার আর প্রয়োজন থাকিবে না। অতএব এ কথাই সত্য যে, শতবৎসরের পূর্ব্বে আবার এইরূপ মহোৎসব আসিবার সম্ভাবনা অল্প। এখনকার বালকবালিকারাও জীবনে আর শতবার্ষিক মহোৎসব দেখিতে পাইবেন না। সে সৌভাগ্য কেবল ভবিষ্যদ্বংশীয়দেরই ঘটিবে।

এই মহা মহোৎসব কি ভাবে সম্পন্ন করিলে আমাদের হৃদয়ের তৃপ্তি হয়, তাহা ভাবিয়া দেখা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। কলিকাতায় যদি খুব বড় রকমের একটা মহোৎসবের মত হয় এবং এক দল প্রধান প্রধান লোক ভারতবর্ষের সকল বড় বড় সহরে ভ্রমণ করিয়া উপাসনা বক্তৃতাদি করেন, তাহাতেই কি আমাদের হৃদয়ের তৃপ্তি হইবে? শতবৎসরে সমাগত এই মহোৎসবও যদি অন্যান্য বার্ষিক উৎসবের মতই উপাসনা বক্তৃতাদিতে পর্য্যবসিত হয়, তদতিরিক্ত অন্য কিছু না হয়, তবে আর কি হইল? প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাকে ভাবিতে হইবে, কি করিলে এ উৎসবের বিশেষ গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য রক্ষিত এবং ইহার পুণ্য-স্মৃতি চিরজীবন হৃদয়ে মুদ্রিত থাকে।

ধর্ম্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব ভারতবর্ষে বোধ হয় নূতন। সুতরাং ইহার প্রকৃতি কি রূপ হওয়া উচিত তাহা নির্ণয় করিতে আমরা অতীতের সাহায্য পাইব না। পাশ্চাত্য দেশে অনেক ব্যাপারের শতবার্ষিক স্মৃতি-উৎসব হইয়া থাকে।

ধর্ম্মসম্প্রদায়েরও শতবার্ষিক উৎসব হয়। কিন্তু যতদূর জানি সে গুলি আলোচনাপ্রধান সম্মিলন মাত্র। তাহাতে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি পঠিত এবং সম্প্রদায়ের ভাবী কর্ম্মপ্রণালী নির্ণীত হয়। আমরা ইহাতে তৃপ্ত হইতে পারি না।

আমাদের বর্ত্তমান মাঘোৎসবটি একটি অমূল্য বস্তু। আত্মিক সাধনের উপযোগী এমন উৎসব জগতে দুর্লভ। এই উৎসবের প্রণালী আবিষ্কার করিতে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাদের অনেক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেক ভক্তি, ব্যাকুলতা, ধর্ম্মোৎসাহ, ত্যাগস্বীকার এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি মাঘোৎসবকে বর্ত্তমান আকার দান করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ এক বেলা মাত্র উপাসনার দ্বারা যে উৎসবের সূচনা করিয়াছিলেন, আজ আমরা তাহার কি বৃহৎ ও কল্যাণময় আকার দেখিতেছি! সাধকদিগের আগ্রহ ও কুশলতার সহিত কল্পনার যোগে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। শতবার্ষিক মহোৎসবকেও একটি বিশিষ্ট আকার দান করিতে হইলে, বর্ত্তমান যুগের সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার ভক্তি, ব্যাকুলতা, ধর্ম্মোৎসাহ, ত্যাগস্বীকার ও প্রীতি একত্র করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে কল্পনার সাহায্যে এমন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, যদ্দ্বারা ইহা জগতে একটি নূতন বস্তু হইয়া দাঁড়ায়,— মাঘোৎসবের অপেক্ষাও অনেক অধিক কল্যাণপ্রদ হয়। সকলের জীবনকে সরস ও সতেজ করে। শতবার্ষিক উৎসবকে বিশিষ্ট আকারে গড়িয়া তোলা বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদের গৌরবময় অধিকার।

দেড় বৎসরব্যাপী এই মহোৎসবে, কলিকাতাস্থ কেন্দ্র-সমিতি কি কি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার মোটামুটি বিবরণ Indian Messenger ও তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় অনেক দিন হইতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহাদের পরামর্শে ও কার্য্যে সকল স্থানের ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন, মফঃস্বল সমাজগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে কি করিতে পারেন, তাহাও সেই সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের ভাবিয়া স্থির করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে যে উৎসবকারী ভক্তদল বিদেশীয় ভক্তগণ সহ ভারতভ্রমণে বাহির হইবেন, শুধু তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা ও তাঁহাদের উপাসনা-বক্তৃতাদিতে যোগদান করা কি মফঃস্বল সমাজসকলের একমাত্র কার্য্য হইবে? প্রত্যেক মফঃস্বল সমাজ পৃথক্‌ভাবে নিজের এলাকার মধ্যে বিশেষ কিছু করিয়া কি এ উৎসবকে চিরস্মরণীয় করিবেন না? কলিকাতা সমাজ সমগ্র ভারতের জন্য যাহা করিতেছেন, প্রত্যেক মফঃস্বল সমাজের নিজের জেলার জন্য তাহা করা কর্ত্তব্য। কি কি করিতে পারেন, যেমন মনে আসিতেছে তেমন লিখিতেছি।

(১) জেলার মধ্যে সহরে বা গ্রামে, যতগুলি ব্রাহ্মপরিবার আছে তাহাদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আগামী আগষ্ট মাসে প্রত্যেক পরিবারে একদিন বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করা। উক্ত উপাসনা প্রাতঃকালে হইলে তৎপূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী পল্লীতে উষাকীর্ত্তন, ও সায়ংকালে হইলে গৃহে বসিয়া সংকীর্ত্তন হইতে পারে।

(২) কলিকাতা হইতে ভক্তদল যে যে সমাজে যাইবেন, সেই সেই সমাজে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদিগকে লইয়া বিশেষ উৎসবের বন্দোবস্ত করা। যে সকল ক্ষুদ্র সমাজে তাঁহারা যাইতে পারিবেন না, তথায় সমাজের আগামী বার্ষিক উৎসব বিশেষ ভাবে সম্পন্ন করা।

(৩) উক্ত বিশেষ উৎসবের সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া, সহরের কোনও প্রশস্ত মিলন স্থানে, তাঁহাদের সহিত ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি প্রভৃতি দেশহিতকর বিষয়ের আলোচনা।

(৪) উক্ত বিশেষ উৎসবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বালক বালিকাদিগকে লইয়া সঙ্কীর্ত্তন দল গঠন করতঃ সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন প্রাতঃকালে সহরের বিভিন্ন অংশে তাহাদের দ্বারা সঙ্কীর্ত্তন করান, ও সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে দরিদ্র-সেবার জন্য অর্থভিক্ষা করান। এই রূপে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা উৎসব-কালে একদিন দরিদ্রদিগকে শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করান। সঙ্কীর্ত্তন, অর্থভিক্ষা, রন্ধন ও পরিবেশনাদি কার্য্য বয়স্ক ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে বালকবালিকারা যথাসম্ভব স্বয়ং করিবে। ভোজন করান সম্ভব না হইলে, চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হইবে।

(৫) সমাজের কোনও মুদ্রিত ইতিহাস না থাকিলে, এই উপলক্ষ্যে যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা তাহা লিখাইয়া মুদ্রিত করা।

(৬) ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শের বিস্তার জন্য পুস্তিকাদি প্রকাশ ও বিনামূল্যে বিতরণ বা অল্পমূল্যে বিক্রয়।

(৭) আগামী আগষ্ট হইতে ১৯৩০ জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে জেলার মহকুমা গুলিতে ও প্রধান প্রধান গ্রামে দল বাঁধিয়া গিয়া সঙ্কীর্ত্তন, প্রার্থনা, লোকের সহিত ভ্রাতৃভাবে ধর্ম্মালোচনা, ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক ও জনহিতকর পুস্তিকাদি বিক্রয় ও বিতরণ; সম্ভব হইলে ছায়াচিত্র সহযোগে নানা কল্যাণকর বিষয়ে বক্তৃতা। ৫।৭ জন লোক মাসে একবার দু তিন দিনের জন্য এক একটি স্থানে যাইতে পারিলে, উক্ত সময়ের মধ্যে ১৮টি স্থানে যাওয়া যাইতে পারে। যে সকল গ্রামে কোনও ব্রাহ্ম-বন্ধুর বাড়ী আছে, তথায় এইরূপ কার্য্যের বন্দোবস্ত তিনি সহজেই করিয়া দিতে পারেন এবং সক্ষম হইলে সমগ্র বা আংশিক ব্যয়ভারও তিনি বহন করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, এ সকল কার্য্য আন্তরিক দীনতার সহিত করিতে পারিলেই সুফলপ্রদ হইবে; নতুবা বিপরীত ফলও হইতে পারে।

এইরূপ আরও অনেক কার্য্য প্রত্যেক সমাজ ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন। সকল সমাজের পক্ষে সকলগুলি অবলম্বন করা সম্ভবপর না হইতে পারে, কিন্তু যতগুলি সম্ভব, আগ্রহের সহিত করিলে, যাঁহারা করিবেন তাঁহারাও উপকৃত হইবেন, এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের এই মহোৎসবও সফল হইবে।

সর্ব্বোপরি প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার ব্যক্তিগত ত্যাগ-স্বীকারের উপর এই মহোৎসবের সফলতা নির্ভর করে আমরা যদি উৎসবে স্থায়ী উপকার পাইতে চাই, তবে তাহা ত্যাগের পথ দিয়াই পাইতে হইবে। সাত্ত্বিক ভাবদ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকার করিব, সেই পরিমাণে

এই উৎসব জীবনে সফল হইবে। অন্যান্য উৎসবে আমরা পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রধানভাবে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকি ; এ উৎসবে দিবার আকাঙ্ক্ষা প্রধানভাবে পোষণ করিতে হইবে—চিন্তাদান, শক্তিদান, অর্থদান। এ উৎসব অকিঞ্চন পরিশোধের উৎসব—ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট কার্য্যদ্বারা কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উৎসব। ইহা ত্যাগের আহ্বান লইয়াই আসিতেছে। প্রতি ব্যক্তির ত্যাগের দ্বারাই তাঁহার জীবনে ইহার সফলতার পরিমাপ হইবে। ত্যাগের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশই এই উৎসবের বিশেষত্ব। যিনি স্বয়ং ত্যাগস্বীকার না করিয়া, অপরের উপাসনা বক্তৃতাদির সাহায্যে উপকৃত হইতে চাহিবেন, তাঁহার জীবনে এ উৎসবের কোনও বিশেষত্ব থাকিবে না ; তাঁহার হৃদয়ে এ উৎসব কোনও ছাপ রাখিয়া যাইবে না।

অঃ

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১)

মঙ্গলময় বিধাতার অসীম কৃপাবারি স্থান ও ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সদাই বর্ষিত হইতেছে। তাঁহার সেই অপার মহিমা বলে কাকিনাধিপতি স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীকে কেন্দ্র করিয়া ষাট বৎসর পূর্ব্বে এই কাকিনায় যে একটী ব্রহ্মোপাসক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল তাহা কালের কুটিল বিবর্ত্তন সত্ত্বেও অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। মহিমারঞ্জন রঙ্গপুরের মফঃস্বলস্থ একটী ঘোর হিন্দু ভাবাপন্ন বৃহৎ জমিদার-গৃহে আশৈশব প্রতিপালিত হইলেও, বাল্যাবস্থায়ই তাঁহার হৃদয়ে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মে। মহিমারঞ্জন ও তাঁহার অপর ভ্রাতা স্বর্গীয় কৈলাশরঞ্জন, নাবালক অবস্থায় যখন রঙ্গপুর জিলাস্কুলে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তৎকালে ভক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারার্থ রঙ্গপুর আগমন করেন। রাজা মহিমারঞ্জন তাঁহারই নিকট সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সমাচার অবগত হন। এই সাধুসঙ্গ লাভে মহিমারঞ্জনের হৃদয়নিহিত সত্য আরো দৃঢ়তর হয়। তিনি সেই একেশ্বর ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া কাকিনাতে একটী ব্রহ্মোপাসক মণ্ডলী গঠনে কৃতসংকল্প হন। এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার মানসে কাকিনাস্থ কয়েকজন বিজ্ঞ ও ধর্ম্মপ্রাণ লোক পরামর্শ করিয়া ১২৭৫ সনের ১২ই মাঘ রবিবার 'ধর্ম্ম সভা' নামে একটী সভা স্থাপন করেন। কাকিনা এষ্টেটের তদানীন্তন ট্রষ্টী ভক্তিভাজন গুরুচরণ সরকার বিদ্যারঞ্জন মহাশয়, ট্রষ্টী গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি. স্কুল সবইনস্পেক্টার মহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, কবিরাজ কালীকুমার গুপ্ত, হেড মাষ্টার হরিহরচন্দ্র দাস, সেকেণ্ড মাষ্টার অঘোরনাথ মৈত্রেয়, হেডপণ্ডিত গগনচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রথম সেই সভায় যোগদান করেন। প্রথম কিছুদিন রাজবাটীর বড় তরফের বৈঠকখানার দ্বিতলে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত গুরুচরণ সরকার মহাশয় গীতা ইত্যাদি ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন এবং আদি সমাজের প্রণালী মত উপাসনা ও সঙ্গীত হইত। রাজা মহিমারঞ্জন ও পণ্ডিত গোবিন্দমোহন রায় মহাশয় উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন ও দয়ানাথ মিত্র মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন। গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত সভার সম্পাদক মনোনীত হন। তন্নিম্নে জগমোহন বা নাটমন্দির পত্রপুষ্পলতাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া বিশেষ সমারোহে প্রতিবৎসর ১২ই মাঘ উৎসব হইত। রাজা মহিমারঞ্জন স্বয়ং বেদীতে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও বক্তৃতা করিতেন এবং স্বরচিত ব্রহ্মসঙ্গীত ও উপদেশপূর্ণ ছোট ছোট পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া সর্ব্ব-সাধারণে বিতরণ করিতেন। এতদুপলক্ষে প্রতিবৎসরই দরিদ্র ও ভিক্ষুক হিন্দু মোসলমান জাতি নির্বিশেষে সকলকেই পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া পয়সা ও অন্ধ আতুরদিগকে স্ব স্ব পরিধেয় শীতবস্ত্র বিতরণ করিতেন। তাহাতে প্রতিবৎসর রাজ সরকারের প্রায় ৭।৮ শত টাকা ব্যয় হইত। এই উৎসব উপলক্ষে কোন কোন বৎসর রঙ্গপুর হইতে স্বর্গীয় কামাখ্যা-চরণ মুখোপাধ্যায়, হরনাথ দাস এবং সদ্য পুষ্করিণী হইতে কবিরাজ কালীশঙ্কর দে প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ কাকিনা আগমন করিতেন। বোধ হয় ইহার কিছু দিন পরই এই ধর্ম্ম সভা "ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত হয়। এই সংবাদ শুনিয়া ১২৭৯ সনে ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রচারক মহাশয় সর্ব্ব প্রথম কাকিনাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করেন। এই সময় কিছুদিন পণ্ডিত গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয়ের বাসাতে ব্রাহ্মসমাজ হইত। তৎকালাবধি হেডমাষ্টার বিশ্বেশ্বর সেন, সেকেণ্ড মাষ্টার গৌরলাল রায়, সুমারনবীশ নবদ্বীপচন্দ্র মজুমদার ও ভারতচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়গণ অত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে থাকেন। ব্যক্তিবিশেষের বাসায় উপাসনাদি হওয়া অসুবিধাজনক মনে করায়, কিছু দিন হাবেলির দালানে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে। তৎপর ১২৮১ সনে রাজা মহিমারঞ্জন তাঁহার রঞ্জনবাগে ব্রাহ্মসমাজের জন্য পাকা ভিত করিয়া একখানা আটচালা গৃহ নির্ম্মাণের আদেশ করেন। সেই গৃহ নির্ম্মিত হইলে রাজা মহিমারঞ্জন স্বয়ং তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি প্রতি রবিবার তথায় রীতিমত উপাসনাদি হইতে থাকে। এই সময় উপাচার্য্য গোবিন্দমোহন রায় মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় বগুড়ার বিখ্যাত ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসী কিশোরীলাল রায় মহাশয় কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য মনোনীত হন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পর ১২৮৫ সন হইতে প্রচারক শ্রদ্ধেয় রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং তৎপর বৎসর শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ কাকিনা আগমন করেন। তাঁহাদের হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণে কাকিনাস্থ অনেকেরই ব্রাহ্মধর্ম্মে আকর্ষণ জন্মে। ১২৮৭ সনে রাজকুমারী হেমলতার বিবাহান্তে কেহ কেহ সৈদপুরের ব্রহ্মোৎসব হইতে আগমন করার পর, রাজ-জামাতা রমণীমোহন রায়, অনাথবন্ধু রায়, তারকনাথ মৈত্রেয়, প্যারীমোহন সেন, অক্ষয়কুমার দাশ, মুকুন্দলাল সরকার, রাধিকানাথ রায়, কিছুদিন পর যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কামিনী-

কুমার ঘোষ (যিনি পরে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত হন), ১২৯০ সনে শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ বক্সী ও শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে থাকেন। রাণী মানমোহিনী চৌধুরাণী, রাজকুমারী হেমলতা রায়, এবং শ্রীযুক্ত কুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী সময় সময় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। উপরোক্ত প্রচারকদ্বয়ের বক্তৃতায়, একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম কিশোরীলাল রায় মহাশয়ের উপাসনা ও উপদেশে এবং শ্রদ্ধেয় রাধিকানাথ রায় মহাশয়ের সুললিত সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া আরো অনেকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং মহিলারাও কেহ কেহ এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে থাকেন। তদ্দৃষ্টে কয়েকজন ভক্ত শাক্ত ও বৈষ্ণব একত্রিত হইয়া হরি সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতে আরম্ভ করেন।

কাকিনার পূর্ব্বতন ভূস্বামিগণ অনেকেই আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া তৎসমুদয়ের সেবা পূজার জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন এবং রাজা মহিমারঞ্জনের পিতা স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় কাশীধামে শিবস্থাপন ও দৈনিক শতাধিক লোকের আহারোপযোগী এক অন্নসত্র স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র রাজা মহিমারঞ্জন ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসী হইয়া কাকিনাতে ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটী ইষ্টকনির্ম্মিত স্থায়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবেন ইহা অসম্ভব নয়। এই সদিচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভগবদ্ভক্ত স্বর্গীয় কালীকুমার গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় তাঁহার এই অভিপ্রায় মহাত্মা মহিমারঞ্জনকে জ্ঞাপন করেন। উদারহৃদয় মহিমারঞ্জনের প্রাণেও এই সৎ সঙ্কল্প নিহিত ছিল, তাই তিনি পরম উৎসাহে এই শুভ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া রাজ এষ্টেটের বার্ষিক রোবকারীতে ব্রাহ্মসমাজের জন্য এষ্টেটের অর্থে একটী ইষ্টকালয় নির্ম্মাণের আয়োজন করিতে আদেশ করেন।

রাজবাটীর দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকস্থ দুই সড়কের মিলন স্থানে, শম্ভু সরোবরের উত্তর পাড়ে, ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের স্থান মনোনীত করিয়া, ভিত্তি স্থাপন জন্য কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করা হয়। ১২৯১ সনের কার্ত্তিক মাসে উক্ত স্থান পত্র পুষ্পের তোড়ন ও আলোকমালায় সুশোভিত করিয়া সামিয়ানাতলে এক বিরাট সভা আহূত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং রাজা স্বয়ং উপাসনা, সঙ্গীত ও বক্তৃতা করনান্তর শাস্ত্রী মহাশয় যথানিয়মে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। একখানা স্থায়ী কাগজে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার মন্দির ইত্যাদি লিখিয়া, তৎসঙ্গে সাময়িক সংবাদপত্র, স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা একটী বোতলে ভরিয়া ইষ্টকনির্ম্মিত গর্ত্তে প্রোথিত করা হয় এবং সেই গর্ত্তোপরি এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর স্থাপন পূর্ব্বক ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

রাজা মহিমারঞ্জনের আন্তরিক উৎসাহে এবং পর্য্যালোচনায় এবং কালীকুমার গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের ও গগনচন্দ্র ঘোষ পণ্ডিত মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বিশেষ উদ্যোগে কাকিনায় বর্ত্তমান ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইলে, ১২৯৩ সালের ২০শে বৈশাখ অভূতপূর্ব্ব সমারোহে সেই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে, রামকুমার বিদ্যারত্ন, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রিন্সিপাল, গুরুচরণ মহালানবীশ মহাশয় সপরিবারে এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, আর নববিধান সমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় গৌরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র, রামচন্দ্র সিংহ, মন্মথনাথ দত্ত গায়ক প্রভৃতি এবং বাউল সম্প্রদায়ের নেতা হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গালনাথ) ও প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী (ফিকির চাঁদ) মহাশয়দ্বয় বহু দলবল সহ, এবং রঙ্গপুর, সৈদপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী মহাত্মাগণ শুভাগমন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক হিন্দুভাবাপন্ন বিশিষ্টলোকও নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। দর্শক ভাবেও বহু লোক আসিয়াছিলেন।

১২৯৩ সালের ২০শে বৈশাখ অপরাহ্নে সমাগত ও কাকিনাস্থ ব্রাহ্ম হিন্দু প্রায় সহস্রাধিক লোক মিলিত হইয়া সুসজ্জিত হস্তি, ঘোড়া, নানা রঙ্গের পতাকা, এবং বহু খোল করতাল সহ পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের গৃহ হইতে এক নগর সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির হন। সেই বিরাট সঙ্কীর্ত্তনের দল রাজবাটীর চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া উক্ত নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রবেশ করে। প্রথমতঃ রাজা মহিমারঞ্জন যে এই মন্দির পরব্রহ্মের নামে উৎসর্গ করিয়া তাহা একমাত্র সত্যস্বরূপ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সর্ব্ব সাধারণকে দান করিলেন তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞাপত্র পঠিত হয়, তৎপরে ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, রাজা মহিমারঞ্জন ও অধিকাংশ ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসী লোক দ্বারা মনোনীত হইয়া, সুসজ্জিত বেদীতে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক রীতিমত উপাসনা করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠার কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। তাঁহার সেই সরল ভক্তিপ্রদ উপাসনা ও উপদেশে মুগ্ধ হইয়া, শ্রোতৃবর্গ কোন সময় ক্রন্দনের রবে কখনও বা আনন্দ ধ্বনিতে মন্দির মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মোন্মাদনার ভাব প্রকাশ করা অসাধ্য। তৎপরদিন হইতে কোন দিন পণ্ডিতবর গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতি নববিধান সমাজের ব্রাহ্মগণ, কোনও দিন বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ, বেদীতে বসিয়া উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন; রাজা মহিমারঞ্জনও কোন কোন দিন জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়াছেন। এই ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত ভগবৎপ্রেমোন্মাদিনী উপাসনা, উপদেশ, বক্তৃতা, সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন এবং বাউল সঙ্গীতের আনন্দলহরী প্রবাহিত হইয়া কাকিনা যে কি প্রকার ডুবুডুবু হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। যিনি এই ব্রহ্ম-মহোৎসব স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারই জীবন ধন্য হইয়াছে। তৎকালে বহু ভক্ত ও সাধু সম্মিলনে এবং অবিরত ব্রহ্ম ও হরিনাম ধ্বনিতে কাকিনা প্রকৃত তীর্থস্থান বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল।

১২৯৩ সালের কাকিনা রাজ এষ্টেটের বার্ষিক পুণ্যাহের রোবকারীতে ৩০০৲ টাকা স্থলে ১২৯৩ সালের রোবকারীতে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা বার্ষিক আয়ের জোত নব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের ও সমাজের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহাত্মা মহিমারঞ্জন দান করিয়াছেন। এবং জামাতা রমণীমোহন রায়কে

এবং কবিরাজ কালীকুমার গুপ্ত মহাশয়কে তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহক অর্থাৎ সেবায়েত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আর ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাসী কাকিনার নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় কার্য্য পরিচালন জন্য একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন করেন। পণ্ডিত গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কেই সম্পাদক রাখিয়া, ট্রষ্টী ও কোষাধ্যক্ষ কবিরাজ কালীকুমার গুপ্ত, ট্রষ্টী রমণীমোহন রায়, উপাচার্য্য কিশোরীলাল রায়, রাজ এষ্টেটের কমিটীর মেম্বর অনাথবন্ধু রায়, মেম্বর বনওয়ারী চন্দ্র চৌধুরী, মেম্বর তারকনাথ মৈত্রেয়, লাইব্রেরিয়ান প্যারীমোহন সেন, হেড মাষ্টার গৌরলাল রায়, দ্বিতীয় পণ্ডিত অক্ষয়কুমার দাশ, মুন্সী মুকুন্দলাল সরকার, মুন্সী রাধিকানাথ রায়, সুমারনবীশ নবদ্বীপচন্দ্র মজুমদার, হেডমুহুরী ভারতচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়গণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হন।

১২৯৩ সালের আশ্বিন মাসে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবিহারী সেন ও পণ্ডিত গৌর-গোবিন্দ রায় প্রভৃতি বহু নববিধান সমাজের ব্রাহ্মগণ কাকিনা আগমন করিয়া রঞ্জনবাগের হাওয়াখানা দালানে (যেখানে তখন মহিমারঞ্জন স্কুল ছিল) নববৃন্দাবন নাট্যাভিনয় করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনাদি করেন।

১২৯৪সালে উপাচার্য্য কিশোরীলাল রায় মহাশয় কাকিনা ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর শ্রদ্ধেয় গৌরলাল রায় মহাশয় উপাচার্য্য মনোনীত হন। এবং ১২৯৫ সালে পণ্ডিত গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদ ত্যাগ করিলে হেডমাষ্টার গৌরলাল রায় মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১২৯৫ সনের বৈশাখোৎসব উপলক্ষে ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কয়েকজন শিষ্য সহ কাকিনা আগমন করেন। তৎপূর্ব্বেই তিনি 'গুরু শিষ্য করা' প্রথার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীন ভগবৎপ্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাসে মোহিত হইয়া রাজা মহিমারঞ্জন স্বয়ং এবং ব্রাহ্ম-সমাজের অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, অনেক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ও শাক্ত, বৃদ্ধ ও যুবক, বালক ও মহিলা, এমন কি ভৃত্যগণও কেহ কেহ, তাঁহার নিকট যোগ ও মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আরও অনেক যুবক বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত কুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী (বর্ত্তমান রাজা) ও শ্রীযুক্ত হৃদয়বন্ধু মজুমদার প্রভৃতি বিশেষ উৎসাহিত হইয়া ছাত্রদের ব্রহ্মোপাসনাদির জন্য পৃথকভাবে একখানা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে রাজা মহিমারঞ্জনের নিকট প্রার্থী হন। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদের প্রার্থনা অনুমোদন করিয়া রাজ এষ্টেটের ব্যয়ে ছাত্রসমাজের জন্য একখানা আটচালা টীনের ঘর নির্ম্মাণের আদেশ করেন।

১২৯৬ সনের ২৪শে বৈশাখ নবনির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দিরের পূর্ব্বাংশে ছাত্রদের উপাসনাদির জন্য পাকা ভিত করিয়া একখানা টিনের আটচালা গৃহ শ্রীযুক্ত কুমার মহেন্দ্ররঞ্জনের উৎসাহে এবং অক্লান্তকর্ম্মী কবিরাজ কালীকুমার গুপ্ত মহাশয়ের বিশেষ যত্নে ও তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। ঐ দিন রাজা মহিমারঞ্জন উক্ত ছাত্রসমাজগৃহ একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা ও তদ্বিষয়ক বক্তৃতা ও জ্ঞানালোচনার জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। এবং ছাত্রসমাজের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনভার কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের কমিটীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয়দ্বয় এই ছাত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া কাকিনা আগমন করেন। ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ।

সিটি কলেজ—আই এ ও আই এস্‌সি পরীক্ষাতে সিটি কলেজ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে জানিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৬ই মে কলিকাতা নগরীতে মিঃ ভুবনমোহন চাটার্জি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়াই নিজকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

বিগত ১ই মে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের ৭ মাস বয়সের শিশু দৌহিত্রী (পরলোকগত মুকুন্দ-কৃষ্ণ বাগচীর কনিষ্ঠা কন্যা) পরলোকগমন করিয়াছেন। এরূপ শোকের উপর শোকের আঘাতে মঙ্গলময়ের কি অভিপ্রায় আছে তিনিই জানেন

বিগত ৫ই মে যোড়হাট নগরীতে শ্রীযুক্ত রমাকান্ত বরকাকতির কন্যা সুধালতা ডুয়ারা এম্ এ, বি টি পথিমধ্যে বিষাক্ত আহার্য্য গ্রহণ করাতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ২৯শে এপ্রিল রবিবার পরলোকগত শিবপদ দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার মুখার্জ্জী শাস্ত্র পাঠ করেন। পুত্র বধূ শ্রীমতী মৃণালিনী দাস জীবনী পাঠ করেন। পুত্র শ্রীমান হরিহর দাস ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্র নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন:—রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজে—৫০০৲, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ২০০৲, সাধনাশ্রমে ১ শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারে ১০০৲, ও দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ফণ্ডে এঁড়িয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে ২০০ রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ২০০ ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে ১০০৲, মোট ১২০ টাকা।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়-স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শোকপ্রকাশ—বাঁকীপুরের ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী স্বর্গীয়া মহালক্ষ্মী দেবী বাঁকীপুর অঘোর নারী সমিতিতে প্রায় ২৯ বৎসরকাল প্রথমে সম্পাদিকা ও পরে সভানেত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমিতি গত ৫ই মের অধিবেশনে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা পুত্রবধূ একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। পরে সমিতি নিম্নলিখিত মন্তব্য নির্দ্ধারণ করেন:—

"আমাদের সভানেত্রী স্বর্গীয়া মহালক্ষ্মী দেবীর স্বর্গারোহণে অঘোর নারী সমিতি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি প্রায় ২৯।৩০ বৎসর সমিতির ভার গ্রহণ করিয়া এই সমিতিকে মাতার ন্যায় যত্নে রক্ষা ও পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সমিতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য সমিতি হইতে কোন স্থায়ী কাজ করিবার চেষ্টা করা উচিত। সমিতি তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানু-ভূতি জানাইতেছেন।"

শুভবিবাহ—বিগত ৩০শে এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত সনৎকুমার দাসের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া বাসন্তী ও বরিশাল নিবাসী শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ গুহের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৪ঠা মে কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত যোগীন্দ্র-নাথ অধিকারীর বিধবা কন্যা (শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষালের গৃহে বর্দ্ধিতা) কল্যাণীয়া গিরিবালা ও যশোহর নিবাসী শ্রীমান অক্ষয়কুমার কুণ্ডুর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

মুকুল—বালক-বালিকাদের মাসিক পত্র "মুকুল" পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে এবং শ্রীমতী শকুন্তলা রাও উহা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। এরূপ পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আশা করি অচিরেই ইহা পূর্ব্বের গৌরবময় স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। প্রথম সংখ্যা বেশ সুন্দর হইয়াছে।

ভারত মহিলা সমিতি—বিগত ১২ই এপ্রিল ভারত মহিলা সমিতির সভ্যগণ কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণের জন্য সাধনাশ্রমে [illegible]ন। একটি সঙ্গীতের পর শ্রীমতী সুশীলা বসু উদ্বোধন করেন। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু সম্পাদিকা, শ্রীমতী অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী সান্ত্বনা রায় ও কুমারী লীলা মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদিকা এবং শ্রীমতী সুবালা হালদার, লীলাবতী মিত্র, সুশীলা ঘোষাল, সুদেবী মুখোপাধ্যায়, সুশীলা বসু, সুবালা আচার্য্য, বাসন্তী চক্রবর্ত্তী, মনোরমা ব্যানার্জি, শোভনা রায়, প্রভাবতী মজুমদার, জ্যোৎস্না লাহিড়ী, বিরাজমোহিনী রায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। প্রতি বৃহস্পতিবার নারীগণ মিলিত হইয়া সঙ্গীত উপাসনা প্রবন্ধ পাঠ, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, জ্ঞানালোচনা ও সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এইরূপ নির্দ্ধারণ করা হয়। ব্রাহ্ম মহিলাদিগকে এই সমিতির সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রতি বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় অধিবেশন আরম্ভ হয়।

দান—ভবানীচক নিবাসী শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ দিন্দা তাঁহার মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন—

কাঁথিব্রাহ্মসমাজ ২৲, কাঁথিবালিকা বিদ্যালয় ২৲, নিজগ্রামে স্থাপিত [illegible] M. E. School ২৲, কলিকাতা S. B. Samaj প্রচার ফণ্ডে ২৲। কলিকাতা সাধন আশ্রম ২৲, এদান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আমার পূজা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। মনোমোহন বাবু ভক্ত কবি। দীর্ঘকাল রোগে দুঃখে তিনি ভগবানের যে জীবন্ত লীলা জীবনে অনুভব করিয়াছেন তাহাই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের সুমধুর ভাষাতে ব্যক্ত হইয়াছে। তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকগণ পূর্ব্বেই ইহার অনেক পরিচয় পাইয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক পাদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ, ব্যাকরণ ও তাৎপর্য্য-ঘটিত বহুল মন্তব্যসহ ব্যাখ্যাত এবং পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক খণ্ডশীর্ষ, বিষয়ানুক্রমণিকা ও যাজ্ঞবল্ক্য দর্শন বিষয়ক ভূমিকা সহ সম্পাদিত। সুন্দর কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা। বৃহদারণ্যকের এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত বোধ করিলাম। ইহার মধ্যে একদিকে যেমন গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় রহিয়াছে, তেমনি অপর দিকে বিবৃত ব্যাখ্যা দ্বারা কোনও বিশেষ মত স্থাপনের চেষ্টা নাই। সুতরাং সত্যান্বেষী ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। বাঙ্গালা অনুবাদ সরল ও অবিকল হওয়াতে, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাহারাও সহজে মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন। আর সংস্কৃতে যাঁহারা সুপণ্ডিত তাঁহারাও গবেষণাপূর্ণ মন্তব্য সকল হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। যাজ্ঞবল্ক্য-দর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা যেমন একদিকে উহাকে সুবোধ্য করিয়াছে, তেমনি উহার অপূর্ণতাও সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। অনেক অসার জিনিষের মধ্য হইতে সার বাছিয়া লইতে হয় বলিয়া এই দেশের শাস্ত্রালোচনা তত প্রীতিপ্রদ হয় না, তাহা হইতে যথোপযুক্ত উপকারও লাভ করা যায় না। এই-জন্যই এরূপ সংস্করণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। আমরা আশা করি ইহা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে।

৩। সচিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত ও চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৵০। স্থানে স্থানে বিশেষ মত প্রতিষ্ঠার একটু চেষ্টা থাকিলেও আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। এত অল্পমূল্যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়া প্রকাশকগণ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বিস্তৃত বিষয়সূচী ও শ্লোকসূচী ও অন্যান্য বিষয় পুস্তকখানার গৌরব বৰ্দ্ধিত করিয়াছে। ইহা যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

NOTICE.

A meeting of the Brahmo Samaj Education Society will be held on Monday, the 11th June, 1928, to authorise the Council (under clause 11 of article 22) to consider the question of raising a temporary loan.

May 18, 1928.
City College.

Herambachandra Maitra,
Secretary.

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৬ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ

Registered No 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯
30th May, 1928.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা, তুমি আমাদিগকে এই দুঃখ তাপময় সংসারের মধ্যে রাখিয়া আমাদের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আমাদিগকে যে সেবার উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছ, আমারা অনেক সময়ই তাহার সম্যক্ মূল্য বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা অধিকাংশ সময়ই আপনার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লইয়া ব্যস্ত হইয়া, আপনার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকি—আপনাকে ভুলিয়া অপরের দুঃখ তাপ অপনোদনের চেষ্টাতে আমাদের দয়া মায়া প্রেম ও আত্মত্যাগ প্রভৃতিকে বিকশিত না করিলে যে আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বই ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। চারিদিকের করুণ আর্ত্তনাদের মধ্য দিয়া তোমার প্রবল আহ্বান আসিয়া যখন আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেয় তখনই আমাদের চৈতন্যোদয় হয়, এবং তাহা অনুসরণ করিয়া যখন আমরা আপনাদিগকে সেবার কার্য্যে নিযুক্ত করি, তখনই দেখিতে পাই তাহার মধ্যে কত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে—শুধু অপরের কল্যাণ নহে নিজেরও মহত্তর কল্যাণ তুমি তাহার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছ। হে কল্যাণদাতা পিতা, তুমি আমাদিগকে সেবার মূল্য ভাল করিয়া বুঝিতে দেও এবং আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিয়া আর্ত্তের সেবা করিয়া ধন্য হইতেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ কর। তুমি আমাদিগকে যে উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছ, আমরা যেন আর আপনার দোষে তাহা হইতে বঞ্চিত না হই। ক্ষুদ্র তার মধ্যে ডুবিয়া না থাকি। তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে সর্ব্বপ্রকারে জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

দৈন্য—আমার যখন অর্থ না থাকে, তখনই যে আমার দৈন্য উপস্থিত হয়েছে, তা নয়। আমি যখন দশের নিকট আদর পাই না, তখনই যে আমি হীন হ'য়ে পড়েছি, তা নয়। যখন আমি পদে মানে খাট হ'য়ে পড়ি, কেহ কোনও কাজে আমাকে ডাকে না, তখনই যে আমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছি তা নয়। কিন্তু যখন আমার প্রাণে প্রেম জাগে না, যখন আর্ত্তজনে একটি সমবেদনার কথা বলতেও প্রাণে আকাঙ্ক্ষা আসে না, যখন সত্যকে বজ্রমুষ্টিতে ধ'রে থাকবার বল থাকে না, যখন অন্যের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে না, অন্যের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হ'তে পারে না, যখন আমার চিন্তা ছোট হয়, আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব হয়, উচ্চ ভাব প্রাণে জাগে না, দৃষ্টির প্রসারতা থাকে না, হৃদয়ের বিস্তৃতি থাকে না, বাক্য ও কার্য্য খাঁটি হয় না, তখনই আমার দৈন্য আসে, আমি হীন হ'য়ে পড়ি। চিন্তার দৈন্য, ভাবের দৈন্য, প্রেমের ক্ষীণতা, দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা, ইহাই প্রকৃত দৈন্য। সেই দৈন্য দূর করাই জীবনের ব্রত।

কি দেখ্‌ছ?—তুমি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছ—আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র উঠ্‌ছে, আবার অস্ত যাচ্ছে; পৃথিবীতে কত বৃক্ষ লতা, নদ নদী, পর্ব্বত সমুদ্র কত ফুলফল, মানুষ পশু পক্ষী—দেখার আর অন্ত নাই। দৃষ্টি কতদূর চলে! দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ, আরও কত জিনিষ তোমার দৃষ্টির গোচর ক'রে দেয়। এই যে দেখ'—কত সুন্দর, কত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ জিনিষ দেখা—এখানেই কি দেখার শেষ? এই যে কেবল জড়—জড় ও চেতন—জড় জগৎ ও প্রাণী জগৎ—ইহাই কি সব! আর কি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ না? আর কি কোনও মুখ তোমার চক্ষে

পড়ে না? এই যে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ধরা, এর ভিতরে কাহারও হস্তের তুলিকা দেখ্‌তে পাচ্ছ না? এই যে সুমধুর সঙ্গীত গীত হচ্ছে—কত পাখীর গান, কত নদ নদীর কুল কুল ধ্বনি, বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর শব্দ, শিশুর মধুর বোল,—তার ভিতরে আর কারও সুমধুর কণ্ঠস্বর শোন না? এই যে রস গন্ধ স্পর্শ তোমাকে আকুল করে, মোহিত করে, তার মধ্যে আর কোনও মাধুর্য্য অনুভব কর না? তবে তোমার দেখা, শোনা, সবই বৃথা। ভিতরে প্রবেশ কর, সৌন্দর্য্যের খনিতে ডোব। মাধুর্য্য রসে আপ্লুত হও। যিনি সকল রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের মধ্যে লীলা কচ্ছেন, প্রেমের তুলিকা বুলাচ্ছেন, মাধুর্য্যরসের উৎস হ'য়ে রয়েছেন, তাঁকে দেখ, তাঁর রসে ডুবে যাও; তবেই দেখা শোনা সার্থক হবে।

সঙ্গী হ'য়ে আছেন—একদিন ছিল, সংসার যখন বিমুখ হলো, অকূল সাগরে একাকী ঝাঁপ দিলাম, অজানার পশ্চাতে ছুটলাম, তখন মনে হতো, আমার সঙ্গে কেহ নাই—এই অসীম সংসার, প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জ, কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা, নির্ম্মম সমাজ—আমি একা, আমার কথা কেহ শোনে না, আমার ব্যথা কেহ বোঝে না, আমার পাশে দাঁড়াইবার কেহ নাই। আমি একাকী চলে যাচ্ছি—কোথায় ভেসে যাব কে জানে? প্রকৃতি, সমাজ সকলে আমাকে পিষে মারবে। সে এক দিন ছিল; প্রাণে আশা পাই নাই, হৃদয়ে বল পাই নাই, মনে আনন্দ ছিল না। আর আজ? আজ দেখি কে যেন আমার সঙ্গে নিয়ত র'য়েছেন, আমি যেন বুঝ্‌তে পারি, একজন আমার সঙ্গে নিয়ত র'য়েছেন। আমার বেদনা তিনি বোঝেন, আমার ক্রন্দন তিনি শোনেন, আমাকে প্রেম-বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। বিভীষিকাপূর্ণ স্থানে একাকী যাই, আর কেহ নাই; অনুভব করি, একজন আছেন, তাঁর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দুঃখে পড়ি, বিপদে পড়ি, আর কেহ নাই, বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই, সহায় সম্পদ নাই—তখনও কার যেন অভয়বাণী কাণে আসে, কে যেন সঙ্গে রয়েছেন অনুভব করি। তিনি কে? তিনিই আমার অন্তর-দেবতা, প্রিয়তম সুহৃৎ, সখা, জীবনস্বামী।

সম্পাদকীয়

সেবার অধিকার—এ সংসারে মানুষ সর্ব্বদাই নানা প্রকার অধিকার লাভের জন্য কতই না ব্যস্ত, কত রূপ চেষ্টা ও সংগ্রামেই না নিযুক্ত! অথচ যে সকল অধিকার লাভের জন্য সে সর্ব্বস্ব দান করিতেছে, আপনার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিতেছে, তাহার যে প্রকৃত মূল্য কি, তাহা যে কতটা কল্যাণ-কর, এবং লভনীয় ও লোভনীয়, সে কথা একবারও চিন্তা করিয়া দেখে কি না গভীর সন্দেহের বিষয়। মানুষ সাধারণতঃ যে সকল অধিকারের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লালায়িত, তাহা যে শুধু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এরূপ নহে, অনেক সময় নিতান্ত অনিষ্ট-করও। অনেক সময় মানুষ আপনার চিরন্তন কল্যাণ, প্রকৃত মনুষ্যত্ব, বিসর্জ্জন দিয়াও তাহা লাভ করিতে কুণ্ঠিত হয় না—এমন কি, কল্পিত সুখের আশায় সম্মুখস্থিত সুনিশ্চিত সুখ পরিত্যাগ করিতেও ক্ষান্ত হয় না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই—তাহা আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে। সেগুলি, উচ্চ ও মূল্যবান হউক বা না হউক, তাহাদের অপেক্ষাও উচ্চতর ও অধিকতর মূল্যবান কিছু যে আছে এবং তাহার প্রতি যে অধিকাংশেরই দৃষ্টি নাই, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। আমাদের মনে হয়, সকল প্রকার সাংসারিক অধিকারের মধ্যে সেবার অধিকারই সর্ব্বোচ্চ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ও কল্যাণকর। কেন না, ইহাতে দয়া দাক্ষিণ্যাদি, প্রেম পরার্থপরতা প্রভৃতি মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ সকল বিকাশের, প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব লাভের যেরূপ সুযোগ ঘটে আর কিছুতেই তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ অতি অল্প লোকেই ইহাকে এই ভাবে দেখে। সেবা অনেকেই করে—নানা কারণে তাহা না করিয়া পারে না। কেহ কেহ হয়ত অবস্থায় বাধ্য হইয়া করে। অধিকাংশ হয়ত মহৎ কর্ম্ম মনে করিয়াই করে। প্রায় সকলেই অপরের উপকার সাধন করিলেন বলিয়া একটা আত্মগৌরব ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ইহার দ্বারা যে নিজেই অধিকতর উপকৃত হইলেন, এরূপ সুযোগ পাইয়া যে নিজে ধন্য হইলেন, সে ভাব কয় জনের মনে উদয় হয় জানি না। এই ভাব থাকে না বলিয়াই সেবার দ্বারা উভয় পক্ষেরই যে পরিমাণ উপকার সাধিত হইবার কথা তাহা হয় না। আর যতটা উপকার সাধিত হয় তাহার সঙ্গে যে কিছু অপকারও সমুৎপন্ন না হয়, এরূপ কথাও বলিতে পারি না। সুতরাং আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে সেবার যে আদর্শ পাইয়াছি, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে—আমাদের সকল সেবা কার্য্যের মধ্যে সেই ভাবটিকে রক্ষা করিয়াই চলিতে হইবে। এই দুঃখ বিপদময় সংসারে বিবিধ প্রকার সেবার সুযোগ আমাদের নিকট সর্ব্বদাই আসিতেছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঝড় তুফান, জল-প্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি আপদ বিপদ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। ইহার মধ্যেও এক প্রকার বিশেষ সেবার সুযোগ উপস্থিত হয়। আমরা আজ বিশেষ ভাবে তাহার কথাই বলিব। ইহাতে কত লোক যে রোগে, অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যুর কবলে পড়িতেছে, গৃহহীন আশ্রয়হীন হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। চারিদিক হইতে লোকের ভীষণ ক্লেশের বার্ত্তা আসিতেছে। আজকাল দুর্ভিক্ষ যেন কোন না কোন স্থানে লাগিয়াই রহিয়াছে। এক স্থানের কার্য্য শেষ করিতে না করিতেই অন্য স্থান হইতে আহ্বান আসিতেছে। যদিও এ সকল তত বিস্তৃত ও ভীষণ আকারের নহে তথাপি উহারা কোনও মতেই উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট কোনও প্রকার সাহায্য লইয়া উপস্থিত না হওয়াতে আমাদের দায়িত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। লোকে যতটা পারে করুক, এই ভাবিয়া গভর্ণমেণ্ট

হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন কিছু করিতেছে না তখন আমাদেরও কিছু করিবার নাই আমরা কোনও প্রকারেই এরূপ ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। আমাদিগকে এক্ষেত্রে যথাশক্তি করিতেই হইবে। আমাদের শক্তিতে যদি না কুলায় তবে তখন গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করিয়া পারিবেন না। সুখের বিষয় অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের যে আর কিছু করিবার নাই, এমন নহে। তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা যথেষ্ট নহে, আরও অনেক করিবার আছে। তাহাদিগকে সাহায্য করিবারও যে কোনও প্রয়োজন নাই, তাহাও নহে। উহাও একটা কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে অর্থ ও লোক দুইয়েরই প্রয়োজন আছে। আমরা এখন পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষেত্রে কাহাকেও পাঠাইতে পারি নাই। নিজেরা কোনও কার্য্যভার গ্রহণ করি নাই, অপরের নিকট কিছু অর্থ প্রেরণ করিয়াছি মাত্র। সম্পাদক ও সভাপতি মহাশয়ের নামে আবেদন পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রহ্মমন্দিরে এক দিবস এ বিষয়ে বিশেষ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, দুই দিন দানসংগ্রহ করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত অতি সামান্য অর্থই সংগৃহীত হইয়াছে। অবশ্য এখন পর্য্যন্ত অধিকাংশের নিকটই সেই আবেদন পৌঁছে নাই। উপযুক্ত কর্ম্মী ও অর্থ সংগৃহীত হইলেই কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। এ বিষয়ে আমাদের গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। আমরা যদি মনে করি অপরের দ্বারা কর্ত্তব্যটা সম্পন্ন হইয়া গেলে মন্দ হয় না, আমরা একটু আরাম উপভোগ করিতে পারি, অনেকটা ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমরা গুরুতর ভ্রমে পতিত হইব। ইহা একটা অপ্রীতিকর অথবা আমাদের আত্মকল্যাণবিবর্জ্জিত কর্ত্তব্যমাত্র নহে, যে ইহা হইতে কোনও প্রকারে মুক্তি পাইলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এরূপ সেবার কার্য্য দ্বারা আমরা নিজেই বিশেষ উপকৃত হই। এই সেবার সুযোগ ও অধিকার একটি অতি কল্যাণকর মহৎ অধিকার, ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে আমাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট সাধিত হয়। সুতরাং এ সুযোগ আমাদের পক্ষে কিছুতেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না—আমরা কোনও প্রকারেই ইহাকে হেলায় বা উদাসীন ভাবে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় প্রকার কল্যাণের জন্যই আমাদিগের প্রত্যেককে এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিতে হইবে। আমরা যে যাহা পারি তাহা করিয়া ধন্য হইলাম, আপনারাই প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হইলাম, ইহা ভাবিয়া যদি সকলে কার্য্য করি, তবে অর্থ ও লোকের কিছুরই অভাব হইবে না। জানি, এসময় আমরা নানা কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি, আমাদের হাতে আরও অনেক প্রকার কর্ম্মভার রহিয়াছে, তথাপি তজ্জন্য এ বিষয়ে কোনও গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, সকল কার্য্যে সকলের সমান উৎসাহ থাকে না। আমাদেরই মধ্যে নানা শ্রেণীর লোকই রহিয়াছে। তাহার মধ্যে কাহার কাহারও মন যে অপর সকল বিষয় অপেক্ষা এ দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই মোট ফলটা সমানই হইবে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। এদিকে আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি—বিষয়টাকে পরোপকারের দিক হইতে ততটা না দেখিয়া প্রধানতঃ নিজেদের কল্যাণের দিক হইতে দেখিবার জন্যই সকলকে অনুরোধ করি। এখানে যেমন সকলের কল্যাণ একই সূত্রে গ্রথিত, অপর কোথাও এরূপ দেখা যায় না। মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের মহত্ত্ব সাধনের জন্য আমাদের নিকট যে সুযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা যেন তাহা হেলায় না হারাই। তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য আহ্বান

বাংলা দেশে আবার দুর্ভিক্ষের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। বাঁকুড়া, বীরভূম, খুলনা, দিনাজপুর প্রভৃতি নানা জেলায় ভয়ানক ভাবে অন্নাভাব উপস্থিত। এ দেশ এমনই দরিদ্র যে প্রজাকুল সামান্য অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে করাল দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়; এ দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার আয়োজন এত অসম্পূর্ণ যে অতি সহজেই নানা স্থান ব্যাপক রোগের আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জন্মাবধি দুর্ভিক্ষের ও ব্যাপক রোগের সময়ে প্রজাকুলের সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। ইহার শক্তি অতি সামান্য; অর্থ ও কর্ম্মী উভয় বিষয়ে ইহা অতি দুর্ব্বল। কিন্তু, তথাপি দেশের দুঃখের আহ্বান সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কখনও উপেক্ষা করেন নাই। এবারও আমাদিগকে সে আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে। আমাদের দেশবাসী ভাইবোন অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহাদের কষ্টে আমরা হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করি। তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে, আমরা ভগবানের অর্চ্চনা করিতে পারিব না, ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাইব না। এ জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার উপাসকমণ্ডলীকে, তাঁহার অন্তর্ভুক্ত সকল পরিবারকে, এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সমন্বিত সকল বন্ধুজনকে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের সাহায্যের জন্য মুক্তহস্তে দান করিতে আহ্বান করিতেছেন। আজ উপাসনাশেষে এই মন্দিরে, এবং তৎপরে সমাজ অফিসে, দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ দান সংগৃহীত হইবে; এবং যাহাতে সেই অর্থের সদ্ব্যয় হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহা নানা সাহায্যকেন্দ্রে প্রেরিত হইবে।

দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, অগ্নিদাহ, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিপদের সময়ে ব্রাহ্মসমাজ জনসেবার আহ্বানটি সর্ব্বদাই মানিয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কাজ, মানুষকে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া। পূজা উপাসনা যেমন তাহার

১৩ই মে ১৯২৮, রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সায়ংকালীন উপাসনার পর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক নিবেদিত।

একটি অঙ্গ, জীবনকে ও চরিত্রকে উন্নত ও বিকশিত করা তেমনি তাহার একটি অঙ্গ; এবং দুঃখে বিপদে মানুষের সেবা করা, এবং জনসমাজের অন্যায় ও দুর্নীতিসকল দূর করাও তেমনি তাহার একটি অঙ্গ। মানুষ যখন ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহাকে এ সকলের প্রত্যেক দিক দিয়া সেই সম্বন্ধের পরিচয় প্রদান করিতে হয়।

এক শ্রেণীর মানুষের মনে এই সকল বিপদ কেবল কতকগুলি প্রশ্নের উদয় করে। কখনও দেখিতে পাই, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানুষেরা "মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন," অথবা "এই সকল বিপদের দ্বারা ঈশ্বরের কি মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়," এইরূপ আলোচনাতে প্রবৃত্ত হন। কখনও বা দেখিতে পাই, ঐতিহাসিক বা রাজনীতিবিৎ পণ্ডিতেরা, কোন্ কোন্ কারণের সমাবেশে এই সকল দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটে, তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন। এই সকল প্রশ্নের আলোচনাতেও যে উপকার আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যখন আমাদের উপাসনামন্দিরে ধর্মমণ্ডলীরূপে মিলিত হই, তখন আমাদের মন অন্যভাবে পূর্ণ হয়। তখন মনে কেবল এই চিন্তা জাগে যে, প্রভু পরমেশ্বর এই বিপদ ও দুঃখের অবস্থাতে আমাদের জন্য কি কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আমাদের নিকটে কি-সেবা চাহিতেছেন। এবং মন বলে, তত্ত্বের প্রশ্ন, ইতিহাসের প্রশ্ন, রাজনীতির প্রশ্ন, অপেক্ষা করিতে পারে; কিন্তু এই দুঃখের ও বিপদের মধ্য দিয়া আমাদের হৃদয়দ্বারে ঈশ্বরের দিক হইতে যে কর্ত্তব্যের আহ্বানটি আসিতেছে, তাহাকে অপেক্ষা করানো চলে না। প্রশ্ন মীমাংসার দাবী পরে, কর্ত্তব্যের দাবী আগে।

মানবজীবনের ও মানবসমাজের সকল দুঃখ সংগ্রামই আমাদের কাছে নানা পবিত্র কর্ত্তব্যের অবসর লইয়া উপস্থিত হয়। মানুষের জীবনের প্রত্যেক বিপদ ও দুঃখই, তাহার নিজের জন্য ঈশ্বরে নির্ভর শিক্ষার অবসর, পরম জননীর কোলে ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিবার অবসর; এবং বন্ধুজনের পক্ষে সেই বিপন্নের প্রতি সহানুভূতি দয়া ও প্রেম প্রকাশ করিবার অবসর। আমাদের দয়া ভালবাসা কোথায় থাকিত, মানবজীবনে যদি সংগ্রাম না আসিত? বুদ্ধ বুদ্ধ হইয়াছিলেন, যীশু Man of sorrows এই গৌরবময় আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, John Howard, Florence Nightingale, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মানুষের প্রাতঃস্মরণীয় হইতে পারিয়াছিলেন, মানবসমাজ দুঃখের আধার বলিয়া।

এই সকল মহাপুরুষ ও মহানারীগণের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যদি সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের কথা ভাবি, তাহাতেও দেখিতে পাই, আমাদের সব ভালবাসার প্রকৃত সার্থকতা হয় পরস্পরের দুঃখের বোঝা বহন করিয়া। মায়ের মাতৃত্ব কিসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায়? সন্তানকে খাওয়াইবার সময় নয়, গলা জড়াইয়া তাহাকে আদর করিবার সময় নয়; কিন্তু, স্নেহ দিয়া তাহার দুঃখ দূর করিবার সময়। মা মনে রাখেন, "আমার বাছার জন্য সংসারপথে কত ব্যথা আছে, কত কাঁটা আছে; মানুষের কর্কশ ব্যবহার, তাড়না, ভর্ৎসনা আছে; তাহার বিফলতার ও ভগ্ন আশার ক্লেশ আছে, তাহার রোগশোকের যাতনা আছে।" মায়ের মন পূর্ব্ব হইতেই এ সকল ভাবিয়া লয়; এবং তাঁহাকে যে এই সকল অবস্থার মধ্যে সন্তানকে স্নেহের আশ্রয় দিতে হইবে, সন্তানের জন্য মায়ের কর্ত্তব্যটি করিতে হইবে, তার জন্য মায়ের মন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতেই মায়ের মাতৃত্ব। জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই মাতৃস্নেহ এমন মূল্যবান্।

তেমনি দাম্পত্যপ্রেমে। "জীবনে দুঃখ আছে, সংগ্রাম আছে, একাকিত্ব আছে, বিফলতা আছে, রোগশোক আছে। সে সকল সময়ে তোমার পাশে দাঁড়াইবে কে? তোমার বোঝার অংশ লইবে কে? আমি তার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া তোমার পাশে দাঁড়াইলাম"—এই হইল প্রকৃত প্রণয়ের কথা। জগতে দুঃখ সংগ্রাম আছে বলিয়াই পারিবারিক প্রেম এত মূল্যবান্।

বিশ্বাসী মানুষের মন বলে, "হে প্রভু, সুখ সম্পদ ও স্বাস্থ্যকে তুমি অস্থায়ী করিয়াছ, ভঙ্গুর করিয়াছ। কেন এ বিধি করিয়াছ, তাহার সব মর্ম্ম আমরা বুঝি না। কিন্তু অন্ততঃ এইটুকু বুঝি যে, সংসারে দুঃখ দারিদ্র্য রোগ ও মৃত্যু না থাকিলে, আমাদের ভালবাসা ফুটিত না, জাগিত না, তাজা থাকিত না।"

তেমনি বিশ্বাসীর মন এ কথাও বলে, "হে প্রভু, জনসমাজে দুর্ভিক্ষ ও রোগের আক্রমণ কেন আসে, তাহা জানি না। কিন্তু অন্ততঃ এইটুকু বুঝি যে, এই সকল ব্যাপক দুঃখ জগতে না আসিলে, জনসমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর পরস্পরের জন্য ব্যাকুল হইত না, পরস্পরের জন্য কাঁদিতে শিখিত না।"

প্রত্যেক মানুষের যেমন একটি হৃদয় আছে, জনসমাজের এক এক স্তরেরও যেন তেমনি একটি হৃদয় আছে, যদ্দ্বারা সেই স্তরের মানুষ অপর-অপর স্তরের মানুষের ভাব বোঝে, আকাঙ্ক্ষা বোঝে, দুঃখ বেদনা বোঝে; যাহার দ্বারা ধনী ও দরিদ্র, রাজপুরুষ ও প্রজা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, নাগরিক ও গ্রামবাসী, পরস্পরকে বোঝে, শ্রদ্ধা করে, ও সহানুভূতি দান করে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে মানবের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের এই হৃদয়, পরস্পরের সম্বন্ধে যেন উদাসীনতায় নিদ্রিত হইয়া থাকে, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিকৃত হইয়া থাকে। এক এক বার দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতি বিপদ আসিয়া আমাদের নিদ্রিত মনকে, আমাদের দরিদ্র ভাই বোনদের সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেয়। এই জন্য বলা যায়, এই সকল বিপদ যেন বিধাতার ডাক,—"যাদের কথা ভুলে রয়েছিলে, তাদের কথা আজ ভাব" তাদের জন্য আজ বেদনা অনুভব কর; তাদের জন্য আজ যেটুকু পার, ত্যাগস্বীকার কর।" বিধাতার সেই ডাক আজ আসিয়াছে। যিনি যাহা পারেন, করিবার জন্য অগ্রসর হউন।

পৃথিবীতে কেন দুর্ভিক্ষ হয়, জানি না। কোন দিন মানুষ সম্যক্‌রূপে জানিয়া ইহার শেষ মীমাংসা ও শেষ প্রতীকার করিতে পারিবে কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু আজ তো দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। কেন আসিল, তাহা জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে আমাদের জন্য ডাক আসিয়াছে; আমাদের প্রাণ আজ কাঁদা চাই-ই, আমাদের আজ ত্যাগস্বীকার করা চাই-ই, আমাদের সচ্ছলতা হইতে, আমাদের উদ্বৃত্ত ও সঞ্চিত অর্থ হইতে, একটু কর্ত্তন করিয়া ক্ষুধার্ত্তের জন্য দেওয়া চাই-ই

নতুবা আমাদের ঈশ্বরের নাম করা বৃথা; আমাদের ভদ্রলোক হওয়া বৃথা।

দেশব্যাপী দুঃখ বিপদের ইহা এক মহান্ অধিকার। ইহা জনসমাজের এক স্তরের হৃদয়কে অপর স্তর সম্বন্ধে সজাগ করে, সদয় করে। কিন্তু দুঃখ বিপদ শুধু কি ধনীর প্রাণকেই দরিদ্রের জন্য কাঁদায়? তা নয়। আমরা কি রোগের যাতনায়, শোকের বেদনায়, আমাদের দাসদাসীর কিংবা দরিদ্র প্রতিবেশীর সজল চক্ষু দেখিয়া ও সরল সহানুভূতির দুটি কথা শুনিয়া প্রাণে অপূর্ব্ব সান্ত্বনা অনুভব করি না? মানবজীবনের গভীরতম দুঃখ-বেদনায় সব মানুষ এক হইয়া যায়। পুরাণে, নির্ব্বাসিত রামচন্দ্রের প্রতি গুহকের সদয় ব্যবহারের কথা, এবং ইতিহাসে রাজা আল্‌ফ্রেডের বিপদে ও রাণা প্রতাপ সিংহের দুঃখে দরিদ্র প্রজাগণের দয়া ও সমবেদনার কথা, চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। জনসমাজের সেই অতীত যুগের কথা ভাবিলেও মন স্নিগ্ধ হইয়া যায়। জগতে এমন একটি যুগ ছিল যখন জনসমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে এইরূপ পরস্পরের প্রতি সমবেদনা ও সহায়তার সম্বন্ধটিই প্রধান ছিল, সে কথা ভাবিলেও মন স্নিগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু হায়, এখন আর যেন তাহা থাকিতেছে না। এখন অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠার নামে, অথবা লাভের ন্যায়সঙ্গত অংশবিভাগ করিয়া দিবার নামে, সেই সমবেদনা ও সহায়তার স্থানে প্রতিযোগিতার নিয়মকে ডাকিয়া আনা হইতেছে। এ যুগ যেন প্রতিযোগিতার যুগ, কাড়াকাড়ির যুগ, strike এর যুগ। আমি অর্থনীতিবিৎ নহি; আমি এ সকলের ভাল মন্দ বিচারে অনভিজ্ঞ। কিন্তু সে-ব্যবস্থার ফলে পৃথিবীতে পণ্য দ্রব্য ক্রমশঃ সস্তা হয়, কিন্তু জনসমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এক সময়ে পরস্পরের প্রতি যে-আত্মীয়তা বোধ, যে-সমবেদনা ও যে-সহানুভূতিটি ছিল, তাহা ক্রমশঃ দুর্লভ হইয়া উঠে, তাহাকে কিছুতেই জনসমাজের পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থা বলিয়া আমি মানিতে পারি না।

অর্থনীতির প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মের দিকে আবার দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনি। ধর্ম্ম, মানুষের জীবনে যতরূপ কর্ত্তব্য সৃষ্টি করিয়া দেন, তাহার মধ্যে প্রধান কর্ত্তব্য মানুষের প্রতি। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দেয় কি? তাহা প্রেম ও ভক্তি, নির্ভর ও আনুগত্য। তিনি তাঁহার নিজের জন্য আমাদের নিকটে আর কিছু চাহেন না। তিনি তাঁহার ভক্তকে বলেন, "তুমি আমাকে সেবা করিতে চাও? তবে মানুষের সেবা কর। মানুষের সেবা করিলেই আমার সেবা করা হয়।" সকল ধর্ম্মেই এই উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যীশুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "যে-সেবা তুমি তোমার সামান্যতম তুচ্ছতম ভাইয়ের জন্য কর, সেই সেবা আমাকেই করা হয়।" হিন্দু শাস্ত্রের শিক্ষা এই যে ভগবান্ দরিদ্রের ও আর্ত্তের রূপ ধারণ করিয়া মানুষের সেবা গ্রহণের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হন। মুসলমান ধর্ম্মেও জনসমাজের সেবা করা ও তাহার কল্যাণার্থ দান করা ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। পাটনায় একজন ৭০ বৎসর বৃদ্ধ মুসলমান ডাক্তার আছেন। তিনি আমাদের অতি সহৃদয় ও প্রেমিক বন্ধু। ৩০ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া তিনি সেথানকার ব্রাহ্মদিগকে সকল প্রকার আপদে বিপদে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এ বিষয়ে তিনি ব্রাহ্মের অপেক্ষাও অধিক তৎপর। আমরা যতদিন পাটনায় ছিলাম, আমাদের অনুরোধে বিনা-দর্শনীতে তিনি যে কত দরিদ্রের চিকিৎসা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। একবার স্বর্গীয় ভাই প্রকাশদেবজী তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে গিয়াছিলেন। সেই মহানুভব ডাক্তারটি ভাইজীকে বলিলেন, "আমি এমন কি করিয়াছি, যাহার জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করিব? মানুষের কাজই তো এই, মানুষের জন্যই তো এই জন্য!" এই বলিয়া তিনি এই উর্দ্দু বচনটি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেন :—

"দর্দে দিল্‌কে লিয়ে পয়্‌দা কিয়া ইন্‌সান্ কো,
ওর্‌না ইতাঅৎ কে ওয়াস্তে কম্ ন থে করুবী বিয়াঁ",

অর্থাৎ, "ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি কর্‌লেনই কেবল পরস্পরের ব্যথার ব্যথী হ'বে ব'লে; কারণ, তাঁর স্তুতি-বন্দনা কর্‌বার জন্য তো স্বর্গের দেবাত্মাগণই যথেষ্ট ছিলেন।" ঠিক কথা! সেই মহান্ পরমেশ্বরের যদি স্তুতি-বন্দনার প্রয়োজন হইত, তবে উন্নত স্বর্গলোকে অমরাত্মাগণ তাঁহার যে স্তুতি-বন্দনা করেন, তাহাই তাঁহার গ্রহণীয় হইত; মানবের ক্ষীণ কণ্ঠ ও ক্ষুদ্র বর্ণনাশক্তি সে বন্দনার তুলনায় অতি তুচ্ছ। কিন্তু ঈশ্বর যে নিম্নে এই মর্ত্ত্যভূমিতে, রোগশোকক্ষুধাতৃষ্ণার ক্ষেত্র এই পৃথিবীতে, মানুষকে জন্ম দিয়াছেন, তাহা কেবল এই জন্য যে মানুষেরা পরস্পরের ব্যথার ব্যথী হইবে। ঈশ্বর দেবতার কাছে চাহেন স্তুতিগান, কিন্তু মানুষের কাছে চাহেন প্রধানতঃ পরস্পরের প্রতি সমবেদনা ও পরস্পরের সেবা।

সংসারক্ষেত্রে মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্বের ও প্রতিযোগিতার সীমা নাই। উচ্চ ও নীচ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রতিদিনের প্রতিযোগিতার দ্বারা জনসমাজের বায়ু যেন দূষিত হইয়া যায়; মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক সহানুভূতি ও 'দরদ' যেন শুকাইয়া যায়। তখন মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ রোগ প্রভৃতি, ঝড় বৃষ্টির মত' আসিয়া যেন সে বায়ুকে শুদ্ধ করে; যেন মানব হৃদয়ের রুদ্ধ দয়া ও সমবেদনার স্রোতকে আবার প্রবাহিত করিয়া দেয়। ব্যাপক দুঃখ বিপদের ইহাই পরম সার্থকতা।

ভগবান্ আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখের দ্বারা আমাদের যে কল্যাণ করেন, সে কল্যাণ ভাল করিয়া লাভ করিতে হইলে তাহার জন্য কিছু সাধনার প্রয়োজন হয়। তেমনি, তিনি জনসমাজের ব্যাপক দুঃখের দ্বারা আমাদের যে কল্যাণ করেন, তাহা লাভ করিবার জন্যও কিছু সাধনার প্রয়োজন হয়।

প্রথম কথা এই মনে হয় যে, দয়াবৃত্তির চর্চ্চা করিতে হইলে, সহানুভূতির সাধন করিতে হইলে, দুঃখীকে দেখা চাই, তাহার সংস্পর্শে আসা চাই। শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি মূলমন্ত্র এই যে, শ্রবণ অপেক্ষা দর্শন শ্রেষ্ঠ, এবং দর্শন অপেক্ষা স্পর্শ শ্রেষ্ঠ। যে বস্তুটিকে ভাল করিয়া জানিতে চাও, তাহার সম্বন্ধে শুধু শ্রবণ অথবা অধ্যয়ন করিয়া ক্ষান্ত হইও না; তাহাকে শুধু দেখিয়াও সন্তুষ্ট হইও না; তাহাকে হস্ত-দ্বারা স্পর্শ কর, তাহার সহিত যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠ সংস্রবের

মধ্যে এস। বিশ্ববিধাতা জনসমাজের ব্যাপক দুঃখের দ্বারা আমাদিগকে যে শিক্ষা দিতে চান, তাহার সম্বন্ধেও সেই কথা। দূর হইতে ক্ষুধিতের বিবরণ শুনিয়া সাহায্যের জন্য অর্থদান করা অপেক্ষা, ক্ষুধিতকে চক্ষে দেখিয়া দান করাতে অধিক উপকার। যাহার পক্ষে সম্ভব, তিনি শুধু অর্থদান করিয়াই তৃপ্ত হইবেন না; দুর্ভিক্ষ-পীড়িতকে নিজে গিয়া দেখিয়া আসুন, শরীর দিয়া তাহার সেবা করিয়া আসুন, অনেক অধিক উপকৃত হইবেন। এই জন্য, নিজ প্রতিবেশী অথবা স্বগ্রামবাসী অথবা পরিচিত মানুষের ব্যক্তিগত সেবা করা, দূর হইতে দান করা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ভগবানের বিধি এই যে, সুখে দুঃখে মানুষ মানুষের যথাসম্ভব কাছে-কাছে থাকিবে ও শরীর দিয়া পরস্পরের সাহায্য করিবে। কিন্তু মানুষ নানা কৃত্রিম নিয়ম সৃষ্টি করিয়া পরস্পর হইতে দূরতাই বৃদ্ধি করিতেছে। এখন যেন দয়ার দানটাও, কলিকাতার কলের জলের মত, নলের সাহায্যে পরিবেশন করা হয়। ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল নিজে হাতে তুলিয়া ভাইয়ের হাতে দিবার ও তাহার মুখখানি দেখিবার সুযোগ অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। ইহাতে আমরা ভগবানের প্রেরিত দুঃখ-বিধির শ্রেষ্ঠ উপকার হইতে বঞ্চিত হই।

দ্বিতীয়তঃ, দয়াবৃত্তিচর্চ্চার শ্রেষ্ঠ স্থান সভাসমিতিতে নয়, নিজ পরিবারে। যাহার পক্ষে সম্ভব, দরিদ্রের জন্য অর্থদানের সঙ্কল্পটা সভাসমিতিতে বসিয়া করিবেন না; নিজের অফিসকক্ষে চাঁদা-আদায়কারীর সম্মুখে বসিয়াও করিবেন না; নিজ পরিবারের সঙ্গে একত্র বসিয়া, তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাহাদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা যেখানে উদ্রিক্ত হয়, সেখানে সেই স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে এই দয়াবৃত্তিকে মিশিতে দিয়া দানের সঙ্কল্পটা স্থির করুন। বাঙ্গালীর সব কাজ হুজুগের আকার ধারণ করে। সভাসমিতি না হইলে বাঙ্গালীর মনে সৎসংকল্প জাগে না। জাতীয় জীবনের সারবত্তার লক্ষণ ইহা নয়। স্বর্গীয় শিবনাথশাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মচরিতে আপনারা পাঠ করিয়া থাকিবেন, তিনি লণ্ডনে যে পরিবারে বাস করিতেন, তাহা দরিদ্র পরিবার ছিল। সেই পরিবারের মাতা ও বয়স্কা কন্যাগণ পর্দ্দা সেলাই করিতেন, বৃদ্ধ পিতা তাহা ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেন; এইরূপে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক হিসাব শেষ করিবার পর সেই পরিবারে প্রায়ই এইরূপ আলোচনা হইত যে, "সংবাদপত্রে দেখা গেল, অমুক স্থানে একটি জনহিতকর কার্য্যের সূচনা করা হইয়াছে, এস দেখি, আমরা তাহাতে কি সাহায্য করিতে পারি।" হিসাব করিয়া সপ্তাহের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রেরণ করা হইত। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, সেখানে ভাল ভাল পরিবারে এইরূপে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে দান করা পারিবারিক জীবনের, পারিবারিক সম্মিলনের, পারিবারিক সুখশান্তি সম্ভোগের একটি অঙ্গস্বরূপ। সেখানে বাড়ীতে বাড়ীতে এইরূপে habit of givingএর চর্চ্চা করা হয় বলিয়া, কোনও সৎকার্য্য অর্থাভাবে নষ্ট হয় না। জল যেমন নিম্নাভিমুখে আপনি ধাবিত হয়, সদনুষ্ঠানের দিকে জনসমাজের অর্থ সে দেশে তেমনি আপনা আপনি প্রবাহিত হয়। আর এ দেশের কি বিপরীত অবস্থা! কত কাকুতি মিনতির অথবা কত বক্র প্রলোভনের সাহায্যে এ দেশে সৎকার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়! কবে বাঙ্গালীর পরিবারে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মের পরিবারে, এই রূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের ধারাটি প্রবর্ত্তিত হইবে?

কলিকাতায় আমার একজন ব্যবসায়ী বন্ধু আছেন, তিনি বাঙ্গালী নহেন। তিনি সৎকার্য্যে দানের জন্য নিজ আয়ের একটি নির্দ্দিষ্ট শতকরা হার স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। আমাকে মাঝে মাঝে কোন কোন দরিদ্র পরিবারের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিতে তাঁহার কাছে যাইতে হয়। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কার্য্যে অর্থ চাহিলে তিনিই আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বলেন, "আমার অর্থের সদ্ব্যয়ের উপায় দেখাইয়া দিয়া আপনি আমার পরম উপকার করিতেছেন।" একবার যখন তাঁহাদের ব্যবসায়ে খুব আয় হইতেছিল, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মের জন্য ও দরিদ্রের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট টাকা আমাদের নিকট হইতে লইবেন; দেখিবেন, যেন আমরা ধনের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হইয়া না পড়ি।" কয়েকদিন হইল, ব্রাহ্মসমাজের কোনও কাজের সাহায্যের জন্য তিনি আমার হাতে কিছু টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। পরদিনে কিছু টাকা ও সেই সঙ্গে তাঁহার এক পত্র আসিয়া উপস্থিত। পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "কাল অফিসে গিয়া দেখিলাম, আমার এক কর্ম্মচারীর একটি ভুলের জন্য হঠাৎ আমার এক হাজার টাকার ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষতির জন্য আপনাকে প্রতিশ্রুত টাকা দিবার আমার আর উপায় ছিল না। কিন্তু অমুক তারিখে আমার স্ত্রীর জন্মদিন। জন্মদিনে তাঁহাকে আমি তাঁহার নির্ব্বাচিত কোনও বস্তু উপহার দিব বলিয়া কিছু টাকা রাখিয়া দিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী আপনা হইতে সেই উপহারের পরিবর্ত্তে এই টাকা আপনাকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। এই টাকা তাঁহারই দান বলিয়া আপনি গ্রহণ করিবেন।" এই বন্ধুর ও বন্ধুপত্নীর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। ইঁহাদের কথা স্মরণ করিলে হৃদয় উন্নত হয়। পতি পত্নী ও সন্তান, সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া সৎকার্য্যে এইরূপ অর্থদান, এবং "দান করিয়া আমরাই ধন্য হইলাম" এইরূপ অনুভব,—ব্রাহ্মদের পরিবারে পরিবারে কবে এই ধারাটি প্রবর্ত্তিত হইবে?

স্ত্রী পুত্র কন্যার সহিত একত্রে পরামর্শ করিয়া দানের সঙ্কল্প করিলে, সে দানের সঙ্কল্পের দ্বারা আপনাদের নিত্য ব্যয়ের অঙ্ককে নিয়মিত করিলে, এবং "দান করিয়া আমরা ধন্য হইতেছি" এই ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া দান করিলে, যে-উপকার লাভ হয়, সভা সমিতির উত্তেজনার মধ্যে দানের সঙ্কল্প করিলে সে উপকার লাভ হয় না। ভগবানের বিধি এই যে, জনসমাজের প্রত্যেক ব্যাপক দুঃখ তাহার প্রত্যেকটি পরিবারের হৃদয়কে আলোড়িত করিবে, ও সে পরিবারের দয়াবৃত্তিকে সতেজ রাখিবে। এবং যেমন ব্যক্তিগত দুঃখ ব্যক্তিগত জীবনকে সুদৃঢ় ও সারবান্ করিয়া তোলে, জনসমাজের ব্যাপক দুঃখও তেমনি জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় ও সারবান্ করিয়া তুলিবে। সেই সারবত্তা সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র পরিবার; সভাসমিতি নহে।

আমার শেষ কথা এই যে, দানের মূল্য ত্যাগে সহানুভূতিতে ও শ্রদ্ধায়। দুর্ভিক্ষের জন্য বা কোনও প্রতিষ্ঠানের জন্য আমোদের আয়োজন করিয়া পাঁচ হাজার টাকা তোলাতে জনসমাজের যে-উপকার হয়, মানুষের বিশুদ্ধ দয়াবৃত্তিকে জাগাইয়া ও শুধু তাহাকে স্পর্শ করিয়া পাঁচ টাকা তোলাতে তাহার অপেক্ষা অধিক স্থায়ী উপকার হয়। যদি জনসমাজ দিনে দিনে এই অভ্যাসের শিক্ষাটি পায় যে, আমোদ না হইলে টাকার মুষ্টি খুলিব না, তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা যাইবে যে, জনসমাজের হৃদয় হইতে দয়াবৃত্তি এবং তদানুষঙ্গিক সমুদয় শ্রেষ্ঠ বৃত্তি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; এবং এক সর্ব্বগ্রাসী আমোদস্পৃহাই সে সকলের স্থান অধিকার করিতেছে। মানব-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠবৃত্তিসকলকে জীবিত রাখা, অম্লান রাখা, সতেজ রাখা, ব্রাহ্মসমাজের সব চেয়ে বড় কাজ। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা এই কথা বলি,—"আমোদের সর্ত্ত করিয়া সাহায্য দান করিও না। কিন্তু, দুঃখীর জন্য ব্যথিত হইয়া দান কর, আপনাকে কোনও বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া দান কর; 'দান করিয়া আমরা ধন্য হই', ইহা অনুভব করিয়া দান কর; ক্ষুধিতের জন্য কিছু না করিলে নিজের অন্ন মুখে তুলিতে পারি না, মনকে এই অবস্থায় লইয়া আসিয়া দান কর।"

শিবনাথশাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন হইতে একটি দৃষ্টান্ত বলি। এক দিন তিনি বেলা দশটার সময় স্নান করিয়া স্নানের ঘর হইতে নিজ কক্ষে যাইবার পথে পত্নীকে বলিয়া গেলেন, "আমার ভাত বাড়।" তৎপরে নিজ কক্ষে গিয়াই সমাগত একজন লোকের মুখে সংবাদ পাইলেন যে, অমুক দরিদ্র ব্রাহ্মের বাড়ীতে অত্যন্ত অর্থকষ্ট উপস্থিত, এমন কি আজ সকালে এখন পর্য্যন্ত তাহাদের রান্নার কোনও আয়োজন হয় নাই। শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ চাদর ছাতা ও কয়েকটি টাকা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। ভাত বাড়া হইতেছিল, তাহা রাখিয়া দিতে বলিলেন। প্রস্তুত অন্ন আহার করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য পত্নী কত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তাহা শুনিলেন না। নিজে বাজারে গিয়া চাউল ডাল তরকারী ইত্যাদি ক্রয় করিয়া, মুটের মাথায় তাহা দিয়া, সেই দরিদ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে রন্ধনের আয়োজন করিতে বলিয়া এবং সহৃদয় বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া পত্নীকে বলিলেন, "এই বার আমায় ভাত দাও।"

সাধু পুরুষের এই রূপই ব্যবহার! যাহার মধ্যে মানুষের প্রাণ আছে, তাহার মনের অবস্থা এই রূপই হয়। দুঃখীর দুঃখের কথা শুনিলে সে স্থির থাকিতে পারে না। আমাদের যে প্রতিদিন বাড়া ভাত রাখিয়া দিতে হইবে তা নয়; কিন্তু প্রতিদিন অন্নগ্রহণের পূর্ব্বে যেন নির্ম্মল বিবেকের এই বাণী শুনিতে পাই যে, ক্ষুধিতের জন্য আমার যেটুকু করিবার ছিল, তাহা করিয়াছি। আজ সকলকে বলি, যার যা সাধ্য আছে, দিতে অগ্রসর হও। আমার সাধ্য কম বলিয়া কম দিতে কোনও সঙ্কোচ নাই। যার সাধ্য এক পয়সা মাত্র, যদি তার পিছনে তার প্রাণের তাজা দয়া থাকে, তবে ধনীর হেলায় প্রদত্ত একটি টাকার চেয়ে তা অধিক আদরণীয়। আমি কম দিলাম, কি বেশী দিলাম, অথবা কে কম দিল, কে বেশী দিল, তাহা ভাবিবার দরকার নাই; "আমার যতটুকু সাধ্য, তার চেয়ে আমি কম দিব না," এই ভাবটি থাকা চাই। যিনি ক্ষুধার মালিক, এবং যিনি অন্নেরও মালিক, তিনিই ক্ষুধিতের অন্নের ব্যবস্থা করেন; আমরা এবং আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা তো নিমিত্ত মাত্র। এই জন্য বলি, আমি কম দিতে পারিতেছি বলিয়া চিন্তিত হইও না। দুঃখীর বেদনা প্রাণ দিয়া অনুভব কর, এবং যাহার যাহা শক্তি আছে, দাও! ঈশ্বর নিজে চাহিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়া, যাহার যাহা শক্তি আছে দাও! তাঁর ডাক শুনিয়া দাও! আমাদের ঈশ্বরপূজা, ঈশ্বরের সন্তানের সেবার দ্বারা সম্পূর্ণ হউক, ধন্য হউক।

হে প্রভু, তুমি সকলের হৃদয়কে স্পর্শ কর। ক্ষুধিতের ক্রন্দনের মধ্যে তোমার ডাক যেন প্রাণে শুনতে পাই; যেন প্রাণ উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে; যেন দিয়ে ধন্য হবার জন্য উন্মুখ হই। যে দানের পশ্চাতে ত্যাগ, যার পশ্চাতে ভাই বোনের প্রতি সহানুভূতি, ও তোমার ডাকের প্রতি শ্রদ্ধা, যে দান আমাদের দৈনিক আরামকে দৈনিক ব্যয়কে নিয়মিত ক'রে আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্র, পারিবারিক চরিত্র ও জাতীয় চরিত্রকে সারবান্ করে, সেই পবিত্র দানের অভ্যাস তুমি আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর, তোমার চরণে এই ভিক্ষা করি।

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (২)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টী ও অক্লান্ত সেবক ভক্তিভাজন কালীকুমার গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় ১২৯৮ সনের ১৮ই চৈত্র ৫৭ বৎসর বয়সে শান্তিদাতা বিধাতার অমৃতক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি কাকিনা ব্রাহ্মসমাজকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মমন্দির ও ছাত্রসমাজগৃহ তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কার্য্যে তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরিক পবিত্রতা ও মন্দিরের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য রক্ষার প্রতি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রচারক আগন্তুক কি অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্রাহ্ম ও হিন্দু পণ্ডিতগণকে সাদরে সেবা যত্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস ও আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল এবং আহার নিদ্রা ভুলিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি আধুনিক ভাবে শিক্ষিত বা বক্তা ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ও চরিত্রের আদর্শে এবং আন্তরিক স্নেহ ও প্রীতির আকর্ষণে অনেক বালক যুবক বৃদ্ধ ও ভ্রান্ত পথিকগণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। তাঁহার অভাবে কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। তিনিই ব্রাহ্মসমাজের অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। তিনি চিকিৎসক ভাবে সাধারণের কত যে উপকার করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তিনি যেমন সকলকে অত্যন্ত প্রীতি ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাঁহারাও তাঁহাকে তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। কাকিনাতে তাঁহার মত সর্ব্বজনীন শ্রদ্ধার পাত্র অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে

সর্ব্বজাতির প্রায় শতাধিক লোক সংকীর্ত্তনাদি করিতে করিতে শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়াছিলেন।

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টী ভক্তিভাজন কালীকুমার গুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনের পর ১৩০০ সনের ২৪শে চৈত্র শ্রদ্ধেয় অনাথবন্ধু রায় মহাশয় রাজা মহিমারঞ্জন কর্ত্তৃক ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা সুখদাসুন্দরী গুপ্তা কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মহিলা সমিতির আদর্শে কাকিনাতে একটী মহিলা সমিতি স্থাপন করিবার জন্য কাকিনার ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসিনী কয়েকটী মহিলাকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে শ্রীযুক্তা শ্যামাময়ী গুপ্তা, স্বর্গীয়া মোক্ষদাসুন্দরী রায় এবং স্বর্গীয়া ষোড়শীবালা দাশ প্রভৃতি কয়েকজন মহিলার বিশেষ উৎসাহে এবং উপাচার্য্য গৌরলাল রায় ও শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র গুপ্তের উদ্যোগে ১৩০০ সনের মাঘোৎসবের সময় কাকিনাতে একটী মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়; শ্রীযুক্তা সুখদাসুন্দরী গুপ্তা তাহার সম্পাদিকা মনোনীত হইয়াছেন। উপাচার্য্য গৌরলাল রায় মহাশয় এই মহিলা সমিতির উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা ও শ্রম করিয়াছেন। প্রতি বৎসর বৈশাখোৎসব ও মাঘোৎসবের সময়ই মন্দিরে এই মহিলা সমিতিরও উৎসব হইয়া থাকে। তাহাতে হিন্দু ও ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন প্রায় ৪০।৫০ জন মহিলা সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা, সঙ্গীত ও স্বরচিত ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করিয়া থাকেন। মাঘোৎসবের সময় প্রায় সকলেই যথাসাধ্য চাঁদা দিয়া থাকেন। এই সংগৃহীত চাঁদার টাকা মহিলাদেরই মতানুসারে দুর্ভিক্ষ মহামারীতে, গৃহদাহে ও জলপ্লাবনে ক্লিষ্ট লোকদের অথবা কোন দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যের জন্য দান করা হয়। কাকিনার বর্ত্তমান রাণী শ্রীযুক্তা শান্তিবালা চৌধুরাণী কিছু দিন এই মহিলা-সমিতির সভানেত্রী হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় গৌরলাল রায় মহাশয়ের উদ্যোগে প্রথম প্রথম প্রতি বৃহস্পতিবার কোন কোন মহিলার বাসায় অল্পদিন মাত্র সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। কাকিনা মহিলা সমিতির মহিলাদিগকে প্রথমাবস্থায় নানা প্রকার নিন্দা ও উপদ্রব ভোগ করিতে হইয়াছিল।

১৩০৩ সনের ২৪শে অগ্রহায়ণ শ্রদ্ধেয় প্যারীমোহন সেন মঃ "মা কোলে লও" বলিয়া বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুগায়ক প্যারীমোহন হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত দ্বারা সকলকে মোহিত করিতেন।

১৩০৩ সনে কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের প্রারম্ভকালের উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় পরলোকগমন করেন। তৎপূর্ব্বেই পণ্ডিত গুরুচরণ সরকার বিদ্যা-রঞ্জন মহাশয়, (যিনি ধর্ম্মসভায় গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন) পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রলয় ভূমিকম্পে কাকিনা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের পূর্ব্বাংশ ভূমিসাৎ হওয়ায় তাহা অব্যবহার্য্য হয়। তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদি যাবতীয় কার্য্য ছাত্র-সমাজ গৃহে হইয়াছে। তদানিন্তন উপাচার্য্য ও সম্পাদক শ্রদ্ধেয় গৌরলাল রায় মহাশয় এই ভগ্নমন্দিরের সংস্কারের জন্য মহাত্মা মহিমারঞ্জনের নিকট আবেদন করেন। উক্ত মহাত্মা নিজ বাটী ভগ্নাবস্থায় থাকা সত্ত্বেও রাজসরকারের ব্যয়ে ব্রহ্মমন্দির মেরামতের আদেশ করেন। তদনুসারে শ্রদ্ধেয় গৌরলাল রায় মহাশয়ের প্রযত্নে ও অক্লান্ত শ্রমে কাকিনা ব্রহ্মমন্দিরের পুনঃ সংস্কার হইয়াছে। ইহাতে রাজসরকারের সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

১৩১০ সালের ২৪শে বৈশাখ কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী শ্রদ্ধেয় অনাথবন্ধু রায় মহাশয় পরলোক গমন করেন। তিনি একজন একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য যথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজের জোত জমার হিসাব পত্র অনেক সুশৃঙ্খল হইয়াছে। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পরিদর্শক ও সভ্য পণ্ডিত অক্ষয়কুমার দাশ মহাশয় পরলোক গমন করেন।

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের মেরুদণ্ড ও এক মাত্র পৃষ্ঠপোষক মহাত্মা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় ১৩১২ সালের ২০শে চৈত্র ৫৫ বৎসর বয়সেই সংসার ও বিশাল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া শক্তিদাতা বিধাতার অমর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই মহাত্মার ধর্ম্মজীবনের বিষয় সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা আমরা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। কারণ, কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের জীবনের সহিত মহাত্মা মহিমারঞ্জনের জীবনী সম্পূর্ণ ভাবে সংসৃষ্ট রহিয়াছে।

কাকিনাধিপতি স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের দত্তক পুত্র কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী ১২৬০ সনের ২২শে মাঘ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৯ বৎসর বয়সেই পিতৃ মাতৃ হীন হইয়া ভীষণ অসহায় অবস্থায় পতিত হন। এই সুযোগে, যাঁহার হস্তে তিনি নিঃসন্দেহে আহার করিতেন (হিতৈষীদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাহা ত্যাগ করেন নাই) সেই রক্ষকই তাঁহার প্রাণ নাশের জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। রাজা স্বয়ং বলিয়াছেন, সেই সময় তিনি একমাত্র ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে আহার বিহার করিয়াছেন, পরে কয়েকজন হিতৈষী অমাত্যের সাহায্যে এই সকল শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ১২৭৫ সনে স্বহস্তে জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। এবং সেই বৎসরই ১২ই মাঘ কাকিনার ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন। মহাত্মা মহিমারঞ্জন তৎকালীন ব্রাহ্মদের আদর্শে অনেকদিন পর্য্যন্ত নিরামিষ ভোজন করিয়াছেন এবং কাকিনা হইতে মদের দোকান ও বেশ্যালয় উঠাইয়া দেন। কিন্তু এই সকল্প তিনি বেশী দিন রক্ষা করিতে পারেন নাই। মহিমারঞ্জন মিষ্টভাষী, সদালাপী, চিন্তাশীল ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি রাজপরিবারস্থ জন্ম, বিবাহ ইত্যাদি শুভ ব্যাপারের প্রারম্ভে আত্মীয় স্বজন ও অমাত্যগণকে লইয়া রীতিমত ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, একদা রাজা মহিমারঞ্জন স্বয়ং তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার মহেন্দ্ররঞ্জনকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করা উপলক্ষে যে উপদেশ দেন, সেই সভায় কলিকাতার হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক কালিদাস বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ লোক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় এই সভায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে "এই হৃদয় গ্রাহী উপদেশ শ্রবণে আমরাও বিশেষ উপকৃত হইলাম" সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রাজা

মহিমারঞ্জনের বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়া বলিয়াছিলেন "এই সমস্ত বক্তৃতা তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইতে পারে।" রাজা মহিমারঞ্জন বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; সংস্কৃত ও পার্শীও তাঁহার কিঞ্চিৎ জানা ছিল। তিনি নিরাকার ঈশ্বর প্রতিপাদ্য উপনিষদাদি অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রারম্ভ হইতে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণিতত্ত্ব, জ্যোতিষ ইত্যাদি বহু গ্রন্থ এবং সাময়িক ইংরেজী ও বাঙ্গলা পত্রিকাদি নিয়মিত ভাবে অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু তাহাতে তাহার তৃপ্তি হইত না, তিনি সকলকে ডাকিয়া বা সভা করিয়া তাহার সংবাদ বিবৃত করিতেন কাকিনাতে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান বা মুসলমান প্রভৃতি যে কোন ধর্ম্মপ্রচারক আগমন করিতেন মহাত্মা মহিমারঞ্জন তাঁহাদের সঙ্গে অত্যন্ত প্রীতির ভাবে এবং আগ্রহের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। একদা হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক বিখ্যাত বক্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কাকিনা আসিয়া এক বিরাট সভায় সাকার দেবদেবীর পূজার্চ্চনার প্রাধান্য এবং হিন্দু শাস্ত্র ও যোগী সন্ন্যাসীদের অভ্রান্ততা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মহাত্মা মহিমারঞ্জন তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ, ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করায় এবং কয়েকজন প্রধান ভক্ত ব্রাহ্মের নাম উল্লেখ করায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ভীষণ ক্রোধান্বিত হইয়া, রাজা মহিমারঞ্জনকে এই সভাতেই অত্যন্ত গালাগালী করেন। ইহার প্রতিশোধ লওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উদার হৃদয় মহিমারঞ্জন, উক্ত প্রচারকের প্রতি বিরক্ত না হইয়া বরং তাঁহার প্রার্থনানুসারে কাশীর বেদবিদ্যালয়ে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। মহাত্মা মহিমারঞ্জন অনেক পুরাতন ভগ্ন মন্দির, মঠ, মস্‌জিদ স্বচক্ষে দেখিয়া নিজ ব্যয়ে মেরামত করিয়া দিয়াছেন। বিদ্যোৎসাহী মহিমারঞ্জন কাকিনায় ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সংস্কৃত টোল, মাদ্রাসা, নৈশ বিদ্যালয়, দিকপ্রকাশ পত্রিকা এবং শম্ভুচন্দ্র লাইব্রেরীর প্রায় সমস্ত ব্যয় ভার নিজে বহন করিয়াছেন। এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্যালয়েও রীতিমত সাহায্য দান করিয়াছেন এবং দরিদ্র ছাত্রদিগকে ভিন্ন স্থানে যাইয়া অধ্যয়নের খরচও দিয়াছেন। দয়ার সাগর মহিমারঞ্জন বহু অনাথ পরিবারের ভরণপোষণ ও ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত করিয়াছেন এবং কত যে দরিদ্র প্রজার খাজনা মাপ করিয়া দিয়াছেন তাহা বলা সুকঠিন। তিনি নিজে জামিন হইয়া কাহারও কাহারও জমিদারী ও সম্পত্তি রক্ষা করিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা মহিমারঞ্জন সর্ব্বসাধারণের সুচিকিৎসার জন্য কাকিনাতে এলোপেথী, হোমিওপেথী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া তাহাদের এবং তাঁহার পিতার স্থাপিত আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য ঔষধালয়ের সমস্ত ব্যয়ই রাজ সরকার হইতে দিয়াছেন। পরদুঃখ কাতর মহিমারঞ্জন কঠিন রোগগ্রস্ত আত্মীয়, অমাত্য, এমন কি দরিদ্র কৃষকের ও ভিক্ষুকের অতি মলিন আবাসে স্বয়ং গমন করিয়া ঔষধ ও পথ্যাদি প্রদান করিয়াছেন। দয়ালু মহিমা রঞ্জনের কোমলহৃদয় কেবলই মানব দুঃখে বিগলিত হইত এমন নয়; নিরীহ পাখীগণও তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি আপন বিশ্রামাগারের চতুর্দ্দিকে পাখীর আহারীয় ফলের বৃক্ষ রোপণ করাইয়াছিলেন। তাহার ফল কেবল পাখীদিগকে আহার করাইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেন। এমন ধর্ম্মপ্রাণ বিদ্যোৎসাহী এবং দয়াল রাজা বঙ্গদেশে অল্পই দেখা যায়। মহাত্মা মহিমারঞ্জনের মুমূর্ষাবস্থায় কাকিনায় প্রায় সমস্ত ধনী, দরিদ্র, কৃষক ভিক্ষুক এমন কি অন্তঃপুরনিবাসিনী ভদ্র হিন্দু ও মুসলমান মহিলাগণ ও কৃষক রমণীগণ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহাকে শেষ দেখার জন্য প্রাণপণে দৌড়িয়া রাজভবনে গমন করিয়াছিলেন। এতদবস্থায় মহাত্মা মহিমারঞ্জন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন সভাপতি ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশমত "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এবং ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি ব্রহ্ম স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে উন্মীলিত নয়নে সকলের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি পাত করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দময় ব্রহ্মধামে চিরগমন করিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বজনীন মহাশোক দৃশ্য কাকিনায় আর কখনো দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। সেই দিনের সূর্য্যাস্তের সময় মহাত্মা মহিমা রঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কাকিনার সুখশান্তি যেন চির অস্তমিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই দুর্ঘটনার পর কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য এবং নিয়মিত উপাসক শ্রদ্ধেয় বনওয়ারীচন্দ্র চৌধুরী, নবদ্বীপচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার দ্বারকানাথ দে, সঙ্গীত আচার্য্য রাধিকানাথ রায়, তারকনাথ মৈত্রেয় ও যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অতি প্রাচীন কালের সভ্যগণ ক্রমে ২ পরলোক গমন করায় সমাজের প্রভূত বলক্ষয় হইয়াছে।

কাকিনার ব্রহ্মমন্দির স্থাপনাবধি, মহাত্মা মহিমারঞ্জনের অভিপ্রায় মত নিরপেক্ষ ভাবে ছিল অর্থাৎ আদি, নববিধান বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৩১৬ সনে সম্পাদক ও আচার্য্য গৌরলাল রায় মহাশয়ের আগ্রহে এবং কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের সকলের মতানুসারে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের সকলের মতানুসারে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও যে কোন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও ব্রাহ্মগণ কাকিনা ব্রহ্ম মন্দিরের বেদীতে বসিয়া উপাচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

শতবার্ষিক মহোৎসব।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য।

শতবার্ষিক মহোৎসব ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ সুমহৎ দানের জন্য ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসব। অন্যান্য উৎসবের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ইহা হইতে আমরা কেবল ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মভক্তি উপার্জ্জন করিয়া ও ব্রহ্মসহবাস জনিত আনন্দ উপভোগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিব না; তদতিরিক্ত নিজের দিক হইতে এমন কিছু করিব, যদ্দ্বারা লোকের কাছে ও ভগবানের কাছে প্রমাণ হয়, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বাস্তবিকই আমাদের হৃদয়ের প্রিয়বস্তু—ইহা পাইয়া বাস্তবিকই আমরা জীবনকে ধন্য বোধ করিতেছি। অন্যান্য বার্ষিক উৎসবাদিতে পাওয়ার দিকেই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে—জ্ঞান, ভক্তি, আশা আনন্দ ইত্যাদি স্বর্গীয় ধন পাওয়া। ইহা অতিশয় উৎকৃষ্ট লক্ষ্য সন্দেহ নাই; এ উৎসবেও এই লক্ষ্য অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু, এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসবে দেওয়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ থাকা যুক্তিযুক্ত—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের জন্য অর্থ, সময় ও শক্তি দেওয়া। এই সব দিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ (ঋষিঋণ) কার্য্যতঃ স্বীকার করিতে ও কিয়ৎ পরিমাণে পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যান্য উৎসবে কয়েকজন মাত্র উদ্‌যোগী হইয়া আয়োজনাদি করেন, অপর সকলে নিষ্ক্রিয় ভাবে উৎসব সম্ভোগ করেন; কিন্তু এ উৎসব কাহারও পক্ষেই নিষ্ক্রিয় ভাবে সম্ভোগ করিবার বস্তু নয়। কার্য্যতঃ কৃতজ্ঞতা না দেখাইলে, এ উৎসব বিশেষত্ব বর্জ্জিত হইয়া পড়িবে, এবং কর্ত্তব্যের ত্রুটিতে হয়ত ইহা ভাবুকতা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে। অন্য উৎসবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সকলে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া থাকেন; প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেন না; এ উৎসবে প্রয়োজন অপ্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল দিবার জন্যই দিতে হইবে। অন্য উৎসবে নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পাদনের জন্য, যাঁহারা পারেন

সুবিধামত কিছু কিছু সময় শক্তি দান করেন; এ উৎসবে প্রত্যেকেরই কিছু করিতে হইবে—করিবার জন্যই করিতে হইবে, খাটিবার জন্যই খাটিতে হইবে। যে পরিমাণে ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রিত ও ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে উপকার প্রাপ্ত প্রত্যেক নরনারী স্বেচ্ছায়, আন্তরিক কর্ত্তব্যবোধে, আপন আপন শক্তি, সময় ও অর্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের জন্য ঢালিয়া দিবেন, সেই পরিমাণে এই মহোৎসবের সার্থকতা হইবে। আমি ভাবিতেই পারি না যে, বৎসরে বৎসরে যেমন উপাসনা বক্তৃতা, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা উৎসব হয়, এ উৎসবও ঠিক সেই প্রকারে (না হয় কিছু বড় রকমে) সম্পন্ন হইলে, কেমন করিয়া তৃপ্ত হইব। মনে হয়, ঐরূপ হইলে, উৎসবান্তে হৃদয়ে গুরুতর হাহাকার থাকিয়া যাইবে। আচার্য্য ও বক্তাদের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহাত পাইতেছি। তাঁহাদের এমন সাধ্য নাই যে, যেরূপ উপাসনা বা বক্তৃতা তাঁহারা সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক উৎকৃষ্ট উপাসনা বা বক্তৃতা করিয়া আমাদিগকে বাঞ্ছিত তৃপ্তি দান করিতে পারেন। সুতরাং আমাদিগকে এবার কেবল পাইয়া তৃপ্তিলাভের আশা না করিয়া, দিয়া তৃপ্তিলাভের পথ খুঁজিতে হইবে। যে ভাবে হউক, কিছু না দিলে এ উৎসবের সার্থকতা হইবে না; হৃদয়ে ও তৃপ্তি আসিবে না। কি অর্থ, কি সময়, কি শক্তি, এমন পরিমাণে দেওয়া চাই, যাহাতে ত্যাগস্বীকারের ক্লেশানুভবটুকু প্রাণে মুদ্রিত হয় এবং অবশিষ্ট জীবন স্মরণ থাকে। প্রাচুর্য্যের ভাণ্ডার হইতে অক্লেশে যাহা দেওয়া যায়, তাহাতে লৌকিক ভিক্ষাদান চলিতে পারে, অথবা সমাজের নিয়মিত কার্য্য সম্পাদনও হইতে পারে; কিন্তু ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইতে পারে না।

সকলের প্রদত্ত অর্থ কি ভাবে খরচ করা হইবে, এবং সকলের সময় ও শক্তি কোন্ কোন্ কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, তাহা উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। সমুদয় অর্থ, সময় ও শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া একই প্রণালীতে ব্যয়িত ও ব্যবহৃত হওয়া সম্ভবপর নহে, বাঞ্ছনীয়ও মনে হয় না। অর্থ বরং কেন্দ্রীভূত হওয়া সম্ভব, কিন্তু বহু বিস্তৃত একটি সম্প্রদায়ের শ্রম কেন্দ্রীভূত হওয়া অসম্ভব। কলিকাতায় কেন্দ্র সমিতির হস্তে অর্থদান করিয়া তাঁহাদের উপরে সকল কার্য্যভার ন্যস্ত করিলে, মফস্বলবাসী দিগকে ফলতঃ নিষ্ক্রিয় হইয়াই থাকিতে হইবে। অথচ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বালক বৃদ্ধ বণিতা প্রত্যেকেই স্বয়ং কিছু না করিলে এ উৎসবের যথার্থ ফল পাইবেন না। অতএব, একদিকে যেমন কলিকাতার কমিটিকে অর্থ ও পরামর্শাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রযত্নে সহায়তা করিতে হইবে, আর একদিকে তেমনি প্রত্যেক মফস্বল সহরে স্থানীয় সমাজকে আপন ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে সাধ্যানুসারে কিছু করিতে হইবে। বিশাল দেশের সকল স্থানের সকল প্রয়োজন একমাত্র কলিকাতার কমিটি দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব, প্রত্যেক মফস্বল সমাজকে স্বকীয় পৃথক ফণ্ড খুলিয়া স্বাধীন ভাবে আপন ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে হইবে।

ইহাতেও শেষ হইবে না। এতদ্ভিন্ন, প্রত্যেক পরিবারেরও পারিবারিক প্রণালীতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রণালীতে কিছু করিয়া, এই মহোৎসবকে পূর্ণাঙ্গ করা আবশ্যক। সুতরাং আমাদের এই মহোৎসব চারি প্রণালীতে সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়—

(১) সমগ্র ভারতের মিলিত মহোৎসব—কলিকাতার কমিটির মধ্য দিয়া;

(২) প্রত্যেক জেলা বা মহকুমার উৎসব—স্থানীয় ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্য দিয়া;

(৩) পারিবারিক উৎসব—পরিজন ও আত্মীয় বন্ধুদিগকে লইয়া;

(৪) ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য—আপনা আপনি।

এই চারিটির মধ্যে প্রথমটি কি ভাবে সম্পন্ন হইবে, কলিকাতায় কমিটি তাহা স্থির করিয়াছেন ও করিবেন। সে সম্বন্ধে আমার কোনও বক্তব্য নাই। দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি। তৃতীয় ও চতুর্থটি (অর্থাৎ পারিবারিক উৎসব ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য) কি কি ভাবে করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে এখন দুই চারিটি কথা বলিব।

প্রথমতঃ পারিবারিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে। ব্রাহ্ম ও সহানুভূতিকারী পরিবারগণ এই সকল কার্য্য করিতে পারেন :—

(১) আগামী ভাদ্র মাসে (অর্থাৎ শতবার্ষিক মহোৎসবের প্রথম মাসে), অথবা তখন সম্ভব না হইলে, পরে, আত্মীয়বন্ধুদিগকে লইয়া পারিবারিক আনন্দোৎসব করা।

(২) যাঁহাদের গ্রামে বাড়ী আছে, তাঁহারা মহোৎসবের দেড় বৎসর (আগামী ভাদ্র হইতে ১৩৩৬ সালের মাঘ পর্য্যন্ত) কালের মধ্যে কোনো সময়ে সেই বাড়ীতে ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে লইয়া গিয়া দুই তিন দিন ব্যাপী উৎসব করা, এবং তাহাতে আত্মীয় বন্ধু ও গ্রামের লোকদিগকে যথাসম্ভব মিলিত করা। এই কার্য্য আপন জেলার ব্রাহ্মসমাজের সহযোগে করিলে সহজ হইবে (এ বিষয়ে জেলা-সমাজের কর্ত্তব্য পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে)।

(৩) পরিবারের কোনও পরলোকগত প্রিয় ব্যক্তির স্মৃতি-রক্ষার জন্য কোনো স্থায়ী ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া শতবার্ষিক মহোৎসবকে পরিবারে স্মরণীয় করিয়া রাখা।

(৪) ব্রাহ্মসমাজের কোনো বিশেষ বিভাগের কার্য্যের জন্য উক্তরূপে স্থায়ী ফণ্ড স্থাপন বা এককালীন দান।

(৫) কোনো দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবারকে মাসিক বৃত্তি বা এককালীন অর্থ সাহায্য দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম পালনে সহায়তা করা।

(৬) যে সকল পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই মহোৎসবের মধ্যে কোনো সময়ে উপযুক্ত পারিবারিক উৎসব করিয়া, প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

(৭) যে সকল পরিবারে প্রত্যহ, অথবা অন্ততঃ সপ্তাহে একবার, উপাসনা হয় না, তাঁহাদের আগামী ৬ই ভাদ্র হইতে নিষ্ঠাপূর্ব্বক তাহা আরম্ভ করা।

(৮) যে সকল পরিবারে উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নাই, অথচ যাঁহারা স্বতন্ত্র গৃহ রাখিতে বা প্রস্তুত করিয়া লইতে সমর্থ, তাঁহাদের তাহা করা।

(৯) যাহাদের নিজের বাড়ী আছে এবং প্রাঙ্গণে পরিবারের পরলোকগত প্রিয়জনদিগের সমাধি চিহ্ন স্থাপন করিবার স্থান আছে, অথচ এ পর্য্যন্ত তাহা করা হয় নাই, তাঁহাদের এই উৎসব উপলক্ষে তাহা করা।

তালিকা আর দীর্ঘ করা অনাবশ্যক। প্রত্যেক পরিবার আপন প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে, এইরূপ কোনো না কোনো উপায়ে ত্যাগস্বীকারের দ্বারা শতবার্ষিক মহোৎসবকে স্মরণীয় করিয়া রাখিতে পারেন। যে সকল কার্য্যে কেবল নিজ পরিবারেরই কল্যাণ, তাহাকেও ত্যাগস্বীকার এবং মহোৎসবের অঙ্গ বলিতেছি এই জন্য, যে, তদ্দ্বারাও ব্রাহ্মধর্ম্মেরই জয় স্বীকৃত ও ঘোষিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য যেটুকু ত্যাগস্বীকার বহুকাল সম্ভব হয় নাই, তাহা এই উপলক্ষে হইলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই।

অতঃপর, ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ব্যক্তি কি ভাবে এই মহোৎসবকে জীবনে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতে পারেন, তাহাও তাঁহার নিজের অবস্থা, প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে নির্ণীত হইবে। তথাপি চিন্তার সুবিধার জন্য কতকগুলি উপায় ব্যক্ত করা যাইতেছে। উপায়গুলির মধ্যে কতকগুলি আন্তরিক ও কতকগুলি বাহ্যিক।

(১) ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্ব্বপ্রধান উপায়,

এই ধর্ম্মের হস্তে আপনাকে সমগ্রভাবে অর্পণ করা। সকল ত্যাগের মধ্যে আত্মোৎসর্গই শ্রেষ্ঠতম ত্যাগ। ভগবানের চরণে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতে হইলে, আপনাকে এই ধর্ম্মের সেবায় নিয়োগ করাই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা আত্মোৎসর্গের দ্বারা এই উৎসবকে সফল করিবেন।

(২) যে সকল যুবক ও কন্যা ব্রাহ্মপরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদিও জন্মতঃ ব্রাহ্মই আছেন, তথাপি আপন আপন জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় স্পষ্টরূপে স্বীকার ও ঘোষণা করিবার জন্য এই উৎসবের সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।

বর্ত্তমানে শুধু ভিন্ন সমাজের যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশকালে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন; ব্রাহ্মগৃহের যুবকগণ ও কন্যাগণ প্রায়ই দীক্ষা গ্রহণ করেন না। এই রীতি প্রচলিত হওয়াতে, গোপনে ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর ক্ষতি হইতেছে। সেই ক্ষতি এই যে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাদের চিন্তার মধ্যে এই ভাব রহিয়াছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ মত পরিবর্ত্তন মাত্র; সাধনাই যে ব্রাহ্মজীবনের বিশেষত্ব, এবং দীক্ষা যে সেই সাধনার আরম্ভ, এ ভাব জাগ্রত হইতেছে না। এই মহোৎসবে, নানাস্থানে অন্ততঃ একশত ব্রাহ্ম যুবক ও একশত ব্রাহ্মকন্যা দীক্ষা গ্রহণ করিলে, একদিকে যেমন নিজ নিজ জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপযুক্ত গৌরব দান করা হইবে, তেমনি অপরদিকে দীক্ষার সম্বন্ধে উপরোক্ত ভ্রান্ত ধারণাও দূর করা হইবে। যুবকেরা ও কন্যারা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া এই প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ প্রমাণিত হইবে; এবং ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহারা স্বয়ং, এবং সমগ্রভাবে ব্রাহ্মসমাজ, অশেষ উপকৃত হইবেন। এইরূপে একশত যুবক ও একশত কন্যা দীক্ষা গ্রহণ করিলে, অচিরে ব্রাহ্মসমাজ বলশালী হইয়া উঠিবেন।

(৩) ভিন্ন সমাজের যে সকল যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী, কিন্তু এখনও প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারাও এই উৎসবে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এইরূপে নিজ নিজ জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়ী করিতে ও ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিশালী করিতে পারেন। নানা স্থানে অন্ততঃ একশত হিন্দু ও মুসলমান যুবককে দীক্ষার জন্য প্রত্যাশা করা বোধ করি দুরাশা নহে। আজকাল অনেক শিক্ষিত মুসলমান যুবককে উদার ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী দেখা যায়। তাঁহারা দল বাঁধিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মসমাজে নবযুগের সূত্রপাত হইবে।

(৪) প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা আপন স্থানে থাকিয়াই ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগের কার্য্যে কিছু কিছু সহায়তা এই দেড়বৎসর ধরিয়া করিতে পারেন। যেমন, (ক) সমাজের কোনো বিশেষ বিভাগের কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ, (খ) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তকাদি প্রণয়ন এবং আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলেও ত্যাগস্বীকার পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করা, (গ) অপরের লিখিত পুস্তকাদি বিক্রয়ের সহায়তা করা, (ঘ) সমাজের পত্রিকাগুলির (Indian Messenger, তত্ত্বকৌমুদী ব্রহ্মবাদী প্রভৃতির) গ্রাহক বৃদ্ধি করা, স্বয়ং গ্রাহক না থাকিলে গ্রাহক হয়ে এবং বন্ধুবান্ধব দিগকে তাহা পড়িতে দেওয়া ইত্যাদি।

(৫) শতবার্ষিক মহোৎসবের সমাচার আপন বন্ধু বান্ধবকে দেওয়া, তাহাতে যোগদান করিতে সকলকে আহ্বান করা, এবং তাহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতাস্থ কমিটির নিকট বা স্থানীয় সমাজে প্রেরণ করা।

এইরূপ কত বলিব? ইচ্ছা থাকিলে প্রত্যেকেই অনেক কার্য্য খুঁজিয়া পাইবেন। নিজ জীবনে, পরিবারে ও ব্রাহ্মমণ্ডলীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকতর প্রতিষ্ঠা, ও বাহিরে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার এই মহালক্ষ্য সাধনের জন্য কাজের অভাব নাই। ভগবান আমাদিগকে এবার আত্মিক জাগরণে জাগ্রত করুন।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকোৎসব।

ঘোষণা (বুলেটিন্)

(৩য় সংখ্যা)

কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার দরুণ গত কয়েক মাসে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকোৎসবের আয়োজন আশানুরূপ না হইলেও, ক্রমাগত বেশ ধীর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। একটি সাময়িক কার্য্য তালিকা (প্রোগ্রাম) প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্ম ও প্রার্থনা সমাজ সমূহে প্রেরিত হইয়াছে। স্থলবিশেষে ইহার সামান্য পরিবর্ত্তন সম্ভব হইলেও, কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে; কারণ কার্য্য তালিকার মধ্যে এমন একটি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, এবম্প্রকার পরিবর্ত্তনে ইহার আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। এজন্য সমাজ সমূহকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, কতকগুলি অসুবিধা সত্ত্বেও যেন তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে ঐ কার্য্যতালিকানুসারে কাজের বন্দোবস্ত করেন। বিদেশ হইতে যাঁহারা প্রতিনিধি-স্বরূপ এই উৎসবে যোগদান করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া গেল। আমেরিকার ইউনিটারীয়ান সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রেভারেণ্ড ডাক্তার সাইমুয়েল ইলিয়ট ও তাঁহার পত্নী, রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্কলিন সি সাউদওয়ার্থ ও তাঁহার পত্নী, এবং রেভারেণ্ড ডাক্তার কার্টিস্ ডাব্লিউ রীজ ও তাঁহার পত্নী উক্ত সমিতির প্রতিনিধি-স্বরূপ আসিবেন। কানাডা ও আমেরিকা হইতে আরও জনকতক প্রতিনিধি এই উৎসবে যোগদান করিবেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার ডাব্লিউ এইচ ড্রমণ্ড ও তাঁহার পত্নী ও কন্যা ব্রিটিশ এবং ফরেন্ ইউনিটারীয়ান্ সমিতির প্রতিনিধি হইয়া আসিবেন।

সুবিখ্যাত একেশ্বরবাদী পণ্ডিত ও প্রচারক স্বর্গীয় ডাক্তার চার্ল্‌স্ বিয়ার্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী উডহাউস ব্রিটিশ ইউনিটারীয়ান্ স্ত্রী সমিতির প্রতিনিধি হইয়া আসিবেন। তিনি একেশ্বরবাদিনী নারীদের মধ্যে বড়ই কর্ম্মিষ্ঠা। ইংলণ্ডে ও আমেরিকার উভয় দেশের সোসাইটী অভ্ ফ্রেণ্ডস্ হইতে অন্ততঃ একজন করিয়া প্রতিনিধি আসার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পারস্য ও পলেষ্টাইনের বাহাই সম্প্রদায় [illegible] তে কয়েকজন প্রতিনিধি আসিবেন। প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায় গুলিকেও অনুরোধ করা হইয়াছে। খুবই আশা করা যায় যে শতবার্ষিকোৎসব সংক্রান্ত প্রত্যেক সভায় অত্যধিক পরিমাণে সভ্যদের সমাবেশ হইবে। স্থানীয় উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিবার জন্য কলিকাতায় এবং অন্যান্য প্রধান কেন্দ্রসমূহে কমিটি গঠন করা হইতেছে। কলিকাতা সিটি কলেজে কলিকাতা ও সহরতলীর ব্রাহ্মগণ ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকদের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত স্থানীয় উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য একটি স্থানীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত সব কমিটিগুলি গঠিত হইয়াছে। যথা সঙ্কীর্ত্তন সবকমিটি, কার্য্য তালিকা সবকমিটি, কাগজ পত্র লিখন ও সংরক্ষণ সবকমিটি ইত্যাদি।

বিভিন্ন সমাজ সমূহকে বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রতিনিধিগণের নাম সেক্রেটারীর নিকট সত্বর প্রেরণ করেন ও অন্যান্য সংবাদের জন্য তাঁহাকে লিখেন এবং আরো বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে এই বিরাট উৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন বিষয়ে তাঁহারা যেন তাঁহাদের সুপরামর্শ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। এতদুপলক্ষে এখানে অবস্থানের জন্য যাঁহাদের বাসস্থানের প্রয়োজন তাঁহারা যেন সত্বর সেক্রেটারীকে লিখেন এই অনুরোধ করা যাইতেছে নচেৎ কলিকাতার মত জায়গায় থাকার যথোচিত বন্দোবস্ত করা এক দুরূহ ব্যাপার হইবে।

হেমচন্দ্র সরকার ও এস, সি মহলানবিশ
ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকোৎসবের সেক্রেটারী দ্বয়।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

পূজনীয় তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

নিম্নলিখিত কটী লাইন আপনার 'তত্ত্বকৌমুদীতে' ছাপাইলে বিশেষ কৃতার্থ হইব। ইহা আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডিব্রুগড় থাকাকালীন লিখিয়াছিলাম:—কিছুদিন হইল একজন ভদ্রলোক আমার কাছে একখানা সার্টিফিকেটের (Certificate) জন্য এসেছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম নন, কোন 'অনুষ্ঠানাদিও ব্রাহ্মমতে করেন না, তবে নিয়মমত স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনায় যোগ দিয়ে থাকেন। তিনি এসে আমাকে বল্লেন যে সার্টিফিকেটে যেন এ কথার উল্লেখ থাকে যে তিনি নিয়ম মত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিয়ে থাকেন। আমি তাঁকে তাঁর চক্ষামতই সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম। আমার কোন আত্মীয় এ' কথা শুনে বল্লেন "This is the old idea about the Brahmo samaj এটা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে লোকের আগেকার ধারণা। আমি দেখলাম কথাটা খুবই সত্য। ব্রাহ্মসমাজকে লোকে আগে কিরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখত তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু হায় আজ সেই ব্রাহ্মসমাজের কি অবস্থা। শুনেছি প্রাচীন ব্রাহ্মদের আদালতে 'হলফ' পড়তে হতো না, কেন না যে ব্রাহ্ম, সে কি আর মিথ্যা কথা বলবে? আর আজ? আজ ব্রাহ্মসাধারণকে লোকে ভণ্ড বলে মনে করে। কত সময় ও মুখ ফুটে বলতেও শুনেছি। ব্রাহ্মেরা কি নিজেদের এ কলঙ্কের হাত হতে মুক্ত করবেন? সত্যের উপাসক ব্রাহ্ম কি "ভণ্ড" আখ্যা ঘুচাতে পারবেন? এ যদি না পারেন তবে বৃথা তাঁর উপাসনা বৃথা তাঁর ব্রাহ্ম হওয়া।

ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্দ্দিনেও মাঝে মাঝে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান লোক দেখা যায়, তাহা শুধু এইজন্য যে তাঁরা তাদের জীবনে সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মের পরিচয় কোন সময় পেয়েছিলেন এবং এখনো সেরূপ লোক বেশী না হইলেও দু'চারজন আছেন বলে বিশ্বাস করেন। আর এতে এও প্রমান হয় যে এখনো ব্রাহ্মসমাজ ষোল আনা মরে যায় নি। এখনো তার বাঁচবার উপায় আছে।

আমি তাই আজ উৎসবের দিনে আমার ব্রাহ্মবন্ধুদের সাদরে অনুরোধ করি তাঁরা সকলে প্রিয় ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর হোন। আমি দেখেছি কত ব্রাহ্ম নিজেদের ব্রাহ্ম-বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। আর অন্যদিকে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে একটু যোগ আছে বলে লোকের কাছে পরিচিত হ'তে গৌরব বোধ করেন। এর চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? আমাদের এ পরিতাপ দূর হোক, আমাদের এ কলঙ্ক ঘুচুক। এককালে যেমন ব্রাহ্মসমাজ দেশের গৌরবের বস্তু হয়েছিল আমরা আমাদের জীবন দিয়ে আবার ব্রাহ্ম-সমাজকে সেই চিরবাঞ্ছিত শীর্ষস্থানে নিয়ে যাই। ভগবান আমাদের সহায় হউন।

বড়গাঁও, আসাম   বিনীত
৫ই মাঘ ১৩৩৭   শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস,

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

পথিমধ্যে বিষাক্ত আহার্য্য গ্রহণের ফলে শ্রীযুক্ত রমাকান্ত বরকাকতির একটি পুত্রও জোড়হাট নগরীতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

কিছু—দিন হইল বরোদা নগরীতে পরলোকগত এন, দাসের দ্বিতীয়া কন্যা বীণা ভোড়া (মিঃ, সি, এইচ, ভোড়ার পত্নী) চারিটি শিশুসন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মধুর প্রকৃতির জন্য বীণা সকলের প্রিয় ছিলেন।

বিগত ১৭ই মে কলিকাতা নগরীতে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অতি বিশ্বাসী উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যে ও অক্লান্তভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মপল্লীতে পণ্ডিত শ্রীনাথচন্দ্র মহাশয়ের গৃহে তাঁহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ জীবনী পাঠ করিলে শ্রীনাথ বাবু ও তাঁহার পত্নী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে স্বর্গগত আত্মার তৃপ্তির জন্য তাঁহার প্রিয়তমা কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী চন্দ নিম্নলিখিতরূপে দান করিয়াছেন। কলিকাতা নববিধান প্রচারাশ্রমের প্রচারকদিগের আহার ও পথ্যের জন্য ১০৲, ঐ সাধনাশ্রমের পরিচারকগণের আহার ও পথ্যের জন্য ১০৲, ঐ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য ফণ্ডে ৫৲, ঢাকা নববিধান সমাজের প্রচারকদিগের আহার ও পথ্যের জন্য ১০ ঐ অনাথ ব্রাহ্ম ধনভাণ্ডারে ৫৲, স্থানীয় নববিধান প্রচার আশ্রম ২৲, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ ২৲, ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণমিশন ২৲, অন্ধ আতুরদের জন্য ৪৲, মোট ৫০৲,

বিগত ১৩ই মে শ্রীহট্টনগরীতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ দাসের পিতা ব্রজমোহন দাস পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ২৪শে মে গিরিডি নগরীতে প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দেব ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ৫ম সংখ্যা। | ১লা আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯ 15th June, 1928. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

হে অনাথের নাথ, আজ দীন ভিখারী তোমারই দ্বারে এসেছে। জীবনসংগ্রামে, শোক তাপে, পাপে, কে আর আমাদের সহায় আছে? শান্তির আশায়, সান্ত্বনার জন্য কত দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছি; কত আঘাত পেয়েছি, কত ধাক্কা খেয়েছি! তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তোমারই দ্বারে এসেছি। যার কেহ নাই তার বন্ধু তুমি, আশ্রয় তুমি। যে পথ হারিয়েছে, তুমি তাকে পথ দেখাও; যার প্রাণের আশা নির্ব্বাণ হতেছে, তুমি তাকে আশা দাও; যে নরকে ডুবিতেছে, তুমি তাকে হাত ধ'রে তোল; যার প্রিয়জন চ'লে গিয়েছে, তার প্রাণে তুমি শান্তি ও সান্ত্বনা দাও। তাই হে নাথ, তোমার কৃপার ভিখারী হ'য়ে তোমার দ্বারে এসেছি। তুমি অনাথের নাথ, দরিদ্রের ধন। তোমার স্পর্শে লোহা সোণা হয়; তোমার স্পর্শে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, তোমার স্পর্শে মৃত প্রাণ জেগে উঠে। তাই বড় আশা ল'য়ে তোমার দ্বারে এসেছি। করযোড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। হে প্রভু, তোমার ঐ চরণে স্থান দাও। তোমার কাছে একটু বসতে দাও। এমনই দুর্ভাগ্য আমরা, তোমার নামও একটু করতে পারি না—মন চঞ্চল হয়, চিত্তের বিক্ষোভ হয়। তুমি প্রাণে এসে স্পর্শ কর, হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হোক, নীরস প্রাণ সরস হোক। তোমার মধুর নাম, মিষ্ট নাম। ঐ নামেও প্রাণে সরস ভাব জাগবে না? প্রভু, তুমি সব বাধা দূর ক'রে দাও; সব বন্ধন ছিন্ন ক'রে দাও; তোমার নাম গেয়ে আমরা সকল দুঃখ ভুলি, সকল পাপ তাপ শোক বেদনা হ'তে মুক্ত হই। তোমার চরণে আত্ম-নিবেদন ক'রে কৃতার্থ হই। তোমার নামে সকলকে ডাকি; সকলে প্রেমে এক হ'য়ে তোমার চরণে পড়ি। তুমি ভিন্ন আর যে আমাদের কেহ নাই—আর যে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই! হে প্রভু দীনবন্ধু, আমাদিগকে তোমার চরণে স্থান দাও। আমরা তোমার হ'য়ে যাই।

নিবেদন।

শোকে—কোনও পল্লীতে যখন আগুন লাগে, সমস্ত ঘর বাড়ী পুড়ে যায়, সব সম্পত্তি ধ্বংস হয়; মানুষ সর্ব্বস্ব হারিয়ে হাহাকার করে। কিন্তু ঐ আগুনই আবার দূষিত বায়ু বিশোধিত করে। লণ্ডনে একবার যে অগ্নিকাণ্ড হ'য়েছিল, তাতে অনেক অনিষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু দেশব্যাপী ভয়ানক মহামারী তাতে চ'লে যায়, রোগের বীজাণু বিনষ্ট হয়। শোকের অনলে যে দগ্ধ হ'তেছে, যার প্রিয়জন চ'লে গিয়েছে, তার কি বেদনা! প্রাণে কি যন্ত্রণা! সর্ব্বস্ব যেন সে হারিয়ে ফেলেছে, আর কিছু ভাল লাগেনা—সে জীবন্মৃত হ'য়ে আছে। সে শোকে কেহ ত সান্ত্বনা দিতে পারেনা। কিন্তু শোকে যেমন প্রাণ দগ্ধ করে, তেমনি আবার উহা চিত্ত শুদ্ধ করে। যে বাসনার বশে ছুটাছুটি কচ্ছিল, তার বাসনা সংযত হয়; যে আমোদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, তার মনে গভীর চিন্তা জাগ্রত হয়, জীবনের ও মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার ইচ্ছা হয়। শোক স্বর্গের দ্বার খুলে দেয়, অমৃতের সন্ধান ব'লে দেয়; শোক দূরকে নিকট করে, পরকে আপন করে; শোক মনের চঞ্চলতা দূর করে, অতৃপ্ত বাসনা সংযত করে; বিক্ষিপ্ত চঞ্চল মনকে স্থির ও গম্ভীর করে। শোক শোক-হরণের স্পর্শ আনিয়া দেয়। শোককে তুচ্ছ ক'রো না—শোক অমৃতের সোপান।

ভিতর হ'তে বাহিরে—মানুষ যখন কেবল বাহিরে থাকে, তখন সে এই বিচিত্রতাপূর্ণ ধরার প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারে না। এখানে ফুল দেখে, ফল দেখে, সমুদ্র দেখে, পর্ব্বত দেখে, চন্দ্র সূর্য্য তারকামণ্ডিত আকাশ দেখেই মুগ্ধ হয়। তবুও বলি, সে কেবল সৌন্দর্য্যের মন্দিরের বাহিরেই রহিল। রূপ রস, গন্ধ স্পর্শ শব্দ তাকে ভুলিয়ে রাখল, প্রকৃত মাধুর্য্য সম্ভোগ করতে দিল না। কিন্তু একবার ভিতরে প্রবেশ কর! অন্তরে কার যেন লীলা চল্‌ছে, তা দেখ; কে যেন বীণা বাজাচ্ছে, তা শোন; কে যেন প্রেমে তোমাকে বেঁধে রেখেছে, কে যেন তোমার জীবনের সুখ দুঃখ নিয়মিত কচ্ছে, কে যেন তোমার সঙ্গে মধুর মিলনের খেলা খেল্‌ছে! অন্তরে চেয়ে দেখ, সেখানে কি অপূর্ব্ব প্রেমের লীলা! তাতে মগ্ন হও, ভিতরে যে অরূপ রূপ তাতে ডোব, দৃষ্টি বদলিয়ে যাবে, জগতের গভীর রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হবে। নূতন দৃষ্টিতে তখন বাহিরে তাকাও, জড় কোথায় চ'লে যাবে; কেবল চৈতন্যের লীলা—কেবল সুন্দরের খেলা দেখে মোহিত হবে। তখন এই জড়ময় জগৎ আত্মার প্রকাশ, সৌন্দর্য্যের খনি, ব'লে মনে হবে। তখন দিবানিশি তাঁর প্রেমের লীলা দেখে অবাক হবে। ঐ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দই হৃদয়নাথের মাধুর্য্য প্রাণে ঢেলে দিবে। তখন চক্ষু মুদিয়া দেখবে, সত্যং শিবং সুন্দরং মধুরং; আবার চক্ষু মেলিয়া বাহিরে তাকাবে, তখনও দেখবে সত্যং শিবং সুন্দরং মধুরং।

তুমি কি দিবে?—দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ, লোকে অন্নাভাবে হাহাকার কচ্ছে। ধনী যাঁরা, জমীদার যাঁরা, যাঁরা হাজার হাজার টাকা দিয়ে দুঃখ দূর করতে পারত, তাঁরা অগ্রসর হ'লো না। তুমি ভিক্ষে ক'রে দুটি পয়সা এনেছ; তুমি তাহাই দাও। জানি, এতে এই বিরাট ক্ষুধার নিবৃত্তি হবেনা, তবুও তুমি নিজে না খেয়ে, ঐ দুটি পয়সাই দাও। অন্যে কে কি দিল, না দিল, সে দিকে তাকিও না। বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র; যাঁরা সুস্থ সবল, যাঁদের সময় আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, শক্তি সামর্থ্য আছে, তাঁরা কাজে এ'লো না। তুমি দুর্ব্বল, তোমার বিদ্যা বুদ্ধি নাই, তুমি অক্ষম, তবুও তুমি যেটুকু পার, ক'রে যাও। জানি, তোমার দ্বারা সামান্যই কাজ হবে; কিন্তু তবুও যেটুকু শক্তি আছে, তুমি তাই নিয়েই কাজে অগ্রসর হও। তুমি এক নূতন আলোক পেয়েছ, নূতন আদর্শ পেয়েছ। কতজন যে আলোক দেখেছে, যে আদর্শ পেয়েছে, তাহা বিস্তার করতে তাঁরা এ'লোনা; তাঁরা সুখে দিন কাটাল। তোমার প্রাণে নব আকাঙ্ক্ষা জেগেছে; নূতন আলোক বিস্তার করতে হবে, নব আদর্শের দিকে মানুষকে ডাকতে হবে; তোমার জ্ঞান নাই, কর্ম্মশক্তি নাই; তবুও তুমি আসবে, যেটুকু পার প্রভুর কাজ করবে। জান না প্রভুর কাছে তোমার ঐ সামান্য কাজেরও কত মূল্য? তোমার ঐ সামান্য কাজ দ্বারাও জগতে মহা পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে। অন্যে কি করে, না করে, তার জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না; তুমি কি দিতে পার, তুমি কি করতে পার, তার প্রতি দৃষ্টি দাও। তোমার সর্ব্বস্ব তুমি দাও, তাতেই তোমার কৃতার্থতা।

সম্পাদকীয়

আদর্শে নিষ্ঠা—যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে:—

তরোরপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।

তরুগণও জীবন ধারণ করে, পশুপক্ষীও বাঁচিয়া থাকে; কিন্তু সে-ই প্রকৃত ভাবে জীবন ধারণ করে, যে মননদ্বারা জীবন ধারণ করে। সংসারে সহস্র সহস্র লোক আসে আর যায়, তাহারা খায়, দায়, মজা করে, জীবনের উদ্দেশ্য জানে না, জানিবার চেষ্টা করে না। তাহারাও যে সময় সময় ঈশ্বরের নাম করে না, পুণ্যকার্য্য করে না, স্বার্থত্যাগ করে না, অপরকে ভালবাসে না, অপরের জন্য ক্লেশস্বীকার করে না, তাহা নয়। কিন্তু তাদের জীবনের লক্ষ্য নাই, মননদ্বারা জীবিত থাকবার অভিপ্রায় নাই, জীবনের একটা আদর্শ নাই, আদর্শের জন্য বাঁচিব আদর্শের জন্য মরিব, এই ভাব নাই। সুখ দুঃখ পূর্ণ সংসার-পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে যে কার্য্য আসে, যে প্রয়োজন পড়ে, তাহা করিয়া যায়। এক পথে চলেছে, একটু বাধা পেলে আর এক পথে চলিল; আজ সত্য পথে চলেছে, কাল মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করল; আজ পরের উপকার করল, কাল অপরের অনিষ্ট ক'রে আপনার সুবিধা ক'রে নিল। কিন্তু তার ভিতরেও এক এক জন লোক আছেন, তাঁরা তারা-দেখা লোক, তারার দিকে চেয়ে চলেন; ঊর্দ্ধদিকে তাঁদের দৃষ্টি—পথে খানা জঙ্গল, নদী পর্ব্বত আছে, তাহা তাঁরা গ্রাহ্য করেন না। উপরের দিকে তাকাইয়া সব বাধা অতিক্রম ক'রে চ'লে যান—হয় সিদ্ধিলাভ, নতুবা সিদ্ধিলাভের চেষ্টাতে দেহের পতন। এঁরা জীবনের একটা আদর্শ পেয়েছেন; এঁরা আপনার ও মানবের কল্যাণের—প্রকৃত কল্যাণের—একটা পথ দেখেছেন; স্বর্গ হ'তে এক আলোকরেখা তাঁদের চক্ষে এসে পড়েছে; একটা বাণী তাঁরা কর্ণে শুনেছেন; সেই আলোক দেখে, সেই বাণী শুনে তাঁরা চল্‌ছেন। স্যার গ্যালাহাডের মতন হোলি গ্রেইলের সন্ধানে তাঁরা চল্‌ছেন। সুখ দুঃখ জ্ঞান নাই, মান অপমানে লক্ষ্য নাই; নিজের বিষয় সম্পত্তি যায়, অনাহারে ক্লেশে থাকতে হয়, নিন্দা অপমান নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়, সে দিকে লক্ষ্য নাই; লক্ষ্য ঐ তারার দিকে, ঐ আদর্শপ্রতিষ্ঠার দিকে; ঐ স্বর্গ হইতে আগত আলোকের দিকে, ঐ অজানা দেশ হইতে শ্রুত বাণীর দিকে। তাঁরা এই আদর্শকে ভালবাসেন, আদর্শ দেখে আপনাদের জীবন নিয়মিত করেন, আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। মানবমণ্ডলীকে, দেশবাসীদিগকে ডাকিয়া বলেন, 'আমি কল্যাণের পথ পেয়েছি, অমৃতের সন্ধান পেয়েছি, তোমরা ক্ষুদ্র সুখ স্বার্থ আমোদ নিয়ে ভুলে থেকোনা, তোমরা এস এস; এই আনন্দলোকের পথ, এই শ্রেয়ের পথ, এই মুক্তির পথ; এই পথে এস। এর জন্য সব ত্যাগ করা যায়, সব দুঃখ

সহ্য করা যায়। ইহাতে অমৃতময় জীবনলাভ হয়। মৃত্যুকে অতিক্রম করতে চাও? ত্যাগদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়; অমৃত পুরুষকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর পথ নাই।' পশু পক্ষী জীবন ধারণ করে; তাদের স্বাভাবিক জ্ঞান (instinct) আছে। সেই স্বাভাবিক জ্ঞানে তারা চলে; তাদের বিচারবুদ্ধি নাই, এইটা ভাল, এইটা মন্দ, এ জ্ঞান নাই। স্বাভাবিক জ্ঞানে যে দিকে নিয়ে যায়, সেই দিকে তারা চলে। তাহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি নিবারণ করে; সবই স্বাভাবিক জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া করে—তাদের দায়িত্ব জ্ঞান নাই, কর্ত্তব্যের দাবী নাই। পশু-মাতা সন্তানকে জন্মের সময় কত স্নেহে পালন করে! একটু বড় হ'লে আর মাতা ও সন্তানে সম্পর্ক থাকেনা। তুমি মানুষ, তোমার একটা কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে, একটা বিবেকবুদ্ধি আছে; একটা শ্রেয় ও প্রেয় বুঝবার ক্ষমতা আছে। তুমি কেবল ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নায়, প্রকৃতির উত্তেজনায়, তোমাকে যে পথে নিয়ে যাবে সে পথেই চলিবেনা। তোমার চিত্তের দৈহিক অভাবের টানে তোমাকে যে পথে নিয়ে যায়, সে পথেই তুমি যাবে না। ইহার উপরে, এই প্রেয়ের টানের উপরে, একটা শ্রেয়ের দাবী আছে। এই প্রেয়, ঐ শ্রেয়, এই বিলাসবিভ্রম, ঐ সংযম; এই কামনার তৃপ্তি, ঐ ত্যাগের আনন্দ। তুমি কোন্ পথে যাবে? ঐ শ্রেয়ের পথ, মনুষ্যত্বের পথ, অমৃতত্বলাভের পথ, আনন্দধামে যাবার পথ। প্রকৃত জীবন চাও? ঐ শ্রেয়ের পথে চল, কল্যাণের পথে চল; আদর্শ দেখে চল; তারার দিকে লক্ষ্য ক'রে চল; এর জন্য ধন জন সুখ স্বার্থ, সবই বিসর্জ্জন দাও। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, এই আদর্শ দেখে চলেছেন; তাঁরা ত তারাদেখা লোক ছিলেন। যে আদর্শ—আপনার ও মনুষ্যের কল্যাণের জন্য যে আদর্শ—পেয়েছিলেন তাহা দেখে মোহিত হয়েছিলেন, সেই আদর্শের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন, আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছিলেন। আর লোককে ডেকে বলেছেন, 'ভ্রান্ত-পথে যেওনা, মরণের পথে যেওনা; এই পথ, এই শান্তির পথ, এই অনন্ত জীবনের পথ, এই মুক্তির পথ, এই পথে এস।' তোমাদের ঐ আলোক দেখেই চল্‌তে হবে; মৃত্যু নিকট হ'লেও তাতে আনন্দ পাবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মমণ্ডলী—ব্রাহ্মধর্ম বলিয়াছেন, "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"—একমাত্র সত্যস্বরূপ, জ্ঞান, প্রেম, ও পুণ্যের আধার পরমেশ্বরে প্রীতি, সাক্ষাৎভাবে প্রেমভক্তি যোগে তাঁর অর্চ্চনা, আর তাঁর প্রীতিদ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে, তাঁর প্রিয় কার্য্য অনুভব ক'রে, লোকশ্রেয়ঃ-সাধন, ইহাই উপাসনা। এই উপাসনা আপনাদের জীবনে ও দেশ-বাসী ও মানব সাধারণের জীবনে প্রতিষ্ঠাই ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য, ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী। বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক রাজর্ষি রামমোহন এই আদর্শপ্রতিষ্ঠারই চেষ্টা করেছেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রপ্রমুখ কত ভক্ত জ্ঞানী কর্ম্মী, এই আদর্শ আপনাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা ও দেশে প্রচার করা আপনাদের জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন! তাঁহারা ঐ আদর্শের জন্য আপনাদের জীবন যৌবন, ধন মান পদ, সমস্ত বিসর্জ্জন দিলেন। লোকে ইঁহাদিগকে পাগল বলিল; কিন্তু ইঁহারা লোকের নিন্দা প্রশংসা গ্রাহ্য না করিয়া লোককে ডেকে বল্লেন, 'আমরা অমৃতের সন্ধান পেয়েছি, মরণের মধ্যে জীবনের আলোক পেয়েছি, দেশের ও মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথ পেয়েছি, তোমরা এস, নরনারী সকলে এস, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলে এস, বালক বৃদ্ধ সকলে এস, এদেশবাসী বিদেশবাসী সকলে এস, ঐ ব্রহ্মের উপাসনা, প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যসাধনদ্বারা উপাসনা, এই উপাসনাই মানবের মিলন ভূমি।' এক দিকে প্রত্যেকের জীবনে সত্য প্রেম পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা, অপর দিকে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা।

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি,
নাহি জাত বিচার।

মানুষ নূতন যুগের, নূতন বাণী শুনে দলে দলে আস্‌তে লাগিল। কত স্থানে ব্রাহ্মমণ্ডলী গঠিত হয়েছে! তাঁরা কত উপাসনালয় স্থাপন কর্‌লেন, কত প্রিয়কার্য্যসাধনের ব্যবস্থা কর্‌লেন; দেশে শিক্ষাবিস্তার, মাদকতানিবারণ, দুর্নীতি দূর, দুঃখ দারিদ্র্য দূর, আর্ত্তের সেবা, কুসংস্কার দূর, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, ঈশ্বরের আধ্যাত্মিকপূজাপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কল্যাণকর কার্য্যের জন্য কত চেষ্টা কর্‌লেন,—কত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলো! দেশবাসীকে নূতন মন্ত্রে জাগ্রত ক'রে তুলিলেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান, এই সকল প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ আদর্শ—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনং" —প্রতিষ্ঠার সুবিধা হলো। কত লোক কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিলেন, কত দুঃখ দারিদ্র্যে ক্লেশ পাইলেন, কত ত্যাগস্বীকার করিলেন। ঐ ত্যাগ, ঐ নিন্দা অপমান সহন, ব্রহ্মের চরণে আপনাকে নিয়োগ, এর ভিতর দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ দেশে প্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগিল। দেশ আজ অনেক উন্নত; ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ, সেবার আদর্শ, সামাজিক রাজনৈতিক আদর্শ অনেক পরিমাণে দেশ গ্রহণ করিয়াছে; একেশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা অনেকে মনে মনে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সম্যক্‌রূপে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এখনও ব্রাহ্মমণ্ডলীর অনেক কাজ রহিয়াছে; বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে রহিয়াছে। এই জন্যই এখনও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ কি তাঁদের আদর্শ ভুলে যাবেন? যদি তাঁরা এখন নিদ্রিত হ'য়ে পড়েন, যদি তাঁরা যে আলোক দেখে এসেছিলেন, তাহা আর না দেখেন, যে বাণী শুনে এসেছিলেন, তাহা আর না শোনেন, তবে তাঁদের যে মৃত্যু হলো এবং দেশেরও যে অকল্যাণ হলো! আর, তাঁরা যদি মনে করেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আদর্শ তাহাতে তাঁদের নিজেদের কল্যাণ, এবং দেশের ও দশের কল্যাণ, মানবের মুক্তির বার্ত্তা তাঁহারা বহন করে এনেছেন; যদি তাঁরা বুঝে থাকেন, ভগবান যে তাঁদের এই নব আদর্শ দিয়াছেন,

দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে তাঁরা দায়ী, তবে বলি—তাঁরা অবহিত হউন; ব্রাহ্মমণ্ডলী আপনাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বুঝিয়া লউন, আর উদাসীন থাকিবেন না, আর নিদ্রিত হ'য়ে থাকিবেন না। তাঁরা এই আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন—কত ত্যাগের ফলে, কত আত্মদানের ফলে, এই সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে—সেই সকল প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য তাঁহারা অগ্রসর হউন। কর্ম্মীর অভাবে, অর্থের অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি মৃতপ্রায়; তাঁহারা কি দেখিতেছেন না? তাঁহারা কি অপরের উপর দোষ চাপাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবেন? এইত সিটি-কলেজ কত বড় একটি প্রতিষ্ঠান! কত ত্যাগের উপর, কত প্রীতি-প্রণোদিত ত্যাগের উপর, এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে! কত কল্যাণ সাধন করিতেছে; আদর্শ প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতেছে! আজ কলেজটি বিপদাপন্ন। কত বার কত বিপদ হ'তে কলেজটি বাঁচিয়া উঠিয়াছে; এবার ঘোরতর বিপদ। এই সময়ে কি ব্রাহ্মমণ্ডলীর কর্ত্তব্য নাই? তাঁরা কি কেবল দুঃখই করিবেন, তাঁরা কি কেবল অপরের দোষই দেখিবেন? তাঁরা কি যার যে শক্তি আছে, তাহা দিয়া ইহা রক্ষা করিবেন না? ৩৪ লক্ষ টাকা, ইহা কি খুব বেশী? গৃহে যখন কঠিন পীড়া আসে, মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে সে পীড়ার উপসম করিতে চেষ্টা করে। আজ কি মণ্ডলীর উপর সেরূপ ব্যাধির আক্রমণ আসে নাই? আমাদের মণ্ডলীর প্রতি প্রেম, আদর্শের প্রতি প্রেম, তার পরীক্ষা কোথায়? আজ যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম, প্রত্যেক সহানুভূতি-কারী প্রতিজ্ঞা করেন, অন্ততঃ একমাসের আয় ইহার জন্য দিব, তবে কত লক্ষ টাকা উঠতে পারে! শুনেছি কয়েকটি গরীব লোক তাঁদের পক্ষে সাধ্যাতীত অর্থ দিয়াছেন; সে অর্থের পরিমাণ অল্প; কিন্তু তার মূল্য অর্থের পরিমাণদ্বারা হয় না; তাতে হৃদয়ের প্রেম কতখানি তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তাতে ত অভাব পূর্ণ হবে না। যাঁরা অবস্থাপন্ন তাঁরাও আসুন, এক মাসের আয় নিয়ে আসুন; ভাণ্ডার পূর্ণ করুন। আজ মণ্ডলীর পরীক্ষার দিন; ব্রাহ্মগণের আদর্শের প্রতি প্রীতির পরীক্ষার দিন এসেছে; আজ আমরা সুখ ও বিলাসিতা চাই, না, আদর্শপ্রতিষ্ঠা চাই, ইহার পরীক্ষার দিন এসেছে। ত্যাগেই ধর্ম্মজীবন গড়ে; প্রেমপ্রসূত ত্যাগই ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মমণ্ডলী গঠনের ভিত্তি। আজ ভগবান্ পরীক্ষার দিন এনেছেন। আমরা কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব না?

বিবাহ আইন—সার হরি সিং গৌর ১৮৭২ সালের ৩ আইন সংশোধনের জন্য একটি প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভাতে উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ আইনটি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মগণের চেষ্টায় প্রধানতঃ ব্রাহ্মদের জন্যই বিধিবদ্ধ হয়। ব্রাহ্মগণ অসবর্ণ বিবাহ দিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণেতর আচার্য্যগণ পুরোহিতের কার্য্য করিতে লাগিলেন; কাজেই ঐ বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হলো। কাজেই এই সকল বিবাহ আইন-সিদ্ধ করিবার জন্য, একটী আইনের প্রয়োজন হইল; গবর্ণমেণ্টও তা স্বীকার করিলেন। যে কারণে আইনটিতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভাবাত্মক স্বীকারোক্তি সংযোজিত হইল, তাহা অনেকেই জানেন। এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ রহিত করিবারও ব্যবস্থা হইল। কিন্তু "আমি হিন্দুধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি স্বীকার করি না," ইহা অনেকেই পছন্দ করিলেন না। অথচ অনন্যোপায় হইয়া ব্রাহ্মদিগকে এই আইন অনুসারেই বিবাহ রেজেষ্টারী করিতে হইতেছে। এই আইন সংশোধন করিবার জন্য অনেকবার চেষ্টা হইয়াছে। স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐ অভাবাত্মক স্বীকারোক্তি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে উত্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা তাহার সমর্থন করিয়াছিলাম; কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ১৯২৩ সালে ডাঃ গৌরের একটা সংশোধনপ্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহাতে "আমি খৃষ্টধর্ম্ম, ইহুদী-ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম প্রভৃতি স্বীকার করি না" ইহার পরিবর্ত্তে, "আমি হিন্দুধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম বা জৈনধর্ম্ম স্বীকার করি", এরূপ বলিলেও চলিবে, এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু যাঁরা এই শেষোক্তভাবে স্বীকারোক্তিদ্বারা বিবাহ করিবেন, তাঁহাদিগকে হিন্দুসমাজের কতকগুলি অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। ইহাতেও ব্রাহ্মগণের বিশেষ সুবিধা হইলনা। কারণ, ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকেই যেমন "হিন্দু ধর্ম্ম খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রভৃতি স্বীকার করিনা", ইহা বলিতে অনিচ্ছুক, তেমনি আবার অনেকে "হিন্দুধর্ম্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইত্যাদি স্বীকার করি" তাহা বলিতেও অনিচ্ছুক। বিশেষতঃ জন সাধারণের ভিতরে এখন ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মনিরপেক্ষ ভাবে একটা বিবাহ আইন সকল সভ্য সমাজে আছে; এখানেও একটা থাকা প্রয়োজন। সেই জন্য ডাঃ হরি সিং গৌর প্রস্তাব করিয়াছেন, "আমি খৃষ্টধর্ম্ম, য়ীহুদী ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম প্রভৃতি স্বীকার করিনা" এর পরিবর্ত্তে "আমি ভারত বর্ষের অধিবাসী" (I am domiciled in India) ইহা বলিলেও চলিবে। এই সংশোধিত আইনে অন্য স্বীকারোক্তিগুলি যথাযথ থাকিবে—যেমন (১) আমি বর্ত্তমানে অবিবাহিত, (২) আমার বয়স (বরের পক্ষে) ১৮ বৎসর (কন্যার পক্ষে) ১৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, (৩) আমাদের মধ্যে এমন রক্তের সম্পর্ক নাই যাতে আইন অনুসারে বিবাহ অসিদ্ধ হ'তে পারে। কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে স্বীকারোক্তি তাতে এই থাকিবে "আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী" অথবা "আমি হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম অথবা শিখ ধর্ম্ম স্বীকার করি"। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এই আপত্তি করা হইয়াছে, এই যে দুই রকম স্বীকারোক্তি, ইহার একটা আর একটা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে। অর্থাৎ "আমি ভারত বর্ষের অধিবাসী" এই বলিলে তার মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখও ত থাকিতে পারে। এই সংশোধিত প্রস্তাব সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতামত চাওয়া হইয়াছিল। সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এই সংশোধিত প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যে আপত্তি দেখাইয়াছেন তাহা হইতে আইনটিকে বিমুক্ত রাখিবার জন্য, ঐ দ্বিতীয় স্বীকারোক্তিটি অর্থাৎ "আমি হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম, অথবা শিখধর্ম্ম স্বীকার করি," এই অংশটুকু এবং তৎসংসৃষ্ট যে সকল ধারা আছে-

তাহা তুলিয়া দেওয়া হউক। এই প্রস্তাব গৃহীত হ'লে আইনটি সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্মনিরপেক্ষ হইবে। আমরা অনুষ্ঠান ও উপাসনা দ্বারা ধর্ম্মানুমোদিত করিয়া লইব। কিছুদিন হ'তে ব্রাহ্মদিগের বিবাহের জন্য একটি সংশোধিত আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার কথা চলিতেছে। তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে, জানিনা। কিন্তু এই সংশোধিত প্রস্তাবটি গৃহীত হ'লে ব্রাহ্মগণের বিবাহের অনেক অসুবিধা দূর হয়। জানিনা, কেন আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই সংশোধিত প্রস্তাবে আপত্তি উঠিবে বলিয়া কাগজে লেখা হইয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ ত এই আইন কিম্বা কোনও আইন অনুসারেই বিবাহ রেজেষ্টারী করেন না। এই আইন অনুসারে বিবাহ করা কাহারও পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে, ব্রাহ্মদের পক্ষেও নহে। আদি সমাজের ব্রাহ্মরা যে প্রণালীতে বিবাহ দেন, তাহাতে অসবর্ণ বিবাহ চলেনা, ব্রাহ্মণেতর কোনও আচার্য্য পৌরহিত্য করিতে পারেন না। যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ দিতে চান এবং ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিকে বিবাহে আচার্য্য মনোনীত করিতে চান, তাঁহাদের বিবাহ আইনসিদ্ধ হইবার সুবিধা দিতে আদি ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্মগণ কেন আপত্তি করেন, তাহা বুঝিতে পারিনা। বর্ত্তমানে আদি ব্রাহ্মসমাজেরও কেহ কেহ অসবর্ণ বিবাহ করিতে যাইয়া ৩ আইনের আশ্রয় লইয়াছেন। জাতীয় গণ্ডী ক্রমে ভাঙ্গিবেই। এরূপ অবস্থাতে আদি ব্রাহ্মসমাজ অপরের সুবিধার পরিপন্থী কেন হইবেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়না। আশা করি, সকল উদার ভাবাপন্ন ব্যক্তিই এই আইনটির সমর্থন করিবেন। অপরকে আইনের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা ন্যায়সঙ্গত নহে; তাহা সকলের পক্ষেই অকল্যাণকর।

ঈশ্বর-প্রীতি*

ঈশ্বরের শক্তি মানবহৃদয়ে কার্য্য করে, ইহা সাধুগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। মানুষ তাঁর প্রেরণায় চলে, কাজ করে।

মানুষ যত কাজ করে, তাহার কতটা ঈশ্বরপ্রেরণায় করে, আর কতটা তার নিজের বাসনার প্রেরণায় করে—ইহাও তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন।

ঈশ্বরপ্রীতি মানব-হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাতে নূতন শক্তি আনয়ন করে; চোখে নূতন আলোক প্রদান করে, হাতে নূতন বল বিধান করে, হৃদয়ে নূতন ভাব সঞ্চারিত করে। সাধুগণ ইহা লক্ষ্য করেছেন।

এই জন্য "নব জীবন" বা "দ্বিজত্ব" শব্দ ধর্ম্মসমাজে উৎপন্ন হইয়াছে।

কেমন করিয়া ঈশ্বরের শক্তি মানবহৃদয়ে কাজ করে, ইহা এক কঠিন প্রশ্ন। ঈশ্বরের শক্তি মানবহৃদয়ে কাজ করে মেনে নিলেও, কি প্রকারে কাজ করে-তাহা বর্ণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। ইহাও সাধুগণ অনুভব করিয়াছেন। চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই।

দুইটি উপমাদ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন:—কখনও (১) বায়ুর সঙ্গে, কখনও (২) অগ্নির সঙ্গে তাঁহার প্রেরণার তুলনা করিয়াছেন।

(১) ঈশ্বরের প্রেরণা বায়ুর ন্যায়। বায়ু সর্ব্বদা চলে, কোথা হইতে আসে, কেন আসে, আপনি স্বাধীন ভাবে আসে, স্বাধীন ভাবে কোনও বাধাবিঘ্ন না মানিয়া বহিয়া যায়; সময়ে সময়ে অত্যন্ত দুর্জ্জয় হইয়া সকলকে অস্থির করিয়া তোলে। তাঁহার প্রেরণাও ঠিক তদ্রূপ।

(২) ঈশ্বরের প্রেরণা আগুনের মত মানুষকে ধরে।

ঈশ্বরের প্রেরণাকে বায়ু এবং আগুনের সহিত তুলনা করার কারণ এই যে—ভৌতিক জগতে বায়ু এবং তাপ গতি উৎপন্ন করে। বায়ু বহিলে সমস্ত জিনিষ, বৃক্ষ লতা পাতা ঘর বাড়ী, কাঁপে, নড়ে। তাপও গতিকে উৎপন্ন করে,—প্রমাণ, আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপত্তি।

ঈশ্বরের প্রেরণা, মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া, গতিকে উৎপন্ন করে, ইহার অর্থ এই যে, মানুষ যেমন ছিল তেমন আর থাকিতে পারে না।

খাঁটি ঈশ্বরপ্রীতি, যে-প্রেমে হৃদয়ে আগুন জ্বলে—"A soul aflame with love of God."—তাহা বড় সাধারণ ব্যাপার নয়।

গড়ের উপর, মুখে আমাদের খুব ঈশ্বরপ্রীতি আছে—আড়ন পাড়ন দিন রাত্রি বুনিতেছি; বিশেষতঃ প্রচারকদের প্রচাররূপ বস্ত্রবয়নের 'টানা' ও 'পড়েন' এ খুব ঈশ্বরপ্রীতির কথা আছে—বড় বড় শব্দ আছে; আমাদের গানে আমরা খুব ঈশ্বরপ্রীতি মানি, বলি 'তুমি আমার সব, সব তোমাকে দিতে পারি'; প্রার্থনায় যত কথা বলি তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ থাকিলে রক্ষা থাকিত না।

এই ঈশ্বরপ্রীতি পাওয়া বড় সহজ নয়, কিন্তু যদি উহা হৃদয়ে আগুন জ্বালে, তবে সত্য সত্যই ব্রহ্মশক্তি হৃদয়ে আসিয়া মানুষকে প্রেরণা দিয়া লইয়া যায়।

এইটি আগে, এই ঈশ্বরপ্রীতি সর্ব্বাগ্রে চাই। যেমন কেও যদি কারবার করিতে চায়, তবে, সে কিসের দোকান করবে, কি ভাবে করবে, এ সমস্তই নির্ভর করে তাহার মূল ধনের উপর। ঈশ্বরপ্রীতি সেই মূল ধন।

নীরব সাধকের নিভৃত চিন্তা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[৪০]

"হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে" এ কথা কি গানের বিষয় হইয়াই থাকবে? হরি যদি সকল হন, তবে ত আর দুঃখ আক্ষেপ থাকতে পারে না। এখন যে হা হুতাস ক'রে দিন কাটাতে হচ্ছে তা ত আর সম্ভবপর হয় না। তখন যদি কেহ পায়েও ঠেলে, তবুও তাঁর পায়ে ঠাঁই পেয়ে সুস্থিরই থাকা যাবে। সে অবস্থা কবে হবে গো, কবে হবে? এখন যে চলচ্চিত্ত হ'য়ে পড়ি তাহা আর কবে যাবে গো, কবে যাবে?

* ১৫ই অক্টোবর, ১৯০৩, বৃহস্পতিবার, সাধনাশ্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক বিবৃত।

[৪১]

তাপসমালার তাপসগণ যে ধর্ম্মজীবন যাপন করেছেন, তাঁহারা যাহাকে ধর্ম্মসাধনের উপায় বলেছেন, তাহাই যদি ঠিক হয়, তবে ত আমাদের জীবন ধর্ম্মজীবন নামেরই যোগ্য হইতে পারে না। তাঁদের যত বিরাগ ছিল আহারের উপরে। আমাদের যত অনুরাগ আহারের উপরে। অনাহার যদি ধর্ম্মলাভের উপায় হয়, তবে আমরা কি এত আহার করিয়া ধর্ম্মজীবন পাইব? সমস্যা সহজ নহে।

[৪২]

আমাদের দয়াল পিতা প্রেমময় প্রভু বৎসরের নানা সময়ে নানা ফল পুষ্পে ধরাকে সাজান। সাধুগণ, ধর্ম্মার্থীরা, যদি তাহা ভোগ না করেন, তাহা কি বনের পশু-পক্ষীদের ভোগের জন্য থাকবে বা যাহারা ধর্ম্ম চায় না, বিষয়সুখে যারা মত্ত, তারাই কি সে সব ভোগ করবে? তাঁর দানের উদ্দেশ্য ত সেরূপ বলিয়া মনে হয় না। তাঁর সকল সন্তানেই তাহা ভোগ করবে, এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাহা দিয়া থাকেন।

[৪৩]

বন্ধুজনকর্ত্তৃক কখনও কখনও জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে, কেন আমি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকপদপ্রার্থী হইয়াও শেষে সে পদ গ্রহণ করি নাই। এ প্রশ্নের উত্তরে আমার বেশী কথা বলিবার নাই—এক কথাতেই সে উত্তর দেওয়া যায় এবং আমি সে উত্তরই দিয়াছি। সে উত্তর এই যে, আমি সর্ব্বদাই আপনাকে এ কাজের অনুপযুক্ত বলিয়া জানিয়াছি এবং এখনও জানি। অযোগ্য বলিয়াই এ পদপ্রার্থী হইয়াও শেষে তাহা গ্রহণ করি নাই। কিন্তু আমি এ কার্য্যেই জীবন যাপন করিয়াছি। এমন কেন হইল? জীবনের শুভ মুহূর্ত্তে প্রাণে এই সংকল্প আসিয়াছিল যে, আমি, পার্থিব প্রয়োজন সাধনার্থই হউক বা অন্য যে কোন প্রয়োজন সাধনার্থই হউক, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিব। আপনাকে অন্য কিছুর সেবায় দিব না। অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিয়া তাহা করিব। অন্য আর কাহারও সেবায় যাইব না। সেই ভাবদ্বারা চালিত হইয়াই ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যেই আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছি। যখন কিছু বলিয়াছি (বক্তৃতা বা উপদেশাদি) ব্রাহ্মসমাজ এবং তৎসংসৃষ্ট কিছুতেই বলিয়াছি। লিখিবার যে উদ্যম আসিয়াছে তাহাও ব্রাহ্মসমাজসংসৃষ্ট কাজের জন্যই লিখিয়াছি। অর্থোপার্জ্জনও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যদ্বারাই করিয়াছি। ইত্যাদি প্রকারে আমার সামান্য শক্তি ও চেষ্টা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যেই নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে।

সুবোধ বা বাধ্য সন্তান বা শিষ্যের যে আচরণ তাহা আমাতে পরিলক্ষিত হয় নাই। বাধ্য সন্তান বা শিষ্য পিতামাতা গুরুর ও প্রভুর আদেশ পাইয়া বা তাঁহার প্রেরণা পাইয়াই তদনুসারে জীবনযাপন করিয়া থাকে। ইতস্তত: করা বা আপত্তি করা তাহাদের প্রকৃতি নয়। আমাতে সে ভাবের অভাবই পরিলক্ষিত হইয়াছে। আমি ধাক্কা খাইয়া এবং পরাজিত হইয়াই প্রভুর কার্য্যে রত হইয়াছি। বাধ্য ভৃত্যের বা অনুগত শিষ্যের মত আমার আচরণ হয় নাই। কতকটা অজ্ঞাতসারে, কতকটা অন্যদ্বারা পরিচালিত হইয়াই চলিয়াছি। পর্ব্বতগাত্র হইতে স্খলিত প্রস্তরখণ্ড যেমন স্রোতপরিচালিত হইয়া অবশ ভাবে গড়াইতে গড়াইতে চলে, তেমনি আমার গতি হইয়াছে—ঘটনার স্রোত আমাকে লইয়া চলিয়াছে। সেই ভাবে চলিলেও কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ভিন্ন অন্য কার্য্যে মন দিবার অবস্থা আমার হয় নাই। তাই অনেক সময় প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি এবং প্রচারক না হইয়াও প্রচারেই আমার যা কিছু সামর্থ্য তাহা নিযুক্ত হইয়াছে। প্রচারক না হইয়াও সেই নামে আমার পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু বন্ধুগণ আমাকে প্রচারক নামে অভিহিত করিলে বা সেই নামে আমার পরিচয় দিলে আমি সঙ্কোচই প্রকাশ করিয়াছি। এ গৌরবের পদের উপযুক্ত বলিয়া আমাকে কখনও মনে হয় নাই।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শিক্ষিত ব্রাহ্ম মহিলাদিগের কর্ত্তব্য।

(বিগত ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে মহিলাদের উৎসবে পঠিত)

শিশুকালে আমরা একান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকি—মা, বাবা, আত্মীয়, স্বজনের আন্তরিক ও অক্লান্ত স্নেহ ও যত্নে আমরা দিন দিন বর্দ্ধিত ও সুস্থ সবল হ'য়ে উঠি—ক্রমে চল্‌তে ও বল্‌তে শিখি। তার পরে আর একটু বড় হ'লেই লেখা পড়া শিখতে আরম্ভ করি। বড় হ'য়ে উঠলে আর তখন মায়ের একনিষ্ঠ দিন রাত্রি সেবার কিম্বা সাহায্যের দরকার হয় না। তখন দৈনন্দিন কার্য্যাদি নিজেই করিতে পারি। জ্ঞানোন্মেষ ও শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নানা কাজ কর্‌বার ক্ষমতা যেমন বেড়ে উঠে, তেমনি আমাদের মনে কর্ত্তব্যভাবও জেগে উঠে।

প্রথমতঃ, মা বাবার কাজের কিছু সাহায্য কর্‌তে থাকি। তাঁদের ছোট খাটো কাজের ভারের অংশ নিয়ে তাঁদের একটু অবসরের সময় দিই। মা বাবা যখন দেখেন তাঁর সন্তানেরা তাঁদের কষ্ট ও শ্রম লাঘব কর্‌বার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, তাঁরা যে কাজটী ভালবাসেন তা কর্‌বার জন্যও তাদের কত আগ্রহ, তাঁদের উপদেশ মত চ'লে চরিত্রকে মহান্ ও উন্নত কর্‌বার জন্য কত চেষ্টা, তখন তাঁরা কতই না সুখী হন! আর, তখন অপর সকলে বলেন যে ওই পরিবারের সন্তানেরা তাদের কর্ত্তব্য কাজই কর্‌ছে—তারা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ।

উচ্চশিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান বেড়ে উঠে। সর্ব্ব প্রথমে আমরা আত্মীয় স্বজন পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করি। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে সমাজের আদর্শে জীবনকে চালাচ্ছি, তার প্রতিও কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে মনোযোগী হ'তে পারি।

আগে আমাদের সমাজের সকল সৎ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগ রাখ্‌তে হবে, তার পরে যথাসাধ্য সে সকল কাজের সহায়তা কর্‌তে হবে।

যে ব্রাহ্মসমাজের কৃপায় আমরা নারীরা জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি, যে সমাজে পুত্র কন্যা উভয়কেই সমভাবে

যত্নের সহিত পিতামাতা উচ্চ শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যে সমাজে নারীর আসন অতি উচ্চে, যে সমাজ এ দেশে নর নারীর সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ খুলে দিয়েছেন, সেই সমাজের নিকট আমরা যে কত ঋণী তা বলা যায় না।

পিতা মাতার স্বর্গীয় স্নেহের ঋণ আমরা শোধ করিতে পারিনা জানি; তবুও আমাদের জীবন যদি তাঁদের কোন সাহায্যেই না আসে তবে যেমন সে জীবনকে ব্যর্থ বলা যেতে পারে, তেমনি যে সমাজ আমাদের পরম পিতার কথা জানিয়েছেন ও আমাদের অন্তর শিক্ষার নির্ম্মল আলোকে আলোকিত করেছেন, সব রকম সৎ চিন্তার অঙ্কুর মনে বপন করেছেন, ও নানারূপ সৎকার্য্যে উৎসাহী ও ব্রতী করেছেন, সে সমাজের মঙ্গলচিন্তা যদি না করি, তার কাজ যথাসাধ্য যদি না করি, তবে যে কর্ত্তব্য-বিমুখতার জন্য মনে অনুতাপ ও ক্ষোভ নিয়ে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হবে!

বয়সবৃদ্ধি ও শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে কর্ত্তব্যের ভারও বেড়ে যায়, সে কথা ত ভুললে চল্‌বেনা। সে ভুল যেন সব সময় আমাদের মনে বেদনা দেয়। আমরা যখন যেখানেই বাস করি না কেন, পাড়াগাঁয়েই হোক কিম্বা সহরেই হোক, সেখানে আমাদের জন্য বড় বড় নামকরা কার্য্যক্ষেত্র না থাকলেও আমরা অন্ততঃ আমাদের প্রকৃত ব্রাহ্মজীবনযাপনদ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের কিছু সাহায্য করিতে পারি। আমাদের পরিবারের সকলের শিক্ষা, চরিত্র ও আচরণদ্বারা অপর সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারি। এরূপে হয়ত কোন পরিবারকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট করতে পারি।

যার যেটুকু শক্তি আছে, তা যেন আমাদের সমাজের কোন কাজে লাগাতে পারি, এই ইচ্ছাই সকলের প্রাণে সর্ব্বদা জাগরূক থাকুক। আর সমাজের কাজ—তা বড়ই হোক কি ছোটই হোক, মন্দিরে ব্রহ্মসঙ্গীত গান ক'রে উপাসনার সাহায্য ক'রেই হোক, কি বেদীতে ব'সে উপদেশ দিয়েই হোক, যখন যে কোন কাজের ডাক আসবে—আমরা যেন সর্ব্বদাই সাধ্যমত সে ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত থাকি।

এরূপ শুনেছি যে, যখন শিখদের ধর্ম্মমন্দিরে কোন উৎসব হয়, তখন ধনীর ঘরের মেয়েরা উৎসবের সব অভ্যাগত অতিথিদের জন্য নিজেরাই রান্না পরিবেশন ও বাসন মাজা ইত্যাদি কাজের ভার নিয়ে "পান্থের" সেবা করে। শুধু যে উৎসবের সময় তারা এ কাজ করে তা নয়, সারা বছর ধরেই কেহ না কেহ মন্দিরে এসে এরূপ কোন কাজ ক'রে দিয়ে যায়। তারা ত তেমন শিক্ষিত নয়, তবু তাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরূপ কাজ করে, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যপালন ক'রে থাকে।

ভগবান আমাদের নিদ্রিত মনকে সচেতন ক'রে দিন, আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করুন। যে ব্রাহ্মসমাজের নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী, তার কার্য্যে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করতে কখন যেন পরাঙ্মুখ না হই, এই তাঁর নিকট প্রার্থনা।

ভগবান আমাদের সহায় হোন, আমাদের পথ দেখিয়ে দিন। যেন আমরা সকলে সমাজের কল্যাণচিন্তা করি ও তার জন্য নিত্য প্রার্থনা করি

শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। (৮)

১৩১৭ সনের ২৬শে অগ্রহায়ণ কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য এবং সম্পাদক গৌরলাল রায় মহাশয় ভগবানের নাম করিতে করিতে ব্রহ্মধামে গমন করিয়াছেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ উপাচার্য্য ও বক্তা ছিলেন। তাঁহার মত একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম কাকিনাতে অতি বিরল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। মহাত্মা মহিমারঞ্জন ব্যতীত কাকিনাতে তাঁহার মত দানশীল ব্রাহ্ম আর কেহই ছিলেন না। ব্রহ্মভক্ত গৌরলাল তাঁহার আজীবনের কষ্টসঞ্চিত দুই হাজার টাকা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কমিটীর হস্তে দান করিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা রামরঙ্গিনী রায় মহাশয়ার মৃত্যুর পর আরো হাজার টাকা এই ফণ্ডে দিতে বলিয়া গিয়াছেন। কাকিনা ব্রাহ্মসমাজ ও মন্দিরটীকে তিনি আপ্রাণ ভালবাসিতেন ও বিশেষ যত্ন করিতেন। শেষ জীবনে কেবলই ব্রাহ্মসমাজের সেবায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় গৌরলাল রায় মহাশয় কাকিনা ব্রাহ্ম-সমাজের অভিভাবক ও রক্ষকস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অভাবে কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের যে প্রকার ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় গৌরলাল রায় মহাশয়ের অভাবের পর শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত ১৩১৭ সনে কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৩২১ সনের চৈত্র মাসে কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের আদি ট্রাষ্টী শ্রদ্ধেয় রমণীমোহন রায় (রাজা মহিমারঞ্জনের জামাতা) কলিকাতা নগরে পরলোক গমন করেন। প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। শেষ জীবনেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে রীতিমত যোগ দিয়াছেন। সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। পাখোয়াজ বাদ্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে বাদ্যসঙ্গতে সঙ্গীতের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র গুপ্ত ১৩২২ সালের ২৯শে চৈত্র কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকীয় পদ ত্যাগ করায়, শ্রদ্ধেয় মুকুন্দলাল সরকার মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করেন। তিনি কাকিনায় ধর্ম্মসভা নামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনাবধি তাহার সম্পাদকীয় কার্য্য রীতিমত সম্পাদন করিয়াছেন এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত উপাচার্য্যের কার্য্যও করিয়াছেন। তিনি মন্দিরনির্ম্মাণ ও তাহার অন্যান্য সমস্ত কার্য্য অক্লান্ত শ্রমের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এবং মন্দিরের সর্ব্ববিধ পবিত্রতা রক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

কাকিনা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা শোভনা নন্দীর চেষ্টা যত্নে ও সুশিক্ষায় ছাত্রসমাজ-গৃহে "বালকবালিকা সম্মিলন" স্থাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ছাত্র ও ছাত্রীদের সঙ্গীত এবং আবৃত্তি হইয়া থাকে।

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বতন ট্রাষ্টীগণ ক্রমে ক্রমে পরলোক গমন করায় মহাত্মা মহিমারঞ্জনের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী ১৩২৬ সালের ১৯শে মাঘ কাকিনা এষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মুকুন্দলাল সরকারকে, কালীবাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র গুপ্তকে এবং কাকিনা কৈলাশরঞ্জন ডিস্পেনসারী ও রাণী শান্তিবালা ইণ্ডোর হস্পিটেলের সব এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত জ্ঞানদানন্দ দাসকে কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের, তৎসংলগ্ন জমির, ছাত্রসমাজের এবং অন্যান্য জোত ইত্যাদি সম্পত্তির যাবতীয় কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয়ের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। তাঁহার ট্রাষ্টীনিয়োগপত্রেই তাহা বিবৃত হইয়াছে। কাকিনা উপস্থিত থাকিলে তিনি ও তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা রাণী শান্তিবালা রায় চৌধুরাণী মহাশয়া কন্যাদ্বয়সহ কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে বিশেষ আগ্রহের সহিত যোগ দিয়া থাকেন। স্বর্গীয়া রাণী মানমোহিনী চৌধুরাণীও প্রত্যেক উৎসবে রীতিমত যোগ দিতেন এবং দরিদ্রদিগকে জলপাত্র ও শীতবস্ত্র দান করিতেন।

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টী ও সম্পাদক মুকুন্দলাল সরকার মহাশয় ১৩২৮ সালের চৈত্র মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুকাল পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে কিছুদিন সমাজের উপাচার্য্যের কার্য্যও করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ দাস ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রদ্ধেয় ভারতচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের প্রায় প্রারম্ভকাল হইতে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন। রীতিমত ব্রহ্মোপাসনা করিতে করিতে জীবন শেষ করিয়াছেন।

পরের ভূমিকম্পে কাকিনা ব্রহ্মমন্দিরের বারেণ্ডার ছাদ অত্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছিল এবং মন্দিরও আগাছায় অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছিল এবং ছাত্রসমাজের টীনের ঘর পতনোন্মুখ হইয়াছিল। ১৩৩৩ সনের শেষ ভাগে ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র গুপ্ত, সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ দাশ ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনের বিশেষ তত্ত্বাবধানে মন্দিরটি রীতিমত মেরামত ও ছাত্রসমাজগৃহ ভাঙ্গিয়া পুনঃ নির্ম্মিত হইয়াছে।

উপসংহার

কেবল কাকিনার রাজা এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণেরই কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টী নিযুক্ত করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মতামত লইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী লোকদিগকে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ট্রাষ্টীদের কাহারো মতান্তর হইলে বা চিরকালের জন্য স্থানান্তর হইলে, তাঁহাদের স্থানে অন্য কাহাকেও ট্রাষ্টী নিযুক্ত করার নিয়ম আছে। ট্রাষ্টী-নিয়োগপত্রেই তাহা লিখিত থাকে। আর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য এবং সম্পাদক ইত্যাদি সমাজের সভ্যদের দ্বারাই আবশ্যক মত মনোনীত হইয়া থাকেন।

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে রীতিমত প্রত্যেক রবিবার প্রাতে উপাসনা, উপদেশ, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্বাবধি হইতেছে এবং বিশেষ বিশেষ দিনে নিরাকার ঈশ্বর প্রতিপাদ্য শাস্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা এবং আলোচনা, ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব ও মহিলা সমিতির উৎসব হইয়া থাকে এবং ব্রাহ্ম প্রচারক বা বক্তাগণের আগমন উপলক্ষে অন্যান্য বারেও উপাসনা সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন হয়। কিন্তু বক্তৃতা, কথকতা, ব্যক্তিবিশেষের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুদিন উপলক্ষে উপাসনাদি মন্দিরে হয় না, ছাত্রসমাজগৃহে হইয়া থাকে। আর মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন উপলক্ষে ও মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ৬।৭ দিন ব্যাপী উৎসব হয়। তৎসঙ্গে একদিন করিয়া মহিলা সমিতিরও উৎসব মন্দিরে হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই দুই উৎসব উপলক্ষে দরিদ্রদিগকে চাউল ও পয়সা বিতরণ ও মাঘোৎসবে প্রীতিভোজন হইত। অনেকদিন পর গত বৎসর প্রীতিভোজন হইয়াছে। এই দুই উৎসবেই কলিকাতা বা ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্ম প্রচারক ও বক্তাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। ৬ই ভাদ্র, ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে উপাসনাদি হয়। কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে ২৭শে সেপ্টেম্বর ছাত্রসমাজের গৃহে উপাসনা, বক্তৃতা ও তাঁহার মহৎ জীবনী আলোচনা হইয়া থাকে।

কাকিনা ছাত্রসমাজগৃহে প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় সম্মিলিত ছাত্রদের উপাসনা, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও আলোচনা হয়। আর ছাত্র সমাজপ্রতিষ্ঠার দিন ২৪শে বৈশাখ প্রতি বৎসর উৎসব, তৎপর বালকবালিকাসম্মিলন, আবৃত্তি এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক বক্তৃতাদি, ব্যক্তিবিশেষের জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনাদি হইয়া থাকে এবং বালকবালিকাসম্মিলনের দিন তাহাদিগকে জাতিনির্ব্বিশেষে মিষ্টদ্রব্য বিতরণ করা হয়।

স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্ববিধ ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য যে দুইটী মোকরীর জোত দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার আয়ের দ্বারাই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্ম প্রচারক ও বক্তাদিগের পাথেয় খোরাকী আর আগন্তুক প্রচারকদিগের আংশিক পাথেয় ও খোরাকী, সমাজের একজন চাকরের বেতন, উৎসবের আলো ইত্যাদি এবং ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা ও পুস্তকের মূল্য ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। পূর্ব্বে রাজসরকার হইতে মন্দিরের চুণকাম ও মেরামতী ব্যয় দেওয়া হইত। এখন সমাজের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া আবশ্যক মত মেরামতী কার্য্য করিতে হয়।

বর্ত্তমানে কাকিনা ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানদানন্দ দাস ট্রাষ্টীদ্বয়, শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ দাস সম্পাদক, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন উপাচার্য্য ও সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত সুখময় দাস কোষাধ্যক্ষ এবং বার জন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য আছেন। কাকিনা মহিলা সমিতিতে শ্রীযুক্তা সুখদাসুন্দরী গুপ্তা সম্পাদিকা ও শ্রীযুক্তা আদাসখী দাস সহকারী সম্পাদিকার কার্য্য

করিতেছেন। আর ছাত্রসমাজের উপাসনাদি এখন বন্ধ আছে। কেবল উৎসবের সময় উপাসনা ও বক্তৃতা হইয়া থাকে।

এই ইতিহাস স্বর্গীয় গৌরলাল রায় ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের আংশিক খসড়া অবলম্বনে লিখিত হইল। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিলাম।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব।

ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা।

ভারতের ভাগ্যবিধাতা করুণাময় পরমেশ্বর, এক শত বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও অপর কতিপয় ব্যক্তিকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া, কলিকাতা সহরের একটি ক্ষুদ্র গৃহে নব-যুগের উপযোগী করিয়া, আপনার পবিত্র উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রতিদিন তিনি যেমন আপন ভক্তকে, প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা মাত্র, তাঁহার নাম স্মরণ করিতে ও তাঁহার ধ্যানে নিবিষ্ট হইতে প্রেরণা দান করেন, ভারতের নব জাগরণে তিনি তেমনি এ দেশকে, উক্ত কয়েকজন ভক্ত সন্তানের মধ্য দিয়া, সকল কর্ম্মের আরম্ভের পূর্ব্বে সমবেত ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠায় বিধাতার অভিপ্রায়।

ব্রহ্মোপাসনায় যে ভারতের নূতন জাতীয় জীবনের আরম্ভ হইয়াছে, ইহা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অশেষ করুণা। প্রত্যুষে ব্রহ্ম-চিন্তাপূর্ব্বক দিবসের কার্য্য আরম্ভ করিলে, অহঙ্কার, স্বার্থবুদ্ধি, দ্বেষ-হিংসা ও ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্ত থাকা যায়, এবং কর্ম্মসকল সুন্দর ও সফল হয়। নব-যুগের উষাকালে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা করিয়া এ দেশ তেমনি সকল কর্ম্মে সফল হইয়া উঠিবে, ইহাই বিধাতার স্পষ্ট অভিপ্রায়।

ব্রহ্মোপাসনা ব্যক্তিগত জীবনকে ক্ষুদ্রতা, পাপ ও দুঃখ হইতে বাঁচাইয়া মহত্ত্ব দান করে; পারিবারিক জীবনকে প্রীতি, শ্রদ্ধা ও নিঃস্বার্থতায় ভূষিত করিয়া শান্তিময় করে; জাতীয় জীবনকে উদারতা, একতা ও পরস্পরের হিতৈষণা দ্বারা মণ্ডিত করিয়া স্বাধীনতার গৌরব দান করে। আমাদের এই ত্রিবিধ জীবনের উদ্ধারের জন্যই পরিত্রাতা ভগবান স্বয়ং ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্রহ্মোপাসনার প্রভাব ও প্রসার বৃদ্ধি।

ইংরাজী ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট (বাঙ্গালা ১২৩৫ সালের ৬ই ভাদ্র) তারিখে যখন ব্রহ্মোপাসনারূপ ক্ষুদ্র বীজটি ভারত ক্ষেত্রে রোপিত হয়, তখন কয় জনই বা ইহার প্রকৃতি জানিতেন?—কয়জনই বা ইহার মহত্ত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন? কিন্তু, আজ এক শত বৎসর পরে, সেই ক্ষুদ্র, কিন্তু জীবন্ত, বীজ বিশাল বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে;—এই ব্রহ্মোপাসনাকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজ নামক বৃহৎ ধর্ম্মমণ্ডলী গঠিত হইয়া ভারতের সহরে সহরে, এমন কি, অনেক গ্রামে, ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ বঙ্গে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শতাধিক ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি সপ্তাহে সমবেত ব্রহ্মোপাসনার পবিত্র ধ্বনি উত্থিত হইতেছে; এবং সেই উপাসনায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, জৈন, পার্শি, য়িহুদী, খাসিয়া, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর নরনারী আগ্রহের সহিত যোগদান করিতেছেন। অগণ্য নরনারী এই উপাসনাকে আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সহায়, শান্তির নিদান, ও পরিত্রাণের উপায় জানিয়া ইহাকে জীবনের অবলম্বন-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সহস্রাধিক পরিবার ইহাকে নিষ্ঠাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শের অনুযায়ী জীবন গঠন করিতে, ও সকল প্রকার গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে, চেষ্টা করিতেছেন।

কিরূপে মঙ্গলময় বিধাতা সামান্য প্রারম্ভ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়াছেন, কিরূপে উপাসনা-পদ্ধতির বিকাশ করিয়া, ব্রহ্ম-সাধনায় ভক্তির অমৃত রস ঢালিয়া দিয়া, জগতের জ্ঞানভাণ্ডার ও সাধন ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, ত্যাগ ও সেবার স্বর্গীয় পথ দেখাইয়া তিনি ব্রহ্মসাধকদিগের অজস্র কৃপা করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে, আপামর সাধারণের জুড়াইবার স্থান করিয়াছেন, কিরূপে তিনি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, অক্ষয়কুমার, রামতনু, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, উমেশচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, কালীনাথ, নগেন্দ্রনাথ, শিবনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি অগণিত সাধু আত্মাকে এই ধর্ম্মের সাধনায় আনিয়া শক্তিদান করতঃ দেশের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ও এই সকল মহাত্মার জীবন-চরিতেও বিবৃত আছে। কিরূপে এই ধর্ম্মের সমাচার তিনি অন্যান্য প্রদেশে পৌঁছাইয়াছেন, এবং রাণাডে, ভাণ্ডারকার, চন্দ্রভারকর, শ্রীধরালু নাইডু, ভিরেশলিঙ্গম, রঘুনাথায়, প্রকাশদেব, সুন্দরসিং, সুব্বা রাও, নভল রায়, ব্রজরঙ্গবিহারী, মধুসূদন রাও, পদ্মহাঁস গোস্বামী, জীবন রায় প্রভৃতি সদাশয় ব্যক্তিদিগকে মহৎ জীবন দান করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা সকল প্রদেশে এই নবালোক বিস্তার করিয়া সমগ্র ভারতকে এক লক্ষ্যে, এক ব্রতে, এক সাধনায় দীক্ষিত করিবার আয়োজন করিয়াছেন, তাহাও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অজ্ঞাত নাই।

ভারতের উদ্ধারকর্ত্তা পরমেশ্বর প্রত্যেক প্রদেশে এই সকল ও অন্যান্য মহাত্মাদের দ্বারা উন্নত ধর্ম্মভাবের বিস্তার, নৈতিক আদর্শের বিকাশ, শিক্ষাবিস্তার, সাহিত্য-গঠন, নারীজাতি ও অবনত জাতিসমূহের উন্নতি, সমাজ-সংস্কার, রাষ্ট্রনীতি-সংস্কার প্রভৃতি নানা লোকহিতকর কার্য্য করাইয়া দেশকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়াছেন; এবং আজও এই ধর্ম্মের আশ্রিত ও অনুরাগী সেবকদের দ্বারা, কি বঙ্গদেশে, কি অন্যান্য প্রদেশে, বিবিধ শুভানুষ্ঠান করাইতেছেন। বিগত এক শতাব্দীতে দেশ জ্ঞানে, ধর্ম্মে, নীতিতে ও মঙ্গল-কর্ম্মে যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা এই সকল ত্যাগী পুরুষের ত্যাগের ফল; এবং মূলতঃ তাহা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, ব্রহ্মোপাসনার ফল। ধন্য ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তা পরমেশ্বর!

ভবিষ্যতের আশা।

আবার, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা বিগত এক শত বৎসরে আমরা যে পরিমাণ কল্যাণ লাভ করিয়াছি, ইহাই ত শেষ নহে; ভবিষ্যতে ইহার অপেক্ষা অনেক অধিকগুণ কল্যাণ অবশ্যই লাভ করিব। এই কালের মধ্যে ইহার দ্বারা সহস্র সহস্র নরনারী নব জীবন লাভ করিয়াছেন; পরে আরও লক্ষ লক্ষ অবশ্যই লাভ করিবেন। ইহার প্রভাবে পরিবারসকল সুন্দর ও আত্মার বিকাশের অনুকূল হইয়াছে, সমাজ-ব্যবস্থা সুসংস্কৃত ও বাধামুক্ত হইয়াছে, জাতীয় জীবনে প্রাণসঞ্চার হইয়াছে; ভবিষ্যতে সুশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ও ইহার আশ্রিত সেবক-সেবিকাদিগের ত্যাগস্বীকারের সাহায্যে, ক্রমে এই প্রভাব আরও দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হইতে থাকিবে।

মহোৎসবের আয়োজন।

অতএব, আজ আমাদের আনন্দের দিন! আজ ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ সুমহৎ দানের জন্য পরিত্রাতা বিধাতার চরণে সকলে মিলিয়া কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার দিন! তাই আজ ভারতবর্ষে দেড় বৎসরব্যাপী এক মহা-মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। ১২৩৫ সালের ৬ই ভাদ্র তারিখে কলিকাতার এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রকাশ্যে সমবেত ব্রহ্মোপাসনার প্রথম প্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম) হয়; এবং ১২৩৬ সালের ১১ই মাঘ তারিখে, সেই শিশু ব্রাহ্মসমাজ নিজস্ব মন্দিরে উঠিয়া গিয়া চিরদিনের জন্য জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি

আকর্ষণ করে এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। জন্ম ও গৃহপ্রতিষ্ঠা এই উভয় ঘটনাকে উপযুক্ত গৌরব দান করিবার উদ্দেশ্যে, বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালের ১লা ভাদ্র হইতে আগামী বৎসরের মাঘের শেষ পর্য্যন্ত পূর্ণ দেড় বৎসর কালকে মহোৎসবের সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। আর, সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রিত সেবক ও অনুরাগী ভক্তগণ ছড়াইয়া আছেন; এই কারণে, এই বিশাল পুণ্যভূমিকে মহোৎসবের ক্ষেত্র বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। যেখানে যে-কেহ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন, যেখানে যে-কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে পারিবারিক জীবনে কল্যাণ লাভ করিয়াছেন, যেখানে যে-কেহ এই উদার, মিলন-প্রধান, উন্নত ধর্ম্মের সহায়তায় জাতীয় জীবনে মহত্ব লাভের প্রত্যাশা করেন, তিনিই এই মহোৎসবের পূজারী; তাঁহাকেই ইহাতে কায়মনে যোগদান করিতে হইবে।

মহোৎসবের চারি প্রণালী।

এই মহা-মহোৎসব চারি প্রণালীতে সম্পন্ন হইবে :—

(১) নিখিল ভারতীয় উৎসব; ইহা কলিকাতাস্থ একটি কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে; (২) মফস্বল সমাজ সমূহের স্থানীয় উৎসব; ইহা প্রত্যেক সমাজকর্ত্তৃক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে পরিচালিত হইবে; (৩) পারিবারিক উৎসব; ইহা প্রত্যেক ব্রাহ্মধর্ম্মাশ্রিত ও ব্রাহ্মধর্মানুরাগী পরিবার কর্ত্তৃক স্বাধীন ভাবে সম্পন্ন হইবে; (৪) ব্যক্তিগত উৎসব; ইহা প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং সম্পন্ন করিবেন।

এই চারি প্রণালীর প্রত্যেকটির প্রস্তাবিত প্রকৃতি নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে :—

(১) নিখিল ভারতীয় উৎসব।

সমগ্র ভারতের বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া কলিকাতায় একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি এ দেশের, ও ইংলণ্ড, কানাডা, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, পারস্য, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশসমূহের উদার একেশ্বরবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহকে এই মহোৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ঐ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে অনেক জ্ঞানী, গুণী, ভক্ত ও কর্ম্মী, (পুরুষ ও মহিলা) ক্রমে ক্রমে আসিয়া যোগদান করিবেন।

প্রথমতঃ, আগামী ভাদ্র মাসের প্রারম্ভে কলিকাতায় শততম ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইবে। ভারতের নানা প্রদেশের ভক্ত নর-নারী এবং সম্ভবতঃ কয়েক জন বিদেশীয় প্রতিনিধি তাহাতে যোগদান করিবেন। উপাসনা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, আলোচনা, বক্তৃতা, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের মিলন-সভা, মহিলা-সম্মিলন, যুবক-সম্মিলন, শিশু-সম্মিলন, প্রভৃতি এই উৎসবের অঙ্গ হইবে। ভক্তদের দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয় ও গভীর ধর্ম্মপ্রসঙ্গে, আশা করা যায়, এই উৎসবক্ষেত্র স্বর্গরাজ্যের পূর্ব্বাভাস প্রদর্শন করিবে।

ভাদ্রোৎসবের পর নানা প্রদেশের একদল ভক্ত বিদেশাগত প্রতিনিধিগণসহ সর্ব্বজাতির উপাস্য মহান প্রভু পরমেশ্বরের বিজয়-পতাকা হস্তে লইয়া, ভারত-ভ্রমণে বাহির হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ খোল-করতাল সহকারে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইবেন। নানা দেশের, নানা সম্প্রদায়ের এই মিলিত অভিযানে জগতের ভাবী মহামিলন ধর্ম্মের ত্বরিত শুভাগমনের আশা দেশময় ঘোষিত হইবে। তাঁহারা যখন যেখানে গমন করিবেন, স্থানীয় সমাজ তাঁহাদিগকে সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিবেন। যুবকগণ ও বালক-বালিকাগণ পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের আগমন-পথ যতদূর সম্ভব পত্রপুষ্পে সজ্জিত করিয়া রাখিবেন। যথাসময়ে বালক-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে, পতাকাদি হস্তে লইয়া, ব্রহ্মনামের ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাদিগকে ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইবেন। পরে সেই ভক্তদল এক দিন, দুই দিন বা তিন-চারি দিন তথায় থাকিয়া, স্থানীয় মণ্ডলী ও জনসাধারণের সহিত উৎসব করিবেন। এই উৎসবেও সঙ্কীর্ত্তন, উপাসনা, উপদেশ, বক্তৃতা, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত মিলন-সভা ইত্যাদি অঙ্গ থাকিবে। এইরূপে ভাদ্র-আশ্বিন-কার্ত্তিক তিন মাস বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান প্রধান সহরে গমন করতঃ উৎসবাদি করিয়া, উক্ত ভক্তদল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন। কার্ত্তিকের শেষে দ্বিতীয়বার বাহির হইয়া তাঁহারা বিহার, আগ্রা, অযোধ্যা, দিল্লী, পাঞ্জাব, বরোদা, ইন্দোর, বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কোর, মান্দ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও উড়িষ্যা পরিভ্রমণপূর্ব্বক, নানা সহরে উক্তরূপ উৎসব করিয়া মাঘের প্রথমে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

অতঃপর, ঐ সমুদায় স্থান হইতে যত লোক তাঁহাদের সঙ্গী হইবেন, এবং অপর যত লোক বঙ্গের নানাস্থান হইতে কলিকাতায় সমাগত হইবেন, সকলে একত্রে মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন। আশা করা যায়, সকল ভ্রাতা-ভগিনীর মিলিত উৎসাহ, অনুরাগ ও ব্যাকুলতাতে এই মাঘোৎসবে ভক্তির প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইবে।

তাহার পরে আর এক মাঘ পর্য্যন্ত নানা ভাবে উৎসব চলিতে থাকিবে। তৎসময়ের কার্য্যপ্রণালী ভাদ্রোৎসবে মিলিত ভক্তগণের সহিত পরামর্শ ক্রমে পরে প্রকাশিত হইবে। ১৩৩৬ সালের মাঘ মাসে শততম মাঘোৎসব দ্বারা এই মহোৎসব সমাপ্ত করা হইবে।

এতদ্ভিন্ন, কলিকাতার কমিটি আরও কয়েকটী কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, যে, এই মহোৎসব উপলক্ষে তাঁহারা (ক) ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী নেতাদিগের উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল পুনর্ম্মুদ্রিত করিবেন; (খ) "বিগত শতবর্ষের উদার একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্মের প্রসার" সম্বন্ধে নানা দেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ যে সকল উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি পাঠ করিবেন, তৎসমুদয় পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন; (গ) জগতের সকল একেশ্বরবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করিবেন; (ঘ) সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সকলের উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির উপায় নির্ণয় করিবেন; (ঙ) ভবিষ্যতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অধিকতর শক্তির সহিত প্রচার করিবার জন্য একটী স্থায়ী ফণ্ড গঠন করিবেন; ইত্যাদি।

এই সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য ন্যূন কল্পে এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন।

সকল বয়সের পুরুষ ও নারী, এমন কি, ছোট ছোট বালক-বালিকা পর্য্যন্ত, এই মহোৎসবে কার্য্যতঃ যোগদান করিয়া ধন্য হন, এবং সকলের মনে ইহার পুণ্যস্মৃতি আজীবন জাগরূক থাকে, ইহাই কলিকাতার কমিটির ঐকান্তিক ইচ্ছা। এই উদ্দেশ্যে, মহিলাদের, যুবকদের ও বালকবালিকাদের আপন আপন বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু কিছু কার্য্য উদ্ভাবন ও অবলম্বন করা আবশ্যক। অন্তঃপুর মহিলাদের বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র; অনুরাগিনী ভগিনীদিগের গৃহে গৃহে গমন করিয়া উপাসনাদি করা ও তাঁহাদিগকে মহোৎসবে আহ্বান করা মহিলাদের বিশেষ কার্য্য। সেইরূপ, স্কুল-কলেজ ও তৎসংসৃষ্ট ছাত্রাবাসসমূহ যুবক ও তরুণদিগের, এবং বালিকাবিদ্যালয় ও বালিকা বোর্ডিংগুলি ছাত্রীদিগের বিশেষ ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রে নীতি ও ধর্ম্মের বিস্তারের জন্য এই উৎসবকালে কিছু করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও স্কুলের বালক-বালিকাদিগকে উৎসবের সহিত যুক্ত করিবার জন্য রচনার পুরস্কার (মেডেল ও অন্যান্য উপহার) ঘোষিত হইয়াছে; এবং বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, যে, অনধিক ষোল বৎসর বয়স্ক যে কোনো বালক বা বালিকা চাঁদা তুলিয়া বা নিজ হইতে, অন্ততঃ একটি টাকা পাঠাইবেন, তাঁহাকে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চিত্রাঙ্কিত একটি মেডেলিয়ন উপহার দেওয়া হইবে। *এই সকল রচনা-পুরস্কার

ও মেডেলিয়ন বিতরণে সম্প্রদায়ের ভেদ থাকিবে না; যে কোনও সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রী বালক-বালিকা, এই সকল পাইতে পারিবেন।

ক্রমশঃ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক নিযুক্ত বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্যসমিতির কার্য্যবিবরণী।

বিগত ১৯২৭ খ্রীঃ ১৮ই আগষ্ট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের বন্যার সংবাদ পাইয়া বিপন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ একটি কমিটি গঠিত করিয়া তাহাদের হস্তে সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করেন। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী নাথ দত্ত উক্ত সমিতির সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত অনিলকুমার সেন তাহার সহকারী নিযুক্ত হন।

লাহোরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল দীর্ঘাবকাশ-যাপনার্থ সে সময় কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সিটি কলেজের ছাত্র শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রকে সঙ্গে লইয়া ৩১শে আগষ্ট বালেশ্বর জিলার অন্তর্গত ভদ্রক নামক স্থানে গমন করেন তৎপরে যথাযথ অনুসন্ধানের পর করঞ্জদিয়া নামক স্থানে কেন্দ্র স্থাপিত করেন। তিনি কিছুদিন পরে চলিয়া আসিলে, ছাত্রসমাজ ও ব্রাহ্মযুবক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন ও শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চৌধুরী তথায় গমন করিয়া তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী ও পঞ্চায়তের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করেন। কিন্তু অধিক দিন থাকিতে সমর্থ না হওয়ায় তাঁহারা উভয়েই চলিয়া আসেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনের নেতৃত্বে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বাগচী প্রমুখ একদল কর্ম্মী তথায় প্রেরিত হন। মধুসূদন বাবু ও নগেন্দ্র বাবু শেষ পর্য্যন্ত সেখানকার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। প্রথমতঃ ৮নং সার্কেলের ২৬টী গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপরে কার্য্যের প্রসারের আবশ্যক হওয়ায় তাঁহারা ৭নং সার্কেলের আরও ৩০টী গ্রামের ভার গ্রহণ করেন। এইরূপে ৫৬টী গ্রামের বিপন্নদিগকে নানা-ভাবে সাহায্য প্রদান করেন।

মধু বাবু স্বয়ং প্রত্যেক গৃহে যাইয়া তাহাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং গৃহস্বামীকে একটী করিয়া টিকিট দিয় তাহাতে পরিবারের লোকসংখ্যা—কয়জন পূর্ণবয়স্ক, কয়জন শিশু ইত্যাদি—লিখিয়া দেন এবং প্রতি সপ্তাহে সেই টিকিট দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিকে ।৶০ চাউল এবং শিশুদিগকে তদর্দ্ধেক পরিমাণ চাউল দিয়া সাহায্য করেন। এই রূপে বালেশ্বর জিলায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬টী গ্রামে ৮৯৩ পরিবারে ১১৬৭৪ জন প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ১০০৬৭ জন শিশুকে করঞ্জদিয় কেন্দ্র হইতে ১২৮২ মণ ৩৬ সের চাউল, ২০০ খানি কম্বল, ১১৫ খানি নূতন বস্ত্র, ৪১২ খানি পুরাতন বস্ত্র এবং ৪০টী নূতন ও ৪৪৪টী পুরাতন জামা কামিজ ও শিশুদিগের ফ্রক ইত্যাদি দান করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ ও শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরে গমন করেন। তাঁহারা স্থানীয় ভদ্রমহোদয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মাইতি ও শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র পাত্রের সহায়তায় কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার কাঁথি মহকুমায় মাণিকজোড় গ্রামে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রথমতঃ ৩টী গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া পরে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ২২টি গ্রামের লোকদিগের সাহায্য করেন। এখানেও টিকিটের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রতি সপ্তাহে ।৴২ চাউল ও শিশুদিগকে ৴১। চাউল প্রদান করা হয়। এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৩২২ মন ২৩ সের ২ ছটাক চাউল, ৫০ খানি কম্বল, ৪০০ খানি নূতন ধুতি ও কতকগুলি পুরাতন ধুতি ও জামা দান করা হইয়াছে।

এই কার্য্যের জন্য নানা স্থান হইতে চাঁদা ও জিনিষ পত্রাদি বিক্রয় করিয়া সর্ব্বসমেত মোট টাঃ ১০,৭৪৩৶৫ পাওয়া গিয়াছে। এবং বিভিন্ন সাহায্যকেন্দ্রে ও কলিকাতায় এই কার্য্যের ব্যবস্থার জন্য সর্ব্বসমেত মোট টাঃ ১০,০৭৮৫১০ খরচ হইয়া হস্তে টাঃ ৬৬৪।৴১৫ গচ্ছিত ছিল। কিন্তু সাহায্যসমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারে বন্যাপীড়িত লোকদিগের গৃহ নির্ম্মাণে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাসের নিকট ৬৪৪৫৫ প্রেরণ করা হইয়াছে।

এই উপলক্ষে অনেকেই নানা ভাবে অর্থ ও শক্তি দিয়া আমাদের সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ এই বৃদ্ধ বয়সেও মেদিনীপুরে যাতায়াত করিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। অনুকুল বাবু তথায় অবস্থান করিয়া তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। মধুসূদন বাবু করঞ্জদিয়াতে ক্রমান্বয়ে ৩ মাস কাল অবস্থান করিয়া অতি কঠোর শ্রম স্বীকার করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সহকর্ম্মী নগেন্দ্র বাবু ও ভূপেন্দ্র বাবু তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতাতে অবস্থান করিয়া সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিলকুমার সেন অভিনিবেশ ও একাগ্রতার সহিত সমস্ত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাদের সকলকেই আমি সমিতির পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সর্ব্বোপরি পরম করুণাময় পিতা পরমেশ্বরের চরণে ভক্তিভরে প্রণত হইতেছি। তিনিই আমাদের মত দুর্ব্বল সন্তানদিগকেও তাঁহার অসুস্থ ও বিপন্ন সন্তানদিগের সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন।

শ্রীপার্ব্বতীনাথ দত্ত, সম্পাদক।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব— সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে) প্রাতে উষাকীর্ত্তন ও উপাসনা এবং সায়ংকালে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও সায়ংকালে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পারলৌকিক— আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২১শে মে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্তের পত্নী শরৎসুন্দরী গুপ্ত হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে তিনি লাহোর হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। বিগত ২৯শে মে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং সুরেন্দ্রশশী বাবু জীবনী বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন।

বিগত ১১ই মে পরলোকগত ভুবনমোহন চাটার্জ্জির আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও অপর এক আত্মীয় জীবনী বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন।

বিগত ২৭এ মে কলিকাতা নগরীতে পরলোকগতা বীণা ভোরার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। গরীব দুঃখীদের সাহায্যার্থ দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ৫৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

বিগত ৯ই জুন, কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাসের পিতা পরলোকগত ব্রজমোহন দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান

সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এককড়ি সিংহ রায় উপাসনা, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস পিতার জীবনীপাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান প্রতিশ্রুত হইয়াছে:—ক্ষেত্রমণি-ব্রজমোহন মিসনফণ্ডের জন্য ১০০৲, সিটিকলেজ ১০০৲, মিসন ফণ্ড ১০৲, দুর্ভিক্ষ ফণ্ড ১০৲, দাতব্য ফণ্ড ১০৲ শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, বাণীবন ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ ৫৲।

বিগত ২০শে মে ঢাকা নগরীতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহের স্ত্রী পরলোকগতা বসন্তকুমারী বসুর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শাস্ত্র পাঠ এবং মথুর বাবু সংক্ষিপ্ত জীবনীপাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে নিম্নলিখিত দানগুলি ঘোষণা করা হয়:—শ্রীমতী শিশিরকুমারী নাগ ৩০৲, শ্রীমতী প্রতিভা নাগ ২০৲, শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ গুহ ২০৲ মোট ৭০৲।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়া গত ২৮শে ফাল্গুন সোমবার সায়ংকালে তথায় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উৎসবের উদ্‌বোধনসূচক উপাসনা করেন। ২৯শে ফাল্গুন প্রাতে ও সায়ংকালে মন্দিরে পুনরায় উপাসনা করেন। ১লা চৈত্র সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা করেন। ২রা চৈত্র সায়ংকালে পরলোকগত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্তের ভবনে কথকতা করেন। ৩রা চৈত্র পুনরায় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা করেন। ৪ঠা চৈত্র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে কথকতা করেন। বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ১১ই চৈত্র সায়ংকালে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্রের ভবনে কথকতা করেন। ১২ই চৈত্র প্রাতে ও সায়ংকালে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দুইবেলা উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র সংগীত সংকীর্ত্তন দ্বারা উৎসবের সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ৬ই মে কুমিল্লায় গমন করিয়া তিন রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, "ধর্ম্ম কি" বিষয়ে বক্তৃতা এবং কতকগুলি পরিবারে উপাসনা ও পরিবারের বালকবালিকাদিগকে গল্প বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরীর মাতার গৃহে তাঁহার পুত্রের মৃত্যুদিন উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছে; অমৃত বাবু উপাসনা করিয়াছেন।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব—পরলোকগত ডাক্তার পরেশরঞ্জন রায়ের কন্যা শীলা রায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এসসি পরীক্ষাতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল—বিবিধ পরীক্ষাতে নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম:—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক এম্ এ—সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—মৃণালবালা দাস গুপ্ত। ঐ হাই স্কুল—প্রথমবিভাগে—উষাবালা সেনগুপ্ত, প্রতিভাময়ী গুপ্ত, শৈলবালা সেনগুপ্ত, সুধারাণী রায়, শতদলবাসিনী বসু, পারুলবালা দাস গুপ্ত, প্রমোদিনী নিয়োগী, জ্যোতির্ম্ময়ী গুপ্ত, আভাময়ী গুপ্ত, বকুলপ্রভা দত্ত, সুরমা দাস, বিনয়বালা সেন, শান্তিকণা সেন, উষারাণী দাসগুপ্ত, বীণা রায়, বাণাপাণি দাসগুপ্ত। দ্বিতীয় বিভাগে—সুষমা ঘোষ, মাদ্রী সেন গুপ্ত। তৃতীয় বিভাগে—জ্ঞানদাবালা গুপ্ত।

ঐ আই এ—প্রথম বিভাগে—লাবণ্যলতা সেনগুপ্ত, প্রতিভাময়ী চন্দ, কমলকুমারী নাগ। দ্বিতীয় বিভাগে—বিনয়বালা গুহ, প্রমীলা গুপ্ত, পারুলবালা সরকার, সুনীলবালা সেন, আশালতা সিংহ। তৃতীয় বিভাগে—সুধা সেনগুপ্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, টি—প্রথম বিভাগে—স্নেহময়ী এনিদ সেনগুপ্ত (১ম স্থান অধিকার করিয়া), লতিকা রুদ্র, ডরোথী ক্রেইটন, মেরী সালখানা, আইরীণ এস্ মিত্র, আইরীণ সিল্‌ভিয়া উইন্‌ফ্রেড, মীরা সরকার, মণিকাশোভনা দত্ত। উত্তীর্ণ—বীণাপাণি বসু, বিলাসমণি ধন, নিরুপমা সেন, হিমাংশুপ্রভা শিকদার। ঐ আই এ—প্রথম বিভাগে—সুমতি ভাণ্ডারকার (৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া) বিভা সেনগুপ্ত (৭ম স্থান), শ্যামসুন্দর নাহার, শান্তা সেন, আইভি খৃষ্টো, রসুয়া কুকা, আইরীন্ মোজেস, রুমিমাই খোঙ্গলা, দীপিকা বেজবরুয়া, সত্যবতী চক্রবর্ত্তী, মণিকুন্তলা দত্ত, বাসনা সেন, লীলা মল্লিক, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণা বসু, শোভনা গুহ, মতিদা মজিদ, বিয়াট্রিস ক্লাসম্যান, বার্থা রজার্স, তরু সেন, ভিক্টোরীন্ গনেট, সুরমা দাস গুপ্ত, ভিক্টোরিয়া বোজ গ্যাম্পার, কমলা সেনগুপ্ত (২য়), এনি ম্যাক্‌লারেন, অমিয়া দত্ত, ক্যাথলীন রুথ সণ্ডেস্, নীলিমা সরকার, তাপস চট্টোপাধ্যায়, সীমা ই ডি ইকাবেন, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, এনিদ জেমস, বীণাপাণি রায়, যুথিকা বসু, ইন্দুপ্রভা ঘোষ, লীলা মজুমদার, লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়, এনা মেরী এডাম্‌স, ফিলিস্ মড বেকেটি, সুরভি সিংহ, সরলা নন্দী, মাধুরী গুপ্ত, এডনা মেঙ্গ হুইফেন, ব্রাউডেন ব্রা, চারুবালা গুহ, প্রতিভা রায়, মা চিট, দুর্গা লাহিড়ী, বিভা দেবী। দ্বিতীয় বিভাগে—সুহাসিনর্মী বৈরাগী, আশারাণী বসু, ইলা বসু, বর্থাডেটস্ ডাকষ্টা, হিরণপ্রভা বসু, নোরা বাকুলী, ইলা দাস গুপ্ত, অন্নপূর্ণা দত্ত, মায়া ঘোষ, ক্লারীস কে, লীলাবতী মজুমদার, কনকলতা মিত্র, পরিমল রায়, কমলা সেন, বীণাপাণি সরকার। তৃতীয় বিভাগে—মীরা বসু, সুষমা বসু, নীলিমা চালিহা, ম্যাটিলডা চাইন, পান মা, শকুন্তলা রায়।

ঐ আই, এস্‌সি—প্রথম বিভাগে—রমা দত্ত (১৩শ স্থান অধিকার করিয়া), উমা বসু। দ্বিতীয় বিভাগে—চারুলতা দাস গুপ্ত, ভ্রমর সেন। পদার্থ বিজ্ঞানে—ললিতা রায়।

শুভবিবাহ—বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ রাঁচিনগরীতে পরলোকগত কেদারনাথ কুলভীর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুষমা ও পরলোকগত হিমাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর মধ্যমপুত্র শ্রীমান শুভ্রাংশুর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার মাতা শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী কুলভি রাঁচি ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, দান করিয়াছেন।

বিগত ২৬শে মে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ রায়ের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া সুমতিবালা ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসুর পুত্র শ্রীমান অশোককুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

গৃহ প্রতিষ্ঠা—বিগত ৩রা জুন জব্বলপুর নগরীতে রায় গৌরীকান্ত রায় বাহাদুরের পুত্র শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার রায়ের লতাকুঞ্জনামক নবনির্ম্মিত গৃহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য ও অমিয় বাবু একটি প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৬৲ টাকা ও দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ৪৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। নব গৃহ প্রেমময় পিতার পুণ্য নিকেতন হউক।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৮ই আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি-এ

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,

তমসো মা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

১৬ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯

June, 1928.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রেম

কোথা নাথ, আছে প্রেম, প্রেম কোথা হায় ;
বড় যে গো শুষ্ক ধরা বিদ্বেষ হিংসায় ভরা,
ধরণীর বুকে স্বার্থ নাচিয়া বেড়ায় !
নরনারী প্রেমহীন, বিষয়চিন্তায় দিন—
জীবনের মহামূল্য সময়—কাটায়।
ভাবে না এ জগতের স্বার্থ শুধু দুদিনের,
অর্থ এক হাত হ'তে অন্য হাতে যায় ;
প্রেম পেলে, প্রেম দিলে, মনুষ্যত্ব দেবত্ব মিলে,
প্রেমে হৃদয়ের কাছে বিশ্ব বাঁধা রয়।
প্রেমে তুমি আস কাছে, প্রেম ভিন্ন কোথা আছে
লক্ষ মানবের ধ্রুব অটল আশ্রয় ?
দেহ নাথ, প্রেম দেহ, তোমা বিনা আর কেহ
করিতে পারে না দূর বেদনা বিশ্বের।
জগৎ যা কিছু চায় তোমায় পেলেই পায়,
তোমার স্বরূপে সবি আছে মানবের।
তোমা হ'তে আছি দূরে, তাই শুধু মরি ঘুরে,
— প্রেম প্রেম ক'রে এই কঠিন ধরায় ;
হিংসা দ্বেষ প্রাণে তাই, ভাইকে চিনে না ভাই,
আঁখি ঢেকে রাখে স্বার্থ-ঘন-কুয়াশায়।
তুমি নাথ, এস ভবে, দেখুক মানব সবে,
তোমার প্রেমের মাঝে বিশ্বের মিলন ;
একপ্রেমে বাঁধা প্রাণ, কোথায় হিংসার স্থান ?
দেখা দাও, প্রেমে করি আত্মবিসর্জ্জন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

প্রার্থনা

হে করুণাময় পিতা, আমরা নিয়ত তোমার যে অসংখ্য দয়ার দান ভোগ করিতেছি তাহা যদি আমরা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতাম, তাহা হইলে কখনও আমরা অকৃতজ্ঞের ন্যায় তোমাকে ভুলিয়া জীবন যাপন করিতে পারিতাম না। জীবনের এমন একটি মুহূর্ত্তও নাই যে-সময় তোমার করুণা না উপভোগ করিতেছি! শরীর মন আত্মার যাহা কিছু সমস্তই ত তোমার অপার দয়ায় প্রাপ্ত হইতেছে! আমাদের ত কোনও বিষয়েই কিছু দাবী নাই! আমাদের কোনও গুণেই ত কিছু পাইতেছি না! তুমিই কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার এই পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়াছ, নানা দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়াছ। অথচ আমরা তাহা ভুলিয়া আমাদের জীবনদ্বারা তোমার ধর্ম্মের গৌরবকে কিছুই বর্দ্ধিত করিতেছি না। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? আমরা যদি তোমার এত করুণা পাইয়াও তোমাকে ভুলিয়াই জীবন যাপন করি, তবে আমাদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ আর কে থাকিতে পারে ? হে জীবনবিধাতা, তুমি আর আমাদিগকে এই ভাবে নিতান্ত অকৃতজ্ঞের জীবন যাপন করিতে দিও না। তুমি আমাদের হৃদয়কে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ কর। আমরা তোমার অপার দয়া আমাদের জীবন ও কার্য্যদ্বারা প্রকাশ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। আমাদের দ্বারা তোমার ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধিত হউক, তোমার পবিত্র রাজ্য এই সংসারে প্রতিষ্ঠিত হউক। আমরা যেন শুধু মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াই শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন না করি! নূতন শতাব্দীতে আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক—আমরা সম্পূর্ণ রূপে তোমার অনুগত জীবন যাপন করি। সর্ব্বোপরি তোমারই ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

সাড়া দিতে হবে—যখন স্বর্গ হ'তে ডাক আসে, যখন অন্তরদেবতা আহ্বান করেন, তখন তাঁকে সাড়া দিতে হয়—তিনি যা চান তা দিতে হয়, তিনি যে কাজে যেতে বলেন সেই কাজে যেতে হয়। তোমার সময় নাই, তোমার সুবিধা নাই, তোমার শক্তি নাই, এ ব'লে অন্য ডাক উপেক্ষা কর্‌তে পার, অন্যের আহ্বান না শুন্‌তে পার; কিন্তু তাঁকে ত প্রত্যাখান করা চলে না, তাঁর ডাকে ত বধির হওয়া চলে না! তিনি এক এক সময় যে সবই চান, সর্ব্বস্বই দিতে বলেন! বিপদ যখন আসে, কল্যাণের পথে যখন বাধা উপস্থিত হয়, মুক্তির আদর্শ যখন ক্ষুণ্ণ হ'তে চলে, তখন কে আপনা ল'য়ে, আপনার সুখ সম্পদ ল'য়ে, নিশ্চিন্ত ভাবে ব'সে থাক্‌তে পারে? তখনই প্রভুর আহ্বান আসে; তাঁর প্রিয় সন্তানের প্রাণে অন্তর হ'তে বাণী আসে। তখন ত তা উপেক্ষা করা চলে না! তখন ত ধন জন সময় শক্তি, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত নিয়ে উপস্থিত থাক্‌তে হয়, তখন ত সর্ব্বস্ব দিতে হয়। তাতে যে কেবল আপত্তি কর্‌তে পার না তা নয়, মনে একটু অসন্তোষের ভাবও জন্মিবে না। খোলা প্রাণে, প্রসন্ন মনে, তাঁর ডাকে সাড়া দিতে হবে, তাঁর জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ কর্‌তে হবে।

এক দিনের আঘাত—জীবনে অনেক সুখ পেয়েছি, প্রশংসা পেয়েছি, মিলনের আনন্দ পেয়েছি; আবার দুঃখও ভোগ করেছি, নিন্দা অপমানও সহ্য করেছি, বিচ্ছেদের বেদনাও পেয়েছি, উপেক্ষার মর্ম্মপীড়াও সইতে হয়েছে। এ সব নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা আসে আর যায়—অনেক সময়ই প্রাণে কোনও চিহ্ন রেখে যায় না। কিন্তু এক এক দিন আসে, সে দিনের সুখ কিম্বা দুঃখ প্রাণে ছাপ মেরে রেখে যায়। একটি দিনের আঘাত, একটি দিনের বেদনা, প্রাণ উলট্ পালট্ ক'রে দিয়ে গেল, স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে গেল, কল্পনার ঘর ভূমিসাৎ কর্‌ল—আমার প্রাণে নূতন আদর্শ জাগিয়ে দিয়ে গেল। পেলাম আঘাত, পেলাম বেদনা, খুলে গেল অনন্ত আনন্দলোকের দ্বার; পেলাম এক নূতন পথ, জাগ্‌ল প্রাণে এক নূতন প্রেম। চেয়ে দেখি সব বদ্‌লে গেছে, সব সুন্দর হ'য়ে গেছে, সব মধুর হ'য়ে গেছে, সর্ব্বত্র নূতন রং ধরেছে, সকলে আপনার হ'য়ে গেছে, আর দুঃখ নাই, উপেক্ষায় কষ্ট নাই, প্রাণে অপ্রেম নাই। পর আপন হয়েছে, দূর নিকট হয়েছে, কুৎসিৎ সুন্দর হয়েছে। প্রভুর প্রেমের আলোকে সব আলোকিত হয়েছে। আমার আর দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই, বেদনা নাই। সেই দিন আমার কি শুভ দিন!

সব ডাক শুন্‌তে নাই—ডাক ত অনেক দিক্ হ'তে আসে, অনেকে অনেক ভাবে ডাকেন—ধন গেল, মান গেল, প্রভাব প্রতিপত্তি গেল, ধর্ম্ম গেল, আদর্শ নষ্ট হলো, এই ব'লে কত দিক থেকে ডাক আসে! সব ডাকই কি শুন্‌তে হবে? সব ডাকের ভিতরেই কি আর একটা ডাক শোনা যায়? সব ডাকই কি তোমার জন্য আসে? ডাক শুনেই ছুটো না—কার ডাক পরীক্ষা কর, ঐ ডাক তোমার জন্য কি না, তাহাও ভেবে দেখ। অন্তরদেবতার সাড়া পাও কি না, তাহাও অনুধ্যান ক'রে দেখ। তাঁর সাড়া যদি না পাও, তাঁর ইঙ্গিত যদি না দেখ, তবে ডাকুক তোমাকে সকলে, তোমার প্রিয় জনেরাও ডাকুক, তোমার গুরুজনেরাও ডাকুন, তবুও নড়বে না। কাজটী ভাল হ'তে পারে, কিন্তু তোমার প্রভু ও-কাজ হয়ত তোমার জন্য রাখেন নাই—তাঁর ভৃত্য অনেক। তাই বলি, ডাক অনেক আস্‌বে, অনেক ডাকে বধির থাক্‌তে হবে। তাতে নিন্দা হবে, আপনার জনেরাও অসন্তুষ্ট হবে, তবুও তুমি নড়বে না। যে পর্য্যন্ত প্রভুর বাণী না শোন, তাঁর ইঙ্গিত না দেখ, সে পর্য্যন্ত ডাকে সাড়া দিবে না, ছুটে চল্‌বে না। নীরবে ব'সে থাক্‌বে। কোনও বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই, আত্মসমর্থনের দরকার নাই—লোকে নিন্দা করুক, নীরবে সয়ে থাক্‌বে; কিন্তু তাঁর ডাক না শুন্‌লে নড়বে না।

সম্পাদকীয়।

কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের বিশেষ সুযোগ—যদিও কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ আমাদের একটি অতি কল্যাণকর কর্ত্তব্য, তথাপি অধিকাংশ সময়েই আমাদের জীবনে সে বিষয়ে গুরুতর উদাসীনতা ও অবহেলাই পরিলক্ষিত হয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই ত আমাদের জীবনে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের কত কারণ উপস্থিত হইতেছে! আমরা প্রতিনিয়ত যাহা কিছু পাইতেছি ও উপভোগ করিতেছি তাহার জন্য যদি সম্যক্ প্রকারে কৃতজ্ঞ হইতে পারিতাম, তবে নিশ্চয়ই আমাদের জীবন আরও অনেক উন্নত ও আনন্দপূর্ণ হইত। আমরা অনেক সময় ভাবিয়া দেখি না যে, হৃদয়ে যথার্থ কৃতজ্ঞতা অনুভব করিলে আমরাই নিজে অধিকতর উপকৃত হই। আমরা সাধারণতঃ মনে করি, কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ একটা বাহ্যিক ব্যাপার, আর উহা প্রধান ভাবে অপরেরই জন্য; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা মোটেই বাহ্যিক ব্যাপার নহে, উহা সম্পূর্ণ আন্তরিক ব্যাপার। অন্তরে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি না থাকিলে বাহিরের প্রকাশ কপটাচার মাত্র,—তাহার দ্বারা কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই সাধিত হয়। সুতরাং সে রূপ বাহ্যিক প্রকাশ সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আর, মানুষই হউক আর ঈশ্বরই হউক, যাঁহার নিকটই আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন, তাঁহাদের কাহারই যে ইহার বিশেষ কোনও প্রয়োজন নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ আমাদের নিজ কল্যাণের জন্য উহার যথেষ্টই প্রয়োজন আছে। তাহাতে যে শুধু আমাদের হৃদয়ের একটা কোমল সাধু-বৃত্তি বিকশিত হয়, তাহা নহে। তাহা ত হয়ই—উহাও সামান্য উপকার নহে। তাহা ব্যতীত দয়ার দান পাইয়া কৃতজ্ঞতা অনুভব না করিলে, আমরা সে-সকল দানের সম্যক্ মূল্য হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারি না, তাহা ভাল করিয়া গ্রহণ ও উপভোগ করিতে সমর্থ হই না এবং তাহার সাহায্যে জীবনকে উন্নত করিতে পারি না। আমরা মানুষ ও ঈশ্বরের নিকট হইতে যে-সকল সাহায্য পাইয়া থাকি, তাহার উপযুক্ত ব্যবহারের উপর যে আমাদের উন্নতি ও সুখ বিশেষভাবে নির্ভর করে, সে কথা অধিক করিয়া না বলিলেও চলিবে। এবং কৃতজ্ঞতার অভাবে যে আমরা তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সমর্থ হই না, তাহাও স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই কৃতজ্ঞতার অনুভূতি আমাদের জন্য কত প্রয়োজনীয় তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। আমরা যদি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে এই কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে পারিতাম, তবে আমাদের জীবন যে আরও বহুগুণে উন্নত ও আনন্দপূর্ণ হইত, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। হৃদয়ে যদি এই কৃতজ্ঞতার অনুভূতি থাকে, তবে তাহা যে স্বভাবতঃই বাহিরেও প্রকাশ পাইবে সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সে প্রকাশ নানা প্রকারেরই হইয়া থাকে। বাক্যে প্রকাশ তাহার একটা সামান্য আংশিক রূপ মাত্র। জীবনের সকল কার্য্যেই তাহা প্রকাশ পাইবে। সে-সকলের সদ্ব্যবহার, যে-জন্য সে-সকল দান পাইয়া থাকি তাহাতে নিযুক্ত থাকা, দাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া যাহাতে দাতা প্রীত হন তাহাতে সর্ব্বদা যত্নশীল হওয়া প্রভৃতি আপনা হইতেই আসিবে। তাহা না হইলে বুঝিতে হইবে প্রকৃত কৃতজ্ঞতার অভাবই ঘটিয়াছে। আমরা চারিদিকে এ সংসারে ইহার পরিচয় পাইতেছি। এমন কি মানবসমাজের বাহিরে পশুদের মধ্যেও ইহার প্রচুর নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই অকৃতজ্ঞ মানুষ পশুর অধম বলিয়া গণ্য হয়। পশুরাও কৃতজ্ঞতার দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের ন্যায় তাহাদের কৃত্রিম কিছু করিবার শক্তি নাই। সুতরাং তাহারা যাহা কিছু করে স্বভাবের বশেই করে—তাহা সত্যই হয়। তাহা হইতে আমরাও বুঝিতে পারি যে, মানুষও স্বভাবতঃ উক্ত প্রকার ব্যবহারই করিবে। কাজেই আমাদের কার্য্য দ্বারাই প্রমাণিত হইবে আমরা কতটা সত্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি। সুতরাং প্রত্যেক কল্যাণার্থী ব্যক্তিকেই হৃদয়ে এই সত্য কৃতজ্ঞতার ভাব জাগ্রত করিবার জন্য যত্নশীল হইতে হইবে। আমরা উদাসীনতা ও চিন্তাহীনতা বশতঃই যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা অনুভব করি না। তবে, বিশেষ বিশেষ সময়ে এমন সুযোগ উপস্থিত হয়, যখন আমরা আর উদাসীন থাকিতে পারি না, আমরা যে-সকল করুণার দান পাইয়াছি তাহা স্মরণ না করিয়া পারি না। তখন অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও প্রকৃত কৃতজ্ঞতা স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রসাদে যে আমরা কত উপকার লাভ করিয়াছি, তাহা আমরা অনেক সময়ই ভুলিয়া থাকি। যাহারা ইহার মধ্যে আবাল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহার অভাবে যে কি দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে কখনও অনুভব করে নাই, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও—তাহাদের পক্ষে এরূপ ভুলের কিছু কারণ যে আছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়—অপর আমরা অনেকেই আছি, যাহাদের সে কথা ভুলিয়া যাওয়া কোনও ক্রমেই সঙ্গত নহে, যাহারা জীবনে এত অধিক করুণা পাইয়াছি, এত অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, এত দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইয়াছি, যাহা স্মরণে না রাখা নিতান্তই অকৃতজ্ঞের কার্য্য। সে-অকৃতজ্ঞতার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবার এবং নূতন ভাবে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবার এক বিশেষ সুযোগ আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব সমাগত। এই উপলক্ষে স্বভাবতঃই ব্রাহ্মসমাজের জীবনে এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে করুণাময়ের অপার করুণার কথা একবার বিশেষভাবে স্মরণ ও আলোচনা করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইবে। শুধু কর্ত্তব্য বলিয়াই যে ইহা করিতে হইবে তাহা নহে। ইহার উপর আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণও প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এরূপ চিন্তা ও আলোচনা করিলে যে আমাদের হৃদয় একদিকে কৃতজ্ঞতায় ও অপরদিকে আপনাদের ত্রুটি ও চর্ব্বলতাস্মরণে অনুতাপে পূর্ণ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ কৃতজ্ঞতা ও অনুতাপ জাগিলে যে প্রাণে নব জাগরণ, নূতন আশা উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা, নব সঙ্কল্প ও চেষ্টা আসিবে, নানা প্রকার কর্ম্মোদ্যমও প্রকাশ পাইবে, সর্ব্বোপরি আমরা করুণাময় জীবনবিধাতার সহিত ঘনিষ্ঠতর ও গভীরতররূপে যুক্ত হইয়া উচ্চতর ও পূর্ণতর জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কল্যাণ আর কি আছে? এরূপ সুবর্ণ সুযোগ হারাইলে আমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইব, তেমনি দেশেরও গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইবে। আমাদের জীবন ও কার্য্যের ফল যে শুধু আমরা নিজেই ভোগ করিব তাহা নহে। তাহার সঙ্গে দেশের কল্যাণও বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব অতীব গুরুতর। জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু আমাদিগকে প্রথম বয়সে যে জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, আমাদের নিকট যে আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা যদি আমরা একবার একটু স্থির চিত্তে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখি, তবে আমাদের গুরুতর দায়িত্বের কথা নিশ্চয়ই হৃদয়ে উজ্জ্বল ভাবে জাগিয়া উঠিবে। আমরা করুণাময়ের কত অসংখ্য দান পাইয়াছি, কত সুযোগ হারাইয়াছি, আদর্শ হইতে কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছি, চারিদিকের ঘোরতর দুর্দ্দশার মধ্যে আমাদের কত করিবার রহিয়াছে, তাহা কি আমরা এ সময় স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারি? আর, তাহা না করিলে কি আমাদের উৎসবের আয়োজন কোনও প্রকারে সফল হইতে পারে? ইহা যে কখনও হইতে পারে না, তাহা অধিক করিয়া না বলিলেও আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। অতএব আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যাহাতে আমরা এই অপূর্ব্ব সুযোগটি আর না হারাই। আমাদের প্রত্যেকের জীবন ও সমগ্র সমাজ যাহাতে প্রেমময় পিতার অপার করুণার প্রত্যক্ষ নিদর্শন হয়, সত্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জীবন্ত মূর্ত্তিস্বরূপ হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। শুধু মৌখিক অনুতাপ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। সমগ্র জীবন ও কার্য্যের দ্বারাই তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। এ দিকে আমাদের সকলের চিন্তা ও চেষ্টা আকৃষ্ট হউক। আমরা সকলে বিশেষ ভাবে এই কার্য্যে নিযুক্ত হই। নিশ্চয়ই করুণাময়ের করুণা আমাদের উপর

প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা যাহাতে জয়যুক্ত হয়, আমরা সকলে তাহার জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হই। তাঁহারই ইচ্ছাই পূর্ণ হউক

ব্রহ্মে অনুরাগ

একবার কোনও দেশে, একটা দুর্গ শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কতকগুলি সৈন্য হঠাৎ আনয়ন করা হইল। দেশে শান্তি বিরাজিত ছিল, যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ার কোনও আশঙ্কা ছিল না; সুতরাং দুর্গে যে সব কামান বন্দুক তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রাদি ছিল, সে সব মরিচা পড়িয়া ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যে সব নূতন সৈন্য দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য [illegible] অনেক প্রাচীন এবং দুর্ব্বিশ্বাস[illegible] [illegible]ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই সব মরিচা পড়া অস্ত্রদ্বারা শত্রু জয় করা অসম্ভব—দুর্গরক্ষা করিতে পারা যাইবে না; অথচ অস্ত্রগুলি মেরামত করিবারও সময় নাই, দু একদিনের মধ্যেই শত্রুগণ দুর্গ আক্রমণ করিবে। কি করেন! সেই অকেজো পুরাতন কামানগুলিই দুর্গপ্রাচীরে সাজাইলেন, এবং যে কতকগুলি ঘষিয়া মাজিয়া ব্যবহারোপযোগী করা সম্ভব হইল, তাহা ঠিক করিয়া রাখিলেন। মনের ভাবটা এই যে, বাহ্যটা কামান চলুক, যার সব সাজান দেখে শত্রুরা ভয় পা'ক যে এত-গুলা কামান রহিয়াছে। শত্রুকে ভয় দেখাইবার জন্য যথাসম্ভব আয়োজন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মনে মনে ভয় থাকিল। প্রাণের ভিতর এই ভয় লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; কামান ছাড়েন আর ভাবেন, কি হয় কি হয়!—নিজেদের অস্ত্রের উপর বিশ্বাস নাই। কাজেই দুর্গ রক্ষা হইল না! ইহা কল্পিত [illegible]। নেপালে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ এই:—ব্রাহ্মেরা যেন একদল সৈন্য, যারা এদেশে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের অস্ত্র কি? ব্রহ্মনাম ও ব্রহ্মপূজা। এই অস্ত্রের সাহায্যে তাঁরা লড়াই করিবেন, জগৎ জয় করিবেন। তাঁদের দুর্গ রক্ষা করিবেন। কিন্তু এই অস্ত্রে যদি ব্রাহ্মদের বিশ্বাস না থাকে, নির্ভর না থাকে—ইহা যদি সেই সৈন্যগণের মরিচাধরা বন্দুক কামানের ন্যায় হয়—যদি এই ব্রহ্মনাম ও পূজার শক্তিতে তাঁদের বিশ্বাস না থাকে, যদি তারা মনে করে, ও-ব্রহ্মনাম এবং পূজায় কিছুই হয় না,—উপাসনাটাও করে কিন্তু মনে মনে জানে এতে কিছুই হয় না, ও দুর্ব্বল হৃদয়ে শক্তি আনয়ন করিতে পারে না, পাপসংগ্রামে জয়লাভ করিতে সামর্থ্য দেয় না, নিরাশ প্রাণে আশার আলোক জ্বালিতে পারে না—তবে তাহার দ্বারা, এমন ব্রাহ্মদের দ্বারা কি হইবে? জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি পাগল, যে তোমরা নিজেই যে উপাসনায় বিশ্বাস কর না, তাহার দ্বারা জগৎ জয় করিতে চাও?

উপাসনা করিতেছি, কিছুই হয় না! আমার তো কিছুই হয় নাই—ব্রহ্মনামে কোনও শক্তি নাই, ব্রহ্মপূজায় কিছুই হয় না—এই যদি মনে হয়, তবে তোমরা কি পাগল, তোমরা কেন মরতে ব্রাহ্ম হ'তে এসেছ?

ব্রহ্মনামে সব জয় হবে—এ নূতন কথা নয়, ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বল, 'হাঁ' কি "না"। যদি বিশ্বাস না হয়, যদি ব্রহ্মনামের এবং ব্রহ্মোপাসনার কোন শক্তি না দেখে থাক, তবে বলিলে কি হইবে? একটা ঔষধ দশবার ব্যবহার করিয়া যদি ফল না পাওয়া যায়, তবে কে বলিবে যে তাহা অব্যর্থ ঔষধ?

ব্রহ্মনামে যদি কিছু শক্তি না দেখে থাক, তবে, তুমি কি জুয়াচোর, না পাগল, না বাতুল, যে তুমি তাহা লইয়া জগৎ জয় [illegible] করতেছ? সেই মরিচাধরা বন্দুকের উপর সৈন্যগণ যেমন নির্ভর করিতে পারে নাই, মনে মনে ভীত হইয়াছিল, তোমরা তেমনি পুরাতন ব্রহ্মনামে বিশ্বাস কর না। তখন, তোমরা বাতুল, না, পাগল, না জুয়াচোর যে মনে কর যে সেই ব্রহ্মনাম [illegible] উপাসনার দ্বারা জগৎ জয় হবে! ইহা এক দুর্গতিবিশেষ যে, লোকে যাহা প্রচার করে, তাহা বিশ্বাস করে না। কেন এ প্রকার হয়, জানি না। হিন্দুসমাজে বার মাসে তের পর্ব্ব করতে হয় করে, তেমন বিশ্বাস নাই। ও কেবল Formal, conventional.

ব্রাহ্মধর্ম্মও শেষে এই প্রকার একটা কিছু না হয়—ইহা চিন্তার বিষয়।

আমরা কি দিয়া জগৎ জয় করিব? ভাবুন সকলে। আমরা কোন্ অস্ত্রে জগৎ জয় করিতে চাই? (১) বিদ্যাবুদ্ধির বলে? অনেক বিদ্বান লোক, জ্ঞানী লোক ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে আছেন। (২) ধনবলে? ব্রাহ্মেরা প্রায়ই গরিব! (৩) রসনার দ্বারা? রসনার কার্য্য অনেক হইয়াছে, এখন মাত্রা কিছু কম হইলে ভাল হয়। এ সবের কিছুর দ্বারাই আমরা জগৎ জয় করিতে পারিব না—কেও কখনও পারে নাই। নিশ্চয়ই জগৎ এই ব্রহ্মনাম এবং পূজার দ্বারাই জয় করিব। এই অস্ত্র তো কমজোর নয়! আমরা অধম, আমাদের হাতে প'ড়ে ইহার দুর্গতি হ'তে পারে। যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য এই পুরাতন অস্ত্রেই জগৎ জয় করিয়াছিলেন। চিরদিন এই পুরাতন অস্ত্রেই জগৎ জয় হইয়াছে।

এই অস্ত্রে কেন এত বল হইল? হরিনাম একই। কিন্তু এক এক জন নরপিশাচ ভিক্ষা করিতে আসিয়া, এমন কণ্ঠে হরিনাম করে যে, তাহা শুনিয়া, তার গলা টিপিয়া রাস্তার বাহির করিয়া দিয়া আসিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু যখন শ্রীচৈতন্য হরিনাম করিতেন, তখন তাহা শুনিয়া পাষাণ হৃদয় গলিয়া যাইত, পাপী নবজীবন পাইত। যীশুখৃষ্ট ভগবানের নাম করিতেন; তাহা শুনিয়া লোকে ব'লত—He speaks as man never spoke before. সেই ঈশ্বরের নাম তাঁহাদের মুখে কেমন শক্তিশালী হইয়াছিল! তবে দেখ, এই পুরাতন মরিচাধরা ব্রহ্মনামেই জগৎ জয় হয়।

রামমোহন রায় আমাদিগকে এই অস্ত্র ধরাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ও-উপাসনায় কিছু হয় না! তোমার

২৩এ নবেম্বর, ১৯১৩, বৃহস্পতিবার, সাধনাশ্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত।

আমার কিছু না হ'লে জগতের কিছু হবে কেন? অনেক ব্রাহ্ম ভাবিতেছেন, উপাসনায় আমার কিছু হ'ল না বটে, কিন্তু অপরের হয় ত কিছু হবে! এত লঘুভাবের ধর্ম্মদ্বারা কি কিছু হয়?

কি সর্ব্বনাশ! ব্রহ্মনাম ব্রহ্মোপাসনা আমাদের জীবনে নিষ্ফল হইল! ইহা অতি গুরুতর প্রশ্ন। আমাদিগকে কি করিতে হইবে? নির্জ্জনে চিন্তা কর এই ব্যাধিগ্রস্তদিগকে কি করিতে হইবে। নির্জ্জনে চিন্তা কর—এমন কেন হইল। এই ব্রহ্মনাম, এই তরবারি, এই অস্ত্র আমাদের হাতে এত হীনবীর্য্য হ'য়ে গেল, কেন?

ও হরিনামের প্রাচীন অস্ত্র প্রাণের গুঁড়ো দিয়ে মাজ্‌তে হয়; তবে উহার শক্তি প্রকাশিত হয়।

এই যোগ সাধন করিতে হইবে—উপাসনা ভাল লাগে না, ব্রহ্মনামে শক্তি পাই না—প্রাণের দিকে দেখিলে কিছুই ভাল লাগে না—কেন? অস্থির হও, এ আমার কি হ'ল!

স্বর্গীয়া হরবালা গাঙ্গুলী

প্রায় ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে আমার মা শ্রীযুক্তা হরবালা গাঙ্গুলী বিক্রমপুরের নাগরভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যখন সবেমাত্র ৮ বৎসর বয়স সেই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। পিতা তখন ১২ বৎসরের বালক মাত্র। আমার পিতৃদেব পরলোকগত গোবিন্দবন্ধু গাঙ্গুলী অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান বিক্রমপুর মাঝপাড়া গ্রামে।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গলার সামাজিক জীবন বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ ছিল—ধর্ম্মের নামে অনেক অমানুষিক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত। আমার পিতামহ জগবন্ধু গাঙ্গুলী মহাশয় বড় উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মৃত্যুর সময়ে আমার পিতামহীকে এসব ব্যাপার হইতে যথাসাধ্য বিরত থাকিবার উপদেশ দিয়া যান। আমার পিতামহীও স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার উপদেশপালনের জন্য যথাসাধ্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। পিতার তখনও উপযুক্ত বয়স হয় নাই, ভগ্নী দুটী বালিকামাত্র, এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ডাক সেই সুদূর পল্লিগ্রামে গিয়া পৌছিল। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম ও আচরণ লোকমুখে এবং সংবাদ-পত্রাদিতে শুনিয়া পিতামহী মুগ্ধ হন। এবং উহা গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। কিন্তু সেকাল ও এ কালের পার্থক্য সহজ ছিল না। একটী অবস্থাপন্ন পরিবারের বিধবা নারীর পক্ষে সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বালক পুত্র, বালিকা পুত্রবধূ ও কন্যাদুটীসহ চিরন্তন ধর্ম্ম ও সমাজ ছাড়িয়া অন্য সমাজে চলিয়া আসা বড়ই বিপদ্‌জনক ও দুরূহ ছিল। কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য, কিম্বা কোন ভাবনাই তাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। আত্মীয়স্বজন, বাড়ী ঘর সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সত্যই তাঁহারা বিপদ ও সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। সে সময়ে বহু ব্রাহ্মের যে দশা হইয়াছিল, আমার পিতামাতারও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু তবুও তাঁহারা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া অটল ছিলেন।

কন্যা শ্রীমতী মৃণালবালা ব্যানার্জ্জি কর্তৃক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত

কিছুদিন পরে পিতা ময়মনসিংহ সহরে একটী চাকুরী পান এবং কয়েক বৎসর সেই খানেই ছিলেন। অল্পদিন পরেই মায়ের সুখের সংসার ভাঙ্গিল। দুইটী কন্যাসহ মা বিধবা হইলেন। সে সময়ে পিতার বয়স ২৯ বৎসর মাত্র ছিল। মার বয়সও অল্প ছিল। যাহা হউক, দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। আমার মারও কন্যাদুটীকে লালন পালনে এবং তাহাদিগের শিক্ষা ইত্যাদিতে দিন কাটিতে লাগিল। অতঃপর তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়ই ঢাকা সহরে বাস করিয়াছিলেন।

এখন মার কথা কিছু বলি। ঠিক এখানকার হিসাবে দেখিতে গেলে মা যে খুব শিক্ষিতা নারী ছিলেন তাহা বলা যায় না। কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ভাল ভাল বাংলা পুস্তক ও সংবাদপত্র তিনি আজীবন পাঠ করিতেন এবং সন্তানাদি নাতি নাতিনী সম্পর্কিত সকলে যাহাতে পাঠে মনোযোগী হয় সেদিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কলিকাতায় গতবৎসর তাঁহার গুরুতর পীড়ার সময়েও এ বিষয়ে উৎসাহ দেখা যাইত।

তাঁর জীবনের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই কতকগুলি সদ্‌গুণের কথা মনে পড়ে। পার্থিব দুঃখ কষ্ট যে মানবকে পরের দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা দেয়, ইহা তাঁহার জীবনে আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি। তাঁহার দানশীলতার কথা মনে হইলে আমি অবাক্ হইয়া যাই। আবশ্যক হইলে তিনি সর্ব্বস্ব দান করিতেও দ্বিধা করিতেন না। পরের দুঃখমোচনের জন্য নিজের বস্ত্রাদি যাহা থাকিত সমস্তই দান করিতেন। অনেক সময় আমরা এজন্য বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলিতাম, "সব তো দিয়ে দিলে! এখন তোমার কি হবে?" মা এ সব কথার কোনও উত্তর না দিয়ে নীরবেই থাকিতেন। যতবারই তিনি গ্রামে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতেন, ততবারই দেশের দরিদ্র বালক বালিকাদের দুরবস্থা দেখিয়া আমাদের পুরাতন বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিতে বলিতেন। তিনি নাতি নাতিনীদের বলিতেন, "তোমরা জান না এদের হাসি-মুখ দেখিলে আমার কত আনন্দ হয়।"

আর একটী কথা মনে পড়ে—তিনি পরকে কিরূপ আপন ও নিকট করিতে পারিতেন। স্বর্গীয় কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী মাকে কন্যারূপে অভিহিত করিতেন এবং তদনুরূপ ব্যবহারও করিতেন। মাও তাঁদের এত ভালবাসিতেন যে তাঁহাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন কি আমরাও সম্পূর্ণ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জানিতাম না যে, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন রক্তের সম্পর্ক নাই। দুইটী সম্বন্ধবিহীন পরিবারে এরূপ হৃদয়ের বিনিময় ও সহানুভূতির ভাব আজকাল দুর্লভ।

শ্রদ্ধেয় বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ মহাশয়ের পত্নী যখন স্বর্গারোহণ করেন, তখন ৪টী শিশুকন্যা লইয়া ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। কোলের কন্যাটী তখন মাত্র এক বৎসরের শিশু। বিশেষতঃ এই কন্যাটীকে লইয়া বৈকুণ্ঠবাবু অতিমাত্রায় চিন্তিত হন। মা তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই শিশুকে নিজ কন্যার ন্যায় স্নেহ ও যত্নে পালন করিতে থাকেন। সেই বয়সে ও সময়ে একটী শিশুকন্যার ভার লওয়া তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত

কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু যেখানে পরের দুঃখে হৃদয় কাঁদে, সেখানে কোনও বাধাই কষ্টকর হয় না।

তাঁহার কাছে সাহায্য চাহিলেই পাওয়া যায় জানিয়া সকলেই তাঁহার কাছে আসিত। প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা মনে পড়িল। সেই সময়ে হিন্দুসমাজের একটী ছেলে ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষা গ্রহণ করে। আত্মীয়স্বজন তাহাকে ত্যাগ করিলে আমার মাতা তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। পরে যখন ছেলেটী দূরদেশে চাকুরী পাইয়া যাইতে প্রস্তুত হন, মা তাহাকে তাঁহার সম্বল যাহা কিছু ছিল দিয়া দিলেন। পরে অবশ্য ছেলেটী উপযুক্ত হইয়া মার অর্থ ফিরাইয়া দেয়। এ কথা মা নিজে কখনও বলেন নাই; ছেলেটীই কথা উঠিলে ঘটনাটী বলিয়াছিলেন। নিজে অভাবে থাকিয়াও পরের অভাবমোচনের স্পৃহা মার বড়ই বলবতী ছিল।

বিধবার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর দীর্ঘ বৈধব্যাবস্থায় তিনি সজ্ঞানে কখনো তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। স্বর্গীয় বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় আমার পিতার বাৎসরিকে যতবার উপাসনা করেন, মা'র চরিত্রবলের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেন।

এই কর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহাকে বিশেষ রকম আত্মনির্ভরশীল করিয়াছিল। তাঁহার সন্তানদের অসুখে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়ও তিনি অবিচলিত চিত্তে সেবা শুশ্রূষা করিয়া যাইতেন। আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী সকলে উদ্বিগ্ন হইলেও তিনি নিরুদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া থাকিতেন এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া যাইতেন। ধর্ম্মজীবনের উচ্চ স্তর ভিন্ন ইহা সম্ভব হয় না।

জীবনের শেষভাগে শরীর যখন দুর্ব্বল, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পরলোকগমন করেন। কন্যার মৃত্যুসংবাদে তিনি অশ্রুপাত করেন নাই, কিন্তু তাঁহার দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। মৃত্যুকে তিনি পর ভাবিতেন না—তাঁহার শয়নগৃহে লিখিত আছে "সর্ব্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক।" তিনি সত্য সত্যই প্রস্তুত ছিলেন।

গতবৎসর কলিকাতায় আসিয়া দীর্ঘ ৮ মাস তিনি কঠিন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি ঢাকা অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; তাই একটু সুস্থ হওয়া মাত্রই তিনি ঢাকা চলিয়া যাইতে ব্যগ্র হইলেন। সেখানে তাঁহার পাড়া প্রতিবেশীরা বলেন যে পাড়ার সকলের দুঃখ, শোক, রোগ ভোগ তিনি আপন করিয়া লইতেন। সেখানে তাঁহার একটী বৃহৎ পরিবারের মত ছিল। মৃত্যুর পর ঢাকা হইতে আমাকে শ্রদ্ধেয় বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যা লিখিয়াছেন, "তুমি যেমন মাতৃহীনা হয়েছ, আমার অবস্থাও সেইরূপ মনে হচ্ছে; বাস্তবিক কায়েতটুলী পাড়ার সকলে মনের মত লোকটীকে হারাইয়া প্রাণে খুবই কষ্ট অনুভব করিতেছেন। সকলেরই শোকে দুঃখে তিনি কত করেছেন এবং সান্ত্বনা দান করেছেন!" শ্রদ্ধেয় বিহারীলাল সেন মহাশয় লিখিয়াছেন "ইনি ঢাকার প্রচারক এবং ব্রাহ্মপরিবারসকলের তত্ত্বাবধান করিতেন। মনটী বড় ভাল ছিল, সকলের দুঃখে দুঃখী ছিলেন।"

রেঙ্গুন হইতে তাঁহার পুত্রস্থানীয় ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্ম হবার পর স্বদেশ ও আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন নানা প্রকার কষ্টে পড়িয়াছিলাম, তখন মা আসিয়া নিজের স্নেহ ভালবাসা দিয়া সমস্ত দুঃখ কষ্ট মুছিয়া ফেলিলেন। নিজ দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজ কোলে টানিয়া লইলেন।"

তাঁহার প্রিয় ঢাকাতেই ২০।২২ দিন জ্বরে ভুগিয়া ২৫শে জুন, ১৯২৭, প্রাতে ৬টায় শান্তভাবে ও সজ্ঞানে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(৩) পারিবারিক উৎসব।

ইহাও আশা করা যাইতেছে, যে প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুরাগী পরিবার, উক্ত দেড় বৎসর কালের মধ্যে কোন ও সময়ে, আত্মীয়-বন্ধুদিগকে লইয়া একটি পারিবারিক উৎসব করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন; এবং সাধ্যানুসারে কোনও না কোনও উপায় অবলম্বন করিয়া এই মহোৎসবকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবেন। এই পারিবারিক উৎসবে সহায়তা করা স্থানীয় সমাজের একটি কর্ত্তব্যরূপে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে [২ (ক)]।

পরিবারে মহোৎসবকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি প্রস্তাবিত হইয়াছে:—

(ক) পরিবারে প্রাত্যহিক বা অন্ততঃ সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা না থাকিলে, কোনও নির্দ্দিষ্ট দিন হইতে নিষ্ঠাপূর্ব্বক তাহা আরম্ভ করা;

(খ) পারিবারিক উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ না থাকিলে, সম্ভব হইলে তাহার ব্যবস্থা করা;

(গ) পরিবারের পরলোকগত প্রিয়জনদিগের সমাধি-চিহ্ন-স্থাপনের স্থান থাকিলে, ও তাহা এ পর্য্যন্ত করা না হইয়া থাকিলে, এই উপলক্ষে তাহা করা;

(ঘ) পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকিলে, পারিবারিক উৎসব সহকারে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ;

(ঙ) গ্রামে বাড়ী থাকিলে, সেখানে ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে লইয়া গিয়া ২।৩ দিন ব্যাপী উৎসব করা। এইটিতে সহায়তা করাও স্থানীয় সমাজের কর্ত্তব্যের তালিকায় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে [২(ঘ)]

(চ) কোনও পরলোকগত প্রিয় ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি স্থায়ী ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করা;

(ছ) ব্রাহ্মসমাজের কোনও বিশেষ বিভাগের কার্য্যের জন্য এককালীন দান বা স্থায়ী ফণ্ড প্রতিষ্ঠা;

(জ) Centenary নাম যুক্ত স্কুল, হাসপাতাল, নৈশবিদ্যালয়, ব্রহ্মমন্দির বা অপর কোনও লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত;

(ঝ) কোনও দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবারকে মাসিক বৃত্তি বা এককালীন দান দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মপালনে সহায়তা করা; ইত্যাদি।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ব্রাহ্ম পরিবার সকলের উপরে ব্রহ্মের দাবী অল্প নহে; এই দাবী সর্ব্বগ্রাসী। আমরা ব্রহ্মের

নামে নাম গ্রহণ করাতে, আমাদের উপরে তাঁহার এই দাবী বর্দ্ধিয়াছে। সুতরাং এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে, আত্মিক দাবীগুলির ত কথাই নাই, আর্থিক দাবীগুলিও সমর্থের পক্ষে অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

(৪) ব্যক্তিগত উৎসব।

প্রত্যেক ব্যক্তি আবার আপন অবস্থা ও সামর্থ্য অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মকে নিজ জীবনে জয়ী করিবেন, পারিবারিক জীবনে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় অবলম্বন করিবেন, ব্রাহ্মসমাজে ইহার প্রভাব বৃদ্ধির জন্য যত্ন করিবেন, এবং বাহিরে ইহার বিস্তারের সহায়তা করিবেন ;—এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, এবং ইহার পূর্ব্বতন আচার্য্য ও লেখকদের নিকট যে 'ঋষি-ঋণ' আছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে শোধ করিবেন।

এ বিষয়েও নিম্নলিখিত উপায়গুলি প্রস্তাবিত হইয়াছে :—

(ক) ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনে ও ব্রাহ্মধর্ম্মপালনে অধিকতর মনোযোগী হওয়া ;

(খ) প্রতিদিন নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনার অভ্যাস না থাকিলে, ইহা ব্রতরূপে গ্রহণ করা ;

(গ) কোনও পাপ বা কু-অভ্যাস থাকিলে, অন্ততঃ একটি পাপ বা কু-অভ্যাস এই উপলক্ষে জন্মের মত পরিত্যাগ করা ;

(ঘ) ব্রাহ্ম যুবক ও কন্যাদিগের সাধন-দীক্ষা গ্রহণ ;

(ঙ) অন্য সমাজের যে সকল যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রকাশ্যে এ ধর্ম্ম গ্রহণ ;

(চ) উৎসবের দেড় বৎসর কাল প্রত্যহ নিজের জন্য, পরিজন ও বন্ধুবর্গের জন্য, এবং ব্রাহ্মসমাজের সকল নরনারীর জন্য প্রার্থনা করা;

(ছ) যাঁহাদের পক্ষে সম্ভব, পরমেশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ—ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় আপনাকে যথাসাধ্য নিয়োগ করা ;

(জ) আপন স্থানে থাকিয়াই এই দেড় বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগের কার্য্যের কিছু কিছু সহায়তা করা ; যেমন, ব্রাহ্মসমাজের জন্য অর্থসংগ্রহ ; ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক পুস্তকাদি লেখা, ও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলেও ত্যাগস্বীকার পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করা ; অপরের লিখিত পুস্তকাদি বিক্রয়ে সহায়তা করা, সমাজের পত্রিকাগুলি গ্রহণ করিয়া বন্ধু-বান্ধবকে পড়িতে দেওয়া ; পত্রিকাগুলির গ্রাহক বৃদ্ধি করা ;

(ঝ) এই মহোৎসবের সমাচার বন্ধু-বান্ধবকে দেওয়া, ইহাতে যোগদান করিতে সকলকে আহ্বান করা, এবং ইহার জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়া, কলিকাতার কমিটির নিকট বা স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করা ; ইত্যাদি।

চারি প্রণালীতে এক অখণ্ড মহোৎসব।

উপরোক্ত চারি প্রণালীর প্রত্যেকটিই মহোৎসবের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। প্রত্যেকটি অপর তিনটিকে সহায়তা করিবে ; এবং সকলগুলির মিলনে এক অখণ্ড, দেশব্যাপী আত্মিক মহোৎসব সম্পন্ন হইবে। দেড় বৎসর কাল ধরিয়া ভারতভূমি হইতে, ত্যাগস্বীকার ও পুণ্যানুষ্ঠান সহ ব্যাকুল প্রার্থনা পবিত্র ধূপশিখার ন্যায় বিশ্বরাজ পরমেশ্বরের চরণের অভিমুখে উত্থিত হইতে থাকিবে।

মহোৎসব সকলের জন্য।

এই মহোৎসব সকলের জন্য। প্রত্যেকের পক্ষে কলিকাতার উৎসব-ক্ষেত্রে বা স্থানীয় সমাজের উৎসব-ক্ষেত্রে সশরীরে যোগদান সম্ভব না হইতে পারে ; কিন্তু কোনোটিতে শ্রম দ্বারা, কোনোটিতে অর্থ দ্বারা, এবং তাহাও সম্ভব না হইলে, কেবল মাত্র শুভ কামনাদ্বারা সহায়তা করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। যে অনুরাগী ভক্ত দূরে অবস্থান হেতু, অথবা শারীরিক অসুস্থতা, দারিদ্র্য বা অন্য প্রতিকূল অবস্থা বশতঃ অপর কিছুই করিতে না পারিবেন, তিনিও এই উপলক্ষে নিজের জন্য ও সমগ্র দেশের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন।

সুদূর পল্লীগ্রামের কোনও একটি অজ্ঞানিত, অল্প-শিক্ষিত যুবকের বা একটি অল্প-শিক্ষিতা বাল-বিধবার হৃদয়ে যদি ভগবৎ-কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি কিরণ-রেখা কোনও ক্রমে প্রবেশ করিয়া থাকে (এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা অনেক শুনা গিয়াছে), আর তিনি যদি এই মহোৎসবের সমাচার পাইয়া, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে দুইটি মাত্র পয়সা এই উপলক্ষ্যে কোনো দরিদ্রকে দান করেন, তবে তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কার্য্যও হৃদয়দর্শী ভগবানের নিকট গ্রাহ্য হইবে, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার মহোৎসবে যোগদান করা হইবে। এইরূপ গোপন সদনুষ্ঠানে যদি দেশময় পুণ্যগন্ধি হাওয়া প্রস্তুত হয়, তবে তাহাই উৎসবের প্রকৃত সফলতা।

এমন অনেক দুর্ভাগ্য ব্যক্তি নানা স্থানে রহিয়াছেন, যাঁহারা জীবনের কোনও শুভ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্রবে আসিয়া প্রচুর উপকার লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার আবর্ত্তে পড়িয়া এত দূরে সরিয়া গিয়াছেন যে, এখন আর এ ধর্ম্মের কোনো বার্ত্তা তাঁহার নিকট পৌঁছায় না। এক সময়ে যিনি প্রার্থনায় কত আনন্দ, শান্তি ও বল পাইতেন, আজ তাঁহার হৃদয়-দ্বার রুদ্ধ, অন্তঃকরণ শুষ্ক ও নিরাশায় ম্রিয়মাণ, এমন ব্যক্তিও পূর্ব্বলিখিত কোনও না কোনও উপায়ে এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া পুনরায় নব আশায় আশান্বিত হইতে পারেন। বর্ত্তমান মহোৎসব এইরূপ ব্যক্তিদিগের জন্য পরিত্রাতা পরমেশ্বরের সস্নেহ আহ্বান।

ফলকথা, এই উৎসব সকলেরই জন্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা উপকৃত প্রত্যেক নরনারী এ উৎসবের পূজারী ; এখন বলা হইতেছে, কেবল উপকৃত কেন, যে-কেহ পরমেশ্বরের কৃপার প্রার্থী, যে-কেহ এই ভারতক্ষেত্রে নীতি ও ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার কামনা করেন, তিনি যে সম্প্রদায়েরই হউন, এই দেশময় পুণ্যভাবের মহাপ্লাবনের সময়ে, তিনি আপন প্রার্থনা ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনার সহিত যুক্ত করুন।

মহোৎসবের বিশেষত্ব—ত্যাগস্বীকার।

ত্যাগস্বীকার ও শ্রমস্বীকার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে গৌরবান্বিত করা এই মহোৎসবের বিশেষত্ব। এ উৎসব আমাদের অন্যান্য বার্ষিক উৎসবের মত পাইবার উৎসবও বটে—জ্ঞান, ভক্তি, আশা, আনন্দ, ইত্যাদি স্বর্গীয় সম্পদ পাইবার উৎসব ; কিন্তু ইহা

প্রধানতঃ দিবার উৎসব—ব্রাহ্মধর্ম্মের 'ঋষিঋণ' পরিশোধের জন্য, ইহার প্রভাব বৃদ্ধি ও প্রসার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, অর্থ সময় ও শক্তি দিবার উৎসব। না দিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না। না দিলে, এ উৎসবে কর্ত্তব্যের ক্রটীতে পাওয়ার দিক বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। না দিলে, না খাটিলে, শতবৎসরে সমাগত এই মহা-মহোৎসব ভাবুকতামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যাইতে পারে।

ত্যাগস্বীকার নিজেরই জন্য।

যিনি দিবেন ও খাটিবেন, তিনি এই দেওয়ার দ্বারা ও খাটার দ্বারাই উৎসবের সফলতা লাভ করিবেন। ইহার মধ্য-দিয়াই আত্মার সম্পদ লাভ করিবেন। এমন পরিমাণ দেওয়া চাই, যেন সেই ত্যাগস্বীকারের সুমিষ্ট ক্লেশানুভবটুকু হৃদয়ে চিরদিনের মত একটি ছাপ রাখিয়া যায়। প্রাচুর্য্যের ভাণ্ডার হইতে অল্প কিছু দিলে দরিদ্র ভিক্ষুক সন্তুষ্ট হয়, তাহার কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের কোনও কাজ আট্‌কাইয়া নাই! আমাদের দেওয়া ও খাটা আমাদেরই কর্ত্তব্য-পালনের জন্য। ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে এ জগতের সকল অভাব আপনি মোচন করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। করেন নাই শুধু এই জন্য যে, আমরা মানুষ প্রত্যেকে অপরের জন্য পার্থিব ত্যাগস্বীকার করিয়া স্বর্গীয় জীবন লাভ করিব।

অবশ্য, কলিকাতার কমিটির ও মফস্বল কমিটির প্রস্তাবিত কার্য্যগুলির সফলতা সকলের প্রদত্ত অর্থ-সাহায্য ও শ্রম-সাহায্যের উপরেই নির্ভর করে। যে পরিমাণে অর্থসাহায্য ও শ্রম-সাহায্য পাইবেন, সেই পরিমাণেই তাঁহারা কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি কোনও রাজা-মহারাজা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সমুদয় অর্থ একাকী দান করিতেন, এবং যদি তাঁহারা বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া সকল কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হইতেন, তথাপি আমাদের প্রত্যেকের ত্যাগ-স্বীকারের দায়িত্ব তিলপরিমাণও হ্রাস হইত না। কেন না, এ আমাদের নিজেরই জন্য; আমরা ত্যাগের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এ উৎসবের আয়োজন করিয়াছি।

মহোৎসবের সফলতা—দৈন্যপীড়িত ভারতের কল্যাণার্থ ত্যাগস্বীকারে।

আর, এই দুঃখ-দৈন্যে পীড়িত ভারতের দুর্দ্দশামোচনের জন্য ত্যাগস্বীকার একান্ত আবশ্যক। এ দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় পরম ঔষধ আর নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনের লক্ষ্যকে উন্নত করে, চরিত্রকে মহৎ করে, পরিবারকে মানুষ গড়িবার উপযুক্ত ক্ষেত্র করে। জাতীয় জীবনে একতা আনয়ন করিবার জন্য, ও ভবিষ্যৎ ভারতকে ধর্ম্ম ও নীতির পথে রক্ষা করিবার জন্য, ব্রাহ্মধর্ম্মের তুল্য আর কিছুই নাই। অতএব, এই ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ত্যাগস্বীকার করিয়া বিধাতার প্রদত্ত অর্থ ও শক্তিকে সার্থক করা সকল ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য। সকলের ত্যাগস্বীকারেই এই শতবার্ষিক মহোৎসব সফল হইবে। ওঁ ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

সমাজের প্রতি ব্রাহ্মমহিলার কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মপ্রাণ যীশু একদা তাঁহার শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমরা এই পৃথিবীর আলোকস্বরূপ। তোমাদের রশ্মি যদি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কাহার প্রভাবে জগৎ পুনরায় আলোকময় হইবে? তোমরা পৃথিবীর লবণ-স্বরূপ; লবণের লবণত্ব চলিয়া গেলে এমন কি পদার্থ আছে, যাহার দ্বারা জগৎ আস্বাদময় হইবে?" মহাত্মা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ যে ধর্ম্মের আলোক ভারতে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহারই কিরণ আজ সমগ্র ভারতকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের বিদ্যানুরাগ, নারী-জাতির স্বাধীনতা, সমাজ সংস্কার ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব আজ সমগ্র ভারতকে আলোড়িত করিতেছে। বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ হিন্দু সমাজ অস্পৃশ্য ও পতিত জাতিসমূহের উদ্ধারকল্পে দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিতেছেন। যে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে এই মহাদেশ গড়িয়া উঠিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, সেই সমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতার ধর্ম্ম নীতি পবিত্রতা ও প্রেমে কিরূপ আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত, তাহা সকলেরই চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় এবং কেমন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য সকলেরই প্রাণ মন একনিষ্ঠ ভাবে সমর্পণ করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে নারীর কর্ত্তব্য পুরুষ অপেক্ষা সমধিক গুরুতর। গৃহে ও সমাজে নারীর নৈতিক প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবতী। নারীর নৈতিক উৎকর্ষ ব্যতীত যেমন কোনও জাতি গঠিত হয় না, সেইরূপ কোনও সমাজও উহাদের চেষ্টা ব্যতীত আদর্শ স্থান লাভ করিতে পারে না। বর্ত্তমান আমেরিকার নারীর প্রভাবে সুরাপান রাজবিধির দ্বারা বিদূরিত হইয়াছে ও তাহার সঙ্গে যাবতীয় দুর্নীতি সমাজশরীর হইতে অপসৃত হইয়া পড়িতেছে। সু-মাতা সু-গৃহিণী, সু-ভগিনী হইতে পারিলে, কোনও প্রকার কুপ্রথাযুক্ত ভোগবিলাস সমাজ-গৃহের গবাক্ষে উঁকি দিতেও সাহস করিবে না। তাহা হইলে আমাদের সন্তানস্থানীয় যুবকগণ সমাজের বাহিরে জন সাধারণের উদাহরণস্থানীয় হইতে পারিবে। তাহাদের চরিত্র ও নীতির জন্য, আমরা তাহাদের মাতা ও ভগিনীগণ, আমরাই সম্পূর্ণ দায়ী। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে কঠোর ভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। আমাদের সন্তানেরা যদি রঙ্গালয়ে যাইতে অভিলাষী হয় বা ধূমপান করিতে বিরত না হয়, তজ্জন্য আমরা ব্যতীত আর কেহই দায়ী নহে। যাঁহারা জনক জননীর গুরুতর আসন গ্রহণ করিয়াও পুত্রকন্যা লইয়া রঙ্গালয়ে গমন করেন, তাঁহাদিগকে উক্ত প্রবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য, আমাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণা তাঁহারা এক যোগে দৃঢ়তা অথচ প্রেমপ্রবণতার সহিত সচেষ্ট হউন। যখন সমগ্র হিন্দু সমাজ মৌখিক অনিচ্ছা সত্বেও অন্তরে, প্রাণে প্রাণে, ব্রাহ্ম আদর্শ অনুসরণ করিতেছে, তখন জীবনের প্রতি পাদবিক্ষেপে আমাদের কি সতর্ক হওয়া উচিত নহে?

দ্বিতীয় প্রসঙ্গে সামাজিক প্রেম। ইহা যে একেবারে নাই তাহা বলিতেছি না, কিন্তু ইহা মনে হয় যে ইহার ব্যবহারেও-

বিগত ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে মহিলাদের উৎসবে পঠিত

প্রদর্শনে আমরা অমনোযোগী ও অলস হইয়া পড়িতেছি। কাহারও দুঃখ কষ্ট বা রোগ শোকের কথা শুনিলে আমরা যতটা কাতর হইয়া পড়ি, কার্য্যে ততটা দেখাইতে বা করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেকেরই অন্যের জন্য কিছু করিবার সামর্থ্য আছে। কেহ বা অর্থ, কেহ বা শরীর, দিয়া অন্যের সেবা করিতে পারেন। আমাদের সমাজটি ক্ষুদ্র; এখানে সকল পরিবার যদি প্রত্যেককে আপনার না ভাবিতে পারে, তাহা হইলে কিরূপ পরিতাপের বিষয় হয়! অধিকাংশ ব্রাহ্ম পরিবার প্রাচীন গৃহ পরিবার ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সমাজে আসিয়া যদি তাঁহারা প্রাচীন আত্মীয়তার স্পর্শ না অনুভব করেন, তাহা হইলে কি একটা নির্দ্দয় নির্জ্জনতা জীবনে অনুভূত হইবে না, ইহা অনুভব করিয়া আমাদের প্রেমের বিস্তার সত্য সত্যই বৰ্দ্ধিত করিতে হইবে এবং সেবা ও সহানুভূতিতে সমাজকে পূর্ণ করিতে হইবে। এখানে একটি গ্রাম্য চিত্র অঙ্কিত করি—কোনও হিন্দু পল্লীতে একটি সধবা নারী কঠিন রোগশয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন। মাসাধিক কাল শয্যাশায়ী থাকিয়া পরে তিনি অনন্ত কালের জন্য প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই ৩০ দিন তাঁহার গৃহ দিবা রাত্রি স্ত্রী পুরুষে পূর্ণ হইয়া থাকিত। ৫০।৬০ জন নরনারী সমুপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সেবা ও চিকিৎসকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। যখন তাঁহার দেহত্যাগ হইল, তখন ৩০০ শতাধিক নরনারী তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ইহা একটি সত্য ঘটনা। এই প্রাচীন সেবা ও সহানুভূতির ভাবটি একবার চিন্তা করুন ও আমাদিগের সামাজিক জীবনে তাহা পুনরাগত হউক। প্রেমের দ্বারাই নূতন সমাজ গড়িয়া উঠে। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রেম তদানীন্তন খৃষ্ট-জগতে এমনি বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, ধনী দরিদ্র একত্রে গৃহ বাঁধিয়া বাস করিত এবং ধনী খৃষ্টান তাঁহার সমস্ত অর্থ বিতাড়িত ও উৎপীড়িত দরিদ্র ভাই ভগ্নীর ব্যয়ের জন্য সাধারণ ধনাগারে প্রেরণ করিতেন। চারিটি শতাব্দী ধরিয়া এই রূপ প্রেমের উচ্চ ভিত্তিতে খৃষ্ট সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রেমের নীতির অনুকরণে অগণ্য Home ও বিদ্যালয় খৃষ্ট জগতের ভিতরে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এ সকল অনুষ্ঠানের অনুকরণে ভারতে আর্য্যসমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন বহুল লোকহিতকর কর্ম্মে শরীর মন অর্থ অর্পণ করিয়াছেন। আমাদের মধ্যেও তদনুরূপ ত্যাগ ও কর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছে।

শ্রীমতী বিরাজমোহিনী রায়

ব্রাহ্মসমাজকে কি ভালবাস?

প্রীতির পরিচয় ত্যাগে; যাকে প্রীতি করি, তার জন্য কতটা কষ্ট সহিতে পারি, তাহাদ্বারাই ত প্রীতির পরীক্ষা হয়। আজ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের প্রেমের পরীক্ষার সময় আসিয়াছে। এক সত্যস্বরূপ নিরাকার জ্ঞান ও প্রেমের আধার পরমেশ্বরে প্রীতি, সাক্ষাৎ ভাবে প্রেম ভক্তিদ্বারা তাঁর অর্চ্চনা, অপর দিকে তাঁর প্রীতিপ্রণোদিত হইয়া, তাঁরই প্রিয় কার্য্য অনুভব করিয়া, লোক-শ্রেয়ঃসাধন, এই আদর্শ লইয়াই ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। এই আদর্শ দেখিয়া ঈশ্বরের আহ্বানে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠাতে আমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণ, দেশের ও মানবের কল্যাণ। এই আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্যই কত লোক কত সাধনা করিয়াছেন, কত দুঃখ দারিদ্র্য বরণ করিয়াছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন! এই আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্যই কত অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে, কত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে! সিটি কলেজ তার একটা প্রধান প্রতিষ্ঠান। কত লোকের প্রীতি, অক্লান্ত শ্রম, অর্থ-দান, নিঃস্বার্থ সেবা ও ত্যাগ দ্বারা সিটি কলেজের সৃষ্টি ও উন্নতি হইয়াছে! এই কলেজের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ প্রচারের সহায়তা হইয়াছে। আজ সিটিকলেজ বিপন্ন। অনেকবার সিটি কলেজ বিপন্ন হইয়াছে, সে বিপদজাল ভগবানের কৃপায় কাটিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে এক নূতন রকমের বিপদ উপস্থিত; যাঁহারা সিটিকলেজের অনিষ্টচেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। তাঁহারা ত আমাদেরই ভাই; ভগবান তাঁহাদের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করুন; ভগবান্ তাঁহাদের নূতন আলোক দিন্ যাহাতে তাঁহারা বিষয়টি প্রকৃত ভাবে বুঝিতে পারেন। আজ আমরা ব্রাহ্ম ভাই বোনদিগকে, ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতিকারী-দিগকে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা কি দূর হইতে বিষয়টা দেখিয়া কেবল দুঃখ করিবেন, এবং যাঁহারা ভ্রান্তিবশতঃ ইহার অনিষ্টচেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সমালোচনা করিবেন? এখানেই কি তাঁহাদের কর্ত্তব্যের শেষ হলো? এই সিটিকলেজকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব কি তাঁদের নাই? ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ তাঁহাদের, এবং দেশের ও মানবের প্রকৃত কল্যাণ আনিয়া দিবে যদি তাঁহারা অনুভব করেন, এবং এই সিটিকলেজরূপ প্রতিষ্ঠান যদি তাহার একটা প্রধান সহায় ব'লে মনে হয়, তবে কি তাঁহারা ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন না? ৪।৫ লক্ষ টাকা ত বেশী নয়। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও সহানুভূতিকারী যদি এক মাসের আয় সিটি কলেজের জন্য প্রদান করেন—এক সঙ্গে নয়, ২ বৎসরের মধ্যে যদি এই টাকা দেন,—অনেক লক্ষ টাকা উঠিতে পারে। কোনও কোনও গরীব অবস্থার লোক তাঁহাদের শক্তির অতীত অর্থ দিয়াছেন; একজন সম্প্রতি ২ বৎসরে এক মাসের আয় দিবেন জানাইয়াছেন; ইঁহার প্রকৃত মূল্য অনেক বেশী। টাকার পরিমাণদ্বারা তাহা নির্ণীত হয় না। কিন্তু এ টাকাতে ত কুলাবে না; সকলে এক মাসের আয় লইয়া আসুন। কমিটির মেম্বর যাঁহারা কাউন্সিলের মেম্বর যাঁহারা, তাঁহারা আগে অগ্রসর হউন। ব্রাহ্মগণ ও সহানুভূতিকারিগণ, তাঁহাদের পুত্র কন্যা আত্মীয়দিগকে সিটি কলেজে পড়িতে দিন। বন্ধু বান্ধবদিগকে অর্থ দিতে ও তাঁহাদের পুত্র কন্যা আত্মীয়-দিগকে সিটি কলেজে পাঠাইতে অনুরোধ করুন। এ ভাবেও ত অনেকে খুব সাহায্য করিতে পারেন। সিটি কলেজ যদি আমাদের আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হয়, তবে ইহাকে রক্ষা করিতেই হইবে। সকলে এক মাসের আয় লইয়া অগ্রসর হউন। বিনা ত্যাগে ধর্ম্মলাভ হয় না। ভগবান্ আমাদের সম্মুখে পরীক্ষা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ধর্ম্মকে ব্রাহ্ম-

সমাজকে আমরা ভালবাসি কি না, তার জন্ত ত্যাগস্বীকার করিতে পারি কি না, তার পরীক্ষা উপস্থিত। ভগবানের আহ্বান অবহেলা করিও না। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হও; এক মাসের আয় প্রদান করিতে অগ্রসর হও।

২১০।৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১৭ই জুন, ১৯২৮।

বিনীত
শ্রীললিতমোহন দাস

নূতন সঙ্গীত *

জয়জয়ন্তী—একতালা

একেলা ফেলিয়ে রেখো না আমায়, কাছে কাছে সদা থাকো।
সবাই যদি গো ছেড়ে যায় দূরে, তুমি মোরে ছেড়োনাকো।
বিষাদ-আঁধারে ঘেরিলে জীবন, মরুসম শুষ্ক হয় যদি মন,
আশালোক দিয়ে, কৃপা বরষিয়ে, নয়নে নয়নে রেখো;
দৈন্তভরে প্রাণ হ'য়ে যদি ম্লান, শান্তি আশে মাগে বিরামের স্থান।
কোলে টেনে নিয়ে জননী আমার, প্রেমের অঞ্চলে ঢেকো।
তুমি যে আমার জীবনের জীবন, চিরসাথী, চির আপনার জন,
এই কথা প্রাণে বল অনুক্ষণ, ভুলিতে আর দিওনাকো।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ যৎ

ওহে প্রাণাধার! আর কোথায় যাব তোমায় খুঁজিতে?
আছ তুমি আমার হৃদয়-নিভৃতে।
ঘেরে মোরে চারিপাশে, প্রাণের সনে আছ মিশে,
(পাই) পরিচয় প্রতি নিশ্বাসে, পারি কি তা ভুলিতে?
আমি দূরে ভাবলে দূরে তো নও, প্রাণের প্রাণ তুমি যে হও;
আমি যদি ভুলিতে যাই (তুমি) দিবে না তো ভুলিতে।

লুম খাম্বাজ—যৎ।

প্রাণের আরাম তুমি আমার, তোমায় ছেড়ে প্রাণ কি বাঁচে?
যে দিকে চাই, আর কেহ নাই, দাঁড়াই বল কাহার কাছে?
সব পেয়েও গরীব আমি, হীন যেন মরুভূমি,
সকল ধনের সার যে তুমি, কোন্ ধনে আর দুঃখ ঘোচে?
তোমার সমান কে আর আপন, প্রেম কে করে তোমার মতন?
যারে দেখলে ঘোচে হৃদয়-বেদন, সকল অশ্রু যায় গো মুছে!
(আমার) সকল ব্যথায় তুমি ব্যথী, সকল পথে তুমি সাথী,
(আমার) হৃদয়-রথে হওগো রথী, (সদা) থাক আমার কাছে কাছে॥

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৯ই জুন বালিগঞ্জ উপনগরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশচন্দ্র পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ২৩শে জুন কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিমাংশুমোহন কন্যা মাতা, পত্নী, দুইটি শিশু কন্যা ও বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজনদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অল্প কয়েক মাসের রোগে ৩৫ বৎসর বয়সে ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার মধুর চরিত্রে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই মুগ্ধ ছিলেন। ইনি শুধু আত্মীয়-স্বজনদের নহে, ব্রাহ্মসমাজেরও, একটি আশার স্থল ছিলেন।

বিগত ২৩শে জুন তারিখে গিরিডি নগরীতে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দেবের দ্বিতীয় পুত্র সরোজকুমার অল্প কয়েকমাস রোগ ভুগিয়া হঠাৎ দুইটি মাতৃহীন পুত্র ও কন্যা, বৃদ্ধ পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে শোকাভিভূত করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই জুন পাটনা নগরীতে ডোমর্যাও হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার বসু দীর্ঘকাল নানা রোগে ভুগিয়া ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি একজন অনুরাগী ব্রহ্মোপাসক ছিলেন এবং ঐ অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজের অনেক কাজ করিয়াছেন।

বিগত ১৬ই ও ১৭ই জুন গিরিডি নগরীতে পরলোকগত সাতকড়ি দেবের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শনিবার প্রাতে কীর্ত্তনান্তে উপাসনা; শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত উপনিষদ্গ্রন্থ হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া উদ্বোধন করেন ও মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি আরাধনা করেন। তদনন্তর পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ, কন্যাদ্বয় ও সহধর্ম্মিণী তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ উপাসনা করেন; তৎপরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী পরলোকগত আত্মার বিশেষ বিশেষ গুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি নিজের শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। পরদিন রবিবার সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হইয়া অনুষ্ঠান শেষ হয়। সাতকড়ি বাবু হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে ইং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিন বৎসর বয়সের সময় মাতৃপিতৃহীন হন। বাল্যকালে পাঠদ্দশায় স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার তরুণ হৃদয়ে নিরাকার ব্রহ্মের ভাব অঙ্কুরিত হয়। তৎপরে তাঁহার ছোট কাকা স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার প্রভাবেই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। কোন্নগর বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর সহিত একসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি যদিও ব্রাহ্মসমাজের একজন শক্তিশালী, কর্ম্মঠ উচ্চপদস্থ বা বিখ্যাত সভ্য ছিলেন না, তথাপি তাঁহার জীবন একটী আদর্শ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবন ছিল। তিনি একজন সরল বিশ্বাসী বাহ্যাড়ম্বরশূন্য বিলাসিতাবর্জ্জিত ব্রাহ্ম ছিলেন। দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি অতি গভীর বিশ্বাসী ও ঈশ্বরে নির্ভরশীল ছিলেন। দুঃখের অবস্থাতেও সদা প্রফুল্ল থাকিয়া অপরের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। একদিনের জন্যও কেহ তাঁহার মুখে নিরাশার কথা শুনিতে পায় নাই। এইভাবে সুদীর্ঘ ৮৫ বৎসরকাল ইহলোকে বাস করিয়া পরলোকের উজ্জ্বল বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া এখান

---

* গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন নীলমণি বাবুর নিকট হইতে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত এই তিনটি সঙ্গীত তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। স্থানাভাববশতঃ এতদিন প্রকাশ করিবার সুবিধা হয় নাই।

হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি পরলোকগমনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের জন্য ২৩১৫৲ দান করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই উপলক্ষে পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেব ১২৭৫৲, জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুবালা ঘোষ ৫০৲, কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুপ্রভা বসু ২০৲, জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রী শ্রীমতী সুকুমারী দে ২০৲, ও মধ্যমা দৌহিত্রী শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী সরকার ১৫৲, দান করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত মোট ৩৬৭৫৲ নিম্নলিখিত রূপে নানা বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে:—১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে "কৃষ্ণমোহন দেব ও বিন্ধ্যবাসিনী দেবের" নামে একটী স্থায়ী প্রচার ফণ্ড ১০০০৲, ২। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে "সুখময়ী সেন ও শরৎকুমারী মিত্র" নামে একটী স্থায়ী ফণ্ড ১০০০৲, ৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে সাতকড়ি দেবের নামে স্থায়ীফণ্ড ১০০৲, ৪। কোন্নগর সমাজে ঐ নামে স্থায়ী ফণ্ড ১০০৲, ৫। গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ ২৫৲, ৬। গিরিডি ছোট বালিকাবিদ্যালয় ২৫৲, ৭। গিরিডি হাঁসপাতাল ২৫৲, ৮। গিরিডি ছোট ছেলেদের স্কুল ১০৲, ৯। বৈদ্যনাথ ১০৲, ১০। গিরিডি উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের বিল্ডিং ফণ্ডে ৪৫৲ মধ্যে বাকী ১৫৲, ১১। ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক ফণ্ডে ৫৲। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দেবের নামে কোনও স্থায়ীফণ্ডে ১০০০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বিভাগে সাতকড়ি দেবের নামে স্থায়ীফণ্ড ১০০৲, গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ ১০৲ মধ্যে ৭৫৲ তিনকড়ি বসু ফণ্ড ২৫৲ গিরিডি নববিধান সমাজ ১০৲ শিবনাথ ও নবদ্বীপ মেমোরিয়াল ফণ্ড ১০০৲, ঢাকা অনাথ পরিবার সংস্থান ধন ভাণ্ডার ১৫৲ ঢাকা বিধবাশ্রম ১০৲ কলিকাতা নারীরক্ষা সমিতি ১০৲ বাণীভবন ১০৲ Indigent Brahmo Family fund (Calcutta) ১০৲ দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার ১০৲ কাঙ্গালী বিদায় ৫৲।

বিগত ২৬শে মে লাহোর নগরীতে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের মাতা সুরবালা দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়-স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

নামকরণ—বিগত ১৮ই মে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ শীলের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুকে নৃপেন্দ্রনাথ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সত্যেন্দ্র বাবু মেসেঞ্জার ফণ্ডে ২৲, দান করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জ নগরীতে শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষের গৃহে তাঁহার আত্মীয়া শ্রীমতী শ্যামলাবালার কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করিয়াছেন। কন্যার নাম শেফালিকা রাখা হইয়াছে।

মঙ্গলময় বিধাতা শিশুদিগকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ৫ই বৈশাখ কলিকাতা নগরীতে কাঁথি নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন জানার ভ্রাতুষ্পুত্রী (স্বর্গীয় কৃপাসিন্ধু জানার কন্যা,) কুমারী সন্ধ্যার সহিত কাঁথি মাউদা গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় বৃন্দাবনচন্দ্র বারিকের পুত্র শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৯শে বৈশাখ বালেশ্বর নগরীতে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বিশালের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী শোভাময়ীর সহিত কাঁথি নিবাসী শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন মাইতির পুত্র শ্রীমান্ সরোজকুমারের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ হাওড়া দক্ষিণ বাঁটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দাসের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত কাঁথি নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন জানার ভ্রাতুষ্পুত্র (স্বর্গীয় কৃপাসিন্ধু জানার পুত্র) শ্রীমান যতীন্দ্রনাথের শুভ পরিণয় হাওড়ায় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

নারায়ণগঞ্জ প্রবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষের কন্যা শ্রীমতী সুকৃতীর সহিত পরলোকগত শশিভূষণ মল্লিকের পুত্র শ্রীমান বিভূতিভূষণের শুভপরিণয় গত ৭ই জুন সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১১ই জুন বরিশাল নগরীতে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাসের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া স্বর্ণলতা ও কটক নিবাসী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ রাও এর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান দিনকরের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—গত ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল; শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৫ই মে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে সমাজের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়; রায় সাহেব প্যারীমোহন দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সমাজের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ ও পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সহকারে গৃহীত হইলে পর, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বৎসরের জন্য সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হন। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, ডাক্তার নেপালচন্দ্র রায়, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বৎসরের জন্য সমাজের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন:—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু সহকারী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন দাস—হিসাবপরীক্ষক, শ্রীযুক্ত সুললিত সরকার—রামমোহন রায় লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ।

গত ১৯শে মে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে (১) পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অষ্টাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন এবং (২) ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকমহোৎসব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কীয় বিবিধ কার্য্যের ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় ব্রাহ্মসাধারণের একটি সভা হয়। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমটি সম্বন্ধে স্থিরীকৃত হয় যে, যখন কলিকাতা হইতে শতবার্ষিক মহোৎসবের ভারতভ্রমণকারী ভক্তদল সম্মিলনীর নির্দ্দিষ্টকালে ঢাকায় আসিবেন, তখন তাঁহাদিগকে লইয়া এক মিলিত উৎসব সম্ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন এ বৎসর ঢাকা সহরেই হইবে। এই কার্য্যের জন্য একটি বৃহৎ অভ্যর্থনাসমিতি ও তদধীনে ১৯ জন সভ্য লইয়া একটি কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়। ডাক্তার নেপালচন্দ্র রায় এই উভয়ের সম্পাদক ও তিনজন উৎসাহী যুবক সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

স্থানীয় সমাজের দেড়বৎসরব্যাপী শতবার্ষিক মহোৎসবের জন্য নিম্ন লিখিত কার্য্যগুলি প্রস্তাবিত হয়—(১) ঢাকা জেলার সহরগুলিতে ও গ্রামে যত ব্রাহ্মপরিবার আছে, তাহার প্রত্যেক পরিবারে আগামী আগষ্ট মাসে বা পরে একদিন বিশেষ উপাসনা এবং এই মহোৎসব সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করা। (২) আগামী শততম ভাদ্রোৎসবে যাঁহারা কলিকাতার মিলিত উৎসবে যাইতে পারিবেন না, তাঁহাদের জন্য স্থানীয় সমাজে উৎসবের ব্যবস্থা করা। (৩) সহরের বিভিন্ন অংশে বালক-বালিকাদিগকে লইয়া সংকীর্ত্তন দল গঠন করা; তাহারা রাস্তায় সংকীর্ত্তন করিবে এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া তাহা দরিদ্রসেবায় ব্যয় করিবে। (৪) উপযুক্ত লোক দ্বারা স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখাইয়া যতশীঘ্র সম্ভব মুদ্রিত করা। (৫) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তক প্রকাশ, বিক্রয় ও বিতরণ। (৬) ঢাকা জেলার মহকুমাগুলিতে ও প্রধান প্রধান গ্রামে দেড়বৎসরকাল মধ্যে অন্ততঃ একটি করিয়া উৎসবের ব্যবস্থা করা। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একটি শতবার্ষিক মহোৎসব কমিটি গঠিত হইয়াছে। সম্মিলনীর কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে বারজনকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হইয়াছে তাঁহারাই এই কমিটিরও সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন এই কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই মহোৎসবের প্রস্তুতির জন্য গৃহে গৃহে উপাসনাদি আরম্ভ হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই তিন মাস সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন করিয়া কোন না কোন গৃহে উপাসনা ও মহোৎসব সম্বন্ধে আলোচনাদি হইবে। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন ও শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুদিগের বাড়ী বাড়ী উপাসনা এবং শতবার্ষিকী উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সবাইকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

স্মৃতিসভা—ব্রাহ্মযুবক সমিতির উদ্যোগে বিগত ১৪ই ও ১৮ই জুন যথাক্রমে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দের স্মরণার্থ দুইটি স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। প্রথমটিতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ও দ্বিতীয়টিতে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং আরও অনেকে বক্তৃতা করেন।

কাঁথিব্রাহ্মসমাজের উৎসব—৩১শে চৈত্র পল্লীবাসীর দ্বারে দ্বারে উষাকীর্ত্তন হয়, তৎপর সমাজমন্দিরে উপাসনা। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উপাসনা করেন। সায়ংকালে ইংরাজীতে বক্তৃতা হয়; শ্রীযুক্ত শুভাকৃষ্ণায়া "ভারত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১লা বৈশাখ পল্লীতে পল্লীতে দ্বারে দ্বারে উষাকীর্ত্তন হয়, মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উপাসনা; বরদা বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নকালে আলোচনা হয়; সায়ংকালে পুনরায় মন্দিরে উপাসনা হয়; বরদা বাবু উপাসনা করেন। ২রা বৈশাখ দ্বারে দ্বারে উষাকীর্ত্তন হয়; তৎপর মন্দিরে উপাসনা; বরদা বাবু উপাসনা করেন। রাত্রিতে সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ৩রা বৈশাখ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন; সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় বুদ্ধদেব বিষয়ে সংগীতাদি সহকারে বক্তৃতা করেন। ৪ঠা বৈশাখ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী শাসমলের ভবনে উপাসনা ও প্রীতিভোজন হয়। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র সংগীত সংকীর্ত্তন দ্বারা উৎসবের সহায়তা করিয়াছেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ২৭শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষের ভবনে তাঁর দৌহিত্রী (স্বর্গীয় সুরেন্দ্রলাল রায়ের প্রথমা কন্যা) কল্যাণীয়া শোভনার সহিত গৌহাটী-প্রবাসী বাবু ললিতমোহন লাহিড়ীর চতুর্থ পুত্র শ্রীমান কমল-কুমারের শুভপরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত বৈশাখের শেষভাগে সর্ব্বানন্দভবনে এবং ১২ই জ্যৈষ্ঠ কল্যাণ-কুটিরে ব্রাহ্মবন্ধু সভার দুইটী অধিবেশন হয়। দুই সভাতেই মনোমোহন বাবু সভাপতির কার্য্য করেন। দুইটী সভাতেই ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ ক'রে কয়েকটী প্রশ্নের আলোচনা হয়। আগামী বৎসরের জন্যও শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস সম্পাদক এবং বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন এবং কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী সহসম্পাদক নিযুক্ত হন।

কিছুদিন হইল বরিশালে শতবার্ষিকী উৎসবের অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের বন্দোবস্তকল্পে এখানকার কমিটীর একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এখন প্রধানতঃ অর্থসংগ্রহেরই উদ্যোগ চলিতেছে।

বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসুর গৃহে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সুশীলকুমারের আদ্যপারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, সত্যানন্দ বাবু পারলৌকিক তত্ত্ব বিবৃত এবং ললিত বাবু প্রার্থনা করেন। এতদ্ভিন্ন ভগিনী নলিনীবালা বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী এবং শান্তিজীবন বসু সুশীলকুমারের জীবন কথা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে ভাই ভগিনীগণ মিলিতভাবে প্রায় ২০৲ টাকা বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে দান করিতে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন।

বিগত ৪ঠা বৈশাখ ভৈরবভবনে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ শিশুপুত্র প্রায় দেড় বৎসর বয়সে আমাশয় রোগে পরলোকগমন করিয়াছে। গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ এই উপলক্ষে ভৈরব-ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য, সঙ্গীত এবং পারলৌকিক তত্ত্ব পাঠ করেন। দুই পরিবারস্থ সকলের উপরেই এক শোকের ছায়া পড়িয়াছে। মঙ্গলবিধাতা এই দুই পরিবারে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

৫ই জ্যৈষ্ঠ সর্ব্বানন্দভবনে রায় বাহাদুর ডাক্তার প্রেমানন্দ দাসের পরলোকগমনদিনে বিশেষ উপাসনা হয়।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ভৈরবভবনে কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বার্ষিক পারলৌকিক সম্পন্ন হয়। পুত্রগণ এই উপলক্ষে বরিশাল ব্রাহ্ম-সমাজে ৫৲ টাকা দান করেন।

৮ই জ্যৈষ্ঠ কল্যাণকুটিরে মনোমোহন বাবুর পিতার মৃত্যু দিনে কীর্ত্তন, পারলৌকিক তত্ত্ব পাঠ এবং উপাসনা হয়। এ উপলক্ষে বরিশাল সমাজে ১৲, একটাকা প্রদত্ত হয়।

তিন দিবসই মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য, পারলৌকিক তত্ত্ব পাঠ প্রভৃতি সম্পন্ন করেন। সমাজের এবং বাহিরের অনেক বন্ধু যোগদান করিয়াছিলেন।

দান—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ নন্দীর পত্নী পরলোকগতা সরলা নন্দীর প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন নন্দী নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন—সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মিসনফণ্ড ২৲, সাধন আশ্রম ২৲, দুর্ভিক্ষ সাহায্য ফণ্ডে ১৲, ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজ ২৲।

পরলোকগত নলিনীভূষণ দত্তের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দত্ত সাধারণ বিভাগে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲, সাধনাশ্রমে ১৲, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ১৲, ও দাতব্য বিভাগে ১৲, দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৩৲, টাকা দান করিয়াছেন।

এ সমস্ত দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মাসকল শান্তি লাভ করুন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২৩ শে আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। | ১লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

৭ম সংখ্যা। | 17th July, 1928. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে অনন্ত জ্ঞান ও প্রেমের চিরপ্রস্রবণ বিশ্ববিধাতা, তুমি তোমার অপার করুণাতে আমাদের নিকট তোমার ধর্ম্মের যে মহান্ আদর্শ প্রকাশিত করিয়াছ, তাহার বিশালতা ও গভীরতা আমরা এখনও সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, —তাহাকে জীবনে ও জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত উপযুক্ত চেষ্টা যত্ন আমরা কিছুই করিতেছি না,—এই দুঃখ লইয়াই তোমার দ্বারে পস্থিত। আমরা অনেক সময় ইহাকে অতি ক্ষুদ্র করিয়াই দেখি, না হয়, উদাসীনতা ও আলস্য বশতঃ তাহা অনুসরণ করিবার কষ্টটুকু স্বীকার করিতে অগ্রসর হই না। তাই আমাদের জীবন ক্ষুদ্রই থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা ত তুমি সকলই জানিতেছ। তুমি আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিলে, এখনও সর্ব্বদা নানা ভাবে ডাকিতেছ,—আমাদের মোহঘোর ভাঙ্গিবার নানা আয়োজন করিতেছ। কিন্তু আমাদের হৃদয় যেন কিছুতেই গভীর বেদনায় কাতর হইয়া উঠিতেছে না—আমরা বাহিরের নানা কোলাহলেই মত্ত থাকি, বাহির লইয়াই অধিক ব্যস্ত থাকি, ভিতরের দিকে দৃষ্টি করি না। আমাদিগকে এই গভীর দুর্গতি হইতে তুমি ভিন্ন আর কে উদ্ধার করিবে? তুমি দয়া করিয়া আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দেও, আমাদিগকে ভাল করিয়া আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে দেও। আর যেন আমরা এই ভাবে ক্ষুদ্র ও মৃত হইয়া পড়িয়া না থাকি, তোমার পবিত্র ধর্ম্মের অগৌরবেরও কারণ না হই! তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার উদার সত্য ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক।

নিবেদন

প্রেমের পরশ—প্রেমের পরশ যখন প্রাণে লাগে, তখন মানুষের দৃষ্টি নূতন হ'য়ে যায়—প্রেম প্রিয় জনকে সুন্দর করে, প্রেম পৃথিবীকে সুন্দর ও মধুর করে, সকল সম্পর্কগুলি মিষ্ট করে। প্রেম মানুষকে ত্যাগে উৎসাহিত করে, প্রেম মানুষকে দানশীল করে; প্রেম মানুষের প্রাণে আনন্দ ঢেলে দেয়। প্রেম মানুষকে প্রিয় জনের জন্য ব্যস্ত করে, প্রিয় জনের সেবাতে সুখ ও আনন্দ এনে দেয়। আমার প্রিয় যখন এসে প্রাণ স্পর্শ করেন, তখন আমি কি যে হ'য়ে যাই তা বল্‌তে পারি না। তোমরাও তা বুঝ্‌তে পার না। তাই ত আমি আছি, তোমাদের সঙ্গে চলা ফেরা কচ্ছি, সুখ দুঃখ পেয়ে কখনও হাসি, কখনও কাঁদি। কিন্তু তাঁকে যখন দেখি, তখন তোমরাই আমার প্রিয়তর হও; তোমাদের মধ্যেও আরও কত সৌন্দর্য্য দেখি! তখন যেদিকে তাকাই সব মধুময়, আনন্দময়; তখন অন্তরে দেখি তাঁরই নানা দুঃখ শোক তাপ, তার ভিতরে দেখি তিনি বক্ষে চেপে ধ'রে আছেন। তখন প্রাণে কত বল আসে! তখন তাঁর আদেশে সব সইতে পারি, আনন্দের সহিত সব ত্যাগ কর্‌তে পারি। তখন কত সাহস পাই! তাঁকে কাছে পেয়ে আনন্দে বিভোর হ'য়ে যাই। তখন দেখি জীবন একটি মধুর সঙ্গীত, সুখ দুঃখের মধ্যে ঐকতান বাদন। সবাই আনন্দের লীলা, প্রেমের খেলা।

আলোক দেখেছ?—আলোকে আমরা পথ দেখে চলি—আলোক ভিন্ন আমাদের চলে না, অন্ধকারে আমরা পথ হারিয়ে বিপথে যাই, মৃত্যুও ঘটিতে পারে। কিন্তু আমি এ আলোকের কথা বল্‌ছি না; আর একটা আলোক আছে,

তাহা অন্তরে জ্বলে। সে আলোকের কি সন্ধান পেয়েছ? সে আলোকে অন্ধকার পথেও চলা যায়। সে আলোক পেলে মাঠ প্রান্তর বন জঙ্গল নদী পর্ব্বত সমুদ্র সব লঙ্ঘন ক'রে চলা যায়। সে আলোকের পশ্চাতে ছুটে সব দুঃখ ক্লেশ বহন করা যায়। সে আলোক যদি না দেখে থাক, দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হও। যে টুকু আসে, সেটুকুর পশ্চাতেই ছোট। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দাও—ঐ আলোক দেখেই চল। সে আলোকের রাজ্যে গেলে আর অপ্রেম থাকে না, স্বার্থ থাকে না, মৃত্যুভয় থাকে না। সে রাজ্যে কেবলই প্রেম, কেবলই আনন্দ—দুঃখেও আনন্দ। সেখানে কেবলই অমৃত। আপনার বুদ্ধি বিবেচনা বিসর্জ্জন দিয়ে ঐ আলোক দেখে চল।

মুক্তির সন্ধান—তাঁতে প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্য-সাধন—ইহাতেই ত মুক্তি। তাই মুক্তির সন্ধান পেয়েই ত আমরা ছুটে এসেছি। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দন উপেক্ষা ক'রে, কত ক্লেশ উৎপীড়ন সহ্য ক'রে ছুটে এসেছি। আজ তবে ফিরে দাঁড়াই কেন? আজ তবে আবার পাটোয়ারি বুদ্ধি কেন? আজ তবে আবার সন্দেহ ভাবনা আসে কেন? তিনি কি প্রাণে আশা জাগান নাই? তিনি কি ব'লে দেন নাই, 'এই পথ, আর পথ নাই'? তবে ঐ মুক্তির পথেই চল। এই পথে তোমার মুক্তি, দেশের মুক্তি, মানবের মুক্তি। এই মুক্তির বার্ত্তা সকলকে শোনাও; এই মুক্তির পথে সকলকে ডাক; এই মুক্তির পথে চল্‌তে যেয়ে ও সকলকে ডাকতে যেয়ে, যদি দুঃখ দৈন্য আসে, তাও যে আনন্দের প্রস্রবণ—অমৃতের সোপান! এই মুক্তির সন্ধানে ত্যাগ চাই; কষ্ট সহ্য করা চাই, লোকের গঞ্জনা সইতে পারা চাই। ভগবান সঙ্গে আছেন; তিনি আশা দিচ্ছেন, তিনি হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছেন। ভয় নাই, নির্ভয়ে অভয় ধামে চ'লে যাও।

সম্পাদকীয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি—যাঁহারা নিজেদের সঙ্কীর্ণতা বশতঃই হউক, অথবা ঈর্ষা বা আপনার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদনের ইচ্ছাদ্বারা চালিত হইয়াই হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরবকে খর্ব্ব করিয়া উহাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা যাহারা ইহার আশ্রয়ে থাকিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি এবং ইহার শতবার্ষিক উৎসব করিবার আয়োজন করিতেছি—সেই আমরাই সকলে ইহার বিশালতা ও গম্ভীরতা, উদারতা ও বিশ্বজনীনতা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। অথচ, তাহা না করিতে পারিলে যে উহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণদ্বারা জীবনের যথোচিত উন্নতি ও কল্যাণ লাভ করিতে এবং যথার্থ ভাবে উৎসব করিতে সমর্থ হইব না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে সম্যক্ ধারণা না থাকিবার একটি কারণ এই—ব্রাহ্মধর্ম্মে ও ব্রাহ্মসমাজে যে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে, অনেকেই তাহা ভাবিয়া দেখেন না। ব্রাহ্মসমাজরূপ প্রতিষ্ঠানটিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও উহা যে কোনও প্রকারেই তাহার পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশে সমর্থ নহে—উহা তাহার আংশিক অপূর্ণ রূপ মাত্র—অনেকেই এই কথা ভুলিয়া যান। বাহিরের আকার অনিবার্য্যরূপেই দেশে কালে আবদ্ধ হইবে—দেশ কালোচিত কতকগুলি নিয়ম পদ্ধতি আচার অনুষ্ঠানাদি এবং জ্ঞান ও ভাবগত মতাদির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে। অনেক সময় অবস্থাবিশেষে অভীপ্সিত আকার প্রদান করিতে না পারিয়া, বাধ্য হইয়াই সংকীর্ণতর আকারও দিতে হয়। যদিও ইহা একটি সাধারণ সত্য ও ইহার প্রমাণ আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, তথাপি এতদুদ্দেশ্যে অন্যত্র যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই—ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসই সেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজর্ষি রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মহান্ আদর্শ হৃদয়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা যে একান্ত আংশিক ও নিতান্ত অপূর্ণ ভাবেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং কোন কোন বিষয়ে (বিশেষ ভাবে পৃথক গৃহে বেদপাঠের ব্যবস্থাতে) অবস্থা বিশেষে বাধ্য হইয়াই (সকলের সমক্ষে বেদপাঠে প্রস্তুত কোনও পণ্ডিত না পাওয়াতেই) তাঁহাকে বিরুদ্ধ ব্যবস্থা (তিনি ত বেদপাঠে সকলের সমান অধিকারই স্বীকার করিয়াছেন এবং কার্য্যতঃ সকলের জন্য তাহা প্রচারও করিয়াছেন) অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, সে কথা কে না জানে? তিনি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মকে সকল গণ্ডী ও সীমার অতীত বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়াই বুঝিয়া-ছিলেন ও প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম যে উদার ও বিশ্বজনীন, সে কথা কি আবেগভরেই তিনি সর্ব্বদা বন্ধু বান্ধব-দিগকে বলিতেন! উহার বিশালতার কথা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয়ে কি উচ্ছ্বাসই না বহিয়া যাইত! তাঁহার ধর্ম্ম কোনও দেশে কালে সম্প্রদায়ে অথবা শাস্ত্রে বা অবাস্তর মতে আবদ্ধ ছিল না। সংস্কারবিহীন বুদ্ধি বিচার দ্বারা নির্ণীত স্বীয় আত্মায় লব্ধ সত্য ও শাস্ত্রে নিবদ্ধ মানবের অভিজ্ঞতা, এতদুভয়ের সম্মিলনে অর্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তি। যুক্তিবিরোধী অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতাবিরোধী যুক্তি, ইহার কোনটিই বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভিত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সত্যধর্ম্মও ইহার কোনও একটির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আর, কোনও দেশের বা কালের ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের অভিজ্ঞতাও পূর্ণ নয়—আংশিক মাত্র। ইহার সম্মিলন ও সমন্বয় ব্যতীত পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবার অন্য উপায় নাই। এই উদার ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই তাঁহার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। ইহা অপেক্ষা প্রশস্ততর ও চিরন্তন যে আর কিছু হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে দেশে ও যে কালে সত্য ধর্ম্মের যে প্রকার বিকাশই হউক না কেন, কোথাও কখনও এই ভিত্তির বাহিরে উহা দাঁড়াইতে পারিবে না। অপর দিকে জ্ঞান প্রেম পুণ্যের আধার জীবন্ত ক্রিয়াশীল সত্যস্বরূপ বিশ্বনিয়ন্তাকে সত্যে ও ভাবে সাক্ষাৎ রূপে অন্তরের অন্তরে পূজা ও লোকশ্রেয়ঃসাধনই তাঁহার ধর্ম্মের মূল বা প্রাণ। সর্ব্ববাদী অকাট্য সত্য ব্যতীত অপর কোনও বিশেষ মতাদির দ্বারা তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে সীমাবদ্ধ করেন নাই—নিখুঁত সত্য ব্যতীত অপর কিছুই এই ধর্ম্মে গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় নহে।

ইহার জন্য কোনও দেশ কাল বা সম্প্রদায়ে অবলম্বিত মন্ত্র বা পদ্ধতি বিশেষও অপরিহার্য্য নহে। যে-মন্ত্রে বা ভাষায়, সরবে বা নীরবে, যেরূপেই কেহ সাক্ষাৎ সত্য পূজা করুন না কেন, তাহাই গ্রাহ্য, তাহাতেই সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন (এ ক্ষেত্রেও অবস্থার অনুরোধে শ্রেষ্ঠতম পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর প্রণালী তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল—তিনি ব্যক্তিগত সাধনে যে প্রণালী অবলম্বন করিতেন সমাজে তাহা প্রচলন করিতে পারেন নাই), তাহাই যে সকল দেশে ও কালে সকলকে অবলম্বন করিতে হইবে, এরূপ কোনও নির্দ্দেশ তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ নহে—সে প্রকার কিছু তিনি করেনও নাই। সুতরাং সকল দেশে ও কালে প্রকাশিত সকল সত্য ও কল্যাণকর সাধন-প্রণালী বা নিয়ম পদ্ধতিই ইহার নিকট আদরণীয় ও অবলম্বনীয়। সত্য ও কল্যাণের সীমার মধ্যে থাকিলে বিশেষ কোনটার গ্রহণে বা বর্জ্জনে এই ধর্ম্ম কোনও প্রকারে বিনষ্ট বা ক্ষুণ্ণ হয় না। উক্ত সীমার মধ্যে প্রত্যেকের পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রহিয়াছে। অপর পক্ষে উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের পথে কোনও প্রকার সীমার প্রাচীর না থাকাতে ইহার বিকাশের পথও চির উন্মুক্ত। সুতরাং যখন যে সত্য প্রকাশিত হইবে বা কল্যাণকর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবে, তাহাই উহাতে অবলম্বিত হইতে পারিবে,—কিছুতেই ইহার উন্নতির পথকে রুদ্ধ করিতে পারিবে না। সত্য ও কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার প্রাচীরই এ ধর্ম্ম স্বীকার করে না। এই সত্য ও কল্যাণের প্রাচীর না থাকিলে যে উন্নতি ও কল্যাণের পরিবর্ত্তে অবনতি ও অকল্যাণের মধ্যে—মরণমৃত্যুর মধ্যেই—পতিত হইতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আর, অনন্ত স্বরূপের সাক্ষাৎ পূজা হইতে কত সত্য ও কল্যাণকর পন্থা প্রকাশিত হইবে তাহার সীমা যে কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না, সেরূপ কোনও সীমা থাকা যে এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে, সে কথাও অধিক করিয়া না বলিলে চলিবে। সুতরাং এই ধর্ম্ম যে অনন্ত উন্নতি ও বিকাশ-শীল, ভবিষ্যতেও কোনও দেশে বা কালে এমন কোনও সত্য বা তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে না, যাহাকে ইহা আত্মস্থ করিতে পারিবে না, যাহা ইহার পক্ষে বর্জ্জনীয় হইবে। সত্যকে পরিত্যাগ করিলে এই ধর্ম্মের প্রাণই বিনষ্ট হইল। পুরাতনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে আবদ্ধ থাকিয়া ইহা কোনও প্রকারেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—তাহা সম্পূর্ণ রূপেই ইহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অতএব চিরকাল সকল সত্যই ইহার অন্তর্গত থাকিবে। কার্য্যগত জীবন সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কার্য্যগত জীবনের আদর্শ ও নীতিতেও একমাত্র সত্য ও মঙ্গলই—শ্রেয়ঃই—ইহার অবলম্বনীয়। কাজেই ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে কোনও বিশেষ আচার পদ্ধতির গণ্ডীর মধ্যেও ইহা চিরকালের জন্য আবদ্ধ থাকিতে পারে না—যাহা অসত্য ও অকল্যাণকর তাহা বর্জ্জন করিতেই হইবে, তাহার সংস্কার না করিলে কিছুতেই চলিবে না, আর যাহা সত্য ও কল্যাণকর তাহা অবলম্বন করিতেই হইবে। উন্নতির পথকে কিছুতেই রুদ্ধ হইতে দেওয়া হবে না, সর্ব্বদাই সর্ব্ব প্রকারে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। তাই ইহার নিকট সকল আচার ব্যবহার নিয়ম পদ্ধতিও চির উন্নতিশীল, পরিবর্ত্তনের অধীন। এ ক্ষেত্রেও পূর্ণ স্বাধীনতা, কোনও প্রকার দাসত্বের স্থান এখানে নাই। যেদিক দিয়াই বিচার করি না কেন, আমরা দেখিতে পাই যে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ও প্রশস্ততর কোনও ধর্ম্ম জগতে নাই, কোনও দিন হইতেও পারিবে না। বর্ত্তমানে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই ইহার শেষ কথা নহে, ভবিষ্যতে যাহা প্রকাশিত হইবে তাহাও ইহার অন্তর্গতই হইবে। যাঁহারা মনে করেন ইহা কোনও ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ, ইহার উন্নতি ও বিকাশের একটা সীমা আছে, ও ভাবেন তাঁহাদের নিকট ইহার সীমার বাহিরে কোনও উচ্চতর ও মহত্তর তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহারা যে ইহার প্রকৃতিকে মোটেই বুঝিতে পারেন নাই এবং ভ্রান্তি বশতঃই হউক বা অপর যে কারণেই হউক, উক্ত প্রকার ভাবেন ও বলিয়া থাকেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা কেহই এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের কথার সপক্ষে কোনও প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই—পারিবেনও না—বিনা প্রমাণেই শুধু গায়ের জোরে এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন। এ পর্য্যন্ত কোনও দিন কোনও ব্রাহ্ম বলেন নাই—বলিতে পারেনও না—বর্ত্তমানে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ কথা, ভবিষ্যতে আর কোনও নূতন সত্য বা তত্ত্ব কেহ লাভ করিবে না। যদি কেহ প্রকৃত পক্ষেই এমন কোনও সত্য পাইয়া থাকেন, যাহা ব্রাহ্মসমাজস্থ কেহ অজ্ঞতা বশতঃই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, স্বীকার করিতেছেন না, বা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলেও উহা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বাহিরে বা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু বলিয়া প্রমাণিত হইল, এরূপও বলা যায় না। তাহাতে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজস্থ লোকেরা ধর্ম্মরাজ্যের নিম্নতর সোপানে পড়িয়া আছে, ধর্ম্মের অনেক উচ্চ তত্ত্ব এখনও বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারা যতটুকু বুঝিয়াছে বা যে সত্যগুলি জানিয়াছে তাহাই ত সমগ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে—তাহাদের জ্ঞানের বাহিরে যাহা কিছু তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মেরও বাহিরে, এরূপ কথা কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা যে ব্রাহ্মধর্ম্মেরও উপরে উঠিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর কোনও নূতন ধর্ম্ম পাইয়াছেন, অথবা ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ, ইহা কোনও ক্রমেই প্রমাণিত হয় না। অপরদিকে তাঁহারা যাহাকে উচ্চতর সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা নিম্নতর ও মিথ্যা কল্পনাও যে না হইতে পারে, এমন নহে। একমাত্র যুক্তি বিচার ও সত্য অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দ্বারাই তাহা নির্ণীত হইতে পারে, কাহারও কথা বা অভিমতের দ্বারা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আর একটি প্রকৃতির কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোনও ব্যক্তি বিশেষ হইতে প্রসূত হয় নাই, তাহা স্বয়ং ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন। সুতরাং কোনও ব্যক্তি বিশেষের—তিনি যত বড়ই হউন না কেন—অভিমতের বা অভিজ্ঞতারও উপর তাহার সত্যতা বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে না। ব্রহ্মেরই আলোকে বিশুদ্ধ যুক্তি বিচারের সাহায্যেই উহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত

হইবে, সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তাহা অপরের অভিজ্ঞতার অতীত হইলেও, বিরোধী হইবে না—একটা সামঞ্জস্য থাকিবেই। ইহার তত্ত্ব বা সাধনেও কোথাও তিনি ভিন্ন কোনও ব্যক্তির কোন প্রাধান্য নাই। তত্ত্ব যেমন সাক্ষাৎভাবে তাঁহারই নিকট হইতে লাভ করিতে হইবে, সাধনেও সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করিতে হইবে। কোনও মানুষেরই আপনার সাধন বলে তাঁহাকে লাভ করিবার শক্তি নাই, কেন না তিনি কোনও মানুষের অধীন নহেন—তিনি মানুষের সকল ক্ষমতার অতীত। এই ধর্ম্মের প্রকৃতিতে আত্মশক্তির উপর নির্ভরের স্থান মোটেই নাই। ইহার প্রবর্ত্তক ও শিক্ষকগণের কেহই সেরূপ শিক্ষাও দেন নাই—সকলেই ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভরের কথাই বলিয়া আসিয়াছেন। আপনার শক্তিতে আত্মোন্নতিসাধন অপর কোনও ধর্ম্ম হইলে হইতে পারে, তাহা কোনও প্রকারেই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে পারে না। আত্মচেষ্টার দ্বারা শক্তির বিকাশ ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। জীবনবিধাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ ও তাঁহার আনুগত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম। সে যোগসাধন ও আনুগত্যলাভ ব্রহ্মকৃপা ব্যতীত অপর কোনও প্রকারে সম্ভবপর নহে। সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে আত্মসমর্পণই এ ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান কথা। অজ্ঞতাবশতঃই হউক বা অপর যে কারণেই হউক, এ বিষয়ে যাঁহারা অন্য মত পোষণ করেন বা মনে করেন ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আপনার সাধনবলের উপর দাঁড়াইলেও ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয় না, তাঁহারা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপেই বলা যায়। যাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহাকে উক্ত প্রকার বিকৃত আকারে লোকসমক্ষে উপস্থিত করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে অযথা নিকৃষ্টতার আরোপদ্বারা আপনাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে প্রয়াস পান, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। তাহার দ্বারা তাঁহাদের নিজের ব্যতীত অপর কাহারও কোনও অনিষ্ট সাধিত হইবে না, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব খর্ব্ব করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমরা যদি ইহার প্রকৃত স্বরূপ, মূল প্রকৃতি, বুঝিতে ভুল করি, তবে যেমন একদিকে আমরা আমাদের জীবন ও ব্যবহার দ্বারা নিশ্চয়ই ইহার গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করিব, তেমনি অপরদিকে আমরা বিশেষ ভাবেই নিজের অনিষ্ট সাধন করিব, প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইব, আমাদের উৎসবের সকল আয়োজনও ব্যর্থ হইবে—আমরা সমগ্র মন প্রাণের সহিত কৃতজ্ঞতাও অনুভব করিতে পারিব না, ইহার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকার করিতেও সমর্থ হইব না, ভবিষ্যৎ উন্নতি ও বিকাশের পথে ইহাকে লইয়া যাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। তাই বিশেষ ভাবে এ দিকে আমাদের সকলের গভীর চিন্তা ও চেষ্টা যত্ন আকৃষ্ট হউক। আমরা ইহার উদারতা বিশালতা ও মহত্ত্ব ভাল করিয়া হৃদয়ে অনুভব করিয়া, ইহার উচ্চ আদর্শে জীবন গঠন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তাঁহারই পবিত্র রাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক।

প্রত্যক্ষ যোগ।

একজন লোক ইউরোপে গিয়ে, ইটালি দেশের নানা প্রকার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া এদেশে ফিরিয়া আসিলেন: ইটালির অত্যাশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য, কারুকার্য্য, চিত্রকর ভাস্কর প্রভৃতির অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ—নানা প্রকার ছবি, পাষাণনির্মিত প্রতিমূর্ত্তি—প্রভৃতির বর্ণনা অতি সুন্দর ভাষায় যদি তিনি করেন, তবে সেই বর্ণনামাত্র শ্রবণ করিয়া মানবের মন চমৎকৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বারা—সেই সুন্দর শিল্পজাত দ্রব্য-সমূহের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া—মানবের সৌন্দর্য্যবোধশক্তি কি কখনও চরিতার্থ অথবা বিকশিত হয়? কখনই না। তার জন্য প্রত্যেকের স্বয়ং সেই দেশে গিয়া স্বচক্ষে সেই সব দেখা আবশ্যক। যদি কেহ ইটালি গিয়া স্বচক্ষে ইটালির সেই মনোহর কারুকার্য্য দেখে, তাহা হইলে তাহার সৌন্দর্য্যবোধশক্তি চরিতার্থ এবং বিকশিত হইতে পারে।

ছেলেকে Art gallery না দেখাইলে তাহার সৌন্দর্য্য-বোধশক্তি কি চরিতার্থ হইতে পারে? দার্জ্জিলিং এর পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য এবং কাশ্মীরের উপত্যকার মাধুর্য্য যে কখনও স্বচক্ষে দেখিল না, সে কি তাহা যে কি বস্তু তাহা ধারণা করিতে পারে? বর্ণনা শুনিয়া শক্তির চরিতার্থতা হয় না, মন জাগে না।

আসল জিনিষটা না জেনে, নকলের দ্বারা, প্রকৃত বস্তুর ছায়ার দ্বারা কোনও বৃত্তি চরিতার্থ হয় না। আমাদের প্রত্যেক বৃত্তির সহিত তাহার স্বকীয় বিষয়ের সাক্ষাৎকার না হইলে সে বৃত্তির চরিতার্থতা হয় না, উন্মেষণ হয় না।

আমরা যদি কেবল চক্ষু বন্ধ করিয়া আলোকের বর্ণনা শুনি, আলোকের গুণ বর্ণনা করি, কিন্তু আলোকের সহিত চক্ষের যোগ—সাক্ষাৎকার—না হয়, তাহা হইলে কি আমাদের দর্শন-শক্তি বিকশিত হওয়া সম্ভব?

নাটক নবেলে প্রেমের বর্ণনা পাঠ করিয়া কি প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম বোঝা যায়—অনুভব করা যায়? আসল দাম্পত্য-প্রেম ফুটাইয়া তুলিবার জন্য জীবন্ত রক্ত মাংস চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট স্ত্রীপুরুষ চাই, তাহার সহিত প্রকৃত সংস্রব চাই, প্রত্যক্ষ যোগ চাই; নতুবা, কেবল মহিমা অথবা বর্ণনা শ্রবণ ও পাঠ করিলে দাম্পত্য-প্রেমের সঞ্চার হয় না।

সাধুগণের বর্ণনা শুনিয়া, পুস্তকে বা লোকমুখে বুদ্ধের বৈরাগ্য, যিশুর প্রেম, চৈতন্যের ভক্তির বিষয় পাঠ বা শ্রবণ করিয়া, জীবনে বৈরাগ্য, প্রেম অথবা ভক্তিলাভ হয় না। জীবন্ত সাধু—জীবন্ত ত্যাগী, প্রেমিক এবং বৈরাগীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়া চাই, পরিচয় হওয়া চাই, তাঁদের কাছে থাকা চাই; তবেই বৈরাগ্য প্রেম ভক্তি বিকশিত হওয়া সম্ভব।

তেমনি যদি কেহ, বেদ Bible কোরাণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া, ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞাত হয়, বচন মুখস্থ করে, কিন্তু শান্ত সমাহিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা অভ্যাস না করে, তাঁকে প্রত্যক্ষ না করে, স্বীয় আত্মায় তাঁহাকে প্রকাশিত না দেখে, তবে শাস্ত্রপাঠদ্বারা

৭ই জানুয়ারী, ১৯০৪, বৃহস্পতিবার, সাধনাশ্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত।

তাহার আধ্যাত্মিকতা, spiritual sense, কখনও চরিতার্থ হইবে না, বিকাশ প্রাপ্ত হইবে না। সে যদি কেবল sermons পড়ে—ডাক্তার মার্টিনো, আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রভৃতির ভাল ভাল উপদেশ পাঠ করে—কিন্তু নিজে উপাসনা করে না, আত্মায় ভগবানের সহিত যোগ স্থাপনের চেষ্টা করে না, তাহার আধ্যাত্মিকতা, spiritual insight, কখনও ফুটিবে না।

যেমন সুন্দর পদার্থের সহিত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার ব্যতীত সৌন্দর্য্যবোধ বিকশিত এবং চরিতার্থ হয় না; যেমন জীবন্ত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সত্য যোগ ব্যতীত দাম্পত্য-প্রেম জন্মে না, যেমন আলোক না দেখিলে আলোকের বর্ণনা দ্বারা দৃষ্টিশক্তি খোলে না, তেমনি, যদি কেহ ঈশ্বরের উপাসনা, শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন করিতে অভ্যস্ত না হয়, তবে কেবল শাস্ত্রীয় বর্ণনা শুনিয়া, তাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিবে না।

এই জন্য জীবন্ত বিশ্বাসী ভক্তদিগের সহবাস প্রয়োজন, এবং ঈশ্বরোপাসনা ধ্যান ধারণায় অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক।

ধর্ম্মসাধনের জন্য, ধর্ম্মজীবনলাভের জন্য, দুই প্রকার যোগ নিতান্ত আবশ্যক। ১ম জীবন্ত বিশ্বাসী ভক্ত সাধু-পুরুষদের সঙ্গে যোগ; ২য় শ্রবণ মনন উপাসনাদ্বারা স্বীয় আত্মাতে ভগবানের সঙ্গে যোগ। এই দুই প্রকারের যোগ দৃঢ় ভাবে, সুদৃঢ় যত্ন এবং প্রতিজ্ঞাসহকারে কার্য্যতঃ সাধনীয়।

ব্রাহ্মগণ যদি বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে চান, ধর্ম্মবিশ্বাসকে নূতন পথে প্রবাহিত করিতে চান, ধর্ম্মজীবন উন্নত করতে চান, তবে, সর্ব্বপ্রকারে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে এই দুই প্রকার যোগ—সাধু ভক্ত বিশ্বাসী মানুষের সহিত যোগ, এবং ভগবানের সহিত যোগ—রাখিতেই হইবে। তাহা হইলেই তাঁহাদের দ্বারা উক্ত কার্য্য সাধিত হইবে।

নিজেদের জীবনে তাহা পাইতে হইবে, সাধন করিতে হইবে, মুখের কথায় হবে না। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি না খুলিলে ধর্ম্মজীবন কিছুই না।

ধর্ম্ম শোনা কথায় টিকে না। পাঁচফুলের সাজির মত ধর্ম্ম-কানন হইতে ফুল তুলিয়া সাজাইলে ধর্ম্ম হইবে না। নিজের জীবনে যদি তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না হয়—যদি তাঁকে নিজের জীবনে প্রকাশিত না দেখা যায়, তবে আর কিছুতেই আমার ধর্ম্মজীবন গড়িবে না।

ধর্ম্মজীবন কথার কথা নয়—একটা শোনাবার বিষয় নয়—যে তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া এবং শ্রবণ করিয়া তাহার চরিতার্থতা হইবে।

মহোৎসবের পূর্ব্বে আত্মপরীক্ষা।

শতবার্ষিক মহোৎসব ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ মহা দানের জন্য পরমেশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের উৎসব। সুতরাং এ উৎসব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, আমরা যে দানের জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিতে যাইতেছি, তাহাকে এ পর্য্যন্ত কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছি। যদি ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে ও পরিবারে সমুচিত মূল্য দিয়া থাকি, তবেই আমাদের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ সত্য ও শোভন হইবে। আর যদি ইহাকে অবহেলা করিয়া থাকি, তবে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ মিথ্যা আড়ম্বরমাত্র হইবে। বস্তুর উপযুক্ত আদরের দ্বারাই তাহার দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকৃত পরিচয় হয়।

পরমেশ্বর প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার মস্তকে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ মহামূল্য মুকুট পরাইয়া দিয়াছেন। আমরা কি সেই মুকুট আজীবন সসম্ভ্রমে মস্তকে রাখিয়াছি? না, ইহাকে ব্যবহারের অযোগ্য ভাবিয়া, অন্ধকার ঘরে সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছি? দাতা ইহাকে সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্যই দিয়াছিলেন। যদি ব্যবহার না করিয়া থাকি, তবে ইহার জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ গ্রাহ্য হইবে কিরূপে?

রাজরাজেশ্বর পরব্রহ্ম আমাদের মস্তকে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ মুকুট পরাইয়া দিয়া আপনার নামে আমাদের নামকরণ করিয়াছিলেন। 'ব্রহ্ম' হইতে 'ব্রাহ্ম' শব্দের উৎপত্তি। ব্রাহ্ম কে?—যে ব্রহ্মের উপাসক। ব্রাহ্ম কে?—যে ব্রহ্মের ভক্ত। ব্রাহ্ম কে?—যে ব্রহ্মের অনুগত সন্তান। 'ব্রহ্মেরই' এই অর্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্মন্-শব্দ হইতে ব্রাহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্ম-নাম অতি গৌরবময় নাম; 'রায় বাহাদুর,' 'রাজা বাহাদুর' প্রভৃতি অপেক্ষা এ নাম কম গৌরবের নহে। ইহা স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতির নামের সহিত সংসৃষ্ট মহোচ্চ সম্মান। আমরা কি এই সম্মানকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়াছি?

আমরা বলিয়া থাকি, পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব—অভ্রান্ত গুরু, অভ্রান্ত শাস্ত্র, অভ্রান্ত অবতার বা অন্য কোনও অভ্রান্ত মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন আমরা স্বীকার করি না। "তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, কোনও বাধা নাই ভুবনে।" এমন যে সাক্ষাৎযোগের অধিকার পরমেশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন, আমরা কি তাহা কাজে লাগাইয়াছি? —আমরা কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎযোগে যুক্ত হইয়াছি? জ্ঞান-যোগে, ভক্তি-যোগে, ও ইচ্ছা-যোগে তাঁহার সহিত নিরন্তর যুক্ত থাকিতে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। আমরা কি সেই যোগ লাভ করিয়াছি? তাঁহার সহিত অন্তরে আমাদের আদান-প্রদান কি সর্ব্বদা চলিয়া থাকে? ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ দানের জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের পূর্ব্বে আমাদের এ সকল বিষয় ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মের প্রদত্ত মহা সম্মানজনক খেলাত। ইহাকে হেলায় ব্যবহার করাতে আমাদের অনেক অপরাধ সঞ্চিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বাদশাহেরা অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে সম্মানিত করিবার জন্য খেলাত প্রদান করিতেন। কেহ সেই খেলাতের মর্য্যাদা নষ্ট করিলে, তাঁহারা তাহা কাড়িয়া লইতেন; এবং কখন কখন অন্য শাস্তিও প্রদান করিতেন। 'তাপসমালা' গ্রন্থে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে।

আবুবেকর্ শব্‌লি নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বোগ্‌দাদের খলিফার শাসনাধীন নেহাওন্দ প্রদেশের আমীর ছিলেন। খলিফা তাঁহাকে এক প্রস্থ মহামূল্য পরিচ্ছদ খেলাত-স্বরূপ প্রদান করেন। আবুবেকর্ শব্‌লি পূর্ব্বে একবার ঐরূপ খেলাত পাইয়া চঞ্চলমতি খলিফার রোষে পড়িয়া তাহা হারাইয়াছিলেন; এই

কারণে তিনি এবার খেলাতকে ইচ্ছাপূর্ব্বক তুচ্ছ করিলেন—খলিফার প্রদত্ত সেই মূল্যবান্ পরিচ্ছদ দ্বারা তিনি নিজের মুখ ও নাসিকা মর্দ্দন করিলেন। শব্‌লির এই উদ্ধত ব্যবহার অচিরে বোগ্‌দাদাধিপতির কর্ণগোচর হইল। খলিফা তৎক্ষণাৎ শব্‌লি হইতে খেলাত কাড়িয়া লইবার ও তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। শব্‌লি এই শাস্তির জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। মানুষের প্রদত্ত আমীরী ও খেলাতের প্রতি তাঁহার মন বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল। অতএব, তিনি শাস্তি পাইয়া দুঃখিত হইলেন না; ভাবিলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রদত্ত খেলাতকে রুমালরূপে ব্যবহার করে, সে এইরূপে অপমানিত ও পদচ্যুত হয়। হায়! যদি কেহ ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রদত্ত খেলাতকে তুচ্ছ করে, না জানি সে কিরূপ শাস্তির যোগ্য হইবে!" এই ভাবিয়া শব্‌লি খলিফার নিকট উপস্থিত হইলেন, "মহারাজ! আপনি মনুষ্য; আপনার প্রদত্ত খেলাতের মূল্য কি, তাহা আমি বুঝিয়াছি। জগৎপতি পরমেশ্বর তাঁহার প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানের খেলাত আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আপনার প্রদত্ত খেলাতের সম্বন্ধে কেহ বে-আদবী করে, ইহা যেমন আপনি ভালবাসেন না, পরমেশ্বর তেমনি তাঁহার প্রদত্ত খেলাতের অপমান ভালবাসেন না। অতএব, আর নয়; আমি আর মানুষের গোলাম হইয়া, ও ভোগসুখের প্রার্থী হইয়া, সেই স্বর্গীয় খেলাতের অবমাননা করিব না। আমি চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া, এক তপস্বীর নিকটে গমন করিলেন; এবং একান্ত মনে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে এক জন বিখ্যাত ঋষি হইলেন। তাপসমালায় যে ৯৬ জন ঋষির বিবরণ আছে, আবুবেকর্ শব্‌লি তন্মধ্যে এক জন প্রধান।

"প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানের খেলাত!" ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বর যে, "প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানের খেলাত" নেহাওন্দের আমীরকে দিয়াছিলেন তাহা তিনি আমাদের ন্যায় দীন-দরিদ্রদিগকেও দিয়াছেন। তাঁহার সহিত প্রেম-যোগে ও তত্ত্বজ্ঞানের যোগে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হইবার উচ্চ অধিকার আমরাও পাইয়াছি। কিন্তু আমরা কি শব্‌লির ন্যায় সেই অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছি?

শতবার্ষিক মহোৎসব যদি সত্যভাবে করিতে হয়, তবে প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ খেলাতকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে। এক দিকে ইহাকে হেলা করিতে থাকিব, অপর দিকে ইহার জন্য তজ্জন্য উৎসব করিব, এ অপেক্ষা অধিক অসংলগ্ন ব্যবহার আর কি হইতে পারে? শতবার্ষিক মহোৎসবের অর্থই এই—ব্রাহ্মধর্ম্মকে মাথায় তুলিয়া আনন্দ করা; নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ মুকুট মাথায় পরিয়া লোকের সম্মুখে বাহির হওয়া, এবং জীবন দ্বারা বলা, "দেখ, কেমন চমৎকার মুকুট আমরা পাইয়াছি; তোমরাও ইহা পিতার নিকট চাহিয়া লও।" এ না হইলে, মহোৎসব বৃথা। যে মুকুট আমরা পরি না, যাহাকে স্বার্থের খাতিরে, সাংসারিকতার অনুরোধে, বা সুখাসক্তির আলস্যে, আমরা অন্ধকার ঘরে লুকাইয়া রাখি, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ কিরূপ?

অতএব, মহোৎসব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে বাদ দিয়া চলিতেছি। সেই সেই বিষয়ে আত্ম-সংশোধন করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক পুরুষ নারী, বালকবালিকা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মকে পুনরায় সসম্মানে মাথায় তুলিয়া লন, তবেই শতবার্ষিক মহোৎসব সত্য ও সার্থক হইবে।

শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নীরব সাধকের নিভৃত চিন্তা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪৪)

বেঁচে থাকা কেন? কোন্ প্রয়োজন এমন, যার জন্য বেঁচে থাকাটা প্রার্থনীয় হইতে পারে? গানে আছে—"কি সুখ জীবনে মম, ওহে নাথ দয়াময় হে, যদি চরণসরোজে পরাণমধুপ চিরমগন না রয় হে"। এই ত জীবনধারণের প্রয়োজনীয়তা। পরাণ-মধুপ যদি চরণসরোজে মগন থাকে, তবেই জীবনের সার্থকতা, তাহার জন্যই জীবনধারণ। আর এক প্রয়োজন এই যে, সত্যের জয়, প্রেমের জয়, পুণ্যের জয় দেখিবার জন্যই জীবনধারণ। তাহা হইলেই বাঁচিয়া থাকা সার্থক হয়।

(৪৫)

মণ্ডলীর পক্ষপাতী হওয়া কখনই দোষের নহে, অপ্রার্থনীয় নহে। কারণ, মণ্ডলী মানুষকে অনেক আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করে। যেমন চারা গাছটিকে বেড়া দিয়া ঘেরিয়া রাখিলেই সে তাহার শত্রু হইতে রক্ষা পায়, তেমন আমাদের জন্য মণ্ডলী-রূপ আবেষ্টন অতি প্রয়োজনীয়। তবে মণ্ডলীও সময়ে বন্ধনের আকার ধারণ করে। যেমন চারা গাছটি বড় হইলে বেড়া তাহার বৃদ্ধির পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়। মণ্ডলীর মোহ ভাল নহে। তাহা যেন দৃষ্টির আবরণ না হয়, উচ্চ সত্যদর্শনের পথে, উচ্চ ভাবে পথগ্রহণের পক্ষে, যেন তাহা বিঘ্নস্বরূপ না হয়। তাহা হইলেই মণ্ডলী কল্যাণসাধনে সহায় হইবে। হে পিতা, মণ্ডলীকে মুক্ত রাখ, সত্য উপার্জ্জনের হেতু করিয়া দাও।

(৪৬)

আত্মা চির উন্নতিশীল প্রকৃতি পাইয়াছে। আত্মার এই উন্নতিশীল প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াই, ব্রাহ্মসমাজে "আত্মা অনন্ত উন্নতিশীল" এই মূল মত গৃহীত হইয়াছে। তাই নিত্য নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতেছে। যে আত্মা গতিশীলতা পাইয়াছে, তাহাই জীবন্ত হইয়া বাস করে, তাহাতে নিত্য নূতন আলোকও প্রকাশিত হয়। এই নিত্য নূতন আলোক, নিত্য নূতন সত্য তাহার নিকট প্রকাশ না পাইলে তার জীবনের সজীবতা, সার্থকতা ও সরসতা থাকে না। এজন্য আত্মার পক্ষে প্রার্থনাশীল হওয়াই স্বাভাবিক। সে নব নব তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রার্থনাশীল হইবে। তাহা হইলেই তাহার জীবন সুখের ও কুশলের হইবে। অনন্তস্বরূপ মহান্ প্রভুর আমা-দিগকে কত দিবার আছে—তাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয় সম্পদ ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ। সুতরাং পাওয়া ও চাওয়ার আর শেষ হয় না। যাহা পাওয়া গিয়াছে বা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ত অল্প। যাহা জানিতে

ও পাইতে বাকী আছে তাহা অফুরন্ত, সীমাহীন। সুতরাং না জানিয়াও দাতার উপরে নির্ভরশীল হইয়াই চাহিতে হইবে। তিনি যাহা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ও উত্তম তাহাই দিবেন।

হে প্রভু, চাহিতে যেন আমরা ক্ষান্ত না হই। নাও যদি পাই, তথাপি চাহিয়াই যেন আমাদের কাজ শেষ হয়। যাহা পাইবার তাহা ত তুমি আমাদিগকে দিবেই—তাহাই দেও।

(৪৭)

ধর্ম্মদ্বারা ভাল মানুষ হওয়া যায়, ইহাই কি ধর্ম্মের পুরস্কার? ধর্ম্মসাধন না করিলেও লোকে ভাল মানুষ হইতে পারে। যাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী নহেন, বরং আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া পরিচিত করেন, তাঁহারাও ভাল মানুষ হইতে পারেন। ঈশ্বরোপাসনাদ্বারা মানুষ ভাল হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাই ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠ ফল নহে। সাকার দেব দেবীর উপাসকেরাও ভাল মানুষ হইয়া থাকেন। এই প্রশ্ন সময় সময় আসিয়া লোকের মন বিচলিত করে যে, যদি দেব-দেবীপূজার দ্বারা ভাল মানুষ হওয়া যায়, তবে আর ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন কি? দেখা যায়, দেব-দেবীপূজকেরা অতিশয় ভক্তিমান হন এবং ভাল মানুষ হইয়া থাকেন, অথচ পরমেশ্বরের উপাসকগণ তেমন ভক্তিমান ও ভাল লোক হন না। ইহাদ্বারাই কি বুঝিতে হইবে দেবোদ্দেশে পূজা করাই সঙ্গত? ভাল মানুষ হওয়া, ভক্তিমান হওয়া দ্বারাই এসব ব্যাপারের পরিমাণ হয় না। বুঝিতে হইবে মানুষের কি হওয়া উচিত। মানুষকে ভক্তি করিয়াও, ভক্তিমান হওয়া যায়। বৌদ্ধেরা বুদ্ধের পূজা করিয়া ভক্তিমান হন। তাহাই ত মানবের লক্ষ্য নহে। মানবের লক্ষ্য ঈশ্বরভক্তি লাভ করা। তাহাতেই তাহার সম্যক কল্যাণ হইয়া থাকে। গীতাতেও এ কথার সায় আছে। গীতা বলিতেছেন, দেবযাজকেরা অন্তবৎ দেবলোক প্রাপ্ত হন। পিতৃব্রতগণ পিতৃলোক, ভূতপূজকেরা ভূতলোক এবং আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হন। সুতরাং ঈশ্বরোপসনার ফল—ঈশ্বরভক্তিলাভ ও ঈশ্বরলাভ। ভাল মানুষ বা ভক্তিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। তাহা নানা প্রকারেই হইতে পারা যায়। কিন্তু ঈশ্বরোপাসনাই করিতে হইবে; কারণ, ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মগণ চারিদিকের সাধকজীবনের চাকচিক্যময় অবস্থা দেখিয়া কখনই ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিবে না এবং দেবদেবী-উপাসকের বাহ্য সজ্জা দেখিয়াই ভুলিবেন না। ঈশ্বরভক্তি-লাভের জন্যই তাঁহারা ব্যগ্র হইবেন। যাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাঁহারা ব্রাহ্মই। তাঁহারা ব্রাহ্ম নামে কেন আপনাদের পরিচয় দেন না? ব্রাহ্ম নামে পরিচয় দিতে যাঁহারা অনিচ্ছুক, বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের এমন কিছুর সহিত যোগ আছে, যাহা ব্রাহ্ম নামে পরিচয় দিবার পক্ষে বাধা প্রদান করে। তা কি খুব উচ্চ অধ্যাত্মরাজ্যের সম্পদের অনুরোধ? তাহাও নহে। তাহা পার্থিব সম্পদের অনুরোধ। যাঁহারা খুব ভক্তিমান এবং ঈশ্বরপরায়ণ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা যদি ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ না করেন, তাঁহারা হয় ঈশ্বরপরায়ণ নহেন, না হয় কপটাচারী। তাহা হইলে তাঁহারা যে খুব উঁচু দরের ভক্তিমান বা সাধু এমন নহে। তাঁহারা ভাবুক বিশেষ। প্রকৃত ঈশ্বরভক্তি তাঁহাদের মধ্যে থাকিলে ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হইতে তাঁহাদের আপত্তি হইবার কারণ থাকিতে পারে না। প্রভু, ভাবুকতা ও বাহিরের ভক্তি-ভাব হইতে সকলকেই রক্ষা কর। প্রকৃত ঈশ্বরভক্তি আমাদের জীবনে সমাগত হউক।

জীবন-সাক্ষ্য

জীবন মাত্রেই তাঁর কৃপা চলেছে। যিনি সে কৃপা অনুভব করিলেন, তিনিই সৌভাগ্যবান্। কৃপার অধিকারী হইয়া এবং তাহা অনুভব করিয়া, তাঁর সাক্ষ্য দান না করাতে অপরাধ হয়। এই জন্যেই বলিতে হইবে সাহস করিয়া ক্ষুদ্র জীবনের কথা।

জীবনের মূল্য ও মর্য্যাদা সংসারের দিক দিয়া হিসাব করিতে গেলে, বিদ্যা বুদ্ধি, ধন মান, খ্যাতি প্রতিপত্তি কতই না আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু সে পথে এ জীবনের মূল্য কিছু নয়। আমি মূল্য ও মর্য্যাদা ধরিতেছি, আমি তাঁর সন্তান তিনি আমার স্রষ্টা রক্ষক পরিচালক, এই সকল সম্বন্ধসূত্রে। কেবল তাহাও নহে। আমি যেন অনুভব করিয়াছি আমি তাঁহার মনোনীত। বহু সূত্রে তাহা প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে ভাবেই হউক কোন দিনও এ জীবন ধর্ম্মকে ভয় না ক'রে চল্‌তে পারে নাই। বাহ্য পূজা, দেব দেবীকে ভয় ক'রে চলা এবং কঠোর ব্রাহ্মণের আচার মেনে চল্‌তে চল্‌তে আশ্চর্য্য রূপে একেশ্বরে আস্থা জন্মিল।

এই পরিবর্ত্তনের মূলে আজ বুঝিতে হইল একজন যেন হাতে ধ'রে সাধু ধার্ম্মিক শিক্ষক ও উপদেষ্টা এবং ধর্ম্মবন্ধু জুটাইয়া দিলেন। কখনো কখনো অসৎ সঙ্গের আবেষ্টনের ভিতরে পড়িয়াও, যতটা বুঝিয়াছি, আচরণে, কার্য্যে গুরুতর অসঙ্গত কিছু করিতে হয় নাই। গুরুতর প্রলোভন এসেছিল, সঙ্গগুণে ভগবান্ আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মকে বুঝিতে এবং গ্রহণ করিতে বহু আয়াস ও বেগ পেতে হল না। অতি সহজে এই উদার উজ্জ্বল ধর্ম্ম জীবনকে ঘিরিয়া বসিল। আমার বড় সাক্ষ্য তাঁর চরণে এই "এই ধর্ম্ম এই জীবনকে ক্ষুদ্র করিয়া বুঝিতে ও ভাবিতে দেয় নাই। ধন মান পদগৌরবের তলে পাকিয়া কোন দিন ভীত বা সঙ্কুচিত হইতে হয় নাই। তাঁর কৃপায় আমিত্বের ভিতরে, ব্যক্তিত্বের মূলে, তাঁরই অমোঘ শক্তিরই যেন পরিচয় মিলিল। তাই ন্যায়, সত্য প্রভৃতির সরল সহজ পথে চলিতে কাউকে সংসারে ডরাইতে হয় নাই। স্পষ্টবাদিতা কোন দিনও পরিত্যাগের সম্ভাবনাও হইল না। লোকপ্রিয়তার হাতে জীবন বিক্রয় করিতে হইল না। এ কথাগুলি ভাবিয়া তাঁর চরণে বার বার মস্তক অবনত হইতেছে।

সংসারে অর্থোপার্জ্জনের পথ চক্ষে পড়েছিল, কিন্তু সে পথ তুচ্ছ ব'লে ভগবান্ বুঝ্‌তে দিলেন, তাই দৈন্যের পথেই অগ্রসর হ'তে হ'ল। এযে তাঁর কত করুণা! সংসার রচনা করেছিলেন;

সুবর্ণ জুবিলী উৎসবে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর বক্তব্যের মর্ম্ম স্মরণে লিখিত।

কিন্তু দারিদ্র্য এবং রোগ দুইটীকে সহচর ক'রে দিয়ে কি সংযম সহিষ্ণুতার দরজাই খুলে দিলেন! শুধু তাই নহে, এই ক্ষুদ্র জীবনে যা কিছু শক্তি দিয়ে রেখেছিলেন কি সৌভাগ্য! বুঝ্‌তে দিলেন, এ সকল তাঁরই দেওয়া সম্পদ, সুতরাং তাঁর নামে তাঁর কার্য্যেই দিতে হবে। আশ্চর্য্য এই, তাহার অপূর্ব্ব প্রেরণায় সেই পথেরই পথিক হইতে হইল। এ পথে বাহির হইয়া বুঝিতেছি—নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিতেছি—"আমি তাঁর মনোনীত।"

কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তি ও সমাদরের ভিতর দিয়া নিরন্তর বুঝিতে দিতেছেন আমি দাস, তিনি প্রভু। পরকালের দরজায় গিয়া আশ্চর্য্য ভাবে ফিরিয়া আসিতে হইল কেন? এ "কেন"র রহস্য ক্রমে অনুভব করিতেছি।

কি সৌভাগ্য! মানুষের ডাকে কোন দিন কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইতে হইল না। যিনি মনোনীত করেছেন তাঁরই ইঙ্গিতে এই ক্ষুদ্র জীবন এখনো চলিতে সচেষ্ট। দুঃখ দৈন্য এ জীবনকে তেমন অভিভূত ও নিরুদ্যম করিতে পারিল না। বলিহারি তাঁর করুণা! আর কি বলিব? ক্ষুদ্র তুচ্ছ কীটাণুকীট মানুষ্য আমি, আমি আজ কত বড় মহোচ্চ সমাজে আদর যত্ন, আলিঙ্গন, অনুমোদন সম্ভাষণে ধন্য হইতেছি! তাই প্রার্থনা, আজ সকল সাধু সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর পদধূলি এই শিরে পড়ুক, প্রেমদৈন্য ঘুচিয়া যা'ক, বিশ্বাসে বলীয়ান্ হই। সেবাধর্ম্মে, দাস-ব্রতে সফলকাম হই। তাঁর কৃপার সাক্ষ্যদানে এ জীবন তাঁর অধিকতর কৃপালাভ করুক্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অমরকথা (১২)

চিরন্তন নিয়তি

(১)

দিবালোকে জেগে ওঠে
মানবের হাসি খেলা,
ও কোন্ করুণ ছটা
খুলেছে আনন্দ-মেলা?
নিশার আঁধার বুকে
চন্দ্রমা তারকা ভাসে,
তারি সাথে হাসে মরি
বসুধা জলধি হাসে।
চুপে চুপে তারি সাথে
বেজে ওঠে সুরে সুরে,
আমারও ভোলা মন
ছোটে সেথা ঘুরে ঘুরে।
আগুন জ্বলেছে বুকে
তারি মাঝে আছি চেয়ে,
কম্পিত বন্ধুর পথে
কোথা চলি ধেয়ে ধেয়ে!
আমারো ব্যথিত বুকে
কি অমৃত মধু ঢালা,
থেমেছে ব্যথার গান,
মিটেছে সকল জ্বালা।
জীবনপ্রভাত হ'তে
দেয় বুকে ওকি দোল,
মরণ-আঁধার বুকে
পাতিবে কি স্নেহ-কোল!
হাসি কান্না সুখে দুখে
সফল কি বেদন-গান,
বাজায় কি মন-তারে
মিলনের মধু তান?
তারি সাথে বয়ে এল
শীতল শান্তির ধার,
নিয়ে এলে দুলালি কি
মিলন-মঙ্গল হার?

আমাদের আশা নিরাশা সুখ দুঃখ হাসি কান্নার মাঝখানেই কালস্রোত কেমন নীরবে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে! কত ভাঙ্গা গড়া, কত পরিবর্ত্তন প্রকৃতির বুকে তার সাড়া পড়ে গেছে। ছয় ঋতুর কি বিচিত্র লীলা! আজ যাহা পুরাতন কাল তাহা নবীনতার মাধুর্য্যে ভ'রে উঠল, নূতন আবার পুরাতন হ'য়ে গেল! অতীতের আনন্দছবি বিস্মৃতির গভীরে ডুবে গেল, কিন্তু কালের সেই অনন্তধারা যে যার কাজ নির্দ্দিষ্ট পথে কোরে চলে। প্রত্যেকটী এক অখণ্ড বিধানে নিয়ন্ত্রিত, স্বর্গ মর্ত্ত একই নিয়মে নিয়মিত। কাননে কাননে মাঠে ঘাটে কত বিচিত্র পুষ্পদলের বিচিত্র মাধুর্য্য, গগনমণ্ডলে জ্যোতিষ্কলোকে কি আনন্দময় জ্যোতির্ম্ময় সুর; পাহাড়ে পর্ব্বতে গিরিশিখরে তুষারমণ্ডিত ধবলতুঙ্গে কি নিত্য নূতন শোভা! এই বিরাট মধুর মোহন বিশ্বপুরে অনন্ত জীবনলীলা; অতি ক্ষুদ্র কীটাণুকীট হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবও ঐ একই মঙ্গল নিয়মে শৃঙ্খলিত। যা ভবিতব্য তাহা অবশ্যম্ভাবী কে অন্যথা করে? এরই নাম কি চিরন্তন নিয়তি? এই নিয়তির বুকেই কি অজর অমর অনন্ত মঙ্গল সুভাসিত। সবই যে দেখি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নিয়তির বিচিত্র সুরে বাঁধা। একটী পুষ্পও ব্যর্থতার ভিতর ফুটে ওঠে না, একটী শিশুর হাসিকান্নাও ব্যর্থ নয়। প্রকৃতির বুকে গিরি কান্তারে নদ নদী ভূচরে খেচরে যে পরম বিকাশ, আবার কালে কত জাতির উত্থান পতন, কিছুই ব্যর্থ নয় সবই পরম চিরন্তন কালসূত্রে গ্রথিত—নিয়মিত। তবে আমার পাপ পুণ্য কি? কে দোষী, আর কে সে দোষের বিচার কোরবে? আমার ইচ্ছাও কি পূর্ব্বাপর ঘটনায় নিয়ন্ত্রিত? আমি কি বিশ্ববুকে লক্ষ্যবিহীন যাত্রাপথে ছুটে চলেছি? এ কি আমার ইচ্ছায় সে ভূমা ইচ্ছার প্রাণময় বুকে আমার জন্ম? যদি সৃষ্টির উষাকাল থেকে সবই কারণপরম্পরায় নিয়ন্ত্রিত তবে মানবের বেদনাকাতর প্রতীক্ষা, জাগরণ, সংগ্রাম কি ব্যর্থ? না, এ আমারই পরম কল্যাণের পথে পরিপূর্ণ মঙ্গলসাধনায়

বিচিত্র উদ্বোধন। আমার দীন প্রার্থনাও কি বিশ্বদরবারে অনন্ত সত্তায় স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে? আমি কি জড় যন্ত্রের মত বিশ্ববুকে অনন্ত লীলার সঙ্গে অজ্ঞান অন্ধ যাত্রা করি? আমার স্বাধীন ইচ্ছার কি তবে জটিল কুহেলীর ভিতরই পরম গতি?

অনন্ত নিয়তি কা'কে বল? এই অখণ্ড চির-প্রশান্ত বিশ্ব-বুকে সবই কার্য্যকারণপরম্পরা হোয়ে চলেছে। আজ যে কারণরূপে ব্যক্ত, কাল তার অবশ্যম্ভাবী ফল বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে—আজ যে বৃক্ষের জীবন-ইতিহাসে প্রতি বীজের জন্ম-দান, কাল আবার সেই ক্ষুদ্র বীজাণু হোতেই বিরাট বৃক্ষের প্রকাশ। আমার 'আমি' এই বিচিত্র সত্তা আশৈশব জেগে আছে, তাই মানুষ বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ, এক আনন্দ-ইতিহাস বিশ্ববুকে পাঠ কর্‌ছে। অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকলই প্রাণময় যোগসূত্রে গাঁথা হোয়ে আছে। অনন্ত রথচক্র চলেছে নিত্যগতিতে, অনন্তযোগে একাকার হোয়ে। এরই নাম নিয়তি? এ গতি কে রোধ করে? একটী উপলখণ্ড সলিলাধারে পতনমাত্রেই গোলাকার জলরেখা রচনা কোরে কোরে তার সীমান্ত রেখাকে স্পর্শ কোরবেই; এ কার্য্যকারণ-জ্ঞান যেমন সত্য, তেমনি সত্য নিয়ন্ত্রিত ঘটনারাজি থেকেই আমরা ভবিষ্যতের তত্ত্ব অবগত হই; কিন্তু যা সত্য নিত্য মরণ-ধর্ম্মশীল মানুষের দৈনিক জীবনে, কই তা ত তেমন ফুটে উঠ্‌ছে না? উত্থানপতন হাসিকান্নার জটিল কুহেলীর ভিতর কি বিচিত্র ইন্দ্রজাল রচনা কোরে চলেছে। কোথায় চলেছে, কোথায় আছি, কে জানে?

আজ দুর্ভাগ্য, কাল সৌভাগ্য, এই ভাগ্যলীলার কি বিচিত্র খেলা—কোথা থেকে কেমন কোরে কি যেন হোয়ে যায়, আদি অন্ত খুঁজে পাই না। এক জটিল রহস্য! কোথায় যেন কি সকল ঘটনার অন্তরালে লুকানো থাকে! এ কি আকস্মিক ঘটনা তবে? কিন্তু প্রকৃতির বুকে প্রতি ঘটনা সকলের মূলেই ত এক চিরন্তন কল্যাণ জেগে আছে! সেই কল্যাণপথেই তার অনন্ত গতি। সবই মঙ্গল সুরে উদ্বোধিত। অনন্ত বিশ্ববুকে অনন্তলোক যুগ যুগান্তর ধোরে সুনিয়ন্ত্রিত, আর এই নিয়ন্ত্রিত কল্যাণলোকে বিচিত্র বিরাটের আনন্দলীলায় আমিও যে যুক্ত হোয়ে চলেছি! কে আমি, কোথায় আমি? এই মৃত্যুময় সহায় সহানুভূতিহীন সংসারের নির্ম্মম নিষ্ঠুর পীড়নের মাঝখানে আমার সুখ দুঃখ হাসি কান্নার পসরা সাজিয়ে নিয়ে একা আমি কোথায় জাগি? তবে কেন আমার বুকের নিভৃত তলে, গভীর থেকে গভীরে, এত স্নেহ, এত প্রেম উথলে উঠ্‌ছে? আমার পাপ পুণ্য সবই যদি অখণ্ড বিধানে নিয়ন্ত্রিত, তবে আমার আকুল বাসনা, প্রাণময়ী আশা, সব কেন আর যাতনা দেয়? সকলে দিক মুক্তি। কেন এ অব্যক্ত কুহেলীজাল? সব যদি বিশ্ব-বিধানে নিয়ন্ত্রিত, তবে পাপ তাপের এ প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপানল কেন? কেন তবে পাপে ঘৃণা, পুণ্যে রুচি?

না গো না, তা ত হোতে পারে না, আমার আমিত্বের চেতন-পুরে প্রকৃতির অখণ্ড নিয়মে সে প্রাধান্য কই? আমার প্রাণপাখী যে কেবল চেতন-গান গেয়ে উঠছে! আমি যে আমার স্বাধীন ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য-মহিমায় জেগে আছি! যদি আমি অন্ধ অচেতন জড়ের মত চলি, তবে কেন জীবাত্মার জাগরণ উদ্বোধন? না গো না, এ জগৎ কেবল হিম জড়তার স্তূপ নয়। এই জড়ের বুকে অখণ্ড নিয়মে অনন্ত প্রাণের প্রাণহীন খেলা নয়। সকলের অন্তরালে ও কার আনন্দ-মাধুরী সব মধুময় কোরে দিল? চির মঙ্গল উদার প্রেম যেই ফুরিয়ে যায়, অমনি সবই লুপ্ত হয়, অমনি পাপ পুণ্য শাশ্বত আনন্দ সবই উধাও হয়। কেন এ মানবের বুকে বেদনার জটিল রহস্য? কেন তবে আবার আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কুহক ঘোর?

কি জন্য কি হয় তা কি জানি? ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ স্বরূপখানি সমগ্র কল্যাণের রূপখানি দেখ্‌বার সে দৃষ্টি কই? সীমার ঘরে অন্তরে বাহিরে সদাই অপরিপূর্ণ অভিব্যক্তির ভিতরই বিচার কোরতে চাই। তাই এত ভুল ভ্রান্তি, অমঙ্গলের মোহঘোর, জমে ওঠে।

শাশ্বত গতি অতি অখণ্ডলীলায় প্রবাহিত। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অখণ্ড বন্ধনে বাঁধা, অতীতের সাধনা বর্ত্তমানে ফুটে উঠ্‌ছে। কে সে বিচিত্র নিয়ম পরিহার করে? বিশ্ববুকে কত কি দেখি, জড়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, চেতনের চেতনগান শ্রবণ করি। সকলের ভিতরই এক মঙ্গলময় চেতনসত্তা অনুপ্রাণিত হোয়ে আছে। যাকে জড় বোল্‌তে যাই, অণুপরমাণুর সমষ্টি বোলে বোঝাতে চাই, তাও ত দেখি চৈতন্যের অখণ্ড শক্তি-রহস্যের ভিতরই তার সংযোজন বিশ্লেষণ। তারই ভিতর রূপ-খানি গড়ে উঠেছে, চেতনের লীলাময় রূপখানি তাইত আমার রূপ রস গন্ধে চেতনবুকে জেগে ওঠে। সকলের অস্তিত্বজ্ঞান আমার চেতনলোকে চৈতন্যের ভিতরই প্রতিষ্ঠিত।

বিচিত্র শক্তিপ্রভাবে বিশ্ববুকে এই আনন্দপ্রকাশ। ক্ষুদ্র থেকে মহান্ সবই পরম সৌন্দর্য্যে বিকসিত হয়ে উঠ্‌ছে—নিত্য নূতন শোভা! যাকে জড় বোল্‌তে গেলাম, উপলখণ্ড বোলে উপেক্ষা কোরতে চাইলাম, তাও ত বিচিত্র শক্তিরই ইতিহাস বহন কোরছে! কি উদ্ভিদ্, কি প্রাণিজগৎ, সবই যে সেই শক্তিলীলা! নিত্য নূতন ভাবে শক্তির নব নব মহিমা, উন্নতি হোতে উন্নতি, নব জীবন হোতে নব জীবনে নিয়ে চলেছে। আত্মজ্ঞানের চেতনপুরে চির চৈতন্য তাঁর আনন্দগানখানি লোক-লোকান্তরে রণিত কোরে তুল্‌ছেন।

বিশ্বস্রষ্টা সর্ব্বশক্তিমান। কে তাঁর বর্ণনা কোরবে? সে ভূমা ইচ্ছার ভিতরই সকলের জাগরণ। তাঁরই শাশ্বত দৃষ্টির ভিতর সমস্ত নিয়ন্ত্রিত, তাঁরই চিরকল্যাণময় ইচ্ছার ভিতরই সকলের অস্তিত্ব। এরই নাম অনন্তগতি।

তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছায় জগৎ হেসে উঠল, তাঁরই আনন্দ-ইচ্ছালোকে নিত্য পূজার জয়শঙ্খ বেজে উঠল। কোথায় ধ্বংস? যাকে ধ্বংস বোলতে গেল মানুষ, সেই ধ্বংসকাহিনীর ভিতর সৃষ্টির নবরূপ ফুটে উঠল। অণু পরমাণু অখণ্ড বিশ্ব প্রাণবন্ধন-ডোরে প্রাণযোগে যুক্ত হোয়ে অনন্তলীলানিকেতনে সেজে উঠ্‌ছে—জন্মমরণের ইতিহাসখানি পরম লীলাময়ের লীলাগানে নব সত্তায় ভরে উঠল।

প্রেমময়ের আনন্দগানেই বসুধাবুককে স্পন্দিত কোরে তুলল। একমেবাদ্বিতীয়মের আনন্দগান বিশ্বচরাচরে বেজে উঠল। তাইত

ক্ষুদ্র পিপীলিকার জীবনযাত্রার ইতিহাসেও এত আনন্দলীলার আয়োজন হোল—সকল জীবনে এক পরিপূর্ণ মঙ্গল জাগ্রত পরিপূর্ণ শিবসুন্দরের পরম মাধুর্য্যে জীবাত্মা পশুত্বের দীনতার উপর দেবত্বলাভ কোরলেন, সকল বাসনা কামনার উর্দ্ধে আত্মলোকে যাত্রা হোল, ভগবদানন্দধারায় শান্ত শীতল হোয়ে গেল, সকল ত্রিতাপজ্বালা জুড়িয়ে গেল।

মানবের দেবলীলা প্রকাশিত, সত্য সুন্দরম্ নামের জয় চন্দন পরা হোল। এবার সত্য সাধনার পরম উদ্বোধন, আত্মসাধনার অটল বিজয় মন্ত্রশক্তি, সত্য আদর্শ, সত্য দীক্ষা। কোথায় সুখ দুঃখের অস্তিত্ব? নির্ম্মল শাশ্বত আনন্দধ্যানলোকে যাবা হোল। এইত অদৃষ্ট! এইত শাশ্বত নিয়তি।

তবে আসুক কি আসবে আমার যাত্রাপথে। সুখ দুঃখ নিন্দা লাঞ্ছনা আসুক। তবে আমি মুক্তির আনন্দে আনন্দিত, চরম সত্যসাধনে সাধনতৎপর, আমার প্রিয়ধনেরা যে বুক খালি কোরে, দীনহীন কোরে, কাঙ্গাল কোরে চলে যায়, তবুও যে পরম কল্যাণে অগত হোয়ে প্রাণযোগে নিত্য মিলনমালা নূতন কোরে গাঁথতে চাই। ধূলি হোয়ে যাই, তবুও যে অমর আত্মা জেগে থাকেন। ধরণীর বুকে রূপ রস গন্ধে কত আনন্দভোগ! এ সব যে দুদিনে শেষ হবে! দুঃখে ভরে উঠে বুক। কিন্তু আমি কে? অবশ্যম্ভাবী মঙ্গলধারা কে প্রতিহত করে? মৃত্যুমহিমার ভিতরই অমৃতের পরিচয় লাভ হবে, অনিত্য থেকে নিত্য ধনে ধনী হব, পশুত্বের দীন আবরণ ফেলে দিয়ে ভাগবতী জ্যোতি-সত্তা লাভ হবে। তবে কেন দুঃখ শোক বেদনা? এই সব কিছুর ভিতরই আমার চরম কল্যাণসাধনা। বিশ্বযুকে ধ্বংস-লীলাই নব কল্যাণগান গেয়ে আসে, আমার দুঃখ বেদনা ঘোর দুর্দ্দিনও মুক্তির আনন্দের খবর দিয়ে যায়। সকল দুঃখ বেদনার মাঝখানেই চিদানন্দ ভক্ত প্রাণ আনন্দে তরণী বেয়ে যান। এই ত বিশ্বজয়ী শক্তির জয় ইতিহাস।

যতই শান্ত সমাহিত আত্মা ততই শান্ত মঙ্গল, ততই অন্তরতর অন্তরতমে প্রশান্ত গম্ভীর স্বরূপ। এইত শুদ্ধতার জ্যোতি। আপাত মনোরম সুখ, আপাত দুঃখ বেদনা, এ সবই ত কল্যাণের জয়পত্র বহন কোরে আনছে! আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছার উপর পরম ইচ্ছা, সেই মঙ্গল ইচ্ছাতেই আত্মসমর্পণ। তাইত নিয়তির উপরে জয় লাভ, তাই ব্রহ্মানন্দ, অক্ষয় আনন্দসুধাপান। ধন্য ইচ্ছাময়, কে ইচ্ছারহস্য ভেদ কোরবে?

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

আশা করি আমার এই ক্ষুদ্র পত্রখানা আপনার আগামী সংখ্যক তত্ত্বকৌমুদী কাগজে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। পত্রের প্রথম ভাগেই আমি সকল পাঠক ও পাঠিকাদিগের নিকট বিনীত ভাবে এই নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমার লিখিত বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া এই বিষয়ে একটুকু মনোযোগ প্রদান করেন।

মফঃস্বলের অনেক স্থানেই ব্রাহ্মসমাজসমূহের অবস্থা দিন দিন অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই পত্রে আমি আসামের কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজের কথা উল্লেখ করিতে পারি বটে, কিন্তু এই বিষয় যখন সর্ব্ববাদীসম্মত, তখন বিশেষ রূপে বিবৃত করিবার আবশ্যক করে না।

(১) সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য মন্দিরে লোক না আসার কারণ—কোনও কোনও সমাজ মন্দিরের দরজাই খোলা হয় না।

(২) কোনও সমাজে সামাজিক বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদ ও দলাদলি হইয়া ভীষণ অপ্রেমের স্রোত চলিতেছে।

(৩) কত দুর্গম স্থানে কত ব্রাহ্মসন্তান নিঃসহায় অবস্থায় বাস করিয়া নিরসপ্রাণ হইতেছেন।

(৪) কোনও কোনও সমাজমন্দির জীর্ণ শীর্ণ ও ভগ্ন-দশায় পতিত হইয়া সংস্কারের অভাবে ভূমিসাৎ হইয়াছে অথবা ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইত্যাদি

সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের এই নবজাগরণের দিনে কি উল্লিখিত অভাবগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিবার কেহ নাই? গৌহাটী সহরের মত উন্নত স্থানের ব্রাহ্মসমাজমন্দিরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, বিশেষ রূপ সংস্কারের অভাবে হয়তো ইহার অস্তিত্ব শীঘ্রই লোপ পাইবে। সম্পাদক মহাশয়, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও, কোনও স্থান হইতেই আশানুযায়ী বা আবশ্যকীয় সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন না বলিয়া, আজ পর্য্যন্ত সমাজমন্দিরটী সর্ব্বাঙ্গীণ বা সম্পূর্ণ মেরামত হইতেছে না। স্থানীয় সাহায্যে এই বিশেষ সংস্কার-কার্য্য সম্পাদন করা সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আসামের অন্যান্য স্থান হইতে সাহায্য পাওয়ার আশা অতি অল্প বলিয়া তিনি সকলের নিকট নানা আবেদন করিয়াছেন। এই সমাজমন্দিরটি রক্ষা বা উন্নতি করা নিতান্ত আবশ্যক। সমস্ত বিষয় বিবেচনায় আমার বক্তব্য এই যে, ব্রাহ্মসমাজের একটী "ফণ্ড" খুলিয়া মফঃস্বলের সাহায্যপ্রার্থী সমাজমন্দিরসমূহের জীর্ণসংস্কার করা একান্ত আবশ্যকীয় কার্য্য বলিয়া, এই বিষয়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মনোযোগ দেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজের মন্দির-সংস্কারের বা রক্ষার জন্য মফঃস্বলের সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করা একটী ভীষণ কঠিন কাজ। ইহার জন্যই গৌহাটী ব্রাহ্মসমাজমন্দির এই ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতায় বা অপরাপর বড় বড় সহরে অনেক উদ্যোগী, হৃদয়বান, ক্ষমতা ও অবস্থাপন্ন ব্রাহ্ম বাস করেন। সমাজের নেতৃগণ যদি এই বিষয়ে সামান্য মনোযোগ করেন, তবেই বোধ হয় অল্পকাল মধ্যেই কলিকাতা বা অপরাপর স্থান হইতে সংগৃহীত সাহায্যে গৌহাটীর সমাজমন্দিরটীর শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে মেরামত হইবে।

মফঃস্বলের ব্রাহ্মসমাজমন্দির মেরামত করার "ফণ্ড" খোলা ছাড়াও মফঃস্বলের সমাজসমূহের সম্বন্ধে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অনেক কাজ করিবার আছে। লোকের অভাবে যে এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে না, ইহাও বলা যাইতে পারে না। উদ্যোগ ও অবহেলাই বোধ হয় ইহার প্রধান কারণ। কেবল মাত্র প্রচারকপ্রেরণেই সমাজগুলির দীনদশা বা দলাদলির

নিঃশেষ হইবে না। সমাজের নেতৃস্থানীয় ক্ষমতাপন্ন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের সময় সময় নিরপেক্ষ ভাবে সমাজগুলি পরিদর্শন করিয়া যাওয়াও আবশ্যক বোধ হইতেছে। ইহাতেই ব্রাহ্ম সমাজের নব বল, নব জাগরণ ও নব আশা নির্ভর করে এবং ইহাতেই ভবিষ্যৎ বংশ সবল হইবে।

শিলং — শ্রীজগতচন্দ্র দাস (২)।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১লা জুলাই বালিগঞ্জ উপনগরীতে বাবু অনুপমচন্দ্র মৈত্র পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৫ই জুলাই লক্ষৌ নগরীতে প্রবীণ ব্রাহ্ম কর্ম্মী নীলমনি ধর ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অতি ধর্ম্মপ্রাণ ও মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং দীর্ঘকাল নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন।

বিগত ৭ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহের দৌহিত্রী (পরলোকগত সতীশচন্দ্র সরকারের কনিষ্ঠা কন্যা) অর্চনা নানা রোগে কষ্ট পাইয়া ১ বৎসর ৩ মাস বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। পরিবারটি উপর্য্যুপরি নানা শোকের আঘাতে বড়ই জর্জ্জরিত হইতেছেন।

বিগত ৮ই জুলাই পরলোকগত হিমাংশুমোহন গুপ্তের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, পত্নী জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা এবং শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী শাস্ত্রপাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে যে সকল দান প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়-স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ২৯শে জুন কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত রামগোপাল বিশ্বাসের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া অশ্রুকণা ও শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান সুখদাচরণের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২রা জুলাই কলিকাতা নগরীতে রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বসুর ভাগিনেয়ী কল্যাণীয়া শোভনা চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর চতুর্থ পুত্র শ্রীমান সত্যপ্রিয়ের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

সিটি কলেজ—বিরোধিগণের নানা বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও সিটিকলেজে বহু ছাত্র যে ভর্ত্তি হইতেছে, ইহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু এরূপ প্রবল বিরোধিতার মধ্যে যে উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং উহার রক্ষা ও পরিচালনের জন্য প্রচুর অর্থের একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। এই বিষয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও সহানুভূতিকারী বন্ধুরই যে একটা গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন; সকলে নিজে নিজেও বুঝিতে পারেন। আশা করি সময় যথাশক্তি অর্থসাহায্য প্রেরণ করিতে কেহ শিথিলতা প্রদর্শন করিবেন না। এ পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত দান ও প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ১৫০০৲, ভাই আয় তেকটরমন্ নাইডু ১০০৲, ভাই সীতারাম ৫৲, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মল্লিক ২৫৲, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ১০০৲, শ্রীযুক্ত অমিয়চরণ ব্যানার্জ্জি ১০০৲, শ্রীযুক্ত সুবিমল ঘোষাল ১০০৲, শ্রীযুক্ত অশোক চাটার্জ্জি ১০০৲, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন ১০০৲, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তি ৫৲, শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রনাথ রায় ১০০৲, শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার বসু ১০০৲, X. Y. Z. ১০০৲, ডাঃ ভি রামকৃষ্ণ ১০০৲, ডাঃ কালিদাস নাগ ১০০৲, ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ ১০০৲, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন হাজরা (একমাসের বেতন) ২৬০৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস ১০০৲, শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত ১০০৲, শ্রীযুক্ত অমল হোম ১০০৲, শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য ১০০৲, শ্রীযুক্ত জে সি মুখার্জ্জি ১০০৲, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ২০০৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১০০৲, শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ সাহা ৪৮৸৹, শ্রীযুক্ত আশুতোষ কুণ্ড ২০৲, শ্রীযুক্ত মুকুন্দানন্দ আচার্য্য ১০৲, কাজী আবদুলগফুর ২৫৲ কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী ১০০৲, কুমারী শান্তি দাস ১০০৲, শ্রীমতী হেমলতা দেবী (মিসেস্ ভি এন ঠাকুর) ১০০৲, মিসেস এস কে নাগ ১০০৲, শ্রীমতী সুধা রায় ১০০৲, মিসেস্ শরৎচন্দ্র দাস ১০০৲, শ্রীমতী শোভনা রায় ১০০৲ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ১০০৲, শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন ২০০৲, রায় সাহেব প্রমোদারঞ্জন রায় ১০০৲, শ্রীযুক্ত এস্ সি রায় ১০০৲, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ১০০৲ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু ১০০৲ শ্রীযুক্ত জয়ন্ত রাও ১০০৲ মিসেস্ এ এন চক্রবর্ত্তী ১০০৲ শ্রীমতী পুর্ণিমা বসাক ১০০৲ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস ১০০৲। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মাসিক ৩৲ টাকার ১০টি, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৬টি (অঘোর প্রকাশ নামে), কাপ্তান নরেন্দ্রনাথ দত্ত ৩টি ও শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন (বসন্তকুমারী নামে) ৩টি বৃত্তি প্রদান করিবেন।

নূতন ডাক্তার—পরলোকগত বাবু শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শরৎকুমার ও শ্রীযুক্ত প্রভাতরঞ্জন ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান প্রশান্তকুমার শেষ এম্ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

প্রচার—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এপ্রিল মে ও জুন মাসে নিম্নলিখিতরূপে প্রচার ও সেবার কার্য্য করিয়াছেন:—

বরিশালে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যরূপে ১০।১২ দিন ব্রহ্মমন্দিরে, দুইটী বিবাহে, ৪।৫টী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে, ৩।৪টী জন্মদিনে, একটী রোগমুক্তির অনুষ্ঠানে এবং এক দিবস বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের জন্মোৎসবে আচার্য্যের কার্য্য এবং বিবিধ বিষয়ে উপদেশ প্রদান। এক বৃহস্পতিবাসরীয় পারিবারিক সম্মিলনে তিন দিন উপাসনা সঙ্গীত প্রভৃতি। বরিশাল সহরে একটা অভিনন্দন-সভায়, অপর একদিবস আর এম্ এস্ এবং পোষ্টাল বিভাগের ৮ম বার্ষিক অধিবেশনে প্রার্থনা ও বক্তৃতা। সমাজের জন্মোৎসবের বক্তৃতাসভায় একদিন এবং ৪টী ব্রাহ্মবন্ধুসভায় সভাপতির কার্য্য এবং বিবিধ বিষয়ে আলোচনা এবং সঙ্গীত প্রার্থনা। মন্দিরের উপাসনায় কোন কোন দিন এবং সমাজের অধিকাংশ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন। ব্রহ্মবাদী পত্রিকার সম্পাদকীয় যাবতীয় কার্য্য। উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের সহযোগী সম্পাদকরূপে কিছু কিছু কার্য্য। সহরের কয়েকটী পরিবারে রোগীদিগের তত্ত্বাবধান, এবং কোন কোন শোকার্ত্ত পরিবারে প্রার্থনা প্রভৃতি। গৃহে আগত এবং সহরের অনেক শিক্ষিত এবং কতিপয় অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা। কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশৎ জুবিলি উৎসবে "ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য" বিষয়ে বক্তৃতা, উৎসবের শেষ দিবস আচার্য্যের কার্য্য, প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের শক্তি বৃদ্ধির উপায় বিষয়ে দুই দিন আলোচনাস্থলে বক্তৃতা, একদিবস জীবনে ঈশ্বরের করুণা বিষয়ে সাক্ষ্যদান এবং ৩।৪ দিন সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন। নববর্ষের উৎসবে "মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা"

বিষয়ে বক্তৃতা। ভবানীপুরস্থ সম্মিলন-সমাজে আচার্য্যের কার্য্য এবং কীর্ত্তন। সাধনাশ্রমে 'প্রচার' এবং ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরীর সভায় 'ব্রাহ্মসমাজের শক্তিলাভ' বিষয়ে দুই দিবস আলোচনা। এক দিবস সঙ্গত সভায় উপাসনা, সঙ্গীত আলোচনা; দুইটী পারলৌকিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য এবং সঙ্গীত প্রভৃতি। গোবরডাঙ্গায় সঙ্গীত উপাসনা প্রসঙ্গ প্রভৃতি।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—৩রা আষাঢ় বাবু প্রসন্নকুমার দাসের গৃহে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যার বার্ষিক পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য, সত্যানন্দবাবু শাস্ত্রবিবৃতি এবং প্রসন্নবাবু প্রার্থনা করেন। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ২ টাকা প্রদত্ত হয়।

বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসক, উকীল বন্ধু বাবু পূর্ণচন্দ্র দের ভবনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কঠিন বসন্ত রোগ-মুক্তি উপলক্ষে বিশেষভাবে কীর্ত্তন ও উপাসনাদি হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং পূর্ণবাবু এই সঙ্কট দিনের মনোভাব ও শিক্ষা প্রভৃতি লিখিত ভাবে পাঠ করেন। প্রীতিভোজনযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই উপলক্ষে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ২ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

১১ই আষাঢ় শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষের গৃহে ব্রাহ্মবন্ধু সভার ৫ম অধিবেশনে মন্মথবাবু সভাপতির কার্য্য করেন। মহর্ষির আত্মচরিত হইতে পাঠ ও আলোচনা হয়। প্রীতিভোজনযোগে কার্য্য শেষ হয়।

বিগত চৈত্র মাসে একদিন এবং ২২শে জ্যৈষ্ঠ সর্ব্বানন্দ-ভবনে ব্রাহ্মিকাসমাজের দুইটী মাসিক অধিবেশন হয়। মহিলাগণই সঙ্গীত, উপাসনা এবং ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করেন।

বিগত ৯ই এবং ১০ই আষাঢ় বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সপ্তপঞ্চাশত্তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। ৯ই সায়ংকালে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বি, এ, "ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষ" বিষয়ে একটি চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ১০ই উৎসবের বিশেষ দিনে প্রাতে সত্যানন্দ বাবু এবং রাত্রিকালে মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বালীবন ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বালীবন ব্রাহ্মসমাজের উনত্রিংশত্তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়—১০ জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উদ্বোধন, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায়; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত এককড়ি সিংহ রায়। ১১ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত পাণ্ডবনাথ সিংহ; সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায় কর্ত্তৃক ভক্তবাণী পাঠ। ১২ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, বি টি। অপরাহ্ণে পশ্চিমবঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনী; সন্ধ্যায় উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ঘোষ। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম এ, এম্ বি। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন; অপরাহ্ণে, পশ্চিমবঙ্গ ব্রাহ্ম সম্মিলনী; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বি এ। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত এককড়ি সিংহ রায়। অপরাহ্ণে বার্ষিক সভা; সন্ধ্যায় বালকবালিকা-সম্মিলনী। এবারকার উৎসবে কলিকাতা হইতে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন

পশ্চিমবঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনী—গত ২৬এ ও ২৭এ মে বালীবনে পশ্চিমবঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন হয়। ১ম দিবস অপরাহ্ণে বালিকা বিদ্যালয়ে সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। মনোনীত সভাপতির অনুপস্থিতে শ্রীযুক্ত অর্পণাচরণ ভট্টাচার্য্য এম এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে সম্পাদক সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বিবৃত করেন। তারপর, সামান্য আলোচনার পর সেই দিনের মত সভাভঙ্গ হয়। উক্ত আলোচনায় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, বি টি ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় বি এস্ সি প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবসও অপরাহ্ণে সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। মনোনীত সভাপতি ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম্ এ এম্ বি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কেবলমাত্র কুমারখালি হইতে একজন প্রতিনিধি সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে সম্পাদক ব্রাহ্মবন্ধুদের ও ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত চিঠিগুলি পাঠ করেন। তারপর সম্পাদক মহাশয় নিমতা উৎসবে অনুমোদিত সম্মিলনীর অস্থায়ী নিয়মাবলী পাঠ করেন। তাহা নিম্নলিখিত-রূপ সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের পর গৃহীত হয়—

৪র্থ নিয়ম—সম্মিলনীর কার্য্যকরী সভা পরিচালনার্থ নিয়ম-প্রণয়নের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী সাব-কমিটি নিযুক্ত করা হয়—ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় বিএস্ সি, (আহ্বানকারী) ৬ষ্ঠ নিয়ম—সম্মিলনীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সভাপতি মনোনয়নের জন্য তিনটী নাম প্রস্তাব করিবেন এবং যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভোট পাইবেন তিনিই সভাপতি মনোনীত হইবেন। তাহা ছাড়া সম্মিলনীতে নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণগুলি গৃহীত হয়—

১। পশ্চিমবঙ্গবাসী ব্রাহ্মদের একটা আদমসুমারী তৈরী করা হউক এবং আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হউক।

২। পশ্চিমবঙ্গের মৃতপ্রায় সমাজগুলিকে সঞ্জীবিত করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হউক।

কলিকাতা, পাটনা, কুমারখালি ও তমলুক হইতে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া এবারের সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

ছাত্রীদের বৃত্তি—বিগত আই এ ও আই এস্সি পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বৃত্তি পাইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম—২৫৲ টাকার বৃত্তি—সুমতি ভাণ্ডারকার, বিভা সেনগুপ্ত। ২০৲ টাকার বৃত্তি—রমা দত্ত, শান্তা সেন, আইভি খৃষ্টো ও রমুয়া কুক, উমা বসু, আইরীস মোজেস, দীপিকা বেজবরুয়া, সত্যবতী চক্রবর্ত্তী, মণিকুন্তলা দত্ত, লীনা মল্লিক, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণা বসু, শোভনা গুহ।

নামকরণ—বিগত ২৪শে জুন কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার সিংহ রায়ের পুত্রের (শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের দৌহিত্র) নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এককড়ি সিংহ রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুকে দীলিপ-কুমার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মঙ্গলবিধাতা শিশুকে সদা কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

শতবার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে ভারত-ভ্রমণকারী ভক্তদলের বঙ্গ ও আসাম অভিযান।

১৮ই হইতে ২৬শে আগষ্ট, ১৯২৮ ইং—কলিকাতা, ২৭শে ও ২৮শে আগষ্ট—ভবানীপুর, ২৯শে—উল্টাডিঙ্গি, ৩০শে—বরাহনগর, ৩১শে—বালীবন, ১লা সেপ্টেম্বর—মেদিনীপুর, ২রা ও ৩রা—কাঁথি, ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই—রাঁচি, ৭ই ও ৮ই—গিরিডি ৯ই—বর্দ্ধমান, ১০ই—কলিকাতা। ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ ইং—খুলনা, ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই—বরিশাল, ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে—চট্টগ্রাম—২১শে ও ২২শে—কুমিল্লা, ২৩শে ও ২৪শে—শ্রীহট্ট, ২৫শে ও ২৬শে—চেরাপুঞ্জী, ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে—শিলং ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১লা ও ২রা অক্টোবর—গৌহাটী, ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই অক্টোবর—ডিব্রুগড়, ৭ই—তেজপুর, ৮ই ও ৯ই—ধুবড়ী, ১০—কাকিনা, ১১ই—রঙ্গপুর, ১২ই ও ১৩ই—দিনাজপুর ১৪ই—কার্সিয়াং, ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই—দার্জ্জিলিং, ১৯শে ও ২০শে—ময়মনসিংহ, ২১শে হইতে ২৪শে—ঢাকা, ২৫শে—নারায়ণগঞ্জ ২৬শে ও ২৭শে—ফরিদপুর, ২৮শে—কলিকাতা।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ৮ম সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯

1st August, 1928.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে করুণাময় পিতা, তোমার অপার প্রেমে ও স্নেহে আমাদের জন্য যে মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহা সম্যক্ প্রকারে উপভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে তুমি ত আমাদিগকে নানা প্রকারে আহ্বান করিতেছ! কিন্তু আমরা তোমার সে আহ্বান শুনিয়া কতটুকু প্রস্তুত হইতেছি তাহাও তুমি দেখিতেছ। তুমি আমাদের জীবনে যে মহা সুযোগ আনয়ন করিয়াছ, আমরা ত এখনও তাহার মূল্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই! তাই এখনও উদাসীনতা অবহেলায় আমাদের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইতেছে। বাহিরের আয়োজন দুই চারি জনে কিছু করিলেও, ভিতরের আয়োজন ত আমরা অতি অল্প লোকেই করিতেছি! তোমার অপূর্ব্ব দানের জন্য যেরূপ কৃতজ্ঞতা ও তাহার অপব্যবহারের জন্য যে গভীর বেদনা এবং এখন হইতে নূতন পথে চলিবার জন্য যে দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া তোমার উৎসবক্ষেত্রে আসিতে হয়, তাহার ত একান্ত অভাবই আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি! অন্তরদর্শী দেবতা তুমি, আমাদের অন্তরের দৈন্য তুমি আমাদের অপেক্ষা আরও গভীরতর রূপেই দেখিতেছ। তুমি কৃপা করিয়া তাহা দূর না করিলে, আমরা আপনার শক্তি ও চেষ্টায় কিছুই করিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদের প্রাণে সে উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা, নিষ্ঠা ও সঙ্কল্প জাগাও, যাহাতে আমরা সমগ্র মন প্রাণ দিয়া তোমার উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। আমাদিগকে হেলায় এই মহা সুযোগ নষ্ট করিতে দিও না। হে অগতির গতি, তুমি ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি নাই। আমরা সকলে তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমাদিগকে উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত করিয়া লও। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকল জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

হৃদয় পেতে দাও—তাঁর করুণা অপার। তিনি কখন কোন্ সূত্র অবলম্বন ক'রে আস্‌বেন, তা ত তুমি জান না। তিনি আস্‌বার জন্য, তোমাকে তাঁর ক'রে নিবার জন্য, অবসর খোঁজেন। তুমি ত জোর ক'রে তাঁকে আন্‌তে পার না! তোমার কাজ তাঁকে পাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকা; তোমার কাজ তাঁর জন্য হৃদয় পেতে রাখা। তোমার কাজ পথপানে ব্যাকুল দৃষ্টিতে আশার সহিত চেয়ে থাকা; তোমার কাজ উৎকর্ণ হ'য়ে তাঁর বাণী শুন্‌বার আশায় প্রতীক্ষা করা। তিনি আস্‌বেন—ঐ পাখীর গানে তিনি আস্‌বেন; ঐ চন্দ্রকিরণে তিনি আস্‌বেন। ঐ ঘন মেঘাবলির ভিতরে তিনি দেখা দিবেন; ঐ প্রিয়জনের প্রেমসম্মিলনে তিনি এসে স্পর্শ কর্‌বেন; ঐ আপনার জনের বিরহের তীব্র বেদনার ভিতরে তিনি এসে বুকে জড়িয়ে ধর্‌বেন। তুমি ভেব না; হৃদয়খানি পেতে দিয়ে প্রতীক্ষা কর, আকুল চিত্তে প্রতীক্ষা কর। হৃদয় তাঁর জন্য পেতে রাখ, তাঁর করুণায় দেখা পেয়ে কৃতার্থ হবে।

নিষ্কৃতি, না, করুণা—জীবনপথে চল্‌তে চল্‌তে যেমন সুখ আসে, সম্পদ আসে, মিলনের আনন্দ আসে, তেম্‌নি আবার দুঃখ আসে, বিপদ আসে, বিচ্ছেদ বেদনাও আসে—দুঃখে শোকে মানুষ অভিভূত হয়। একটি ছেলে চ'লে গেল, আর একটির ডাক এল, সেই একটিও চ'লে গেল। অর্থের —আর চলে না—তবুও সইতে হয়। কি কর্‌বে? উপায়

নাই। লোকে বলে নিয়তি; এ নিয়তির সঙ্গে সংগ্রাম চলে না; স'য়েই যেতে হবে। তোমরা বল নিয়তি, একে লঙ্ঘন করা যায় না; আমি দেখি আমার প্রিয়তমের করুণার হাত। সুখ, সম্পদ, মিলনের আনন্দ যখন আসে, তার ভিতরে দেখি, প্রিয়তম আমার আনন্দের লীলা কর্চ্ছেন, আমাকে প্রেম ভরে আহ্বান কর্চ্ছেন। আবার যখন দুঃখ আসে, ক্লেশ আসে, বিরহ বেদনা আসে, অপমান নির্য্যাতন আসে, তখনও দেখি তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন, তিনিই আমাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে রয়েছেন—তিনি আমাকে শুদ্ধ ক'রে নিতেছেন, তিনিই আমাকে তাঁর প্রিয় ক'রে নিতেছেন। এ ত নিয়তি নয়, এ যে তাঁর করুণার পরশ, প্রেমের প্রকাশ।

উদারতা—ঋষি বলেছেন, তাঁকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর পথ নাই—আর পথ নাই। ঋষি ত এ কথা বলেন নাই, তাঁকে জান্‌লেও হয়, না জান্‌লেও হয়! ঋষি ত এ কথা বলেন নাই, শ্রেয়ের পথে চল্‌লেও হয়, প্রেয়ের পথে চল্‌লেও হয়; সত্য পথে চল্‌লেও হয়, মিথ্যা অবলম্বন কর্‌লেও হয়! ঋষি কি তবে অনুদার? উদারতা বল্‌তে কি বুঝব, সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ নাই, শ্রেয় ও প্রেয়েতে বিভিন্নতা নাই, সংযম ও ব্যসনে পার্থক্য নাই? ইহা ত উদারতা নয়। সত্য যাহা, শাশ্বত যাহা, শ্রেয় যাহা, তাহার অনুসরণ কর্‌তেই হবে—আর পথ নাই, আর পথ নাই। তবে যে বিপথে যায়, যে সত্যকে লঙ্ঘন করে, যে প্রেয়ের জন্যই ব্যাকুল, তাকে ঠেলে ফেলে দিও না, তাকেও হৃদয় হ'তে দূরে রেখ না। সে বিপথে গিয়াছে, তবুও তাকে আলিঙ্গন দাও, প্রেমডোরে তাকে টেনে আন; নতুবা সে যে আরও দূরে যেয়ে পড়বে। তার জন্য অশ্রুপাত কর, তার জন্য প্রার্থনা কর। ভগবান্ ত তাকে ছাড়েন না, তাকে বিনাশ করেন না, তাকে প্রেমে ও করুণায় বঞ্চিত করেন না! তুমি কেন তাকে হৃদয়ে টান্‌বে না? উদারতা এ নয় যে, অসত্যকে সত্য বল্‌তে হবে, প্রেয়কেও শ্রেয়ের সম্মান দিতে হবে! উদারতা প্রাণকে প্রসারিত করে; যে দূরে গিয়াছে, তাকে টেনে আনে; যে প্রেয়ের পথে, বিনাশের পথে চলেছে, তাকে হৃদয়ে টেনে আনে, প্রেমে বেঁধে রাখে।

সম্পাদকীয়।

মহোৎসবের আয়োজন—শতবার্ষিক মহোৎসব সমাগতপ্রায়। আমরা ইহার জন্য কি প্রকার আয়োজন করিতেছি, তাহা এই সময় একবার গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। উপযুক্ত আয়োজনের অভাবে এই মহা সুযোগ হারাইলে, ইহা যে আর পুনরায় উপস্থিত হইবে না, আমরা নিতান্তই ক্ষতিগ্রস্ত হইব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের উপর বাহিরের কার্য্যভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যে অপর সকলের নিকট হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা কিছুতেই বলা যায় না। তথাপি বাহিরটা সহজে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলিয়া এবং অধিকাংশের সেদিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকা হেতু, উক্ত বিষয়ে লোকের যে পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে, অপর বিষয়ে তাহার শতাংশের একাংশও দৃষ্ট হইতেছে না। অথচ সেই অপর বিষয়টা—অন্তরের দিকটাই—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। আমাদের উৎসবটা সর্ব্বোপরি অন্তরের ব্যাপার। যদি অন্তরের সত্য উৎসবই আমরা সম্যক্‌প্রকারে সম্ভোগ না করিতে পারি, তবে বাহিরের শত সহস্র গুণ আড়ম্বরেও কোনই লাভ নাই—বরং ক্ষতিই আছে। কিছু দিন যাবৎ বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শতবার্ষিক-মহোৎসব-কমিটির পক্ষ হইতে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকাও অল্পদিন হইল প্রকাশিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ প্রতি বুধবার সন্ধ্যার সময় কতিপয় বন্ধু সাধনাশ্রমে মিলিত হইয়া আলোচনা প্রার্থনাদি করিতেছেন। যাহা যতটা হইতেছে তাহা ভালই, কিন্তু ইহা যে অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই আবদ্ধ, সমগ্র সমাজকে বা অধিকাংশ লোককে এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়। বহুসংখ্যক লোক যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, এমন অনেকও যে রহিয়াছে যাহারা এ পথের কণ্টকস্বরূপ, গুরুতর প্রতিবন্ধক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায়, উক্ত প্রকার ক্ষীণ আয়োজন যে নিতান্তই অপ্রচুর, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সকলে, অন্ততঃ অধিকাংশ, এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে, উৎসব কখনও সম্যক্ প্রকারে সফল হইবে না। প্রধানভাবে সকলের সমবেত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার উপরই আমাদের উৎসবের সাফল্য নির্ভর করে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের সকলকেই বিশেষ সচেষ্ট হইতে হইবে এবং পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে। বহুবার বলা হইয়াছে, আমাদের এই মহোৎসব বিশেষভাবে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের এবং নূতন সংকল্প গ্রহণের—কিছু দেওয়ার ও হওয়ার—উৎসব। চিন্তাবিহীন উদাসীন জীবনে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জন্মে না। প্রাপ্ত দান যে কত অমূল্য এবং আমরা তাহার কত অযোগ্য, এই জ্ঞান যে পরিমাণে গভীর ও উজ্জ্বল হইবে, সেই পরিমাণেই হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অবনত হইবে। হৃদয়ে সেরূপ অনুভূতি না জাগিলে কৃতজ্ঞতা আসিবে কেন? এই হেতু বিশেষভাবে নিজের ও অপরাপরের জীবনে এবং সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে করুণাময় পিতার অপার করুণার কথা এবং তাহা যে কত মহামূল্যবান ও আমাদের শত সহস্র অযোগ্যতা সত্ত্বেও কিরূপ অযাচিত ভাবে আমাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে, তাহা গভীর ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। তাহা করিলে, স্বভাবতঃই আমাদের সকলের হৃদয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত না হইয়া পারিবে না এবং নিশ্চয়ই সম্মিলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতার প্লাবন করুণাময় মঙ্গলবিধাতার পানে ধাবিত হইবে এবং সকল প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিবে। সে প্লাবন যে অপর সকলকেও ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, কেহই তাহার স্পর্শ অনুভব না করিয়া পারিবে না, তাহা অধিক করিয়া বলিবার

প্রয়োজন নাই। প্রকৃত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা যে একটা সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নহে, সত্য কৃতজ্ঞতা যে বাধ্যতা ও আনুগত্য না আনিয়া পারে না, তাহাও বলা বাহুল্য মাত্র। প্রকৃত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জাগিলে তদ্দ্বারা জীবন পরিবর্ত্তিত না হইয়াই পারে না—তখন আমাদিগকে কিছু দিতে ও হইতেই হইবে, নূতন ভাবে জীবন যাপন করিবার সংকল্প ও ব্রত গ্রহণ করিতেই হইবে। জীবনের সকল প্রকার বিরোধিতা নিশ্চয়ই বহু পরিমাণে বিদূরিত হইবে, এবং যেখানে তাহা সম্ভবপর হইবে না, সেখানেও অন্ততঃ তাহা দূর করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প ও চেষ্টা যে জাগিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং যাহাতে উহা সম্ভবপর হয়, আমাদিগকে সেই চেষ্টা যত্নেই নিযুক্ত হইতে হইবে—বিশেষভাবে সে সাধনে নিরত হইতে হইবে। বিনা সাধনে কোন কার্য্যই যখন সিদ্ধ হয় না, তখন এ ক্ষেত্রেও যে সাধন ও তপস্যার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তবে, সে সাধন ও তপস্যা যে কোনও কৃত্রিম অস্বাভাবিক উপায়ের অনুসরণ নহে, অথবা তাহার কোনও অলৌকিক শক্তির উপরও নির্ভর নহে, তাহা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য। নিশ্চয়ই আমরা কেহ সেরূপ ভ্রমে পতিত হইব না। ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন সাধনবলে কিছু লব্ধ হয় না—আমাদের সাধন শুধু আপনাদিগকে সেই কৃপা গ্রহণের উপযুক্ত অবস্থায় রাখা মাত্র—সে কথা আমরা সকলেই বিশেষ ভাবে জানি। তাঁহার কৃপা ভিন্ন আমাদের অপর কোনও নির্ভরের স্থল নাই। আর সে কৃপাও নিয়তই বর্ষিত হইতেছে। আমরা আপনাদের উদাসীনতা অবহেলার জন্যই তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদিগকে তাহার উপযুক্ত অবস্থায় রাখিলে—হৃদয়দ্বার খুলিয়া উন্মুখীন ভাবে দীন চিত্তে তাঁহার দ্বারে ভিখারী হইলে, প্রার্থী হইয়া প্রতীক্ষা করিলে, আমরা তাহা হইতে কখনও বঞ্চিত হই না। সুতরাং আমাদিগকে গভীরভাবে শ্রবণ মনন চিন্তনে, পাঠ আলোচনা প্রার্থনাদিতে নিযুক্ত হইতে হইবে; দীর্ঘকাল নির্জ্জন আত্মচিন্তা আত্মপরীক্ষা, ধ্যান ধারণা, আকুল প্রার্থনা, ব্রহ্মকৃপাস্মরণ প্রভৃতিতে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। অপরের সঙ্গে সম্মিলিত সাধনেও যত অধিক সম্ভব সময় দিতে হইবে। হৃদয়ের শুভ সংকল্পগুলিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে ও দৃঢ় সংকল্প দ্বারা আপনাকে বাঁধিতে হইবে। সর্ব্বোপরি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে করুণাময় পিতার হাতে [illegible]ণ করিতে হইবে। স্মরণে রাখিতে হইবে, আমাদিগকে কিছু দিতে হইবে ও হইতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, আপনাকে দেওয়ার তুল্য কঠিন কিছু নাই, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরও অপর কোন দান বা ত্যাগ নাই। অর্থ বিত্ত অপর যাহা কিছু একটু চেষ্টা করিলেই দেওয়া যায়—ভাবের উত্তেজনাতে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত দিয়ে দেওয়া অতি সহজই; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে, জীবনের সকল অবস্থায় ও সর্ব্ববিষয়ে আপনার ইচ্ছা অভিরুচি সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া, জীবনবিধাতার হাতে আপনাকে অর্পণ করা সহজ নহে—নিতান্তই কঠিন। অথচ তাহা ব্যতীতও কিছু হওয়া ও করা সম্ভবপর নয়। ইহা হইলে অন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বভাবতঃই অতি সহজ হইয়া যায়, ত্যাগের পথের সকল বাধা বিদূরিত হইয়া যায়। আনুগত্য এবং বাধ্যতাও স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া উঠে। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগত জীবন যাপন করিতে হইলে এবং জীবনে তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, তাঁহার হাতে আপনাকে অর্পণ করা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই। তাহা ব্যতীত আমাদের মধ্যে তাঁহার কার্য্যও পূর্ণভাবে সফল হইতে পারে না। আমাদের ইচ্ছা বিরোধী হইলে তাঁহার কার্য্যে কিছু না কিছু বাধা উৎপন্ন হয়ই। তাঁহার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিবার ক্ষমতা আমাদের না থাকিলেও, তিনি যে সহজে আমাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না, তাহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উৎসবকে সফল করিতে হইলে আমাদের সকলকেই যে প্রধানভাবে এই সমস্ত আয়োজনে নিযুক্ত হইতে হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট ও চেষ্টা যত্ন নিযুক্ত হউক। সকল গৃহ পরিবার ও প্রত্যেক হৃদয় হইতে আকুল প্রার্থনার ধ্বনি উত্থিত হউক। করুণাময় পিতা আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও বল দিউন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

ভগবান একমাত্র প্রভু।

বড় বড় সহরের রাস্তায়, সওদাগরদের কার্য্যালয়ের দরজায়, নানা প্রকারের Sign Board দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন Sign Boardএ শুধু একজনের নাম লেখা থাকে, যেমন "Smith & Co."। কোন কোনটায় আবার দু'তিন জন লোকের নাম থাকে যেমন, "Smith Elder & Son."

যেখানে কেবল একজনের নাম লেখা থাকে, সেখানে ইহাই বুঝিতে হয় যে সেই দোকানের মালিক একজন। যেখানে "Smith & Co." লেখা আছে, সেই দোকানের একমাত্র মালিক Smith. তাঁর যে পুত্র নাই তা নয়; হয়ত তাঁর পুত্রই দোকানের manager, এবং অধিকাংশ কাজই হয়ত সে করে; কিন্তু সমস্ত কাজই হয় Smith এর নামে। সে দো[illegible] লক একমাত্র Smith,—তাঁর ছেলে অপরাপর কর্ম্মচারীদের মত কাজ করেন। কিন্তু যেখানে "Smith Elder and Son" লেখা আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, দোকানের মালিক দু'জন, Smith এবং তাঁহার পুত্র; পুত্রও সেখানে অংশিদার। সেখানে মালিক দুজন—পিতা এবং পুত্র। কাজ তাঁদের উভয়েরই নামে চলে।

ধর্ম্ম জগতেও অনেক স্থলে "Smith and Son হইয়া গিয়াছে—পিতা এবং পুত্র দুই জন কর্ত্তা হইয়া গিয়াছে। মানুষ ঈশ্বরের অধীন হইতে গিয়াও আপনাকে ভুলিতে পারে নাই—ঈশ্বরের হাতে সমস্ত সমর্পণ করিতে পারে নাই—নিজের জন্যও কিছু রাখিয়াছে; ঈশ্বর একমাত্র প্রভু না হইয়া, ঈশ্বর এবং মানুষ নিজে দুই প্রভু হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে এই ভাবে কাজ চলিয়াছে, ধর্ম্মজগতে সেখানে ভাল কাজ হয় নাই। মানুষ আপনার প্রভুত্ব ভুলতে না পারায়, আপনাকে বুঝতে না পারিয়া ভগবানের কাজ নষ্ট করিয়াছে, ধর্ম্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪, বৃহস্পতিবার, সাধনাশ্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-কর্ত্তৃক বিবৃত।

হইতে দেয় নাই। যেখানে ঈশ্বরের শক্তি এবং ইচ্ছা অবাধে কাজ করিতে পায়, সেইখানেই সর্ব্বপ্রকারে মানুষের মঙ্গল এবং উন্নতি হয়, তাব ক্রমে, ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তৃত হয়। আর যেখানে মানুষ স্বয়ং একটু প্রভুত্ব রাখে, নিজেও মালিক হইয়া কাজ করিতে চায়, সেখানে ভগবানের শক্তি এবং ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হয়, এবং সবই শুষ্ক হইয়া যায়।

এই আশ্রম "Smith and Son" এর কারবার নয়:— এখানে মালিক একমাত্র তিনিই, আমরা তাঁর ভৃত্য মাত্র। যে পরিমাণে আমরা নিজের ইচ্ছা ছাড়িতে পারিব এবং তাঁর ইচ্ছার জয় হোক, তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হোক, ইহাই চাহিতে পারিব, সেই পরিমাণে তাঁর জয় হইবে।

আমরা অজ্ঞাতসারে অনেক সময় আমাদের প্রভুত্ব জাহির করিয়া ফেলি। অনেক সময় ক্ষুদ্র এবং মলিন ভাব কর্ত্তৃক পরিচালিত হ'য়ে, তাঁর রাজ্য বিস্তারের ব্যাঘাত জন্মাই। প্রেম এবং শুদ্ধতার অভাবে সর্ব্বপ্রকার আয়োজন বৃথা হইয়া যায়। আমরা অনেক সময় মনে করি, প্রীতি এবং শ্রদ্ধা না-ই বা থাকিল, উপাসনা প্রার্থনা করি, নিজে কোন পাপ করি না, আবার কি? কিন্তু প্রীতি এবং শ্রদ্ধা যদি না থাকে, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং ভগবানের সঙ্গে সকলের যোগ হইতে পারে না। আর, এই যোগ যদি না থাকে, তবে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে যা' হয়, ধর্ম্মজগতেও তাই হয়। মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে উপরের শক্তি আর নিম্নের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে অবতরণ করিতে পারে না, সে সব স্থলে তাহার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। মানবের মধ্যেও এই প্রীতি এবং শ্রদ্ধার যোগ না থাকিলে, ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহার শাস্তি এই হয় যে, একের শক্তি অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হইতে পারে না, একের ভাব অপরের হৃদয়ে প্রবেশের পথ পায় না—মণ্ডলী গঠিত হ'তে পারে না, সকলেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শুষ্ক হইয়া যায়—Spiritual isolation উপস্থিত হয়।

ধর্ম্মের পথ ঠিক তার বিপরীত। যেখানে মানুষ ভক্তি এবং বিনয়ে নত হয়, আপনাকে অধম জেনে অপরকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি দেয়, সেখানেই যোগ স্থাপিত হয়, এবং যতই সকলে আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া, ঈশ্বরের শক্তিকে কার্য্য করিতে দেয়, ততই সেই মণ্ডলীতে ঈশ্বরের কার্য্য প্রকাশিত হয়।

আমাদের সাধনব্যাপারে, আমাদের মণ্ডলীর পক্ষে "Smith and Son" যেন না হয়। তিনিই একমাত্র রাজা প্রভু মালিক, আমরা অধম ভৃত্য—আপনাকে একেবারে বিলুপ্ত করি। জ্বলুক তাঁর ইচ্ছার আগুন; আমরা তাতে শুষ্ক কাঠের মত আমাদিগকে নিক্ষেপ করি; তাঁর শক্তি জ্বলুক, তিনিই কাজ করুন।

তিনি কর্ত্তা প্রভু চালক, তাঁর হাতে দিয়েই, সব দিয়েই সুখ। প্রীতি ও শ্রদ্ধার যোগে যুক্ত হ'লে তাঁর প্রীতি জাগিবে, তাঁকে সব ছাড়িয়া দিয়া আনন্দ অনুভব করিব।

সে ব্যক্তিত্ব আত্মার বিরোধী, যে ব্যক্তিত্ব যথাস্থানে নত হ'তে পারে না; সে ব্যক্তিত্ব আধ্যাত্মিক উন্নতির বিরোধী, যে আপনার ত্রুটিতে অবনত হয় না। সে ব্যক্তিত্ব বিষতুল্য, যাহা ঈশ্বরের কারবারের মধ্যে নিজেরও কিছু অংশ রাখিতে চায়।

আমরা তাঁর দাস—কৃপাভিখারী, পাপী, এই ভাবে প'ড়ে থাকি। তাঁর রাজ্য বিস্তার হোক—এই ভক্তির অবস্থা মনে করে'ও কত আনন্দ!

মহোৎসবের বিশেষ প্রকৃতি।

আমরা, সাধারণ মানুষ, যাহা চোখে দেখিয়াছি তাহারই ধারণা করিতে পারি; যাহা চোখে দেখি নাই, সহজে তাহার ধারণা করিতে পারি না। শতবার্ষিক মহোৎসব কখনও দেখি নাই; সুতরাং ইহার স্পষ্ট ধারণা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইতেছে। বার্ষিক উৎসবাদি দেখিয়াছি; তাই শতবার্ষিক মহোৎসবকেও তাহারই অনুরূপ একটি বৃহদাকার উৎসব মনে করিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক কি ইহা অন্যান্য উৎসবের অনুরূপ?

এমন এক সময় ছিল, যখন আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মেরা বর্ত্তমান মাঘোৎসবকেও ধারণায় আনিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার সাড়ে চৌদ্দ বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় (তখনও মহর্ষি হন নাই) ১১ই মাঘ সায়ংকালে এক বেলা মাত্র উপাসনাদ্বারা প্রথম মাঘোৎসব করেন। এক পক্ষ-কালব্যাপী, বিচিত্র অনুষ্ঠানময় বর্ত্তমান মাঘোৎসব তখন এক জন ব্রাহ্মেরও কল্পনায় আসে নাই। ক্রমে ভক্তদের উৎসাহ অনুরাগ ও উদ্ভাবনী শক্তির ফলে মাঘোৎসবের বিকাশ হইয়াছে। যাঁহারা ইহার আত্মিক গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহাদের নিকট ইহা এখন ব্রহ্মকৃপাসম্ভোগের এক বিশেষ ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। মাঘোৎসবে তাঁহাদের অন্তশ্চক্ষুর সমক্ষে স্বর্গের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত হয়—তাঁহারা ঐ দ্বার দিয়া আত্মার রাজ্য উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পান; আশা আনন্দ, প্রীতি ভক্তি, বিশ্বাস নির্ভরে তাঁহাদের হৃদয় ভরিয়া উঠে। তাঁহারা অনুভব করেন, মাঘোৎসবের ন্যায় দ্বিতীয় একটি উৎসব জগতে আর নাই।

মাঘোৎসবটি যেমন অতীতের অনুকরণে হয় নাই, ভক্ত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদের উৎসাহ অনুরাগের ফলে আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে, শতবার্ষিক মহোৎসবকেও তেমনি আপনি গড়িয়া উঠিতে দেওয়া আবশ্যক। ইহাকে অপর কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতবার্ষিকের অনুকরণে বা মাঘোৎসবের অনুকরণে কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা উচিত নহে।

কিন্তু এই মহোৎসবকে আপনি গড়িয়া উঠিতে দিবার পূর্ব্বে, ইহার প্রকৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। মাঘোৎসবাদির সহিত ইহার প্রকৃতিগত একটি গুরুতর ভিন্নতা আছে। সেইটি লক্ষ্য না করিলে, ইহার বিশিষ্ট আকারে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবে। মাঘোৎসবাদি ব্রহ্মকৃপাপ্রার্থনা ও ব্রহ্মকৃপাসম্ভোগের উৎসব; আর শতবার্ষিক মহোৎসব সেই সকল কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের উৎসব। কিছু পাওয়া, এবং পাইয়া তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, কখনই এক কথা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশ করিয়া জগজ্জননী আমাদিগকে যে কৃপা করিয়াছেন, এই ধর্ম্মের আশ্রয়ে সত্যনিষ্ঠ, সরল হৃদয়, ধর্ম্মানুরাগী আত্মা-সকলকে আনিয়া তাঁহাদের সাধনা

ও ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যত কৃপা করিয়াছেন, এবং এই একশত বৎসর ধরিয়া দৈনিক উপাসনায়, সাপ্তাহিক উপাসনায়, মাসিক ও বাৎসরিক উৎসবাদিতে অগণ্য নরনারীকে যত কৃপা করিয়াছেন, সেই অপার কৃপা-সমষ্টির জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করা শতবার্ষিক মহোৎসবের উদ্দেশ্য। অন্যান্য উৎসবে জগজ্জননী তাঁহার কার্য্য করিয়াছেন—আমাদিগকে যাহা দিবার দিয়াছেন; এবার আমাদিগকে আমাদের কার্য্য করিতে হইবে—তাঁহার দানের জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিতে হইবে। এই খানেই অন্যান্য উৎসবের সহিত শতবার্ষিক মহোৎসবের প্রভেদ। এই প্রভেদ সামান্য নহে; ইহা মৌলিক প্রভেদ।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কোনও বাড়ীতে ছোট বড় অনেকগুলি সন্তান আছে। তাহারা আজন্ম মায়ের কোমল স্নেহ ও সুমিষ্ট সেবা সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সকল সময় সেই স্নেহ ও সেবার বিষয়ে চিন্তা করে নাই। মা যে তাহাদের জন্য প্রতিদিন কত ভাবনা ভাবেন ও কত প্রকারে আপন কোমল হৃদয়ের পরিচয় দেন, সে বিষয়ে তাহাদের খেয়াল নাই। পরে যখন এ বিষয়ে তাহারা চিন্তা করিল, ও মায়ের প্রতি তাহাদের হৃদয় জাগ্রত হইল, তখন একদিন তাহারা পরামর্শ করিল, "মা এতকাল আমাদিগকে কত খাওয়াইতেছেন, পরাইতেছেন! রোগে কত শুশ্রূষা করিতেছেন; দুঃখে কত সান্ত্বনা দিতেছেন! প্রতিদিন তাঁহার সেবা-যত্নের অন্ত নাই! চল, আমরা একদিন মায়ের এই অপার স্নেহ স্মরণ করিয়া আনন্দ করি। সে দিন আর মাকে নূতন সেবা করিতে দেওয়া হইবে না; একটি দিনের জন্য তাঁর কার্য্য স্থগিত থাকুক। আজন্ম তাঁর যে অসীম স্নেহ পাইয়াছি, তাহা স্বীকারের জন্য আমরা কি করিতে পারি, চল তাই ভাবি; এবং ভাবিয়া, একটি দিন এমন কিছু করি, যাহাতে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার চাক্ষুষ প্রমাণ হয়; আমাদের কৃতজ্ঞতা যে সত্য, যাহাতে মাও তাহা দেখিতে পান এবং পাড়া-পড়শীরাও বুঝিতে পারে।" এই বলিয়া একটি দিন স্থির করিয়া, তাহারা নানা প্রকারে মাতৃভক্তির নিদর্শন দেখাইয়া আনন্দোৎসব করিল।

শতবার্ষিক মহোৎসব এইরূপ। ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অমূল্য দান দিয়া জগজ্জননী শত বৎসর ধরিয়া যে করুণা করিয়াছেন, আগামী দেড় বৎসর আমরা তাহা স্বীকার করিব। মুখের স্বীকার নয়; কার্য্যদ্বারা স্বীকার। মহোৎসবের দেড় বৎসর আমরা এমন কিছু করিব, যদ্দ্বারা প্রমাণ হয় যে আমাদের কৃতজ্ঞতা সত্য।

একটি শিশু মায়ের কোনও দান পাইয়া খুশী হইলে, তাহা মাথায় তুলিয়া নাচে, ও বাড়ী বাড়ী গিয়া বন্ধুবান্ধবকে দেখায়। ইহাই তাহার কৃতজ্ঞতা। সে মাকে মুখের ভাষায় কৃতজ্ঞতা না দিলেও, মা তাহার হৃদয় বুঝিতে পারেন। পক্ষান্তরে, যে শিশু মায়ের দানকে হেলায় ফেলিয়া রাখে, যত্ন করে না, ব্যবহার করে না, সে সুমিষ্ট ভাষায় মাকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাইলেও মা তাহার কৃতজ্ঞতাকে অসার বলিয়া মনে মনে অগ্রাহ্য করেন। আমরা যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম পাইয়া যথার্থই খুশী হইয়া থাকি, তবে আমাদিগকে এবার ইহাকে মাথায় করিয়া নাচিতে হইবে। শতবার্ষিক মহোৎসব এইরূপ আনন্দের নৃত্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মকে মাথায় তোলার অর্থ কি?—ইহাকে ধন অপেক্ষা, বিদ্যা অপেক্ষা, পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষা প্রধান স্থান দেওয়া;—ইহাকে জীবনের এক বিভাগে না রাখিয়া, সকল বিভাগে প্রতিষ্ঠিত করা; কেবল চিন্তায় ও মতে না রাখিয়া, চরিত্রে ফুটাইয়া তোলা; গোপনে না রাখিয়া প্রকাশ করা। আর, ব্রাহ্মধর্ম্মকে লইয়া নৃত্য করার অর্থ কি?—ইহার আনন্দে আপনাকে ভোলা; ইহার জন্য সহজে ত্যাগস্বীকার করা। জীবনে, পরিবারে, মণ্ডলীতে ও জনসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব-বৃদ্ধির জন্য ত্যাগস্বীকারেই শতবার্ষিক মহোৎসবের সার্থকতা।

অন্যান্য উৎসবে আমরা পাওয়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখি; এবার দেওয়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেননা, ইহা কর্ত্তব্যপালনের উৎসব—কার্য্যদ্বারা কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের উৎসব। অন্যান্য উৎসবের ন্যায় আমরা যদি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া আচার্য্য ও প্রচারকের নিকট হইতে কিছু পাইবার জন্য তাকাইয়া থাক, তবে এ উৎসব বিফল হইবে। ত্যাগের পরিমাণ দ্বারাই প্রত্যেকের জীবনে ইহার সফলতার পরিমাণ হইবে। অন্যান্য উৎসবের শেষে আমরা যেমন মনে মনে প্রশ্ন করি—'এবার কি পাইলাম?', এই উৎসবের অবসানে তেমনি প্রশ্ন করিতে হইবে—'এবার কি দিলাম?'

কর্ত্তব্যপালন ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনের এক প্রধান দিক। কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। কর্ত্তব্যপালনদ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হইলে যে ভাবোচ্ছ্বাস আসে, তাহাই সত্য ও স্থায়ী; তাহাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা যদি প্রত্যেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য যথোচিত ত্যাগস্বীকারপূর্ব্বক আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করি, তবে জগজ্জননীও অবশ্য তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিবেন—তিনি আশা আনন্দ, প্রেম ভক্তি আমাদের হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে, সন্তানেরা যখন এক দিনের জন্য মাকে বিশ্রাম দিয়া, নানা ভাবে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল, মা কি তখন সত্যই বসিয়া রহিলেন? সন্তানেরা তাঁহার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলেও, তাঁহার মাতৃহৃদয় বিশ্রাম মানিল না। সন্তানদের উচ্ছ্বসিত মাতৃভক্তি সে দিন তাঁহার প্রাণে অধিকতর বাৎসল্য জাগাইয়া তুলিল। তিনি উঠিয়া তাহাদের মাতৃ-উৎসবে যোগদান করিলেন; এবং অন্য দিনের অপেক্ষাও অধিক স্নেহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অতএব আমরা না বলিলেও, জগজ্জননী আপন কর্ত্তব্য অবশ্যই সম্পাদন করিবেন। কিন্তু, আমরা এবার সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনেই সমগ্র মন নিয়োগ করিব।

কর্ত্তব্যপালনদ্বারা উৎসব করিবার এই বিশেষ ভাবটি ভারতের সকল স্থানের ব্রহ্মভক্ত নর নারীর প্রাণে জাগিয়া উঠিলে, কত বিচিত্র আকারে সেই ভাব ব্যক্ত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক পরিবার ও প্রত্যেক মণ্ডলী কত প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে পারেন, তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত 'ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব" নামক পুস্তিকায় পাওয়া গিয়াছে। (১লা ও ১৬ই আষাঢ়ের

তত্ত্বকৌমুদীতে এই পুস্তিকা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে)। ত্যাগ-স্বীকারের আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিলে, আরও কত অসংখ্য উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইবে কে জানে? সকলে মহোৎসবের এই বিশেষ প্রকৃতিটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তদনুযায়ী আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিলে, এ উৎসব অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া জগতে অতুলনীয় হইয়া উঠিতে পারে। যেমন মাঘোৎসব বার্ষিক উৎসবসমূহের আদর্শস্থানীয় হইয়াছে, তেমনি এই উৎসবও শতবার্ষিক উৎসবসমূহের আদর্শস্থানীয় হইয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দের অনুকরণযোগ্য হইতে পারে। সকলে ইহার জন্য চেষ্টা করুন, এই নিবেদন।

শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ব্রাহ্মসমাজের পরমায়ু

এ দেশে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে প্রায় একশত বৎসর। আগামী ভাদ্রমাসেই শতাব্দী পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই এক শত বৎসরে ব্রাহ্মসমাজ তাঁর লক্ষ্যের দিকে কতটা অগ্রসর হইয়াছে, ব্রা' সমাজ যে জন্য এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তার কতটা করিয়া উঠিতে পারিয়াছে, একবার সেই হিসাব নিকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে সমাজের ভিতরের ও বাহিরের লোকদের ধারণাই বা কি, তাহাও একবার আলোচনা করিয়া দেখিবার দরকার হইয়াছে। ভিতরের লোকেরা ইহাকে কি ভাবে দেখেন শতাব্দীপূর্ত্তি উপলক্ষে তার সম্যক্ আলোচনার আয়োজন হইতেছে। আমি আমার এই প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোকেরা ইহাকে কি ভাবে দেখেন, শুধু তারই একটু আলোচনা করিব। এই সব আলোচনা এই জন্যও আবশ্যক যে, আমাদের ভিতরের ও বাহিরের অবস্থা যথযথরূপে জানিতে পারিলেই শতাব্দীপূর্ত্তি উপলক্ষে দেশময় যে বিরাট মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে, তাহা আমরা যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিব এবং আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্ষেত্রেও আরও দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে পারিব।

ব্রাহ্মসমাজের জন্মের সূচনা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, ইহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার বিষম চেষ্টা হইয়াছে। রামমোহনের সময় রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক স্থাপিত "ধর্ম্মসভার" এবং বাংলা ও বাংলার বাহিরের 'পণ্ডিত' 'শাস্ত্রী' উপাধিধারী হিন্দু প্রধানগণের তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা একদিকে, অন্যদিকে মার্সম্যান ওয়ার্ড ও কেরী প্রভৃতি বিখ্যাত পাদ্রীগণের ভীষণ আক্রমণ। মহর্ষির সময়ে খৃষ্টান পাদ্রী ডফ সাহেবের আক্রমণ হইতে হিন্দুদের রক্ষা করা ও "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" স্থাপন প্রভৃতি কারণ হইতে হিন্দুদের উদাসীন ভাব, কিন্তু খৃষ্টানদের সহিত তুমুল সংগ্রাম। কেশবচন্দ্রের সময়ে একদিকে পাদ্রী ডাইসন ও লালবিহারী দের সহিত ঘোরতর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, অন্যদিকে সহবাসসম্মতি আইন ও ১৮৭২ এর ৩ আইনের বিবাহ-বিল লইয়া হিন্দুসমাজের সহিত প্রবল সংঘর্ষ। তারপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার পরেও শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি একদিকে এবং কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মসমাজ ত মরিল না-ই, বরং প্রতি আক্রমণে আরো সজীব ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল! ব্রাহ্মসমাজ এখনো বাঁচিয়া আছে এবং আরো বহুকাল যে বাঁচিয়া থাকিবে তারও যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ইহার প্রতি আক্রোশ ও আক্রমণ নাই। খৃষ্টানদের আক্রমণ এক প্রকার থামিয়াই গিয়াছে। তাঁদের ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই, মধ্যে মধ্যে যদি কিছু বলেন তাহাও পুরাণ কথার পুনরুক্তি বলিলেই হয়। কিন্তু হিন্দুদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা এখন আর না থাকিলেও এখনো একটু আধটু চলিতেছে এবং তাহার কিছু নূতনত্বও আছে। আমি সেই সম্বন্ধেই আজ কিছু বলিব। উপন্যাস গল্প নাটকাদিতে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে যে প্রচারের চেষ্টা চলিতেছে, সে বিষয়ে কিছু বলিবার দরকার বোধ করি না। কারণ, বই বিক্রি বা পত্রিকা চালাইবার জন্য মানুষকে নানারূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা না হইলে নাকি ঐ সব ব্যবসা চলে না! আর, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সততার কথা মুখে যতই বলা হউক, কাজে করা বড়ই কঠিন।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে যাঁহারা লেখনী চালনা করিতেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি তিনজন বিশিষ্ট লেখকের নাম এখানে করিতেছি। একজন "শতবর্ষের বাংলার" লেখক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়। তিনি একজন শক্তিশালী লেখক শুধু নন, তিনি বর্ত্তমান কালে একজন অদ্ভুত কর্ম্মীও বটেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ধর্ম্মের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারাটী পরিষ্কার রূপেই দেখিতে পাইয়াছেন, তবে তাঁহার দৃষ্টিও কেশবচন্দ্র পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গিয়াছে এবং অন্যদিকে ধাবিত হইয়াছে। এই বিষয়ে আমার পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আর দুইজন রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী। এঁদের দুজনেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশূন্য এবং এঁরা সুযোগ পাইলেই ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিতে ছাড়েন না। তবে, রায় বাহাদুর সম্বন্ধেও আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই; কারণ, বহুদিন পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার" উপলক্ষে এবং ইদানীং ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গবাণীতে" (ভাদ্র, ১৩৩৩) "সাহিত্যে জাতীয়তা" শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহার যথোপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন। আমি কেবল গিরিজা বাবুর লেখা সম্বন্ধেই কিছু বলিব। তাঁহার "বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দী" প্রথমে বক্তৃতার আকারে বাহির হইয়াছিল, পরে তাহা বঙ্গবাণীতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় এবং তার পরে পুস্তকাকারে দেখা দিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থখানির সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সম্ভবপরও নয়। তাহা ছাড়া, তার দরকারও বোধ করি না; কারণ, গ্রন্থখানিতে অনেক ইতিহাসবিরুদ্ধ যুক্তিহীন মামুলী বিচার ও মীমাংসা আছে। তবে বলিহারি আমাদের

বিশ্ববিদ্যালয়ের! যেখানে এইরূপ মৌলিক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদত্ত হয় এবং তাহাই আবার যেখানে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

যে কেহ এই গ্রন্থের ২১১ পৃষ্ঠা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, রামমোহন হ'তে আরম্ভ করিয়া সকল ব্রাহ্ম নেতাদের সরাইয়া দিয়া রামকৃষ্ণ দেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহার মুখপাত্র ও ব্যাখ্যাতা করিয়া রামকৃষ্ণকেই সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত করা—তাঁহাকেই যুগাবতাররূপে দেশের কাছে ধরা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এই প্রচেষ্টার মধ্যে গ্রন্থকারের দুরাকাঙ্ক্ষা ও অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকা যায় না।

লেখক রাজা রাধাকান্ত দেব হইতে শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন পর্য্যন্ত যাঁরা প্রাচীনত্বের জীর্ণদণ্ডকে একমাত্র আশ্রয়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্টতা দেখিতে পাইয়াছেন, দেখেন নাই কেবল তাঁদের যাঁরা এ যুগে একমাত্র কল্যাণ ও উন্নতিকে বরণ ও যুগবাণীকে বহন করিয়া নবজীবনের বেগে সকল বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া নির্ভয়ে পথ চলিয়াছিলেন এবং দেশবাসীকে ঐ পথে আহ্বান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যেমন দেবতাদের লইয়া মারামারি কাড়াকাড়ি হইয়াছে, এক সম্প্রদায়ের দেবতাকে ছোট করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের দেবতাকে বড় করিবার চেষ্টা হইয়াছে, আজকালও সেই হীন চেষ্টা এ দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই,—এখন তাহা অন্য আকারে দেখা দিয়াছে। এখন মহাপুরুষদের লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। এখন রামকৃষ্ণ বড় কি রামমোহন বড়, বিবেকানন্দ বড় কি কেশবচন্দ্র বড়, এই ভাবটা অতি কদর্য্য আকারে প্রকাশ পাইতেছে। সত্যের প্রতিষ্ঠা নয়, সম্প্রদায় বা দলের এবং সেই সেই দলের বা সম্প্রদায়ের নেতাদের প্রতিষ্ঠার জন্যই সকলে ব্যস্ত। "বিবেকানন্দ" গ্রন্থে ইহা আমরা পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাই।

ব্রাহ্ম যুগ নাকি কেবল একটা সংস্কারের যুগ, আর তার পরে রামকৃষ্ণ হইতে নাকি সমন্বয়ের যুগ। তবে লেখক নিজেই বলিতেছেন—"রামকৃষ্ণ কোন নূতন ধর্ম্মমতের প্রচার করেন নাই, কোন নূতন সাধনপ্রণালীরও আদেশ করেন নাই…… তিনি যদি কোন নূতনত্ব প্রচার করিয়া থাকেন তবে তাহা এই যে ব্রহ্মানুভূতিই মানুষের চরম লক্ষ্য।" লেখক এখানে যাহা ইতস্ততঃ করিয়া লিখিয়াছেন তাহা অতি স্পষ্ট। ব্রহ্মবাদী ঋষিদের দেশে, বিশেষতঃ রামমোহন যাহা ইঙ্গিতে বলিয়া গিয়াছেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাহা নিজ জীবনদ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই দেশে এই বিষয়ে নূতনত্বের কোন দাবী উপস্থিত করা অতি অর্ব্বাচীনের কাজই হইত।

এখন দেখা যা'ক 'সমন্বয়' বিষয়ে রামকৃষ্ণের বিশেষত্ব কতটুকু। সমন্বয়ের ঋষি রামমোহনের কথা বাদ দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, রামকৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পরিচয়ের (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ) বহুপূর্ব্ব হইতেই নববিধান ও সমন্বয়ের ভাব কেশবের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। "১৮৬০ ইং সালে তাঁহার "প্রেমের ধর্ম্ম" (Religion of Love) নামক প্রবন্ধে হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলকে এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মে এক হইবার জন্য অনুরোধ আছে। ১৮৬১ সালে যখন তিনি কৃষ্ণনগরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যান তখন সেখান হইতে হিন্দু খৃষ্টান মুসলমান সকলে গদা ধরা ধরি করিয়া শান্তিনিকেতনে সেতু পার হইয়া যাইতেছেন, এইরূপ এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া আনিয়াছিলেন!"—আচার্য্য কেশবচন্দ্র. মধ্য লীলা। রামমোহনের অভ্যুদয়ের পর এই সমন্বয়ের ভাবের দ্বারা কেশবেরই হউক বা রামকৃষ্ণেরই হউক, অনুপ্রাণিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে, বরং না হওয়াটাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। রামমোহন নিজেই ছিলেন মূর্ত্তিমান সমন্বয়। তাঁহাকে হিন্দুরা হিন্দু, খৃষ্টানেরা খৃষ্টান ও মুসলমানেরা মুসলমান বলিয়া দাবী করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। ইহা কিছু নূতন কথা নহে।

আর, কেশবকেও এই ভাবের দ্বারা একেবারে গ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাবের দ্বারা গ্রস্ত ছিলেন বলিয়াই তিনি গৌরগোবিন্দকে দিয়া হিন্দুশাস্ত্র, প্রতাপচন্দ্রকে দিয়া খৃষ্টান শাস্ত্র, গিরীশচন্দ্রকে দিয়া মুসলমান শাস্ত্র, অঘোরনাথকে দিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র, এবং বিজয়কৃষ্ণকে দিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সাধন করিবার ভার তাঁদের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং নিজে সকলের মধ্যে মধ্যবিন্দু হইয়া ছিলেন। এই সব বিশেষত্ব আমরা রামকৃষ্ণ কিম্বা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে দেখিতে পাই না। কাজেই লেখক রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে দাবী উপস্থিত করিয়াছেন, তার কোন মূল্য আছে কি না সুধিগণ বিবেচনা করিবেন। তবে লেখক কেশবের সমন্বয়কে 'বস্তুতন্ত্রহীন' বলিয়াছেন। কেশবের সমন্বয়টা নাকি বুদ্ধির আর রামকৃষ্ণের সমন্বয় বোধির ও উপলব্ধির। "ইহা বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একত্রে জুড়িয়া এক নূতন সমন্বয় নহে। ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মসাধনার মধ্য দিয়াই যে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীই একই গন্তব্যস্থানে পরিণামে পৌছিতে পারেন, একই ব্রহ্মে মিলিত হইতে পারেন, তাহারি সাক্ষাৎ উপলব্ধি।" ইহা প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণের নয়, রামমোহন রায়েরই কথা; তবে একটু পার্থক্য আছে, তাহা এখানে পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক—প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মে মিলিত হইতে পারিবেন, কিন্তু সেই সেই ধর্ম্মের আবর্জ্জনাসকল সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া, সেইগুলিকে অটুট রাখিয়া নহে। বিবেকানন্দের মতে "শ্রুতিকে কোন বিশেষ মতবাদের সমর্থনের জন্য তিনি (রামকৃষ্ণ) ব্যাখ্যা করেন নাই। ক্রমবিকাশের ধারায়, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের এই তিনটি সোপান বা স্তরকেই একত্রে মানিয়া লইয়া তিনি বিভিন্ন মতপরিপোষক শ্রুতিবাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন।" এখানে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের, বিশেষভাবে Hegel এর thesis, antithesis, synthesis এর অতি স্পষ্ট গন্ধ পাওয়া যাইতেছে—যিনি দার্শনিক নন তাঁকে দার্শনিকরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা। কেশবের সমন্বয় যদি বস্তুতন্ত্রহীনই হয়—তবে রামকৃষ্ণের সমন্বয়—যদি নূতন কোন সমন্বয় তাঁর মধ্যে থাকিয়াই থাকে—কিরূপ বস্তুর সমন্বয় তাহা ত আমরা দেখিতে পাইতেছি না। আমরা ত এই বস্তুতন্ত্রের ভিতরে একমাত্র সনাতন হিন্দুতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সেই অবতার, সেই

পৌত্তলিকতা, সেই হোম ও ভোগ আরতি—সেই সনাতন সবই দেখিতেছি। এ সকলের মধ্যে বাস্তব সমন্বয়টা কোন্ খানে? সমন্বয়ের স্থানে দেখিতেছি সাধারণ সঙ্কলন—অসংখ্য অবতারের সঙ্গে আরো একটী অবতারের, অসংখ্য পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের সহিত আরো কতকগুলি ঐরূপ অনুষ্ঠানেরই যোগ মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, যদি সমন্বয়ের দাবী কোন সমাজ করিতে পারে তাহা একমাত্র ব্রাহ্মসমাজই পারে, আর কোন সমাজ তাহা পারে না—এপর্য্যন্ত আমরা তার কোনই প্রমাণ পাই নাই। এখনো ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজই প্রকৃত সমন্বয়ের অটল ভূমি হ'য়ে দাঁড়াইয়া আছেন। ধর্ম্মে, সমাজে, শিক্ষায়, দীক্ষায় সমন্বয়ই ছিল ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য সাধনের জন্যই সংস্কারের আবশ্যক হইয়াছিল। সংস্কারটা উপায় মাত্র। সংস্কার অর্থ সংশোধন। বিকৃতির সংশোধন করিয়া আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করার নামই সমন্বয়—ব্রাহ্মসমাজ তাহাই করিয়াছে। শুধু সংস্কার বলিয়া কোন সংস্কারে ব্রাহ্মসমাজ কখনো হাত দেয় নাই। তাই ব্রাহ্মযুগ শুধু একটা সংস্কারের যুগ নয়—বিশেষভাবেই ইহা সমন্বয়েরই যুগ। রামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা নূতন কোন সমন্বয় ত দেখিতে পাই-ই না, আর সংস্কারের ত কথাই নাই।

লেখকের মতে রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়াই নাকি অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণের জীবনে মহা পরিবর্ত্তন সংগঠিত হইয়াছিল। কেশব নাকি ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য করজোড়ে রামকৃষ্ণের কাছে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং এজন্য তিনি বিলাতী নজিরও উপস্থিত করিয়াছেন (ভট্ট ম্যাক্সমুলারের এক উক্তি); কিন্তু রামমোহন জনহিতকর কার্য্যে জেরেমী বেন্থামের অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী বলিয়া তাঁহারই নিকটে বিবেকানন্দ অপেক্ষাও খাটো হইয়া গিয়াছেন। ম্যাক্সমুলারের উক্তিটি যাহাই হউক, তাহা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ ইতিহাস। কেশব Behold the Light of Heaven in India এই সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতাটী ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারীতে প্রদান করেন, আর রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় ঐ সালের মার্চ্চ মাসে। আমি ভাবিয়াই পাই না যে, লেখক মহর্ষি ও শিবনাথকে বাদ দিলেন কেন? তাঁহারা ত তখনো খোসমেজাজে বহাল তবিয়তে বিদ্যমান ছিলেন এবং শিবনাথের প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগও ছিল। তাহা হইলে ত সব গোল একেবারেই চুকিয়া যাইত এবং ব্রাহ্মসমাজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লইয়া লেখককে কোন মুস্কিলেই পড়িতে হইত না—সমগ্র দেশ এই নূতন মহাবতারের পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা ত হয়ই নাই, বরং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রামকৃষ্ণের সহিত পরিচয়ের (১৮৭৫ খৃঃ) পরেই বিজয়কৃষ্ণ শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৮৭৮ খৃঃ) এবং কেশব আরো ভাল করিয়া নববিধান ঘোষণা করিলেন। আর এখন পর্য্যন্ত মেছুয়াবাজার কিম্বা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ব্রহ্মমন্দিরগুলি রামকৃষ্ণ-মঠে পরিণত হয় নাই, এবং শীঘ্র হইবার কোন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। ক্রমশঃ

শ্রীঅনঙ্গমোহন রায়।

ঢাকা জেলায় শতবার্ষিক মহোৎসব।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ঢাকা জেলায় দেড়-বৎসরব্যাপী মহোৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য একটি কমীটি গঠন করিয়াছেন। এই কমীটি যে ভাবে মহোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া তাঁহারা একখানা প্রাথমিক নিমন্ত্রণ-পত্র ঢাকা জেলার সকল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগীর নিকট প্রেরণ করিতেছেন। নিম্নে পত্রখানা উদ্ধৃত হইল:—

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

আপনি অবশ্য অবগত আছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের শত বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে ভারতব্যাপী এক মহা-মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। এই মহোৎসবের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি কালকাতার সমগ্রভারতীয় মহোৎসব-কমীটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব" নামক একখানা পুস্তিকায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তিকার এক খণ্ড আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি; অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিলে অতিশয় বাধিত হইব।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ সমগ্র ঢাকা জেলাকে ক্ষেত্র করিয়া দেড় বৎসরব্যাপী মহোৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য একটি কমীটি গঠন করিয়াছেন। এই কমীটি যে কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়াছেন, তাহা অপর পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে বিবৃত হইল। বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে শততম ভাদ্রোৎসবে আরম্ভ করিয়া ১৩৩৬ সালের মাঘ মাসে শততম মাঘোৎসবে এই মহোৎসব সমাপ্ত করা হইবে। এই সময়ের মধ্যে আর একটি ভাদ্রোৎসব, আর একটি মাঘোৎসব ও স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের দুইটি বার্ষিক উৎসব পড়িবে। এই সকল উৎসবকে শতবার্ষিক মহোৎসবের অঙ্গীভূত করিয়া শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত বিশেষভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজন; এ বিষয়ে সমাজ-কমীটিকে যথাসাধ্য সহায়তা করা মহোৎসব-কমীটির আকাঙ্ক্ষা। প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা হইলে অতিরিক্ত প্রচারক আনাইয়া ও অন্যান্য উপায়ে তাঁহারা ইহা করিতে ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক খণ্ড-উৎসবের বিস্তারিত কার্য্যপ্রণালী যথাসময়ে ক্রমে বিজ্ঞাপিত হইবে।

এই মহোৎসবে পারিবারিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে গৌরবান্বিত করা প্রত্যেক ব্রাহ্মধর্ম্মাশ্রিত ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী গৃহস্থের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য। মহোৎসব-কমীটি আশা করিতেছেন যে, উপরোক্ত দেড় বৎসর কাল মধ্যে প্রতি পরিবারে একটি কৃতজ্ঞতাসূচক আনন্দোৎসব শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন হইবে। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনাদিতে নিকটস্থ ও দূরস্থ প্রত্যেক পরিবারের পুরুষ নারী, বালক বালিকা, সুস্থ অসুস্থ, সকলের উপস্থিত হওয়া প্রায়ই সম্ভব হয় না; এই কারণেও পারিবারিক উৎসবের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। শত বৎসরে সমাগত এই মহোৎসবের আনন্দ ও উপকার হইতে একটি আত্মাও বঞ্চিত না হন, মহোৎসব-কমীটির ইহাই আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রয়োজন হইলে আচার্য্য ও গায়কের বন্দোবস্ত করিয়া এবং পরামর্শাদি দিয়া উক্ত প্রকার পারিবারিক উৎসবের সহায়তা করিতে ইচ্ছুক। মহোৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া ইহাকেও কার্য্যপদ্ধতিতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন ঢাকা জেলার মহকুমা-সহরগুলিতে ও গ্রামসমূহে যে সকল ব্রাহ্ম ও অনুরাগী বাস করেন, তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের সরল ধর্ম্মপিপাসু প্রতিবেশিগণকে মহোৎসবের অংশী করিবার উদ্দেশ্যে কমীটি ঐ সকল স্থানে ছোট ছোট উৎসব করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কার্য্যপদ্ধতিতে ইহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

কমীটি এই সকল বিষয়ে আপনার ও অপর সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। সকলের সহযোগিতা ভিন্ন এ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

বলা বাহুল্য, শতবার্ষিক মহোৎসব আমাদের জীবনে এই প্রথম; এবং ইহা এ জীবনে দ্বিতীয় বার আসিবে না। এই দুর্লভ সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার করা আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য-কর্ত্তব্য। এ উৎসব আমাদের অন্যান্য বার্ষিক উৎসবের ন্যায় কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয়-সম্ভোগের বস্তু নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে, পরিবারে, সমাজে ও দেশে তুলিয়া ধরিয়া, ইহার দাতা করুণাময় পরমেশ্বরের চরণে কার্য্যমূলক কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করাই এ উৎসবের বিশেষ উদ্দেশ্য। ইহার জন্য আমাদিগকে ত্যাগস্বীকার ও শ্রমস্বীকার করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য ত্যাগস্বীকারে ও শ্রমস্বীকারেই এ উৎসবের বিশেষত্ব। ব্রাহ্মধর্ম্মকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য দেড় বৎসর ধরিয়া প্রকাশ্যে বা গোপনে যিনি যাহা করিবেন, তদ্দ্বারাই এ উৎসবের প্রকৃত সফলতা হইবে। এ সফলতা পূর্ণমাত্রায় লাভ করিতে হইলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রিত ও অনুরাগী প্রত্যেক নর নারীর, এমন কি প্রত্যেক বালক বালিকার, উৎসাহ ও নিষ্ঠা জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। সকলের মিলিত উৎসাহ ও অনুরাগেই এ উৎসব আশানুরূপ ফলপ্রদ হইবে।

অতএব, আপনার নিকট মহোৎসব-কমীটির সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনি স্বয়ং এ উৎসবে কায়মনে যোগদান করিয়া, ও কমীটির প্রস্তাবিত কার্য্যসকলের সহায় হইয়া, তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত ও উৎসাহিত করিবেন; এবং আপনার পরিজনবর্গ ও বন্ধুবান্ধবদিগকে মহোৎসবের বিশেষ প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া ইহাতে যোগদান করিতে অনুরোধ করিবেন। এ উৎসব সকলের জন্য; সর্ব্বসাধারণ সাগ্রহে যোগদান করিয়া ইহাকে সফল করেন, কমীটির এই একান্ত বাসনা। নিবেদন ইতি

বিনীত নিবেদক

শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন } মহোৎসব-কমীটির সম্পাদক।

(ক) পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরে।

১৩৩৫, ভাদ্র—শততম ভাদ্রোৎসব। কার্ত্তিক—পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সম্মিলনীর সহিত, ও কলিকাতা হইতে আগত ভারত-ভ্রমণকারী (দেশীয় ও বিদেশীয়) ভক্তদলের সহিত মিলিত উৎসব। নির্দ্দিষ্ট দিন:—৪ঠা হইতে ৭ই কার্ত্তিক (২১-২৪ অক্টোবর, ১৯২৮ ইং)। অগ্রহায়ণ—পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব। মাঘ—বিশেষ মাঘোৎসব। ১৩৩৬, ভাদ্র—বিশেষ ভাদ্রোৎসব। অগ্রহায়ণ—পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব। মাঘ—শততম মাঘোৎসব। ১৩৩৫ ভাদ্র হইতে ১৩৩৬ মাঘ পর্য্যন্ত—প্রতি বাঙ্গালা মাসের প্রথম রবিবার, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণকামনায় বিশেষ উপাসনা।

(খ) পরিবারসমূহে

১৩৩৫ ভাদ্র হইতে ১৩৩৬ মাঘ পর্য্যন্ত—ঢাকা জেলার প্রত্যেক ব্রাহ্মধর্ম্মাশ্রিত ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী পরিবারে একদিন কৃতজ্ঞতাসূচক উৎসব। (প্রত্যেক পরিবার আপন সুবিধা অনুসারে ইহার দিন নির্ণয় করিবেন এবং আপন অবস্থা ও রুচি অনুসারে আয়োজন করিবেন। প্রয়োজন হইলে, মহোৎসব-কমীটি আচার্য্য ও গায়কের বন্দোবস্ত করিয়া এবং পরামর্শাদি দিয়া সহায়তা করিবেন)।

(গ) মহকুমা-সহরে ও গ্রামে

১৩৩৫ ভাদ্র হইতে ১৩৩৬ মাঘ পর্য্যন্ত—ঢাকা জেলার কোনও না কোনও মহকুমা-সহরে বা গ্রামে প্রতি মাসে একটি দুই-তিন দিনব্যাপী উৎসব। (ঐ সকল সহরে বা গ্রামে যাঁহারা বাস করেন, অথবা যাঁহাদের বাড়ী আছে, তাঁহাদের সহযোগিতায় মহোৎসব-কমীটি আচার্য্য, সঙ্কীর্ত্তনকারী, ছায়াচিত্রসংযোগে বক্তৃতাকারী প্রভৃতি সহ ন্যূনাধিক দশ জন উৎসবকারীর একটি দল পাঠাইয়া ইহা সম্পন্ন করিবেন।

মহোৎসব-কমীটির অন্যান্য প্রস্তাবিত কার্য্য।

(১) ঢাকা সহরের বিভিন্ন অংশে বালক বালিকাদিগের দ্বারা কয়েকটি সঙ্কীর্ত্তন-দল গঠন করিয়া, রাস্তায় রাস্তায় সঙ্কীর্ত্তন, সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে ভিক্ষাসংগ্রহ, ও ভিক্ষালব্ধ অর্থে বালকবালিকাদের দ্বারা স্বহস্তে দরিদ্রসেবার ব্যবস্থা। (২) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তকাদি প্রকাশ, বিক্রয় ও বিতরণ। (৩) পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের একখানি উৎকৃষ্ট ইতিবৃত্ত প্রকাশের ব্যবস্থা।

পরলোকগত শিবপদ দাস

আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর স্বর্গীয় শিবপদ দাস মহাশয় ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ১৩ই জুলাই, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের ২৮শে তারিখে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এঁড়িয়াদহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁহার প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়। এই পাঠশালা হইতেই মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। এই বৃত্তি পাওয়াতেই তিনি পাঠে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই নিয়ম ছিল যে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রেরা বিনা বেতনে যে কোন গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলে অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। তিনি সেই সুযোগ অবলম্বন করিয়া কলিকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি যথা সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া General Assembly Institutionএ প্রবেশ লাভ করেন এবং পরে সেই কলেজ পরিত্যাগ করিয়া রুড়কী (Roorkee) Engineering Collegeএ ভর্ত্তি হন। ইতি পূর্ব্বেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ

শ্রাদ্ধবাসরে পুত্রবধূ শ্রীমতী মৃণালিনী দাস কর্ত্তৃক পঠিত।

হইয়াছিল এবং তাঁহার পিতৃদেব দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পিতৃবৎসল সন্তান সেই সময়ে প্রাপ্ত বৃত্তির টাকা হইতে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। এই প্রকারে Engineering Collegeএর পাঠ সমাপন করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি সরকারী চাকুরী করিয়া ১৯০৫ খৃঃ অব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে অধিকাংশ অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর ন্যায় অলসভাবে ও নিরুদ্যমে জীবনযাপন করিতে দেয় নাই। তিনি পূর্ণ উৎসাহে ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনের সাফল্যের বিষয় সকলেরই বিদিত। এই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে মৃত্যুর অনধিক তিন বৎসর পূর্ব্বে স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় অবসর গ্রহণ করেন।

বাল্যকালে শিক্ষালাভ করিবার জন্য বহুদূর হইতে পদব্রজে বিদ্যালয়ে গমন করিতে হইত এবং গমনের পথও তৎকালে সুগম ছিল না। এই বিষয় তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে চির জাগরূক ছিল। তিনি সেইজন্য স্বগ্রামের স্কুলটির উন্নতির জন্য একখণ্ড ভূমিদান করেন এবং তৎপরে স্কুলের জন্য একটী সুবৃহৎ ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেন। স্কুলটী তাঁহার পিতার নামেই পরিচিত। এতদ্ব্যতীত যদি কখনও শুনিতে পাইতেন যে, অর্থাভাবে কোনও দরিদ্র ছাত্র অধ্যয়ন করিতে পারিতেছে না, তখন তাহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহা ছাড়াও অভাবগ্রস্ত অনেক লোকের অনেক সাহায্য তিনি নীরবে করিয়াছেন।

যখন তিনি কলেজে অধ্যয়ন করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতে দেশে ব্রাহ্মসমাজের খুব প্রভাব ছিল। সেই সময়ে অতি অল্প লোকই তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত মূর্ত্তিপূজার প্রতি শ্রদ্ধা চলিয়া গেল এবং যথাসাধ্য তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি সাক্ষাৎ ভাবেই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। রেঙ্গুন সহরে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইবার প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আনন্দের সহিত তাহা সমর্থন করেন এবং নির্ম্মাণকার্য্যে যথাসাধ্য নিজ শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করেন। তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল—প্রিয় ব্যবহার, কর্ম্মে দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ঈশ্বরে নির্ভর। এই সকল গুণ লইয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া দরিদ্রতা হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা ও কৃপার উপর তিনি চিরদিনই দৃঢ় ভাবে নির্ভর করিতেন এবং জগতে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, এই আন্তরিক বিশ্বাস তাঁহার গভীর ছিল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হন। গত বৎসর এই সময়ে অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন হয়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া একটু অবস্থান্তর লাভ করেন। এই ভাবে ভালমন্দ অবস্থার ভিতর দিয়া এক বৎসর অতিক্রম করিয়া, গত ৩১শে চৈত্র শুক্রবার দ্বিপ্রহরে তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

ভগবান তাঁহার স্বর্গস্থ আত্মাকে চিরমঙ্গলের পথে রক্ষা করুন। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি ওঁ।

প্রাপ্ত।

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসবে একশত বৎসরের ইতিহাসের আলোচনায় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে দেখাবার অনেক আছে। কোন ধর্ম্মসমাজের ইতিহাসে একশত বৎসরের মধ্যে এরূপ বিস্তৃতি, এরূপ মহাপুরুষগণের আবির্ভাব দেখা যায় নাই। কিন্তু গৌরব ও সফলতার পশ্চাতে যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তাহা উপেক্ষণীয় নয়। বিশাল ভারতে কয়েকটি স্কুল কলেজ ও কতকগুলি ব্রহ্মমন্দির স্থাপনে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হয় নাই। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন কতখানি ধর্ম্মানুমোদিত ও তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহাই দ্রষ্টব্য। তাহাতেই ব্রাহ্মসমাজের শক্তি স্ফুরিত হইয়া দেশের মধ্যে ব্রাহ্মজীবনের মূল্য বাড়াইবে। কিন্তু সেদিক দিয়া বড় একটা আশার বাণী শোনা যাইতেছে না। বঙ্গদেশে অনেক স্থানে সমাজগুলি প্রাণহীন, উৎসাহহীন, নীরবে কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া দণ্ডায়মান আছে। আসাম প্রদেশের ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় তেজপুর, নগাওঁ, গৌহাটি সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা নিয়মমত হইতে পারে না। ভারতের অন্যান্য স্থানে যে উপাসকমণ্ডলী আছেন, দুই এক স্থান ব্যতীত তাহাদের অবস্থাও আশানুরূপ নহে। উপাসনালব্ধ আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হইয়া কেন নবযুগে প্রভাব বিস্তার করিতেছে না, তাহা চিন্তা করিবার ও তদনুসারে উপায় অবলম্বন করিবার সময় আসিয়াছে। উৎসবের আনন্দের মধ্যে ইউরোপ আমেরিকা ও ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় যেন দেখিতে পায় যে, বিশ্বের কল্যাণ ও ভারতের মুক্তির মন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ সাধনা করিয়া পাইয়াছে। তাহা হইলে ব্রাহ্মজীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহা বলা যায় যে, সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মজীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। কেন করে নাই, সে অনেক কথা। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আমরা বাহিরের ব্যাপারগুলিকে যত বড় বলিয়া মনে করি, সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থার প্রতি তত গভীর মনোযোগ ও মূল্য দিই নাই। ব্যক্তিগত জীবনে ও পরিবারে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা অপেক্ষা আমরা প্রচার ও অনুষ্ঠানগুলির উপর অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছি। নীরবে একটি জীবন গঠিত করা অপেক্ষা মন্দির ও বক্তৃতামঞ্চ মুখরিত করার সাফল্যে আমরা অধিকতর উৎসাহিত হইয়াছি। তা ছাড়া আমাদের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যেও তারতম্য আছে। ঈশ্বরদর্শন ও উপলব্ধি, ঈশ্বরানুমোদিত কার্য্য সম্পন্ন করা, বিশ্বে তাঁর প্রকাশের মধ্যে মগ্ন হওয়া প্রভৃতি উপদেশের বিষয় থাকে। কিন্তু যে নৈতিক উন্নতি বিশ্বাস ও সম্যগ্ ধারণায় উপর ঈশ্বর-উপলব্ধি নির্ভর করে, ব্রাহ্মজীবনে সে

শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করি না। ফলে উপাসনা উৎসব, কন্‌ফারেন্সের আনন্দ ও উৎসাহে যে ক্ষণিক উপকার হয় তাহা স্থায়ী হয় না। এই জন্য বুদ্ধ যে অষ্ট সাধনমার্গের নির্দ্দেশ করেন তন্মধ্যে সম্যগ্‌ ধারণা অন্যতম। স্বরূপের সম্যগ্‌ ধারণার অভাবে ব্রাহ্মজীবনেও সংসারের সকল ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিয়া উঠে। উপাসনা ব্যতীত ঈশ্বরের স্বরূপের সহিত আমাদের পরিচয় হয় না। সামাজিক উপাসনাতে সকলের ঘনিষ্ঠ যোগ নাই, ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকে দৈনিক উপাসনা করেন না। এমন অবস্থায় একমাত্র উপায় আমার মনে হয় যে, ব্রাহ্মপরিবারে ৫।১০ মিনিটের জন্যও যদি ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাধুজীবনীপাঠ, সঙ্গীত, পরিবারস্থ সকলকে লইয়া একত্র বসিবার ব্যবস্থা করা যায়, তা হ'লে ব্রাহ্মজীবন ও ব্রাহ্মপরিবারগুলি মধুময় হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মজীবনের সৌরভে দেশের লোক ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হবে। সকল প্রচারক ও সমাজের পরিচালকগণ সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে ঐরূপ ব্যবস্থা সহজসাধ্য ও অবশ্যপ্রতিপালনীয় হইয়া উঠিবে।

শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা দাস, বি এ

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—বিগত ১৪ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত অনুপমচন্দ্র মৈত্রের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ফণ্ডে ১০৲, দান করিয়াছেন।

বিগত ১০ই জুলাই লক্ষ্ণৌ নগরীতে পরলোকগত নীলমণি ধরের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাঁহার পুত্রগণ সম্পন্ন করেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস তথায় গমন করিয়া, উপাসনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পুত্র শ্রীমান সর্ব্বরীকান্ত ধর পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় ৪০০ কাঙ্গালীকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে আর্য্যসমাজের অনাথাশ্রমের প্রায় ১২৫ বালক বালিকাকে ভোজন করান হয়। পুত্রগণ এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন:—সিটিকলেজ ১৫০৲, অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজ ২৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী প্রচার ফণ্ড (নীলমণিধর ফণ্ড) ২০০৲, ঐ প্রচার ফণ্ড ২৫৲, সাধনাশ্রম ২৫৲, দাতব্য বিভাগ ২৫৲, দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ফণ্ড ২৫৲, শতবার্ষিকী উৎসব ফণ্ড ২৫৲, মোট ৫০০৲ টাকা। উক্ত তারিখে ঢাকা নগরীতে কন্যা শ্রীমতী সরলা দত্ত কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে অনাথআশ্রমের বালক বালিকাদিগকে আহার করান হইয়াছে।

বিগত ২২শে জুলাই কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত সরোজকুমার দেবের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৫৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন।

ছাত্রীদের কৃতিত্ব—নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম—

ইংরাজী সাহিত্য (অনার্স)—রায়সাহেব প্রমোদারঞ্জন রায়ের কন্যা লীলা রায় (১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করিয়া), লিলি সেন (১ম বিভাগে ৫ম) কৃষ্ণা লীনা (১ম বিভাগে ৬ষ্ঠ)।

দ্বিতীয় বিভাগ—এনিমুখার্জ্জী, ভায়োলেট রাওক্লিফ, এলিস আক্‌ওয়ার্থ, ক্যাথরীন্ নাহাপিট্, দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়, সুধা ঘোষ, গ্ল্যাডিস্ ওয়েষ্ট, এগ্‌নিস্ স্বরূপগৌর। সংস্কৃত সাহিত্য—সুরমা মিত্র (১ম বিভাগে ১ম), শশীমুখী লাহিড়ী (২য় বিভাগে)। কল্যাণী দাস (দর্শনশাস্ত্রে ২য় বিভাগে)। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ঘোষের কন্যা শান্তিসুধা ঘোষ (অঙ্কশাস্ত্রে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করিয়া; তাহা ছাড়া সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম স্থান অধিকার করাতে ঈশান বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।)

কৃতিত্বের সহিত—সান্ত্বনা বসাক, তুহিনিকা চট্টোপাধ্যায়, শোভনা চৌধুরী, অরুণা দাস, কমলা দাস গুপ্তা, জয়খান ধর্ম্মশ্বেতা, এস জি লুথার, মেরী নিকোলাস্, গ্ল্যাডিস্ সেইন।

পাশকোর্স—বকুল দেশপাণ্ডে, রত্নাবলী বেজবড়ুয়া, বনলতা চট্টোপাধ্যায়, তড়িৎলতা দাস, সরস্বতী দাসগুপ্ত, সুমতী দাসগুপ্ত, লীলাবতী দত্ত, নীহারনলিনী দত্ত, সুপ্রভা দত্ত, শান্তিময়ী ঘোষ, মনোরমা গুহ, জয়ন্তী গুপ্ত, বেগ হাডসান্, জয়নাল রহিম, প্রিয়লতা কাকুতী, সুলতা কর, হায়া ল্যাজারাস্, মা মি, সুধা মজুমদার, অরুণা নাগ, ভায়োলেট নিরুপমা রায়, ললিতকুমারী সাঁতরা, বাসন্তীরাণী সান্যাল, সুলেখা সেন, বনলতা সেনগুপ্তা,

শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরীর তৃতীয়া কন্যা সুজাতা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ এম্ বি বি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

ছাত্রীদের বৃত্তি—নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইস্কুল পরীক্ষায় নিম্নলিখিতরূপ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন—উষাবালা সেনগুপ্ত ২০৲, প্রতিভাময়ী গুপ্ত ১৫৲, শৈলবালা সেনগুপ্ত ১০৲, এবং সুধারাণী রায় ১০৲। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় লাবণ্যলতা সেনগুপ্ত ও প্রতিভাময়ী চন্দ ২০৲, বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ নিম্নলিখিতরূপ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন:—২০৲ টাকার বৃত্তি—অপরাজিতা ঘোষ, শান্তি রায়। ১৫৲ টাকার—উষাবালা দাস গুপ্ত, ফুলরাণী গুহ, সুপ্রভা দত্ত, ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়, মোসাম্মৎজিব্‌জাদা রোকেয়া কোমার সুলতান। ১০৲ টাকার—নলিনীবালা পাল, রেণুকণা সেন, পূর্ণিমা বসাক, উষা দাসগুপ্ত, আইরীণ খাঁ, পারুলবালা গুপ্ত, সুধাংশু গুপ্ত, সাবিত্রী নিয়োগী, বেলা দাসগুপ্ত, নীলিমা মিত্র।

নামকরণ—বিগত ২২শে জুলাই লক্ষ্ণৌ-সহরে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্তের দুই কন্যার নামকরণ সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রথমা কন্যার নাম রত্নাবলী ও তারা এবং দ্বিতীয়া কন্যার নাম রঞ্জনা ও অপর্ণা রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ৫৲ টাকা দান প্রতিশ্রুত হইয়াছে। মঙ্গলময় পিতা শিশুদিগকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

দান—ভবানীচক নিবাসী শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ দিন্দা পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাঁথি ব্রাহ্মসমাজে ৪৲, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে ২৲, সাধন আশ্রমে ২৲, মোট ৮৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুখবিন্দু মুখোপাধ্যায় মাতা বিরজাসুন্দরী মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশ বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জেনারেল ফণ্ডে ২৲, দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীপতিনাথ দত্ত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এ সমস্ত দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা সকল চিরশান্তি লাভ করুন।

জাতকর্ম্ম—গত ২৫শে জুন গিরিডিতে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দাসের প্রথমা কন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে উপাসনা হয়। কন্যার মাতামহ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ উপাসনার কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে শিশুর মাতামহী স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে ১৲ দান করিয়াছেন। বিধাতা শিশুকে কল্যাণের পথে রক্ষা করুন।

সিটিকলেজ ফণ্ড—সিটিকলেজের জন্য আরও নিম্নলিখিত দান প্রতিশ্রুত ও প্রদত্ত হইয়াছে জানিয়া আমরা সুখী হইলাম:— (প্রতিশ্রুত) মেসার্স ডি, জি, বৈদ্য ৩০০৲, পি, রামস্বামী ১০০৲, পরলোকগত নীলমণি ধরের পুত্রগণ ১৫০৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত ১০০৲, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ ১০০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ ১০০৲, ডাঃ বি এম, গুপ্ত ২০৲, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় ৫৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দে ১৲, কুমারী স্নেহশোভনা গুপ্ত ১০০৲, ডাঃ বি এল চৌধুরী ১০০৲, D. S. B. ১০০৲ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ ১০০৲, কুমারী আশালতিকা হালদার ১০০৲, শ্রীযুক্ত হিমাংশুমোহন বসু ১০০৲, ডাঃ বিজলীবিহারী সরকার ১০০৲, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাসগুপ্ত ১০৲। (প্রদত্ত) শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল (১ম কিস্তি) ২৫৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন ১০০৲, শ্রীযুক্ত বেণী-মাধব দাস (১ম কিস্তি) ২৫৲, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু (১ম কিস্তি) ১০৲, শ্রীযুক্ত অজিতমোহন সেন (১ম কিস্তি) ৫০৲ শ্রীযুক্ত শীতিকণ্ঠ মল্লিক ১০৲, ডাঃ কুমারী এস্ ঘোষ ১০০৲, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন ১০০৲, শ্রীযুক্ত অরুণনাথ চক্রবর্ত্তী ১০০৲, শ্রীযুক্ত জয়ন্ত রাও ১০০৲, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ ১০০৲ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র আচার্য্য (পুরাতন ছাত্র) ১০৲।

কালীঘাট প্রার্থনা সমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালীতে কালীঘাট প্রার্থনা সমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ২১শে জুন উৎসবের উদ্বোধন; আচার্য্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু। ২৬জুন সন্ধ্যায় উপাসনা ও সংকীর্ত্তন, আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭শে জুন প্রাতে উপাসনা ও সংকীর্ত্তন, আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস; তৎপরে প্রীতিভোজন। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে আলোচনা। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা উপস্থিত করেন; অনন্তর শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ উহাতে যোগদান করিয়া প্রস্তাব শেষ করেন। সন্ধ্যায় উপাসনা ও সংকীর্ত্তন আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ।

মহিলাদিগের নবদ্বীপ চন্দ্রস্মৃতি ভাণ্ডার—মহিলাদিগের নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারের সম্পাদিকা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন :—

শ্রীমতী পুণ্যলতা রায় ৬৲, শ্রীমতী সরলা দেব ৫৲, শ্রীমতী শৈলবালা চক্রবর্ত্তী ৫৲, লেডি বসু ১০৲, শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দাস ৬৲, শ্রীমতী মীরা চৌধুরী ৫৲, শ্রীমতী সান্ত্বনা ব্যানার্জ্জি (২য় দফা) ২৲, শ্রীমতী প্রমীলা দেবী (২য় দফা) ২৲, শ্রীমতী জ্ঞানদা মজুমদার ২০৲, শ্রীমতী অমিয়া সরকার ১৲, শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক বিক্রয় (৩য় দফা) ২৲, মোট ৬৪৲, পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০৫৭৵০ সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৪,১২১৵।

টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালীতে টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের সপ্তত্রিংশ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

২১শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় উদ্বোধন-সূচক উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। ২২শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়; অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার পর আলোচনা ও প্রার্থনা; সন্ধ্যায় মহর্ষি নারদের জীবনী সম্বন্ধে কথকতা। শ্রীযুক্ত বরদা-প্রসন্ন রায় প্রার্থনা ও কথকতা করেন। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ রায়; অপরাহ্ণে বালক বালিকা সম্মিলন। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহ আমোদজনক গল্পচ্ছলে উপদেশ দেন; বালিকাগণ সঙ্গীত করে। সন্ধ্যায় টাউন হলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র "ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ সম্পাদকের গৃহে প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্ণ ৪টার সময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রার্থনা করেন।

উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ—উল্টাডাঙ্গা ব্রহ্মমন্দিরের এবং আশ্রমের প্রাঙ্গণ বাঁশের বেড়া দ্বারা ঘিরিবার জন্য শ্রীযুক্ত শশাঙ্কনারায়ণ দাসগুপ্ত ১৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শতবার্ষিক উৎসবের কার্য্য প্রণালী—১২৩৫ সালের ৬ই ভাদ্র মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা নগরীতে একমাত্র সত্যস্বরূপ নিরাকার পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা প্রবর্ত্তন করেন। তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকগণ অবগত আছেন, যে আগামী ৬ই ভাদ্র হইতে ১২৩৬ সালের মাঘ মাস পর্য্যন্ত নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইবে। আগামী ২রা ভাদ্র ১৮ই আগষ্ট হইতে ১০ই ভাদ্র ২৬শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতায় রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনাপ্রতিষ্ঠার শতবার্ষিক উৎসবের দিন ধার্য্য হইয়াছে। আমাদের একান্ত বাসনা এবং ব্যাকুল চেষ্টা যে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী সকল নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। নানা স্থানে অবস্থিত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাইভগিনীগণের নিকটে উৎসবের সাদর নিমন্ত্রণ পাঠাইতে চেষ্টা করা হইতেছে; কিন্তু আমাদের আগ্রহ ও চেষ্টা সত্ত্বেও ভয় হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এমন অনেকে থাকিয়া যাইবেন যাঁহাদের কাছে বাচনিক বা পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিতে পারা যাইবে না। এইজন্য তত্ত্বকৌমুদীর সাহায্যে সকল ভাই ভগিনীদিগকে এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য ব্যাকুল ও সাগ্রহ অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা সকল দোষত্রুটি উপেক্ষা করিয়া এই মহোৎসবে যেন যোগ দান করেন। মহোৎসব সকলের জন্য, ইহা ভগবানের আহ্বান। আশা করি, সকলেই এইভাবে যোগদান করিবেন। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিতে পারিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ এবং উৎসবের সার্থকতার জন্য যেন প্রার্থনা করেন। মফঃস্বল হইতে সমাগত যে সকল ভাইবোনের জন্য বাস ও আহারের ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আগামী ৭ই আগষ্টের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণ করিবেন। নিম্নে উৎসবের কার্য্যপ্রণালী প্রদত্ত হইল।

২রা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট) শনিবার সন্ধ্যায়—প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা। ৩রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট) রবিবার, প্রাতে—উপাসনা। অপরাহ্ণে ধর্ম্মসভা; সন্ধ্যায় উপাসনা। ৪ঠা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট) সোমবার, প্রাতে—ইংরাজীতে উপাসনা; সন্ধ্যায় বক্তৃতা। ৫ই ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) মঙ্গলবার, প্রাতে—উপাসনা ও আলোচনা; সন্ধ্যায়—নগর সংকীর্ত্তন। ৬ই ভাদ্র ২২শে আগষ্ট) বুধবার প্রাতে—উষাকীর্ত্তন ও উপাসনা। সন্ধ্যায় উপাসনা। ৭ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) বৃহস্পতিবার, প্রাতে—উপাসনা ও আলোচনা, সন্ধ্যায়—বক্তৃতা। ৮ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট) শুক্রবার, প্রাতে—উপাসনা ও আলোচনা; অপরাহ্ণে মহিলাদের সভা। ৯ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট) শনিবার প্রাতে উপাসনা ও আলোচনা; সন্ধ্যায়—সান্ধ্যসম্মিলন। ১০ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট) রবিবার, প্রাতে—উপাসনা; মধ্যাহ্নে ১টা—৩৷০ ঘটিকা পর্য্যন্ত যুবক সম্মিলন; অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়—বালক বালিকা সম্মিলন। সন্ধ্যায় উপাসনা।

২১০।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা } বিনীত শ্রীহেমচন্দ্র সরকার।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৬ই শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ৯ম সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯ — 17th August, 1928. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ — অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে প্রেমময় জীবনবিধাতা, তোমার অসীম প্রেমে ও স্নেহে তুমি আমাদিগের জন্য তোমার পবিত্র ধর্ম্মের শতবার্ষিক উৎসব উপস্থিত করিয়াছ। তুমিই জান আমরা কি রূপ ভাবে তোমার উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। তুমি আমাদিগের নিকট যে মহান্ আদর্শ উপস্থিত করিয়াছ, আমরা ত তাহার অনুরূপ জীবন কিছুই যাপন করিতে পারি নাই! তুমি জীবনে যে অসংখ্য কৃপা প্রদর্শন করিয়াছ, আমরা ত তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারি নাই! আজ নানা দিক দিয়া আমাদের দৈন্যই অনুভব করিতেছি! আজ যে আমরা পূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে আনন্দও করিতে পারিতেছি না! তোমার দয়ার কখনও অভাব হয় নাই। আমাদের প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের জীবনে তাহার অনেক পরিচয় দিয়াছ। কিন্তু এত পাইয়াও আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার হইতে পারিলাম না! হেলায় বহু সুযোগ হারাইলাম—ক্ষুদ্র হইয়াই পড়িয়া রহিলাম! তাই আমাদের প্রাণে আবার নূতন আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প জাগাইবার জন্য এই উৎসব উপস্থিত করিয়াছ। তুমি আর আমাদিগকে এই সুযোগ হারাইতে দিও না। তুমি আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা সকলই জান। তুমি ভিন্ন আর কে আমাদিগকে বল ও শক্তি দিতে পারে? তোমার কৃপা ভিন্ন আমাদের অন্য কোনও সম্বলই নাই। তুমি আমাদিগকে তোমার করিবার জন্য নিয়ত নানা আয়োজন করিতেছ জানি। আমাদের উদাসীনতা ও অবহেলা দ্বারা তাহা কত ব্যর্থ করিতেছি তুমি দেখিতেছ। আর আমাদিগকে তোমার মঙ্গল ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে দিও না। আমাদের সকল বিরোধিতা তুমিই দূর করিয়া দেও। তুমি আমাদিগের মধ্যে নব জীবন সঞ্চার কর। আমরা নূতন শতাব্দীতে নূতন ভাবে নূতন পথে চলি। তোমার পবিত্র ধর্ম্মকে জীবনে গৌরবান্বিত করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। আমাদের সকল জীবনে উৎসব সফল হউক। তোমার পূর্ণ রাজত্ব ও কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার পবিত্র ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

শত বার্ষিকী—ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজ কত ভাব প্রাণে জাগ্‌ছে! কোথায় ছিলাম কোথায় এসেছি! জীবনের উষাকালে কি ডাক শুনেছিলাম, কি আনন্দের গান ধ্বনিত হয়েছিল, কি মধুর আহ্বান এসেছিল! প্রাণ মেতে উঠ্‌ল, তাই সব ছেড়ে ছুটে এলাম। কত দুঃখ, কত বেদনা, কত সংগ্রাম বরণ ক'রে নিলাম! প্রভু নূতন দৃষ্টি দিলেন, নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগালেন, নূতন পরিত্রাণের বার্ত্তা শুনালেন। নূতন বন্ধু পেলেম, নূতন গুরু, নূতন শাস্ত্র, নূতন সঙ্ঘ পেলেম। কত আশা প্রাণে জাগ্‌ল! আজ প্রাণ কৃতজ্ঞতা-ভরে অবনত হতেছে। তিনি হাত ধ'রে নিয়ে চলেছেন, তপ্ত হৃদয় শীতল কচ্ছেন। কত ব্যথা দূর ক'রে দিয়েছেন! কত মরুভূমিতে নূতন নূতন উৎস উৎসারিত হয়েছে, কত শুষ্ক হৃদয় সরস হয়েছে; কত মৃত প্রাণ জেগে উঠেছে! আজ তোমার করুণার সাক্ষ্য দেই; আজ তোমার মহিমার গাথা গান করি। আজ দূরে যে সে নিকটে আসুক, পর যে সে আপনার হউক। শত্রু কেহ থাকবে না, অপ্রেম থাকবে না, পাপ কুসংস্কার থাকবে না। সকলে মিলে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে, প্রভুর নাম নিয়ে, তাঁরই চরণে পড়ে থাকি।

কোন্ পথে আমাকে নিবে—তুমি যে আমাকে চাও, তুমি যে আমার জন্য ব্যস্ত, তা ত জানি; কিন্তু কোন্ পথে যে তুমি আমাকে নিবে, কোন্ দ্বার দিয়ে যে তুমি আস্‌বে, তা ত আমি জানি না। আমি একটা সঙ্কল্প করি, একটা আদর্শ রচনা করি, একটা কল্যাণের পথ খুঁজে বাহির করি; ভাবি, এই পথই প্রকৃত পথ; এই পথেই তুমি আস্‌বে, আমাকে নিয়ে যাবে। তুমি তাহা ভেঙ্গে দাও; সে পথ রুদ্ধ ক'রে দাও। আমি যে কল্যাণের পথে চলি, ভাবি, এতে তোমার সায় আছে, এ সঙ্কল্প আমার সিদ্ধ হবে। কিন্তু তা ত সব সময়ে হয় না; পরাজয়ের পর পরাজয়, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা আসে। দেশের ও দশের কল্যাণকামনায় কত শুভ প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুল্‌তে চেষ্টা করি! কিন্তু সব সময় ত তাতে সিদ্ধি দাও না; আমার আশা কামনা ভেঙ্গে যায়। তুমি ঐ ব্যর্থতার ভিতর দিয়াই আমাকে চাও; ঐ যে কল্যাণ ইচ্ছা সিদ্ধ হলো না, সেই বিফলতার দ্বার দিয়াই তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে চাও। তাই আজ ব'সে ব'সে ভাবি, তুমি কোন্ পথে আস্‌বে, কোন্ প্রণালীতে আমাকে তোমার ক'রে নেবে। তুমি যা করবে আমার তাতেই আনন্দ।

চিন্‌তে পার নাই—আজও ভাইকে ভাই ব'লে চিন্‌তে পার নাই। আজও তোমাদের দৃষ্টি খোলে নাই। বাহিরের আচরণ দেখেই—ব্যবহারে একটু বাধা পেয়েছ, একটু কঠিনতা লক্ষ্য করেছ—তাই তাকে আপনার জন ব'লে ধরতে পার নাই। নারিকেলের ছোবড়া ও খোলা দেখে ভয় পেয়েছ, ভিতরে যে শাঁস আছে, শীতল জল আছে, তার সন্ধান পাও নাই। যে এসেছে তার বহিরাচরণ দেখে তোমরা তাকে দূর ক'রে দিয়েছ, শত্রু ব'লে পরিত্যাগ করেছ। একবার দৃষ্টি উজ্জ্বল কর, প্রেমের অঞ্জন চোখে পর, উদার ভাবে দেখ, দেখ্‌বে বাহিরের কর্কশতার পশ্চাতে কি কোমল ভাব! বাহিরের মলিন বসনের পশ্চাতে শুভ্র পরিচ্ছদ। ভিতরটা দেখ, দেখ্‌বে, সে পর নয়, সে শত্রু নয়; সেও তোমার প্রিয়জন, সে একটু প্রতিকূলতাচরণ করে ব'লে ভুল করো না; সে তোমার ভাই, সে তোমার আপনার লোক। ভুল করো না; তোমার কাজে বাধা দেয় ব'লে দূরে ঠেলে দিও না। দৃষ্টি সতেজ কর, উদার কর, প্রেমপূর্ণ কর, কেহ পর থাকবে না, আপনার জনকে চিন্‌তে পারবে।

সম্পাদকীয়।

উৎসব কিসে সফল হইবে—যে দিনের জন্য আমরা দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, অবশেষে তাহা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা কে কিরূপ আয়োজন লইয়া উৎসবদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে তাহা যে যথেষ্ট নয়, সে কথা সহজেই বলা যায়। আর, যথেষ্ট হইলেও, শুধু তাহাতেই উৎসব সফল হইবে, এরূপ মনে করিলে আমরা মহা ভ্রমেই পতিত হইব। আমাদের আয়োজন যতই পূর্ণ হউক না কেন, শুধু তাহার উপর নির্ভর রাখিলে আমরা কখনও সফলতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের আয়োজনের যতই প্রয়োজনীতা থাকুক না কেন, ব্রহ্মকৃপা ব্যতীত অপর কিছুর উপর নির্ভর রাখিতে গেলে যে সে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং উৎসবকে সফল করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মকৃপা ব্যতীত অপর কিছুর উপর নির্ভর সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অকিঞ্চন না হইলে আমরা কিছুতেই উৎসবদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিব না—সে রাজ্যে অহঙ্কারীর কোনও স্থান নাই। কিন্তু আপনার উপর নির্ভর না থাকিলেই যে সকল সময় ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর থাকে তাহা বলা যায় না। কোনও কোনও সময় এরূপও ঘটে যে, কিছুর উপরই নির্ভর নাই, কোনও আশার স্থলই নাই। এরূপ অবস্থা নিতান্তই সঙ্কটজনক। সুতরাং আমরা যাহাতে কিছুতেই ব্রহ্মকৃপার উপর আশা ও নির্ভর না হারাই, সে বিষয়ে সর্ব্বদাই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা যে ভাবে উৎসব সম্ভোগ করিতে চাই, আনন্দ ও উচ্ছ্বাস পাইতে চাই, ঠিক সেইরূপ না ঘটিলেই যদি আমরা নিরাশ হইয়া পড়ি, ব্রহ্মকৃপার অভাব ঘটিয়াছে মনে করি, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, তাঁহার উপর আমাদের প্রকৃত আশা ও নির্ভর নাই। তাঁহার উপর নির্ভর থাকিলে, তিনি যে ব্যবস্থাই করুন না কেন, তাহাই কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—তাঁহার হাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে হইবে। পূর্ণ আত্মসমর্পণ না থাকিলেই বুঝিতে হইবে লুক্কায়িত ভাবে আত্মনির্ভর রহিয়াছে, অহঙ্কার অন্তরের ভিতরে কার্য্য করিতেছে। কাজেই তিনি যে ভাবেই উৎসব সম্ভোগ করান না কেন, তাহাই মঙ্গলকর জানিয়া তাঁহার সকল ব্যবস্থাই মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। আবার, উৎসবের মূল লক্ষ্য ভুলিয়া অবান্তরকে যদি প্রধান স্থান দেই, তবে যে কিছুতেই উৎসব সফল হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং যাহাতে আমরা প্রধান লক্ষ্যটি হারাইয়া না ফেলি, সে বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহার পর, পাওয়া অপেক্ষা দেওয়াই যে এই উৎসবের বিশেষ লক্ষ্য, এ কথা ভুলিয়া গেলে উৎসব কোনও প্রকারেই সফল হইতে পারিবে না। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা পাইয়াছি তাহার জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া, যদি যাহা পাই নাই তাহার জন্য অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হই, তবে যে আমরা সত্য ও পূর্ণ কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে পারিব না, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সকল দাবী পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, যতটুকু পাইলাম তাহাই আমার যোগ্যতা বা দাবীর অতিরিক্ত, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, এরূপ ভাব না থাকিলে, পূর্ণ কৃতজ্ঞতা জন্মিতে পারে না। আর, শুধু কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে পারিলেই যে উৎসব পূর্ণরূপে সফল হইল, তাহাও নহে। কৃতজ্ঞতাটা শুধু কথায় ও ভাবে থাকিলেও যথেষ্ট হইল না। উহা জীবনে ও কার্য্যে প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক—অর্থাৎ জীবন যদি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত না হয়, তবে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের কোনই মূল্য থাকে না, উহা জীবনের বাহিরেই থাকিয়া যায়। এই জন্যই জীবনের পরিবর্ত্তনসাধন, নূতন কিছু হইয়া যাওয়া, জীবনবিধাতার অনুগত সন্তান ও সেবক হইয়া যাওয়াকেই, আমরা উৎসবের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ

করিয়াছি। সেই লক্ষ্যকে ভুলিয়া উৎসবের মধ্যে অপর কিছু খুঁজিলে যে উৎসব ব্যর্থ হইবে, কিছুতেই সফল হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অপর সকল পাওয়াই ইহার নিকট তুচ্ছ। জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠতম ও প্রধানতম লক্ষ্য তাহাই যদি সিদ্ধ না হয়, যাহাতে মানবজীবনের সার্থকতা, আমাদের প্রকৃত কৃতার্থতা, তাহাই যদি সাধিত না হয়, তবে যে সবই বৃথা! কাজেই আমরা কি পরিমাণে তাঁহার হইতে পারিতেছি, আপনাদের ইচ্ছা অভিরুচি কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হইতেছি, তাহাই প্রধান ভাবে দেখিতে হইবে। উৎসবের মধ্যে সকল বিষয়ে যদি আমাদের সে দৃষ্টি থাকে, তবে সকল অবস্থায়ই তাঁহার কৃপা, তাঁহার মঙ্গল ব্যবস্থা দর্শন করিতে পারিব এবং যাহা কিছু আসিবে সমস্তই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারিব, তাহার মধ্যেই কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে পারিব—অভিযোগের বিন্দুমাত্র কারণও আর থাকিবে না। এরূপ অবস্থায় যে আমাদের আশা ও আনন্দ কিছুতেই বিনষ্ট হইবে না, উৎসাহ উদ্যম কোনও প্রকারে খর্ব্ব হইবে না, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, কোনও বিষয়েই আর উৎসব বিফল হইবে না—সর্ব্বপ্রকারেই উহা সফল হইবে। আমাদের মধ্যে যে একটা উদাসীনতা ও অবসন্নতা লক্ষিত হইতেছে, এই উৎসবের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইবে এবং আমরা নূতন শতাব্দীতে নূতন উৎসাহ ও বলে সঞ্জীবিত হইয়া, নূতন ভাবে জীবনপথে অগ্রসর হইতে ও জীবন-বিধাতার কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইব। উৎসবে প্রেমময়ের করুণাধারা প্রচুর পরিমাণেই বর্ষিত হইবে। আমরা যাহাতে সেই কৃপা-স্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দিতে পারি, আপনাদের দোষে এরূপ মহাসুযোগ না হারাই, সেই বিষয়ে সকলকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। সুতরাং আমরা যেন তাঁহারই কৃপার উপর পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া, আশা ও বিশ্বাসের সহিত উৎসবদ্বারে প্রতীক্ষা করি, আপনাদিগকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই হাতে অর্পণ করি। আমাদের প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের জীবনে তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। আমরা তাঁহার অনুগত জীবন লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। উৎসব যথার্থরূপে সফল হউক।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকীর সম্মুখে।*

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ আমাদের প্রাণে কত কথা জাগ্রত হইতেছে! এই শত বৎসরে ভারতে যে এক নব যুগ আসিয়াছে, তাহাতে দেশের ধর্ম্ম নীতি সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি কত বিষয়ে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে কি নূতন আদর্শ আসিয়াছে! কি এক নূতন মন্ত্র পাইয়া ভারতবাসী নবীন উৎসাহে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে! ১৮২৮ সালের ৬ই ভাদ্র মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ঋষির দৃষ্টিতে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের আদর্শ দর্শন করিয়া, এক নিরাকার অদ্বিতীয় সত্য জ্ঞান প্রেমের আধার পরব্রহ্মের সাক্ষাৎভাবে প্রেম ভক্তি দ্বারা আধ্যাত্মিক পূজার যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং সেই দিন সমবেত ভাবে যে উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে এক নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছে। আজ ব্যক্তিগত ভাবে ঐ দিনের জন্য প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই ধর্ম্মের কৃপায় কত ভক্ত, কত সাধু সাধ্বী, কত জ্ঞানী, কত কর্ম্মী, কত যোগযুক্ত গুরু পাইয়াছি, যাহাদের চরণে ব'সিয়া কত অনুপ্রাণনা লাভ করিতেছি! আমরা যে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম পাইয়াছি, তাহাই স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি। মানুষ যে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন, মানুষ যে এক ঈশ্বরেই প্রীতি রাখিয়া তাঁহারই প্রেমপ্রেরণায় মানবের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবে, এই মহান্ আদর্শ পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এই ধর্ম্মের আলোকে কত পতিত উদ্ধার পেয়েছে! কৃপাময় প্রেমের দেবতা কত নিরাশ প্রাণে আশা দিয়াছেন, কত দুর্ব্বলকে সবল করিয়াছেন! যে পাপে পড়েছিল, যাকে সমাজ বক্ষ হ'তে দূর করিয়া দিয়াছিল, তাকে হাত ধরে তু'লে আচার্য্যের আসনে বসায়েছেন; যে অশিক্ষায় কুশিক্ষায় পাপ ও কুসংস্কারে ডুবে ছিল, তাকে তু'লে অমরগণের সঙ্গে মিলিত করেছেন। আজ সঙ্গীতের একটি পদ বার বার স্মরণ হইতেছে—

> গভীর পাপবিকারে নিরাশার আঁধারে
> কত জীবনের ভাতি হ'তেছিল নির্ব্বাণ;
> তুমি যে প্রাণ পরশিয়ে, প্রীতি-ফুল ফুটাইয়ে,
> কুসুমকানন-শোভা রচিলে শ্মশানে।

বাস্তবিকও আজ কত নিরাশ প্রাণে আশা জাগিয়াছে, কত মৃত প্রাণে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, কত শ্মশানে কুসুমকাননশোভা রচিত হয়েছে! জীবনের সেই উষাকালে তিনি ডেকেছিলেন, নিরাশায় আশা জাগ্রত করেছিলেন,—আমি তাঁকে চাই নাই, তিনি চেয়েছিলেন। তিনি কত করুণা করেছেন, কত প্রেম ঢেলে দিয়েছেন, তা স্মরণ ক'রে আজ বার বার তাঁকে প্রণিপাত করি। এইরূপ কত জনকে হাত ধ'রে তিনি এনেছেন! ওগো ভাই বোন সকল, আজ স্মরণ কর, প্রেমময়ের প্রেমের কথা স্মরণ কর; তাঁর করুণার সাক্ষ্য দাও, ব্রাহ্মধর্ম্মের পারত্রাণপ্রদ বার্ত্তা পেয়ে, মুক্তির সমাচার পেয়ে তোমরা কোথা হ'তে কোথায় এসেছ, আজ তার কথা বল। তাই বলি, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ মনে হয়, কত মানুষ দেখিলাম, কত ভক্তসঙ্গে মিলিত হইলাম, পাপীর নবজীবনলাভের কত দৃষ্টান্ত দেখিলাম, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর করুণা, তাঁর অযাচিত প্রেমের কত পরিচয় পাইলাম, আজ সে সমস্ত স্মরণ করি, আর ভক্তিভরে প্রণাম করি। তাই আবার বলি—

> গভীর পাপবিকারে, নিরাশার আঁধারে
> কত জীবনের ভাতি হতেছিল নির্ব্বাণ;
> তুমি সে প্রাণ পরশিয়ে প্রীতি-ফুল ফুটাইয়ে,
> কুসুমকানন-শোভা রচিলে শ্মশানে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,

---

* ৫ই আগষ্ট সায়ংকালীন উপাসনাতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস কর্তৃক ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত।

তাহার মূল মন্ত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একটি সূত্রে বিবৃত করিয়াছেন; তাহা এই "তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব", তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রীতিপ্রেরণায় তাঁরই কার্য্যসাধন—ইহাই উপাসনা। এই উপাসনাতে তিনি ও তাঁর পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ সকলকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। এই উপাসনাতেই ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ, এই উপাসনাতেই ব্যক্তিগত উন্নতি, দেশের উন্নতি, মানবের উন্নতি। এই উপাসনা কি? এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে প্রীতি—সত্য প্রেম ও পুণ্যের প্রস্রবণ পরম দেবতা যিনি, অন্তর ও বাহির যিনি পূর্ণ করিয়া আছেন, তাঁকে প্রীতির সহিত অর্চনা কর; একান্তে ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁর চরণে বস; বাহ্যিক উপকরণে নয়, পুরোহিতের মধ্যবর্ত্তিতাতে নয়, স্বয়ং প্রেম ভক্তির অঞ্জলি তাঁর চরণে অর্পণ কর। তাঁর করুণার কথা, তাঁর প্রেমের কাহিনী চিন্তা কর। তাঁহাতে আত্মা মন সমর্পণ কর, তাঁর নাম জপ কর। কর তাঁর নাম গান, কর তাঁর নাম গান", 'ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।' এই সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক পূজা, ঈশ্বরের স্মরণ মনন, ধ্যান ও বন্দন, ইহা উপাসনার এক অঙ্গ; আর এক অঙ্গ—অপরিহার্য্য অঙ্গ—তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন—মানবের সেবা। কেবল মানবের সেবা বলিলেই তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন হয় না। একজন নিরীশ্বরবাদীও মানবের সেবা করিতে পারে, তাহা ঈশ্বরের উপাসনা হয় না। মানবের সেবা করিতে হইবে, দুঃখ দৈন্য দূর করিতে হইবে, অবিচার অত্যাচার দূর করিতে হইবে, অশিক্ষা কুশিক্ষা, পাপ কুসংস্কার হইতে মানবকে মুক্ত করিতে হইবে, জাতিভেদ দূর করতে হবে, দেশকে স্বাধীনতার পথে নিয়ে যেতে হবে, নারী জাতির কল্যাণ সাধন করতে হবে। কিন্তু তার মূল প্রস্রবণ কোথায়? ঈশ্বরে প্রীতি—ঈশ্বরের প্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহারই আদেশে, তাঁহারই প্রিয় কার্য্য অনুভব করিয়া যে মানবের সেবা, পশুপক্ষীর সেবা, ইহাই তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন এবং ইহাই উপাসনার অঙ্গ। এই যে সর্ব্বাঙ্গীণ উপাসনা, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র, ইহাই অমর জীবনের উন্নতি ও বিকাশের ভিত্তি। এই উপাসনাতেই আমাদের আচার্য্যগণ সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন; এই উপাসনা সাধন করতে যাঁহারা জীবন মন নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। দেশে—মানব সমাজে—এই উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে। এই উপাসনা নিজ জীবনে ও দেশে প্রতিষ্ঠার জন্যই ব্রাহ্মগণ কত ক্লেশ, কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন! কত নিন্দা অপমানের ডালি মাথায় বহন করিয়াছেন; কত জন পিতামাতার স্নেহের বক্ষ হইতে ছিন্ন হইয়াছেন; দারিদ্র্য দুঃখ বহন করিয়াছেন! আজও এই উপাসনাপ্রতিষ্ঠার জন্য, কত নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার চেষ্টা হইতেছে! যাঁহারা পূর্ব্বে লাঞ্ছনা করিতেন, সুখের বিষয় আজ তাঁহাদের অনেকের বংশধরগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ কতক পরিমাণে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আজও যাঁহারা নিগ্রহ করিতেছেন, আশা আছে সেদিন দূরে নয়, যেদিন ভগবানের করুণায় তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এই আধ্যাত্মিক উপাসনা অবলম্বন করিবেন। ভগবান তাঁহাদের কল্যাণ করুন; তাঁহারাও আমাদের সম-উপাসক, আজ তাহাদিগকেও হৃদয়ে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সময়ে এ দেশে নূতন পরিত্রাণের বার্ত্তা লইয়া আসিলেন, সেই অন্ধকারময় যুগের কালিমাময় অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। তখন বেদ উপনিষদের কথা এদেশে কেহ জানিত না; নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত,—আড়ম্বরেই ধর্ম্ম পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের নামে কত দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছিল! পুরোহিতের সাহায্যে মনঃকল্পিত দেবদেবীর বাহ্য পূজা করিয়াই মানুষ তৃপ্ত থাকিতে চাহিত। সেই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জগতের শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া, বেদ উপনিষদ্ বাইবেল কোরাণ আলোচনা করিয়া, ধর্ম্মের এক মহান্ আদর্শ প্রাপ্ত হইলেন। তাই তিনি দেশবাসীকে—মানব সাধারণকে—ডাকিয়া বলিলেন, "ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অন্তরে ও বাহিরে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কর তাঁর নাম গান, যতদিন রহে দেহে প্রাণ।"

তাঁর নাম কর, সেই একের উপাসনা কর; তিনি দূরে নন, তিনি প্রাণে, তাঁর পূজার উপাদান প্রেম ও ভক্তি, তাঁর কাছে পশুবলি দিতে হয় না, আত্মনিবেদন করতে হয়। তাঁর আদেশ পালন করতে হয়। এই যে আধ্যাত্মিক পূজা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ নিজেরা করিয়া তৃপ্ত হইলেন, মানব সাধারণকে এই পূজাতে আহ্বান করিয়া বলিলেন "এস, এস, ইহাই মুক্তির পথ, পাপতাপগ্রস্ত নর নারী, শান্তির ভিখারী নর নারী, এই উপাসনা গ্রহণ কর, ইহাতেই তোমাদের শান্তি ও মুক্তি—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। তাঁরা কেবল এই প্রীতির দিকে মানুষকে আহ্বান করিয়াই বিরত রহিলেন না। মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করতে হবে, গৃহে পরিবারে বসিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, গৃহ পরিবার সমাজ ও দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করতে হবে। মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মানুষকে মানুষের অধিকার দিতে হইবে। যেখানে দুঃখ দারিদ্র্য, অত্যাচার উৎপীড়ন সেখানে যাইয়া তাহা নিবারণ করিতে হইবে। স্বর্গের অন্বেষণ কোথায় করিতেছ? এই ধরাকেই স্বর্গে পরিণত করিতে হইবে। এই সর্ব্বাঙ্গীণ, বিশ্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই ব্রাহ্মগণ নূতন করিয়া সমাজ গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; নূতন ভাবে দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে ব্রতী হইলেন। যেখানে রোগ শোক, যেখানে মানুষ অনাহারে ক্লেশ পাইতেছে, দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া আছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন মহামারী, সেখানেই ব্রাহ্মগণ উপস্থিত। নিজে গরীব, পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই; সমাজে নগণ্য মুষ্টিমেয় লোক। কিন্তু প্রাণে অনন্ত বিশ্বাস, হৃদয়ে গভীর আশা। তাদের এই সেবাকার্য্যে কত লোক এসে সাহায্য করত! ব্রাহ্মগণ তখন সমাজে লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত, কিন্তু এই সেবার কার্য্য যোগে, লোক তাহাদের শ্রদ্ধা করিত, সাহায্য করিত, আদর করিত। তাঁহারা

দেখিলেন, ধর্ম্মের ভিত্তি নীতি, সত্য, প্রেম পবিত্রতা; ইহাই ধর্ম্মজীবনের মূল ভিত্তি। ধর্ম্ম বিনা নীতি বরং থাকিতে পারে, কিন্তু নীতি বিনা ধর্ম্মের স্থান নাই। ভাবুকতা থাকিতে পারে; কিন্তু যেখানে সত্যনিষ্ঠা নাই, প্রেম নাই, চিত্তশুদ্ধি নাই, সেখানে ধর্ম্মভাব ফোটে না। তাই ব্রাহ্মগণ বিবেকের অনুসরণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন; যাহা সত্য তাহা করিতে হইবে—সত্য ভাব, সত্য চিন্তা, সত্য বাক্য, সত্য কার্য্য—আমরা যে সত্য-স্বরূপের উপাসক। তাঁরা বলিলেন

সাজ সত্যের সংগ্রামে
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে।

এই সত্য পথ, বিবেকের পথ, অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে—

কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা নির্ভয়ে করিব তাহা,
যায় যাক্, থাকে থাক, ধন প্রাণ মানরে

ইহা তাঁহাদের জীবনের মটো ছিল। আর চিত্তশুদ্ধতা, প্রীতি, পবিত্রতা, ইহা জীবনের ভিত্তি ছিল। বিবেক—Conscience—ধর্ম্মবুদ্ধি, ইহাই তাঁহাদের কার্য্যের পরিচালক ছিল।

তাঁহারা দেখিলেন দেশে কত অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। তাই তাঁহারা কত স্কুল, নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন; সাধারণ শিক্ষার ভিতর দিয়া নীতি ও ধর্ম্ম ও সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ঈশ্বর পিতা, সকল নরনারী ভাই ভগিনী। তবে এত বৈষম্য কেন? তবে জাতিভেদ কেন? তবে মানুষে মানুষে পার্থক্য কেন? তবে নারীজাতির প্রতি এত অবজ্ঞা কেন? তবে বাল্যবিবাহ কেন? তবে গৃহবিবাদ কেন? তবে বিধবার এত দুঃখ কেন? তবে নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতায় বাধা কেন? তবে কোটি কোটি মানবসন্তানকে মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে কেন? ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করিলেন—

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি, সে পাবে মুক্তি
নাহি জাত বিচার।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিলেন—ঈশ্বর সকল মানবের পিতা; তবে আর মানুষে মানুষে ভেদ নাই, জাতিভেদের নিগড় ভগ্ন কর, সকল বর্ণ এক হয়ে ঈশ্বরের চরণে বস। ব্রাহ্মগণ সকল বর্ণকে এক করিতে লাগিলেন; অসবর্ণ বিবাহ দিতে লাগ্‌লেন, জাতি-ভেদের চিহ্ন যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিলেন। দেশ নূতন ধর্ম্মের নূতন আলোক সইতে পার্‌ল না। ব্রাহ্মগণকে দেশ-দ্রোহী, সমাজদ্রোহী ব'লে নির্য্যাতন কর্‌তে লাগল। কিন্তু ব্রাহ্মগণ ধীরভাবে দেশের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের প্রেরণায় জাতিভেদ ভাঙতে লাগিলেন। যারা হীন হয়ে রয়েছে তাহা-দিগকে আহ্বান কর্‌তে লাগ্‌লেন। সমাজে দেশে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল—ব্রাহ্মগণ সমাজচ্যুত হইতে লাগিলেন। এদিকে নারীদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। লোকে বলিল—স্ত্রী শিক্ষা! নারী শিক্ষা লাভ কর্‌লে যে বিধবা হয়! নারীদিগকে স্বাধীনতা দিতে লাগ্‌লেন। কত কুৎসার সৃষ্টি হলো! থিয়েটারে শিক্ষিতা মহিলার কুৎসাপূর্ণ কত অভিনয় হ'তে লাগ্‌ল। কত গালাগালি, কত অপমান শিরে ধারণ কর্‌তে হলো! ব্রাহ্মগণ বিরত হ'লেন না। বাল্যবিবাহ রহিত করিলেন, বহু বিবাহ রহিত করিলেন; বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিলেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলেন; নারীকে আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভারতে এক নূতন যুগের অবতারণা হলো। সমাজে "ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল" রব উঠিল। কত কুৎসা, কত গ্লানি, কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন! ব্রাহ্মগণ দেবতা মানে না, ব্রাহ্মণ মানে না। নিরাকারের উপাসনা করে; নিজেরাই আচার্য্য হয়। ইহারা জাত মানে না, ছাপ্পান্ন জাতির লোক এক সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দেয়; নারীদের শিক্ষা দেয়, স্বাধীনতা দেয়, বিধবা বিবাহ দেয়। এ কি অনাচার! শূদ্রে বেদ পাঠ করে! ধর্ম্ম গেল। ব্রাহ্মগণ অকুতোভয়ে ঈশ্বরে প্রীতি রাখিয়া সংস্কারকার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজনীতিক সংস্কারেও ব্রাহ্মগণ অগ্রণী হইয়া দেশবাসীকে দেশের সেবায় আহ্বান করিলেন। রামমোহন রায় যে স্বাধীনতার আদর্শ পেয়েছিলেন তাহা সর্ব্বাঙ্গীণ, আত্মার স্বাধীনতা—ঈশ্বর প্রাণে, তিনি প্রাণে থেকে কথা বলেন, "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" প্রত্যেকের হৃদয়ে তিনি কথা বলেন। সুতরাং মানুষ স্বাধীন; শাস্ত্রের শৃঙ্খল, সমাজের শৃঙ্খল, গুরু-পুরোহিতের শৃঙ্খল ভেঙ্গে পড়িল। দেশের রাজনীতিক স্বাধীনতার নূতন আদর্শ প্রাণে উদ্ভাসিত হইল। সেই যে রাজা রামমোহন রায় দেশের অন্যান্য স্বাধীনতার সঙ্গে রাজনীতিক স্বাধীনতার সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার তরঙ্গ এখনও চলিতেছে। আজ তাই আমরা স্বরাজলাভের জন্য অস্থির হ'য়ে উঠেছি। ব্রাহ্মগণ চিরদিনই দেশের রাজনীতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে অগ্রদূতের কাজ করিয়া আসিয়াছেন। তাই বলি, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ কি? উপাসনা—ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন—দেশের ও মানবের কল্যাণ। এই মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া ব্রাহ্মগণকে কত নির্য্যাতন অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে, কত দুঃখ দৈন্য বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে—আজও কত অপমান ও লাঞ্ছনা সহিতে হইতেছে! তবুও বলি, হে ভগবন্, আমরা ম'রে যাই, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, দেশের ও মানবের কল্যাণ হউক।

ব্রাহ্মসমাজ এই যে শতবর্ষের সাধনা ও সংগ্রাম দ্বারা নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ব্রাহ্মগণ যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা কর্‌তে যেয়ে এত দুঃখ ক্লেশ নিগ্রহ সহ্য করিয়াছেন, তাহাদের সে সাধনা, সে সংগ্রাম কি ব্যর্থ হইয়াছে? তাহাতে কি সুফল প্রসূত হয় নাই? দেশবাসী কি উদার ধর্ম্মবার্ত্তা পাইয়া জাগ্রত হইয়া উঠে নাই? দেশে কি সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম জাগিয়া উঠে নাই? দেশবাসী কি ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মের, সেবার, সমাজসংস্কারের ও রাজনীতিক আদর্শ গ্রহণ করে নাই? বর্ত্তমান যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশেই এক উদার ধর্ম্মের ভাব জাগ্রত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, পাশ্চাত্য দেশে ইউনিটেরিয়ান্ ও ইউনিভাসে লিষ্ট-গণও সেই আদর্শই অন্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। মুসল-মানদের ভিতরে বাহাই ধর্ম্ম, আমেদিয়া ধর্ম্ম, সেই সুরেই গান ধরিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি অভ্রান্তশাস্ত্রবাদী ও গুরু-বাদী ধর্ম্মসমূহের নূতন নূতন ব্যাখ্যা হইতেছে। এদেশে

আর্য্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, থিওসফী ধর্ম্মের উদার ব্যাখ্যা দিতেছেন। সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মের এক উদার ভাব প্রবেশ করিয়া মানবদিগকে নূতন ভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে; তাহা দেখিয়া আশা হয়, সমগ্র মানব বাহিরের নানা প্রকার আচরণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একদিন বলিতে পারিবে

এক দেশ, এক ভগবান,
এক জাতি, এক মন প্রাণ।

সেদিন বেশী দূরে নয়। বর্ত্তমানে এত দলাদলি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, এ সব সত্ত্বেও বলিতেছি, সে দিন দূরে নয়, যেদিন সকল মানব শ্বেত কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু ম্লেচ্ছ, মস্লেম কাফের এক পিতার চরণতলে আসিয়া বলিবে

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদ্
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যু মেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই ভারতবর্ষের কথাই বলি। মানবের দুঃখ দৈন্য অশিক্ষা কুশিক্ষা নিবারণকল্পে ব্রাহ্মসমাজই ত প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন। দুঃখীর দুঃখে প্রাণ সকলেরই গলে। কিন্তু সমবেত ভাবে দুঃখনিবারণের চেষ্টা এ দেশে ছিল না। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হ'লে, জলপ্লাবন বা অগ্নিকাণ্ড হ'লে গবর্ণমেণ্টের দিকে লোক তাকাইয়া থাকিত; ব্রাহ্মসমাজই প্রথমে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া লোকদুঃখনিবারণের চেষ্টা করেন। এখনও ব্রাহ্মসমাজ দুঃস্থের সেবা করেন। এখনও ব্রাহ্মসমাজ অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে প্রায় ৪০০ স্কুল পরিচালনা করিতেছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, দেশবাসিগণ সেবার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণমিশন, ভারত-সেবাসঙ্ঘ প্রভৃতি কত প্রতিষ্ঠান সেবাকার্য্যে প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন! সমবেত শক্তিদ্বারা লোকসেবার ভাব দেশে জাগ্রত হইয়াছে। অশিক্ষা কুশিক্ষা নিবারণের চেষ্টা হইতেছে; অনেক কুসংস্কার দেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করিয়াছিলেন—"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার"; তাই তাঁহারা জাতিভেদ দূর করিতে, নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রদান করিতে, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রহিত করিতে, বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে, অগ্রসর হইয়াছিলেন। দেশবাসী তখন এ সামাজিক আদর্শ গ্রহণ করিতে চায় নাই। এই জন্য ব্রাহ্মদিগকে তাহারা কত নির্য্যাতন করিয়াছে! কত জনকে অশ্রু মুছিতে মুছিতে গৃহ হইতে, পিতা মাতার স্নেহের বন্ধন হইতে, ছিন্ন হইয়া আসিতে হইয়াছে! আজ সে দুঃখের কথা মনে হয়—জীবনের সে বিষাদময় অভিজ্ঞতার কথা মনে হয়। কিন্তু আজ—আজ দেশের মুখ অনেক পরিমাণে ফিরিয়াছে। আজ জাতিভেদের নিগড় অনেক পরিমাণে ভাঙ্গিয়াছে। আজ অস্পৃশ্যতানিবারণের চেষ্টা হইতেছে। আজ অন্ততঃ সহরে আহারে জাতি বর্ণে বাদ বিচার নাই। আজ অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। নারী জাতির মধ্যে দিন দিন শিক্ষা প্রচলন হইতেছে। কত হিন্দু ও মুসলমান নারী আজ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন! পরদা তুলিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের মহিলাগণ প্রকাশ্য সভায় আসিয়া যোগ দিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন। বাল্যবিবাহ উচ্চ বর্ণের ভিতরে এক রকম রহিত হইয়াছে। কৌলীন্য প্রথার প্রভাব হ্রাস পাইয়াছে। ব্রাহ্মণের অন্যায় অধিকার খর্ব্ব হইয়াছে। বহুবিবাহ হ্রাস হইয়াছে, বিধবাবিবাহপ্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। নারীজাতিকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ কি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না? যে সকল সংস্কারের জন্য ব্রাহ্মগণ নিগৃহীত হইতেন, এখন সেই সকল কাজে হিন্দুগণ অগ্রসর হইতেছেন। "সত্যমেব জয়তে" এই মহামন্ত্রের সার্থকতা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি, কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল স্থানেও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের অবসান হয় নাই। এই যে জাতিভেদ দূর, নারীজাতির অধিকার প্রদান, হিন্দু মুসলমানের মিলনচেষ্টা, ইহা ঐহিক হইতে হইতেছে, তাহা ঠিক প্রকৃত আদর্শ নয়। আজ দেশের কাজের জন্য সকলের সাহায্য প্রয়োজন, আজ হিন্দুসমাজের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন, স্বরাজলাভের জন্য হিন্দু মুসলমানের মিলনের প্রয়োজন, আজ দেশের কল্যাণের জন্য নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রদান, বাল্যবিবাহরহিত, বিধবাবিবাহপ্রচলনের প্রয়োজন। সুতরাং দেশবাসিগণ এই সকল কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের angle of vision (দৃষ্টির দিক) এখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এক ব্রহ্ম সকলের মধ্যে বিদ্যমান, সকল মানুষেরই মনুষ্যত্বলাভের অধিকার আছে, তাই ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করিয়াছেন—"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার।" আমরা দয়া করিয়া অস্পৃশ্যদিগকে অধিকার প্রদান করিব, মুসলমানের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার করিব, নারীজাতিকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিব, ইহা প্রকৃত আদর্শ নহে। আমরা এতকাল যুগ যুগান্ত ধ'রে মানব সন্তানকে হীন করিয়া রাখিয়াছি, অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি, ব্রহ্ম যাদের প্রাণে বিদ্যমান, তাহাদিগকে ফুটিতে দেই নাই, মানুষ ও মানুষের ভিতরে, জাতি ও জাতির ভিতরে, স্ত্রী ও পুরুষের ভিতরে, দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া রাখিয়াছি; ইহাতে আমাদের ভগবানের নিকট, মানবের নিকট, অপরাধ হইয়াছে। আজ সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হইবে। তাই হৃদয়ে প্রেম লইয়া সমস্ত নিগড় ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইতে হইবে। আজ সকলকে পায়ে ধরে ডেকে আনিতে হবে, সকলের নিকট সকল উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এই যে দৃষ্টির পরিবর্ত্তন তাহা ঘটাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে এখনও সংস্কারকার্য্যে ব্রতী থাকিতে হইবে। ঈশ্বর পিতা, নরনারী ভাই বোন—এই মূল মন্ত্র লইয়া সংস্কারকার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। আজ রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশবাসী মাতিয়া উঠিয়াছে। স্বরাজ লাভের জন্য দেশবাসিগণ ব্যস্ত হইয়াছেন। খুব ভাল কথা, খুব শুভ লক্ষণ। কিন্তু, যাহারা নিজেরা স্বাধীনতা চায়, আর অন্যকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নহে, যাহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চায়, অথচ সমাজে সকলকে স্বাধীনতা দিতে চায় না, যাদের প্রাণ উন্মুক্ত

হয় নাই, আত্মা স্বাধীন হয় নাই, সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করিতে প্রস্তুত হয় নাই এবং যাহারা একমাত্র ঈশ্বরের অধীন থাকিয়া স্বাধীনতা সম্ভোগ কর্‌ত্তে এবং অন্যকে সম্ভোগ কর্‌তে দিতে প্রস্তুত নহে, তাহারা স্বাধীনতার 'ক' 'খ'ও শিক্ষা করে নাই। যাহারা ব্রহ্মে নিবেদিতপ্রাণ তাহারাই প্রকৃত স্বাধীনতার উপাসক। সুতরাং দেশকে স্বাধীনতার পথে চালিত কর্‌তে হইলেও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে চলিবার প্রয়োজন আছে। ব্রাহ্মসমাজই এদেশে শাস্ত্রচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজই নানা দেশীয় শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা উদার সমন্বয়ের ভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুখের বিষয়, এখন এ দেশে দেশীয় শাস্ত্রচর্চ্চা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। কত নূতন ব্যাখ্যা হইতেছে। অনেকে অন্য দেশের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন কর্‌লে শাস্ত্রে শাস্ত্রে সামঞ্জস্য করা যায়; ধর্ম্মের বাহিরাবরণের পশ্চাতে যে আন্তরিক ঐক্য রহিয়াছে, ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্যসাধন, ইহাই যে সকল ধর্ম্মের মূল ভিত্তি, ইহা উপলব্ধি করা যায়। নতুবা অন্য আদর্শ লইয়া অগ্রসর হইলে, শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ, বাহিরের আচরণ লইয়া ঝগড়া কলহ, রক্তপাত অনিবার্য্য।

এদেশে যে সুরাপানের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টাতেই অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দলনের সময় যুবকগণ সুরা-দোকানের দ্বারে দ্বারে দাঁড়াইয়া লোকদিগকে সুরাপানে বিরত করিত, তখন মদ্য-বিক্রয় হ্রাস হইয়াছিল, আবার তাহা বাড়িয়াছে। এখানেও মহর্ষির মন্ত্র "মদ্য মদেয় মপেয় মগ্রাহ্যং" এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকেই অগ্রসর হইতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজই "বিবেকের' মন্ত্র এদেশে ঘোষণা করেন। সত্য-নিষ্ঠ হও, চরিত্রবান হও, শ্রদ্ধাসমন্বিত হও। ব্রাহ্মসমাজই ধর্ম্মকে নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজই নানারূপ অনিষ্টকারী আমোদ প্রমোদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের চেষ্টা অনেক পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ কি দেখিতেছি? দুর্নীতি নূতন বেশে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া, আর্টের ভিতর দিয়া, বিভীষণের বেশে দুর্নীতি আসিয়া তরুণ হৃদয়গুলিকে কলুষিত করিতেছে।

সত্য ও মিথ্যার ভিতরে যে পার্থক্য তাহা লোপ পাইতে চলিয়াছে; বাসনা ও সংযমের মধ্যে যে দেয়াল তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বাসনার প্রবল স্রোতে মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। ক্ষণিক কৃতকার্য্যতার জন্য মানুষ অসত্যের আশ্রয় লইতেছে। বিবেকের আদেশ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজকে জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে হইবে, "থাম, আর নয়।" ঋষির বাক্যে বলিতে হইবে—এই শ্রেয়ের পথ, ঐ প্রেয়ের পথ, এই জীবনের পথ, ঐ মৃত্যুর পথ, তোমরা পথ বাছিয়া লও, এই শ্রেয়ের পথে, অমৃতের পথে, জীবনের পথে চল। ভগবান্ তোমাদের সহায়।

ব্রাহ্মসমাজ প্রিয়কার্য্যসাধনের সহায়রূপে, লোকশ্রেয়ঃ সাধনের জন্য সেবাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাই অনেক বিষয়ে কতক পরিমাণে তাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছেন। যে সকল কারণে তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন বরণ করিয়া লইতে হইয়াছিল, আজ দেশবাসীই সেই সকল সংস্কারকার্য্যে রত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যে প্রীতিসাধনের আদর্শ, ব্রাহ্মসমাজ যে ঘোষণা করিয়াছিলেন "ভাব সেই একে", ব্রাহ্মসমাজ যে এক নিরাকার অদ্বিতীয় সত্য প্রেম পুণ্যের আধার, পরব্রহ্মের সাক্ষাৎভাবে প্রেম ভক্তি দ্বারা পূজা প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে চাহিয়াছিলেন, সে কার্য্যে কি তাঁহারা কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন? দেশবাসী কি একেশ্বরের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক পূজার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন? এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, বর্ত্তমান সময়ে নানা দেশের শাস্ত্র আলোচনা, দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা, সকল দেশের সাধু সাধ্বীগণের জীবনচরিত পাঠ এবং ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি উদার ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের সাধনা ও চেষ্টা দ্বারা লোকের মনে একটা উদার ধর্ম্মের ভাব জাগ্রত হইয়াছে। এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, জগতের কর্ত্তা একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তিনি নিরাকার চিৎস্বরূপ। প্রেম ভক্তি দ্বারা তাঁর অর্চ্চনাই প্রকৃষ্ট উপাসনা। কিন্তু তাহা হইলেও এখনও বাহ্য উপচারে প্রতিমাপূজা দেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এখনও সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক পূজা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ যে এক সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ভাবে প্রেম ভক্তি সহকারে পূজা নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহা দেশে ও মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমরণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, আজও তাহা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই যে এক ঈশ্বরের সত্যং জ্ঞানং অনন্তং প্রেম ও পুণ্যের আধার নিরাকার পরমেশ্বরের সত্য পূজা, প্রেম ভক্তির দ্বারা, আত্মসমর্পন দ্বারা, প্রেমের জন্য ত্যাগদ্বারা পূজা, আর প্রীতির জন্য তাঁর প্রিয় কার্য্য অনুভব করিয়া লোকসেবা করা, ইহা জ্ঞানগত ভাবে স্বীকার করা এক কথা, আর প্রকৃত ভাবে এই রূপ উপাসনাতে নিযুক্ত হওয়া, এই রূপ সাধন সরল প্রাণে অবলম্বন করা, অন্য কথা। বলিতে কি, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের সকলেও এই আধ্যাত্মিক পূজা অবলম্বন করিতে সমর্থ হন নাই। যখন ব্রাহ্মগণের ঈশ্বরের অর্চ্চনা, তাঁর চরণে অকপট প্রার্থনা, তাঁর নাম কীর্ত্তন, তাঁতে আত্মসমর্পণ, তাঁর আদেশ শ্রবণ ও পালনে উৎসাহ ছিল, উপাসনার জন্য তাঁরা ব্যাকুল ছিলেন, উপাসনার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতেও তাঁরা ভীত হইতেন না, তখন ব্রাহ্মসমাজের স্বর্ণ যুগ ছিল; তখন তাঁরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন, তাঁদের ধন জন পদ মান প্রতিপত্তি ছিল না, সমাজ তাহাদিগকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, নগ্নপদে, সামান্য পোষাকে, গরীবের মত চলিতেন, তখন লোকে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিত; তখন তাঁহারাই দেশে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন; তখনই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য জ্ঞানে দেশসেবায় তাঁরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখনই দেশবাসী তাঁদের কথা শুনে অবাক হ'তেন। তখন দেশের লোক যেমন একদিকে তাদের উৎপীড়ন করিত, অপর দিকে শ্রদ্ধাও

কম্বিত, এবং দলে দলে তরুণ সম্প্রদায় ব্রাহ্মসমাজের পতাকার তলে আসিয়া আশ্রয় লইত। তখনই তাঁরা "ছড়ারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন" বলিয়া সমস্ত কুসংস্কার অসত্য হইতে মুক্ত হইয়া এক ঈশ্বরের চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু আমরাই এখন আদর্শ হইতে সরিয়া পড়িতেছি, আমরাই ব্রহ্মের উপাসনাকে শক্ত করিয়া ধরিতে পারিতেছি না, আমরাই এখন ধন জন পদ মান প্রতিপত্তির পশ্চাতে ছুটিতেছি; তাই আমরাও নিদ্রিত হইলাম, দেশও সত্যস্বরূপের পূজাতে ব্রতী হলো না। দেশে আবার নানা ভাবে কুসংস্কার, দুর্নীতি মাথা খাড়া ক'রে উঠিল।

আজ ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসবে আমরা কোন্ সঙ্কল্প লইয়া যোগদান করিব? কোন্ ব্রত আমরা গ্রহণ করিব? ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যদি এদেশের কল্যাণের জন্ম এসে থাকে, ভগবান যদি নূতন আদর্শ লইয়া আমাদিগকে ডাকিয়াছিলেন, আমরা যদি তাঁরই আলোক দেখিয়া নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, তাঁর উপাসনা করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ অনুসারে কথঞ্চিৎ পরিমাণে চলিয়াও যদি আমরা দুঃখে শান্তি, শোকে সান্ত্বনা, সংগ্রামে বল পেয়ে থাকি, আমাদের দৃষ্টি যদি প্রসারিত হ'য়ে থাকে, আমরা যদি দেশের ও মানবের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখিতে পাইয়া থাকি, তবে আজ এই শতবার্ষিকী উৎসবের দ্বারে ভগবানের চরণে দাঁড়াইয়া নূতন ভাবে আমরা জীবন আরম্ভ করি। আমরা ব্রহ্মোপাসনাতে গভীর ভাবে নিযুক্ত হই; ব্রহ্মের চরণে আমরা আত্মা মন সমর্পণ করি; আমাদের গৃহে গৃহে ব্রহ্মের নাম ধ্বনিত হউক, আমাদের জীবনে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হউক, আমাদের প্রাণ ব্রহ্মানুগত হউক; ব্রহ্মে প্রীতি রাখিয়া তাঁর আদেশে, তাঁর ইঙ্গিতে আমরা গৃহধর্ম্ম পালন করি, সমাজের সেবা করি, দেশের সেবা করি, মানবের সেবা করি। আর দেশবাসীর নিকট, মানবমণ্ডলীর নিকট বলি, উদাত্ত স্বরে বলি—

তোরা আয় রে ভাই,
এত দিনে দুঃখের নিশি হ'ল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।

আমরা সকলকে ডেকে বলি—
"ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।"
"কর তাঁর নাম গান, যতদিন রহে দেহে প্রাণ।"
"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহৎ যশঃ।"

আমরা ব্রহ্মের নামে, ঈশ্বরের আরাধনাতে সকলকে আহ্বান করি। সকলকে বলি, এস ভাই, মহতো মহীয়ান্ যিনি, তাঁর পূজাতে এস, তাঁর চরণে এসে বস; প্রেম ল'য়ে এস, ভক্তি ল'য়ে এস, ত্যাগ ল'য়ে এস! ঐ যে প্রভু—

বিশ্বভুবনরঞ্জন, ব্রহ্ম পরম জ্যোতি,
অনাদি নাথ দেব দেব, বিশ্বের প্রাণ

তাঁর পূজা কর। অন্তরে তিনি, বাহিরে তিনি, এক অদ্বিতীয় চিন্ময় দেবতা, তাঁর পূজাতেই ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ, তাঁর উপাসনাতেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি। এই মুক্তির বার্ত্তা, এই একেশ্বরের উপাসনার বার্ত্তা, দেশে দেশে ঘরে ঘরে প্রচার করি। আমার দেশবাসী কি ক্ষুদ্র লইয়া তৃপ্ত থাকিবে? যে দেশে পৃথিবীর সভ্যতার উষাকালে অনন্ত দেবতার বন্দনার গাথা উত্থিত হইয়াছিল, যে দেশের ঋষিগণ গাহিয়াছিলেন, "অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি," সেই দেশ কি ক্ষুদ্র কল্পিত দেবতার বাহ্য পূজা লইয়া তৃপ্ত থাকিবে? তাহা নয়, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের পূজা, আধ্যাত্মিক পূজা, ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সাধন করিতে হ'লে সত্য চাই, প্রেম চাই, পবিত্রতা চাই। বিবেক বড়ই মলিন হয়ে পড়েছে। মানুষ এখন আর বিবেকের পথে চলে না; শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয়ের পথে চলিতেছে। মানুষ এখন সত্য পথ ছেড়ে মিথ্যা অবলম্বন করে দেশের কল্যাণ সাধন করতে চায়। মানুষ এখন সংযমের পথ পরিত্যাগ করিয়া বাসনার পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। কত কুৎসিৎ আমোদ, কুৎসিৎ ভাব উদ্দীপক সাহিত্য ও আর্টের উদয় হইয়াছে! আবার বল্তে হবে, "তোমরা সত্যস্বরূপের উপাসক, তোমরা পুণ্যস্বরূপের উপাসক, তোমরা প্রেমস্বরূপের উপাসক। অসত্য ভাব, অসত্য চিন্তা, অসত্য বাক্য, অসত্য কার্য্য পরিত্যাগ কর; 'বিবেক"— ঈশ্বরের বাণী—শুনিয়া চল; অসাধু ভাব, অসাধু চিন্তা, অসাধু কার্য্য, অসাধু বাক্য পরিত্যাগ কর; অপ্রেম বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর। সত্য অবলম্বন কর, শুদ্ধচিত্ত হও। প্রেমে সকলকে আপনার ক'রে লও। ভয় নাই, নিরাশ হইও না; পাপকে ভয় করো না। ভগবানের আশ্রয় লও। তাঁর নামে সকল পাপ অসত্য অপ্রেম চ'লে যাবে।

আজ আবার অসত্যের সঙ্গে সংগ্রাম, দুর্নীতির সঙ্গে সংগ্রাম, অপ্রেমের সঙ্গে সংগ্রাম, ঘোষণা করতে হবে। আজ আবার দৃঢ়ভাবে বল্তে হবে

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি
নাহি জাত বিচার।

মানুষকে মানুষ ব'লে ভাল বাস্তে হবে, সম্মান করতে হবে, উন্নতি ও বিকাশের অধিকার দিতে হবে। কোনও স্বার্থের জন্ম নয়, কোনও অভিসন্ধিতে নয়, রাজনীতিক সুবিধার জন্ম নয়। মানুষ যে ঈশ্বরের সন্তান, ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর ভিতরে বর্ত্তমান; শ্বেতকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু ম্লেচ্ছ, মস্লেম কাফের সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজিত! সকল মানুষই মুক্তির অধিকারী; সকলেই ঈশ্বরের চরণে ভাই ভগিনী। এই মনুষ্যত্বের দাবী সকলের আছে। তাই তাদের মনুষ্যত্ব ফুটাইতে হবে, সকলকে ভাই ব'লে সমান অধিকার, সমান শিক্ষা, সমান স্বাধীনতা দিতে হবে।

আজ এই শতবার্ষিকী উৎসবে নূতন ভাবে, নূতন উদ্দীপনা ল'য়ে, ব্রহ্মের আশীর্ব্বাদ লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ আদর্শ নূতন ভাবে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হই। ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ১লা বৈশাখ, শনিবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

১ম সংখ্যা। 14th April, 1928. অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে চিরন্তন দেবতা, তুমি চির-পুরাতন হইয়াও চির-নবীন, নিত্য-নূতন উন্নতি ও বিকাশের পথে সকলকে লইয়া যাইতেছ, নিত্য নূতন ভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতেছ। তুমি নিত্যক্রিয়াশীল মঙ্গলময় বিধাতা, তুমি কাহাকেও পুরাতনের মৃত্যু মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেও না; সকল অবস্থার মধ্য দিয়াই নবশক্তি সঞ্চার করিয়া, নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া, নূতন পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া, তুমি সকলকে নবজীবনের পথেই অগ্রসর কর। তোমার প্রকৃতিরাজ্যে, জড় ও জীবের মধ্যে, মানবজীবনে ও সমাজের ইতিহাসে, আমরা ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। তবুও অন্ধ ক্ষীণবিশ্বাসী আমরা অনেক সময় তাহা দেখিয়াও দেখি না,—তোমার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে সকল অবস্থার মধ্যে আপনাদের স্বাস্থ্য করিয়া যাইতে পারি না! নানা বিঘ্ন বাধা বিপদ আসিয়া যখন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, হৃদয় মন অবসন্ন করিয়া দেয়, তখন বুঝিতে পারি না যে ঐ গভীর অন্ধকারই আলোকের পূর্ব্বসূচনা, ঐ অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতাই নূতন বল ও শক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, মৃত্যুই নবজীবনের মূল ও সোপান। নূতন বৎসরে আমাদের সম্মুখে যে গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার উপস্থিত করিয়াছ, চারিদিকে যেরূপ নানা বাধা বিঘ্ন বিপদ আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়াছে, তাহাতে আমাদের দুর্ব্বলতা ও অযোগ্যতা বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছি। তাই হে করুণাময় পিতা, আমরা অনন্যগতি হইয়া তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে নূতন বৎসরে নূতন বল ও শক্তি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেও, যাহাতে আমরা তোমার উপযুক্ত সেবক ও সন্তান হইয়া তোমার কার্য্য সাধন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক। নূতন বর্ষে নূতন ভাবে তোমার রাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক।

নিবেদন।

গর্ব্বে পতন—তোমার গভীর জ্ঞান আছে, নিজে সব জান, লোককে কত বুঝা'তে পার। তোমার অত্যন্ত কর্ম্মশক্তি আছে; যে কাজ হাতে নাও, দেশের ও দশের জন্য যে কাজে প্রবৃত্ত হও, তুমি তাহা সুসম্পন্ন ক'রে তোল; তোমার ত্যাগ আছে, দেশপ্রীতি আছে, মানবের দুঃখ দূর কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা আছে, তুমি নিজের সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে লোকশ্রেয়ঃ সাধন করিতেছ। সকলে তোমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তোমার প্রশংসা করে; এসবই ভাল। গুণের আদর হওয়াইত উচিত। কিন্তু তুমি সাবধানে চলিবে; সাবধান, এই জ্ঞান, এই কর্ম্মশক্তি, এই ত্যাগ, ইহাঁর গর্ব্ব যেন তোমার মনে উদয় না হয়। এ সকল বাঁধা রেখে যেন কর্ম্মে কৃতকার্য্যতা লাভের চেষ্টা না কর। সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে, তোমার কিছু নাই; যাহা আছে তাহা প্রভুর দান, তুমি তাঁর দীন সন্তান। সর্ব্বদা করযোড়ে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাক্‌বে। তুমি জ্ঞানী, তুমি ত্যাগী, তুমি কর্ম্মঠ, এই ভাব যেদিন তোমার মনে আস্‌বে, সেদিনই তোমার পতন আরম্ভ হয়েছে। এ পথ বড়ই পিচ্ছিল। কোথায় যেয়ে যে পড়্‌বে তার ঠিকানা নাই। প্রার্থনাকে জীবনের মূলমন্ত্র ক'রে কাজে প্রবৃত্ত হও।

তোমার হাতে—তোমার হাতে জীবন অর্পণ ক'রেও

যেন সব সময় নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারি না। দেখ্‌ছি, প্রতি পদে দেখ্‌ছি, জীবনের প্রতি ঘটনায় দেখ্‌ছি, তুমি আমার ভার নিয়েছ, তুমি আমার হাত ধ'রে নিয়ে চল্‌ছ; তোমার বাহু আমাকে বেষ্টন ক'রে আছে—যখন যাহা প্রয়োজন তুমি তার বিধান কচ্ছো; তবুও আমি আবার যেন তোমাকে পন্থা ব'লে দিতে চাই। তুমি কোন্ ভাবে আমার অভাব পূরণ কর্বে, তা তোমাকে ব'লে দিতে চাই। তা' ত হবে না, তোমার পথ ভিন্ন, কার্য্যপ্রণালী ভিন্ন; আমি যে ভাবে চাই, তুমি সেভাবে দাও না, আমি যখন চাই তুমি তখন দাও না; আমি যেভাবে থাকৃতে চাই, তুমি সেভাবে রাখ না। আমার আশা ভেঙ্গে যায়, কিন্তু অন্য ভাবে, অন্য প্রণালীতে, অন্য ঘটনার ভিতরে, তুমি তোমার করুণার পরিচয় দাও। তখন দেখি, তুমি আমার সকল অভাব পূর্ণ করেছ, সকল দুঃখ দূর করেছ। তোমার হাতে জীবন অর্পণ ক'রেও নিশ্চিন্ত হইতে পারি না কেন? এ অবিশ্বাস, এ অশান্তি দূর কর। আমি নিরুদ্বেগে তোমার ক্রোড়ে থাকি।

কাণ পেতে থাক—বিশ্ব হ'তে ডাক আস্‌ছে; ভেব না, এই অনন্ত বিশ্বে তোমাকে কেহ খোঁজে না; ভেব না, এই অনন্ত বিশ্বে তুমি ক্ষুদ্র ব'লে তোমার কোনও প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মাণ্ডপতি যিনি, তিনি তোমাকে চেনেন, তিনি তোমাকে ভাল বাসেন; তাঁর কাজে তিনি তোমাকেও চান। তাঁর ডাক কত দিক্ দিয়া আসে; কত ভাবে তাঁর আহ্বান আসে! সংসারের কোলাহলে বধির হ'য়ে থেক না, কাণ পেতে থাক। মেঘের গর্জ্জনে, পাখীর গানে, নদীর কল কল ধ্বনিতে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে, তাঁর ডাক আসে; দুঃখীর ক্রন্দনে, ব্যথিতের বেদনায়, আর্ত্তের কাতর ধ্বনিতে, উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদে তাঁর ডাক আসে। সে ডাক শোন। তুমি ক্ষুদ্র, মলিন, তা ব'লে তিনি তোমাকে ছাড়েন নাই, তিনি তোমাকে চান; তাঁর কাজে তোমাকে চান। তুমি কাণ পেতে থাক, সে ডাক শু'নে কার্য্যে অগ্রসর হও।

সম্পাদকীয়।

নববর্ষ—আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এপর্য্যন্ত যে সকল নববর্ষ আসিয়াছে ও গিয়াছে তাহার মধ্যে বর্ত্তমান বর্ষের যে একটা বিশেষত্ব আছে, সে কথা আমরা অনেকেই কিঞ্চিদধিক অনুভব করিতেছি। যেরূপ আলস্য ও উদাসীনতা অথবা সাময়িক একটু উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্ম্মপচেষ্টার মধ্য দিয়া বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে যে আমরা কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া না দেখিলেও, তাহা আমাদের কাহারও সম্পূর্ণ অবিদিত নহে,—তাহা আর আমরা উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা যদিও চিন্তাহীন আরামপ্রিয় জীবনই ভালবাসি, তথাপি বিশ্ববিধাতার মঙ্গল বিধানে তাহা চিরদিন সম্ভবপর হয় না; জগতের নানা ঘটনা, প্রতিকূল অবস্থা আসিয়া একদিন সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেয়ই দেয়, সজাগ না করিয়া কিছুতেই ছাড়ে না। আমরা দীর্ঘকাল মোহনিদ্রায় কাটাইয়াছি, অজ্ঞাতসারে ভাসিতে ভাসিতে আমরা কোথায় যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এখন ঘরের ও বাহিরের নানা ঘটনা আমাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছে, এ ভাবে চলিলে অচিরেই আমাদিগকে মহামৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতে হইবে। সুতরাং ঘরের ও বাহিরের যে সকল প্রতিকূল অবস্থা আমাদের পথকে কণ্টকাকীর্ণ, অতি সংগ্রামময়, করিয়া তুলিতেছে, আমাদের দুর্গতি ও বিবিধ প্রকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট করিয়া নয়নসমক্ষে ধরিতেছে, সে সকল আমাদিগকে যতই ক্লিষ্ট ও লাঞ্ছিত করুক না কেন, তাহারা আমাদের মিথ্যা সুখের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে দিয়া, কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে আমাদের বিশেষ সহায়তাই করিতেছে—প্রকারান্তরে আনুকূল্যই করিতেছে, বন্ধুর কার্য্যই করিতেছে। নিন্দা লাঞ্ছনা, ব্যর্থতা পরাজয়, দুঃখ বেদনা, এ সকল আমাদেরই পাপ-দুর্ব্বলতার অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেখানে আমাদের দোষ ত্রুটি বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, অপরের অন্যায় প্রতিবন্ধকতাটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সেখানেও অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারি আমাদের কার্য্য উপযুক্তরূপে না করাতেই, ওরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, মঙ্গলবিধাতার কল্যাণ-দূতরূপেই তাহারা আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। যে সংগ্রামে বিমুখ তাহাকে এই ভাবেই উত্তেজিত করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত করাইতে হয়। অহিফেনসেবনে যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতে চায় তাহাকে কষাঘাত করিয়া জাগাইয়া রাখিতে হয়—নতুবা মৃত্যু অবধারিত। সংগ্রামেই জীবন, বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে যাইয়াই আমাদের শক্তি বিকশিত হয়, তাহা ব্যতীত অন্য উপায়ে উন্নতিলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; ইতিহাসও ইহাই প্রমাণ করিতেছে—সে ইতিহাস ব্রাহ্মসমাজেরই হউক আর অন্যান্য ধর্ম্মসমাজেরই হউক, সকলে একই শিক্ষা দিতেছে। বলা বাহুল্য, যাহারা বাধা বিঘ্ন দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে, তাহাদের পক্ষে শুধু পরাজয় নয়, মৃত্যুই অবধারিত, অবশ্যম্ভাবী—তাহারা কিছুতেই ধ্বংসের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। আর, সংগ্রাম করিয়া পরাজিত হইলেও লাভ আছে, তাহাতেও শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ভবিষ্যৎ জয় সম্ভবপর হইয়া আসে। নববর্ষ আমাদের নিকট এক দিকে যেমন নবযুগের গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তেমনি অনেক বাধা বিঘ্ন সংগ্রামও লইয়া আসিয়াছে। সুতরাং কি ভাবে আমাদিগকে ইহার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। শুধু আনন্দোৎসব সম্ভোগ ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। তাহা যে করিতে হইবে না, এরূপ কথা অবশ্য আমরা বলিতেছি না। তাহা ত সর্ব্বপ্রযত্নে করিতেই হইবে। কিন্তু স্মরণে রাখিতে হইবে, উহাকে একটা সাময়িক ব্যাপারে, ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে

পরিণত করিলে বিশেষ কোনও কল্যাণই সাধিত হইবে না, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আর, কার্য্যসাধন সম্বন্ধেও মনে রাখিতে হইবে, সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য বাহ্যিক উপায়ের যতই প্রয়োজনীয়তা থাকুক না কেন, শুধু তদ্দ্বারা সফলতা-লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। আমরা অনেক সময় সে কথা ভুলিয়া যাই—কোনও কার্য্য করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই আমাদের সমগ্র দৃষ্টিটা বাহিরের নানা উপায়ের দিকেই ধাবিত হয়, কিন্তু যাহা সে সকল উপায়কে ব্যবহার করিবে, যাহা প্রয়োজনানুসারে উক্ত প্রকার বহু উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ, যাহা ব্যতীত সর্ব্বপ্রকারে নিখুঁত উপায়ও কোনও কার্য্য সাধন করিতে পারে না, সেই জীবন্ত কর্ম্মকর্ত্তার জীবন ও চরিত্রের বিষয় আমরা মোটেই ভাবি না। উপযুক্ত কর্ম্মী ব্যতীত কিছুতেই কিছু হইবে না, অপর সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, হইতেছেও তাহাই। উপযুক্ত কর্ম্মীর সর্ব্বপ্রধান গুণ বিশ্বস্ততা, বাধ্যতা ও নিঃস্বার্থপরতা। বলা বাহুল্য, যে আপনার স্বার্থ সুখ সুবিধা আরাম প্রভুত্ব প্রভৃতিকে প্রধান লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া কার্য্য করে, সে কখনও বিশ্বস্ততার সহিত প্রভুর কার্য্য সাধন করিতে পারে না, সকল সময়ে সকল বিষয়ে প্রভুর অনুগত দাস বা বাধ্য সন্তান হইয়া চলিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সে যে অনেক সময় প্রভুর কার্য্য নষ্ট করিয়াও আপনার স্বার্থ সাধন করিবে, অথবা আপনার ইচ্ছা অভিরুচি প্রভৃতির পথেই চলিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর, যেখানে এতটা অকর্ম্মণ্যতা না ঘটিবে, সেখানেও যে তাহার কার্য্যশক্তি বহু পরিমাণে খর্ব্ব হইবে, সে সমগ্র মনপ্রাণের সহিত সমস্ত শক্তি দিয়া একমাত্র প্রভুরই কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতে সমর্থ হইবে না, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপেই বলা যাইতে পারে। খুব ভাল হইলেও এই শ্রেণীর কর্ম্মীর নিকট হইতে কোনও প্রকারে সাধারণ কাজ চালাইয়া যাওয়ার অপেক্ষা আর অধিক কিছু আশা করা যায় না। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে উপযুক্ত শ্রেণীর কর্ম্মী কোথায় পাইব? এ বিষয়ে প্রথম কথা এই যে, প্রেম ভিন্ন পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও ত্যাগ কিছুতেই আসে না—সাধারণ অবস্থায় তাহার কিছুটা দেখিতে পাওয়া গেলেও, সঙ্কটকালে পরীক্ষা ও সংঘর্ষের মধ্যে, তাহা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। অপর দিকে প্রেম শুধু বিশ্বস্ততা ও ত্যাগই প্রদান করে তাহা নহে, তাহা সকল প্রকার শক্তি এবং উপযুক্ততাও জীবনে সঞ্চার করে। প্রেম মানুষকে যে কি অপূর্ব্ব বল বুদ্ধি শক্তি আনিয়া দেয়, তাহার অসংখ্য প্রমাণ আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ভক্ত প্রেমিক না হইলে, ব্রহ্মপরায়ণ জীবন না থাকিলে, কোনও প্রকারেই কেহ উপযুক্ত কর্ম্মী হইতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, এখানে আমরা ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মীরই উপযুক্ততার আলোচনা করিতেছি, অপর ক্ষেত্রের কথা মোটেই ভাবিতেছি না। অন্যত্র ইহা ব্যতীত চলিতে পারিলেও এক্ষেত্রে যে চলে না, এখানে যে তাহা একান্তই অপরিহার্য্য, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আর, এই কথা ভুলিয়া অন্য প্রকার উপযুক্ততার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা সময় সময় যে সকল কর্ম্মী গ্রহণ করিয়াছি তাহাদের দ্বারা যে উপকার অপেক্ষা অধিকতর অপকারই সাধিত হইয়াছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতার শিক্ষা যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তাহা স্মরণে না রাখিয়া যদি কার্য্য করিতে অগ্রসর হই, তবে যে অবশ্যম্ভাবীরূপেই আমাদের সে প্রচেষ্টা কল্যাণকর না হইয়া অকল্যাণকরই হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। সুতরাং সাময়িক উৎসাহের দ্বারা চালিত হইয়া একটা বৃহৎ কার্য্যব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই যে আমাদের কার্য্য নূতন যুগে নূতন বলে চলিবে তাহা নহে। যাহাতে আমাদের মধ্যে উপযুক্ত কর্ম্মী গড়িয়া উঠে এবং কর্ম্মীনিয়োগ বিষয়ে আমরা প্রকৃত উপযুক্ততার দিকে অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়া চলি, সর্ব্বাগ্রে তাহাই করিতে হইবে। তাহাতে সংখ্যার ন্যূনতা ঘটিলেও, দেখিতে পাইব অধিকতর সফলতা লব্ধ হইবে। আমাদের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত এবং কর্ম্মীর সংখ্যা যেরূপ অল্প, তাহাতে সংখ্যাবৃদ্ধির যে যথেষ্টই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কোথাও একমাত্র সংখ্যাধিক্য কার্য্যসাধনের নিয়ামক বা সফলতার কারণ নহে। —এ ক্ষেত্রে ত নয়ই। এতদ্ব্যতীত ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, শুধু কর্ম্মীদের উপরই সকল কার্য্য নির্ভর করিতেছে না, আমাদের প্রত্যেকের উপরও অনেকটা নির্ভর করিতেছে। আমরা যদি সকলে প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন লাভ করি, তবে তাহার প্রভাবও কোনও প্রকারে উপেক্ষার বিষয় হইবে না। নীরব জীবনের দ্বারাও বহু কার্য্য সাধিত হয়—জীবনের উপর জীবনের প্রভাব সামান্য নহে। আর যদি আমাদের অধিকাংশের জীবন তাহার বিপরীতই হয়, তবে তাহার অনিষ্টকর ফলও শুধু কর্ম্মীদের দ্বারা কিছুতেই নিবারিত হইবে না। অনুপযুক্ত কর্ম্মীর দ্বারা যদি কোনও অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে, তবে আমাদের অব্রাহ্মোচিত জীবনদ্বারাও সামান্য অপকার সাধিত হয় নাই। তাহারও প্রমাণ আমরা চারিদিকে যথেষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। নূতন বর্ষে, নূতন যুগে, আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন, ব্রহ্মানুগত জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্যই বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে যদি আমরা সফলতা লাভ করিতে পারি, তবে দেখিব আমরা দিন দিন সকল বিষয়েই সফল হইতেছি, কোনও বাধা বিঘ্নই আমাদের কোনও প্রকার অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না। উপযুক্ত কর্ম্মীরও কোনও প্রকার অভাব হইবে না। এদিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক, আমাদের সকল চেষ্টা নিয়োজিত হউক। করুণাময় পিতা আমাদিগকে সে বুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি প্রদান করুন। আমরা তাঁহার প্রেমিক সন্তান, বিশ্বস্ত ভৃত্য, অনুগত দাস হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। নববর্ষ আমাদিগকে নবজীবন প্রদান করুক। আমাদের জীবনে ও সমাজে একমাত্র তাঁহার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব।

(বা সুবর্ণ সাম্বৎসরিক)

আমরা ভয়ে ভয়েই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব সম্পাদনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। নানা-কারণে যথা সময়ে আয়োজন আরম্ভ হইতে পারে নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মিগণ গুরুতর শ্রম করিতে বাধ্য হইয়াছেন। করুণা-ময় পিতার উপর আশা ও নির্ভর রাখিয়াই তাঁহারা কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনিই সকল বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁহার অপার করুণায় সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা নব জাগরণ, নূতন আশা ও উদ্দীপনা, নূতন আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প, নূতন বল ও শক্তি লাভের জন্যই উৎসবক্ষেত্রে সকলে সম্মিলিত হইয়াছিলাম। এই কয় দিনের উৎসবে যাঁহারা যোগ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা যে প্রচুর পরিমাণেই তাহা লাভ করিয়াছেন, এ কথা আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপেই বলিতে পারি। বহুদিন এরূপ সম্মিলন আর হয় নাই। নানা দূরস্থান হইতে ব্যাকুল-প্রাণ বন্ধুগণ উৎসবক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। পঞ্জাব হইতে বৃদ্ধ ভাই রামকিশন, ভাই সীতারাম, ভাই প্রকাশ লাল ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত, বোম্বাই হইতে মিঃ জি ওয়াই চিৎনীশ, পাটনা হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গবিহারী লাল, শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত প্রেমরঙ্গবিহারী লাল, কটক হইতে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর, কাঁথি হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাস, আসাম ডিব্রুগড় হইতে শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ দাস, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার মিত্র, গৌহাটী হইতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, খাসিয়া পাহাড় হইতে শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, দিনাজপুর হইতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন, বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ, ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস, গিরিডি হইতে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস, চট্টগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়, ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন, রাঁচি হইতে শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বসু, মান্দ্রাজ হইতে শ্রীযুক্ত ই সুব্বা কৃষ্ণায়, গয়া হইতে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত দেবব্রত মল্লিক এবং নিকটবর্ত্তী নানা স্থান হইতে আরও অনেকে এবং ময়মনসিংহ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েকটী মহিলাও আসিয়া উৎসবকে সফলতা প্রদান করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালী অনুসারে উৎসবের কয় দিবস প্রত্যহই কোন কোন রাস্তায় উষাকীর্ত্তন করা হইয়াছে। কেহ কেহ পূর্ব্ব দিবস আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে ৫ই এপ্রিল প্রাতেও উষাকীর্ত্তন হইয়াছিল। প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ এই কীর্ত্তনের পরিচালক ছিলেন।

৫ই এপ্রিল (২৩শে চৈত্র) বৃহস্পতিবার—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা। মন্দির পূর্ব্বেই পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই পুরুষ ও মহিলাতে মন্দির পূর্ণ হইয়া গেল; সকলের মুখেই উৎসাহের ভাব দৃষ্ট হইল। কিছু সময় প্রমত্ত কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আশা ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উপাসনা আরম্ভ করেন। তিনি বিশেষ-ভাবে ভারতীয় ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ, বুদ্ধদেব, যিশু, মহম্মদ, চৈতন্য দেব ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গণকে এবং রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি পূর্ব্ব আচার্য্য ও সাধকগণকে স্মরণ করিয়া এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আদি গুরুরূপে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা অর্পণ করেন এবং সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া সকলের সহিত হৃদয়ে যুক্ত হইয়া উদ্বোধন করেন। তাহা সকলের হৃদয়তন্ত্রীকে স্পর্শ করিয়াছিল। আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হ'তে চল্‌ল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রতিষ্ঠার সময়ে যাঁহারা ইহার প্রধান সেবক ও সহায় ছিলেন, তাঁহারা এখন পরলোকে। তাঁহাদের হৃদয়ের যে আকাঙ্ক্ষা যে বিশ্বাস ও যে আত্মোৎসর্গ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আকার ধারণ ক'রে আমাদের সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে রয়েছে, তাহা আজ স্মরণ করি। সেই স্বর্গগত প্রবর্ত্তক ও সেবকদিগকে প্রণাম করি।

আজ আমাদের আনন্দ কর্‌বার ও কৃতজ্ঞ হবার দিন। আমাদের আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার প্রধান বিষয় এই যে, এই সমাজ আমাদের আত্মার শান্তিময় গৃহ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে সময়ে আমাদের স্বর্গগত প্রবর্ত্তকগণ আপনাদিগকে আধ্যাত্মিক ভাবে গৃহহীন ব'লে অনুভব কর্‌ছিলেন, সেই দিনগুলি আজ মনে পড়্‌ছে। তাঁদের অশ্রু ও তাঁদের হৃদয়বেদনার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য এই আধ্যাত্মিক নিরাপদ গৃহখানি রচিত হয়েছে। ক্রমে আমরা একে একে এসে এই ঘরে আমাদের আধ্যাত্মিক জন্ম লাভ করেছি। এই সমাজে আমরা সেই স্বর্গীয় অগ্রণীদের কাছে কাছে ব'সে মা বিশ্বজননীর মুখ দেখেছি, তাঁর ডাক শুনেছি; তাঁর নামের শান্তি, তাঁর প্রেমের স্নিগ্ধতা, তাঁর অভয়-বাণীর বল, কত আস্বাদন করেছি! কত উৎসবে তাঁর দয়ার কত প্লাবন, তাঁর সাধু ভক্ত সন্তানদের হৃদয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আমাদের জীবনে এসেছে; তাঁর দয়ার কত বন্যাতে আমাদের দুঃখ তাপ পাপ ভেসে গিয়েছে! আমাদের কত জীবনের পরিবর্ত্তন, আমাদের কত অনুতাপাশ্রু, শোক দুঃখে কত সান্ত্বনা, বিধাতার কাজে এবং তাহার জন্য সংগ্রামে কত অনুপ্রাণন, কত সম্মিলিত আত্মোৎসর্গ, জ্যেষ্ঠদের চরিত্র হ'তে যুবকদের জীবনে সংক্রান্ত কত পবিত্র সঙ্কল্প, এই সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। আজ সর্ব্বাগ্রে আমরা তাহাই স্মরণ করি। আবার, পঞ্চাশ বৎসরে এই সমাজ আমাদের মতন পৃথিবীর আরও কত দুঃখী তাপীর কাছে দয়ালের দয়ার বার্ত্তা

বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছেন; আমাদের মতন আরও কত পাপীর হৃদয় মায়ের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন; কত গৃহে কত পরিবারে তিন পুরুষ ধ'রে দয়ালের নাম ধ্বনিত ক'রেছেন, ব্রহ্মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন, তাহা আজ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। কৃতজ্ঞতায় আজ হৃদয় ভেসে যাক্।

আজ মায়ের দয়া সব চেয়ে বেশী কোথায় দেখ্‌ব? মানুষের জীবনে, মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তনে, মানুষের চরিত্রের মহত্ত্বে তাঁর লীলা আজ প্রধান ভাবে দেখ্‌ব। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কিসের স্থান? মানুষের জীবনে সেই সত্যস্বরূপ যে জলন্ত জীবন্ত ভাবে কাজ করেন, তাই দেখ্‌বার স্থান। আজ কৃতজ্ঞ প্রাণে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে, স্মরণ করি আমাদের সেই মানুষগুলিকে। এ সমাজ পঞ্চাশ বৎসরে দেশের সঙ্গে দেশের অনেক কাজ করেছেন বটে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় কথা এই যে, এ সমাজ জন্মাবধিই কতকগুলি মানুষের মতন মানুষের সমাজ হয়েছেন। আজ আচার্য্য শিবনাথের ব্যাকুলতায় প্রদীপ্ত মুখশ্রী স্মরণ করি। উৎসবের সময়ে তিনি যেন নিজ ব্যাকুলতার রজ্জু দিয়ে আমাদের মনগুলিকে নিজের সঙ্গে বেঁধে ঈশ্বরচরণে টেনে নিয়ে যেতেন, সে কথা আজ স্মরণ করি। তাঁর মনের মহত্ত্ব, তাঁর উদারতা ও বীরত্ব, সকল পাপ দুর্নীতি লঘুতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর আজীবন সতেজ সংগ্রাম, ব্রাহ্মসমাজের কাজে তাঁর নিঃশেষে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ, তাঁর সেই অপূর্ব্ব ত্যাগ,—এ সকল আজ আমরা স্মরণ করি। সাধক উমেশচন্দ্রকে স্মরণ করি। তাঁর সেই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সেই বিনীত অথচ দৃঢ় অনুরাগ, সেই ধর্ম্মের জন্য লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন নীরবে বরণ, সেই অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা, আজ আমরা স্মরণ করি। শান্তস্বভাব বীরপ্রকৃতি জনহিতব্রত শিবচন্দ্রকে স্মরণ করি। মধুরদর্শন মধুরস্বভাব সংযতবাক্ সৌজন্য ও প্রতিভার আধার আনন্দমোহনকে স্মরণ করি। অক্লান্তকর্ম্মা, অধ্যবসায়শীল, সকলের সুখ দুঃখে পরম বন্ধু মহালানবিশ মহাশয়কে স্মরণ করি। দানবীর উদারহৃদয় দুর্গামোহনকে স্মরণ করি। মূর্ত্তিমান তেজঃস্বরূপ নারীবন্ধু স্বাধীনতার উপাসক দ্বারকানাথকে স্মরণ করি। ব্রহ্মনামরসে নিমগ্ন ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়কে এবং সাধকাগ্রগণ্য কালীনাথ দত্ত মহাশয়কে স্মরণ করি। আজীবন জনসেবায় ও ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ভুবনমোহন কর মহাশয়কে স্মরণ করি। পরম সহৃদয় আর্ত্তের বন্ধু নবদ্বীপচন্দ্রকে স্মরণ করি। জ্ঞানচর্চ্চায় আত্মবিস্মৃত, তর্কযুদ্ধে বীর, কঠোর দারিদ্র্যে চিরসহাস্যমুখ নগেন্দ্রনাথকে স্মরণ করি। ত্যাগে ও বীরত্বে উজ্জ্বল, বাধাবিপত্তিতে অটল, রোগ দারিদ্র্য সংগ্রামে অচল, পঞ্জাবকেশরী ভাই প্রকাশ দেবজীকে স্মরণ করি। বিশ্বাসী গুরুদাস ও কাশীচন্দ্রকে স্মরণ করি। নবীনচন্দ্র রায়, ব্রজসুন্দর মিত্র, গিরিশচন্দ্র মজুমদার, সর্ব্বানন্দ দাস প্রভৃতি যে সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক ও সেবক এই সমাজের পতাকা নানা স্থানে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। যাঁহারা এক সময়ে এই সমাজের সেবাসূত্রে কত মানুষের মধ্যে ধর্ম্মজীবনের প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, সেই ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়কেও আজ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আরও কত স্মরণীয় জ্ঞানী ভক্ত ও নিষ্ঠাবান্ সেবক অভ্যুদিত হ'য়েছিলেন; অল্প সময়ের মধ্যে সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমরা আজ এই অনুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ করি যে, আমাদের এই সমাজ জীবন-জ্যোতিতে চরিত্র-জ্যোতিতে উজ্জ্বল। আমাদের এই সকল জলন্ত চরিত্রসম্পন্ন মানুষগুলিকে নিয়েই আমাদের প্রধান গৌরব। একটি ধর্ম্ম-সমাজের সম্বন্ধে দেখ্‌বার প্রধান বিষয় এই যে, সে কেমন মানুষ প্রস্তুত করে, কেমন মানুষসকলকে জনসমাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান করায়। এই দিক দিয়ে এ সমাজের ইতিহাসকে দেখ্‌লে আমাদের মন কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত ও অনুপ্রাণনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে। বন্ধুগণ, আজ প্রাণ ভ'রে অনুভব কর, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব শুধু ইহার সমাজসংস্কারে অথবা ইহার কল্যাণকর্ম্মে অথবা ইহার নিয়মতন্ত্রে নয়। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা কতকগুলি মানুষের মতন মানুষের সমাজ। ইহা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব মহত্ত্ব বীরত্ব ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ সঞ্চার করবার জন্য বিধাতার জলন্ত বিধান। ইহা সেই স্থান, যেখানে মানুষ আসে মাটির ঢেলার মতন; পরে হ'য়ে যায় আগুনের গোলার মতন। ইহা সেই স্থান, যেখানে বিধাতা মানুষের জীবন নিয়ে এই অলৌকিক লীলা করেন।

কিন্তু আজ আমাদের কর্ত্তব্য শুধু আমাদের কর্ম্মী ও অগ্রণীদের জন্যই আনন্দ করা নয়; আজ আমাদের সব ভাই বোনদের স্মরণ ক'রে আমরা কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হব। এই সমাজ যে এতগুলি মানুষকে ও এতগুলি পরিবারকে আপনার অন্তর্গত ক'রে ধর্ম্মের বাঁধনে পরস্পরের সঙ্গে ও নিজের সঙ্গে বাঁধতে পেরেছেন, ইহার জন্য আমরা আজ প্রাণ খুলে আনন্দ করি। "এতগুলি মানুষ" এ কথায় হয়তো অনেকের মনে হবে, "কই, আমাদের সংখ্যা আশানুরূপ বেড়েছে কই? ঐ তো অমুক অমুক প্রতিষ্ঠানে কত অল্প সময়ে লোকসংখ্যা আমাদের চেয়ে কত বেশী বেড়ে গিয়েছে। তারা যখন দলবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ায়, ও বড় বড় সভা সমিতির সৃষ্টি করে, তার বিবরণ পাঠ ক'রে অপরের মনেও কত উৎসাহ জাগে।"—সত্য বটে, সংখ্যায় আমরা দুর্ব্বল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ কি-বাঁধনে তাঁর মানুষগুলিকে বাঁধেন, কি-ডাকে তাঁর মানুষগুলিকে ডাকেন, তা আমরা একবার ভেবে দেখি। শুধু কোনও বিশেষ মত স্বীকার করতে নয়, শুধু একটি বিশেষ পূজার প্রণালী অনুসরণ করতে নয়, শুধু সভাসমিতিতে উপস্থিত হ'তে নয়, শুধু কোন বাহিরের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়তে নয়, শুধু কোন উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হ'তে নয়, অথবা শুধু কোন বাহ্য বিষয়ে ত্যাগস্বীকার করতেও নয়। কিন্তু ধীর ভাবে সংকল্প ক'রে, সমগ্র জীবন, সকল আচরণ, সকল উপার্জ্জন ও সকল ব্যয়, সকল আমোদ আহ্লাদ, পৃথিবীর সকল সম্বন্ধ, সমগ্র গৃহ পরিবার,—এক কথায় মানুষের যা কিছু আছে সবই, ধর্ম্মের শাসনের অধীন ক'রে দিতে আহ্বান করেন। ব্রাহ্মসমাজ মানুষকে এমন একটি আদর্শ দান করেন, যা তাহার সমগ্র জীবনকে পরিবর্ত্তিত করবে। এই আহ্বানে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে অর্পিত এক একটি মস্তক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অর্পিত সহস্রটি

মস্তকের সমান। এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ঈশ্বরচরণে মস্তক দিতে গিয়ে কত অল্পবয়স্ক বালক, কত অসহায়া দুর্ব্বলা নারী, কত স্বজনপরিত্যক্ত দরিদ্র মানুষ, কত নির্য্যাতন কত লাঞ্ছনা কত ক্লেশ আনন্দে বহন ক'রেছেন। কিসের টানে তাঁরা সকলকে ছেড়ে এই সমাজকে আশ্রয় ক'রেছিলেন? এ সমাজ তো তাঁদের কোন সাংসারিক দুঃখ দূর করতে পারে নাই। অভাবের সময়ে এক মুষ্টি অন্নও তো দিতে পারে নাই। তবু তাঁরা ইহার দ্বার হ'তে মাথা তুলে নেন নাই। এ কিসের টান? কিসের বাঁধন? এমন বাঁধনে জগতে আর কে মানুষকে বাঁধতে পারে? যে পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজ ইহার অনুবর্ত্তী মানুষগুলির জীবনের ও আচরণের উপরে, বাক্য কার্য্য ও চিন্তার উপরে, এইরূপ প্রভাব ও প্রভুত্ব স্থাপন করেছেন, সেই পরিমাণেই ইহার বল। এই বলের পরিমাণ লোকসংখ্যা দিয়ে নির্ণয় হয় না। কয় জন লোক কোন্ প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়েছেন, তার সংখ্যার তুলনা করা অতি তুচ্ছ কথা। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের যোগের গাঢ়তা, তাঁদের জীবনের উপরে ধর্ম্মের প্রভাবের ব্যাপকতা, বন্ধনশৃঙ্খলের দৃঢ়তা,—ইহাই প্রধান কথা। এই দেশের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত যে সকল মানুষ ও যে সকল পরিবার ধর্ম্মের সুদৃঢ় বাঁধন দিয়ে আপনাদিগকে ও আপনাদের পারিবারিক জীবনকে এই সমাজের সঙ্গে বেঁধেছেন, তাঁদের সংখ্যা আজ কয়েক শতই হোক অথবা কয়েকটি মাত্র হোক, যত অল্প হয় হোক, তাঁদের সঙ্গে এই বাঁধনগুলিই এই সমাজের শক্তি, তাহাই এই সমাজের সুদৃঢ় ও সুদূরপ্রসারিত মূল। আজ আমরা এই সকল বাঁধনের জন্য প্রাণ ভ'রে দেবতার চরণে কৃতজ্ঞতা দান করি।

আজ সেই প্রাণের টানে দেশ বিদেশ হ'তে যে সকল বন্ধু আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের মুখগুলি দেখে' আমাদের হৃদয় উথলে উঠ্‌চে। তাঁদের আমরা সাদরে হৃদয়ে ধরি। যাঁরা আস্‌তে পারেন নি তাঁদেরও আমরা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করি। কত দূর দূর নগরে ও গ্রামে আমাদের কত নমস্য কত পূজ্য মানুষ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ধর্ম্মসংগ্রামের কত আঘাতের চিহ্ন বুকে ধ'রে, ব্রহ্মচরণে প্রাণমন অর্পণ ক'রে, বার্দ্ধক্যে রোগে জীর্ণ হ'য়ে, প'ড়ে রয়েছেন। আজ আমাদের প্রাণ তাঁদের সকলের দিকে ছুটে যাচ্চে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সেই বাঁধন, যা রক্তের বাঁধনের চেয়ে পবিত্রতর ও দৃঢ়তর, তা আজ অনুভব করি। আমাদের কত সময়ে ইচ্ছা হয়, মফঃসলের সেই সকল নগরে ও গ্রামে তীর্থযাত্রীর ভাবে গমন করি। সেই সেই আকাশের তলে, নদীতীরে, পুকুরের ধারে, ঝোপে, বনে, যেখানে যেখানে আমাদের আত্মার এক এক জন আত্মীয়ের হাতখানি পরমেশ্বর ধরেছিলেন, যেখানে যেখানে তাঁদের জীবনে বিশেষ ক'রে পরমেশ্বর দেখা দিয়েছিলেন, সেখানেই তো ব্রাহ্মদের পরম তীর্থ। ইচ্ছা হয়, সেই সেই স্থানে গিয়ে সেই তীর্থের অনুপ্রাণনধারায় স্নাত হ'য়ে আসি। যেখানে পরমেশ্বর মানবজীবনকে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করেন, সেখানেই মানবের তীর্থ; এবং যেখানে পরমেশ্বর **আমাদের** প্রাণের মানুষগুলিকে ধরেন, স্পর্শ করেন, সেখানেই **আমাদের** তীর্থ। আমি এই তীর্থ বড় মানি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এমন তীর্থ এদেশে অনেক ছড়ানো আছে। সেই সকল প্রাণের প্রিয় মানুষকে ও তাঁদের ধর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্রকে আজ মনশ্চক্ষে দেখি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কেমন স্থান? এমন এক স্থান, যেখানে প্রাণ হ'তে প্রাণে ডাক ছুটে যায়, যেখানে প্রাণে প্রাণে ঠেকাঠেকি হয়; যেখানে এক জন মানুষ আর এক জন মানুষকে বুকে ধ'রে বল পায় শান্তি পায়, এবং স্মরণ ক'রে জীবনে অনুপ্রাণন লাভ করে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এমন স্থান যেখানে আমরা আমাদের প্রিয় মানুষগুলির জীবনে ব্রহ্মের জলন্ত লীলা দেখ্‌তে পাই।

আজ এই বিশেষ উৎসবের দিনে ভাই বোন, তোমাদের বিশেষ ভাবে আহ্বান করি, নিজ নিজ সঙ্গী ও বন্ধুদের জীবনে ঈশ্বরের হাত, ঈশ্বরের কাজ, উজ্জ্বল ভাবে দেখ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মানুষগুলির মধ্যে সত্যস্বরূপের জীবন্ত লীলা দেখ। মানবইতিবৃত্তে সাধারণ ভাবে বিধাতার লীলা দেখা ভাল বটে; কিন্তু এক এক জনের ব্যক্তিগত জীবনে তাহা দেখা আরও ভাল। সাধু ভক্ত চরিত্রে দয়ালের দয়া দেখা ভাল বটে; কিন্তু সমসাময়িক ও নিকট বন্ধুদের জীবনে তাহা দেখা আরও ভাল। জগতের প্রাচীন ধর্ম্মবিধানসকলে বিধাতার হাত দেখা ভাল বটে; কিন্তু নিজের ধর্ম্মবিধানধারার মধ্যে তাহা দেখা আরও ভাল। দায়িত্ববিহীন শিথিল প্রশংসার চক্ষে দূরের মানুষকে ঈশ্বরের স্পর্শে মণ্ডিত দেখার চেয়ে, নিজের নিকট বন্ধুদের জীবনকে ঈশ্বরের স্পর্শের আলোকে, তাঁহার বিধাতৃত্বের আভায়, মণ্ডিত দেখা অধিক প্রয়োজন। সেই দয়াময় এসে যে জীবনের দুঃখে সংগ্রামে বন্ধুর হাতখানি ধরেছেন, ও বন্ধু যে তাঁর হাতে ধরা দিয়েছেন, সে ব্যাপার দেখা ও সেজন্য বন্ধুকে শ্রদ্ধা দেওয়া, এবং বন্ধুর জীবনের সে অনুপ্রাণনে সঙ্গী হওয়া বড়ই প্রয়োজন। প্রতিদিনের একত্র কর্ম্মের সহস্র সংঘাতের ভিতরে বন্ধুর জীবনে সেই হাত ধরার ব্যাপারখানি স্মরণে রেখে সেই ভাবে তাঁর সঙ্গে মেশা ও ব্যবহার করা, ইহা বড়ই প্রয়োজন। যদি আমাদের দলে, আমাদের সমাজে, আমাদের মানুষগুলির জীবনে বিধাতার হাত না দেখি, তবে যেন বিধাতার ভর্ৎসনা শুন্‌তে পাই, "ওরে হতভাগ্যগণ, তোরা শুধু কি দূরবীণ্ দিয়ে আমাকে দেখ্‌বি, চোখ দিয়ে যেখানে দেখা যায়, সেখানে কি দেখ্‌বি না?" আমরা যদি এত দিন তাহা না দেখে' থাকি, আজ দেখা চাই। যে সকল মানুষকে ও যে সকল পরিবারকে নিয়ে আমাদের এই বিস্তীর্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, তাঁদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের লীলা আজ দর্শন করি; তাঁদের সকলের সঙ্গে প্রাণের বন্ধন আজ অনুভব করি। তাঁদের সকলের জন্য কৃতজ্ঞতায় আজ হৃদয় পূর্ণ করি।

তার পরে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরকৃপায় পঞ্চাশ বৎসরে জনসমাজে যত কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছেন, তা স্মরণ ক'রেও আজ আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধকে স্বাধীনতায় ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই সমাজ অবিরাম যে চেষ্টা ক'রেছেন, এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মসমাজের ও ক্রমশঃ সমগ্র দেশের পারিবারিক জীবনে যে উন্নত

আদর্শ, যে পবিত্রতা ও যে মধুরতা সঞ্চারিত হয়েছে, বঙ্গদেশে নারীর শিক্ষাকে, নারীর স্বচ্ছন্দ অবাধ গতিবিধির অধিকারকে ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্রকে এই সমাজ যে পরিমাণে প্রসারিত ক'রে দিতে সমর্থ হ'য়েছেন, নিগৃহীত অনুন্নত শ্রেণীর সেবা ক'রে, নিগৃহীতা নারীর রক্ষার ও সহায়তার আয়োজন ক'রে এই সমাজ যে-পরিমাণে নিগৃহীতের ও অত্যাচরিতের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জ্জন করেছেন, বিদ্যামন্দির হ'তে লঘুতাকে, আমোদ হ'তে দুর্নীতিকে, দলবদ্ধ কর্ম্ম হ'তে অসাধুতাকে দূরে রাখবার জন্য এই সমাজ যে প্রাণপণ সংগ্রামে নিযুক্ত র'য়েছেন, ধর্ম্মসমাজের কার্য্যকে এই সমাজ যে-পরিমাণে সর্ব্বসাধারণের মতের প্রতি শ্রদ্ধার সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে সমর্থ হয়েছেন, এই প্রণালীতে কার্য্য ক'রে ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা দেশ মধ্যে যে পরিমাণে প্রচার ক'রেছেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের যন্তগুলি স্থায়ী ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন,—কোনও একটি বৃহত্তর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষেও তাহা পঞ্চাশ বৎসরের কার্য্যের অতি গৌরবময় বিবরণ ব'লে বিবেচিত হবার যোগ্য।

কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী এই উজ্জ্বল কর্ম্ম-ইতিহাসকে ভাবতে গিয়েও আজ আমার মন এই সকল কাজের পরিমাণ ও গুরুত্বের কথা প্রধান ভাবে চিন্তা কর্‌তে অগ্রসর হচ্চে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাজ যত বড় বস্তু হোক্ না কেন, ভগবৎপ্রেরণায় ইহার মানুষগুলির অন্তরে যে আদর্শ ও যে বিশ্বাস সঞ্চারিত হ'য়ে ইহার সকল কার্য্যের জন্ম দান ক'রেছে, তাহা আরও বড়। আজ ইহার কর্ম্ম-ইতিহাসকেও আমরা অন্তরের দিক হইতেই দেখি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম ইতিহাসের অন্তরের শিক্ষা কি কি? সে শিক্ষা প্রধানতঃ দুটি। (১) মানুষের সকল কল্যাণকর্ম্মে ঈশ্বর বড় অংশী, মানুষ ছোট অংশী; এবং (২) ঈশ্বরে অর্পিত জীবন ও উন্নত চরিত্রই সকল কল্যাণকর্ম্মের ভিত্তি।

"ঈশ্বর বড় অংশী," এ কথার অর্থ কি? এটি বিশ্বাসী মহামতি গ্লেড সাহেবের উক্তি। তিনি যখন একবার ইংলণ্ডে একটী দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের নেতৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন, যখন ইংলণ্ডের সমগ্র অভিজাতমণ্ডলী তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'য়েছিলেন, যখন দিনের পর দিন তাঁহার পরিশ্রম সংগ্রাম ও উদ্বেগের আর অন্ত ছিল না, সেই সময়ে তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মহাশয়, এত উদ্বেগে ও পরিশ্রমে বোধ হয় রাত্রিতে আপনার সুনিদ্রা হয় না?" গ্লেড উত্তর ক'রেছিলেন, "কেন হবে না? দিনের বেলায় আমার যা কাজ আমি তা প্রাণপণে সম্পন্ন করি; রাত্রিতে সব ভার আমার Senior Partnerএর হাতে ফেলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাই।" এখানে Senior Partner বল্‌তে তাঁর অভিপ্রায় ছিল, ঈশ্বর। কি অটল বিশ্বাস ও কি মহৎ উত্তর! সেই বিশ্বাসী পুরুষের এই উত্তর যত বার স্মরণ করি, হৃদয় উন্নত হয়।

বিশ্বাসীর কাছে সকল কর্ম্মে মানুষ ছোট অংশী, ঈশ্বর বড় অংশী। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের মতন একটি ধর্ম্মসমাজের কার্য্যে মানুষ ছোট অংশীদার, বিধাতাই বড় অংশীদার, এ কথা মনে রাখা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সংসারের মানুষ অনেক সময় বিধাতাকে দেখে না; কারণ, তাঁর কাজ প্রধানতঃ মানবের নিভৃত অন্তর্জীবনে হয়, এবং তাহা ধীরে ও নিঃশব্দে হয়। তাঁকে না দেখে', কখনও বা মানুষ তাঁকে অতিক্রম ক'রে অগ্রাহ্য ক'রে চলে; কখনও বা আপনার শক্তিতেই আপনাকে জয়ী মনে ক'রে আস্ফালন করে; কখনও বা বিপদের দিনে নিজের পশ্চাতে তাঁকে না দেখে' ভয় পায়। কিন্তু তাঁকে যে দেখে, সে কখনও ভয় পায় না।

বল দেখি, ভাই বোন্, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বড় কর্ত্তা, বড় অংশীদার, এতদিন ধ'রে কে ছিলেন, এবং ইহার জীবনে তিনি প্রধানতঃ কি কাজ কর্‌ছিলেন? তাঁর হাত কি দেখ? তবে ভয় নাই! তাঁর কাজ প্রধানতঃ কোথায় হয়? মানুষের অন্তরে হয়। তাঁর কাজ কিরূপ প্রণালীতে হয়? ধীরে ও নিঃশব্দে হয়। বীজবপনের জন্য মাটি কাটে মানুষ, মাটি ভাঙ্গে মানুষ, বীজটিকে মাটিতে পুঁতে দেয় মানুষ, তাতে জল সেচন করে মানুষ। কিন্তু বীজটিকে ধীরে ধীরে ফুলিয়ে তোলেন ঈশ্বর, ফাটিয়ে ফেলেন ঈশ্বর, তা থেকে অঙ্কুর উদগত করেন ঈশ্বর। ক্ষুদ্র বৃক্ষকে বনস্পতিতে পরিণত করেন ঈশ্বর। এ কাজেও তো মানুষ ছোট অংশীদার, ঈশ্বর বড় অংশীদার; এখানেও তো মানুষের হাতে এবং ঈশ্বরের হাতে স্পষ্ট ঠেকাঠেকি হয়। কিন্তু এখানেও ঈশ্বরের কাজটি ধীরে ও নিঃশব্দে হয় ব'লে সাধারণতঃ মানুষ তাঁকে দেখে না, মনে রাখে না।

বিধাতা ধর্ম্মসমাজের দ্বারা দেশে যে কাজ সম্পন্ন করান, তাহা যত বড়ই হোক্, মানব-অন্তরে যে কাজটি করেন, তাহা আরও বড়। আজ শুধু পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসকে নয়, শত বৎসরের ইতিহাসকেও এই চক্ষে দেখি। শত বর্ষ পূর্ব্বে রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, তখন অবোধ লোকেরা দেখ্‌তে লাগ্‌ল, ধর্ম্মসভায় উপস্থিত বড় লোকদের জুড়ি-গাড়ীর দীর্ঘ শ্রেণী রাজপথের কতখানি স্থান অধিকার ক'রে দণ্ডায়মান র'য়েছে আর 'ব্রহ্মসভা' তার তুলনায় কত ক্ষুদ্র। তারা বল্‌তে লাগ্‌ল, "ধর্ম্মসভা ব্রহ্মসভার পিত্ত গালিয়া বাহির করিবে।" তারা জান্‌ত না যে ব্রাহ্মসমাজটা ধর্ম্মসভার মতন একটা মানবীয় পরামর্শের বা মানবীয় উদ্যোগের স্থান নয়; তারা জান্‌ত না যে ব্রাহ্মসমাজের কাজ অন্তরে। যিনি প্রতি জীবনে, প্রতি মানব-সমাজে, ও জগতের যাবৎ ব্যাপারে বড় অংশীদার, মানুষের জীবনকে তাঁহার সঙ্গে মিলিত ক'রে দেওয়াই ব্রাহ্মসমাজের কাজ। তারা জান্‌ত না যে ব্রাহ্মসমাজ এক দিন দেশের মানুষকে সেই পরম অংশীদারের হস্তে আত্মসমর্পণ কর্‌তে শিখাবে, এবং সেই বড় অংশীদারের অনন্ত শক্তি সেই সকল মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে বঙ্গসমাজে প্রবাহিত ক'রে আন্‌বে, ও তার দ্বারা দেশকে আলোড়িত কর্‌বে।

সেই বড় অংশীদার গোল মাল ক'রে কাজ করেন না। সভাসমিতি তাঁর কাজের নিদর্শন নয়, সংবাদপত্রের ঘোষণা তাঁর কাজের সাক্ষ্য নয়, কাতারে কাতারে শ্রেণীবদ্ধ গাড়ী তাঁর কাজের চিহ্ন নয়, স্পর্দ্ধিত মানবের নানা আস্ফালন তাঁর শক্তির পরিচয় নয়। বীজ হ'তে গাছটি হয় নিঃশব্দে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ বনস্পতিতে পরিণত হয় নিঃশব্দে, জীবদেহে রস রক্ত

সৃষ্টি হয় নিঃশব্দে। তেমনি মানব-অন্তর বিমল জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় ধীরে ও নিঃশব্দে; মানুষে মহৎ চরিত্র গঠিত হয় ধীরে ও নিঃশব্দে; মানব-হৃদয়ে প্রেমের মহত্ত্ব ও ধর্ম্মের বীরত্ব সঞ্চারিত হয় ধীরে ও নিঃশব্দে; জনসমাজের অকল্যাণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানব-প্রাণ দৃঢ় সঙ্কল্পে আরূঢ় হয় ধীরে ও নিঃশব্দে; ভীরু, মেরুদণ্ডবিহীন, প্রবলের পদানত হইতে চিরঅভ্যস্ত একটি জাতির মধ্যে, সত্যে দৃঢ়, লোক-ভয়ে নির্ভীক, আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত কতকগুলি মানুষের অভ্যুদয় হয় ধীরে ও নিঃশব্দে। এই প্রণালীতেই শাস্ত্রী শাস্ত্রী হ'য়েছিলেন, আনন্দমোহন আনন্দমোহন হ'য়েছিলেন, দ্বারকানাথ দ্বারকানাথ হ'য়েছিলেন। বড় অংশীদারের এই ধীর ও নিঃশব্দ কার্য্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ও ইহার তেজস্বী কর্ম্মীদের জীবনে অতি সমুজ্জ্বল। সেই মহান্ প্রভু **আগে** তাঁহাদের অন্তরকে পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে নিজ আদর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত ক'রেছেন, **পরে** তাঁহাদের দ্বারা দেশকে আন্দোলিত ও আলোড়িত ক'রেছেন। তাঁহারা যে কুসংস্কারের দুর্গকে উৎখাত ক'রেছেন, তাঁহারা যে দেশের নৈতিক বায়ুকে বিশুদ্ধ ক'রেছেন, 'সময় হয়নি' ব'লে অগ্রসর হ'তে অপ্রস্তুত কুণ্ঠিতচরণ সমাজকে তাঁহারা যে সবলে কেশে ধ'রে সংস্কারের পথে আকর্ষণ ক'রে এনেছেন, ইহা সত্য বটে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা নিভৃতে ঈশ্বরচরণে ব'সে ব'সে নিজ চিন্তাকে বিশাল ক'রেছেন, চরিত্রকে অগ্নিময় ক'রেছেন, আকাঙ্ক্ষাকে ঊর্দ্ধগামী ক'রেছেন, মনকে বীর্য্যে আত্মোৎসর্গে ও বিশ্বাস বৈরাগ্য সেবার আদর্শে পূর্ণ ক'রে নিয়েছেন। বল দেখি বন্ধুগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মের কাজ আর দেখ্‌বে কোথায়? কোনও কোনও যুগে দেশের নানা আন্দোলনের ইতিহাসে যে ইহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি সাগ্রহে স্বীকৃত হয়েছে, কখনও কখনও সংবাদপত্রসকল যে ইহার প্রশংসায় মুখরিত হ'য়েছে, অথবা ইহার কোনও কোনও মানুষ যে রাজকার্য্যসূত্রে ভারতে কিংবা ধর্ম্মপ্রচারসূত্রে ইংলণ্ডে আমেরিকায় সম্মানিত হ'য়েছেন, এ সকলেই কি তুমি ব্রহ্মের লীলা দেখ্‌বে? এ সকলকেই কি তুমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘটনা ব'লে মনে কর? না, ঐ মানুষগুলি নিভৃতে ঈশ্বরচরণে ব'সে ব'সে জীবনে ও চরিত্রে যে অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চয় ক'রেছিলেন, তাকেই তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার ব'লে মনে কর?

অথবা, তুমি একবার নিজের দিকে তাকাও। তোমার দ্বারাও হয়তো কিছু ভাল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তোমার জীবনে তাকেই তুমি বড় ব'লে দেখ, না, তোমার অন্তর্জীবনের পরিবর্ত্তনকে বড় ব'লে দেখ? তোমার চেতনায় যেখানে পূর্ব্বে জড়ের আকর্ষণ ছিল, সেখানে যে এখন অতীন্দ্রিয়ের আকর্ষণের উদয় হ'য়েছে, তোমার আত্মার রসনা পূর্ব্বে যে-সকল নিকৃষ্ট সুখের আস্বাদনে সুখ লাভ ক'রত, এখন যে সে সকল তোমার কাছে বিস্বাদ হ'য়ে গিয়েছে, মিথ্যাচরণ ও প্রবঞ্চনা যে এখন তুমি কল্পনাতেও সহ্য করতে পার না, সাধুতার ও পবিত্রতার আদর্শ যে একটি ইস্পাতের পাতের মত' তোমার ইচ্ছার সহিত মিশিয়া গিয়া তোমার শিথিল ইচ্ছাকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে, তুমি যে সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছ, তোমার জীবনে ইহাই কি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার নয়? তোমার বাহিরের কোনও সফলতা অথবা কীর্ত্তি অপেক্ষা এ সকল অন্তরের পরিবর্ত্তনেই কি তোমার জীবনে সেই বড় অংশীদারের হাত অধিক স্পষ্ট নয়?

অথবা ধর্ম্মের টানে ব্রাহ্মসমাজে যখন একটি নূতন মানুষ আসে, সে দৃশ্যের দিকে তাকাও। বীজটি ফুলিয়া উঠার মত, ফাটিয় যাওয়ার মত,' তা হ'তে অঙ্কুর বাহির হওয়ার মত,' সেই মানুষের জীবন পরিবর্ত্তনে ব্রহ্মের লীলা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। দেখা যায়, তাহার দৃষ্টি দিনে দিনে কেমন গভীর হইতেছে, তাহার চিন্তা দিনে দিনে কেমন গাঢ়তা লাভ করিতেছে। ঐ দেখ, পূর্ব্বে অভ্যস্ত কদভ্যাসের জন্য অনুতাপে তাহার হৃদয় ফুলিল, ফাটিল ঐ দেখ, নব সংযমে তাহার রসনা চক্ষু ও হস্তপদ সংযত হইয়া আসিল। ঐ দেখ, আত্মসমর্পণের ও শ্রদ্ধার ফুল তাহার হৃদয়ে ফুটিল। ঐ দেখ, মহৎ সঙ্কল্পের জোয়ার তাহার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া আসিল। ঐ দেখ, নূতন জীবনের আনন্দ তার মুখে চোখে নূতন একটি আভার মত' প্রদীপ্ত হইল। যাহাকে একদিন তুমি তোমার অনুসরণকারী বলিয়া দেখিয়াছিলে, সে ক্রমে ক্রমে তোমার সঙ্গী ও বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল, দেবদর্শনে তোমার সহযাত্রী হইয়া উঠিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই পবিত্র দৃশ্য আমরা কতবার দেখিয়াছি। জিজ্ঞাসা করি, সে ইতিহাসের কোন্ ঘটনা ইহা হইতে বড়? দেশব্যাপী কোন্ আন্দোলন ইহা হইতে অধিক মূল্যবান্? আজ আমরা বাহিরের কাজের ও সফলতার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আনিয়া মানব অন্তরে বিধাতার এই সকল লীলার দিকে দৃষ্টিপাত করি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ কার্য্যধারার গূঢ় উৎস এখানে। এই কার্য্যের পক্ষে দেশ ও সমাজ যেন রঙ্গভূমি, আর যেখানে ব্রহ্মের কাছে মানবহৃদয় আত্মসমর্পণ করে, সেই নিভৃত প্রাণনিকেতন যেন তার সাজঘর। যদি বিশ্বাসী হও, তবে শুধু রঙ্গভূমির দিকে তাকাইও না, সাজ-ঘরের ব্যাপারও একবার দেখ!

সেই সাজঘরে যেমন এক এক জীবনের বিকাশে ব্রহ্মের লীলা, তেমনি আবার, জীবনে জীবনে সকল স্পর্শের ব্যাপারে, এক জীবন হইতে আর এক জীবনে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার ব্যাপারে, ব্রহ্মের লীলা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে, সেই সত্যপুরুষের অপূর্ব্ব লীলায় কত বার এক জনের ব্যাকুলতা ও আত্মোৎসর্গ আর দশ জনের মধ্যে সংক্রান্ত হয়েছে, এক জনকে দেখে' আর দশ জন ঈশ্বরের সেবায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায়, কত বার কত নরনারী 'অনলে পতঙ্গের' মতন জীবন যৌবন ব্রাহ্মসমাজের সেবার যজ্ঞে নিক্ষেপ করেছেন। এর মধ্যে কি ব্রহ্মের লীলা দেখ্‌বে না? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তো কোনও নেতা কোনও অনুবর্ত্তীকে কখনও বলেন নাই যে "আমাকে আদর্শ মনে কর", কিংবা "আমার অনুসরণ কর"। কিন্তু সকল হৃদয়ের যিনি এক প্রভু, তিনিই একের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ অপরের হৃদয়ে সংক্রান্ত ক'রে দিয়েছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের কাজ সম্বন্ধে মানুষেরা শুধু পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে না। এ সমাজ এমন

স্থান, যেখানে একটি জীবন আর একটি জীবনকে ব্রহ্মের হাত দিয়ে সেবার ক্ষেত্রে টেনে আনে; যেখানে ভক্তেরা ভগবানের কাছে নাম ক'রে ক'রে মানুষের জীবন ভিক্ষা করেন, এবং সে ভিক্ষা ভগবান্ পূর্ণ করেন। এ সমাজ শুধু একটা কাজ করবার জায়গা নয়, মানুষের জীবনক্ষেত্রে ধর্ম্মের বেড়া-আগুন লাগাবার জায়গা। যেমন খড়ের চালার বাজারে একখানি চালাতে আগুন ধরলে দশখানি চালা জলে, তেমনি, এখানে এক প্রাণ থেকে দশটি প্রাণে আগুন লাগে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সত্য পরিচয় এই সাজঘরে,—প্রতি জীবনের বিকাশে এবং জীবনে জীবনে সংস্পর্শের ব্যাপারে,—আমরা আজ তাহা অনুভব করি।

এই সকলই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের সকলের চেয়ে বড় ঘটনা। পঞ্চাশ বৎসরে এই সমাজ কি ক'রেছেন, ভবিষ্যতে এ সমাজ কি করবেন? এ সমাজের কাজ,—দয়ালের নাম মানুষের দ্বারে দ্বারে নিয়ে যাওয়া, মানুষকে সেই পরম প্রভুর সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে তার হৃদয় পরিবর্ত্তন ও জীবন পরিবর্ত্তন করা, তার মধ্যে জলন্ত চরিত্র সঞ্চার করা। এ সমাজের কাজ, মানুষ সৃষ্টি করা, মানুষে মানুষে বাঁধন সৃষ্টি করা, মানুষে মানুষে মিলিয়ে অনুপ্রাণনের ব্যাপক অনল সৃষ্টি করা। এ সমাজের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র মানুষের অন্তরে, মানুষের জীবনে, মানুষে মানুষে সম্বন্ধে। ইহার পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসে ইহার বাহিরের সফলতা ও বিফলতা এবং ইহার কার্য্যে মানুষের বাধা ও সহায়তা, অনেকবার অনেক ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। দেশের অবস্থার ও দেশবাসীর মনের ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, ভবিষ্যতেও অনেক নূতন সঙ্কট, অনেক নূতন প্রশ্ন, ইহার সম্মুখে উপস্থিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন যতই অতর্কিত হউক, অবস্থা যতই অচিন্তিত হউক, সঙ্কট যতই কঠিন হউক, ইহার আদর্শ ও ইহার কার্য্যপ্রণালী চিরদিন একরূপ। ইহার অন্তর্গত মানুষগুলিকে ঈশ্বরের চরণে দৃঢ় হ'য়ে বসতে শিক্ষা দেওয়া, তাঁর মুখ ভাল ক'রে দেখতে শিক্ষা দেওয়া, সেই বড় অংশীদারকে ইহার পশ্চাতে দেখে' নির্ভীক হ'তে শিক্ষা দেওয়া, আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করতে শিক্ষা দেওয়া, সকল কাজে চরিত্রশক্তি ও প্রেমের শক্তির উপরে প্রধান নির্ভর রাখতে শিক্ষা দেওয়া,—ইহাই এ সমাজের প্রধান কাজ। আমরা যদি বিশ্বাসী থাকি, আমরা যদি প্রভুর হাতে আত্মসমর্পণ করি, তবে ইহার অতীত যুগের অনুরূপ অগ্নিময় জীবন ও তেজস্বী কর্ম্ম, নিশ্চয়ই সম্মুখের যুগে আবার প্রকাশিত হবে। সেই দয়াল প্রভু আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন; এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও বিশেষ ভাবে ইহার মানুষগুলির জীবন যে তাঁর লীলাক্ষেত্র, তা আমরা আজ বিশ্বাস-নয়নে উজ্জল ভাবে দেখি। মানবজীবনে বিধাতার শক্তিকে ইহার সকল শক্তির উৎসরূপে দর্শন ক'রে আজ আমরা তাঁকে কৃতজ্ঞতা ভরে প্রণাম করি।

অনন্তর কিছু সময় সংকীর্ত্তন হইয়া অদ্যকার কার্য্য শেষ হইল।

৬ই এপ্রিল (২৪শে চৈত্র) শুক্রবার—প্রাতে উষাকীর্ত্তনান্তে মন্দিরে অনেকক্ষণ কীর্ত্তন হয়, তৎপরে উপাসনা। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি উদ্বোধনে বিশেষভাবে এই কথাই বলেন যে, চারিদিকের দুর্গতি দুর্দ্দশা দেখিয়া যখন প্রাণে নিরাশা নিরুৎসাহ আসে তখনই নূতন আশা ও উৎসাহ প্রাণে উপস্থিত হয়। চৈতন্য বুদ্ধ খৃষ্ট প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদের জীবনেও তাহা দেখা যায়। খৃষ্ট চারিদিক অন্ধকারময় দেখিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন "পিতা, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে?" তাহার পরই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পিতার হাতে অর্পণ করিলেন। রৌদ্রতাপে তপ্ত প্রান্তরমধ্যে একটি বটবৃক্ষ দাঁড়াইয়া পথিককে ছায়া প্রদান করিতেছে। উহার পত্রগুলি যতই রৌদ্রতাপে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, ততই উহার মূল মৃত্তিকা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বশরীরে ও সকল পত্রে সঞ্চারিত করিতেছে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। দীপ্তশিরার মুক্তি নিকট। এই রাজ্য করুণার রাজ্য। পত্র নিজে কিছু করে না, বিশ্ববিধাতার বিধানেই মূল হইতে রস আসিয়া উহাকে জীবিত রাখে। জীবনের মূলের দিকে দৃষ্টি করিলে, মন গভীরে প্রোথিত করিলে, আমাদের মধ্যেও স্বাভাবিক ভাবে জীবনের রস সঞ্চারিত হইবে—আমাদের কাজ মূলে প্রবেশ করা। When Winter comes Spring is not far off—শীতকাল আসিলে বুঝিতে পারা যায় বসন্তকাল অধিক দূরে নয়। জীবনের দুঃখ দুর্দ্দিনে তাঁহার করুণা পাওয়ার, তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য আকুল প্রার্থনা আসে—"যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং" তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা নিত্য আমাকে রক্ষা কর, এই প্রার্থনা উদয় হয়। তাহাতেই সকল দুঃখ দুর্দ্দিন কাটিয়া যায়, তাঁহার করুণাধারা নামিয়া আসে। আমরা যেন কেবল তাঁহার দক্ষিণ মুখই চাই, অন্য কিছু না চাই; তাহা হইলে কোনও দুঃখ তাপ থাকিবে না, তাঁহার করুণাতে সমস্ত বিদূরিত হইবে। আজকাল যেমন Broad-casting হইতেছে, ঘরে বসিয়া অতি দূরের সংগীতাদি শুনিতে পারা যায়, তেমনি আমরাও ঘরে বসিয়া পূর্ব্বতন আচার্য্যদের বাণী—মধুর সংগীত—শুনিতে পারি। তাহাই আমাদিগকে শুনিতে হইবে, কাণ পাতিয়া শুনিতে হইবে, সে still small voice শুনিতে হইবে, সকলের সঙ্গে ভাববিনিময় করিতে হইবে। পরম পিতার প্রিয় পুত্রদের কথা শুনিতে হইবে, তাঁহাদের সঙ্গে যুক্ত হইতে হইবে। তাঁহাদের কার্য্য আমাদেরই উদ্ধারের জন্য। ইহাতে স্বদেশ বিদেশ নাই, সকল দেশের সাধু ভক্তদের ডাক শুনিতে হইবে। দেওয়ার পূজা নয়, পাওয়ার পূজাই আমাদের করণীয়। তিনি ভাবতন্ত্রী স্পর্শ করিলেই কথা বাহির হয়, সত্য পূজা হয়। আমাদিগকে তাঁহার করুণার ভিখারী হইয়াই প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার করুণা ভিন্ন আমাদের অন্য কোনও সম্বল নাই।

"কার মা এমন আনন্দময়ী" ইত্যাদি দ্বিতীয় সংগীতের পর আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনা; তৎপরে "তুমি ত অন্তরে বাহিরে" ইত্যাদি তৃতীয় সংগীত গীত হইলে তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে কিছু বলেন:—

এই ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মকৃপারূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আজ ৫০ বৎসর ব্রহ্মকৃপার প্রবাহে ব্রাহ্মসমাজ এই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমরা ব্রহ্মকৃপারই বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করি। যিনি ব্রহ্মকৃপার এক রতি পাইয়াছেন তিনি পরম সৌভাগ্যবান। আজ বলা হইয়াছে ব্রহ্মকৃপার কথা ছাড়া অন্য

কথা বলা হইবে না। আজ সকলকে জীবনে ব্রহ্মকৃপার পরিচয় ব্রাহ্মসমাজের পরম সম্পদরূপে রক্ষা করিবার জন্য বলা হইয়াছে। যে বালুকণার মধ্যে সোণা থাকে তাহার সবটাই যে সোণা এমন নহে; মাঝে মাঝেই স্বর্ণরেণু থাকে, তাহা বাছিয়া লইতে হয়। ব্রহ্মকৃপাও সমস্ত জীবনেই প্রবাহিত থাকে বটে, কিন্তু সকলে তাহা ধরিতে পারে না, চিনিতে পারে না। বাল্যকালে যে ব্রহ্মকৃপা বর্ষিত হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিছু বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে যখন বুঝিবার শক্তি হয়, তখনও আমাদের দেশে তাহা বোঝা একটু কঠিন হয়। এদেশে কর্ম্মফলবাদ যে ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে তাহাতে, সুখই হউক আর দুঃখই হউক সবই পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মেরই ফল বলিয়া মনে করা হয়, কাজেই জীবনে ব্রহ্মকৃপা দেখা কঠিন হয়। যাহারা সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মের পূজা করে তাহারাই ব্রহ্মকৃপা দেখিতে পারে। যাহারা পরবর্ত্তী জীবনের মধ্যে ফল দেখে তাহারা ব্রহ্মকৃপা কোথায় দেখিবে? উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"যথাকারী যথাচারী তথাভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।" যাহা তুমি করিবে তাহাই হইবে। যদি সদয় ব্যবহার করিতে পার, প্রেমের ব্যবহার কর, তবে দয়া প্রেম বাড়িবে, প্রেমই হইয়া যাইবে। লোকে বুঝিতে পারে না, ইহা কি প্রকারে হইবে। তাহারা মনে করে পুণ্য করিলে তাহার ফলে পরে রাজা হইবে। তাহা হইলে ত যথাকারী তথা হইল না। ইহাই স্বাভাবিক যে পুণ্য করিলে পুণ্যই হইবে, প্রেম করিলে প্রেমই হইবে। পুণ্যে পুণ্যই বৃদ্ধি পায়, প্রেমে প্রেমই বাড়িয়া যায়। তাহা হইতে যে উচ্চপদ আসিবে এরূপ ত হইতে পারে না। জীবহত্যা করিলে, হৃদয় কসাইয়ের ন্যায় কঠোরই হইবে। আর সমস্তই অর্থবাদ। "তুমি যদি ব্রহ্মকে অন্নরূপে জান তবে গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ হইবে", ইহা স্তোকবাক্য। ইহারা ব্রহ্মকৃপা বাহিরে খোঁজে—গরীব ধনী হইবে, পদমানহীন উচ্চপদ লাভ করিবে। অর্থের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু ভগবানের করুণা তাহার মধ্যে দেখিতে হইবে না। যেখানে ভগবানের করুণা নাই মনে কর, সেখানেও, সেই দুঃখ তাপ সংগ্রামের মধ্যেও, তাঁহার করুণা দেখিতে হইবে। ঈগল পাখী সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। তাহারা পাহাড়ের খুব উচ্চ চূড়াতে নীড় নির্ম্মাণ করে, সকলেই জানেন। সেই উচ্চ নীড়ে শাবকগুলি যখন একটু বড় হয়, নূতন পাখা বাহির হয়, তখন ঈগল মাতা শাবককে ঠোকরাইতে থাকে। শাবক তখন পাখা বিস্তার করিয়া সেই উচ্চ স্থান হইতে নীচের দিকে পড়িতে থাকে। ঈগলমাতা যেন নিশ্চিন্ত মনে নীড়ে বসিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। যখন দেখে বিপদ নিকটে, তখন তাড়াতাড়ি নামিয়া আসে ও তাহার নীচে নিজের সবল পাখা বিস্তার করিয়া উহাকে বহন করে। এই ভাবেই উহাকে উড়িতে শিখায়। ভগবান তেমনি আমাদিগকে আরামে রাখেন না, অনন্ত আকাশে আমাদিগকে উড়াইয়া দেন, যখন দেখেন আর উপায় নাই, আমাদের নিজের শক্তিতে কুলায় না, তখন তিনি আসিয়া রক্ষা করেন। এখানেই করুণার নিদর্শন। এই করুণার কথা যত বলিতে পারা যায় ততই মঙ্গল।

আমি সেরূপ পরিচয় বেশী পাই নাই। আমি আরামের মধ্য দিয়াই চলিয়াছি। শিশুকালে দুঃখ দেখিয়াছি। কিন্তু তখন তাহাতে ব্রহ্মকৃপা দেখি নাই, তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। পিতা যখন মা ও আমাদের দুইটি শিশু ভাইকে রাখিয়া পরলোকে চলিয়া যান, তখন আমাদের খুবই দুঃখ কষ্ট—একখানা ভাঙ্গা ঘরে থাকি, তাহার বেড়ার ভাঙ্গা স্থান খলে দিয়া ঢাকা। তখন সহরে অনেক সময় বাঘ আসিত। একদিন ঘরের নিকটেই বাঘ ডাকিতে লাগিলে ভয়ে মাকে জড়াইয়া ধরিলাম—বাঘ চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে যে ব্রহ্মপ্রেমের পরিচয় আছে, তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। জীবনে সুখ স্বাচ্ছ্যের মধ্যে ব্রহ্মপ্রেম খুঁজিতে হয় না, দুঃখ কষ্টের মধ্যেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। আজ যে আপনাদের কাছে জীবনের কথা বলিব তখন তাহা জানিতাম না।

বাল্যকালে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিতাম। উপবীত হওয়ার পরই তিনি গোপালের পূজার ভার আমার উপর দিলেন। ব্যবস্থাটা হ'ল উল্টা। তখন ব্রাহ্মসমাজের কথা জানিতাম না। এই ব্যবস্থাই কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে আসিবার পক্ষে সহায় হইল। এই ঠাকুরের পূজা করিতে যাহা যাহা করিতাম তাহাতে নানা প্রশ্নই মনে উঠিত। মশারী খাটাইবার সময় মনে হইল, পিতলের মূর্ত্তি, ইহাকে মশায় কামড়াইতে পারে না, অথচ ইহাকে মশারী দেই,—এ পূজা কিছু নয়। মনে লাগিয়া গেল। জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলিব, এই সংকল্প লইয়াই কলিকাতা আসিয়াছিলাম। কতকটা কৌতূহলী হইয়া এই ব্রাহ্মসমাজের দরজায় একদিন আসিলাম। ক্রমে মাঝে মাঝে আসিতে লাগিলাম। কয়েকটী বন্ধু জুটিল, পূর্ব্ব সংকল্প চলিয়া গেল। মানুষের পশ্চাতে অন্য শক্তি কাযা করে। আমার সংকল্প সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, তথাপি এই পথে আসিতে হইল। তখনও ইহার মধ্যে ব্রহ্মকৃপা দেখি নাই, ব্রহ্মকৃপার কথা বুঝি নাই। পরে তাহার অনেক পরিচয় পাইলাম। নানা কাজের মধ্যে সে কথা বিস্তারিত বলিব না। দীর্ঘ হইয়া যাইবে। আজ পঞ্চ প্রদীপের দ্বারা উপাসনা করিতে হইবে, সকলকে ব্রহ্মকৃপার সাক্ষ্য দিতে হইবে। কাল বাবু সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উৎসবের উদ্বোধন করিয়াছেন। আমি অনুরোধ করি, তিনিই আজ এই সাক্ষ্যদানেরও উদ্বোধন করুন।

ক্রমশঃ।

যৌবনের অভিষেক

বিগত মহাসমরের পূর্ব্ব হইতে এবং বিশেষভাবে পর হইতেই য়ুরোপে "যৌবন আন্দোলন" (Youth movement) নামে একটী জিনিষ দেখা দিয়াছে। তাতে সে-দেশের অনেক মহৎকার্য্যও সাধিত হইতেছে। সেই তরঙ্গ তুরস্ক হইয়া চীনেও আসিয়া পৌছিয়াছে এবং আমাদের দেশেও ঐ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা সুরু হইয়াছে ও তার অনুরূপ সভা বা সংঘ স্থাপিত হইতেছে। ইহা ভালই; কিন্তু আমি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি যে, যাঁরা এ দেশে এই বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিতেছেন, তাঁদের দৃষ্টি প্রধানতঃ পশ্চিমের দিকেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। জার্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte) হইতেই নাকি এই আন্দোলন আরম্ভ হয়—তিনিই নাকি এই আন্দোলনের প্রথম গুরু। ঐ দেশসকলে ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে বহুপূর্ব্ব হইতেই এই জিনিষটী ছিল একটু অন্যরূপে—যৌবন-আন্দোলনরূপে নয়, যৌবনের অভিষেকরূপে। ঋষিরা যে মানবকে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহা ঐ ভাব হইতেই। তার পর যুবরাজ বুদ্ধের কথা যদি ভাবি তবে দেখিতে পাই যে, তিনি যৌবনেই অমৃতত্ব—চিরযৌবন—লাভ করিবার জন্য সকল ফেলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলেন এবং তাঁর শিষ্যগণ যৌবনেই দেশে বিদেশে অমৃতের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এদেশকেও অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। বুদ্ধের পর আচার্য্য শঙ্কর যৌবনেই অদ্বৈতের বিজয়দুন্দুভি বাজাইয়া দেশকে কম্পিত করিয়াছিলেন। শঙ্করের পর কবীর নানক ও চৈতন্য যৌবনেই প্রেমভক্তিতে দেশকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি, তাহা

মাঘোৎসব উপলক্ষে যুবকসম্মিলনের জন্য লিখিত

হইলেও দেখিতে পাই যে, রাজা রামমোহন রায় যৌবনেই সকলের এক উপাস্য ও মিলনভূমি "একমেবাদ্বিতীয়মের" পতাকা উত্তোলন করিয়া জগতে ব্রহ্মেরই জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। তার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ প্রভৃতি যৌবনেই ঐ পতাকা ধারণ করিয়া নিজেরা কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং দেশকেও কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যৌবনই জীবন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যৌবনেরই ইতিহাস। এদেশ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই আবার যৌবনকে ফিরাইয়া পাইয়াছিল—জরামৃত্যুর মধ্যেই নবজীবনের সাড়া অনুভব করিয়াছিল। নইলে যুগ যুগ সঞ্চিত এত অধর্ম্ম অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও কদাচারের বিরুদ্ধে এমন অকুতোভয়ে দাঁড়াইয়া—এত দুঃখ অপমান ও লাঞ্ছনা উপেক্ষা করিয়া—ব্রাহ্মসমাজ একটা নূতন সভ্যতার সূত্রপাত করিলেন কিরূপে? যৌবনই তাহা সম্ভব করিয়াছিল। যৌবন অসম্ভব সম্ভব করে, অসাধ্য সাধন করে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এই যৌবন কি? আদর্শের কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জন—যাহা মহৎ যাহা সত্য শিব সুন্দর তাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তাকেই আপন অন্তরে সাগ্রহে বরণ।

কেশবচন্দ্রের সময় হইতেই এই ব্রাহ্মসমাজ এক মহাশক্তির কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, যাহা লক্ষ করিয়া পাদ্রীশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ ডফ সাহেবও বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে Brahmo Samaj is a power and a power of no mean order—ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে আর তুচ্ছ করিবার নয়। তবুও ত ব্রাহ্মসমাজে এত গুণী জ্ঞানীর সংখ্যা তখন ছিল না। কিন্তু এ কি শক্তি? এ যৌবনে ধর্ম্মদীক্ষার—অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার শক্তি—জীবনের মহত্তম যাহা তার নিকট আত্মসমর্পণের শক্তি, এতেই ব্রাহ্মজীবন, পরিবার ও সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং দুর্জ্জয় শক্তিশালী হইয়াছিল। কেশব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উচ্চ উপাধিধারী কিম্বা মহাপণ্ডিত ছিলেন না, তবুও কিন্তু তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত ছিল, শিবনাথ শাস্ত্রী অপেক্ষাও বড় পণ্ডিত তখন দেশে ছিল, তবু তাঁহার অদ্ভুত প্রভাবের মূল ছিল কোথায়? যৌবনে ধর্ম্মদীক্ষা—অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা—জীবনের মহত্তম যাহা তার নিকটে বিন্দুমাত্র লাভক্ষতির গননা না করিয়া একেবারে নিঃশেষে আপনাকে ঢালিয়া দেওয়ার মধ্যে।

আমার তরুণ তরুণী ভাইভগিনী, আপনারাই ত এই ব্রাহ্মসমাজের উত্তরাধিকারী, আশা ভরসা ও বল। এই ব্রাহ্মসমাজের কাজ আপনাদেরই কাজ। এখনো ব্রাহ্মসমাজ মহাশক্তির আধার। ব্রাহ্মসমাজের বিগত এক শত বৎসরের ইতিহাস অতি বিচিত্র মহিমাময় ইতিহাস, জগতের ইতিহাসের এক অমূল্য অধ্যায়। আগামী শতবৎসরে এই ইতিহাস আরো সুন্দর, আরো মহিমান্বিত করিয়া আপনারাই রচনা করিবেন, সেই ভার আপনাদেরই উপর। তবে মনে রাখিবেন ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজ,—একটী ধর্ম্মমণ্ডলী—এবং ব্যক্তির ধর্ম্মানুরাগ লইয়াই ধর্ম্মমণ্ডলী বা সমাজ। এই ব্যক্তির ধর্ম্মাগ্নিই চিরদিন এই সমাজকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা যখন নিষ্প্রভ হইয়া যায় তখন সমাজ বা মণ্ডলীও জীবন্মৃত হইয়া পড়ে। অতীতের ব্রাহ্মসমাজ এই ভিত্তির উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল, ভবিষ্যতের ব্রাহ্মসমাজও এই ভিত্তির উপরেই দাঁড়াইয়া থাকিবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ধর্ম্মসাধনা লোকালয় ছাড়িয়া অরণ্যে পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছিল। এ যুগের ধর্ম্মসাধনা অরণ্যে পর্ব্বতে নয়, লোকালয়েই—পরিবারে জনসমাজে, বিশ্বমানবে—মানবের প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তের জীবনযাত্রার সুখ দুঃখ, আলোক অন্ধকার, ঘাত প্রতিঘাত ও জয় পরাজয়ের মধ্যেই। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ বাণী। এই ধর্ম্মসাধনাকে কেন্দ্র করিয়াই ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ। কিন্তু যাদের জীবনদীপগুলি সম্মিলিত হইয়া এই ধর্ম্মাগ্নি দাবানলে পরিণত হইয়াছিল—যাহারা দেহ মন প্রাণ দিয়া ইহার পতাকা ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে মহা প্রস্থান করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাঁহারা এখনো আছেন তাঁহারা বৃদ্ধ অন্ধ খঞ্জ। তাঁহারা আপনাদের অপেক্ষায়—তাঁদের পতাকা আপনাদের হাতে তুলিয়া দিবার জন্যই,—রহিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য গত একশত বৎসরেই শেষ হয় নাই। এখনো একমেবাদ্বিতীয়মের আধ্যাত্মিক পূজা সম্পূর্ণরূপে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এখনো পৌত্তলিকতা নানা বিকট আকারে দেশে বিরাজ করিতেছে, নারীজাতির সম্মান শিক্ষা ও স্বাধীনতা এখনো সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হওয়া দূরে থাকুক, এখনো নারীর প্রতি নানা অবিচার অত্যাচার চলিতেছে। জাতিভেদ এখনো দূর হয় নাই, এখনো মানুষ মানুষের ছায়া স্পর্শ করিলে অপবিত্র হয়, এখনো অনুন্নত উন্নত হয় নাই, এখনো হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ পরস্পর কাটাকাটি করিতে উদ্যত, এখনো দেশে কত মলিনতা অধীনতা, কত রোগ শোক, কত দুঃখ দারিদ্র্য, কত হাহাকার! ব্রহ্মের নামে কাহারা এই সমুদয়ের বিরুদ্ধে আবার ঘোরতর সংগ্রাম ঘোষণা করিবে? আপনারা ঐ দেখুন রোগজীর্ণ ও অন্ধ হেমচন্দ্র এখনো নানাস্থানে ব্রহ্মের বাণী ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন, বৃদ্ধ ও অন্ধ কৃষ্ণকুমার এখনো নারীর সম্মান রক্ষার জন্য তাঁহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এখনো বৃদ্ধ ও অন্ধ রাজমোহন অনুন্নত জাতির চিন্তায় দিন যাপন করিতেছেন, এখনো বৃদ্ধ সীতানাথ নিশিদিন ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। আর কত নাম করিব? ইহারা সকলে আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন, এঁদের পতাকা আপনারা আসিয়া ধারণ করুন। আসুন আপনারা রামমোহনের পরে দেবেন্দ্রনাথ যেমন আসিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের পরে কেশব যেমন আসিয়াছিলেন এবং কেশবের পরে শিবনাথ প্রভৃতি যেমন আসিয়াছিলেন, আসুন আপনাদের স্থান আপনারা আসিয়া গ্রহণ করুন। কিন্তু ভাইভগিনী, আপনারা ভুলিয়া যাইবেন না যে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুধু যুগধর্ম্ম নয়, বিশ্বধর্ম্ম, শুধু এদেশের নয়, সমগ্র জগতের পরিত্রাণ ও কল্যাণের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন। মহামতি এণ্ডরুজ কি বলিয়াছেন আপনারা কি শুনেন নাই? Raja Rammohan Roy represents the dawn of the modern Indian nation. No other name in Indian History stands out with such prominence as his as the founder of modern India. Not only did his personality awaken new life in his own country, but it also awakened new life throughout Asia. From Bengal went forth the great religious and cultural movement which has spread the 19th century to almost every part of Asia. The Bengal Renaissance anticipated by more than fifty years the meiji period in Japan, which represents the highwater-work of modern progress in the far east of Asia. It can be proved historically that this renaissance in the Far East which has since spread to China, Indochina since owed its origin to Raja Rammohan Roy in Bengal. বর্ত্তমান ভারতীয় জাতির নব উষার প্রতীক রাজা রামমোহন রায়। বর্ত্তমান ভারতের প্রতিষ্ঠাতারূপে ভারতের ইতিহাসে আর কোন নাম তাঁর নামের মত উজ্জ্বল নয়। তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব শুধু তাঁহার নিজের দেশে নয়, সমগ্র এশিয়াতে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছে। বাংলা দেশ হইতেই ধর্ম্ম ও সভ্যতার আন্দোলন প্রসারিত হইয়া এশিয়ার প্রায় সর্ব্বত্র ঊনবিংশ শতাব্দীকে বিস্তার করিয়াছে। জাপানের যে মেইজি যুগকে সুদূর পূর্ব্ব এশিয়ার আধুনিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ বলা

হয়, তারও অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক পূর্ব্বে বাংলার এই নবজাগরণ আরম্ভ হইয়াছিল। সুদূর পূর্ব্বদেশের এই নবজাগরণ যাহা পরে চীন, ইন্দোচীন ও শ্যামে বিস্তার লাভ করিয়াছে, বাংলা দেশে রাজা রামমোহন রায় হইতেই ইহার আরম্ভ; ইহা ইতিহাস দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

ভাইভগিনী, আপনাদের পূর্ব্বগামিগণ যাহা অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আপনাদের সম্পন্ন করিতে হইবে। দিকে দিকে দেশে দেশে এই নব ধর্ম্মবার্ত্তা—এই নবজীবনবার্ত্তা আরো উদাত্ত স্বরে প্রচার করিতে হইবে। শুধু এদেশের ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে তাহা নয়, এদেশকে আবার জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইতে হইবে। মিস্ মেয়ো কি কলঙ্ককালিমায় ভারতমাতার ছবি আঁকিয়াছেন তাহা ত আপনারা জানেন। তার উত্তর তাদের দেশের কলঙ্কের ছবি আঁকা নয়। তার উত্তর আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, গৃহ, সমাজ ও রাষ্ট্র—সমুদয় দেশকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলা। যাহা পরিপূর্ণ জীবনের পরিপন্থী তাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা এবং যাহা মহৎ, যাহা শিব সুন্দর তাকে আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া। এই যুগে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব এই জন্যই। মিস মেয়োর 'ভারতমাতার' প্রকৃত উত্তর ব্রাহ্মসমাজ—ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাবলী। তিনি এদেশের এমন একটি দুষ্ট ঘাতেও অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে পারেন নাই, যাহা নিরাময় করিয়া একটি সুস্থ সুন্দর শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ প্রথম হইতেই চেষ্টা করেন নাই এবং পর্ব্বতপ্রমাণ অসংখ্য প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কতক পরিমাণে সফলকামও হন নাই। আরও হইবেন যদি আপনারা সকলে আসিয়া আনন্দে ও আগ্রহে ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। রামমোহনের উন্নত ললাটে জগতের নব দিবালোকের যে প্রথম কিরণসম্পাত হইয়াছিল, তাহা দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া আজ চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়াছে—বিশ্বে আজ মহামহোৎসবের জয়ধ্বনি উঠিয়াছে। সেই মহোৎসবের ঋত্বিক হইবেন আপনারাই। আসুন জ্ঞানী, আসুন ভক্ত, আসুন কর্ম্মী, সকলে আসুন, আজ ব্রাহ্মসমাজের বিধাতা ও জগৎবিধাতা আপনাদের সকলের সমবেত সেবা চাহিতেছেন। আজ সকলের প্রাণে সেই আকাঙ্ক্ষাই জাগুক, ভগবান আজ সকলকে সেই আশীর্ব্বাদই করুন। তাঁহারই জয় হউক।

শ্রীঅনঙ্গমোহন রায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৬ই মার্চ্চ আমেদাবাদ নগরীতে তথাকার প্রার্থনা-সমাজের প্রাণস্বরূপ স্যার রমণভাই অহিপতরাম নীলকণ্ঠ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে গুজরাট প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের গুরুতর ক্ষতি হইল।

বিগত ১লা এপ্রিল পরলোকগত মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং মিসেস কে এন রায় একটি প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ভ্রাতা ভগিনীগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৫০৲, ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে ২৫০৲ এবং ব্রীষ্টল নগরীস্থিত রামমোহন স্মৃতিমন্দির সংস্কারার্থ ৫০০৲, টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বিগত ১১ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসুর কন্যা ইন্দুলেখা গুহের, নবজাত শিশু দৌহিত্রের ও বৈবাহিক মথুরানাথ গুহের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ শাস্ত্রপাঠ এবং নিশিবাবু জীবনীবর্ণন ও প্রার্থনা করেন। শ্রীমান শক্তিরঞ্জন ভগিনীর জীবনচরিত পাঠ করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ১৲ ও সাধনাশ্রমে ১৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

আনন্দমোহন ভবনের দ্বারোদ্মোচন—বিগত ২রা এপ্রিল ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়সংসৃষ্ট নূতন ছাত্রীনিবাস "আনন্দমোহন ভবনের" গৃহ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন ও স্যার জগদীশচন্দ্র বসু গৃহদ্বার উন্মুক্ত করেন।

নামকরণ—বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী ঢাঁকুরিয়া শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বর্ম্মণের দুই কন্যা ও দুই পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যা দুইটিকে যথাক্রমে কুন্তলা ও ইন্দিরা এবং পুত্র দুইটিকে সুজিৎকুমার ও সুভাষ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে অশ্বিনীবাবু প্রচার বিভাগে ৫৲, ও সাধনাশ্রমে ৫৲, প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অশোকমোহন বসুর প্রথম সন্তানের (কন্যা) নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যাকে গৌরী নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে জুবিলি প্রচার ফণ্ডে ৩০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও শতবার্ষিক উৎসব ফণ্ডে ১৭৫৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

মঙ্গলময় বিধাতা শিশুদিগকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

রোগমুক্তি—বাবু গগনচন্দ্র হোম প্রায় ৬ মাসকাল ভুগিয়া সঙ্কটাপন্ন ব্যাধি হইতে ভগবৎকৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন। গিরিডি অবস্থান কালে গত ৯ই জানুয়ারী তাঁহার গৃহে এই উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন উপাসনা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, টাকা দান করা হইয়াছে।

বিগত ৩১শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার নন্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যার কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ১৫৲, শতবার্ষিক উৎসব ভাণ্ডারে ৫৲, জুবিলী উৎসব ভাণ্ডারে ৫৲, দাতব্য বিভাগে ১৫৲, ও দুঃস্থ-ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ১৫৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

দান—পাটনা প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন গুহের পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা গুহ তাহার পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিম্নলিখিত রূপ দান করিয়াছেন—বাঁকিপুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৲ কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মিশন ফণ্ড ২৲, দাতব্য বিভাগ ২৲ বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ সংলগ্ন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় ২৲, অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ভাণ্ডার ঢাকা ২৲, মোট দশ টাকা।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু তাঁহার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মিশন ফণ্ডে তিন টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুখবিন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মিশন ফণ্ডে দুই টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীমতী বসন্তবালা হোম তাঁহার পিতা কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ৫৲, টাকা দান করিয়াছেন।

কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রীমতী বসন্তবালা হোম গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে ২৲, টাকা দান করিয়াছেন। বাবু গগনচন্দ্র হোমের দ্বিতীয় পুত্রের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি সাধনাশ্রমে ৫৲, দান করিয়াছেন।

এ সকল দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১০ই বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু বি, এ।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ১লা আশ্বিন, সোমবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

১১শ সংখ্যা। 17th September, 1928. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

হে প্রেমময় বিশ্ববিধাতা, তোমার অপার প্রেমেই তুমি আমাদিগের উপর তোমার এই সংসারের নানা কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছ এবং তাহার মধ্যে জগতের ও আমাদের কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছ। আমরা অনেক সময় সে কথা ভুলিয়া যে উদাসীনতা ~~ও অবহেলাতে অনেক কাজ নষ্ট~~ করি এবং জীবনকেও ব্যর্থ করি তাহা তুমি দেখিতেছ; তাই তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে বার বার বিবিধ প্রকারে তোমার পথে আকর্ষণ কর, প্রাণে নূতন উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত কর। আবার কত সময় আমরা উৎসাহের স্রোতে চালিত হইয়া উপযুক্ত উপায়াদি অবলম্বন না করিয়া বিপথে চলিয়া যাই, সম্পূর্ণ রূপে তোমার অনুগত হইয়া বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায়, বাধ্য সন্তানের ন্যায়, কার্য্য করিতে পারি না। ইহাতে যে তোমার প্রকৃত কার্য্য পণ্ডই হয় এবং আমাদেরও অকল্যাণই সাধিত হয়, তাহা অনেক সময়ই ভাবিয়া দেখি না। সাময়িক উত্তেজনার মোহেই ভুলিয়া থাকি। হে জ্ঞানময় জীবনবিধাতা, তুমি যদি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রকৃত পথ প্রদর্শন না কর, এবং সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন না কর, তবে আমরা কিছুতেই ঠিক ভাবে তোমার কার্য্য করিতে পারি না। তাই হে করুণাময় পিতা, নূতন শতাব্দীতে বাহাতে আমরা তোমার অধীন হইয়া তোমার কার্য্য সাধন করিতে পারি এবং নিজেরাও প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি প্রদান কর। আমরা যেন আর মোহবশতঃ আপনার ভাবে আপনার পথে চলিয়া সমস্ত পণ্ড না করি। আমাদের প্রতি জীবনে ও সমাজে তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণভাবে জয়যুক্ত হউক, সর্ব্বত্র তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হউক।

নিবেদন।

জয় যুগ আলোকময়—এ কোন্ যুগ? কোন্ যুগে আমরা জন্মেছি? লোকে বলে, এটা কলি-যুগ, এ যে পাপময় যুগ; এ যুগে মানুষ কেবল নরকের পথে চলে। আমি দেখ্‌ছি এ পুণ্য যুগ, এ আলোকময় যুগ। এ যুগে আমাদের দৃষ্টি কেমন প্রসারিত হয়েছে! আমরা এক নূতন আলোক পেয়েছি; বেদ বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা, সব এক নূতন আলোকে দেখ্‌ছি, সব আমাদের হয়ে গেছে। আর্য্য ঋষি, বুদ্ধ, ঈশা, মুসা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য, জোরাষ্টর, সকলের চরণে ব'সে, সকলের আশীর্ব্বাদ ও অনুপ্রাণনা পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি। এই যুগে মুক্তিপ্রদ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম পেয়েছি; এই যুগ সমন্বয়ের যুগ। বিজ্ঞান দর্শন, সাহিত্য ইতিহাসও যে নূতন আলোক দিচ্ছে; প্রকৃতি নূতন বেশ ধারণ কচ্ছে; একটি ফুল, একটি পাতা, একটি লতা, কত নূতন বাণী এনে দিচ্ছে! গৃহ পরিবার, স্ত্রী পুত্র নূতন বেশে উপস্থিত হয়েছে। এ যুগ জ্ঞানের যুগ, প্রেমের যুগ, সেবার যুগ; এ যুগে সংসার ও ধর্ম্মের বিরোধ গিয়াছে, ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধ গিয়াছে। সকল অন্ধকার চ'লে গেল, সকল অজ্ঞানতা কুসংস্কার দূর হলো, নূতন আলোক, নূতন প্রেম এল; সব জাতি, সব ধর্ম্ম "এক" এরই দিকে চলেছে; "এক" এরই মহিমা সকলে ঘোষণা কচ্ছে। এ যুগে কি দেখ্‌লাম! পরব্রহ্মের মহিমালোকে সকলই উদ্ভাসিত। নূতন ভাষা—সে অন্তরের ভাষা; নূতন প্রেম—সে বিশ্বব্যাপী প্রেম; নূতন ধর্ম্ম—সে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন। তাই বলি, "জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকময়।"

ব্রহ্মের প্রকাশ—যুগ যুগান্ত ধ'রে ব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশ কচ্ছেন। এই যে বিজ্ঞান দর্শন, এই যে শাস্ত্র গ্রন্থ, সবই

তাঁর ক্রমপ্রকাশ সূচনা কচ্ছেন। মানুষ যে দিকে তাকায়, তাঁহারই মহিমা প্রকাশ দেখে অবাক্ হয়। মানুষ প্রকৃতি দেখ্‌ল, সূর্য্যের কিরণ, চন্দ্রমার আলোক দেখ্‌ল, ফুল ফল, লতা পাতা দেখ্‌ল, আর অবাক হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রাণের ভিতরে কত জ্ঞান প্রেমের লীলা, কত আকাঙ্ক্ষার জাগরণ হ'ল! মানুষ কত উজ্জ্বল প্রকাশ দেখ্‌ল, কত শক্তির বিকাশ দেখ্‌ল, কত প্রাণের অনুপ্রাণন অনুভব কর্‌ল! মানুষ দেখ্‌ল আকাশে এক জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় পুরুষ, অন্তরে এক জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় পুরুষ। সে অব্যক্তের সন্ধানে ছুটল। যাহা পেল, যাহা দেখ্‌ল, যাহা অন্তরে অনুভব কর্‌ল, ভাষাতে তাহা প্রকাশ কর্‌তে গেল। তাই ত শাস্ত্র রচনা হলো, দর্শন রচনা হলো, বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা হলো; কবিতা রচনা হলো। অপূর্ণ মানুষ, সম্যক্ দেখ্‌তে পায় না; যাহা দেখে, যাহা অনুভব করে, ভাষা তাহাও প্রকাশ কর্‌তে পারে না। তাই ত বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন শাস্ত্র, বিভিন্ন দর্শন; কিন্তু সবই যে ব্রহ্মের অসম্পূর্ণ প্রকাশ। ধর্ম্মে ধর্ম্মে তবে বিরোধ নাই, সাধুতে সাধুতে বিরোধ নাই, শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ নাই। সকলই এক পরব্রহ্মের কথা, আপনার অভিজ্ঞতা ও আলোক অনুসারে, আপনার ভাষায় ব'লে গিয়াছেন। যাহা বুঝেছেন, অনুভব করেছেন, ভাষা তাহাও প্রকাশ কর্‌তে পারে নাই। তাই "এক" এরই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ হয়েছে। আমরা সকল বিচিত্রতার মধ্যে ব্রহ্মেরই প্রকাশ দেখে ধন্য হই।

প্রাণের ভাষা—মানুষ নানা ভাষাতে কথা বলে, নানা ইঙ্গিতে আপনার মনের ভাব ব্যক্ত কর্‌তে চেষ্টা পায়। কিন্তু ভাষা বা ইঙ্গিত কি সব কথা প্রকাশ করে? ভাষা অনেক সময় মনের ভাব ফুটাবার সাহায্য করে। কিন্তু আর একটা ভাষা আছে; তাহা শব্দে প্রকাশ পায় না; তাহা চোখে, মুখে, শরীরের ভাবে প্রকাশ পায়, তাহা অন্তর হ'তে অন্তরে কথা বলে। আদর অভ্যর্থনাতে, আচার আচরণে, বাক্যবিন্যাসে প্রাণের কথা সব সময় বোঝা যায় না। দুই দিন এক জনের সঙ্গে থাক, তার ব্যবহারে ভাষাতে যা না বল্‌বে, তার প্রাণের ভাষাতে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ব'লে দিবে। প্রাণের ভাষা সত্য প্রকাশ ক'রে দেয়। মানুষকে বাহিরের আদরদ্বারা, মিষ্ট বাক্যদ্বারা ভুলাতে পার না। সে প্রাণের ভাষা শুন্‌তে পায়। দেবতাকেও বাহিরের পূজাদ্বারা, স্তবস্তুতিদ্বারা ভুলাতে পার না; অন্তর-দেবতা অন্তরে থেকে প্রাণের ভাষা শোনেন। প্রাণ পবিত্র কর, নির্ম্মল কর, সরল কর; অভিসন্ধি বর্জ্জন কর; মুখের ভাষা, বাহিরের ব্যবহারের পশ্চাতে অন্তরে প্রেম জাগ্রত হউক। তবেই জীবন সত্য হবে। দেবতা প্রাণের ভাষা বুঝ্‌বেন; মানুষ মনের স্পর্শ অনুভব কর্‌বে।

সম্পাদকীয়।

কার্য্যসিদ্ধির উপায়—নূতন শতাব্দীতে নূতন উৎসাহে বিস্তৃততর কার্য্যে নিযুক্ত হইবার যে একটা প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম আমাদের মধ্যে জাগিয়াছে, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। উৎসাহ উদ্যমহীন হইয়া মৃত যন্ত্রের ন্যায় কোনও প্রকারে নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিলে যে কোনও দিন কোনও কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিছু দিন যাবত যে আমাদের অধিকাংশ কার্য্য এই ভাবেই চলিতেছিল, তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং এই নূতন উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিয়াই বরণ করিয়া লইতে হইবে। উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষাই সকল কার্য্যের জনক ও প্রেরক, তাহা হইতেই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইবার শক্তি জন্মে। উহার অভাবে কোনও প্রকারেই এক পা অগ্রসর হওয়া যায় না, সিদ্ধিলাভ ত দূরের কথা। শক্তি ভিন্ন কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না যেমন একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, উৎসাহ উদ্যম ব্যতীত সিদ্ধিলাভ করা সম্ভবপর নহে, ইহাও তেমনি ধ্রুব সত্য। কিন্তু শুধু শক্তি থাকিলেই যে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না; বরং শক্তি উপযুক্ত ভাবে ঠিক পথে চালিত না হইলে অনেক সময় সিদ্ধির পরিবর্ত্তে কার্য্যসাধনে ব্যাঘাতই ঘটে—অনিয়ন্ত্রিত শক্তির অপব্যবহার দ্বারা মহা অনিষ্টই সাধিত হয়, সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। জড়জগতে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বদাই চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। এই হেতু কার্য্যসাধনের জন্য যেমন শক্তি জন্মান আবশ্যক, তেমনি সেই শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করাও অনিবার্য্যরূপেই প্রয়োজনীয়, বরং অধিকতর আবশ্যক বলিয়াই বিবেচিত হইবে। উৎসাহ উদ্যম সম্বন্ধেও ঠিক ইহাই সত্য। যদিও তাহা না থাকিলে কোনও কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না, তথাপি শুধু উহাই সিদ্ধিলাভের পক্ষে যথেষ্ট নহে, বরং উপযুক্ত পথে ও সংযত ভাবে চালিত না হইলে উহা হইতে অধিকতর অনিষ্টই সাধিত হইতে পারে এবং সেরূপ হইয়াও থাকে। জড়জগতে যেমন শক্তির হাতে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, উহাকে সর্ব্বদাই অধীনে রাখিতে হয়, তেমনি এ ক্ষেত্রেও আমরা সম্পূর্ণরূপে উৎসাহের দ্বারা চালিত হইতে পারি না, উৎসাহ উদ্যমকে সর্ব্বদাই আপনার অধীনে রাখিতে হইবে, উহা যাহাতে আমাদিগকে বিপথে চালিত না করিতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। অনেক সময় দেখিতে পাই, আমরা উৎসাহের দ্বারা চালিত হইয়া এমন ভাবে কার্য্য করি যাহাতে সে বিষয়ে সফলতা লাভের পরিবর্ত্তে বিফলতাকেই আমরা ডাকিয়া আনি, সমস্ত পণ্ড করিয়া ফেলি। যেখানে অতিরিক্ত উৎসাহ আমাদিগকে বিপথে চালিত না করে, সেখানেও যে সকল সময় উহা আমাদিগকে সফলতায় মণ্ডিত করে, তাহা নহে। অনেক সময়ই উৎসাহের সঙ্গে কল্পনা জড়িত থাকে। কল্পনারও যে একটা প্রয়োজন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই আদর্শ রচনার পক্ষে কল্পনার একটা ক্ষেত্র আছে। বৃহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইলে, বৃহৎ পরিকল্পনা চাই; শুধু বাস্তবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে, আমাদের নিজের ক্ষুদ্র দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে, আদর্শও ক্ষুদ্র হইয়া যায়, কোনও প্রকারে উচ্চ আদর্শ রচনা করা যায় না। এরূপ অবস্থায় সমস্ত প্রচেষ্টাও যে নিতান্ত ক্ষুদ্রই থাকে, তাহা সহজেই

বুঝিতে পারা যায়। উৎসাহ উদ্যম কাহাকেও এই ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেয় না। উহা তাহাকে এই ক্ষুদ্র সীমার বাহিরে লইয়া যাইবেই। আর ইহা তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যকও। কিন্তু এই আদর্শ রচনা বিষয়ে এবং তদনুরূপ কার্য্য সাধনে যদি বাস্তবতাকে একেবারে পরিত্যাগ করি, শুধু কল্পনার হাতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দেই—তবে উহা যে আকাশ-কুসুম রচনাতেই পর্য্যবসিত হইবে, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং কল্পনা যত সুদূরপ্রসারিত ও বৃহৎই হউক না কেন, উহা যাহাতে কোনও ক্রমেই সম্ভবপরতার সীমাকে অতিক্রম করিয়া না যায়, তাহা দেখিতে হইবে। অত্যধিক উৎসাহ শুধু লক্ষ্য ও আদর্শ বিষয়ে নয়, কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও আমাদিগকে অনেক সময় বাস্তবতার সীমার বাহিরে লইয়া যায়—আমাদের শক্তি সামর্থ্য, আয়োজন উদ্যোগ কতটা আছে, তাহা লইয়া কি ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে সহায়তা হইতে পারে, কিসের অভাবে সমস্ত পণ্ড হইতে পারে, কোন্ পন্থা অবলম্বন না করিলেই চলে না, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া শান্ত অবিচলিত ভাবে ঠিক পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে দেয় না। লক্ষ্য ও আদর্শ যতই বড় হউক না কেন, বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা তাহার কতটা পৌঁছিতে পারি, তাহা ভুলিয়া যদি এক লম্ফে শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে প্রয়াস পাই, তবে সে চেষ্টা যে শুধু বিফল হবে তাহা নহে, আমাদিগকে অনেক সময় তাহাতে বিপদ্‌গ্রস্তও হইতে হইবে। অনেক সময় আমাদের চেষ্টা যে আমাদিগকে লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত করিতে না পারিলেও সে পথে অন্ততঃ কিছু দূর অগ্রসর করিয়া থাকে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঠিক পথে চেষ্টা পরিচালিত হইলে তাহাই হয়। কিন্তু চিন্তা ও বিচারহীনতা বশতঃ আমরা সময় সময় এরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই, এরূপ উপায়ও অবলম্বন করি, যাহা আমাদের অবস্থার সম্পূর্ণ অনুপযোগী; এবং উক্ত অবস্থায় আমাদের পক্ষে অনিষ্টকরও। সকল উপায় সকল সময় সকলের পক্ষে উপযোগী নয়, কল্যাণকরও নহে। যাহা এক অবস্থায় একজনের পক্ষে কল্যাণকর, তাহাই অন্য অবস্থায় তাহার নিকট মহা অনিষ্টকর হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। সুতরাং সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে শুধু সাধারণ ভাবে কার্য্যসাধনোপযোগী উপায় অবলম্বন করিলেই যথেষ্ট হইল না, এমন কিছু ধরিতে হইবে যাহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে, আমাদের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে আমাদিগকে সে পথে অন্ততঃ কিছু দূর অগ্রসর করিতে পারে, আমাদিগকে সর্ব্বদা সত্যের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত রাখে। সত্যের ভূমি অতিক্রম করিলে ভাল উপায়ও অনিষ্টকর হইয়া যায়। উপযুক্তরূপ বিচার বিবেচনা না করিয়া আমাদের শক্তি সামর্থ্যের অনুযায়ী, কার্য্যসাধনের যথোপযোগী উপায় আয়োজন অবলম্বন না করিয়াই, শুধু উৎসাহের বশে আমরা অনেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই বলিয়াই আমরা বহু কার্য্যে আশানুরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছি না,—এমন কি অনেক সময় উহার গৌরব-হানিরও কারণ জন্মাইতেছি। এই ভাবে যে আমরা ইষ্টের পরিবর্ত্তে কত অনিষ্ট সাধন করিতেছি তাহা অনেক সময় ভাবিয়া দেখি না। এরূপভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা নিশ্চেষ্ট থাকাও ভাল। তাহাতে কোনও উপকার না হইলেও অন্ততঃ অপকারটা ত সাধিত হয় না। যে কোনও প্রকারে একটা কিছু করিলেই হইল না। তাহাতে সাময়িক ভাবে বাহিরে হৈ চৈ উপস্থিত করা যায় বটে, কাগজ পত্রে কতকগুলি বিবরণ লিখিবার সুযোগ ঘটিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু পরিণামে উহার দ্বারা আমাদের দৈন্যই অধিকতর প্রমাণিত হইবে, লোকের নিকটও আমরা উপহাসাস্পদই হইব—মিথ্যা অসারতা বর্দ্ধিত করিয়া উহা আমাদের মহা অনিষ্টই সাধন করিবে। সুতরাং সকল বিষয় ভালরূপ চিন্তা করিয়া যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা যে কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। শুধু আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা, শক্তি সামর্থ্য, উৎসাহ উদ্যমের উপর নির্ভর রাখিয়া চলিলেই যে যথেষ্ট হয় না, সকল সময় ঠিক উপায় অবলম্বন করিয়া সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ করা যায় না, সর্ব্বদা সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্ববিধাতার দিকে দৃষ্টি ও তাঁহাতে নির্ভর রাখিয়াও চলিতে হয়, তাহা বলা বাহুল্য বলিয়াই মনে হয়। তাই সে কথা এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিলাম না। আমাদিগকে নূতন শতাব্দীতে যদি সত্যই মহত্তর কিছু সাধন করিতে হয়, যে উদ্দেশ্য লইয়া ব্রাহ্মসমাজ জন্মিয়াছে তাহা কিয়ৎ পরিমাণেও সিদ্ধ করিতে হয়, যে অভিপ্রায়ে করুণাময় পিতা আমাদিগকে তাঁহার এই পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়াছেন তাহা আমাদের জীবনে সংসাধন করিতে হয়, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে এই সকল দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, সকল বিষয় গভীর ভাবে বিচার করিয়া, অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত ধীর ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে, কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা সিদ্ধি লাভের কোনই আশা ও সম্ভাবনা নাই। শুধু উৎসাহের বেগে কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিয়া আমরা কখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না। নূতন শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদিগকে ইহা বিশেষ ভাবেই স্মরণে রাখিতে হইবে। মঙ্গলময় জীবনবিধাতা, আমাদিগকে শুভ-বুদ্ধি প্রদান করুন এবং হাত ধরিয়া তাঁহার পথে লইয়া যাউন। আমরা সকল বিষয়ে তাঁহার অধীন হইয়া তাঁহাকেই একমাত্র চালক ও প্রভু করিয়া নূতন ভাবে জীবনপথে অগ্রসর হই। তাঁহার শুভ ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে, গৃহ পরিবারে সমাজে ও জগতে জয়যুক্ত হউক।

শতবার্ষিক মহোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট) রবিবার— ধর্ম্ম সঙ্ঘের অধিবেশন শেষ হইলে পর কিছু সময় সংকীর্ত্তন হইয়া যথা সময়ে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

বর্ষশেষে যখন এই মন্দিরে আমরা সমবেত হই, তখন যে

ভাবটি মনে আসে আজ একশত বৎসরের পর সেই ভাবই মনে জেগেছে। শতাব্দীর শেষ আমাদের খুব অল্পসংখ্যক জীবনেই আসে; ২৫ বৎসর অথবা ৫০ বৎসরের পর উৎসবে যোগদান করা যত লোকের পক্ষে সম্ভব ১০০ বৎসরের শেষে উৎসবে যোগদান করা কখনই তত সংখ্যক জীবনে সম্ভব হইবে না। শতাব্দীর উৎসব আমাদের নিজস্ব। কেন এই শতাব্দীর উৎসব আমাদের নিজের হ'ল তাই আমাদের সকলের ভাবা উচিত।

একদিন ছিল যখন মানুষ মনে করতো কোন কোন স্বতন্ত্র বিষয়ে তাহার অধিকার থাকবে অক্ষুণ্ণ; কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। এখন সমাজে সকল স্তরের সকল লোকেরই সমান অধিকার আছে, তাদের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, এবং আরও অন্যান্য সকল বিভাগে।

সমাজই আমাদের মাতা, সমাজই আমাদের পিতা, আমাদের সকল কর্ম্মের উৎস। আজ আপনার বলে যাহা পাইয়াছি, ১০০ বৎসর পূর্ব্বে কেহ কি তাহার কল্পনা করিতে পারিত? ভাব দেখি একশত বৎসরের আগেকার কথা—রাজা রামমোহন রায় কাঠের অক্ষর তৈয়ার ক'রে যখন সংবাদ-কৌমুদী ছাপাইয়াছিলেন, তখন দেশের কি অবস্থা ছিল, তখন পুস্তক ত দূরের কথা, হাতে লেখা পুঁথিও কেহ পড়তে পেত না। দেশের লোক লেখা পড়া জানতো না। পুস্তক ছাপানের বিদ্যা, কৌশল কে আমাদের দেশের সম্মুখে আনিয়া দিল? ১৮২৮ খৃঃ আগষ্ট মাসে যে সময় ব্রাহ্মসমাজ দেশে সর্ব্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনকার অবস্থা ভাব দেখি? ছাপা বই তখন ছিল না, লেখার অভ্যাস ছিল না, বর্ণ শুদ্ধ ক'রে একখানা চিঠি লিখতে পাড়ার পাঁচজনকে ডাকতে হ'ত।

পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বলিতেন, সংস্কৃতভাষারই চর্চ্চা করিতেন, জন সাধারণের তাহা অবোধ্য থাকিত। এখন মুদীর দোকানে যে সামান্য লেখা পড়া জানা লোক খাতা পত্র রাখে, তার মত লেখা পড়া জানা লোকও তখন বিরল ছিল।

এই সমাজ দেশের কত উন্নতি সাধন করেছে—লৌকিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক, সামাজিক, সর্ব্ববিষয়ে দেশের মধ্যে নূতন আদর্শ, নব ভাব আনিয়া দিয়াছে। কত সময় কত বিপদ কত ক্লেশ, কঠোর অধ্যবসায় সহকারে এই সব কার্য্যে তখন আত্মনিয়োগ করিতে হইত, সেই সব কার্য্যের ফল অনায়াসে এখন দেশের লোক ভোগ করিতেছেন। জীবনব্যাপী কি অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা Newton তাঁর মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিলেন! এখনকার ১৬ বৎসরের ছেলে I. sc. পড়তে গিয়ে তাহা কত সহজে আয়ত্ত করিয়া থাকে!

সচরাচর একটি আপত্তি উঠে যে আমরা বাপ পিতামহদের চেয়ে নিজেদিগকে অধিক জ্ঞানী ও পাণ্ডিত্যাভিমানী মনে করি। উত্তরে আমি বলবো, এই যে সম্পদ আমাদের বাপ পিতামহ রেখে গিয়েছেন, তাহা যদি আমরা সত্যভাবে নিজেদের করে নিতে পারি এবং সেই জ্ঞান-প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে পারি, তবে আমরা বাপ পিতামহদের ধনে ধনী বা তাঁদের চেয়ে উন্নত তা বলতে আমাদের বাধা কি?

আবার এমন যদি কিছু আমাদের বাপ পিতামহরা ক'রে গিয়ে থাকেন যাহা স্মরণ করলে লজ্জিত হ'তে হয় তাহা কি বিস্মৃত হওয়া আমাদের উচিত হইবে না? আমি বলি তাহা বিস্মৃত হওয়াই একান্ত উচিত।

ভগবান প্রাণের ভিতর যে সুর বেঁধে দিয়েছেন, সেই সুর উপলব্ধি ক'রে তাতে সুর মিলাতে হবে। ব্রাহ্ম সমাজে এসে দেখেছি আমাদের পূর্ব্বতন সমসাধকদের সকলের দিকে যে উৎসধারা প্রবাহিত হয়েছে তাই জগতের নানা ক্ষেত্রে শতধারায় ছুটে চলেছে। তাদের সকলের সুরই এখন আমাদের প্রাণে বাজছে, এখন তো দেখছি সেই পূর্ব্বতন প্রাচীন সমসাধকদের সুরেরই প্রতিধ্বনি হচ্ছে। এবারকার উৎসবে ঐ এক কথাই বলছে, ব্রহ্মধারা, প্রেমধারা এসে জগৎ প্লাবিত করছে—এ যোগ সাজসের কথা নয়, একেবারে বাস্তব প্রত্যক্ষ কথা।

কেহ কেহ ব্রাহ্ম সমাজকে Eclectic church বলেছেন—যেন পাঁচ ফুলে সাজান একটি তোড়া। নানা বর্ণের নানা রংএর টুকরা দিয়ে তৈয়ারী আলখেল্লার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের তুলনা দেওয়া হয়েছে। আমরা কি নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্য থেকে বাছাই করা কয়েকটি সার বান্ মত ও প্রণালী একত্রিত ক'রে ধর্ম্ম সমাজ গড়েছি? এবংবিধ বালকোচিত যুক্তির কোন ভিত্তিই নাই। যাঁরা এমন সব আজগুবি কথা বলেন তাঁদের 'ব্রহ্ম' এর সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, একথা আমি বলতে পারি।

ব্রাহ্মসমাজ সত্যের উপাসক, বিবেক ও পরমাত্মার বাণী তাঁরা শুনে এসেছেন। সেই সত্য যদি খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে, হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে, মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে অথবা জগতের অপরাপর ধর্ম্মের মধ্যে কিছু কিছু পরিমাণে পাওয়া যায় তবে কি তৎ তৎ ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্য থেকে পেয়েছি বলতে হবে? সত্য যাহা তাহা যে ধর্ম্মের মধ্যেই প্রকাশ থাকুক না কেন, আমরা সেই সত্যকেই চাই, কোন্ ধর্ম্মসমাজে তাহা বর্ত্তমান তাহা আমাদের লক্ষ্যের বস্তু নয়। 'ব্রহ্ম' যদি Eclectic না হন, তবে ব্রাহ্মসমাজও Eclectic নয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ব্রহ্মসাধকদের পক্ষে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই যে ভগবদ্বাণী তাঁর কাছে এল—পৃথিবীর সকল পদার্থই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত—ইহাতে তাঁর প্রাণে কিরূপ বল, উদ্যম, তেজ আসিল, ইহা যে তাঁর বিবেকের অনুমোদিত আপন উপলব্ধি হইতে প্রাপ্ত।

এদেশের চিন্তাশক্তি কিরূপ মৃত ও অসাড় হ'য়ে পড়েছে, তা প্রাচীন সমাজের ঘরে ঘরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—যিনি এক অদ্বৈত চরাচর বিশ্বব্যাপী পূর্ণ এক বিরাট রূপে বর্ত্তমান তাকে ক্ষুদ্র ক'রে উপাসনা করা হচ্ছে!

"যোবৈ ভূমা তৎ সুখং"—ভূমা বিরাট অনন্ত যিনি তিনিই সুখ দিতে পারেন, ক্ষুদ্রের উপাসনায় সুখ হইতেই পারে না।

কেহ বা বলেন ছোটকে মন ধারণা করতে পারে, বিরাটকে মন আয়ত্ত করতে পারে না—কিছু এগিয়ে উঠে তবে বিরাটকে ধরা যায়। ঋষি বলেছেন যে মুহূর্ত্ত থেকে ধর্ম্মের প্রতি আকাঙ্ক্ষা জাগে তৎমুহূর্ত্ত থেকেই ভূমাকে ধরতে হবে। প্রাচীন হিন্দু-

সমাজ একথা বোঝেন, জানেন; কিন্তু তাঁরা অন্ধভাবে এক সংস্কারের পথে চল্‌তে চল্‌তে এমন একটা অভ্যাসের দাসত্ব কর্‌ছেন যে জেনে শুনেও সেই সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি বা মেরুদণ্ড নাই। এই আমাদের সমাজমন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনায় এসে এঁরা যা বুঝেন, যা বিশ্বাস করেন, এখানে সেইরূপ ভাবে উপাসনাও করেন, আবার বাড়ী গিয়েই আর একজনকে পূজা করেন। ইঁহারা মন্দিরে এক প্রভুর, বাহিরে আর এক প্রভুর সেবা করেন। এদেশে জ্ঞান ও কর্ম্ম, এ দুটির সামঞ্জস্য হয় নাই। যখন জ্ঞানের কথা বলেন তখন একেবারে উচ্চস্তরে উঠে পড়েন, আবার কর্ম্মের মধ্যে যখন এসে পড়েন, তখন ঐ জ্ঞানদ্বারা কর্ম্ম মার্জ্জিত করা হয় না। জ্ঞান ও কর্ম্ম পৃথক ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছে। এদেশের চিন্তার মধ্যে এমন নির্জ্জীবতা থাকে ব'লে mental deformity এমন ভাবে এসেছে যে, অন্যায় অসত্য বুঝেও তাহা কর্‌তে প্রস্তুত হয়, যাহা অন্যায় তাহার বিরুদ্ধাচরণ করার শক্তি নাই। সত্যকে কার্য্যে প্রযুক্ত কর্‌তে সাহসী হয় না। ব্রাহ্মসমাজ এই দুই প্রভুর উপাসনা করাকে মহাপাপ ব'লে স্বীকার করেছেন—যাহা সত্য ব'লে জেনেছ তাহাকেই অবলম্বন কর্‌তে হবে, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের বাণী।

সেই জন্য মহর্ষি যখন ব্রহ্মকে গ্রহণ কর্‌লেন, তখন আর পিণ্ড দিয়ে পিতার শ্রাদ্ধ কর্‌তে পার্‌লেন না। কারণ, যা সত্য ব'লে উপলব্ধি হয় তাকেই জীবনের কার্য্যে অবলম্বন কর্‌তে পারে। ব্রহ্মের সঙ্গে যাহা মিল খায় না তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। মূল আমার অন্তরাত্মা, আমার অন্তরাত্মা যা গ্রহণ কর্‌তে বল্‌বে তাহাই গ্রহণ করবো। অন্তরের ব্রহ্মবাণীর সঙ্গে অন্য ধর্ম্মে যে টুকু সত্য মিলে তাহা যে ধর্ম্মেরই হোক্ না কেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করবো ও গ্রহণ করবো। তাই ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ ছাড়্‌তে হ'ল ধর্ম্মের জন্য, শুধু সংস্কারের জন্য নয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উপবীতকে সর্প ব'লে মনে কর্‌লেন, তখনি উপবীত পরিত্যাগ কর্‌লেন। স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় উপবীতকে কপটতার আবরণ ব'লে যখনি মনে করিলেন তখনই উহা পরিত্যাগ করিলেন।

কেহ বা বল্‌ছেন ব্রাহ্মসমাজ যে কাজ শতবর্ষ পূর্ব্বে আরম্ভ করেছেন তাহা এখন শেষ হ'য়ে গেছে, এখন আর ব্রাহ্মসমাজের কোন কাজ নাই। এইরূপ বাক্যও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। কারণ, আরব্ধ কার্য্য যে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক, উন্নতির পথপ্রদর্শক, তাহা স্বীকৃত হইতেছে। অবশ্য ধর্ম্মসমাজে ১০০ বৎসর যে ক্ষুদ্র তাহা বিবেচনাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। ধর্ম্ম চিরকাল অনন্ত। ধর্ম্মাবহ যিনি তিনি চিরকাল সর্ব্বত্র সমান ভাবে বর্ত্তমান।

অনেকে বলেন ব্রাহ্মসমাজ একটি সংস্কারের সমাজ। আমরা কোনও সমাজকে সংস্কার করিবার জন্য আসি নাই; ধর্ম্ম আমাদিগকে কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন তাই বর্জ্জন করি, ইহাতে যদি কোন সমাজের সংস্কার হয় হোক, তাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমরা প্রকৃত পক্ষে হিন্দুসমাজকে সংস্কার করিয়া একটি অভিনব সমাজ স্থাপন করিতে আসি নাই সমাজনিরপেক্ষ স্বাধীন ভাবে সংস্কার যদি কর্ত্তে হয় আমরা তাহাই করবো, আমরা আপনার ভাবে, আপন ভাষা দ্বারা উপাসনা করবো, আমরা আমাদের অন্তরের কথা দিয়ে অন্তরদেবতার পূজা করবো। গুরু বা পুরোহিত দ্বারা মধ্যবর্ত্তী রেখে আমরা হৃদয়-দেবতার অর্চ্চনা করবো না।

সমাজনীতির যে সংস্কার তাহাও এইভাবে ধর্ম্মভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হবে। আমার অন্তরাত্মা ভগবানের বাণী শুনেই দেশের পাপ তাপ ভারাক্রান্ত ভাই বোনদের জন্য আমাকে সমাজনীতি সংস্কার কর্‌তে বলে। হিন্দুসমাজে দরিদ্র-নারায়ণ ব'লে একটা কথা শুনিতে পাই, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা কর্‌তে হ'লে দুটো পয়সা ব্যয় ক'রে charity fund খুল্‌লে দরিদ্র-নারায়ণ এর প্রকৃত সেবা হয় না। তাদিগকে হেয় ঘৃণ্য ক'রে রেখে, জাতিগত পার্থক্য বজায় রেখে কি সেবা করা হয়? যে-দিন তাদিগকে ভাই ভাই ব'লে ডাক্‌তে পার্‌বে, তাদিগকে সকল পার্থক্য ভু'লে প্রাণ মন ঢেলে আলিঙ্গন কর্‌তে পার্‌বে, সেই দিন তাদের সেবা হবে। এবং সেই দিনই প্রকৃত ধর্ম্মসংস্কার হবে।

দেশের মধ্যে এখন একটা রব উঠেছে—অস্পৃশ্যতা দূর কর্‌তে হবে। এর মধ্যেও কোন উদার ভাব নাই, কোন একটি বিশিষ্ট অধিকারলাভ বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এইরূপ প্যাক্ট, বা Contract বা সাময়িক ভালাচারের অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রকৃত ইষ্টলাভ কখনও হ'তে পারে না। ব্রহ্মের আদেশে, নিজ বিবেকের আদেশরূপে, অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে যদি ইহাকে গ্রহণ না কর্‌তে পার, তবে উহার দ্বারা কোনই ফললাভ হবে না।

আগে যাদের নীচ জাত, অস্পৃশ্য, ব'লে রেখে দিয়েছ, তাদের স্থানে নেমে এস, ধূলার সঙ্গে আপনার অহঙ্কারী আত্মাভিমানী মনকে মিশিয়ে দাও, ভাই ব'লে হাত ধর, তার পর অস্পৃশ্যতা দূর করো।

এ দেশের লোকের একটি ধারণা আছে যে, মন্ত্রের একটি শক্তি আছে। বিড় বিড় ক'রে সংস্কৃত ভাষাতে মন্ত্র পড়্‌লেই শক্তি লাভ হয় এবং তাহার দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা হয়। এরা চোখ খুলে দেখে না যে শক্তি কোথায়, মন্ত্র পড়্‌লেই অভিষ্ট সিদ্ধ হয়, এই ভাবে। ইহা দ্বারা কখনও কি প্রকৃত সংস্কার হ'তে পারে? যাঁরা পণ্ডিত, বিদ্বান, তাঁরা জানেন এইরূপ অন্ধভাবে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়্‌লেই কখনও ধর্ম্ম সাধন হয় না; তবুও এমন সাহস নাই যে সত্যকে সত্যরূপে বুঝে সেই অনুরূপ কাজ করে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"call a spade a spade". কোদালকে কোদাল বলিবার সাহস আমাদের দেশের লোকের নাই। ভক্তির সঙ্গে প্রাণ মিশিয়ে প্রকৃত অনুভব ক'রে মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌লে তাতে শক্তি আছে; শুধু আওড়ালে কোন শক্তি নাই। বাহিরের আচরণটা ধর্ম্ম নয়। নিজের ধর্ম্ম অন্তরের ধর্ম্ম, তার উৎস কোথায় ভাল ক'রে চিন্তা ক'রে বুঝে দেখ, প্রাণে ঈশ্বরের বাণী শুন্‌তে পাও কি না সেইটা অনুভব কর, তখন দেখ্‌বে ধর্ম্ম আর তুমি কত দূরে রয়েছ। শিক্ষিত যুবকেরা কালী, দুর্গার পূজা নিজ মঙ্গলের জন্য যে আবশ্যক তা মনে করেন না, কিন্তু কপট চিন্তার বশীভূত হ'য়ে, অন্ধসংস্কারের দাসত্ব

ব'য়ে নিজেদের চিন্তাশক্তি এঁরা বিসর্জ্জন দিয়েছেন; এরা তাই শুনেই ধর্ম্মলাভ করেন, ভেবে করেন না। ধর্ম্মের ধারা চলে এসেছে, তাকে আত্মস্থ কর, বুঝে নেও, তবে ধর্ম্ম কর।

আমার সাধুকার্য্যে কোন প্রেরণা আসছে কি না, জগতের ভাই বোনদের মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্যে প্রকৃত উদ্দীপনা জাগছে কি না, এই সকল মাপকাঠি দিয়ে ধর্ম্মকে test ক'রে—পরীক্ষা ক'রে নাও। যখন অন্তরে সায় পাবে, তখনি জেন তাহা ধর্ম্ম।

Jesus Christ এর Sermons on the mount এর মত ধর্ম্মের আলো উঁচু করে মানুষের কাছে তুলে ধর, এই তাজা আলোককে ধামা চাপা দিবার দরকার নাই। এই আলো জলবেই; ধর্ম্ম মানুষের দ্বারা প্রচার হ'তে পাবে না—অন্তরে যদি ধর্ম্মের আলো জ্বলে, তবে ঈশ্বরই জ্বালাবেন, তিনিই তোমার আমার ভিতর দিয়ে তাঁর ধর্ম্ম প্রচারিত করবেন। ভগবান যদি ব্রহ্মতেজ না দেন, তবে এমন কারও শক্তি নাই যে তিনি ধর্ম্ম প্রচার করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলছে, ব্রহ্ম যা বলবেন তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই সাধন করবো, অন্য কিছু করবো না। পৌত্তলিকতা শুধু নিকৃষ্ট ধর্ম্ম নয়, তাহা উচ্চ ধর্ম্মলাভের পক্ষে বিরোধী। যদি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠা বোধ কর, তবে সত্য ধর্ম্মের অন্বেষণ করো না। কারণ, মৃত্যুতে ভয় কিসের? "সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে"।

স্ত্রী জাতিকে বলা হয়েছে তারা উচ্চ ধর্ম্ম লাভের অযোগ্য, বেদ বেদান্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র তাদের অপাঠ্য। আমি বল্‌বো বেদ বেদান্ত যদি সত্যই স্ত্রী জাতির পাঠের অযোগ্য হয়, তবে উহা মানুষের পাঠেরও অযোগ্য। স্ত্রী জাতিকে বল তাদের মানসিক দুর্ব্বলতা আছে, তাদের মন উচ্চ চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট নয়। তাহাদিগকে কি সুযোগ সুবিধা দিয়েছ যে বল তারা অনুপযুক্ত? যখন তারা উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগ পেয়েছে তারা যে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়, তাহা কি তারা কার্য্যদ্বারা প্রমাণ করে নাই? বর্ত্তমান University র পরীক্ষার Result দেখলেই বুঝতে পারবে তারা Scope and field (সুযোগ ও সুবিধা) পেলে কত উন্নতি সাধন করতে পারে।

একটি স্থানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এখানে নমঃশূদ্র এত অধিক, এখানে এদের শিক্ষা দীক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই কেন? উত্তরে শুনিলাম, নমঃশূদ্রেরা যদি লেখা পড়া শিক্ষা করে তবে চাকর পাওয়া যাবে কোথায়? হায়রে দেশ! চাকর পাওয়ার জন্যই কি একটি জাতি চিরদিন অন্ধকারে কুশিক্ষা অশিক্ষায় জীবন যাপন করবে? ভগবান কি এদের কেবল চাকরের জন্য সৃষ্টি করেছেন?

আবার তোমরা বল স্বরাজ পেলে ওদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। তোমাদের মন প্রস্তুত হয়নি। তোমরা স্বরাজ পেলেও জাতিগত বিদ্বেষ দূর হবে না। মন তোমাদের পরিবর্ত্তন হয় নি। ব্রাহ্মসমাজ ও পথ দিয়ে যায় নি, তারা চাকর পাবে কি না পাবে, এটা তারা কোনও দিন ভেবে দেখেনি, যা কর্ত্তব্য ব'লে বুঝেছে তাই করেছে।

আর একটি বড় কথা শুনতে পাই "চণ্ডালোঽপি দ্বিজঃশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ"। এই চণ্ডালদিগকে কি কখনও সুবিধা দিয়ে দেখেছ যে তারা দ্বিজশ্রেষ্ঠ হ'তে পারে কি না? দাদুর মত প্রেমিক, কবিরের মত ধর্ম্মপ্রাণ তোমাদের পাণ্ডিত্যাভিমানীদের মধ্যে একজনও আছেন কি না আমার সন্দেহ আছে। মনে হয় নিরক্ষরদের মধ্যে আছে। তাই বলি ব্রাহ্মধর্ম্ম যে পথ দিয়ে চলেছেন, যে বাণী দেশের মধ্যে এনে দিয়েছেন, তাহাতে যুক্ত হও; আর যদি নাও হও, যখন দেখবো তোমার প্রাণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব পেয়েছ, সেই এক পরমব্রহ্মকে উপাসনা করতে আরম্ভ করেছ, সেই একেরই অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়েছ, তখন তুমি যেই হও না কেন, হিন্দু হও, মুসলমান হও, খৃষ্টান হও, আর যে নামেই তোমরা অভিহিত হও না কেন, তখন তুমি আমার ভাই, তখন তুমি আমারই একজন।

৪ঠা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট) সোমবার—
ইংরাজী তারিখের হিসাবে আজই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার শততম সাম্বৎসরিক—১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট (৬ই ভাদ্র, ১২৩৫ বঙ্গাব্দ) দিবসেই প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। আমরা বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা তারিখই অনুসরণ করিয়া থাকি, কিন্তু অন্য প্রদেশে ইংরাজী তারিখই অধিক প্রচলিত। অদ্য প্রাতঃকাল হইতেই মুষল ধারে বৃষ্টি পতিত হইতে থাকে। তথাপি, লোকসংখ্যা আশানুরূপ না হইলেও, অনেকে যথাসময়ে মন্দিরে সমবেত হন। কিছু সময় সংকীর্ত্তন হইলে পর ইংরাজীতে উপাসনা হয়। [illegible] হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

সায়ংকালে সংকীর্ত্তনান্তে ব্রাহ্মসমাজের বাণী বিষয়ে বক্তৃতা। আচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ সার ভেঙ্কটরত্নম্ নাইডু প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত কয়েক খানা টেলিগ্রাম পাঠ করেন। তৎপর তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকালে দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহার উল্লেখ করিয়া—যথা, কুষ্ঠরোগের প্রতিকারস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে রোগীকে এক লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিতে হইবে—ইংরাজীতে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত ভি আর সিন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিলে পর, অসুস্থতা নিবন্ধন ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ করের উপর সভাপতির কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত জি বি ত্রিবেদী ইংরাজী ভাষায় এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও সভাপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করেন। একটি সঙ্গীত হইয়া অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

৫ই ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) মঙ্গলবার—
প্রাতে পাঞ্জাব হইতে আগত ভ্রাতা ভগিনীগণ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঊষাকীর্ত্তন করেন। অনন্তর ৭টা হইতে ৭৷৷টা ইংরাজীতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত ভিঃ আর সিন্ধে আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে ১০টা পর্য্যন্ত "সামাজিক উপাসনা ও পারিবারিক ধর্ম্মসাধন" বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্তা কামিনী রায় সভানেত্রীর কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, শ্রীমতী

অবন্তী ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত, শ্রীযুক্ত পি এল নারায়ণ, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত প্রভৃতি আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি করেন। সভানেত্রী লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্ক হইতে বিপুল নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। সকলে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ প্রার্থনা করেন। তৎপরে নিম্নলিখিত পাঁচ দলে বিভক্ত হইয়া সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে রাস্তায় বাহির হন:— সর্ব্ব প্রথমে বালকগণ বাঙ্গালা ভাষায়, তৎপর পাঞ্জাবী ভাই ভগ্নিগন হিন্দিতে, তাঁহাদের পশ্চাতে আর্য্যসমাজের ভ্রাতাগণ হিন্দি ভাষাতে, তাহাদের পেছনে উড়িষ্যার ভ্রাতাগণ উড়িয়া ভাষাতে ও সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষের নেতৃত্বাধীনে প্রধান দল বাঙ্গালা ভাষাতে প্রমত্ত ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট, মোহনলাল ষ্ট্রীট, আপার সারকিউলার রোড, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গ্রেষ্ট্রীট, রাজাবাগান জংসন ষ্ট্রীট, রাজা গোপীকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কাশীবসুর লেন, হরিঘোষের ষ্ট্রীট, নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, বিডন ষ্ট্রীট, বেথুন রো, মানিকতলা ষ্ট্রীট, বলরাম দে ষ্ট্রীট, রামতনু বসু লেন, সিংহী লেন, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হইয়া রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে মন্দিরে উপস্থিত হন। সেখানে পর পর প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক দল কিছু সময় কীর্ত্তন করেন। সমস্ত সময় রাস্তায় বৃষ্টি পড়িতেছিল, তাহার মধ্যেই সকলে উৎসাহের সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। পাঞ্জাবের ভগিনীগণ এই অবস্থার মধ্যে যেরূপ উৎসাহের সঙ্গে সুদীর্ঘ পথ কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন তাহা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। মন্দিরে কিছু সময় কীর্ত্তন হইলে পর উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে তিনি বলেন যদিও তাঁহাকে শুধু প্রার্থনা করিয়া শেষ করিতে বলা হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার হৃদয়ে এই দৃশ্য এমন উৎসাহ জাগাইয়াছে যে তিনি উপদেশচ্ছলে কিছু না বলিয়া পারিলেন না। রাত্রি ১০ ঘটিকার পর অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

৬ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট) বুধবার— অদ্য উৎসবের প্রধান দিন। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া যুবকগণ পত্র পুষ্পে মন্দির সুশোভিত করেন। ভোর হইতে না হইতেই উপাসক উপাসিকাগণে মন্দির পূর্ণ হইয়া যায় এবং প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বাধীনে সংগীত ও সঙ্কীর্ত্তন চলিতে থাকে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আচার্য্যের কার্য্য করিবার কথা ছিল; তিনি সংবাদ পাঠান যে অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি সে ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু ৮ ঘটিকার সময় উপস্থিত হইয়া তাঁহার লিখিত উপদেশ পাঠ করিবেন। তদনুসারে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। অনন্তর ৮ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ আসিয়া বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক মুখে কিছু বলিয়া তাঁহার লিখিত উপদেশ পাঠ করেন। তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

মহাপুরুষ যখন আসেন তখন বিরোধ নিয়েই আসেন, নইলে তাঁর আসার কোনো সার্থকতা নেই। ভেসে-চলার দল মানুষের ভাঁটার স্রোতকেই মানে। যিনি উজিয়ে নিয়ে তরীকে ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবেন, তাঁর দুঃখের অন্ত নেই, স্রোতের সঙ্গে প্রতিকূলতা তাঁর প্রত্যেক পদেই। রামমোহন রায় যে-সময়ে এ দেশে এসেছিলেন সেই সময়কার ভাঁটার বেলার স্রোতকে তিনি মেনে নেন নি, সেই স্রোতও তাঁকে আপন বিরুদ্ধ ব'লে প্রতিমুহূর্ত্তে তিরস্কার করেচে। হিমালয়ের উচ্চতা, তার নিম্নতলের সঙ্গে অসমানতারই মাপে। সময়ের বিরুদ্ধতা দিয়েই মহাপুরুষের মহত্বের পরিমাপ।

কোনো জাতির ইতিহাসে মানুষের প্রাণ যতদিন প্রবল থাকে ততদিন সে আপন মর্ম্মগত জাগ্রৎ শক্তিতে নিজেকে নিজে নিরন্তর সংশোধন ক'রে জয়ী ক'রে চল্‌তে পারে। বস্তুত প্রাণের প্রক্রিয়াই তাই। সে তো নিত্য সংগ্রাম—আমরা চলি. সে তো প্রতিপদক্ষেপেই মাটীর অবিশ্রাম আকর্ষণের সঙ্গে বিরোধ। জড়তার বূহ চারিদিকেই, দেহের প্রত্যেক যন্ত্রই তার সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত। হৃদ্‌যন্ত্র চল্‌চে, দিনে রাত্রে, নিদ্রায় জাগরণে; জড় রাজ্যের প্রকাণ্ড নিষ্ক্রিয়তা সেই চলার বিরুদ্ধ, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই সে ক্লান্তির বাঁধ বাঁধ্‌তে চায়, যতক্ষণ জোর থাকে হৃদ্‌যন্ত্র মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই সেই বাঁধাকে অপসারণ ক'রে চলে। বাতাস আমাদের চারিদিকে আপন নিয়মে প্রবাহিত, তাকে প্রাণের ব্যবস্থাবিভাগ আপন নিয়মের পথে প্রতিক্ষণেই বলপূর্ব্বক চালনা করে। রোগের কারণ ও বীজ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই, দেহের আরোগ্য-সেনানী তাকে সর্ব্বদাই আক্রমণ করচে—এর আর অবসান নেই। জড়ধর্ম্মের সঙ্গে জীবধর্ম্মের, রোগশক্তির সঙ্গে আরোগ্য-শক্তির নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধক্রিয়াকেই বলে প্রাণক্রিয়া। সেই সচেষ্ট শক্তি যদি ক্লান্ত হয়, এই প্রবল বিরোধে যদি শৈথিল্য ঘটে, দেহব্যবস্থায় চলার চেয়ে না চলার প্রভাব যদি বেড়ে ওঠে, তবেই বিকৃতি ও মলিনতায় দেহ কেবলি অশুচি হ'তে থাকে, তখন মৃত্যুই করুণারূপে অবতীর্ণ হ'য়ে এই শ্রান্তসংগ্রাম পরাভবকে জীবজগৎ থেকে অপসারিত ক'রে দেয়।

সমাজ-দেহও সজীব দেহ। জড়ত্বের মধ্যেই তার সমস্ত অমঙ্গল। সমাজের যুদ্ধ-কুশল প্রাণধর্ম্মকে বুদ্ধির ম্লানতা, সংকল্পের দৈন্য, জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা, প্রীতি মৈত্রীর দৌর্ব্বল্যের সঙ্গে কেবলি বিরোধ জাগিয়ে রাখ্‌তে হয়। চিত্তের অসাড়তা তার সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। চিত্ত যখন আপন কর্ত্তৃত্বকে খর্ব্ব ক'রে স্থাবর হ'য়ে বসতে চায়, তখনি তার সর্ব্বত্রই বিকৃতির আবর্জ্জনা জ'মে উঠে তাকে অবরুদ্ধ ক'রে দেয়। এই অবরোধেই মৃত্যুর আরম্ভ। এই সময়ে আসেন যে মহাপুরুষ তিনি জড়ত্বপুঞ্জের মধ্যে প্রবল বিরোধ নিয়ে আসেন, নির্ব্বিচার প্রথার দ্বারা চালিত দীনাত্মা তাঁকে সহ্য করতে পারে না।

সুদীর্ঘকাল থেকেই ভারতবর্ষে ইতিহাস স্তম্ভিত হ'য়ে আছে। কতকাল এই দেশ নিজে চিন্তা করে নি, চেষ্টা করে নি, সৃষ্টি করে নি, বুদ্ধিপূর্ব্বক নিজের অন্তর-বাহিরের সম্মার্জ্জন করেনি, তার সক্রিয় সঙ্কল্পশক্তি নব নব ব্যবস্থার দ্বারা নব নব কালের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে নি। আত্মদৈন্য, অন্নদৈন্য, জ্ঞানদৈন্য একে একে তার প্রাণের প্রায় সকল শিখাই ম্লান ক'রে এনেছে।

শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে তার পরাভব বিস্তীর্ণ হ'য়ে চল্‌ল। মানুষের পরাভব তাকেই বলে, যখন তার আপন ইচ্ছায় অরাজকতা ঘটে এবং বাহিরের ইচ্ছা শূন্য সিংহাসন অধিকার ক'রে বসে, যখন তার নিজের বুদ্ধি অবসর নেয়, বাহিরের বুদ্ধি তাকে চালনা করে,—সেই বুদ্ধি তার স্বজাতির অতীত কাল থেকেই তাকে অভিভূত করুক, বা অন্যজাতির বর্ত্তমান কাল থেকে এসেই তাকে ঘুরিয়ে বেড়াক। মানুষের পরাভব তাকেই বলে, যখন তার আত্মার কর্ত্তৃত্ব আড়ষ্ট হয়, যখন সে কালপরম্পরাগত অভ্যাস-যন্ত্রের চাকাগুলোকে অন্ধভাবে ঘুরিয়ে চলে, যখন সে যুক্তিকে স্বীকার করে না, উক্তিকে স্বীকার করে, আন্তর ধর্ম্মকে খর্ব্ব ক'রে বাহ্য কর্ম্মকে প্রবল ক'রে তোলে। কোনো কূট কৌশলের দ্বারা বাহিরের কোন সঙ্কীর্ণ সংক্ষিপ্ত পথে এই স্থবিরত্ব-ভারমন্থর মানুষের পরিত্রাণ নেই।

এমনতর বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চলতাকেই পবিত্রতা ব'লে স্থির ক'রে নিস্তব্ধ ছিল এমন সময়েই ভারতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব! দেশকালের সঙ্গে অকস্মাৎ এমন প্রকাণ্ড বৈপরীত্য ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে। তাঁর দেশ-কাল তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করেছিল। সেই অসহিষ্ণু অস্বীকৃতির দ্বারাই দেশ তাঁর মহোচ্চতাকে সর্ব্বকালের কাছে ঘোষণা করেচে। এই পরুষ কণ্ঠের গর্জ্জনধ্বনির চেয়ে আর কোনো উপায়ে স্পষ্টতর ক'রে বলা যায় না যে, তিনি এদেশে অন্ধকারের বিপক্ষে আলোকের বিরোধ এনেছিলেন, তিনি অভ্যস্ত দুর্ব্বল বচনের পুনরাবৃত্তি ক'রে জড়বুদ্ধির অনুমোদন করেন নি; চাটুলুব্ধ জনতার খ্যাতিগ্রস্ত অগ্রণীত্ব করার আত্মাবমাননাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন; তিনি উদ্যতদণ্ড জনসঙ্ঘের মূঢ় প্রতিকূলতাকে ভয় করেন নি, এবং তাদের নিবেদিত অন্ধভক্তির প্রলোভনে সত্যপথ থেকে লেশমাত্র বিচলিত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি বহুযুগের পূজাবেদীতে আসীন জড়ত্বকে আঘাত করেছিলেন এবং জড়ত্ব তাঁকে ক্ষমা করেনি।

তিনি নিজে জান্‌তেন সকল প্রকার জড়ত্বের মূলে আত্মার প্রতি অশ্রদ্ধা। জন্তু পায়নি তার স্বরাজ, কেন না সংস্কারের দ্বারা সে চালিত। জ্ঞানালোকিত আত্মা মানুষের ধর্ম্মকে, কর্ম্মকে তার সৃষ্টিকে যে পরিমাণে অধিকার করে সেই পরিমাণেই তার স্বরাজ প্রসারিত হয়। সভ্যতার ইতিহাস মানুষের আত্মবুদ্ধি আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মানের শক্তিতে স্বরাজ্যবিস্তারের ইতিহাস।

মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয়ঘোষণা এক দিন এই ভারতবর্ষে যেমন অসংশয়িত বাণীতে প্রকাশ পেয়েছিল, এমন আর কোথাও পায়নি। সেই বাণীই ভারতবর্ষে যখন খণ্ডিত আচ্ছন্ন অবরুদ্ধ, তখনি রামমোহন রায় তাকে পুনরায় নূতন ক'রে বহন ক'রে আন্‌লেন। তার পূর্ব্বেই অধিকাংশ ভারতবর্ষ নিজেকে নিকৃষ্ট অধিকারী ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে জ্ঞানে কর্ম্মে তামসিকতাকে অবলম্বন ক'রে আত্মাবমাননায় নিমগ্ন ছিল। তার প্রথাজড়ত্বের ব্যাধিস্ফীত মন মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকারকে কেবল অস্বীকার কর্‌লে না, তা নয়, তাকে ভৎর্সনা কর্‌লে, আঘাত কর্‌লে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত দেশের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যেই তিনি আত্মার বাণীকে উদ্বোধিত কর্‌তে চেয়ে-ছিলেন এমন নয়। যে কোন সম্প্রদায়ই আপন জড় বাহ্য রূপের দ্বারা, জ্ঞানবিরোধী অন্ধ আচারের দ্বারা আপন সত্য রূপকে আবৃত করেছে তাকেই তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা বিচার করেছিলেন। তিনি মানুষের সমগ্রতাকে যেমন সমস্ত মনে প্রাণে অনুভব ও ব্যবহারে প্রকাশ করেচেন, সেই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের পক্ষেই তা সম্ভবপর ছিল। তিনি জান্‌তেন, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সকল ধর্ম্মের মধ্যে মানুষের আত্মার মিলন ঘট্‌তে পারে। তিনি জান্‌তেন, মানুষ যখন আপন ধর্ম্মতত্ত্বের বাহ্য বেষ্টনীকে তার আত্মরূপের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েচে, তখনই তাতে যেন মানুষের ব্যবধান ঘটিয়েচে, তার ধর্ম্মগত বিষয়বুদ্ধি অহংকার হিংসা বিদ্বেষ জাগিয়ে পৃথিবীকে রক্তে পঙ্কিল করেচে, এমন আর কিছুতেই করেনি। ধর্ম্মের বিশ্বতত্ত্বের ভূমিকা তিনি সেই ধর্ম্ম-সঙ্কীর্ণতার দিনে আপন চিত্তের মধ্যে লাভ ও আপন জীবনের মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন।

যদিও সেদিন বাহির থেকে পৃথিবীর মানুষ প্রত্যেক সভ্য মানুষের জ্ঞানের মধ্যে স্থান পেয়েছিল, তার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করেনি। মানুষের সম্বন্ধে বিশ্ববোধ আজও পৃথিবীতে নানা সঙ্কীর্ণ সংস্কারে বাধাগ্রস্ত। আজও পৃথিবী এ কথা বল্‌তে পাচ্চেনা যে, নূতন যুগ এল। সকল দিকেই এ যে অখণ্ডতার যুগ। এই যুগে জ্ঞানে কর্ম্মে সব মানুষকে মিলিয়ে নেবার প্রশস্ত রাজপথ উদ্‌ঘাটিত হওয়া চাই। বিজ্ঞানরাজ্যে আজ জ্ঞানে জ্ঞানে অসবর্ণতা দূর ক'রে মিলন আরম্ভ হয়েচে; বিশ্ববাণিজ্যের মধ্যে কর্ম্মের মিলও বিস্তীর্ণ হোলো, যদিও সেই মিলন-পথের বাঁকে বাঁকে আজও বাটপাড়ির ব্যবসা চলে; যতই কঠিন বাধায় কণ্টকাকীর্ণ হোক তবু বিশ্বরাষ্ট্রনীতির যে সূত্রপাত হয় নি এমন কথা বলা যায় না। এই নূতন যুগ-ধর্ম্মের উদ্বোধন বহন ক'রে বাহিরের প্রতিকূলতা ও আত্মীয়ের লাঞ্ছনার মধ্যে যাঁরা এই পৃথিবীতে বুক পেতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রথম ও প্রধানদের মধ্যেই রামমোহন একজন। তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের বাণীকে বহন ক'রে নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন—সেই বাণী ভারতের স্বকীয় দৈন্য নিয়ে নয়, দুর্য্যোগ নিয়ে নয়, সমস্ত মানবের কাছে আপনার অর্ঘ্য নিয়ে। মানবসত্যকে তিনি সমগ্র ক'রে দেখেছিলেন। তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙালীর আত্মপ্রকাশের উপাদানকে বলিষ্ঠ কর্‌বার জন্য প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন বাংলা গদ্য ভাষার অনুদ্‌ঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন কর্‌তে হয়েছিল; যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বাঙালীর মন উদ্ভাসিত কর্‌তে চেয়েছিলেন, তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন সকল পাঠকের কাছে বেদান্তের ভাষ্য কর্‌তে কুণ্ঠিত হন নি যাদের কোনো কোনো পণ্ডিতও উপনিষদ্‌কে কৃত্রিম ব'লে উপহাস করতে সাহস করেচেন, ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রকে মনে করেছিলেন রামমোহনেরই জাল করা শাস্ত্র; সমাজে নারীর অধিকার সমর্থন কর্‌তে একলা যখন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তখন পশ্চিম মহাদেশেও নারী অবলাই

ছিল এবং তার অধিকার ছিল সকল দিকেই সঙ্কীর্ণ; যখন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান দাবী করেছিলেন, তখন দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূত্রপাতও হয়নি। মনুষ্যত্বের উপকরণ-বৈচিত্র্যকে তিনি তাঁর সকল শক্তি দিয়েই সম্মান করেছিলেন। মানুষকে তিনি কোনো দিকেই খর্ব্ব ক'রে দেখ্‌তে পারতেন না, কারণ তাঁর নিজের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা অসাধারণ ছিল।

এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনো তাঁর সত্য পরিচয় দেশের কাছে অসম্পূর্ণ, এখনো তাঁকে অসম্মান করা দেশের লোকের কাছে অসম্ভব নয়, যে উদার দৃষ্টিতে তাঁর মহত্ত্ব সুস্পষ্ট দেখা যেত সে দৃষ্টি এখনো কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এতে সেই কুহেলিকার স্পর্দ্ধার কোনো কারণ নেই। জ্যোতিষ্ককে আবৃত ক'রে সমস্ত প্রভাতকে যদি সে ব্যর্থ ক'রে দেয় তবু সেই জ্যোতিষ্ক কুহেলিকার চেয়ে ধ্রুব ও মহৎ। মহত্ত্ব বাহিরের কর্কশ বাধার মধ্যে থেকেও কাজ করে, আলোকের অনাদরে তার বিলুপ্তি হয় না। রামমোহন যে শক্তিকে চালনা ক'রে গেছেন সেই শক্তি আজও কাজ করচে, এবং অবশেষে এমন দিন আস্‌বে যখন তাঁর অবিচলিত প্রতিষ্ঠাকে, তাঁর বীর্য্যবান্ অপ্রতিহত মহিমাকে, সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করবার মতো অন্ধসংস্কারমুক্ত সবল বুদ্ধি ও নির্বিকার শ্রদ্ধার অবস্থায় দেশ উত্তীর্ণ হবে। আমরা যারা তাঁর কাছ থেকে মানুষকে প্রচুর বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও সত্য ক'রে দেখ্‌বার প্রেরণা লাভ করি, তাঁর প্রত্যেক অসম্মানে আমরা মর্ম্মাহত হই, কিন্তু তাঁর জীবিতকালেও শত শত অবমাননাতেও তাঁর কল্যাণশক্তিকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ ক'রে নি; এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও সকল অবজ্ঞার মধ্যে সেই শক্তি জাগ্রত থেকে অকৃতজ্ঞতার অন্তরে অন্তরেও সফলতার বীজ বপন করবে।

অনন্তর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর অনুরোধ ক্রমে একটি গান গাহিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। কিছু সময় কীর্ত্তন হইয়া এই বেলার কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু কেহ কেহ মন্দিরে অবস্থান করিয়া ব্যক্তিগত ধ্যান প্রার্থনা ও সঙ্গীতে নিযুক্ত থাকেন। অনেকে প্রীতিভোজনে যোগদান করেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় আবার উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশ করিব। উপাসনান্তে ৩½ ঘটিকা হইতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভাই সীতারাম, মিঃ এম্ এস্ ফিলিপ্‌স্ শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জীবনের ঘটনা অবলম্বনের উৎসব সম্বন্ধে কিছু বলেন। অনন্তর কিছুসময় সংকীর্ত্তন হইলে পর যথা সময়ে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম পরে প্রকাশ করিব।

৭ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) বৃহস্পতিবার— প্রাতে ইংরাজীতে উপাসনা; মিঃ জি বি ত্রিবেদী আচার্য্যের কার্য্য করেন। অনন্তর ৭½ ঘটিকা হইতে "ধর্ম্মসমাজের গঠন-প্রণালী" (Church organisation) বিষয়ে আলোচনা। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল, শ্রীযুক্ত এন রঙ্গচারিয়া, শ্রীযুক্ত জি বি ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সেন, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন ও শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কেহ ইংরাজি ও কেহ বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করেন। অনেকে অজ্ঞাতসারে যে একটি অপ্রীতিকর বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু সর্ব্বশেষে অনুরোধ জানান।

সায়ংকালে "ব্রাহ্মসমাজের বাণী" বিষয়ে বক্তৃতা; শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তার ডি আর ভাণ্ডারকার, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, ভাই সীতারাম ও ডাক্তার ডি এ সুখ্‌ঠাঙ্কার বিভিন্ন ভাষাতে বক্তৃতা করেন।

৮ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট) শুক্রবার— প্রাতে বাঙ্গালা ভাষাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর আচার্য্যের কার্য্য করেন। অনন্তর ৭½ ঘটিকা হইতে "সামাজিক সমস্যা" বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত জি বি ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত ভি আর সিন্ধে প্রভৃতি বক্তৃত করেন।

অপরাহ্ণে মহিলাদের আলোচনা সভা। তাহাতে শ্রীযুক্তা কামিনী রায় সভানেত্রীর কার্য্য ও উপাসনা করেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করেন।

৯ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট) শনিবার— প্রাতে হিন্দিতে উপাসনা; ভাই সীতারাম আচার্য্যের কার্য্য করেন। মিঃ ফিলিপ্‌স্ সংক্ষেপে আপনার জীবন পরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব কাহিনী বর্ণন করেন। অনন্তর ৭½ ঘটিকা হইতে "প্রচার" বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্ত ভিঃ আর সিন্ধে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই বেলা ভারতে ও বাহিরে প্রচার বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জি ওয়াই চিংনীশ, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পি এল্ নারায়ণ ও শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভৌমিক প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় উহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তাহাতেও শ্রীযুক্ত ভি আর সিন্ধে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে "অবনত শ্রেণীদিগের মধ্যে প্রচার কার্য্য" বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত জয়মঙ্গল রথ লিখিত একটি প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র পাঠ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত কালীদাস বিশ্বাস বি এ, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি বক্তৃত করেন। শ্রীযুক্তা সুশীলা বসু লিখিত একটি প্রস্তাবও দেবেন্দ্র বাবু পাঠ করেন।

সায়ংকালে মেরীকার্পেণ্টার হলের মাঠে সান্ধ্য সম্মিলন।

১০ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট) রবিবার— প্রাতে বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের

কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশ করিব। তাহার পর ৯ ঘটিকার সময় তেলেগু ভাষাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত পি এল নারায়ণ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

অপরাহ্ণ ১॥ ঘটিকার সময় যুবক সম্মিলন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। "ব্রাহ্মসমাজের জন্ত ব্রাহ্ম-যুবকগণ কি করিতে পারেন" এই বিষয়ে আলোচনা হয়। কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার কালিদাস নাগ, ডাক্তার শিশির কুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত, শ্রীযুক্ত প্রকাশপাল, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত প্রভৃতি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় বালক বালিকা সম্মিলন। তাহাতে শ্রীযুক্তা মণিকা মহলানবীশ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। বালক বালিকাগণ সঙ্গীত ও "ওঁ নমস্তে পরমব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে" ইত্যাদি স্তোত্র পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় প্রার্থনা করেন ও শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ কিছু উপদেশ প্রদান করেন। যাহারা পুরস্কার ও মেডেলিয়ান প্রাপ্ত হইয়াছে সভানেত্রী তাহাদিগকে সে সকল বিতরণ করেন। জলযোগান্তে কার্য্য শেষ হয়।

শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত বালক বালিকাগণ পদক ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন :—

(ক) "ভারতবর্ষের উন্নতি বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব" সম্বন্ধে রচনা :— ১। কে এম নাথ (কেনারীজ ভাষায়)— পুস্তক পুরস্কার ২। সি সীতারাম মূর্ত্তি (ইংরাজী ভাষায়) পুস্তক পুরস্কার।৩। কল্যাণী চক্রবর্ত্তী (বাঙ্গালা ভাষায়) পুস্তক পুরস্কার (খ) "বিগত শতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য" বিষয়ে রচনা— ১। পি সরোজিনী (তেলেগু ভাষায়) স্বর্ণপদক। ২। অর্দ্ধেন্দু বকসী (ইংরেজী ভাষায়) রৌপ্যপদক। ৩। লতিকা দাস (ইংরেজী ভাষায়) পুস্তক পুরস্কার। (গ) "ব্রাহ্মসমাজ ও রামমোহন রায়" বিষয়ে রচনা—১। কনকাবল্লী তায়ারাম্মা (তেলেগু ভাষায়) স্বর্ণপদক। ২। সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় (বাঙ্গলা ভাষায়) রৌপ্যপদক। ৩। মীরা চৌধুরী (বাঙ্গলা ভাষায়) পুস্তক পুরস্কার। ৪। পি শেষায়া (তেলেগু ভাষায়) পুস্তক পুরস্কার ৫। কমলকুমার সেন (বাঙ্গালা ভাষায়) পুস্তক পুরস্কার ৬। পরিমল রায় (খাসী ভাষায়) পুস্তক পুরস্কার।

উপস্থিত বালক বালিকা সকলকেই "ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে উপহার" নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল।

সংকীর্ত্তনান্তে সায়ংকালীন উপাসনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশ করিব। উপাসনান্তে কিছু সময় সংকীর্ত্তন হইয়া এই মহোৎসবের কার্য্য শেষ হয়। পরস্পরে আলিঙ্গনাদি করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

আমরা অতি অপূর্ণভাবেই এই মহোৎসবের বিবরণ দিতে সমর্থ হইলাম। করুণাময় পিতা এই উৎসবের ফল সকল জীবনে স্থায়ী করুন। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের মধ্যে জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে প্রবীণ ব্রাহ্ম ত্রৈলোক্যনাথ দেব ৯ মাস শয্যাশায়ী থাকিয়া ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অতি বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সংকলিত ব্রাহ্মসমাজসমূহের ইতিহাস খানা প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রটি পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার পত্নীও দীর্ঘকাল রোগে ভুগিতেছেন। পরিবারটির উপর দিয়া নানা বিপদ্ যাইতেছে। বিগত ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য শাস্ত্রব্যাখ্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব জীবনীপাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে বিবিধ বিভাগে ২৫৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২রা আগষ্ট ঢাকা নগরীতে শ্রীমান ভূপেন্দ্রমোহন মিত্রের মাতা পরলোকগমন করেন। বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে ভূপেন্দ্রমোহন তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌ নগরীতে পরলোকগতা অশ্রুকণা ধরের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার পতি শ্রীযুক্ত শর্ব্বরীকান্ত ধর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ২৫৲, সাধনাশ্রম, ৫৲, দাতব্য বিভাগে ৫৲, দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ফণ্ডে ৫৲, সিটিকলেজে ৫৲, ও শতবার্ষিক উৎসবে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতা এবং ময়মনসিংহে ও তাহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ময়মনসিংহে শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন।

বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে প্রবীণ ব্রাহ্ম রাজকুমার চন্দ রায় ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিত আছেন, ইহা বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে।

বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত স্যার কে জি গুপ্তের কন্যা (শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেনের পত্নী) সরযূবালা সেন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব—ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসবের কলিকাতার কার্য্য শেষ হইলে পর গত ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে উৎসবে যোগদান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত একদল ব্রাহ্ম কলিকাতা হইতে যশোহর অভিমুখে যাত্রা করেন। সেই দলে শ্রীযুক্ত ডি আর সিংহ, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গমন করেন। প্রচারযাত্রী

দলের যাত্রা উপলক্ষে ১লা সেপ্টেম্বর সায়ংকালে সাধনাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং একটি প্রাণস্পর্শী উপদেশ প্রদান করিয়া সকলকে উৎসাহিত করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন। অতঃপর প্রচারযাত্রীদল উপস্থিত সকলের শুভাকাঙ্ক্ষা লইয়া, "জয় ব্রহ্ম জয়" অঙ্কিত পতাকা হস্তে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় রেল-যোগে যশোহর অভিমুখে যাত্রা করেন। রাত্রি প্রায় ২টার সময় তাঁহারা শিঙ্গিয়া ষ্টেশনে অবতরণ করেন। রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই নৌকাযোগে তাঁহারা মালিয়াট রওনা হন। তথায় পৌঁছিতে ২রা সেপ্টেম্বর প্রায় ১১টা বাজিয়াছিল। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহে যাত্রীদলের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। বিশ্রাম ও স্নানান্তে শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সমাদ্দারের গৃহে উপাসনা হয়। তাহাতে গ্রামবাসিগণের কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর সেই বাড়ীতে যাত্রীদলকে সযত্নে ভোজন করান হয়। তখন বেলা প্রায় ৩টা। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় নগরসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কয়েকখানি বাড়ী ব্যতীত প্রায় সমুদয় স্থানই জলময়। নৌকার সাহায্যে কতকগুলি বাড়ীতে গিয়া কীর্ত্তন করা হয়। যে সকল বাড়ীতে যাওয়া সম্ভব হয় নাই, সেই সকল বাড়ীর নিকট নৌকা থামাইয়া কীর্ত্তন করা হয়। চারি পাঁচখানা নৌকা ভরিয়া যখন কীর্ত্তনের দল গ্রামের মধ্য দিয়া উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছিলেন, তখন গ্রামখানি ব্রহ্মনামের ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল ও গ্রামবাসিগণের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত "জয় ব্রহ্ম জয়" ধ্বনি শুনিয়া সকলের হৃদয় বিগলিত হইল। কীর্ত্তন করিতে করিতে যাত্রীদল সায়াহ্ন ৭টার সময় স্থানীয় মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে গমন করেন, তথায় গ্রামবাসিগণের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংক্ষেপে প্রার্থনা করিলে পর শ্রীযুক্ত ভি আর সিন্ধে ব্রাহ্মসমাজের বাণী ঘোষণা করিয়া একটী হিন্দী বক্তৃতা করেন। তৎপর সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ বাঙ্গলা ভাষায় সংক্ষেপে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিশ্বাস ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে "বাঙ্গালার শতবর্ষ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৩রা সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে যাত্রীদল "ব্রহ্মনামামৃত পান কর" এই কীর্ত্তন করিতে করিতে নৌকাযোগে মালিয়াট ব্রহ্মমন্দিরে গমন করেন। গ্রামবাসিগণও অনেকে নৌকা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। মন্দিরে পৌঁছিলে তথায় উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ব্রহ্মনামামৃত পান কর" কীর্ত্তনের এই পদটী অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদত্ত হয়। অপরাহ্ণে যাত্রীনিবাসে গ্রামের কতিপয় বালক ও বালিকা মিলিত হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিল। সায়ংকালে বালিকা বিদ্যালয়-গৃহে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "স্বাবলম্বন" সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। বৃষ্টি ও বর্ষার নিমিত্ত অল্প সংখ্যক পুরুষ ও মহিলাই তাহাতে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে উপস্থিত ব্যক্তিদিগের সহিত স্থানীয় উন্নতি সাধন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়। তৎপর আহারান্তে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় যাত্রীদল নৌকাযোগে মসিহাটি গ্রাম অভিমুখে রওনা হন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে তাঁহারা ঘোগের ঘাট নামক স্থানে পৌঁছেন। তথা হইতে পদব্রজে প্রায় এক মাইল পথ জলকাদা ভাঙ্গিয়া গিয়া চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশনের নিকট নৌকার ঘাটে পৌঁছেন। তথা হইতে মসিহাটি হাই স্কুল কমিটীর সভ্য শ্রীযুক্ত ব্রজরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দুই খানি নৌকা লইয়া যাত্রীদলকে অভ্যর্থনা করিয়া উক্ত গ্রামে লইয়া যান। চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশনে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সেখানে সমাগত ব্যক্তিদিগের নিকট যাত্রীদল সংক্ষেপে ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার করেন। অতঃপর বহু ধান্যের ক্ষেত ও কচুরি পানাতে পূর্ণ মাঠের মধ্যদিয়া ছাদহীন নৌকা দুইখানি প্রখর সূর্য্যতাপ মাথায় করিয়া বাহিয়া চলিল। যাত্রীদল পথে রাজাপুর নামক গ্রামে নটবর রায়ের বাড়ীতে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। গৃহস্বামী তাঁহাদিগকে সেই দ্বিপ্রহরের উত্তাপের সময় ডাবের জল পান করাইয়া তৃপ্ত করেন। বিশ্রামান্তে তাঁহারা মসিহাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দূর হইতে মসিহাটী গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইলে যাত্রীদল "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়" কীর্ত্তন করিতে করিতে মসিহাটি হাইস্কুলের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে তিনটা। স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বিশ্বাস অন্যান্য শিক্ষক ও বহু ছাত্রবৃন্দ সঙ্গে লইয়া যাত্রীদলকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের উৎসাহপ্রদীপ্ত মুখগুলি দেখিয়া যাত্রীদল সারা দিনের রৌদ্রের উত্তাপ ও অনশন-জনিত ক্লেশ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ বিশ্রাম ও স্নানান্তে তাঁহারা স্থানীয় হাই স্কুলের ছাত্রাবাসে উপাসনার নিমিত্ত মিলিত হইলেন। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। তৎপর অপরাহ্ণ ৫ টার সময় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায়ের গৃহে মধ্যাহ্নের ভোজন সম্পন্ন হইল। যাত্রীদলের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া মসিহাটি ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে দলে দলে বালক বৃদ্ধ ও যুবক আসিয়া হাইস্কুলের গৃহ ও প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্কুল গৃহে শ্রীযুক্ত ভি আর সিন্ধে ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন। স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বিশ্বাস তাহা বাঙ্গালাতে জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতাতে অন্যূন একসহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতে ৭॥ টার সময় হাই স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দ ও বহুলোক সঙ্গে লইয়া যাত্রীদল উষাকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ যখন "ব্রহ্ম নামসুধারস কর পান" এই কীর্ত্তনটী আরম্ভ করিলেন, তখন উপস্থিত সকলের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। দুই ঘণ্টা কাল গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিবার পর কীর্ত্তনদল হাই স্কুল হলে প্রত্যাগমন করিলেন। সেখানে উপাসনা হইল। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন।

অপরাহ্ণে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে আগত একদল নমঃশূদ্র বৈষ্ণব স্কুল গৃহে কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় স্কুল গৃহের প্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বিশ্বাস স্থানীয় স্কুলের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার আবশ্যকীয় উন্নতি সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তৎপর হাই স্কুলের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। শ্রীযুক্ত ভি আর সিন্ধে প্রার্থনা করিয়া উক্ত গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। তৎপর পুনরায় সভার কাজ আরম্ভ হইল। অন্যূন দেড় হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। হাই স্কুল প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে অবস্থিত বালিকাবিদ্যালয়গৃহখানিও মহিলাদিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভি আর সিন্ধে হিন্দীতে এবং স্থানীয় হাই স্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বিশ্বাস অবনত শ্রেণীর উন্নতিসাধন ও ব্রহ্মসমাজের বাণী সম্বন্ধে বাঙ্গলাতে বক্তৃতা করেন। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বিশ্বাস প্রস্তাব করেন যে মসিহাটীতে ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত আনুমানিক ২০০৲ দুই শত টাকা ব্যয়ে একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করা হউক। এই প্রস্তাব উপস্থিত জনমণ্ডলী সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মজুমদার জ্ঞাপন করেন যে উক্ত উপাসনালয়ের কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত একজন স্থায়ী

আচার্য্যের অভাবে তিনিই উপাসনার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত আছেন। এই সম্পর্কে তিনি ইহাও বলেন যে তিনি যদিও পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রাণে অবিশ্বাস ও সন্দেহ আসিত। গত কল্য সঙ্গীত ও কীর্ত্তনে তাহার প্রাণ গলিয়া গিয়াছে। অতঃপর শ্রীযুক্ত ভি আর সিন্ধে জ্ঞাপন করেন যে তিনি উক্ত উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্য কল্পে ১০০৲ এক শত টাকা প্রদান করিবেন। ইহাতে সকলে অতিশয় আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছেন। "জয় ব্রহ্ম জয়" ও "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম" ধ্বনি করিতে করিতে সভার কার্য্য শেষ হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিশ্বাস ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে "বাঙ্গালার শতবর্ষ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে স্থানীয় হাই স্কুল গৃহে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরি" এই শ্লোকটী অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদত্ত হয়। উপাসনার পর আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও সমাগত লোকদিগের সহিত কথোপকথনের পর যাত্রীদল "গাও রে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়" কীর্ত্তনটী গাহিতে গাহিতে নৌকাযোগে চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশন হইয়া খুলনা অভিমুখে যাত্রা করেন। স্বতন্ত্র একখানি নৌকা করিয়া হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র বৃন্দ এবং অন্যান্য বহুলোক যাত্রীদলের অনুসরণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া "গাও রে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়" গাহিতে গাহিতে অনেক দূর আসিয়াছিলেন। অবশেষে অতিশয় দুঃখের সহিত উভয় দল পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় এইস্থানে উৎসবটী অতি সুন্দর ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

মসিহাটি হইতে ৮ মাইল আসিবার পর সন্ধ্যা হইল। নৌকাদ্বয় রাজাপুর নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে বৃষ্টি আসিল। নৌকায় চালা না থাকাতে সকলকে খুব ভিজিতে হইল। ভিজিতে ভিজিতে সকলে নটবর রায় নামক এক নমঃশূদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। বৃষ্টি ছাড়িলে পর যখন সকলে আবার নৌকায় উঠিতে গেলেন, তখন বাড়ীর লোকেরা আসিয়া বলিলেন তাঁহারা যাত্রীদলকে আহার না করিয়া যাইতে দিবেন না। তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া যাত্রীদল সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আহারান্তে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় পুনরায় নৌকায় উঠিলেন। রাত্রি প্রায় ১টার সময় চেঙ্গুটিয়া খালের ধারে আসিয়া নৌকা লাগিল। সেখান হইতে তাঁহারা প্রায় এক মাইল পথ অতিকষ্টে জল কাদার মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। কর্দ্দমাক্ত পথে মোটবাহী একজন নৌকার মাঝি মোট লইয়া পড়িয়া যায়। তাহাতে কাহারও কাহারও বিছানাদি কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল। রাত্রি দেড়টার সময় যাত্রীদল চেঙ্গুটিয়া রেল ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন। ট্রেন ধরিতে না পারায় সারা রাত্রি ও পরদিবস বেলা ৯টা পর্য্যন্ত চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে হইল। ৭ই সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় ১১টার সময় রেলযোগে যাত্রীদল খুলনা সহরে পৌঁছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তীকে লইয়া, ৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় খুলনায় আসিয়া পৌছেন। বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে আসিয়া তথায় পৌঁছেন। ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের গৃহে উপাসনা করেন। তৎপর সহরের অনেক ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনিই রাত্রিতে উপাসনা করেন। সহরের অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুই দিনই উপাসনার পর, সমাজের কার্য্যে যোগদিবার জন্য অনেককে অনুরোধ করা হয়। তাঁহারাও তাহাতে আগ্রহের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করেন। শেষোক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় স্থানীয় Coronation Hall এ একটি সভা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত ভি আর সিন্ধে, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের বাণী ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সঙ্গীতান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। প্রচারযাত্রীদল সেই রাত্রিতেই আহারান্তে নৌকাযোগে খুলনা জেলার অন্তর্গত মাদারতলি গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী পরদিবস স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া সে রাত্রি খুলনাতেই রহিলেন। খুলনাতে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায় ও শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার, এম্. এল, সি, সযত্নে যাত্রীদলকে আহারাদি করাইয়া ছেন।

দীক্ষা—গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৩৭ নম্বর ফিয়ার লেনে লক্ষ্ণৌ নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সেনের পুত্র শ্রীমান অক্ষয়কুমার সেন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে দীক্ষার্থী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ২৲ দুই টাকা দান করিয়াছেন। করুণাময় পিতা নবদীক্ষিতকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

দান—স্থায়ী মিশনফণ্ডের জন্য শ্রীযুক্ত শশাঙ্কনারায়ণ দাসগুপ্ত একখানি ১০০৲ টাকা মূল্যের (শতকরা ৪৲ সুদের) কোম্পানীর কাগজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের হস্তে দিয়াছেন।

পরলোকগত মিঃ আনন্দমোহন বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুত্রগণ এ এম্ বসু ফণ্ডে ১০০৲ টাকার এক খানি কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমতী সুনীতিবালা ঘোষ পতি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন। এ সমস্ত দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মাসকল শান্তিলাভ করুন।

আনন্দমোহন স্মৃতি—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর পরলোকগমনদিনে সিটি কলিজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে ময়মনসিংহ টাউনহলে এক সভার অধিবেশন হয়। উহাতে স্থানীয় অতিরিক্ত জজ শ্রীযুক্ত কুমুদ নাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার আরম্ভে ও শেষে সিটিস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দের রচিত দুইটি গান গীত হয়। একটি স্তোত্র, একটি কবিতা, ও দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম এ, বি এল, নববিধান ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি মহাশয় আনন্দমোহনের অনুকরণীয় জীবন, উন্নত চরিত্র, গভীর ধর্ম্মভাব ও অকৃত্রিম দেশহিতৈষিণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

উক্তদিবস কলিকাতা নগরীতে এলবার্টহলে এক প্রকাণ্ড সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির কার্য্য এবং অনেকে বক্তৃতা করেন।

---

২১১ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩রা আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ১২শ সংখ্যা।
১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯
2nd October, 1928.
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে বিশ্ববিধাতা, তুমি আমাদিগকে তোমার বিশ্বপরিবারের অঙ্গ করিয়াই এখানে পাঠাইয়াছ। আমরা যত ক্ষুদ্রই হই না কেন, আমাদের প্রত্যেককেই কিছু কার্য্য করিবার ভার ও শক্তি দিয়াছ। তুমি সকল শক্তির প্রস্রবণ হইয়া নিয়ত শক্তি যোগাইতেছ এবং আমাদিগকে তোমার কার্য্যসাধনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছ। কিন্তু অনেক সময় আমরা কার্য্যের মোহে পড়িয়া শক্তিসঞ্চয় করিবার পূর্ব্বেই একটা কিছু করিবার জন্য ছুটিয়া যাই। তুমি যে আমাদের দ্বারা কি কার্য্য করাইতে চাও তাহার দিকে দৃষ্টি রাখি না, আপনার ভাবেই চলিতে ব্যস্ত হই। তাই আমাদের দ্বারা তোমার কার্য্য যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না, আমরাও প্রকৃত শক্তি ও কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হই না। এই ভাবে আমরা আর কত কাল জীবনকে ব্যর্থ করিব, তোমার কার্য্যকেও পণ্ড করিব জানি না। হে শুভবুদ্ধিদাতা পিতা, তুমি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেও। আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন হইয়া তোমার নির্দ্দেশে জীবনপথে চলি। তোমার বলে বলীয়ান্ হইয়া তোমার কার্য্য সাধন করি। আমরা যেন বাহির লইয়া মত্ত হইয়া অসারতার স্রোতে ভাসিয়া না যাই। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে গভীর ভাবে তোমাতে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার শক্তিতেই যেন জীবন সত্যেতে প্রসার লাভ করে। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই সকল বিষয়ে পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

"নীলকণ্ঠ" হই—কথিত আছে দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনে অমৃত ও গরল উৎপন্ন হয়েছিল—অমৃতের জন্য দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে ঝগড়া লাগ্‌ল। অমৃত কত মিষ্ট, অমৃতে কত আনন্দ, অমৃতে অমরত্ব লাভ! বিষ ত কেহ নিতে চায় না। বিষে যে এদিকে জগৎ ধ্বংস হয়! তাই ভোলানাথ শিব নিজে বিষ পান ক'রে জগৎ রক্ষা কর্‌লেন,—বিষ তাঁর গলদেশে লেগে রইল; তিনি নীলকণ্ঠ হ'লেন। আজ আমারও ইচ্ছা হয় নীলকণ্ঠ হই, আমারও ইচ্ছা হয় পৃথিবীতে যে অপ্রেম বিদ্বেষ পাপ সন্দেহে গরল উৎপন্ন হচ্ছে, তাহা আমি পান ক'রে পৃথিবীকে শান্ত করি। তোমরা সকলে অমৃত পান কর; তোমরা অমৃত পান ক'রে সুখী হও, আনন্দ সম্ভোগ কর, আমাকে তোমাদের বোঝা বইতে দাও, গরল পান কর্‌তে দাও। অপ্রেম বিদ্বেষ সন্দেহ পাপে মানব ধ্বংসের পথে যাচ্ছে, দেশের অকল্যাণ হচ্ছে, সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আস্‌ছে, পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। তোমরা এ হলাহল পান করো না, তোমরা অমৃত ভাল ক'রে খাও; প্রেমের আনন্দ, স্নেহ মমতার সুখ তোমরা ভোগ কর। যে গরল উঠ্‌ছে, তাহা আমি পান করি; আমি দুঃখ পাই, তোমাদেরে সুখী দেখে আমি আনন্দ লাভ করি। কি বিষ! কি গরল! ভাই ভাইএর প্রাণ বিদ্ধ কর্‌তে চায়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভেদ; দেশসেবকে দেশসেবকে দ্বন্দ্ব; ধর্ম্মের নামে অপ্রেম, বিদ্বেষ, দুর্নীতি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা! পৃথিবী যে নরক হলো! আমি আর দেখ্‌তে পারি না; সব দুঃখ আমাকে দাও, সব গরল আমি পান করি। কণ্টকাকীর্ণ পথ, তোমাদের পায়ে কাঁটা বিঁধ্‌বে, আমি প'ড়ে থাকি, আমার উপর দিয়ে তোমরা

সুখে চ'লে যাও। তোমাদের সংগ্রাম, তোমাদের বিপদ—বিপদে ধৈর্য্য নাই—পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, প্রাণে শান্তি নাই, পরিবারে সুখ নাই! আমি আছি, আমার মাথায় দুঃখের বোঝা দাও; আমাকে গরল পান করতে দাও, তোমাদের মধ্যে শান্তি আসুক, নির্ভর আসুক, অপ্রেম সন্দেহ চ'লে যাক্। শিব নীলকণ্ঠ হ'য়েছিলেন; বিষে তাঁকে কিছু করতে পারে নাই। আমি দুর্ব্বল, বিষে জর্জ্জরিত হব, দেহ মন ভেঙ্গে পড়বে, চোখে আঁধার দেখ্‌ব, তবুও তোমাদের কল্যাণ চাই; আমি বিষ খেয়ে তোমাদের বাঁচাব; মরণের মধ্যে অনন্ত জীবন পাব।

ঐ যে আমার সাধনের সহায়—তোমরা যাকে বিপদ বল, যাকে বোঝা বল, তোমরা যাকে উপেক্ষা বল, সে যে আমার কল্যাণ, সে যে আমার সাধনের সহায়! আমি জীবনের উষাকালে প্রভুর নাম নিয়ে বাহির হয়েছি; কত আশা, কত আনন্দ! ভাবলাম এইরূপ হেসে খেলেই তাঁর নাম গেয়ে চ'লে যাব। কিন্তু চলতে চলতে বিপদ এল; চলতে চলতে কত ঝঞ্ঝা এল; বইতে পারি না, এমন বোঝা এসে ঘাড়ে চাপল! যে বন্ধু ছিল, আপনার জন ছিল, একান্ত স্নেহ-ভাজন ছিল, যার কাছে প্রাণের ব্যথা ব'লে শান্তিলাভ করতাম, সে-ও বিগড়িয়ে গেল, পর হ'য়ে গেল, উপেক্ষা করল, স্নেহের মর্ম্ম বুঝল না! ভাবলাম, এ কি হলো? ভগবান্, এমন কেন হলো? এ কি অকল্যাণের সূচনা হলো! ভগবান্, এ কি হলো? ভগবান্ ক্রন্দন শুনলেন; তাঁর দয়া অনুভব করলাম; তিনি প্রাণে আশা দিলেন। দেখতে পেলাম, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, এ বিপদ উপেক্ষা আমার সাধনপথ। এই যে বোঝা, ইহা বোঝা নয়, এ তাঁর প্রেমের চাপ। এ বোঝার মধ্যেই তাঁর আলিঙ্গনের অনুভূতি। ঐ যে উপেক্ষা, ঐ যে প্রিয়জনের দেওয়া বেদনা, এর ভিতরেই তাঁর স্নেহের টান। সকলের সাধন এক প্রণালীতে হয় না; সকলকে তিনি এক ভাবে আকর্ষণ করেন না। আমাকে দুঃখ দিয়ে, বেদনা দিয়ে, বিপদে ফেলে, বোঝা দিয়ে, তিনি ক্রোড়ে টেনে নিচ্ছেন। আমাকে বিপদ বরণ করতে হবে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে, আগুনে পড়তে হবে, বোঝার পর বোঝা বইতে হবে, এক বোঝা নামলে আর এক বোঝা মাথায় বইতে হবে। বইতে পারি না, তবুও তাঁর দেওয়া বোঝা মাথায় পেতে নিতে হবে। যে উপেক্ষা করে, তাড়িয়ে দেয়, স্নেহ করতে যেয়ে যার কাছে ঠেলা খাই, তাকেও স্নেহ দিতে হবে, আলিঙ্গন দিতে হবে। ইহাই আমার সাধনব্যবস্থা, প্রভুর বিধান।

মগ্ন ও লগ্ন—মধুকর ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়; মধু সংগ্রহ করে; এক একটা ফুলের মধু পেয়ে এমন বিভোর হয় যে সে একেবারে ডুবে যায়, মগ্ন হ'য়ে যায়—তাকে তাড়া কর, সে নড়বে না; তাকে টান, সে উঠবে না; তার ডানা ছিঁড়ে যাবে, তবুও উঠবে না। অনেকে, আবার ফুলে বসবার অবকাশ পায় নাই—তারা গুণ্ গুণ্ ক'রে ফুলের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। এক এক বার বসে, একটু মধু খায়, আবার উঠে; কিন্তু স্থান ছেড়ে যায় না, বার বার স্পর্শ করে; ডুবতে না পারে, অন্ততঃ লেগে থাকতে চায়। তোমরা কি প্রেমের আস্বাদ পেয়েছ? তোমরা কি নামের মধু পান করেছ? তবে মগ্ন হ'য়ে থাক, নামরসে ডুবে থাক; যদি ডুবতে না পার, তবুও লগ্ন হ'য়ে থাক, ফুলের কাছে কাছে থাক, একটু ছুঁয়ে থাক, দূরে যেও না। নামে ডুবতে পার নাই, সে সৌভাগ্য হয় নাই! তবে নাম গান করতে থাক, প্রিয়তমের নিকটে ঘেসে বস; সাধুজীবনের সঙ্গে বস; নির্জ্জনে ও সজনে তাঁর নাম কর। ঐ নাম গাইতে গাইতে রসের আস্বাদ পাবে। তখন আর উঠতে ইচ্ছা হবে না; একেবারে ডুবে যাবে। যদি সব সময় তাঁর নামে ডুবে থাকতে না পার, তবে যখনই সময় পাও, তখনই নাম গান কর। চলতে ফিরতে নাম গান কর; যেদিকে তাকাও তাঁর রূপ দেখতে চেষ্টা কর; যা শোন, তার মধ্যে তাঁর সুর বাজে, তাই শুনতে কাণ পেতে থাক; সকল রসে গন্ধে স্পর্শে তাঁর মাধুর্য্য সম্ভোগ কর; মগ্ন হও। তা যদি না হয়, তবে অন্ততঃ লেগে থাক, প'ড়ে থাক তাঁর চরণে।

সম্পাদকীয়।

নূতন শতাব্দীর সর্ব্ব প্রধান কার্য্য—আমরা নূতন শতাব্দীতে অনেকটা নূতন উৎসাহের সহিত যে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি ইহার পরিচয় আমরা চারিদিকেই দেখিতে পাইতেছি। বিগত ১লা সেপ্টেম্বর এক প্রচারযাত্রী দল যে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারের জন্য বাহির হইয়াছেন, তাহার বিবরণ বিগত সংখ্যায় কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে ২৮শে আগষ্ট তারিখে ভারতের বাহিরে জাপান পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য ডাক্তার খাণ্ডওয়ালা ও শ্রীযুক্ত জি ওয়াই চিংনীশ বহির্গত হন। তাঁহারা ব্রহ্মদেশে পৌঁছিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কিছু দিন হইল শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায় প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত বাহাদুর প্রভৃতি বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে প্রচার করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছেন। অক্টোবর মাসে বিলাতের প্রতিনিধিগণ আসিলে তাঁহাদিগকে লইয়া আর একদল প্রচারার্থ বাহির হইবেন, এইরূপ স্থির আছে। প্রচারচেষ্টা যে আমাদের একটা বড় কাজ, এই প্রকার প্রসারতাবৃদ্ধির যে একটা প্রয়োজন আছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তথাপি আমরা ইহাকে নূতন শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। প্রচারকার্য্য পূর্ব্বে যেরূপ মৃতভাবে চলিতেছিল তাহার পরিবর্ত্তে যদি একটা সাময়িক সজীবতাও আসে, তবে তাহাও কখনও উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু আমরা যদি তাহাতেই তৃপ্ত থাকি এবং তাহাকে নূতন শতাব্দীর প্রধান কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করি, তবে আমরা নিশ্চয়ই মহা ভ্রমে পতিত হইব। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে এখনও অতি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে, উহার প্রচারক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করিবার যে যথেষ্ট

প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। তথাপি কিছুতেই এরূপ প্রসারবৃদ্ধিকেই প্রধান কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যে স্রোতহীন নদী পলি পড়িয়া অগভীর হইয়া গিয়াছে তাহাতে যখন পার্ব্বত্যদেশ হইতে বন্যা আসে, তখন অতি সহজেই সে জলরাশি দুই কূল ছাপাইয়া সাময়িক ভাবে উহার প্রসারকে বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দেয়; কিন্তু বন্যাবসানে অল্পকাল মধ্যেই উহা আবার সেই ক্ষুদ্রপরিসর অগভীর মৃত নদীতেই পরিণত হয়। অপর দিকে নিয়ত প্রবাহমানা গভীরতোয়া স্রোতস্বতী একদিকে যেমন আপনার তলদেশকে খনন করিয়া নিজের গভীরতাবর্দ্ধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে, তেমনি আবার দুকূল ভাঙ্গিয়া প্রসারতাসাধন করিতেও ক্ষান্ত হয় না। বাস্তবিক যেখানে গভীরতা আছে সেখানে প্রসারতা আপনা হইতেই আসিবে। এই উভয়ের কারণ যে স্রোত, এবং সেই স্রোতের কারণ যে নিত্য উৎসের সঙ্গে যোগ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। নিত্য উৎসের সঙ্গে যে নদীর যোগ নাই তাহা যে অচিরেই স্রোতবিহীন হইয়া অগভীর ও অল্পপরিসর শুষ্ক ও মৃতপ্রায় হইয়া যাইবে, এ কথা ত সুনিশ্চিত। ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এবং প্রধান কর্ম্মীদের কার্য্য ও জীবন ও এই তত্ত্বই প্রমাণ করিতেছে। এই সময় আমরা যাঁহাদের চরিতালোচনা করি, যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকি, স্বভাবতঃই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের কথাই এই প্রসঙ্গে মনে উদয় হইতেছে। কর্ম্মের প্রসারতার দিক দিয়া বিচার করিলে রাজর্ষি রামমোহনের সমতুল্য আর দ্বিতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। এদেশের জীবনের এমন কোন্ দিক্ আছে যাহার উন্নতিসাধনে তিনি আপনার শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ না করিয়াছেন, যাহার মধ্যে তাঁহার প্রভাব বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয় না? ধর্ম্মেতে নীতিতে শিক্ষাতে, সামাজিক রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক অবস্থাতে, সকল বিষয়ে, ধনী নির্ধন, জমিদার প্রজা, স্ত্রী পুরুষ সকল শ্রেণীর লোকের—তাহা আবার শুধু আপনার সম্প্রদায় ও দেশের নয়, সকল সম্প্রদায়ের, সকল দেশের লোকেরই—সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ ও উন্নতিসাধনে তাঁহার তুল্য আর কে আপনার শক্তি সামর্থ্য অর্থ বিত্ত যাহা কিছু সমস্ত নিঃশেষে ব্যয় করিয়াছে, আপনাকে সকলের সেবাতে ক্ষয় করিয়াছে? সাময়িক শত প্রকার নিন্দা গ্লানি বিরোধিতা সত্ত্বেও কাহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা গভীর ও স্থায়ী হইয়াছে, এবং দিন দিন বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে? কে দিন দিন অধিকতর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইতেছেন? আর কাহার সম্বন্ধে লোকের হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, তিনি শত বৎসরের নয়, সহস্র বৎসরেরই লোক, সুদূর ভবিষ্যতের অগ্রদূত, ভাবী বিকাশের মূর্ত্তিমান প্রতিনিধি? কিন্তু এই সকলের মূল অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যদি আমরা তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা অপেক্ষা গভীরতর কিছু দেখিতে না পাই, তবে আমরা মহা ভ্রমেই পতিত হইব। একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে, তাঁহার জীবনের ও সকল প্রকার কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূল প্রস্রবণ অনন্তস্বরূপ জীবনদেবতার সঙ্গে গভীর ও নিত্য যোগ। তাহাই এই সকলের একমাত্র কারণ। তিনি যে শুধু নিয়মিত উপাসনাসময়ে বা ভজনালয়ে নয়, আহারে বিহারে স্নানে, পথে ঘাটে, সজনে নির্জ্জনে, আপনাকে জীবন-দেবতাতে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার, জীবনের নিত্য উৎসের সঙ্গে আপনাকে গভীর ভাবে যুক্ত রাখিবার জন্য সতত যত্নশীল ছিলেন এবং সে বিষয়ে বহু পরিমাণে সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই সমস্ত সম্ভবপর হইয়াছে। যদিও সকল প্রকার দুঃখ দৈন্যই তাঁহার হৃদয়কে পীড়া প্রদান করিয়াছে, তথাপি কিসের জন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন, কোন্ অভাব তাঁহার হৃদয়ে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি করিলেই এই কথা আরও স্পষ্টতর হইবে। তাঁহার প্রিয়দেশ যে সত্যস্বরূপের সাক্ষাৎ পূজা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এই দুঃখই তাঁহাকে, কি স্বদেশে কি বিদেশে, সর্ব্বত্র সর্ব্বাপেক্ষা গভীর ভাবে ব্যথিত করিয়াছে, হৃদয়ভেদী অশ্রুবারি প্রবাহিত করিয়াছে। ইহাই যে তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনেও তাহাই দেখিতে পাই। তিনিও আকুল প্রার্থনা ও কঠোর সাধনাদ্বারা জীবনের যে গভীরতা সাধন করিয়াছিলেন, জীবনদেবতার সঙ্গে যোগসাধন দ্বারা আপনাকে যে সুদৃঢ় সত্য ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার বলেই সম্পূর্ণ আত্ম-বিলোপসাধন দ্বারা এত প্রকার কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত রাখিতে ও চারিদিকে মহাকল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। তিনি কোন্ স্থানে অবস্থিত করিয়া দেশের ও সমাজের অপর সকলের অপরাধের জন্য আপনাকে অপরাধী মনে করিতেন, আপনার জীবন ও প্রভাবদ্বারা অপরকে আশানুরূপ তুলিয়া ধরিতে সমর্থ না হওয়াতে প্রাণে তীব্র বেদনা অনুভব করিতেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই বুঝিতে পারিব, সে জীবনের গভীরতা কত এবং প্রভাববিস্তারক্ষমতার উৎস কোথায়। বিগত দুই মাসের মধ্যে আমরা যাঁহাদিগকে তাঁহাদের পরলোকগমন-দিন উপলক্ষে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ না করিয়া পারি নাই—দেশের সুসন্তান মধুরস্বভাব আনন্দমোহন বসু, ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু, নীরবকর্ম্মী বিশ্বাসী রামতনু লাহিড়ী, সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত, ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত, তেজস্বী প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনও সেই একই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইঁহাদের সকলের জীবনই নানা কার্য্যে যে বহু সম্প্রসারণ লাভ করিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল তাঁহাদের জীবনের গভীরতা, জীবনের নিত্য উৎসের সঙ্গে জীবন্ত যোগ। ইঁহাদের ন্যায় সফল প্রচার আর কয়জনে করিয়াছে? স্থায়ী প্রভাব কয়জনে রাখিয়া গিয়াছেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অপর বহু বিখ্যাত কর্ম্মী ও সেবকদের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিবার আর কোনও প্রয়োজন নাই। অপর দিকে যাহারা সুদক্ষ অভিনেতার ন্যায় রঙ্গমঞ্চে সাময়িক উচ্চ করতালি ও বাহবা সংগ্রহ করিয়া চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, স্থায়ী শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারে নাই, কোনও কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই, তাহাদের দৃষ্টান্তও এ সংসারে বিরল নহে। ব্রাহ্মসমাজেও

যে সেরূপ লোক দেখা যায় নাই, এমন নহে। তাহাদের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, প্রচার বা সম্প্রসারণকে অথবা বিবিধ প্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠানকে আমরা কোনও প্রকারেই নূতন শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এই সকলেরই যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগকে প্রধান স্থান দিলে চলিবে না—একটু পশ্চাতেই রাখিতে হইবে—উহারা আনুসঙ্গিক রূপে আপনা হইতেই আসিবে। প্রধান স্থান দিতে হইবে জীবনের গভীরতাসম্পাদনের উপর, জীবনকে জীবন ও শক্তির নিত্য উৎসের সঙ্গে জীবন্ত সুদৃঢ় যোগে যুক্ত রাখাতে, সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করাতে। ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত বাহিরের অন্য সকল চেষ্টা যে অনিবার্য্যরূপেই ব্যর্থ হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জগত অমোঘ নিয়মশৃঙ্খলে সুনিয়ন্ত্রিত, তাহার ব্যতিক্রম কদাপি হয় না—এখানে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও স্থায়ী ভাবে জয় লাভ করিতে পারে না, আর সত্যের জয়ও কেহ রোধ করিতে পারে না। শক্তি থাকিলে তাহার প্রভাব বিস্তার হইবেই হইবে। আর প্রকৃত শক্তি না থাকিলে, আস্ফালন করিয়া, হৈ চৈ করিয়া যতই বাহবা অর্জ্জন করি না কেন, অল্পকালের মধ্যেই সকল অসারতা বাহির হইয়া পড়িবে, ব্যর্থতায় ডুবিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের জীবনকে গভীররূপে সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, জীবন ও শক্তির নিত্য উৎসের সঙ্গে সুদৃঢ় যোগে যুক্ত হইতে হইবে। তাহা হইলে অপর সকলের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না, সমস্তই অবশ্যম্ভাবীরূপে আপনা হইতে আসিবে। এই প্রধান কার্য্যের প্রতি যে আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তাহার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। এ বিষয়ে নূতন শতাব্দীর প্রারম্ভে কোনও নূতন আয়োজন উদ্যোগ চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে না। পূর্ব্বে যেরূপ চলিতেছিল সেরূপই চলিতেছে। দুই এক জনের প্রাণে এ বৎসর নূতন আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প জাগিতে পারে, দুইএক জন ব্যক্তিগত ভাবে সেরূপ কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু সাধারণভাবে সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার কোনই পরিচয় যে পাওয়া যায় না, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের সকলকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি প্রদান করিতে হইবে। তাহা না করিলে সকলই ব্যর্থ হইবে, পণ্ড হইয়া যাইবে, আমরা কোনও কার্য্যই সাধন করিতে সমর্থ হইব না। মঙ্গলময় আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন, আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দিউন, আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সঙ্গে সত্য ভাবে যুক্ত হইবার জন্য সমগ্র মন প্রাণের সহিত যত্নশীল হই এবং তাঁহার অনুগত হইয়া জীবনের সকল কার্য্য সাধন করি। তিনিই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

হত্যা দেওয়া।

বাইবল্ গ্রন্থে দেখা যায় যে, যিশুখৃষ্টের শত্রুগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তার পর তাঁহার শিষ্যগণের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতে লাগিলেন। যিশুর শিষ্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেন এবং নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন কোথাও যিশুর নামগন্ধ রহিল না। তাহার পর য়িহুদিদিগের মহাপর্ব্ব Pentecost সমাগত হইল। দলে দলে য়িহুদিগণ জেরুজালেমে আসিতে লাগিলেন। সেই উৎসবে নানা স্থান হইতে যিশুর শিষ্যগণও আগমন করিলেন। তাঁহারা জেরুজালেমে আসিয়া পিটার প্রভৃতি যে গৃহে বাস করিতেন সেই গৃহে সকলে জুটিলেন। তখন তাঁহাদের সংখ্যা ১২০ জন মাত্র। অন্য লোকেরা উৎসবের ধুমধামে ব্যস্ত। এই কয়জনের সেদিকে দৃষ্টি নাই। তাঁহাদের মেলা দেখা থাকিল, কেনা বেচা সব বন্ধ রহিল, বাহিরের সব কাজ গেল, তাঁহারা দরজা বন্ধ করিয়া দিনরাত্রি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"ভগবান, বাঁচাও; প্রভু, তুমি রক্ষা কর; তুমি তোমার সত্য ধর্ম্মকে রাখ।" ক্রমাগত রাতদিন এই প্রার্থনা চলিতে লাগিল। সকলে উৎসবে মত্ত, উৎসবে ব্যস্ত, ইহাদের সেদিকে মন নাই, কেবল প্রার্থনায় মগ্ন। সেই প্রার্থনা করিতে করিতে তাহাদের হৃদয়ে কি এক ভাব আবির্ভূত হইল, কি এক শক্তি অবতীর্ণ হইল! তখন তাহারা দরজা খুলিয়া ঘরের বাহির হইল এবং যে সত্য পাইয়াছিল তাহা প্রচার করিতে লাগিল। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। যাহারা কথা বলিতে জানিত না তাহারা অগ্নিময় ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিল। সকল দলের ভাষাতে তাহারা প্রচার করিতে লাগিল। দেখা গেল, যে-দলে যে-লোক আছে তারই মুখ ফুটিয়াছে। ছিল ১২০ জন, একদিন দেখা গেল হয়েছে ৩০০০ জন। দলে দলে লোক যিশুর শিষ্য হ'য়ে অভাবের লাথি কিল সহ্য করিতে লাগিল। আবার একদিন দেখা গেল, তাহাদের সংখ্যা ৫০০০ হ'য়েছে। চারিদিকে একটা ভয়ানক আন্দোলন চলিতে লাগিল। দলে দলে লোক আসিয়া সেই দলে যোগ দিতে লাগিল। তাই সেই ঘটনার নাম হইয়াছে Pentecostal shower.

এই যেমন একটা ঘটনার উল্লেখ করিলাম, তেমনি আরও একটা ঘটনার কথা বলা যায়। শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাকুল আত্মা শ্রীবাসের ঘরে গোপনে ক্রমাগত হরিনাম করিতে লাগিলেন। হরি নাম করিতে করিতে শেষে ভাব এলো। তখন তাঁহারা রাস্তায় বাহির হইয়া নগরকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। চারিদিকে ঢলাঢলি গলাগলি পড়িয়া গেল; নরনারী সেই ভাব দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল; সেই ক্রন্দন ও হৃদয়-পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এ দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার হইল।

এইরূপ আরও ঘটনা জগতে ঘটিয়াছে। এইরূপ ঘটনা হইতে কি উপদেশ পাওয়া যায়? যদি সমাজে ও দেশমধ্যে নবভাব আনতে চান, তবে তার রাস্তা কোথায়? আলোচনার দরকার

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১০, সাধনাশ্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রদত্ত উপদেশ।

আছে, কিন্তু আলোচনও তত ঠিক রাস্তা নয়। বক্তৃতাও তত নয়—ও পথই নয়। তবে রাস্তা কোথায়? দাও ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দাও, পড় ঈশ্বরচরণে একমনে, এবং প্রার্থনা কর, প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা কর, "তুমি শক্তি দাও।" এই প্রার্থনা সকলে প্রাণ দিয়েঃধর, তবে বল আস্‌বে।

এ দেশে হত্যা দেওয়া একটা ব্যাপার আছে। কেও রোগে ভুগ্‌ছে। এ কবিরাজ সে কবিরাজ দেখ্‌লেন, কত ঔষধ দিলেন, কিছুতেই রোগ দূর হইল না। কত লোকে কত রকম টোট্‌কার কথা বলিল; সে সব ব্যবহার করা হইল, কিছুতেই কিছু হইল না। যখন সব উপায়, সব ঔষধ বৃথা হইল; তখন সে তারকেশ্বরে গিয়ে হত্যা দিল। কবিরাজের চিকিৎসায়, টোট্‌কায়, কিছুতেই কিছু হবে না যখন বুঝিল, তখন হত্যা দিয়ে পড়ে থেকে রোগের ঔষধ পেয়েছে, একথা অনেকবার শুনা গিয়েছে।

নিজের শক্তিতে যখন কুলায় না, তখন হত্যা দেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। ঐ ১২০ জন শিখুর শিষ্য যেমন দরজা বন্ধ ক'রে পড়েছিল, শ্রীবাসের ঘরে চৈতন্য প্রভৃতি যেমন ব'সে-ছিলেন, তেমনি যদি ব্রাহ্মেরা ১০ জনে ব্যাকুল প্রাণে হত্যা দিয়ে পড়েছেন দেখা যায়, তবে ব্রাহ্মদের মধ্যে নবশক্তির আবির্ভাব হবে। আলোচনা, বক্তৃতা তত উপায় নয়। বেশী কথার এ সময় নয়। যারা ব্যাকুল প্রার্থনার সন্ধান পেয়েছে তারা শক্তি-লাভের মহা সন্ধান পেয়েছে। আমরা এটা কেন ভাল করিয়া ধরি না!

রুদ্রের আহ্বান ও আশীর্ব্বাদ।

বন্ধুগণ, জরার ক্লান্তিতে আজ আমি অভিভূত, একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এই স্মরণ-উৎসবে সম্পূর্ণভাবে যোগদিতে পারিনি, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আজ আমাদের উপাসনার একটি বিশেষ দিন। উপাসনার বিশেষ উপলক্ষ্য আমাদের কাছে সময় সময় উপস্থিত হয়। প্রকৃতির মধ্যেও দেখি ঋতু ঋতুতে নূতন নূতন উৎসব। প্রত্যেক ঋতু তার নিজের অর্ঘ্য নিবেদন বহন ক'রে আসে। শরৎ যখন তার শিশিরধৌত নির্ম্মল সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য নিয়ে দেখা দেয়, তখন সে আমাদের আত্মাকে আহ্বান করে, তখন আমাদের একটি বিশেষ বন্দনার দিন উপস্থিত হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমরা শুনতে পাই বহু-বিচিত্রকে নিয়ে একটি অখণ্ড সুষমার বাণী। জলে স্থলে আকাশে রূপসম্মিলনের মধ্যে সেই অপরূপ একের সঙ্গীত কেবল আমাদের আত্মার কাছেই পৌঁছায়; সে এমন একটি লিপি, যার ঠিকানা একমাত্র এই খানেই।

সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। তাকে আমরা কোনো রকম ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝাতে পারি না। আমাদের অন্তরতম উপলব্ধির দ্বারা তাকে আমরা শুধু স্বীকার ক'রতে পারি। সংসারের সমস্ত কিছু প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে এই সৌন্দর্য্য বিরাজমান। সৃষ্টি রক্ষা বা পালনের কোনো তাগিদ দিয়ে তার হিসাব পাওয়া যায় না। সকল প্রয়োজনের অতীত যে ঐশ্বর্য্য, বিশ্বজগতে আনন্দরূপের আবির্ভাবকে সে প্রকাশ করে। তাই সংসারযাত্রার প্রতিদিনের সমস্ত অব্যবহিত দাবি চুকিয়ে দিয়েও যে অসীম উদ্বৃত্ত সৌন্দর্য্য দেখা দেয় তার মধ্যেই আমাদের আত্মা বিশ্বের নিত্যোৎসবের মূল সুরটিকে উপলব্ধি ক'রতে পারে।

জীবনযাত্রার ছোট খাটো খুঁটী নাটির মধ্যে আমরা এই মূল সুরটিকে ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ক'রে দেখি ব'লে তাকে তার বৃহৎ কার্য্যের মধ্যে উপলব্ধি ক'রতে পারি না। যদি আদ্যন্ত দেখ্‌তে পেতেম, যে-দেখা নানা বাধায়, নানা বিরুদ্ধতার দ্বারা খণ্ডিত নয় এমন একটি স্বচ্ছ সমগ্র দেখা দিয়ে যদি অনুভব ক'রতে পারতেম, তবে আমাদের মন অহৈতুক আনন্দে অভিভূত হ'য়ে পড়তো। জান্‌তে পারতেম যে-পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য আমরা শরৎকালের একটি শেফালির মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি তার ছন্দ লোকে লোকে, আকাশে আকাশে পরিব্যাপ্ত। প্রতিদিনকার কাজ চালাবার দেখার মধ্যে আমাদের আত্মার সেই দেখা চাপা পড়ে, আনন্দ-রূপের পূর্ণতাবোধ ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে ফেলি, তার পরে নোতুন ঋতু যখন পুরাতন ঋতুৎসবের পালা বদল করার আয়োজন করে, তখন তার রাগিণীতে সেই মূল সুরের ধুয়াটিকে নোতুন ক'রে পাই। চন্দ্রতারাখচিত নীল আকাশে বিশ্বের যে আশ্চর্য্য-সুন্দর শতদলটি আলোকের সরোবরে ধীরে ধীরে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, তাকে সম্পূর্ণ ক'রে সমগ্রভাবে যিনি দেখ্‌ছেন তাঁর সেই স্থির-গম্ভীর আনন্দের আংশিক উপলব্ধি আমরা অনুভব করি।

এই রকম ক'রেই আমাদের আর একটি বন্দনার বিষয় হয়, যখন আমরা কোনো মহাপুরুষের মধ্যে সেই মহতোমহীয়ানের পরিচয় পাই। এই পরিচয়ের মধ্যে একটি প্রতিবাদ আছে, যে প্রতিবাদ আমরা প্রকৃতির মহোৎসবের মধ্যেও দেখি। চারিদিকে শ্রীহীনতার অভাব নাই, কতো কুৎসিত মলিনতা, কতো আবর্জ্জনা, কতো অসম্পূর্ণতা, প্রতিনিয়তই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু তারই মধ্যে দেখি সুন্দরকে—যখন দেখি ক্ষণজীবী প্রজাপতির ক্ষীণ সূক্ষ্ম সুকুমার পাখার রঙে রেখায় আশ্চর্য্য নৈপুণ্য, তখন বুঝি যা কিছু কুশ্রী তার বিরুদ্ধে চিরকাল ধ'রে চলেছে সৌন্দর্য্যের এই প্রতিবাদ। তখন বুঝি সমস্ত কুশ্রীতাকে অতিক্রম ক'রে সৌন্দর্য্যই ধ্রুব সত্য। বিশ্বজগতের ভিতরে আমাদের আত্মা যখন ছন্দোময় সামঞ্জস্যকে আবিষ্কার করে, তখন দেখি অনন্ত আকাশে সৌন্দর্য্যের তপস্যার আসন বিস্তীর্ণ। যা কুশ্রী, যা নিরর্থক, যা খণ্ড, সে-সমস্তকে একটি আশ্চর্য্য সুষমার মধ্যে সুপরিমিত ক'রে নেবার জন্যে বিশ্বজগতের অন্তরে একটি অবিশ্রাম প্রবর্ত্তনা কাজ ক'রছে। বিক্ষিপ্তকে সংযত, বিকৃতকে সংস্কৃত করবার এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্যতত্ত্ব

৬ই ভাদ্র প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত মৌখিক উপদেশ—শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কর্ত্তৃক লিখিত।

আশ্রয় ক'রে আছে আনন্দ-স্বরূপকে, অমৃত-স্বরূপকে। বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত ক'রে আনন্দরূপমমৃতং প্রকাশমান ব'লেই এটি সম্ভবপর হ'য়েছে।

মানবাত্মার মধ্যেও কতো দীনতা, কতো কলুষ, কতো হিংসা দ্বেষ সর্ব্বদাই প্রকাশ পাচ্ছে জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বাস আসে—এ সমস্তকে অতিক্রম ক'রে যিনি শিবং তিনি আছেন। মহাপুরুষের জীবনের মধ্যে আমরা এই ইঙ্গিত পাই। যা কিছু অশিব তাকে পরাভূত ক'রে, সমস্ত বিরুদ্ধতার সম্মুখে এসে মহাপুরুষের জীবন যখন দাঁড়ায়, আঘাত-অপমানের মাঝে কল্যাণের তপস্যাকে সার্থক করে, তখন সেই আশ্চর্য্য আবির্ভাবের সম্পূর্ণ যে অর্থ তাকে দেখি। প্রমাণ পাই যে, যুগে যুগে কলুষ ক্ষয় ক'রছেন যিনি, অকল্যাণকে দুঃখের মধ্য দিয়ে কল্যাণে উত্তীর্ণ ক'রছেন যিনি, তিনিই মহাপুরুষের বাণীর ভিতর দিয়ে বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে, জাতির সঙ্গে জাতিকে, ইতিহাসের বিপদসঙ্কুল বন্ধুর পথে একসূত্রে বেঁধে দিচ্ছেন। তখন জানি যে তাঁকে প্রণাম করার দিন উপস্থিত।

আমাদের উপাসনায় ধ্যানের যে মন্ত্র আমরা ব্যবহার করি—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং—সেই মন্ত্রের গভীর অর্থ হচ্ছে এই যে, চোখের দেখায় সত্যকে পাওয়া যায় না। মানুষের আত্মা নিজের জানবার ধর্ম্ম দিয়েই সত্যের স্বরূপকে দেখে। চোখের দেখা বিচ্ছিন্ন, আত্মার দেখা ঐক্যে বাঁধা। ইন্দ্রিয়বোধ সেই একের বোধ নয়। আত্মা নিজের মধ্যে, দেশকালের ভূমিকায়, দেশ ও কালকে সমগ্রভাবে, অখণ্ডভাবে, বিশ্বজগতের ঐক্যসূত্রটিকে আবিষ্কার করার দ্বারাই সত্যকে উপলব্ধি করে। চোখ্ দিয়ে যখন অসীমতাকে দেখ্‌তে যাই, তখন আয়তনের মধ্যে, সংখ্যার মধ্যে, তাঁকে খুঁজি। এমন ক'রে বাহিরের দিক থেকে অসীমের সত্যকে পাওয়া যায় না। যতো ছোটো আয়তনের মধ্যেই হোক্ না কেন, পরিপূর্ণতাকে যখন আত্মার দৃষ্টি দিয়ে দেখি তখন পাই অনন্ত সত্যকে। শিবকে অশিবের মধ্যে দেখা—সেও হচ্ছে আত্মার দেখা। মহাপুরুষেরা এই দৃষ্টি নিয়ে আসেন। তাঁরা বিপদকে ভয় করেন না, নিন্দা-ক্ষতিকে গ্রাহ্য করেন না। অবমাননার ভিতর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেন। যাঁরা মহৎ, ভগবান তাঁদের বাহিরের দিক থেকে দয়া করেন না। নিষ্ঠুর ভগবান মহাপুরুষকে সম্মানের পথে পুষ্পবৃষ্টির ভিতর দিয়ে আহ্বান করেন না, দুঃখের কঠোর পথই তাঁদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে রেখেছেন। সেই জন্যই দুঃখের মধ্যেই মহাপুরুষের জীবনের সার্থকতা, তাঁর সত্যের প্রমাণ। এই নির্দ্দয়তার মধ্যে আমরা দেখি ভগবানের দয়া—তখন ভয় যায়, তখন আমরা ভরসা পাই, তখন আমরা প্রণাম করি।

এই প্রণামের পরিপূর্ণ প্রার্থনা হচ্ছে "অসতো মা সদ্গময়" অসত্য আছে জানি, তার মধ্যেই সত্য দেখা দাও। কে এই সত্যকে আমাদের কাছে উজ্জ্বল ক'রে দেখায়? যখন বহুল উপকরণের প্রয়োজনকেও অস্বীকার ক'রে মানুষ ব'লতে পারে, যা অমৃত নয় তা নিয়ে আমি কি করবো? বীর যখন আঘাতের পর আঘাতেও অবসন্ন হন্ না, তখন অসত্যের মাঝখানে সত্যের যে আবির্ভাব তাকে আমরা দেখ্‌তে পাই। মানব-ইতিহাসের সঙ্কটময় নিত্য বাধাগ্রস্ত অভিযানের মধ্যে আমরা সত্যের প্রকাশকে দেখি। আবার নিজের মধ্যেও দেখি বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম ক'রে, অসত্যকে পরাভাব ক'রে, সত্য প্রকাশ পায়। তখন এই বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়েই আমাদের প্রণাম পৌছয়। তখন বলি "আবিরাবীর্ম্মএধি"—আমার অপ্রকাশের অস্বচ্ছতার মধ্য দিয়াই তোমার প্রকাশ উজ্জ্বল হোক্। তখন আমরা বলি "তমসো মা জ্যোতির্গময়"—অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে আলোক প্রকাশ পাক্। "মৃত্যোর্মামৃতং গময়"—মৃত্যুর মধ্যে অমৃত জাগ্রত হউক।

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, রুদ্রের আহ্বান সেই মহা-পুরুষকেও একদিন ডাক দিয়েছিলো। রুদ্র নিজে তাঁকে আহ্বান ক'রেছিলেন—সেই আহ্বানের মধ্যেই রুদ্রের প্রসন্নতা তাঁকে আশীর্ব্বাদ ক'রেছে। সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর হওয়া এই ছিলো তাঁর প্রতি রুদ্রের নির্দ্দেশ। আজও সে আহ্বান ফুরোয়নি। আজ পর্য্যন্ত তাঁর অবমাননা চ'লেছে। তিনি যে-সত্যকে বহন ক'রে এনেছেন দেশ এখনও সে-সত্যকে গ্রহণ করেনি। যতো দিন না দেশ তাঁর সত্যকে গ্রহণ করবে ততো দিন এই বিরুদ্ধতা চ'লতেই থাকবে। দিন-মজুরি দিয়ে জনতার স্তুতি-বাক্যে তাঁর ঋণ শোধ হবে না—রুদ্রের হাতে তাঁকে অপমান সহ্য করতে হ'বেই। এই হচ্ছে তাঁর রুদ্রের প্রসাদ। তাঁর জন্য কোনো ছোটো পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়নি। নিন্দা-অপমানের ভিতর দিয়েই সত্যকে প্রকাশ ক'রতে হবে, ক্ষতির মধ্যেই সত্যকে লাভ করতে হবে, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে জাগ্রত ক'রতে হবে।

তাই আজ আমাদের প্রার্থনা যেন ছোট না হয়। ভীরুর মতো বল্‌বো না, আমাদের দুঃখ দূর করো। বীরের মতো ব'ল্‌বো, দুঃখ দাও, বিপদ দাও, অপমানের পথে আমাদের নিয়ে যাও। কিন্তু দুঃখ বিপদ অপমানের মধ্যেও অন্তরে যেন তোমার প্রসন্নতার আশীর্ব্বাদ অনুভব করি।

হে রুদ্র, "যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"—তোমার যে প্রসন্ন মুখ আমাদের দেখাও। তমসো মা জ্যোতির্গময়—অন্ধকারের মধ্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ করো। হে রুদ্র, হে নিষ্ঠুর, ক্ষতিপরাভবের ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাও। বাহিরের আঘাতের দ্বারা আমাদের শক্তিকে অন্তরে অন্তরে পুঞ্জিত করো।

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, যিনি রুদ্রের এই জয়পতাকা বহন ক'রে এনেছিলেন, যিনি আমার পরমপূজনীয়, যাঁর কাছ-থেকে আমার জীবনের পূজা, আমার সমস্ত জীবনের সাধনা আমি গ্রহণ ক'রেছি। আজ তাঁর কথা বলতে পারি এমন শক্তি আমার নেই, আজ আমার কণ্ঠ ক্ষীণ। যদি কিছুই না ব'ল্‌তে পারি এই মনে ক'রে আমি কিছু লিখেছিলাম, সেই লেখাটুকু প'ড়ে আমার বক্তব্য শেষ করবো।

[সেই লেখা গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।]

পরলোকগত নীলমণি ধর

নীলমণি ধর মহাশয়ের আদি বাসস্থান কাটোয়া সহরে। তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ ধর পুত্রের ৫ বৎসর বয়সের সময় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বিধবা মাতা কয়েকটি পুত্র ও এক কন্যা সহ কলিকাতায় আসিয়া আপনার ভ্রাতার গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া কোন প্রকারে দিনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। এই স্থানে নীলমণি ধর মহাশয়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়। বিদ্যা-শিক্ষাতে তাঁহার এমনি অনুরাগ ছিল যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তখনকার মত বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়া ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি ফ্রি চার্চ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। ১২।১৩ বৎসরের বালক সার্পেন্টাইন লেন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে ফ্রি চার্চ্চ স্কুলে পদব্রজে প্রত্যহ পাঠ করিতে যাইতেন। অনেক সময় রাত্রিতে তৈলের অভাবে রাস্তার ধারে গ্যাসের আলোকে পাঠ অভ্যাস করিতেন। শুধু তাহাই নয়, অর্থাভাবে গৃহে পাঠের সাহায্যের জন্য লোক পাইতেন না বলিয়া কোন ভদ্র লোকের বাড়ীর প্রতিদিনের বাজার করিতেন এবং সেই লোকটি তাঁহাকে পাঠে সাহায্য করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় এই অল্প বয়সেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ভদ্রলোকের বাড়ীর বাজার করিয়া গৃহে আসিলে হয়ত কোন প্রতিবেশী বলিতেন "আহা, তুমি বাজারে গিয়াছিলে, তাহা জানিতাম না, নচেৎ আমাদের জন্যও কিছু জিনিষ আনিতে দিতাম।" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতেন "আমি আবার যাইতেছি, যাহা প্রয়োজন বলুন।" এইরূপে অনেকদিন তাঁহাকে প্রতিবেশীদেরও বাজার করিতে হইত। তাঁহার মাতুল সামান্য গৃহস্থ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে অন্ন বস্ত্র ও থাকিবার আশ্রয় ছাড়া আর অন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিতেন না। বালক নীলমণি স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন, অথচ আহারের কোন ব্যবস্থা নাই, সুতরাং বাড়ীর একটা পেয়ারা গাছে উঠিয়া একটি ফল খাইয়া ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করিতেন। এইরূপে অনেক দিন গিয়াছে। পরিশ্রম বিদ্যানুরাগ ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি যথা সময়ে প্রবেশিকা ও এফ এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া কোন্নগর স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বি এ পরীক্ষা দিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও, অর্থাভাবে এই ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে পথও পাওয়া যায়, এই নীতির উপর গভীর আস্থা ছিল বলিয়া, তিনি কোন্নগরে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করিয়াও বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পরলোকগত অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। এই অবিনাশ বাবু পরে আগ্রা সহরে সবজজ হইয়াছিলেন। ইনি স্বনামধন্য স্বর্গগত রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী ও ইংরাজী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত স্বর্গগত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। অবিনাশ বাবু প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। নীলমণি বাবু প্রতি শনিবারে কোন্নগর হইতে মাতাকে দর্শন করিবার জন্য কলিকাতা আসিতেন ও সেই সময়ে অবিনাশ বাবুর নিকট হইতে কলেজের নোট্স্ লইয়া যাইতেন। এইরূপে তাঁহার অধ্যয়ন ও সংসারযাত্রনির্ব্বাহ উভয়ই চলিতে লাগিল। বি এ পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল, অবিনাশ বাবু ও নীলমণি বাবুর নাম এক বন্ধনীর মধ্যে বাহির হইয়াছে এবং দুজনেই অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

তৎপরে নীলমণি বাবু কলিকাতা হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে মেট্রোপলিটন কলেজের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাধ্যাপক স্বর্গগত প্রসন্নকুমার লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্টার পরলোকগত ত্রৈলোক্যনাথ ব্যানার্জ্জিও সেই সময়ে হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। ত্রৈলোক্য বাবু আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সময় প্রায়ই নীলমণি বাবুর প্রশংসা করিতেন ও "আমাদের সবে ধন নীলমণি" বলিয়া তাঁহার সহিত অকৃত্রিম বন্ধুতার পরিচয় দিতেন।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময়ে বাংলা দেশে যে নবযুগের সূচনা হইয়াছিল এবং সেই নবযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলস্বরূপ যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব নীলমণি বাবুর হৃদয়কেও গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। তখন মহর্ষির সহিত মিলিত হইয়া কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি যুবকগন বাংলাদেশে একদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিত্রাণপ্রদ বার্ত্তা এবং অন্যদিকে ইহার জাতীয় জীবনগঠনের উপযোগিতার সংবাদ দেশে বিদেশে প্রচারের জন্য উৎসাহ, উদ্যম, সাহস ও আত্মত্যাগের অসাধারণ দৃষ্টান্ত যুবকগণের নিকট প্রদর্শন করিতেছিলেন। নীলমণি বাবুর সরল ও পবিত্র জীবনে এই সময়কার জলন্ত প্রভাব যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবনে দেখিতে পাই। ইনি এই সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, মহর্ষির নিকটে প্রকাশ্যভাবে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তখন যুবকগণের উপর কেশবচন্দ্রের আশ্চর্য্য প্রভাব। নীলমণি বাবু কোন দিন সর্ব্বত্যাগী প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু অনেক সময় আমার মনে হয়, ইনি এবং ইহার মত ব্রাহ্মসমাজের আরও অনেক ব্যক্তি সমস্ত জীবনব্যাপী পরিশ্রমের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যে কাজ করিয়াছেন, তাহা অনেক সর্ব্বত্যাগী প্রচারক অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। যুবক নীলমণি সার্পেন্টাইন লেনের দুর্গাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র কোঙর, নীলমণি কোঙর (ইনি নববিধান সমাজভুক্ত যামিনীকান্ত কোঙরের পিতা) প্রভৃতি আরও কতিপয় যুবকের সহিত মিলিত হইয়া ঐ পল্লীতে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। এই সমাজ অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার পরিবারে তাঁহার মাতা, স্ত্রী, একটি কন্যা ও একটি পুত্র। হেয়ার স্কুলে ৭০৲ বেতন পাইতেন। এই টাকাতে পরিবারের ভরণ পোষণ চালাইয়া কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতেন। পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে সার্পেন্টাইন লেনে জমি খরিদ করিয়া তাহাতে বাটী নির্ম্মাণ করেন। সমস্ত জীবনে

* জামাতা শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত।

তাঁহার মিতব্যয়িতার দৃষ্টান্ত যাহা দেখিয়াছি, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। তাঁহার মাতার প্রাণে কি আনন্দ! অসহায়া বিধবা কয়েকটি শিশু লইয়া সংসারে অকূল সাগরে ভাসিতেছিলেন। ভগবান কৃপা করিয়া আজ তাঁহার সেই অবস্থা ঘুচাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে এই সৌভাগ্যের অবস্থার মধ্যে বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। বিধাতা তাঁহাকে শীঘ্রই আহ্বান করিয়া পরলোকে লইয়া গেলেন; কিন্তু প্রস্থানের সময় তিনি যে তাঁহার মাতৃভক্ত পুত্রকে সুখ সৌভাগ্যের মধ্যে রাখিয়া যাইতে পারিলেন, ইহাতেই তাঁহার পরমানন্দ। নীলমণি বাবু মাতার পারলৌকিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে সম্পন্ন করিবেন স্থির করিলেন। যথা সময়ে কেশবচন্দ্র সদলে আসিয়া নীলমণি বাবুর গৃহে এই প্রথম অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে সম্পন্ন করেন। তখনকার ব্রাহ্ম যুবকদের উৎসাহের অগ্নি যুবক নীলমণি বাবুর হৃদয় স্পর্শ করাতে, তিনি যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, অন্যদিকে তেমনি তখনকার মদ্যপানাসক্ত বাংলাদেশে "মদ না গরল" নামক পত্রিকা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার প্রথম কয়েকটি ছত্র এইরূপ:—

বিষধরে ধরি শিশু চুম্বিবারে যায়।
ঘুরিয়া বিষম ফণা চুম্বিল তাহায়॥

অতঃপর তিনি আইনের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে গয়া জেলাতে এই ব্যবসা আরম্ভ করেন। তখন সেখানে গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ওকালতি করিতেন। সেখানে ব্যবসায়ে উন্নতি না দেখিয়া তিনি মেদিনীপুরে এই কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি হইল। কখন কখন তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের উকীলের কাজও করিতে হইত। ব্যবসাতে উন্নতি ও অর্থাগম হইলে অনেক সময়ে মানুষকে অর্থলিপ্সা গ্রাস করিয়া ফেলে। এইরূপে কত যুবককে দেখা গিয়াছে অধ্যয়নের সময় অথবা কলেজে পাঠ সমাপ্ত হইবার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত দেশের কাজে লাগিয়া যাইবার জন্য কি আশ্চর্য্য উৎসাহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করে, কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি সাংসারিক উন্নতির জন্য এতই ব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, তাহাকে আর দেশ-সেবার সীমান্তরেখার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় না। নীলমণি বাবু সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না। সুবিখ্যাত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নামের সহিত মেদিনীপুরের নাম যেমন চিরকাল জড়িত আছে, নীলমণি বাবুর নামের সহিতও তেমনি এই সহরের নাম চিরকাল জড়িত থাকিবে। এই স্থানে তিনি ব্রাহ্মসমাজ, বালিকা বিদ্যালয়, যুবকদের উন্নতির জন্য সভা সমিতি স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। তাঁহার সরলতা, অমায়িকতা, হৃদয়ের কোমলতা ও চরিত্রের গাম্ভীর্য্যের জন্য সকলের প্রশংসাভাজন হইলেন। এই স্থানে প্রায় পনর বৎসরকাল অবস্থানের পর দুরন্ত ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়াতে মেদিনীপুর ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার জীবনের কোন আশা ছিল না। কিন্তু অনেক স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের পর অবশেষে দার্জিলিঙ্ গিয়া এই রোগ হইতে মুক্ত হয়েন। তৎপরে তিনি শিয়ালদহে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তাঁহার প্রাচীন বন্ধু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আগ্রা সহরে সদরওয়ালা ছিলেন। তিনি চেষ্টা করিয়া আগ্রা কলেজের আইন অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে আগ্রাতে লইয়া যান। তদবধি প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল এই সহরেই বাস করেন।

মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দেখা যাইত যে, জাতীয় জীবন গঠনের দ্বারা স্বাধীনতালাভের জন্য রাজ-পুরুষদের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে তিনি ভীত হইতেন না। যখন পরলোকগত দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হাইকোর্টের বিচারে জেলে প্রেরিত হয়েন, সেই সময়ে সমস্ত বাংলাদেশে এই অবিচারের বিরুদ্ধে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তখন আমি স্কুলের ছাত্র, মেদিনীপুর টাউন স্কুলে পাঠ করিতাম। মেদিনীপুর সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সভা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইবে। তখন সেখানে বিপিনবিহারী দত্ত, কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী উকীল ছিলেন। কিন্তু ঐ সভাতে কেহই সভাপতি হইতে সম্মত হইলেন না। নীলমনি বাবুকে অনুরোধ করা মাত্র তিনি সম্মত হইলেন। সেই সভাতে গোবিন্দচন্দ্র মুখুর্য্যে প্রভৃতি কয়েকজন যে অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছিলেন তাহা এখনও স্মরণ আছে। অবশেষে সভাপতি মহাশয় শান্ত ও ধীরভাবে রাজপুরুষদের এই অন্যায় বিচারের সমালোচনা করিয়া সকলকে চক্ষুর জলের সহিত একমাস কাল রঙের ফিতা ধারণ করিয়া অশৌচ পালন করিতে যখন অনুরোধ করিলেন, তখন সেই বৃহৎ সভার মধ্যে সকলের হৃদয়ে যে ভাবোচ্ছাস হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

আগ্রাগমনের অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার উপর দিয়া বিষম পরীক্ষার ঝটিকা প্রবাহিত হইল। যমুনার নিকটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে প্রায় এক মাসকাল বাস করিবার পর, বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রী ও দুইটি শিশুপুত্রকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার সেবা করিবার জন্য কোন মহিলা ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার এই দুরন্ত শোকের আঘাতের সময়ও রোগশয্যাতে তাঁহার দুশ্চিন্তা বাড়াইবার জন্য তিনটি অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল। অবিনাশ বাবু প্রভৃতি বন্ধুগণ তাঁহার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহারা আর কি করিতে পারেন? ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহার এই বিশ্বাসী সাধু সন্তানকে রোগমুক্ত করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া এই শিশুগুলির পিতা ও মাতার স্থান গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এইবারে তিনিও ওকালতি ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন। আগ্রা গিয়াই তাঁহার প্রথম কাজ এই হইল যে বাড়ীতে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে সজন উপাসনার প্রবর্ত্তন। কতকগুলি ভদ্রলোক এই উপাসনাতে রীতিমত আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুস্থানী কয়েকটি ভদ্রলোকও যোগদান করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে হিন্দীতে উপাসনা করিতে দেখা যাইত। আগ্রাতে অবস্থানকালে অনেক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক তাঁহার বাটীতে যাইতেন। তিনি

Registered No 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ১৩শ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯

18th October, 1928.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

হে অনন্তস্বরূপ জীবনবিধাতা, তুমি আমাদিগকে তোমার অনন্ত মহত্ত্বের পথে চলিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছ,—আমাদের জন্য ক্ষুদ্রে তৃপ্ত হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা কর নাই। মোহ ও বিকৃতি বশতঃই আমরা অনেক সময় ক্ষুদ্রতাকেই পছন্দ করিয়া লই, ছোট হইয়া থাকিতে কোনও লজ্জা বা বেদনা অনুভব করি না। উহা যে দুর্গতিরই চরম অবস্থা তাহা বুঝিতেও পারি না। হে সর্ব্বদর্শী পিতা, তুমি জান কোন্ পাপে আমাদের এই প্রিয় দেশ এক প্রকার চরম দুর্গতিতে উপস্থিত হইয়াছে—ইচ্ছাপূর্ব্বক নিকৃষ্টতাকে বরণ করিয়া লওয়াটাই গৌরবজনক মনে করিতেছে। পুরাকালে তোমার সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বই এই দেশে তুমি কৃপা করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলে। কাহার প্ররোচনায় মানুষ তাহা গ্রহণ না করিয়া সকলের নীচে পড়িয়া রহিল জানি না। আজও আবার নূতন ভাবে তোমার প্রেমের মহা আহ্বান আসিয়াছে। মানুষ তাহা শুনিয়াও শুনিতেছে না—তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষুদ্রতা ও অসারতার পথেই চলিতেছে, সে পথ নিকৃষ্ট জানিয়াও পরিত্যাগ করিতেছে না। হে করুণাময় পিতা, তুমি ভিন্ন আর কে এই মহা দুর্গতিহইতে এ দেশকে উদ্ধার করিবে? তুমি আমাদের উপর যে গুরুতর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত করিয়াছ, আমরা তাহা সম্যক্ প্রকারে সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদিগকে বল ও শক্তি দেও, আমরা তোমার কার্য্য ভাল করিয়া করি। আমরা নিয়ত তোমার মহত্ত্বের পথে চলিয়া সকলকে সে পথে আকর্ষণ করি। আমরা অনেক সময় নীচে পড়িয়া থাকি বলিয়াই-ত অপরকে তুলিতে পারিতেছি না। কৃপা করিয়া আমাদের সকল দুর্ব্বলতা ও অবহেলা দূর কর। তোমার পবিত্র ইচ্ছা আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত কর।

নিবেদন।

তোমারে লইয়া থাকি—আমার ইচ্ছা হয় নিশিদিন আমি তোমারে ল'য়েই থাকি; আমার প্রাণ মন তোমারই চরণে সমর্পণ করি; যা কিছু দেখি, তাতে তোমারই মধুর রূপ দর্শন করি; যা কিছু শুনি,—আকাশে বাতাসে, পত্রের মর্ম্মরধ্বনিতে, নদ নদীর কুল কুল শব্দে, পাখীর সঙ্গীতে, মানুষের কণ্ঠরবে,—তোমারই মধুর বাণী শুনি! সুখে অসুখে, আঁধারে আলোকে, তোমাকে প্রাণের ভিতরে রাখি। নিশিদিন তোমারই নাম গান করি; সকলকে প্রেমে আলিঙ্গন করি—যে দূরে গিয়াছে, তাকে নিকটে টেনে আনি; যে প'ড়ে গিয়াছে তাকে তু'লে ধরি; যে পর হয়েছে, তাকে প্রেমের টানে আপনার ক'রে লই; যে ব্যথা দিয়েছে, তাকে প্রেমে আলিঙ্গন করি; যে হস্ত পীড়া দিয়েছে, সে হস্ত চুম্বন করি। আমার ইচ্ছা হয়, আপনার কিছু রাখ্‌ব না—তুমি আমার জীবনের প্রভু হ'য়ে থাক্‌বে; দিন রাত তোমার চরণে প'ড়ে থাক্‌ব। ঐ চরণ আমার আরামভূমি—আমার বিশ্রামস্থান। তোমাকে ল'য়েই আমার সুখ সম্পদ; তোমার কাছে থেকেই আমি কৃতার্থ হব।

মনের কাণ মলা—ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয় বল্‌তেন, মনের কাণ ম'লে দিতে হয়। বাসনা যখন জেগে উঠে, জোর ক'রে তাকে সংযত কর্‌তে হয়। সুখের ইচ্ছা, আরামের স্পৃহা কর্ম্মজীবনে আসে; রিপুকুল উত্তেজিত হ'য়ে উঠে; তাদিগকে ত "কাণ ম'লে" দমন কর্‌তেই হয়। অনেক সময় অনেক আকাঙ্ক্ষা জাগে, অনেক প্রকার বাসনা আসে, তাহা আপাততঃ নির্দ্দোষ মনে হয়; কিন্তু সাধননিরত যে, তাকে সে সকলও সংযত কর্‌তে হয়। জীবনপথ ত আজও সরল নয়। কখন কোন্ ভাবে, কোন্ পথে, কোন্ ছিদ্র পেয়ে যে

বাসনা কামনা মাথা উচু ক'রে দাঁড়ায়, কখন কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন ক'রে যে প্রবৃত্তিকুল জেগে উঠে, তা ত জানা যায় না। অনেক সময় বাসনাকে নির্দ্দোষ মনে ক'রে উপেক্ষা কর্‌তে কর্‌তে তাহাই প্রবল হ'য়ে উঠে। তখন তাকে সংযত করা কঠিন হয়। বাড়ীর ছাদের উপর মাটি জমল! কোথা হ'তে, কি ভাবে কোন বৃক্ষের একটা বীজ এসে পড়ল; চারা জন্মিল; তখন গ্রাহ্য কর্‌লাম না; তাহাই বড় হ'য়ে উঠল, শিকড় গজাল; ছাদের ভিতরে ঢুকল। তখন তাকে বিনাশ করা কত কঠিন! ছাদ যে ফেটে যায়! লালসা কামনার বীজ গজাতে না গজাতে তাহা তু'লে ফেল্‌তে হয়। মনে বিলাস বিভ্রমের আকাঙ্ক্ষা জাগলেই সংযত কর্‌তে হয়; মনের 'কাণ ম'লে' দিতে হয়। একদিকে ঈশ্বরের চরণে কাতর প্রার্থনা, অপর দিকে সজোরে কামনার বীজ উৎপাটন। প্রাণের গ্রন্থি ছিঁড়ে যাবে, কিন্তু উপায় নাই; সংযমেই জীবন।

সে পথে গেলেই পার্‌তে—চারিদিকে কত আমোদ উচ্ছ্বাস, কত গাড়ী ঘোড়া মোটর; কত সুখ ঐশ্বর্য্য, কত গ্রামোফোন, বেতার সঙ্গীত! লোক কেমন সুখে আছে! যাদের সঙ্গে একত্রে চলেছি, আজ তারা কোথায়!—দূর হ'তে দেখেও দেখে না; খাওয়ার ভাবনা নাই, দিন রাত খাট্‌তে হয় না! গরমের সময়ে শৈলবিহারে যায়। আর তুমি? তুমিও ত কত অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে পার্‌তে; সুখে থাক্‌তে পার্‌তে; গাড়ী ঘোড়া মোটর কর্‌তে পার্‌তে; হর্ম্ম্যবাসী হ'য়ে বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া খেতে পার্‌তে; আমোদে আনন্দে দিন কাটাতে পার্‌তে; দশজনের আদর পেতে পার্‌তে। কোন্ সময়ে কি ডাক শুন্‌লে, সব ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালে! আজ সব সময় পেটে অন্ন জোটে না; থাক্‌বার স্থান হয় না; পরিবার প্রতিপালন কর্‌তে পার না; রোগে ঔষধ জোটে না, পথ্যের বন্দোবস্ত হয় না; দীন দুঃখী ব'লে বন্ধুরাও আদর করে না! তাই ব'লে কি দুঃখ হচ্ছে? মনে অনুতাপ আস্‌ছে? সুখ সম্পদই যদি আকাঙ্ক্ষিত হয়, তবে সে পথে গেলেই পার্‌তে! আরও ত কত জন ঐ ডাক শুনেছিল, কতদূর এসেও ছিল; তারা ত ফিরে গিয়াছে; তুমিও ত ফিরে যেতে পার্‌তে; দশজনের একজন হ'তে পার্‌তে! এ পথে এসে দুঃখ দারিদ্র্য বরণ ক'রে নিতেই হয়। তিনি যাকে ডাকেন, তাকে সংগ্রামের ভিতর দিয়াই যেতে হয়; তাকে দুঃখ অপমানের বোঝাই বইতে হয়। তাকে প্রিয়জনের নিকটও উপেক্ষা পেতে হয়। কিন্তু তবুও যদি তাঁর শ্রীচরণে প'ড়ে থাক, বাহিরের সুখ ঐশ্বর্য্য যে আস্‌বে তা নয়, অন্তরে শান্তি পাবে। প্রভুর প্রসন্ন মুখ দেখে সুখী হবে, আনন্দ পাবে। এ পথে যখন এসেছ, তাঁর চরণে প'ড়ে থাক; তিনি তোমার ভার নিবেন।

সম্পাদকীয়।

নিকৃষ্টতাতে তৃপ্তিবোধ—বিশ্ববিধাতা মানুষকে সকল বিষয়ে অনন্ত উন্নতি ও বিকাশের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই তাহার প্রাণে সকল প্রকার মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষাই নিহিত করিয়াছেন—স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাকে কিছুতেই নিকৃষ্টতার মধ্যে তৃপ্ত হইয়া থাকিতে দেন না। অপূর্ণ মানুষ এক মুহূর্ত্তেই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে না, তাহাকে সংগ্রামের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরেই উঠিতে হয়। সুতরাং তাহার জীবনে উত্থান পতন, জয় পরাজয়, দুইই আসিতে পারে—তাহার পক্ষে নানা প্রকার ভুল ভ্রান্তিতে পতিত হওয়াও সম্পূর্ণ সম্ভবপর। ইহার মধ্য দিয়া চলিবার ব্যবস্থাই তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতার বিধানে এ সকল বাধা বিঘ্ন তাহার উন্নতিপথে ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতে পারে না—বরং অনেক বিষয়ে তাহারা সাহায্যই করিয়া থাকে। তিনি তাহার প্রাণে যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই তাহাকে সে পথের দিকে আকর্ষণ ও অগ্রসর করে—তিনি স্বয়ং সকল অবস্থার মধ্যে তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া যান। ইংরাজীতে যে একটি প্রবাদ আছে—যেখানে ইচ্ছা আছে সেখানে একটা পথও আছে অর্থাৎ ইচ্ছা থাকিলে আপনিই পথ বাহির হয়—তাহা অতীব সত্য। কিন্তু যেখানে এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাটির অভাব ঘটে, সেখানে কোনও প্রকার উন্নতির আর সম্ভাবনা থাকে না, সকল সংগ্রাম ও চেষ্টা বিলুপ্ত হইয়া যায়, একপ্রকার মৃত্যুর অবস্থাই উপস্থিত হয়। ইহা যে মানব-জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা নহে, ঘোরতর বিকৃতিই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্য ইহাকে চরম দুর্গতির অবস্থাই বলিতে হইবে। অন্য সকল প্রকার দুর্গতিই একদিকে অতৃপ্তি ও দুঃখ বেদনা অনুশোচনা, অপর দিকে তাহা হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা সংকল্প ও চেষ্টা, জাগ্রত করিয়া প্রকারান্তরে উন্নতির সহায়তাই করিয়া থাকে। একমাত্র ইহাই অবনতির পথে দ্রুত অগ্রসর করে। অথচ ইহা এমনই মোহ উৎপন্ন করে যে কিছুতেই এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে দেয় না। তাই মধ্যযুগের শাস্ত্র-কর্ত্তা ও সমাজ-পরিচালকগণ যে আর্য্য ঋষিদের এই দেশটাকে এরূপ চরম দুর্গতিতে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা অনেকে একটুও বুঝিতে পারিতেছে না। ইহারা সমাজের এক অঙ্গকে নিকৃষ্ট রাখিয়া শুধু সমাজদেহকেই যে পঙ্গু করিয়াছেন তাহা নহে, তাহাদের হৃদয়ে নিজেদের নিকৃষ্টতার ভাবকে মুদ্রিত করিয়া দিয়া তাহাদের ও সমগ্র সমাজের উন্নতির দ্বারকে চিরতরে রুদ্ধ এবং মৃত্যু ও অবনতির পথকে অগণিত কালের জন্য সুপ্রশস্তও করিয়াছেন। পতিত যে পতিত থাকাকেই বিধাতার বিধান মনে করিয়া সে অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতে প্রস্তুত, কখনও উন্নত হইবার জন্য বিন্দুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা করে না, এদৃশ্য জগতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাই জগতের আর কোনও জাতি এরূপ অধঃপতিতও হয় নাই, দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছে নাই।

বর্ত্তমানে শিক্ষাপ্রভাবে এই ভাব কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও তাহা অনেকের মধ্যে বেশ প্রবল ভাবেই কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা না হইলে এতদিনে মহাবিপ্লব আসিয়া সমাজকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিত; কেন না, এই বৃহত্তর অঙ্গ একবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিলে উহাকে চাপিয়া রাখিবার শক্তি আর কাহারও নাই। ইহা যদি একটা সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র হইত, তাহা হইলে উহা কখনও লোকের উপর এত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। একদিন লোক বিদ্রোহী হইয়া উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতই। ইহাকে মিথ্যা ধর্ম্মের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করাতেই, এই ব্যবস্থা এত দীর্ঘকালস্থায়ী ও শক্তিশালী হইতে পারিয়াছে, লোকে উহাকে এমন ভাবে মানিয়া লইয়াছে। ইহাদের ব্যবস্থায় যে শুধু সামাজিক অনিষ্টই সাধিত হইয়াছে তাহা নহে। কল্পনা ও অসত্যের উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহারা মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির পথকেও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই শাস্ত্র-কর্ত্তাগণ যে আর্য্য ঋষিদের বিশুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম হইতে এই দেশকে বঞ্চিত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অসার মিথ্যা ধর্ম্মের চাকচিক্যময় বাহ্য আবরণ দ্বারা লোককে বিমোহিত করিয়াছেন তাহার দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। ইঁহারা যদি শুধু উচ্চ ও নিম্ন অধিকারীর জন্য দুই প্রকার ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, দুইটিকে পাশাপাশি রাখিয়া লোককে উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে ও আপনার জ্ঞান বুদ্ধি মতে যেটিকে হয় বাছিয়া লইতে সুযোগ দিতেন, তাহা হইলেও কতকটা কল্যাণের সম্ভাবনা থাকিত, এরূপ চরম দুর্গতি উপস্থিত হইত না। ইঁহারা বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু উহাকে শুধু উচ্চ অধিকারীর সাধনীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়া এবং সংসারে সে প্রকার উচ্চ অধিকারীর কোনও চিহ্ন মাত্র না রাখিয়া, উহাকে চিরতরে সংসার হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। তাঁহারা যে—কোন্ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই—মানুষের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন যে তাহারা সকলেই নিম্নাধিকারী, তাহাদের উচ্চ তত্ত্ব লাভে কোনও অধিকার নাই, সে প্রকার কোনও চেষ্টা করা তাহাদের পক্ষে বাতুলতা মাত্র, ইহা অপেক্ষা প্রাণঘাতী আর কিছু হইতে পারে না। ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণের কেহ কেহ উচ্চাধিকার ও নিম্নাধিকার স্বীকার করিয়াও বলিয়াছিলেন, উচ্চতর তত্ত্ব জানিবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিলেই নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারী হইয়া যায়, তখন তাহাকে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিতে হইবে, সে আর মিথ্যা কল্পনার মধ্যে, অসার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও আড়ম্বরের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে না। ইঁহারা সে পথও রুদ্ধ করিয়া দিলেন। এমন দাসবৃত্তি মানুষের মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন যে, তাহার সকল প্রকার স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টা চিরতরে লুপ্ত হইল। চিন্তাধারা এমন বিকৃতি প্রাপ্ত হইল যে, তাহা সেই মিথ্যা কল্পনাকে সত্য বলিয়া, নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট বলিয়া লোকের ভ্রান্তি উৎপাদনেই নিযুক্ত হইতে লাগিল, অন্ধকারকে আরও গভীরতর অন্ধকারেই নিমজ্জিত করিল। যাহারা জ্ঞানের অভাবে মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া ভ্রম করে ও সে পথে চলিতে থাকে, তাহারা এক সময় অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইয়া সত্যে উপনীত হইতে পারে। তাহাদের সরল বিশ্বাস ও অকপট অনুরাগ তাহাদিগকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করিবার পক্ষে সাহায্যই করে, অকল্যাণ হইতে বহু বিষয়ে রক্ষাই করে। আর তাহাদের প্রাণে যদি এই বিশ্বাস থাকে যে, উচ্চতর তত্ত্ব কিছু আছে, তাহাকে তাহার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে, তাহা হইলে অচিরে সেই অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইয়া সত্য জ্ঞানে উপস্থিত হইতে পারে এবং উন্নতির পথেও অবাধে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয়। কিন্তু সে প্রকার বিশ্বাস না থাকিলে যে তাহার অগ্রসর হইবার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না, উন্নত সত্য লাভের কোনও চেষ্টাই থাকে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়, শিক্ষিত জ্ঞানী লোকও আপনাকে নিম্নাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে না। ইহা যদি বিনয়ের নিদর্শন হইত তাহা হইলে দুঃখের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইঁহারা আপনাদের জ্ঞানকে সত্যনির্দ্ধারণে নিয়োগ না করিয়া, উচ্চতর জীবন লাভে প্রয়োগ না করিয়া আপনাদের নিকৃষ্টতর অবস্থার সমর্থনেই ব্যবহার করিয়া, জ্ঞানের যে অপব্যবহার করিতেছেন তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই যে স্বাধীন চিন্তা ও সত্যের অনুসরণ হইতে বঞ্চিত করিয়া মানবজীবনের মূল প্রস্রবণ ধর্ম্মধারাকে এই প্রকারে কলুষিত ও একেবারে শুষ্ক ও মৃতপ্রায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা চরম দুর্গতি আর কিছু হইতে পারে না। ধর্ম্মধারা বিশুদ্ধ থাকিলে তাহার প্রভাব জীবনের আর সকল বিভাগেই প্রসারিত হইত, দেশ ও সমাজকে সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ হইত। তাহার অভাবে সকল মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির চেষ্টাই বিলুপ্ত হইয়াছে। এই দাসবৃত্তি হইতেই দেশের সকল প্রকার ধর্ম্মহীনতা ও উদ্যমহীনতা আসিয়াছে। তাই মানবপ্রাণে সর্ব্বাগ্রে এই বিশুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম লাভের আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল করিতে না পারিলে, কেহই যে নিকৃষ্টতার মধ্যে পড়িয়া থাকিতে সৃষ্ট হয় নাই, সকলকেই সকল বিষয়ে উৎকৃষ্টতার জন্যই আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত হইতে হইবে, এই ভাব প্রাণে জাগ্রত করিতে না পারিলে আর এ দেশের কল্যাণ নাই। প্রত্যেক মানুষই একমাত্র সত্যেরই অনুসন্ধান ও অনুসরণ করিতে বাধ্য, জ্ঞান প্রেম পুণ্যের অনন্ত প্রস্রবণ সত্যস্বরূপ জীবনদেবতাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিবার অধিকারী, এই বিশ্বাস যদি কেহ হারাইয়া ফেলে, তবে তাহার কোনও প্রকার উন্নতিরই আশা থাকে না। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহারা যে উচ্চ ধর্ম্মলাভ করিয়াছে, তাহাতে যে সকলেরই অধিকার আছে, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, স্ত্রী পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেই যে ইহাতে অধিকারী, সকলেরই এই জন্য আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত হইতে হইবে, ইহা আমাদিগকে জীবনদ্বারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে আমরা দায়ী। শুধু যুক্তি বিচার দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। তাহাতে মানুষের বদ্ধমূল ভুল সংস্কার বিদূরিত হইবে না। জীবন দ্বারা দেখাইতে হইবে উচ্চ বিশুদ্ধ ধর্ম্মে সকলেরই অধিকার

আছে। সকল প্রাণে সত্যানুসরণের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা জাগিলেই আর সমস্ত ধীরে ধীরে আপনা হইতেই আসে। আমাদেরও প্রত্যেকের প্রাণে সর্ব্বদা উন্নতি হইতে উন্নতিতে পৌঁছিবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। কিছুতেই ক্ষুদ্র হইয়া নিকৃষ্টতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া তৃপ্ত থাকিলে চলিবে না। মঙ্গলময় পিতা আমাদিগের প্রাণে শুভ সংকল্প জাগ্রত করুন। আমরা তাঁহার হইয়া, তাহার পথ সর্ব্বদা অনুসরণ করিয়া, ধন্য ও কৃতার্থ হই। তাঁহার শুভ ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মসমাজের দান।

ব্রাহ্মসমাজ কেন এ দেশের প্রিয় হ'ল না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। ব্রাহ্মসমাজকে কেন সকলে আদর ক'রে আপন ব'লে স্থান দিল না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। ব্রাহ্মসমাজকে আপনার বলিয়া ইহার উন্নতির জন্য এ দেশ কেন চেষ্টা করিল না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। পরম করুণাময় পরমেশ্বর এ দেশের সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি হরণের জন্য এই ব্রাহ্মসমাজকে এ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। কেন লোকে তাহা বুঝিতে পারে না, এ কথা আজ প্রাণে জাগিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ এ দেশকে কি দান করিয়াছেন, আজ একবার সে কথা ভাবি।

ব্রাহ্মসমাজ এ দেশের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রধান এক দান করিয়াছেন তাহা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর উপাসনা। ইহার মত মহৎ দান আর কে করিতে পারে? "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর উপাসনা ব্রাহ্মসমাজ যেমন করিয়াছেন এমন আর কেহ করে নাই। নিবে কি আমার উপস্থিত ভাই ভগি, এই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর উপাসনা?

শুনতে পাই মানুষ ক্ষুদ্রজ্ঞানবিশিষ্ট, সীমাবিশিষ্ট, তার কল্পনা ক্ষুদ্র, সে কিরূপে নিরাকার অনন্ত ব্রহ্মের উপাসনা করিবে? কিন্তু এমন এক দিন ছিল—এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে—যখন আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ বলেছিলেন "মহান্ প্রভুর্বৈপুরুষঃ"। তিনি একজন ব্যক্তি, একজন বিরাট পুরুষ। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল। পরম ব্রহ্মকে তাঁহারা কি সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করেছিলেন! কিন্তু কাল-প্রবাহে দেশের মধ্যে কি সংকীর্ণতা এসে দেশের কি সর্ব্বনাশই করিয়াছে! ব্রাহ্মসমাজ তাই এখন জানিতে পারিয়াছেন, সেই "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষকে" জানতে না পারলে এবং তাঁকে পূজা না করতে পারলে জাতির ও দেশের মঙ্গল নাই।

এই সর্ব্বসাক্ষী বিরাট পুরুষকে শুধু বাহিরের চক্ষু দিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় না, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখলেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। একজন প্রাচীন ব্রাহ্মের কথা বলি। তিনি কখনও ব্রাহ্মসমাজে আসতেন না। একদিন বৃষ্টিতে বাড়ী ফিরছিলেন। ব্রাহ্মসমাজমন্দিরের কাছে এসে বৃষ্টির জন্য মন্দির মধ্যে আশ্রয় নিলেন। সেদিন রবিবার ছিল। উপাসনার সঙ্গীত হইতেছিল "কর তাঁর নাম গান"। সেদিন সেই গানটি শুনে তাঁর হঠাৎ অন্তরে দৃষ্টি পড়লো, তিনি একেবারে জেগে গেলেন, বাড়ী ফিরেও সেই গান তিনি অন্তরে শুনিতে লাগিলেন—"কর তাঁর নাম গান"। এইরূপে তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর পূজা আরম্ভ করলেন—জীবনে আর তাহা পরিত্যাগ করতে পারেন নাই।

একজন স্ত্রীলোক, কিরূপে জানি না,—ব্রহ্ম যাঁকে জানান তিনি সহজেই জানতে পারেন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর পূজা আরম্ভ করলেন। তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে এই "এক-মেবাদ্বিতীয়ম্" এর পূজা পরিত্যাগ করতে বললেন, না করিলে লাঞ্ছিত হইতে হইবে ভয় দেখালেন। তিনি ত্যাগ না করায়, একদিন সেই স্ত্রীলোককে একটি গাছের তলায় নিয়ে গেলেন এবং বললেন "যদি তুমি একের পূজা পরিত্যাগ না কর, তবে এই বৃক্ষে তোমাকে ঝুলাইয়া ফাঁসি দিব"। তিনি কিছুমাত্র ভীত না হ'য়ে বললেন আমাকে ফাঁসি দাও আর যা কর, কিছুতেই প্রাণ থাকিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর পূজা ত্যাগ করতে পারবো না।" এইরূপে এক বিরাট পুরুষ সূর্য্যে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, অন্তরীক্ষে, আমার মধ্যে, তোমার মধ্যে, সকলের মধ্যে প্রকাশিত আছেন। তিনি কত হতভাগিনীর অন্তরে অপূর্ব্ব আলোকপাত করিয়া জীবন পবিত্র ক'রে তুলেছেন! এক হতভাগিনী যে পূর্ব্বে বিলাস ব্যসনে রিপুর বশীভূত হ'য়ে অপবিত্র জীবন যাপন করছিল, তাঁর প্রাণের মধ্যে একদিন ধ্বনিত হল "কন্যা, করছিস্ কি?" এই বাক্যে কন্যা জেগে উঠলো, সকল অসন বসন অলঙ্কার খুলে ফেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে এল। ব্রাহ্মসমাজে এসে বললেন "শুনেছি এখানে পাপীর নাকি ত্রাণ হয়। সেই বার্ত্তা শুনে আমি এসেছি।" এইরূপে তাঁর জীবন পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। কে বলে তিনি দর্শন দেন না? কে বলে তাঁর বাণী শুনা যায় না? কে বলে তাঁকে পূজা করা যায় না? এঁকে যেমন পূজা করা যায়, এমন পূজা আর কাহাকেও করা যায় না। তিনি প্রাণের মধ্যে দর্শন দেন, স্পর্শ করেন, কথা বলেন।

ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় দান আত্মার পরিচয়। এ দেশের লোক 'আত্মা' ব'লে যে জিনিষ আছে তাকে জানে না—"পরমাত্মাকেও" জানে না 'জীবাত্মাকেও' জানে না। কর্ম্মশালায় যাও, সেখানে কেবল যন্ত্র, 'আত্মা' সেখানে নাই। শিক্ষালয়ে যাও সেখানেও জ্ঞান যন্ত্র মাত্র, পৃথিবীর সকল স্থানে যাও "আত্মা"কে দেখিতে পাবে না। জগতে কত কত লোক ধন দৌলত উপার্জ্জন করিয়াও তৃপ্ত হন নাই, আত্মহত্যা করেছেন। ব্রাহ্মসমাজ দেশকে শুনাইয়াছেন, তোমার আত্মা আছে এবং আত্মার মুক্তি আছে। আমাদের এক জন তো বলেছেন "জ্ঞানে গভীরতা চরিত্রে সংযম, প্রেমে বিশালতা, মানবে প্রীতি, ঈশ্বরে ভক্তি" লাভ করিতে হইবে।

মানুষের ধর্ম্ম এই আত্মার, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংস্পর্শ আছে। শাস্ত্রের কথা মানুষ ভুলে গিয়েছিল। এখন মানুষ আত্মার সমাচার এই ব্রাহ্মসমাজমধ্যে দেখিতে ও জানিতে পারিতেছে। আত্মার জ্ঞান, পবিত্রতা, বুদ্ধি, ইচ্ছা সকলই আছে; ইহা জড়

৬ই ভাদ্র রাত্রিকালীন উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।

বস্তু নহে এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ বিলাস বিভবের পরিতৃপ্তির জন্য আসেন নাই। আমোদ প্রমোদ ব্রাহ্মসমাজের নিকট বিষতুল্য। আমাদের যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁরা বাহিরের আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন না। বাহিরের লোকে যাহাকে আনন্দ ব'লে উন্মত্ত হয় তাহাতে তাঁহারা কখনও যোগ দিতেন না। মহর্ষি তাঁর বাড়ীর যাবতীয় বিলাস সামগ্রী বিতরণ ক'রে শান্তি পেলেন। ব্রাহ্মসমাজই প্রথম এ দেশে গৃহীকে আত্মার প্রতি দৃষ্টি দিতে শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের দেশে আত্মাকে চির দাসত্বে বন্দী ক'রে রেখেছে। আত্মার এই দাসত্ব শৃঙ্খল পাঞ্জাবেও এমনি ভাবে এক দিন মোচন হয়েছিল। যেদিন গুরু অর্জ্জুন গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন "গুরু কি সি বন্দ খালাস"—যত ভ্রান্তি, যত কুসংস্কার, পতিতের এই মুক্তি সেই দিন হ'ল। মনের মধ্যে মহা আলোক প্রকাশিত হ'ল, পাপের "বেড়ী" কেটে ফেলে দিল, বন্দী খালাস পেল। "বিবেকের স্বাধীনতা," "বেড়ী কেটে দাও", প্রথম হ'তে ব্রাহ্মসমাজ এই রব তুলেছেন। বেড়ি কাটা অনেক হ'য়ে গেছে। আগে ছিল সংস্কৃত বচন না হ'লে পূজা হয় না, ব্রাহ্মসমাজ এই বেড়া কেটে দিয়েছেন। মানুষ আত্মার কথা দিয়ে পূজা কর্‌বেন, এরই নাম বিবেকের স্বাধীনতা।

নারী জাতির নিজের কোন ধর্ম্ম কর্‌বার শক্তি নাই, ধর্ম্ম এক জনের হ'য়ে আর এক জন কর্‌বে, এই বেড়ী কাটা হয়েছে। পরের উপর নির্ভর ক'রে আত্মা তৃপ্ত হ'তে পারে না, পরের আদেশ শুনে সে চল্‌তে পারে না। বিবেকের বাণী এখন মানুষ শুন্‌তে পেয়েছে। মানুষকে এখন কি উন্নতির পথে নিয়ে চলেছে! কি শুভদিন এসেছে! আমি বল্‌তে চাই স্বদেশবাসীদিগকে কি শুভদিন ব্রাহ্মসমাজ এনে দিয়েছেন। মৃত্যু নাই—যে মৃত্যুর ভয়ে জগৎ অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছিল, মহা হাহাকার উঠেছিল, এখন আর সে হাহাকার নাই। এই তত্ত্বের আগমনে জগতে কি উপকারই না হয়েছে! দেখেছি কত মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে ব'সে, বেদনা নাই, ভয় নাই, আনন্দে পরম জননীর কোলে চ'লে গিয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজের এটা কি মহৎ দান—ভয় চ'লে গেল! বালক বালিকার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে ব'সে শুনেছি "মা তুলে লও কোলে" ব'লে সঙ্গীত হচ্ছে। দেশে কি অসম্ভব সম্ভব হ'ল! মৃত্যুকে ব্রাহ্মসমাজ জয় কর্‌ল! এ কি প্রাণ দিল ব্রাহ্মসমাজ! ব্রাহ্মসমাজের এই তৃতীয় দান পরলোকে বিশ্বাস।

৪র্থ দান ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। দেখ্‌তে পাই এক ধর্ম্মের লোক অপর ধর্ম্মের লোককে "যবন", "কাফের", 'ম্লেচ্ছ', 'pagan', 'heathen', 'barbarian' বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ বলে এ সকলেই সেই পরম পিতার সন্তান। ব্রাহ্মেরা যাঁহাদের আচরণে সন্তুষ্ট নন তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্মসমাজ কদাপি ঘৃণা করেন না। এই ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, তাই দেখি জগতে যাঁরা নিগৃহীত, পরপদানত, তাদের জন্য ব্রাহ্মসমাজ চক্ষের জল ফেলে। ব্রাহ্মসমাজের কাছে মুচি মুচি নয়, সেও শুচি। ব্রাহ্মসমাজ তাই বল্‌ছেন, জগতের যত নিগৃহীত ভাই আছ এই প্রেম ধর্ম্মের মধ্যে এস, এখানে সকলেই আশ্রয় পাবে।

পঞ্চম দান সংসারে ও গৃহে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। লোকে বলে সংসারে থেকে ধর্ম্ম হয় না। সুতরাং সংসারে যখন থাকি তখন অধর্ম্মও কর্‌তে পারি; যারা ধর্ম্মকে সার কর্‌বে তারা বনে যাবে। ব্রাহ্মসমাজ বল্‌ছেন এই লোকালয়েই ধর্ম্ম কর্‌তে হবে। এই যে জগৎরূপ বৃহৎ সংসারে চন্দ্র, সূর্য্য, পুষ্প, লতা, বৃক্ষ, জীব নানা দৃশ্য, এই সকলের সৌন্দর্য্য, সৌরভ উপভোগ কর্‌বে না? নারীকে নরক বল্‌বে? না না, ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই গ্রহণ কর্‌বে। সংসারে যদি ধর্ম্ম না হয় তবে পাতকীর ত্রাণ কোথায় হবে? পাপীর কি এ জগতে তবে পরিত্রাণ হবে না? তার কি উদ্ধার হবে না? তার কি গতি হবে না? না, না, ব্রাহ্মসমাজ বল্‌ছেন পাতকীর অবশ্যই ত্রাণ হবে। যে পতিত তারও গতি হবে। পতিতার মধ্যে ঈশ্বর আছেন। তিনি দুঃখীর ঘরে, বিলাসীর ঘরেও অনুতাপের আগুন জ্বালাচ্ছেন। তাই ব্রাহ্মসমাজ বল্‌ছেন সংসারে ধর্ম্মসাধন নিশ্চয় হয়।

৬ষ্ঠ দান—নীতিমূলক ধর্ম্ম। দেখেছি লোকে এই মিথ্যা কথা বল্‌ছে আবার পরক্ষণেই পূজা কর্‌ছে। এদেশে কালীপূজা ক'রে ডাকাতী করার প্রথা আছে; আবার সকল প্রকার পাপ ক'রে, ব্যভিচার ক'রে, যদি একবার কোন রকমে গঙ্গাস্নান করা যায়, বাস্, তবেই সকল পাপের স্খলন হ'য়ে গেল! কি সর্ব্বনাশের কথা দেশে বলা হয়েছে! ব্রাহ্মসমাজ বল্‌ছেন মদও খাবে আর পূজাও করবে, তা কখনও হ'তে পারবে না, ধর্ম্ম তাতে হয় না। সত্য আগে, সত্য মধ্যে, সত্য পরে। লোকে বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিয়ে সংসারে থাকা চলে না। কেন চলে না? ব্রাহ্মসমাজ বল্‌ছেন ধর্ম্ম যদি চাও, তবে সকল প্রকার মিথ্যা ও পাপ পরিত্যাগ কর। ব্রাহ্মেরা তাই Temperance Society, Purity Association প্রভৃতি খুলেছেন, ব্রাহ্মেরা বলেছেন plain living and high thinking চাই, জীবনের যে সমুদয় কার্য্য তোমার চিত্তকে লঘু করে সে সকল পরিত্যাগ কর্‌তে হবে। একজন লোক পূর্ব্বে সরকারী কার্য্যে খুব ঘুস লইতেন। যখন ব্রাহ্মসমাজে এলেন ঘুষ আর নিতে পার্‌লেন না, ঘুষ লওয়া একেবারে পরিত্যাগ কর্‌লেন এবং ঘুষের টাকা দ্বারা অর্জ্জিত ঘর বাড়ী বিষয় সকলই ত্যাগ কর্‌লেন। নীতি-বিহীন হ'য়ে ব্রাহ্মসমাজে কেহ থাক্‌তে পার্‌বেন না। এখন এই নব শতাব্দীতে ব্রাহ্মদের জীবনে এই ছয় দান ভাল ক'রে অভ্যাস কর্‌তে হবে। প্রাণ যায় যাক্, ব্রাহ্মদের এই দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই কার্য্য—এই মহান্ আদর্শকে দৃঢ় ক'রে ধর্‌তেই হবে। আমাদের মহাসাধন আরম্ভ কর্‌তে হবে।

ইন্দ্রিয়ের তাড়না, রিপুর তাড়না, ব্রাহ্মসমাজ হ'তে দূরীভূত কর্‌তে হবে। এই দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাপ, দুর্নীতি, দেশ হ'তে বিতাড়িত কর্‌তে হবে, এই হ'ল রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ। ইহা প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হবে। আত্মার ও বিবেকের বাণী সর্ব্বদা শুন্‌তে হবে। আসুন সকলে মিলে সাধন ক'রে জীবনে তাহা আয়ত্ত করি। দেশ মধ্যে এই মহাসাধন প্রচার করি। ভগবন্ তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

উৎসবের পরে

এবার কলিকাতায় শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান ক'রে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি এবং উৎসাহিত হয়েছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মহান্ ঈশ্বরের মহৎ দান, তা মনে মনে অনুভব করতে চেষ্টা করেছি। যে দেশে জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, দেশভেদ ভাই ভাইকে ঠাঁই ঠাঁই ক'রে রেখেছিল, সেই দেশে ব্রহ্মোৎসবে, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, উড়িষ্যা, বেহার, এই নানা দেশের নানা শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলাগণ পরস্পরকে একই পিতার পুত্রকন্যা, মনে ক'রে একই মন্দিরে মিলিত হ'য়ে সঙ্গীত, ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করেছেন, একস্থানে সকলে একত্র ব'সে আহার ও হৃদয়ের স্নেহপ্রীতির বিনিময় করেছেন। প্রতিদিন পঞ্জাবের পুরুষ ও মহিলাগণ মিলিত হ'য়ে উষাকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

কলিকাতার উৎসবের পরে বোম্বাইর দুজন বন্ধু ধর্ম্মপ্রচারের জন্য জাপানে যাত্রা করেছেন। আর একদল নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার ক'রে বরিশাল এসেছিলেন। আমার বড় সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রিয়বন্ধু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রচারক, বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, বোম্বাইর প্রচারক মিষ্টার সিন্ধে, উৎসাহী রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বরিশালের প্রচারক মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, আচার্য্য সত্যানন্দ দাস প্রভৃতি পরমোৎসাহী ধর্ম্মবন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে উক্ত সহরেও উৎসব সম্ভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

যা হোক, আমরা যে এই উদার, মহৎ ও প্রেমের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েছি, এই নূতন শতাব্দীর আরম্ভে আমাদের সকলেরই গভীর ভাবে এই চিন্তা করা প্রয়োজন যে, কিরূপে এই ধর্ম্মকে রক্ষা করতে, নব নব সত্যে, নব নব সৌন্দর্য্যে, নব নব ভাবে এই ধর্ম্মকে সমুন্নত ক'রে তুলতে এবং দেশে দেশে ইহার বিস্তার করতে পারি। এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হ'লেই, আমাদের সমাজের যে সকল সাধক ও ত্যাগীপুরুষ বীরত্বপূর্ণ চরিত্র, নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ হৃদয় এবং শক্তিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক জীবন লাভ ক'রে ব্রাহ্মধর্ম্মকে গৌরবে মণ্ডিত ক'রে তুলেছিলেন, তাঁদের উচ্চ আদর্শ ও মহৎ কার্য্যের কথাই স্মরণ হয়। আমরা সেই আদর্শ ও কার্য্যের অনুসরণ করতে পারলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার এবং এই ধর্ম্মকে সমুন্নত ক'রে তুলতে পারব।

আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠ ত্যাগী পুরুষদিগের সাধনের এক গূঢ় রহস্যকথাই এই যে, তাঁরা এক তেজোময়, শক্তিসম্পন্ন, জীবন্ত পুরুষের জীবন্ত সাধনা ক'রে, জ্বলন্ত বিশ্বাস, বীরত্বপূর্ণ চরিত্র ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের শক্তি লাভ করেছিলেন। এখন এই বিষয়টি নিয়েই সংক্ষেপে একটুখানি আলোচনা করা যা'ক।

ধর্ম্মসাধনের একটি গভীর তত্ত্বই এই যে, তুমি যে রকম আরাধ্য দেবতার যে রকম প্রকৃতি, গুণ ও স্বরূপের আরাধনা ও ধ্যান করবে এবং তন্মধ্যে তন্ময় হ'য়ে যাবে, তোমার সেই রকম ভাবেরই ধর্ম্ম-জীবন গড়ে উঠবে। ধর্ম্মরাজ্যে একটি বড় সুন্দর কথা প্রচলিত আছে। সে কথাটি এই যে, উপাস্য দেবতার অনুকরণই উপাসকের লক্ষণ। কথাটি যেন লক্ষ কথার এক কথা। মানুষ যখন উপাস্য দেবতার গুণ ও প্রকৃতি চিন্তা করতে করতে তন্মধ্যে তন্ময় হ'য়ে যায়, যখন জীবন্ত ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব করে, যখন তাঁর সঙ্গে আত্মার যোগ হয়, যখন সেই ব্রহ্মের অনুভূতিতে অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠে; তখনই আত্মায় মহান্ ঈশ্বরের গুণ ও প্রকৃতির একটা ছাপ পড়ে, তখনই তাড়িতের শক্তির মতন ব্রহ্মের শক্তি এবং তেজ আত্মায় আসিয়া আত্মাকেও সেই শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন ও সেই তেজে তেজস্বী করিয়া তোলে। মানুষের অনেক দিনের চিন্তা আরাধনা ও ধ্যানে মানবাত্মা যখন ব্রহ্মতেজে তেজোময় ও ব্রহ্ম শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠে, তখনই মানুষের মধ্যে জ্বলন্ত বিশ্বাস, বীরত্বপূর্ণ চরিত্র ও আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা লক্ষিত হ'য়ে থাকে।

সকলেই জানেন, ব্রাহ্মসাধকদিগের অতি প্রিয় একটি উপনিষদের বচন এই—

"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

অর্থ—এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলই জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলই জানিতেছেন, সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

এই তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ সর্ব্বানুভূ শব্দগুলির মধ্য দিয়ে জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্মের তেজ এবং শক্তিই যেন প্রকাশ পাচ্ছে। ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ সাধক ও ত্যাগী পুরুষেরা এই তেজোময় ব্রহ্মেরই সত্তা সাধন ক'রে, এই ব্রহ্মের গুণ ও প্রকৃতির মধ্যে তন্ময় হ'য়েই জ্বলন্ত বিশ্বাস, বীরত্বপূর্ণ চরিত্র ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের শক্তি লাভ করেছিলেন, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? তাহা ছাড়া মনের কল্পিত কোন দেবীমূর্ত্তির রূপ ও যৌবন ধ্যান ক'রে, ধনৈশ্বর্য্য ও যশের কামনা করলে ঐরূপ বিশ্বাস, চরিত্র ও ত্যাগের শক্তি লাভ করবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই আমরা মূর্ত্তি পূজার পক্ষপাতী নই।

সে কথা যাউক। আমি যে জ্বলন্ত বিশ্বাস, বীরত্বপূর্ণ চরিত্র ও ত্যাগের শক্তির বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছি, তার কারণ আছে। ব্রাহ্মসমাজের সাধক ও ত্যাগী পুরুষগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ায়, তাঁদের সম্মুখে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছিল। সেই সংগ্রামের কাহিনী এ দেশের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ইতিহাসে রক্তের অক্ষরেই লেখা থাকবে। আমরা যুদ্ধের কাহিনী শুনবার সময় শুনতে পাই, রণক্ষেত্রে যখন বাজনা বেজে ওঠে, যখন বিপক্ষের লোক গোলাগুলি নিয়ে এসে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হয়, তখন যারা ভীরু, তাদের প্রাণ ভয়ে কেঁপে ওঠে; আর যাঁরা সাহসী বীর, তাঁরা উৎসাহে পূর্ণ হ'য়ে সংগ্রামের মধ্যে ঝম্প দিয়ে পড়েন এবং বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে

২৩শে সেপ্টেম্বর ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রদত্ত উপদেশ অবলম্বনে লিখিত।

জয় লাভ করেন। তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময়ে যখন ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছিল, তখন যাঁদের সাহস ছিল না, তাঁরা সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারেন নাই, ভয় পেয়ে পশ্চাতে প্রচীন সমাজে গিয়েই আত্মবিলোপ করেছেন। কিন্তু যাঁরা জলন্ত বিশ্বাস, বীরত্বপূর্ণ চরিত্র ও আত্মত্যাগের শক্তিলাভ ক'রে সাহসী এবং নির্ভীক হ'তে পেরেছিলেন, তাঁরাই সেই সংগ্রামক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে ব্রাহ্মধর্ম্মকে শক্তিশালী ক'রে তুলেছেন।

ঐ সকল ধর্ম্মবীরদিগের সংগ্রামের কাহিনী স্মরণ করলে আমাদের অত্যন্ত উপকার হবারই সম্ভাবনা; সেই জন্য আজ একটুখানি স্মরণ করা যা'ক। তাঁদের সামনে প্রধানতঃ চারি প্রকারের সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছিল।

প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের ঐ সকল সাহসী সাধক ও ত্যাগী পুরুষদিগের সম্মুখে, সংসারের সঙ্গে ধর্ম্মের, বিষয়াসক্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের এবং যশ মান ও কুলগৌরবের সঙ্গে আত্মত্যাগের ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছিল। আমার মনে হয়, সকলের চেয়ে এই সংগ্রামে জয়লাভ করতেই তাঁদের বলিষ্ঠ আত্মার অনেক শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছিল। এ দেশের নিস্পৃহ তপস্বীগণও এই সংসারের সংগ্রামের ভয়ে ভীত হ'য়ে অরণ্যে গমন ক'রে ব্রহ্মসাধনে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু মহাত্মা রামমোহন রায় তাঁর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন, ধর্ম্ম মানুষের স্বভাবের উল্টাদিকের কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। তাঁর প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম যতই উচ্চ হো'ক না কেন, সংসার থেকেই তার সাধন করতে হবে! নচেৎ সংসারে-বিমুখ অস্বাভাবিক ধর্ম্ম কখনও স্থায়ী ধর্ম্ম হ'তে পারে না। এ দেশে এখন আর উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না কেন? হয় ত তার একটা প্রধান কারণই এই যে, এ দেশের সন্ন্যাসবাদ ঐ ধর্ম্মকে সংসার হ'তে তু'লে অরণ্যে নিয়ে গিয়েছিল। এই সন্ন্যাসবাদ খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আজ ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, যে-সন্ন্যাসবাদ ধর্ম্মকে সংসার হ'তে ছিঁড়ে নিয়ে মানবপ্রকৃতির পক্ষে অস্বাভাবিক ক'রে তোলে, সে-সন্ন্যাসবাদের ধর্ম্ম অধিক দিন টিকে থাকা একরকম অসম্ভব।

কিন্তু আবার অন্য দিকে সংসারে বাস ক'রে ধর্ম্ম সাধন করাও অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। তা করতে হ'লেই পদে পদে দুর্জ্জয় প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে রক্তাক্ত চরণে জীবনের পথে অগ্রসর হ'তে হয়। কে না জানে, ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকে সংসারের সংগ্রামক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার অগ্নিবৃষ্টির মধ্য দিয়াই সাহসের সহিত ধর্ম্মপথে চলতে হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুর পরে, সংসার তাঁর কাছে কি সংগ্রামময় হ'য়ে উঠেছিল, আমরা কি তা ভুলতে পারি? একদিকে পিতৃঋণ ও বিষয়রক্ষা, অন্যদিকে তাঁর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পিতার শ্রাদ্ধ করিবার জন্যে আত্মীয়-স্বজনের সহস্র অনুরোধ; এই উভয়ই নির্দ্দয় শত্রুর মতন তাঁর সম্মুখে সংগ্রামক্ষেত্র তৈরী করেছিল; তিনি যে সেই সময়ে একাকী কি বীরত্বের সহিত সংগ্রামের মধ্যে জয়লাভ করেছিলেন, এ সময়ে আমরা হয় ত তা ধারণাও করতে পারব না। মহাত্মা কেশবচন্দ্র, মনস্বী প্রতাপচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ—এঁদের সকলের সামনেই বিষয়-সুখের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাচীন সমাজের আত্মীয়-স্বজনের আসক্তি, সংগ্রাম ও পরীক্ষার আগ্নেয়গিরি রচনা করেছিল। তাঁরা ধর্ম্ম-বীরের মতন সেই আগ্নেয়গিরির মধ্য দিয়েই চ'লে জলন্ত বিশ্বাস ও বীরত্বপূর্ণ চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন। হায়, বলতে ক্ষোভের উদয় হয় যে, আমরা সংসারের এই বিষয়াসক্তির, এই আত্মীয়-স্বজনের আসক্তির কাছেই সংগ্রামভীরু দুর্ব্বল মানুষের মতন পরাজয় স্বীকার করছি। এই জন্য ধর্ম্মের চেয়ে সংসারই আমাদের পেয়ে বসেছে। তাই আমরা আমাদের ধর্ম্ম-জীবন ও ধর্ম্ম-সমাজ উভয়ই উন্নত ক'রে তুলতে সমর্থ হই না।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের সমাজের সংগ্রামজয়ী পুরুষদিগের সামনে প্রাচীন সমাজ যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল; সত্যের সঙ্গে অসত্যের, উন্নত আদর্শের সঙ্গে কুসংস্কারের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছিল। আমাদের সাহসী পুরুষগণ যে কি রকম শক্তির সহিত বহু দেববাদ, জাতিভেদ, বাল্য বিবাহ, নারীর উন্নতির মস্তকে পাথর চাপাইয়া রাখা ইত্যাদি কুপ্রথাকে অতিক্রম ক'রে, ব্রাহ্মসমাজকে গঠন ক'রে তুল্লেন, তা চিন্তা করলেও বিস্ময়ের উদয় হয়।

তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মসমাজের সাধকদিগের পাপ, দুর্নীতি ও অভ্যস্ত কু-অভ্যাসের সঙ্গে কি কঠোর সংগ্রামই করতে হয়েছিল! সত্যের অনুরোধে এ কথা বলতেই হবে, ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের সময়ে এ দেশের নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হ'য়ে পড়েছিল। তখন অনেক ব্রাহ্মকে পাপ দুর্নীতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে রক্তাক্ত হৃদয়ে জীবনের পথে চলতে হয়েছে। ব্রাহ্মগণ দেশের মধ্যে বিবেক-বাণীর মাহাত্ম্য ঘোষণা ক'রে উন্নত নীতির দ্বারা দেশকে উর্দ্ধ দিকে তু'লে না ধরলে, কে বলবে আজ দেশের অবস্থা কি হ'য়ে দাঁড়াত? এই পাপ ও দুর্নীতির সংগ্রাম আমাদের সামনে যে খুবই কম, তা মনে করলে অত্যন্ত আত্ম-প্রবঞ্চনার মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। এখনো কত সময় আমাদের সামনে এ বিষয়ে অগ্নি-পরীক্ষা উপস্থিত হয়। আমরা যদি আমাদের পবিত্রচরিত্র ব্রাহ্মদিগের দুর্জ্জয় নৈতিক শক্তি ও সাহসের কথা স্মরণ ক'রে, পরীক্ষার অগ্নির মধ্য দিয়াই চলতে না পারি, তবে কিছুতেই আমাদের সমাজকে রক্ষা করতে পারব না।

চতুর্থ, ব্রাহ্মসমাজের ত্যাগীপুরুষদের সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছিল স্বার্থপরতা, সুখাসক্তি ও খ্যাতি প্রতিপত্তির সঙ্গে। হায়, হায়, প্রবল সুখের স্পৃহা ও ভয়ানক স্বার্থপরতা মায়াবিনীর মতন হৃদয়ে যে কি কুহক বিস্তার করে, তা স্মরণ করলেও নিদারুণ দুঃখে ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়তে হয়। এই কুহক হ'তে মুক্ত হ'য়ে, সুখ-স্পৃহা ও স্বার্থপরতাকে চূর্ণ করতে হ'লে, আত্মার কতই বলিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন! এজন্য আত্মাকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকটস্থ ক'রে, তাঁর তেজে তেজস্বী, তাঁর ঐশীশক্তিতে শক্তিশালী করতে না পারলে, কিরূপে প্রবল সুখের বাসনা ও ভয়ানক স্বার্থপরতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা যাবে? আমরা নিশ্চয়ই সন্ন্যাস-বৈরাগ্য মানি নে; কিন্তু স্বার্থকে চূর্ণ করতে হ'লে, প্রবল সুখাসক্তির উপরে উঠতে চাইলে, বৈরাগ্যের যে একান্ত

প্রয়োজন, তাহাও ত অস্বীকার করতে পারি নে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ত্যাগীপুরুষেরা সংসারকে বরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু বৈরাগ্যের প্রতি ত অবহেলা প্রকাশ করেন নাই! তাঁরা স্বাভাবিক বৈরাগ্য অবলম্বন ক'রে এবং আত্মাকে ঈশ্বরের সমীপে নিয়ে, শক্তিলাভ করতে সমর্থ হ'য়ে স্বার্থপরতার সংগ্রামে আশ্চর্য্য ভাবে জয়লাভ করেছিলেন। তাই ত তাঁদের চরিত্রে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা তেজস্বী পুরুষ আচার্য্য শিবনাথের বৈরাগ্য ও ত্যাগের কথা স্মরণ ক'রেই ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্য ব্যাকুল হব।

আমাদের সমাজের শক্তিশালী পুরুষগণ যেরূপ ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'য়ে, অনন্ত বিশ্বাস, বীরত্বপূর্ণ চরিত্র ও ত্যাগের শক্তির সাহায্যে জয়লাভ করেছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজকে সমুন্নত ও শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলেন; আমরা ঠিক্ সেই রকম না পারলেও, ঈশ্বর করুন, যেন তাঁদেরই জীবনের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ ক'রে প্রতিকূল সংগ্রামে অনেক পরিমাণে জয়লাভ করতে পারি এবং বিশ্বাস, বীরত্বপূর্ণ চরিত্র ও ত্যাগের শক্তি লাভ ক'রে, এই নব শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য উৎসাহের সহিত যেন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে সমর্থ হই।

অভিনন্দন

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতৃগণ!

আজ আপনারা বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে শতবার্ষিক ব্রহ্মোৎসব করিতে যাইতেছেন। আপনারা সৌভাগ্যবান্; কেন না, পরিত্রাতা পরমেশ্বর তাঁহার এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্য আপনাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। আপনারা যদি সরল প্রাণে, কেবলমাত্র তাঁহারই গৌরববৃদ্ধির জন্য, এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তবে ইহার দ্বারা নিজ নিজ অন্তরে তাঁহার প্রচুর করুণা নিশ্চয়ই লাভ করিবেন।

শতবার্ষিক মহোৎসব শুধু সহরের কয়েকটি ব্রাহ্মের জন্য নয়। গ্রামে গ্রামে কত সরল ধর্ম্মানুরাগী আত্মা ইচ্ছা সত্ত্বেও সহরে গিয়া উৎসবে যোগ দিতে পারেন নাই, ও পারিবেন না। তাঁহাদের দ্বারে উৎসবকে লইয়া যাওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। শতবার্ষিক মহোৎসবের আয়োজনকারীদের লক্ষ্য এই—যেন সমগ্র ভারতে একটি অনুরাগী আত্মাও ইহার অংশ সম্ভোগে বঞ্চিত না হন। এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতার উৎসবকারীরা কেবল মহানগরীতে উৎসব করিয়া তৃপ্ত না হইয়া, দলে দলে নানা দিকে বাহির হইতেছেন।

বিক্রমপুর পরগণার উৎসাহী ও অনুরাগী ব্রাহ্মগণ এই যে আয়োজনটি করিয়াছেন, ঢাকা জেলার প্রত্যেক পরগণার অধিবাসীরা যদি এরূপ করিতেন, তবেই এই জেলার গ্রামিক উৎসব কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হইত। 'কথঞ্চিৎ' বলিতেছি এই জন্য যে, তাহাতেও কত গ্রাম বাদ পড়িত, এবং কত অগণ্য, অভাবগ্রস্ত দুঃখী নরনারী মহোৎসবের আনন্দ ও আশ্বাসবাণী হইতে বঞ্চিত থাকিতেন!

ঢাকা সহরে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ যে মহোৎসব-কমীটি গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য ঢাকা জেলার গ্রামে গ্রামে উৎসবকে লইয়া যাওয়া। তাঁহাদের লক্ষ্য—যেন এই জেলায় একটি অনুরাগী আত্মাও উৎসব হইতে বঞ্চিত না হন। কিন্তু লোকবল ও অর্থবলের অভাবে তাঁহারা প্রতিমাসে একটি মাত্র গ্রামে দুই একদিনব্যাপী উৎসব করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; নিজেদের অবস্থা বিবেচনায় ইহার অধিক সাহস করিতে পারেন নাই। আপনারা যে অন্ততঃ একটি পরগণায় এই একমাসব্যাপী উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। তাই উক্ত কমীটির পক্ষ হইতে আমরা আজ আপনাদিগকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবার জন্য ঢাকা হইতে এ স্থানে আসিয়াছি। তাঁহারা যাহা পারেন নাই, আপনারা তাহা করিতে যাইতেছেন। উৎসাহ, অনুরাগ ও প্রাণের সরলতায় আপনাদিগকে যোগ্যতর জানিয়াই পরমেশ্বর আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃগণ! আপনাদের এই কার্য্য অতি মহৎ। ইহাকে আপনারা ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে দেখিবেন না। আপনাদের এই একমাসব্যাপী উৎসব পবিত্র ধূপশিখার ন্যায় জগৎপিতার চরণাভিমুখে উত্থিত হইবে, এবং চারিদিককে ধর্ম্মের সৌরভে পবিত্র করিবে। আহা! যদি পরগণায় পরগণায়, জেলায় জেলায়—ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ সৌরভ উত্থিত হইত, তবেই শতবার্ষিক ব্রহ্মোৎসব সুসম্পন্ন মনে করা যাইত। যাহা হউক, আপনাদের দ্বারা বিধাতা যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, তাঁহার ইচ্ছা হইলে, এখনও সেই দৃষ্টান্ত নানা স্থানে অনুসৃত হইতে পারে।

আবার বলি, আপনারা এই কার্য্যকে ক্ষুদ্র মনে করিবেন না। অভিসন্ধির ক্ষুদ্রতাতেই কার্য্য ক্ষুদ্র হয়; অপর কিছুতে হয় না। আপনারা যদি বিশ্বরাজ পরমেশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়া, তাঁহার গৌরবের জন্য এই উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে ইহা সামান্য কার্য্য নহে। ইহা মানুষের ইতিহাসে লিখিত না হইলেও জগৎপিতার অক্ষয় ইতিহাসে লিখিত থাকিবে।

পরিত্রাতা পরমেশ্বর সামান্য আয়োজন হইতে মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কে বলিতে পারে, আপনারা তাঁহার নামরূপ যে অক্ষয় বীজ গ্রামে গ্রামে ছড়াইবেন, তাহা কোনও কোনও অনুকূল ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া কালে ফলবান বৃক্ষে পরিণত না হইবে? কে বলিতে পারে, আপনাদের এই কার্য্যের ফলে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর হইতে অচিরে দুই চারি জন ঋষি মুনি উত্থিত হইয়া ভারতে নব জাগরণ না আনিবেন? আপনারা ত জানেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিরূপে মহর্ষি হইয়াছিলেন! রাজা রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ঈশোপনিষদের একখানা ছিন্ন পত্রই কি তাঁহার মূল নহে? ঐ ছিন্ন পত্র দেবেন্দ্রনাথকে উপনিষদের সহিত পরিচিত না করিলে, এবং ইহা হইতে আশা পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের [illegible]

শতবার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে গমনোন্মুখ প্রচারযাত্রীদলকে ঢাকা শতবার্ষিক মহোৎসব কমীটির সম্পাদকদ্বয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

না হইলে কি তিনি মহর্ষি হইতে পারিতেন? রামমোহন যখন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতভূমিতে উপনিষৎ প্রচার আরম্ভ করেন, তখন কেই বা তাহা বুঝিত এবং কেই বা তাহার আদর করিত। তথাপি তিনি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা প্রচারের জন্য, বাঙ্গালা, ইংরাজী, উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় উপনিষৎ-সমূহের অনুবাদ করিয়া নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিলেন, এবং দেখিতে অনিচ্ছুক, পড়িতে অনিচ্ছুক, শুনিতে অনিচ্ছুক, দেশবাসীদের নিকট বিনামূল্যে সেগুলি বিতরণ করিতে লাগিলেন। কি আশায় তিনি এ সকল করিয়াছিলেন? তাঁহার একমাত্র ভরসা ছিল—সত্যের অমোঘ প্রভাবে। তিনি ফলাফল বিধাতার হস্তে রাখিয়া, তাঁহার প্রেরণায় চলিয়াছিলেন। যেদিন তিনি তাঁহার নব-প্রকাশিত ঈশোপনিষদের এক খণ্ড বন্ধু দ্বারকানাথের হস্তে দিয়াছিলেন, সেদিন কি তিনি জানিতেন ঐ পুস্তকখানাই ন্যূনাধিক বাইশ বৎসর পরে জীর্ণ ও ছিন্ন হইয়া তাহার একটিমাত্র পত্রের দ্বারা একটি যুবককে মহর্ষি করিয়া তুলিবে? সে দিন কি তিনি জানিতেন, তাঁহার ধনী বন্ধুর বিলাসময় উর্বর ভূমিতেই ব্রহ্মভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, কালে ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া উঠিবে? রামমোহন জানিতেন না; কিন্তু জগতের ধর্ম্মবিধাতা জানিতেন। তিনিই সময়ে সুফল প্রসব করিবার জন্য দ্বারকানাথের গৃহে ঐ পুস্তক খানাকে এতকাল রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং যথা সময়ে ইহার সাহায্যে দেবেন্দ্রনাথকে মহর্ষিত্ব দান করিয়া তাঁহার দ্বারা রামমোহনের প্রারব্ধ কার্য্যকে ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের নিকট অগ্রসর করিয়া দিলেন! দেখুন, রামমোহনের দেশময় পুস্তকবিতরণ কোন্ দিকে কি ভাবে সফল হইল!

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তারের ইতিহাসে এইরূপে আশ্চর্য্য ঘটনা অনেক আছে। (১) একখানা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়া কোনও সুদূর পল্লীগ্রামে এক ব্যক্তির গৃহে ভগ্ন টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল; তাহাই পড়িয়া একটি প্রতিবেশী বালকের আত্মা ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। (২) একখানা প্রার্থনা-পুস্তক কোনও সূত্রে একটি গ্রাম্য বালিকার হস্তে পড়িয়াছিল; তাহা পাঠ করিয়া সেই বালিকা মনে মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল; এবং ঈশ্বরচরণে কাতর প্রার্থনাদ্বারা অনুকূল পতিলাভ করিয়া ক্রমে সাধনরাজ্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিল! (৩) কোনও ভক্তের এক দিনের উপাসনাকালীন স্বর্গীয় মুখচ্ছবি একটি শিশুর প্রাণে এমন মুদ্রিত হইয়া গেল, যে, তাহাই তাহাকে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনে নিযুক্ত করিয়া, চির জীবন সে পথে সহায়তা করিল! এইরূপ অগণ্য ঘটনা কি আপনারা শ্রবণ করেন নাই? হাওয়ায় যেমন শিমূল গাছের উচ্চ শাখা হইতে তুলার বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া সেই গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, পাখী যেমন ভুক্ত ফলের আঁটি দেশান্তরে নিক্ষেপ করিয়া উদ্ভিদ্রাজির বিস্তার করে, ব্রাহ্মধর্ম্ম শতবৎসর ধরিয়া তেমনি ভাবে বিস্তৃত হইতেছে। এই ধর্ম্মের লক্ষ্য যে জগৎপতি পরমেশ্বর, তিনি যেন এক হৃদয়ে বাঁকিয়া সত্যের কণাকণ ছড়াইতেছেন, এবং নিকটে বা দূরে অপর হৃদয়ে থাকিয়া সেগুলি লুফিয়া লইতেছেন! অতএব, [illegible]

নৈরাশ্য, শিথিলতা ও ক্ষুদ্রদৃষ্টি এই ধর্ম্মের আশ্রিতদের সাজে না। এ সকল হীন ভাব তখনই আসে, যখন আমরা তাঁহার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিজেদের প্রতি দৃষ্টি করি।

ভ্রাতৃগণ! আমরা নিজ নিজ অযোগ্যতার কথা ভাবিব না; জানি, আমাদের অতীত জীবনে, এমন কি বর্ত্তমান জীবনেও, অন্ধকারের অংশই অধিক; আলোক অল্প। তথাপি আলোককে জ্বালিয়া রাখিতে হইবে। ইহাই আমাদের জীবনের কাজ। ঘরে রাশি রাশি অন্ধকার আছে বলিয়া যে ব্যক্তি আলোক জ্বালিতে লজ্জিত হয়, তার মত নির্ব্বোধ আর কে? আলোক জ্বালা ভিন্ন অন্ধকার নিরসনের অন্য উপায় কি আছে?

আমরা অনেকেই সারা জীবন ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোককে শিরে ধারণ করিয়া চলি নাই। আমরা লজ্জায়, সঙ্কোচে, এই আলোককে লুকাইয়া রাখিয়াছি; সুখাসক্তিতে ইহাকে ম্লান করিয়াছি। কিন্তু এই আলোকের জন্য বিশ্বরাজের চরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই আমরা শতবার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ করিয়াছি। অতএব, মহোৎসবের দেড় বৎসর কাল আমাদিগকে বিশেষ ভাবে এই আলোক শিরে ধরিতে হইবে। নিজ নিজ জীবনে যদি এই আলোককে উজ্জ্বল করিয়া না ধরি, তবে ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সার্থকতা কোথায়? সহস্র ব্রাহ্মজীবনে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক সত্য সত্য জ্বলিয়া উঠে, তবে তদ্দ্বারাই শতবার্ষিক মহোৎসব যথার্থভাবে সম্পন্ন হইবে।

বিক্রমপুরের এই উৎসব ভারতব্যাপী মহোৎসবেরই এক অংশ। এই উৎসব সফল হউক, আমাদের এই কামনা। যে করুণাময় পরমেশ্বর আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি অনুক্ষণ আপনাদের হৃদয়ে বাস করুন। আপনারা যেন চিন্তায় বাক্যে ও কার্য্যে তাঁহাকেই দেখাইয়া আসিতে পারেন; গ্রামবাসিগণ যেন আপনাদের জীবনে তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার পথের পথিক হইতে পারেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি। ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্

শতবার্ষিক উৎসব সঙ্গীত।

গদ্‌ভাঙ্গা সুর।
তাল—ঝুলন।

আছেন আলোক বাতাস আকাশ-মাঝে ব্রহ্মসনাতন।
অন্তর্য্যামী অন্তরাত্মা জীবের জীবন।

(তাঁরে ভাব ওরে মন, ভজ ওরে মন, পূজ ওরে মন)
কিছুই ছিল না যেথা, কি বিশাল বিশ্ব সেথা!
ইচ্ছাতে যাঁহার এই বিচিত্র সৃজন!
(তাঁরে ভাব ওরে মন, ভজ ওরে মন, পূজ ওরে মন।)
উষার সুন্দর ভালে, সন্ধ্যার তারকা-জালে,
সে জ্যোতির জ্যোতিঃ দিয়ে খেলিছে কিরণ!
(তাঁরে ভাব ওরে মন, ভজ ওরে মন, পূজ ওরে মন)
যত বর্ণ গন্ধ শোভা, সুন্দর যা মনোলোভা,
সবার মূলে, ফুলে ফলে, (এক) ভুবনমোহন!

(তাঁরে ভাব ওরে মন, ভজ ওরে মন, পুজ ওরে মন)
এক যে তিনি বহুর মাঝে, জ্ঞানে ধ্যানে কর্ম্ম-সাজে।
অরূপ রূপের প্রকাশ দেখ কি বা অনুপম!
(তাঁরে ভাব ওরে মন, ভজ ওরে মন, পুজ ওরে মন)
নয় শুধু ঋষি-আরাধ্য, সর্ব্বগত সর্ব্বসাধ্য,
পিতা মাতা গুরু হ'য়ে প্রাণে অনুক্ষণ।
(তাঁরে ভাব ওরে মন, ভজ ওরে মন, পুজ ওরে মন)
যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি ধ্রুবম্,
লভ সে পরমানন্দে ঘুচিবে বন্ধন!
(তাঁরে ভাব ওরে মন, ভজ ওরে মন, পুজ ওরে মন।)

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৩রা অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে প্রবীণ ব্রাহ্ম রাজচন্দ্র চৌধুরী ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল নানা ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের কর্ম্মিগণ একে একে অনেকেই চির বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। বিগত ১৩ই অক্টোবর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ শাস্ত্র পাঠ, দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান প্রফুল্লচন্দ্র জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা, চতুর্থকন্যা কুমারী শান্তা চৌধুরী স্মৃতিতর্পণ পাঠ ও প্রার্থনা এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য একটি কবিতা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে পত্নী ও পুত্র কন্যাগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে ৫০০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫০০৲ সিটিকলেজে ২০০৲, পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজে ১০০৲, এবং তাঁহার স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ে একটি প্রতিকৃতি রক্ষা ও বার্ষিক পুরস্কারবিতরণের জন্য ৩০০৲, প্রদান করিয়াছেন।

বিগত ৭ই অক্টোবর পরলোকগত দিলীপকুমার দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য, খুল্লতাত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দত্ত জীবনী পাঠ, এবং মাতা ও পিতা প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে পিতা মাতা তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি স্থায়ী ভাণ্ডারের জন্য ৫০০৲ প্রদান করিবেন। রোগশয্যায় মাতার সহিত দিলীপকুমারের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার বিবরণ শুনিয়া উপস্থিত সকলে বিশেষ মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়াছিলেন।

কিছুদিন হইল আমেদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মিঃ রেভাশঙ্কর ভাট ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সমাজের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়-স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে স্বর্গীয় এইচ্. বসুর বাড়ীতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভা আহূত হয়। ডাঃ বি রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং কুমারী লাবণ্যবালা ঘোষ, এম এ, বি টি, রায় গোপীকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, বাবু রসরঞ্জন সেন এবং মিঃ জি এন মুখার্জি প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। ঐ দিন প্রাতে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়, ডাঃ বি রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। বাবু কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস উপাসনার কাজ করেন।

কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজ—সম্পাদক রাধারমণ সাহা লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মসমাজের অশীতিতম সাম্বৎসরিক উৎসব আগামী ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার আরম্ভ হইয়া ২৮শে অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইবে। ভক্তদল মহোৎসবে যোগদান করিলে আমরা সুখী হইব।"

দান—শ্রীমতী সরোজিনী সরকার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হীরেন্দ্রনাথের ইম্পিরিয়াল পুলিশ সার্ভিসে প্রবেশ উপলক্ষে ১০০৲, টাকার দান যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি তিনি নিম্নলিখিত বিভাগে উক্ত টাকা প্রদান করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৫৲, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ ১৫৲, কুষ্টীয়া ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, রাঁচি ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার ১৫৲, হাজারীবাগ খৃষ্টীয় অনাথাশ্রম ৫৲, রাঁচি অন্ধ বিদ্যালয় ৫৲, হিন্দুমিশন ৫৲, নারীশিক্ষা সমিতি ৫৲, দরিদ্রদিগকে ভোজন করান ১২৲, মোট ১০০৲ টাকা। এ দান সার্থক হউক।

জাতকর্ম্ম—বিগত ২৬শে সেপ্টেম্বর দার্জ্জিলিং এ শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ রায়ের প্রথমা কন্যার জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতামহী ও মাতামহী প্রত্যেকে দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজে ১৲ দান করিয়াছেন।

ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণের আগমন—শতবার্ষিক উৎসবে ইংলণ্ডস্থিত একেশ্বরবাদী ভ্রাতৃগণের প্রতিনিধিরূপে ডাক্তার ও মিসেস ড্রমণ্ড, মিঃ ও মিসেস এফ ডবলিউ মক্স, মিসেস উডহাউস, কুমারী নেটলফণ্ড ও কুমারী মক্স বিগত ১০ই অক্টোবর কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, শতবার্ষিক মহোৎসব কমিটীর সম্পাদক ও অন্যান্য অনেকে (মহিলাদেরও কেহ কেহ) তাঁহাদিগকে ষ্টীমার-ঘাটে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহাদের ১১ই তারিখে পৌঁছিবার কথা ছিল, হঠাৎ ১০ই তারিখে তাঁহারা পৌঁছেন। তাই সংবাদ না পাওয়াতে আরও অনেকে যাইতে পারেন নাই। ১২ই তারিখে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সিটিকলেজ হলে একটি সান্ধ্য সমিতি হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার প্রার্থনা করিলে পর, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে

তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন ও ব্রাহ্মসমাজের ও একেশ্বরবাদী সমাজের কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলেন। ডাক্তার ভ্রমণ্ড তাঁহার উত্তরে একসূত্রে কার্য্য করা সম্বন্ধে কিছু বলেন। তাঁহারা সেই রাত্রিতেই দার্জ্জিলিং চলিয়া গিয়াছেন।

কক্সবাজারে শতবার্ষিক মহোৎসব—ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রচারযাত্রীদল গত ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কক্সবাজারে উপস্থিত হন। স্থানীয় বালক বৃদ্ধের সঙ্কীর্ত্তনের দল পতাকা হস্তে গাহিতে গাহিতে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন। দুইদলে মিশিয়া অপূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তিতে দ্রবীভূত হ'য়ে এক জমাট ভাব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সুসজ্জিত ব্রহ্মমন্দিরে সকলে গমন করেন। প্রার্থনার পর যাত্রীদল সমুদ্র সৈকতে বাংলায় বিশ্রামার্থ গমন করেন। ক্ষণিক বিশ্রামের পর মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সিন্হে আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া সরল হিন্দিতে উপাসনা করেন। তিনি ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন তাঁহাদের প্রার্থনায় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ-বার্ষিকী স্মৃতি উপাসকদের হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া দেন। তৎপর দিন ভোরে প্রচারযাত্রীদল ও স্থানীয় কীর্ত্তনকারিগণ মিলিয়া উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ করেন। পরে স্থানীয় লাইব্রেরী হলে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। সহরের অনেক ভদ্র লোক ও বিদ্যালয়ের ছাত্র উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় লাইব্রেরী হলে উপাসনা হয়। আচার্য্য মিষ্টার সিন্হে। হিন্দিতে উপাসনা করিয়া ইংরাজীতে উপদেশ দেন। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনালোক ধরিয়া এই উপদেশ দেন। সোমবার প্রাতে সাগর-তীরস্থিত পাহাড়ের উপর উপাসনা হওয়ার কথা ছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া তাহা হইতে পারে না, ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক আচার্য্যের কার্য্য করেন। সোমবার অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সিন্হে ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন স্থানীয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত সিন্হে ইংরাজীতে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রমেশ বাবু বাংলাতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পূজা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। সন্ধ্যায় সম্পাদকের বাড়ীতে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। অনেক ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক উহাতে যোগদান করেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ। অনন্তর লাইব্রেরী হলে শ্রীযুক্ত সিন্হে "ব্রাহ্মসমাজের সংবাদ ও সংবাদবাহক" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সব্‌ডিভিসানল অফিসার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি ছিলেন। তিনি তিনটি সংবাদ প্রচার করেন—(১) (Individual freedom) প্রত্যেক লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—ইহা তার জন্মগত অধিকার; (২) (mutual fellowship) পারস্পরিক সহযোগ ও সাহায্য—যাতে পরিবার ও সমাজ গঠিত হয়, কিন্তু কাহারও ব্যক্তিত্বের খর্ব্ব হয় না; (৩) universal brotherho.d বা বিশ্ব প্রেম—জাতিধর্ম্ম সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যাতে ধর্ম্মের সমন্বয় ও সার্ব্ব-ভৌমিকতা সংঘটিত হয়। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সংবাদবাহক তিন মহাপুরুষের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের অনেক সদাশয় ব্যক্তি যে ব্রাহ্মসমাজের বাণী প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বলেন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত ছাত্রসমাজ সম্পর্কে একদিন বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভায় বক্তৃতা, একদিন রামতনু লাহিড়ী স্মৃতিসভার ও একদিন আনন্দমোহন বসু স্মৃতিসভায় সভাপতির কার্য্য এবং ভাদ্রোৎসবে উপাসনা, বক্তৃতা ও সঙ্গীত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য ও সঙ্গীত এবং কয়েকটি পরিবারে সাপ্তাহিক উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ভাদ্রোৎসবের পর হইতে নূতন ভাবে সঙ্গত সভা পরিচালন করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ময়মনসিংহে শতবার্ষিক উৎসব—ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে ৩রা ভাদ্র সন্ধ্যায় ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "ভারতের কোন্ পুনর্জ্জীবনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ৪ঠা ভাদ্র প্রাতে মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর স্মরণার্থে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত উপাসনার কার্য্য করেন এবং আনন্দমোহনের জীবনে "পার্থিব ও অপার্থিবের অপূর্ব্ব সমন্বয়" বিষয়ে উপদেশ বিবৃত করেন। ৫ই ভাদ্র সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে মনোরঞ্জন বাবু উপাসনা করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের সর্ব্বতোমুখীনতা ও মানবজীবনের বিভিন্ন অবস্থায় ইহার উপ-যোগিতা বিষয়ে উপদেশ দেন। ৬ই ভাদ্র ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতের ও সন্ধ্যার উপাসনায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে "জাতীয় জীবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব" ও "ব্রাহ্মসমাজের সাধনমন্ত্র" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। পরদিন সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে মনোরঞ্জন বাবু "ব্রাহ্মসমাজের বাণী" বিষয়ে বক্তৃতায় বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক রাজর্ষি রামমোহন রায়ের প্রচারিত মহান্ আদর্শ ও তাঁহার অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্য্যা-বলীর ব্যাখ্যা করিয়া প্রদর্শন করেন যে, ভারতীয় ও সভ্যজগতের অন্যান্য জাতিসমূহের নূতন বিস্তৃত জীবনের কঠিন সমস্যাবলীর সমাধানের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে একমাত্র ব্রাহ্মসমাজই সমর্থ।

রাজসাহী ব্রাহ্মসমাজে শততম ভাদ্রোৎসব নিম্নলিখিত-রূপে সম্পন্ন হইয়াছে:—৬ই ভাদ্র সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। ৭ই ভাদ্র সন্ধ্যায় মন্দিরে মহিলা সম্মিলন হয়, শ্রীযুক্তা শারদামঞ্জরী দত্ত উপাসনা করেন।

বরিশালে শত-বার্ষিক উৎসব।—ভগবানের আশীর্ব্বাদ এবং ব্রাহ্মবন্ধুগণের আপ্রাণ চেষ্টায় উৎসব অতীব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই পর্য্যন্ত চারি দিবসের কার্য্য-তালিকা পূর্ব্বেই সহরে বিতরিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ভি আর সিণ্ডে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আরো ৫।৬ জন গায়ক বাদক ও কর্ম্মী যুবক বরিশালে বিভিন্ন দিনে আগমন করেন। এই সঙ্গে বরিশালের শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষও নানা স্থানে উৎসব করিয়া ইহাদের সঙ্গে নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হন। নবাগত অতিথিদের জন্য বগুড়া পল্লীতে স্বতন্ত্র একটী বাড়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

চারি দিবসের উৎসবে ব্রহ্মমন্দিরে লোক ধরে নাই, সমস্ত সহরে উৎসবের একটা সাড়া পড়িয়াছিল। উৎসবে উষাকীর্ত্তন, বক্তৃতা, আলোচনা, উপাসনা, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির উদ্দীপনায়, গভীরতায়, এবং মধুরতায় সকলেরই আনন্দ হইয়াছিল। সংক্ষেপে উৎসবের বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

১৫ই সেপ্টেম্বর সায়ংকালে অভ্যর্থনাসভায় সঙ্গীতান্তে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রার্থনান্তে সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণ ব্যপদেশে একটা বক্তৃতা করিয়া একে একে বিদেশাগত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সকলকে অভ্যর্থনা করেন এবং শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বরিশালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া সমাগত জনমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা-সূচক লিখিত উক্তি পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস নবাগত অতিথিবর্গকে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত ইতিহাস-পুস্তিকা উপহার প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রত্যুত্তরে বরিশালের বিশেষত্ব এবং ব্রাহ্ম-

সমাজের কার্য্য ফুরায় নাই, এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিলে, সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপাদি হইয়া এদিনের উৎসব শেষ হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতে নগরে উষাকীর্ত্তনান্তে মন্দিরে উপাসনা হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, উপদেশের বিষয় "ভগবৎ সান্নিধ্যের বিচিত্র প্রকাশ"। উপাসনান্তে আলোচনা-সভায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য করেন। আলোচ্য বিষয়—ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনা। প্রথমে সভাপতি এই বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য ব্যক্ত করিলে একে একে, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজ নিজ মত ও ভাব ব্যক্ত করেন। সভাপতির মন্তব্য অন্তে ১১টার পরে সভার কার্য্য শেষ হয়। সায়ংকালে জমাট কীর্ত্তন এবং নবরচিত উৎসব-সঙ্গীত গীত হইলে উপাসনা হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। উপদেশের বিষয়—"ভারতে রাজা রামমোহনের মহৎ আদর্শের কল্পনা এবং কর্ত্তব্য।" ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে নগরে নবরচিত উষাকীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্য। উপদেশের বিষয়—"ধর্ম্ম-সমাজে প্রেমের সাধন এবং ত্যাগস্বীকার।" সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল "ভারতে ব্রাহ্মসমাজের স্থান" বিষয়ে এক পাণ্ডিত্য ও চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। অপরাহ্নে মহিলাগণের সম্মিলনে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। উপদেশের বিষয়—আদর্শ পরিবার গঠন। ১৮ই সেপ্টেম্বর মন্দিরে উষাকীর্ত্তন হইলে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ভি আর সিণ্ডে ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন এবং ধম্মপদের শ্লোক অবলম্বনে উপদেশ দেন। উপাসনান্তে "ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী সমস্যা" বিষয়ে আলোচনা-সভা হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। একে একে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, ভি আর সিণ্ডে, এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস নিজ নিজ মন্তব্যচ্ছলে বক্তৃতা করেন। সভাপতির সারগর্ভ মন্তব্য-সূচক বক্তৃতান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। অপরাহ্নে যাত্রিনিবাসে একটি প্রীতিসম্মিলনে, আলাপ পরিচয় ও প্রীতি-জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় সঙ্গীতান্তে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে মিঃ ভি আর সিণ্ডে এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করিলে উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি প্রারম্ভে কয়েকটী কথা বলিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত রামমোহন রায় শীর্ষক অংশ জীবনচরিত হইতে পাঠ করেন। তৎপরে একে একে বাবু শ্রীচরণ সেন, বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর গনেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, সৈয়দ আব্বার রব চৌধুরী, Rev J. D. Raw এবং বাবু সত্যানন্দ দাস রাজার জীবনের বিভিন্ন দিক অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করেন। সভাপতির দুই একটী কথা হইলে পর ৯½ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিগত ২৭শে শ্রাবণ সায়ংকালে সর্ব্বানন্দ ভবনে ব্রাহ্মবন্ধু সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক সঙ্গীত প্রার্থনা করিলে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, সাধু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনচরিত হইতে পাঠ করেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি** (বঙ্গানুবাদ সহ) ঢাকা, ৩৫ নং বিধানপল্লী হইতে শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪৲, পূর্ব্বে নাম ও ঠিকানা জানাইয়া গ্রাহক হইলে মূল্য ৩৲। শুধু উপক্রমণিকা ও দ্বাদশ অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ-সহ নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া মহিম বাবু একটি মহৎ কার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। গীতার শ্লোকগুলির অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত পদ্যানুবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং উহা যে অতি সুন্দরই হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। ভাগবতের শ্লোকগুলির যে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও যতটা প্রকাশিত হইয়াছে সরল ও বিশদই হইয়াছে। আশাকরি শীঘ্রই সমগ্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবে। ইহা দ্বারা যে ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিমাত্রই বিশেষ উপকৃত হইবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

২। Works of Raja Rammohon R y vol 1. published by Babu H. C. Sarker, Secretary, Brahmo-samaj Centenary Committee. মূল্য ৩৲। রাজার ইংরাজী ও বাঙ্গলা গ্রন্থাবলীর কয়েক সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও তাহা সকলই নিঃশেষিত হইয়াছে। তাই শতবার্ষিকী কমিটী এই সংস্করণ বাহির করিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন। এই খণ্ডে ২১ খানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক। খৃষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ক ও রাজনৈতিক গ্রন্থাদি ও নূতন যে সকল পুস্তক আবিষ্কার হইয়াছে তাহা পরে পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। ইহা সুন্দর কাগজে সুন্দর ভাবে ছাপান ও বাঁধান হইয়াছে। এই অমূল্য গ্রন্থ যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা সকলেরই ভাল করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৩। **রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী** ১ম খণ্ড—ইহাও শতবার্ষিক কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১॥০। ইহাতে বেদান্ত গ্রন্থ প্রভৃতি ৫ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অপর গ্রন্থগুলি পরে পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। ইহারও কাগজ এবং বাঁধান সুন্দর হইয়াছে। বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীরও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কমিটী এই সংস্করণ প্রকাশ করিয়া অতি ভাল কাজ করিয়াছেন। ইহাও সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। রাজার অমূল্য গ্রন্থাবলী সকলের ভাল করিয়া পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৪। Brahmo Dharma of maharshi Devendra-nath Tagore (Translated into English by Hem-chandra Sarker, মূল্য ৩৲। ইহাও শতবার্ষিক কমিটির সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সুন্দর কাগজে সুন্দরভাবে ছাপান ও বাঁধান। এই অমূল্য গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া হেম বাবু বাঙ্গালা ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উপনিষদগুলির কোন্ স্থান হইতে কোন্ বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়া একত্র সংযোজিত হইয়াছে এবং তাহাদ্বারায় উপনিষদ্ বাক্যাবলীর যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, উচ্চতর সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, মন্তব্যে তাহা প্রদর্শন করাতে বাক্যগুলির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণের বিশেষ সাহায্য হইবে। ইহা হইতে বাঙ্গালী পাঠকগণও বিশেষ উপকার লাভ করিবেন। "এষাস্য পরমাগতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের মন্তব্যে আরও স্পষ্টভাবে দেখাইলে ভাল হইত যে, যাজ্ঞবল্ক্য স্বপ্নাবস্থার প্রতিই উহা প্রয়োগ করিয়াছেন, খুব উচ্চ প্রত্যক্ষ যোগের কথা বলেন নাই। তেমনি উপনিষদ্ যে "অমৃত" বলিতে বার বার জন্ম গ্রহণ হইতে মুক্তিলাভ ভিন্ন কোনও উচ্চতর কিছু বুঝেন নাই, আমাদের প্রার্থনা-মন্ত্ররূপে গৃহীত "অসতো মা সদ্গময়, মৃত্যোর্মা মৃতংগময়" ইত্যাদি বাক্যের যে ব্যাখ্যা উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে কত ভিন্ন ও উচ্চতর অর্থে উহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে, সে কথাটাও পরিষ্কার করিয়া দেখাইলে ভাল হইত। এরূপ সামান্য দুই একটু উন্নতিসাধনের স্থান থাকিলেও তাহাতে পুস্তকখানার গৌরব ক্ষুন্ন হয় নাই। আমরা আশা করি ইহা সর্ব্বত্র সমাদৃত ও বহুলভাবে প্রচারিত হইবে। এরূপ একটি বাঙ্গলা সংস্করণেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালী পাঠকগণকেও আমরা ইহার সাহায্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ১৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹
১৩শ সংখ্যা। 2nd November, 1928. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

প্রভু, তুমি কেমন সুন্দর ক'রে এই জগৎ রচনা করেছ, কত সৌন্দর্য্য ঢেলে দিয়েছ; নিজে তুলিকা দিয়ে কত বর্ণে চিত্রিত করেছ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ভিতর দিয়া কত ভাবে তুমি [illegible]কে প্রকাশ কর্চ্ছো। তোমাকে জানবার জন্য যেমন বাহিরে সুন্দর জগৎ দিয়েছ, অন্তরে জ্ঞান প্রেম পুণ্য ভাব ফুটিয়ে তুলিতেছ। হে আমাদের প্রভু, হে জীবন দেবতা, তোমাকে অন্তরে ও বাহিরে দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি। বাহিরে দেখি তোমার অপার সৌন্দর্য্য; যে দিকে তাকাই তোমারই হাতের লেখা সব রয়েছে উজ্জ্বল অক্ষরে, তোমারই চিহ্ন সকল, তোমারই নিদর্শন সকল রয়েছে কেমন বিচিত্র ভাবে। আর অন্তরে দেখি, হৃদয় নাথ, জীবন স্বামী, জীবনের, দুঃখে ও সুখে তোমার করুণার লীলা, প্রেমের খেলা চল্‌ছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন, মলিন জীবন, ইহার একটি ঘটনাও বৃথা নয়; একটু হাসি, একটু কান্না, একটু সুখ দুঃখ সবই তোমার করুণায় পরিপ্লুত প্রেমের নিদর্শন। ওগো, জীবন দেবতা, তোমার মহিমা, তোমার লীলা দেখে আমরা অবাক্ হই, তোমার চরণে পড়ে থাকি, তোমার দাস হয়ে থাকি; তুমি থাক জীবনের প্রভু হয়ে, আমরা তোমারই প্রেমে ডুবে, দাস হয়ে থাকি।

নিবেদন।

দুর্গম পথে—যাহা চাই তাহার অন্বেষণে ছুটতে হবে; পথ দীর্ঘ ও দুর্গম; পথে চল্‌তে কত কাঁটা পায়ে ফোটে; কত পাহাড় জঙ্গল হ্রদ নদী পার হ'তে হয়; কত প্রলোভন এড়িয়ে চল্‌তে হয়; তবুও চল্‌তে হবে, প্রাণপণে সন্ধান কর্‌তে হবে। তা না পেলে যে চলে না! লোকে ত এই ভাবেই অভীপ্সিত জিনিষের সন্ধানে ছোটে। তুমি তোমার প্রিয়তমকে চাও? তাঁর সন্ধানে ছুটে কি ক্লান্তি এসেছে? প্রিয়তমের সন্ধানেত কেহ কষ্টকে কষ্ট মনে করেনা। প্রিয়তম যিনি, তাঁর সন্ধানত জীবনব্যাপী; যত পাবে, আরও পেতে ইচ্ছা হবে, আরও তাঁর সঙ্গের জন্য ব্যাকুল হবে। তাঁর সন্ধানে চল; দীর্ঘ পথ, দুর্গম পথ, কণ্টকাকীর্ণ পথ, কত চড়াই উৎড়াই; ভয় কি? দুঃখ কি? তাঁকে না পেলে যে চলেনা। তাঁর জন্য দুঃখ সহতেও যে কত সুখ। তিনি কত বোঝা ঘাড়ে চাপান, কত বেদনা প্রাণে দেন; সব সইতে হবে। বোঝা বহনে, দুঃখ সহনেই যে আনন্দ। এর ভিতরে তাঁরই যে স্পর্শ পাওয়া যায়। তাই আনন্দময় দেবতার, প্রাণের প্রিয়তম বন্ধুর সন্ধানে দীর্ঘ দুর্গম পথে আনন্দে চল্‌তে হবে।

তবুও প'ড়ে আছি—এত দীর্ঘ জীবন পথে কত সংগ্রাম ও পরীক্ষা এল; কত দুঃখ বেদনা এল; তবুও নাথ, তোমারই চরণে প'ড়ে আছি। জীবনের উষাকালে তুমি ডেকে ছিলে; সেই ডাক শু'নে সব ছেড়ে ছুটে এলাম। তুমিই হাত ধ'রে আন্‌লে। আবার অন্ধকার এল; তুমিই নিরাশায় আশা দিলে। আজ জীবনের সন্ধ্যা হয়ে এল; এখনও সংগ্রাম চল্‌ছে। কিন্তু তোমার করুণা পেয়েছি। এই দীর্ঘ জীবনে কত ঘর বাঁধ্‌লাম, কত আকাশ কুসুম রচনা কর্‌লাম; সব ঝড়ে উ'ড়ে গেল। কত দুঃখ কত অশ্রুজল; তার ভিতরে দেখি, তুমি প্রাণে আশা দিতেছ; তুমি বুকে ধ'রে আছ। যখন তোমাকেও হারাই তখনই আমার ব্যথা বাড়ে; তখনই আমি আর সইতে পারি না। কি করি? তোমারই চরণে প'ড়ে থাকি। লোকে আমার অবস্থা দেখে হাসে, বিদ্রূপ করে, কত অযাচিত উপদেশ দেয়। তাঁদের কথাত শুন্‌তে পারি না।

তোমার কথাই শুনব; তোমার চরণেই প'ড়ে থাকব; আর আমার গতি নাই। তোমার চরণে প'ড়ে যদি মৃত্যুও আসে, সে মৃত্যুই আমার অমৃতের সোপান।

সব ভেঙ্গে দিলে—আমার একে একে সবই ফুরাল; একটি ঘর তুলি, সেটা তুমি ভেঙ্গে দাও; আবার তুলি, তাহাও ভেঙ্গে দিচ্ছ। এ কি তোমার লীলা! তুমি বুঝি চাও, আমি উন্মুক্ত আকাশ তলে থাকি; তুমি বুঝি চাও, আমি সব বেদনা স'য়ে, সব উপেক্ষা স'য়ে, কেবল প্রেম বিলিয়ে যাই। প্রাণের প্রিয়জন যে, সেও কোথায় চ'লে গেল; সেও প্রাণে আঘাত করুন; তবুও তাকে ডাকতে হবে, তবুও তাকে হৃদয়ে রাখতে হবে; তবুও তাকে অকাতরে স্নেহ দিতে হবে। যে ব্যথা দেয়, যে অনিষ্ট করে, তারও মঙ্গল করতে হবে, তাকেও ভালবাসতে হবে। এইত তোমার বিধান আমার উপর। তবে দাও, প্রভু, সব ভেঙ্গে দাও; আমার গড়ান সব ঘর দরজা ভেঙ্গে দাও, আমার আশার কুসুম সব উড়ে যাক্; আমি শ্মশানেই প্রেমের ফুল ফুটিয়ে তুলন। আমি তোমার চরণে বসেই সব পাব; সব দুঃখ হ'তে মুক্ত হব। প্রেম বিলিয়েই সুখ, কল্যাণ দিয়েই শান্তি। যেখানে উপেক্ষা, সেখানেই প্রেমে আনন্দ; যেখানে আমার অকল্যাণ করে, সেখানেই কল্যাণ বিতরণে সুখ। তবে সব ভেঙ্গে দাও; আমি মুক্ত উদার প্রাণ ল'য়ে সকলকে আলিঙ্গন করি, সকলের পায়ে পড়ে সেবা করি।

সম্পাদকীয়।

প্রচার কে করিতে পারে?—সকলেই আপনার মত প্রচার করে। সেই জন্যই এত তর্ক বিতর্ক, এত বাদ বিসম্বাদ হয়। আবার এই প্রচার দ্বারাই মানুষ উন্নত হয়; যে যে সত্যটি লাভ করিল, তাহা যদি সে অন্যের কাছে না বলিল, তবে যে লোকে সে সত্য জানিতে পারিল না। আর যে ব্যক্তি সত্যটি পায়, সে তাহা অন্যকে না দিয়া পারে না; সুতরাং সত্যের প্রচার একান্ত আবশ্যক। এই জন্যই যেমন বৈজ্ঞানিকগণ, দার্শনিকগণ আপনাদের লব্ধ সত্য প্রচার করিয়াছেন, সাধুভক্তগণও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লোককে দিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু সকলেই যে প্রচার করে, তার মধ্যে কে প্রকৃত ভাবে প্রচার করে? আমাদের দেশে সন্ন্যাস গ্রহণের নিয়ম আছে। যে ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে সন্ন্যাস্ গ্রহণ করে, তাঁহাকে পূর্ব্ব নাম, ধাম পদ প্রতিপত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। পূর্ব্বে হয়ত সে রাজার পুত্র ছিল, উচ্চবংশ ছিল, মান প্রতিপত্তি ছিল, অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, পিতার নাম ও যশঃছিল; সে সকলই পরিত্যাগ করে। তাকে কেবল তার নিজের নামেই লোকে চিনিবে, নিজের চরিত্র ও জ্ঞান দ্বারাই তার বিচার করিবে। এই সন্ন্যাস ব্রত দ্বারাও এক রকম প্রচার হয়; প্রচার কেবল বক্তৃতা দ্বারা হয় না, জীবন দ্বারা হয়। কিন্তু এই সন্ন্যাসী কেবল আপনার জীবন দ্বারাই প্রচার করে। পূর্ব্ব সংস্রব সমস্ত পরিত্যাগ করাতে, পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য, কুল, পিতার যশ মান প্রভৃতি দ্বারা যে সম্মান হইত, তাহার যে একটি প্রভাব ছিল, তাহা হইতে সে আপনাকে মুক্ত রাখে। সে যেন বলে, আমি কে ছিলাম, কোথায় জন্ম, কোন কুলে জন্মেছিলাম, আমার ঐশ্বর্য্য মান প্রতিপত্তি যাহাছিল, তাহা দ্বারা তোমরা কি করিবে? আমার মত শোন, আমার জীবন দেখ, ইহাতে তোমাদের যদি শ্রদ্ধা হয়, আমার অনুসরণ কর। বাস্তবিক প্রচার যিনি করিবেন, তাঁকে জীবন, মত ও কার্য্য দ্বারাই প্রচার করিতে হইবে। লোকে কথায় বলে, "ধারে না কাটে ভারে কাটে"। সেকথা ধর্ম্মপ্রচারে প্রয়োগ করা ঠিক নহে। এখানে 'ধারে'ই কাটিতে হবে, ভারে কাটিবার চেষ্টা করা উচিত নয়; তাতে মানুষের হৃদয় পরিবর্ত্তন হয় না। যিনি প্রচার করিতে যাবেন, তাকে দীন হীন হইতে হইবে। আমার কিছু নাই, কেবল প্রভুর নাম আমার সম্বল। এই নাম পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি, তোমরা এই নাম গ্রহণ কর, নামের মিষ্টতাতেই মুগ্ধহও; আমার পদ মান প্রতিপত্তি বিদ্যা বুদ্ধি ভাষার জোর আছে, তাহা দেখিয়া ভুলিওনা। আর এজন্য প্রচারের লক্ষণ হইবে এই যে, সে অত্যাচার উৎপীড়ন, নিন্দা অপমান ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া সহ্য করিবে। সে অমৃতের ভাণ্ড লইয়া দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইবে; লোকে হয়ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, অপমান করিবে, উপেক্ষা করিবে, উৎপীড়ন করিবে, নিন্দা করিবে, কুৎসা রটনা করিবে, প্রচারে নানা ভাবে বাধা উৎপাদন করিবে। সে নীরবে সকল সহ্য করিবে; প্রতিবাদ করিবে না; আপনার কাজ, প্রভুর কাজ সে করিয়া যাইবে, প্রভুর নাম সে কীর্ত্তন করিবে। প্রভুর ভৃত্য সে, তাঁর নামের সুধা বিলাইতে আসিয়াছে, তাঁর নিজের মান অপমান দেখিবার সময় নাই। এই ভাবে আপনাকে দান করিয়া, আত্ম বিলোপ করিয়া, প্রভুর নাম প্রচার করিতে যে পারে, তাহার প্রচারেই মানুষ আকৃষ্ট হয়; তাহার জীবন ও কার্য্য দেখিয়াই, তাহার কথা শুনিয়াই মানুষ নামের মহিমা বুঝিতে পারে ও ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হয়।

সভাপতির অভিভাষণ।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, সম্মিলনীর পূর্ব্বেকার কয়েক অধিবেশনে আমি অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়াছি। তথাপি অনুভব করিতেছি, এবার আমার অপেক্ষা যোগ্যতর কেহ সভাপতি হইলে সম্মিলনীর অধিকতর সফলতা হইত। শুধু এবারকার ব্রাহ্ম সমাগম, সম্মিলনীর অধিবেশন নহে, ইহা ব্রাহ্ম নবশতাব্দী আরম্ভের উদ্যোগও বটে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর এইরূপ সমাগমে অনেকটা পূর্ব্ববঙ্গের ঘরোয়া কথার আলোচনা হইয়াছে। এবার ব্রাহ্ম মাত্রের হৃদয়ে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত

(পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অষ্টাত্রিংশ অধিবেশনে সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত।)

হইয়াছে যে, অতীতে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, নবশতাব্দীতে আমাদের প্রিয় সমাজকে যোগ্য পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। শুধু বঙ্গের নয়, শুধু ভারতেরও নয়, জগতের ব্রাহ্মধর্ম-ধারাকে নবশতাব্দীতে কোন খাতে চালিত করিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশের জন্য সভাপতি পদে একজন ত্যাগী সাধকের প্রয়োজন ছিল। আমাকে এ ভার দেওয়া ভাল হয় নাই। এই সভার সভাপতির কার্য্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা আমার আছে, তাহা স্মরণ করিয়া আমি অতিশয় সঙ্কুচিত হইতেছি। কেবল আপনাদের সহযোগিতা ও ভগবানের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই কার্য্য যৎকিঞ্চিৎরূপে নির্ব্বাহ করিতে সাহসী হইতেছি। সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ ১৮২৮ সালে স্থাপিত হইয়াছে। যখন কোন দেশে ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখন ভগবান নব ধর্ম্ম প্রেরণ করেন, ইহা আমাদের দেশের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং সকল দেশের ইতিহাসের সাক্ষ্য। দুটী বিষয়ের মীমাংসা আমাদিগকে প্রথমেই করিতে হইবে—১ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম কি না? ২য় যখন ইহার উদ্ভব হয়—তখন এদেশে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছিল কি না? অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা না করিয়া প্রথমটা সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বলিব ইহুদী ধর্ম্মের তুলনায় খৃষ্টধর্ম্ম যেমন নূতন, হিন্দুধর্ম্মের তুলনায় ব্রাহ্মধর্ম্ম তেমনি নূতন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ধর্ম্ম নামে যাহা পরিচিত ছিল তাহার তুলনায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাংশেই নূতন। সকল ধর্ম্মেরই মৌলিক ভাবগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী নানা ধর্ম্মের মধ্যে পাওয়া যায়, তবুও নবাগত ধর্ম্ম সেগুলির এমন সমাবেশ করিয়া লন যে কার্য্যতঃ পরবর্ত্তী ধর্ম্ম নূতনই হয়। রাজা রামমোহন বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন শাস্ত্র হইতে উপাসনার বাক্য সংগ্রহ করিলেও উপাস্য এবং উপাসকের ভক্তিমূলক সাক্ষাৎ সম্পর্ক, এ ধর্ম্মে সম্পূর্ণ নূতন।

দ্বিতীয় কথা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অবতরণ কালে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছিল কি না? উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও তাহার পূর্ব্ব শতাব্দীতে এ দেশে বৈদিক বা উপনিষদিক কোনও ধর্ম্মসাধনা যে ছিল না তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। যাঁহারা সংস্কৃত জানিতেন তাঁহারাও ব্যাকরণ ও স্মৃতির অতিরিক্ত আর কিছুর আলোচনা করিতেন না। ইহার অনেক পরবর্ত্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বেদ-শিক্ষার জন্য কাশীতে ছাত্র পাঠাইতে হইয়াছিল। বার মাসে তের পার্ব্বণকে লোকে ধর্ম্ম মনে করিত এবং সেগুলি ধর্ম্ম অপেক্ষা আমোদ আহ্লাদের উপলক্ষ-রূপেই লোকের নিকট পরিচিত ছিল। ধর্ম্ম সাধনের দুটী ধারা ছিল—একটী বৈষ্ণব ও অপরটি তান্ত্রিক। উচ্চবর্ণের লোকের মধ্যে কেহ কেহ এই শেষোক্ত প্রণালীতে সাধন করিতেন এবং অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বৈষ্ণবই বেশী ছিল। নীতি কলুষিত হওয়াতে এই দুই পথাবলম্বী লোকেরাই যথার্থ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ছিলেন। জ্ঞানের আলোচনার কোন সুযোগ ছিল না। মহাত্মা রামমোহনের জীবনীতেই পড়া যায়, তাঁহার পূর্ব্বে লিখিত বাঙ্গলা ভাষার কোনও উন্নতি হয় নাই, সাহিত্য বা মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। ধর্ম্মের যথার্থ প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য বুঝিবার লোকের শক্তি ছিল না। দূরে যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, ভূয়োদর্শন দ্বারা সংকীর্ণ মতকে সংশোধন করিবার শক্তি ছিল না, সেকথা বলাই বাহুল্য। দেশের শাসন সুব্যবস্থিত ছিল না, গ্রামের ধনীলোকদের শাসনে প্রচলিত আচার হইতে কাহারও একচুল এদিক ওদিক করিবার ক্ষমতা ছিল না। স্বাধীন চিন্তা ছিলনা, জাতি ভেদের কঠিন শাসন ছিল। এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কতকগুলি বাহ্যিক আচারকেই ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া হইত এবং তাহা মানিয়া চলিলেই ধর্ম্ম পালন হইতেছে মনে করা হইত!

এরূপ সময় যে ধর্ম্মের গ্লানির কাল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অন্য কারণ না থাকিলেও শুদ্ধ এই কারণেই অনুমিত হইতে পারে যে মহাত্মা রামমোহনের মধ্য দিয়া যে ধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা যুগ ধর্ম্ম। পরবর্ত্তী শতবর্ষের ইতিহাস ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাদের নিকট অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়াছে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতের এবং জগতের জন্য ভগবৎ প্রেরিত নব ধর্ম্ম। মধ্যে মধ্যে নানা ধর্ম্মাবলম্বীকে লইয়া যে সম্মিলন হয় তাহাতে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মের যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই অনুরূপ।

এই সত্যটীকে একটু বিশদ ভাবে উপস্থিত করিতে হইতেছে; এই জন্য যে, ব্রাহ্ম যদি বিচার পূর্ব্বক ইহাতে আস্থাবান হইতে পারেন তাহা হইলে ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিবে, নিজেদের লোক সংখ্যা অল্প দেখিয়া নিরাশা আসিবে না, এই ধর্ম্ম লোককে দিবার জন্য ব্যাকুলতা উৎপন্ন হইবে এবং ইহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ হইবে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম এবং যিনি আত্মার কল্যাণের জন্য ধর্ম্ম চাহেন তাঁহাকে যে ইহারই আশ্রয়ে আসিতে হইবে, তাহা নির্ভয়ে ঘোষণা করা যায়। আকাশ হইতে নির্ম্মল বারিধারা যখন বর্ষিত হয় তাহা পর্ব্বতের মস্তকে পড়িয়া তন্নিহিত গৈরিক পদার্থের বর্ণ লইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বাহ্যরূপ দেশ ভেদে যে কেন কিছু কিছু ভিন্ন হয় তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। মুসলমান দেশের বাহাই ধর্ম্ম, খৃষ্টীয় দেশের একেশ্বরবাদ ও ভারতের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে মূলতঃ একই, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। সত্য ধর্ম্ম যখন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তখন সে তত্তৎ দেশের ধর্ম্ম ভাবের মধ্যে যাহা খাঁটি তাহাকে আপনার অন্তর্গত করিয়া লয়; ধর্ম্মের বাহিরের পরিচ্ছদ—যেমন উপাসনার ভাষা—তাহা যখন ভাবের অনুকূল হয় তখন তাহাকে পরিত্যাগ করার কোনই কারণ থাকে না।

এখানে প্রসঙ্গত একটী কথার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্ম ও অন্যধর্ম্মাবলম্বী অনেকের মুখেই শুনিতে পাই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কৃত রূপ অথবা ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু-সমাজের সংস্কারক শাখা। ইহা সত্য হইলে ব্রাহ্মের পক্ষে কোন অগৌরবের কথা হইবে না। খৃষ্ট বলিয়া ছিলেন, তাঁহার নবধর্ম্ম প্রাচীনকে বিনষ্ট করিতে আসে নাই, তাহাকে পূর্ণতর করিতে আসিয়াছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন এবং সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকই এই ভাবেই নিজ নিজ দেশের ধর্ম্মভাবকে ভিত্তি করিয়াই সর্ব্বজনীন ধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ধর্ম্মে

সজীবতা রক্ষা করার ইহাই একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। একটী বৃদ্ধি প্রাপ্ত বৃক্ষকে উন্মূলিত করিয়া অন্যত্র রোপণ করা যেমন দুষ্কর, তেমনি এক দেশের ধর্ম্মভাবকে নিরস্ত করিয়া তাহার স্থানে অন্যত্র বর্দ্ধিত ধর্ম্মান্তর প্রতিষ্ঠাও তদ্রূপ কঠিন ব্যাপার। এই তত্ত্বটী রামমোহনের সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে অতিক্রম করে নাই। অনেকে মনে করেন যে রাজা কেবল স্বদেশ প্রেমের অনুরোধে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সাধনার ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়াছিলেন। আসল কথাটা এই যে, তিনি কেবল পূর্ণ ধর্ম্ম বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মই অনুসরণ করিয়াছেন। খৃষ্ট এই নিয়মে যে ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন তাহাকে ইহুদী ধর্ম্ম হইতে পৃথক বলিতে লোকে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্ম হইতে পৃথক বলিতে অনেকে কুণ্ঠা বোধ করেন। ইহুদী ও খৃষ্টানের মধ্যে পার্থক্য খৃষ্টকে লইয়া কিন্তু এখনকার খৃষ্টীয়ানগণ এই পার্থক্যও কমাইয়া আনিতেছেন; অথচ ইহুদী এবং খৃষ্টান ভিন্নই আছে। ব্রাহ্ম কাহারও হইতে পৃথক হইতে চাহেন না, কিন্তু যদি একজনের সঙ্গে মিলিত হইতে হইলে অপরকে বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে সে ভাবের মিলনও চাহেন না; একথা বলিলেও চলিবে না যে ভবিষ্যৎ মিলনের আশায় বর্ত্তমান ঘনিষ্ঠতা ত্যাগকরা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। ইহা কেবল বাহিরের দৃষ্টিতেই বলা যায়। অন্তরের দিক দিয়া আমরা দেখিতেছি, নব্য হিন্দু, একেশ্বর বাদী খৃষ্টান, বাহাই, ইহারা সকলেই আমাদের আত্মীয়। কাজেই এমন কথা স্বীকার করা যায় না যাহাতে এই সম্বন্ধের ব্যাঘাত হয়। হিন্দু সমাজের কোনও কোনও নেতার এভাব দেখি যে ব্রাহ্মসমাজ একটী সম্প্রদায় হইয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্গত হইয়া থাকুক; আমাদিগকে তাঁহাদের মধ্যে ভুক্ত করিয়া রাখিতে চাহেন এই জন্য যে আমরা পাছে মুসলমান বা খৃষ্টানের সঙ্গে বেশী আত্মীয়তা করিয়া ফেলি। আর আমরা চাই যে আমরা মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত মিলিত করি। আমাদের ঘনিষ্ঠতা একদিকে তাঁহাদের সঙ্গে অন্যদিকে অপর ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম কোনও প্রাচীন ধর্ম্মের নিজস্ব নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতের বাহিরের প্রধান প্রধান ধর্ম্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। এই যোগের পথ উন্মুক্ত রাখিয়া ইহাকে মূলই বলো আর শাখাই বলো, তাহাতে ক্ষতি নাই।

বীজের ক্ষুদ্রত্ব দেখিয়া যেমন তদুৎপন্ন বৃক্ষের আকার বা পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের লোকগণনা দ্বারা ইহার ভবিষ্যৎ গৌরবের ধারণা করা যায় না। ১০০ শত বৎসরে ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত লোকের যে সংখ্যা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব হ্রাস করিতে চাহেন। অপরে যাহা বলে তাহাতে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই কিন্তু ব্রাহ্মের চিত্ত এই সকল সমালোচনায় দোলায়মান হইলেই সমাজের সমূহ ক্ষতি। যাঁহারা উপাসনাতে ও জীবনের আচরণে একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের। সমগ্র মুসলমান সমাজ আমাদের স্ত্রী লোক সম্বন্ধীয় নীতির পরিবর্ত্তন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনুদারতা বর্জ্জন করিলে তাঁহাদের আর আমাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। সমগ্র খৃষ্টীয় সমাজ যেরূপ দ্রুত গতিতে অমিশ্র একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে শীঘ্রই সেদিক হইতেও আমরা কত সমবিশ্বাসী প্রাপ্ত হইব; হিন্দুসমাজের আর্য্যশাখা অনেকবিষয়ে আমাদের অনুরূপ. ইহা ছাড়া বিস্তীর্ণ হিন্দুসমাজে কত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালীতে উপাসনা করিতেছেন, তাহারও ইয়ত্তা নাই।

সত্য, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুচারুরূপে প্রচার করিতে পারিনাই; কিন্তু ব্রহ্ম কি আমাদের ক্ষমতার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন? সুদূর সুইডেন হ'তে হ্যামারগ্রেন সাহেব ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনা করিতে আসিয়া ভারতে শরীর রক্ষা করিলেন। তাঁহাকে কি আমরা ডাকিয়া আনিয়াছিলাম? বাল্যকালে আমাদের সহরে বড় বড় অগ্নিকাণ্ড হইত। অগ্নিদাহ একস্থানে আরম্ভ হইলে সেখান হইতে এক এক দিকে বেণী উল্কা পড়িতে আরম্ভ হইত। যাহারা চালে উঠিয়া আগুণের গতি রোধ করিতে চেষ্টা করিত তাহারা যখন দেখিত পল্লীর চারিদিকে উল্কা জলিয়া উঠিতেছে তখন বুঝিত তাহাদের চেষ্টা বৃথা—সে পল্লী আর রক্ষিত হইবেনা; আমিও দিব্য চক্ষে দেখিতেছি জগতের চারি প্রান্তে ব্রহ্মাগ্নি স্ফুলিঙ্গ যেরূপ ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে অচিরে জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া দেদীপ্যমান হইবে। এখানে কেবল একটু মানবীয় অভিমানের কথা আছে। আমরা কি চাই ভিন্ন ভিন্ন দেশে উদ্ভূত সকল একেশ্বরবাদের নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে? খৃষ্টীয়ান একেশ্বর বাদী হইয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টীয়ান নামের সঙ্গে যে অমূল্য ভাবযোগ রহিয়াছে তাহা ছাড়েন নাই। মুসলমানও এইরূপ স্বীয় নামই রক্ষা করিবেন। কিন্তু বস্তু সম্পর্কে সকলেই হইব এক ব্রহ্মের উপাসক, একের ঘরে আসিয়া আমরা ভাই বোন হইয়া থাকিব। আমাদের সকলের চেহারা এক হইবে, ব্যক্তিত্ব মুছিয়া যাইবে ইহা আমরা কল্পনাও করিনা। সুতরাং ব্রাহ্ম নিশ্চিন্ত হইতে পারেন গণনাতে ব্রাহ্ম অল্প সংখ্যকের মধ্যে নহে।

আর একটী বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয় উল্লেখ করিয়া আমি আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণ করিব। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম ৫০ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখা হইয়াছে। এই বিষয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই স্বর্গীয় লালবিহারী দে বলিয়া ছিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রত্যেক ব্যক্তির অভিমতের ধর্ম্ম, উহার মূল নাই, উহার গ্রন্থ নাই, উহাতে সমঞ্জনী শক্তি নাই। বড় বড় ধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মমতের ঐক্য রাখিবার জন্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ঘন ঘন সম্মিলিত করিতে হইত। ইহা সত্বেও সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মের প্রথমাবস্থাতেই অল্প বিস্তর পার্থক্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাখা স্থাপিত হইয়াছে। অভ্রান্ত গ্রন্থ থাকিলেও ইহা নিবারিত হয় নাই। নূতন ধর্ম্ম বিধান যখন বিবেককে জাগ্রত করিয়া তুলে তখন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সতেজ ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং ইহার ফলে মত ও কর্ম্ম প্রণালীতে কিছু কিছু পার্থক্য হওয়া অনিবার্য্য। ব্রাহ্মসমাজের যে পার্থক্য তাহা ধর্ম্মমতে নহে, প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্ম্ম সমাজের পরিচালন প্রণালী সম্বন্ধে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথমা-

ব্যস্থায় ছিল এক নায়কত্ব, দ্বিতীয় যুগে ছিল প্রবীনদের পরামর্শ দ্বারা পরিবর্ত্তিত এক নায়কত্ব, তৃতীয় যুগে হইয়াছে নিয়মতন্ত্র প্রণালী। যাহ হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে কল্যাণকরই হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন শাখা একত্রে আসিয়া মতের কলহ করা অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া যাওয়াতে সকলেরই বিকাশের সুবিধা হইয়াছে। যখন খুব ক্ষমতাশালী নেতা থাকেন তখন যে ব্যবস্থা চলে, অন্য সময়ে তাহা চলেনা। এখন ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখাই নিয়ম তন্ত্রতাই গ্রহন করিতেছেন। এখন ভিন্ন ভিন্ন শাখা থাকিলেও ব্রাহ্মসমাজ মিলনের ভূমিতেই কার্য্য করিতে পারিতেছেন, সুতরাং এখানেও ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতার বা আশঙ্কার কারণ নাই।

আজ ৩৮ বৎসর হইল এই পূর্ব্ববঙ্গ সম্মিলনীর অধিবেশন হইতেছে। প্রথম উদ্যোক্তাগণ এই ভাব দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিলেন যে, যে সময়ে দেশময় পরিমিত দেবতার উৎসব হইতেছে তখন ব্রাহ্মগণ মহান্ ব্রহ্মকে লইয়া আনন্দোৎসব করিবেন না কেন? ক্রমে সম্মিলনীর সাফল্য দ্বারা প্রমাণিত হইল যে এই সম্মিলনীর বিশেষ উপযোগিতাই রহিয়াছে। মাঘ মাসে কলিকাতাতে যে মহোৎসব হয় তাহা সাধারণ পর্ব্বদিন না হওয়াতে বিদ্যালয় অফিস প্রভৃতি বন্ধ থাকে না। মফঃস্বলের বড় বড় সহরে যে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্ম থাকেন, তখন স্থানীয় মন্দিরে নিজেদের সাধ্যমত উৎসব করিতে হয় বলিয়া তাঁহারাও কলিকাতার উৎসবে যাইতে পারেন না। পূর্ব্ববঙ্গ সম্মিলনী এই মহোৎসবের স্থান পূরণ করিয়াছেন। এখানে তিন দিনে আত্মার যে কল্যাণ হয়, বন্ধুসম্মিলনে হৃদয়ের যে প্রশস্ততা হয়, তাঁহা স্মরণ করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মের এই সম্মিলনীর প্রতি একটী আকর্ষণ জন্মিয়া গিয়াছে। কার্য্যবশে এখানে উপস্থিত হইতে না পারিলে তাঁহাদের হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়। দ্বিতীয় কথা এই যে ব্রাহ্মসমাজ এখন এত বিস্তৃত হয় নাই যে মফঃস্বলের ব্রাহ্মগণ সর্ব্বত্রই বহুসংখ্যক সমবিশ্বাসী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে পারেন। বৎসরে কয়েক বার অনেক ভাই বোনের সহিত একত্র হইয়া ভগবানের চরণে সমাসীন হইলে প্রাণে যে বল পাওয়া যায় তাহাতে সারাবৎসরের বিচ্ছিন্নতা ও শুষ্কতা বিস্মৃত হওয়া যায়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ব্রাহ্মদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ ভাব আনয়ন করা সম্মিলনীর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। বড় দুঃখের বিষয় যাতায়াতের ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ বলিয়া ভাই ভগিনীগণ যথেষ্ট সংখ্যক আসিতে পারেন না। সম্মিলনীর তৃতীয় উদ্দেশ্য এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও প্রচার করিবার ভার কেবল কলিকাতার কেন্দ্র সমাজের উপর রাখিলে চলিবে না। যত অধিক লোক এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন তত এই সাধন ও প্রচার প্রত্যেকের হৃদয়ের বস্তু হইবে এবং তাহার জন্য স্বাভাবিক ভাবে স্বার্থ ত্যাগ আসিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন ও প্রচারের সহায়তা করা সম্মিলনীর তৃতীয় উদ্দেশ্য। সম্মিলনীর প্রতিবৎসরের কার্য্য তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও প্রচারই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহা সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য তাহাই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সম্মিলনী আলোচ্য বিষয় মধ্যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও প্রচার" কে প্রতিবৎসর প্রধান স্থান দিয়া আসিতেছেন ব্রাহ্মসমাজ ও এ বিষয়ের গুরুত্ব সর্ব্বদা লক্ষ্যস্থানে রাখিয়াছেন। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও প্রতিবৎসর আমরা ইহাই শুনেতেছি যে ব্রাহ্মসমাজের গৌরব অতীতেই ছিল, বর্ত্তমানে ক্রমে তাহার অপচয় হইতেছে। ব্রাহ্ম সাধারণের জীবনে নীতি ও ধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ নাই, ইহা আমরা গৌণ ভাবে সকলেই স্বীকার করিতেছি। বিষয়ের গুরুত্ব যদি না ভুলিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের কার্য্য প্রণালীর মধ্যে এমন ত্রুটি আছে যাহার জন্য এইরূপ অবাঞ্ছনীয় ফল উৎপন্ন হইতেছে। কেহ কেহ ত্রুটি স্বীকার করা অপেক্ষা আমরা যে ধর্ম্মানুরাগেও নীতিতে হীনবল হইতেছি, তাহাই মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলিতেছেন ব্রাহ্মসমাজ ত পৃথিবীর বাহিরে নহে। পৃথিবীর চারিদিকে চাহিয়া দেখ, জগৎময় ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ও সাংসারিক সুখের প্রতি লোলুপতা। ব্রাহ্মসমাজ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাহারই অংশী হইতেছেন। জগতে ধর্ম্মের গ্লানি হইতেছে বলিয়া আমরাও যদি সেই গ্লানি স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে কি ইহাও স্বীকার করা হইল না যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা জগতের একটা অংশেরই গ্লানি নিবারণ হইল না এবং যে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহা সাধিত হইল না।

অনেকে আবার অবশ্যম্ভাবী কারণে আমাদের আধ্যাত্মিক হীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ বলেন যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের স্থাপনের কালে ব্রাহ্মেরা যে অপ্রীতির বীজ বপন করিয়াছেন এখন তাহাই বিশ্বাস হীনতা রূপ ফল প্রসব করিতেছে। অপর কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মসমাজে ধন বৃদ্ধি হওয়াতে ব্রাহ্মগণ প্রাচীন কালের সাদাসিদে সাংসারিক জীবন ও উচ্চ ধর্ম্ম সাধন হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় এইখানে যে যাঁহারা সাংসারিক ব্যাপারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন সমাজে ধর্ম্মানুরাগীদের অপেক্ষা তাঁহাদের আদর বেশী হইয়াছে এবং তাহাতেই আদর্শের হীনতা আসিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় পক্ষ বলেন যাঁহারা সাধন ও চরিত্র হিসাবে উচ্চ শ্রেণীর লোক নহেন তাঁহাদিগকে আচার্য্য ও প্রচারকের পদে স্থাপন করাতে ধর্ম্মের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা যে কমিয়াছে তাহা ইহাতেই বুঝা যায় যে সঙ্গত উপাসনাদিতে পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ নাই। এইরূপ আরো কারণ থাকিতে পারে কিন্তু ইহা দ্বারা অবস্থাটা মানিয়াই লওয়া হইল। গত বৎসর ডিব্রুগড় সম্মিলনীর সভাপতিও বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে ব্রাহ্মগণ নীতি ও ধর্ম্মে যেমন সবল ছিলেন এখন আর তাহা নাই।

বিষয়টীকে আর একদিক্ দিয়া ও দেখা যায়। বাহিরের লোকে বলে ব্রাহ্মসমাজ যদি সত্য ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র হয় তাহা হইলে ইহা সাধুজীবন উৎপন্ন করারও উর্ব্বর ক্ষেত্র হইবে। তাঁহারা বলেন, আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রাচীন সমাজ হইতে সংগৃহীত, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন গত শতবৎসরের

মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ও প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম যদি গত শতবৎসরে ধর্ম্ম নিষ্ঠ অনেকগুলি পরিবার হইয়া থাকেন তাহা হইলেও এই প্রশ্নের সদুত্তর হয়। আমার মনে হয় এইরূপ উত্তর আমরা দিতে পারি। তথাপি প্রতি পক্ষের এই আক্রমণ আমি আংশিক ভাবে মানিয়া লইব, স্বীকার করিব যে ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতি আশানুরূপ হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে জন্মিতেছেন তাঁহাদের উপরই নির্ভর করিতে হইবে এবং কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে, আমার অবশিষ্ট বক্তব্য সেই বিষয়েই আলোচিত হইবে।

কখনো কখনো দেখা যায় যে ধর্ম্মভাবের জন্য নহে কিন্তু সামাজিক বা অন্যবিধ কারণে বহুলোক একত্রে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। ব্রাহ্মসমাজ এরূপ কার্য্যে কখনো উৎসাহ দান করেন না। সুতরাং প্রচারের দ্বারা বাহির হইতে যাহাদিগকে সমাজভুক্ত করা হইবে তাহাদের অপেক্ষা সমাজে যাহারা জাত এবং বর্দ্ধিত তাহাদের সংখ্যাই সমাজে সর্ব্বদা অধিকতর থাকিবে। ইহাদের শিক্ষা দীক্ষা যেরূপ হইবে সমাজের আকৃতি প্রকৃতি সেইরূপ হইবে। এ পর্য্যন্ত এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্রাহ্মসমাজ পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। বালকবালিকাগণের ধর্ম্মভাব ও নীতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। এমন কি, বহুলোকের মধ্যে এই ভাব প্রবল রহিয়াছে যে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশের দ্বারা বিশেষ কোনও ফল হয়না, এ সকল বিষয় চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারাই শিখাইতে হইবে। যাঁহারা এই মতের পোষক তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন, সমাজের সকল পিতা মাতা বা পরিবারের সকল বয়স্ক লোকের প্রতি এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইবার ভার দেওয়া যায় কিনা। তাঁহারা নিজেই বুঝিয়া দেখিবেন এই কার্য্যে সর্ব্বদা সমভাবে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা। সন্তানেরা পিতমাতা বা অপর গুরুজনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা করিবে বলা যাহা এ বিষয়ে সমাজের কোনও কর্ত্তব্য নাই বলাও তাহাই। আমরা দুঃখ করিয়া থাকি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি উপেক্ষা বা অবজ্ঞার ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। আমার মনে হয় ইহা পিতামাতার অনুকরণে সন্তানগণ নিজে নিজে নীতি ও ধর্ম্ম শিখিয়া লউক, এই ধারণাই তাহার মূল।

প্রস্তাব দীর্ঘ না করিয়া এ বিষয়ে আমার কি কি উপায় অবলম্বন করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় তাহারই কয়েকটী উল্লেখ করি। আমার প্রথম কথা এই যে, জগতের লোকেরা আজ কাল ধর্ম্মও নীতি শিক্ষাকে যে সাধারণ শিক্ষা হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে ইহাতে জগতে ধর্ম্মের হানি হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে যে ব্যবস্থা ছিল তাহাতে একই গুরুর অধীনে, তাঁহারই গৃহে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাই হইত। আমার মনে হয় ধার্ম্মিক ও নীতিমান মানুষ প্রস্তুত করিতে হইলে ইহারই অনুরূপ কিছু করা আবশ্যক। মানুষ যদি মনে করে যে রবিবার ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য ও সপ্তাহের অপর কয়েকটী দিন সাংসারিক কাজের জন্য তাহাতে যেরূপ অনিষ্ট হয়, তেমনি বালকেরা যদি মনে করে রবিবাসরীয় বিদ্যালয় নীতিশিক্ষার জন্য ও অপর কয়েক দিন ভাষা গণিত প্রভৃতির জন্য, তাহাতেও সেইরূপ ক্ষতি হয়। ধর্ম্ম ও নীতি যাহা সকল শিক্ষা, সকল কার্য্য, ও সকল সম্বন্ধের নিয়ামক, তাহাকে যতই আমরা জীবনের শিক্ষনীয় এবং সাধনীয় বিষয় সমূহের একটী শাখা মাত্র বলিয়া মনে করিব, ততই এই অস্বাভাবিক বিভাগের জন্য ধর্ম্ম ও কর্ম্ম উভয়ই শুষ্ক ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। একবার এই বিচ্ছেদ স্বীকার করিলেই স্বাভাবিক ভাবে এই কথা মনে আসিবে যে অগ্রে সন্তান সাধারণ বস্তু জ্ঞানের রাজ্যে কতক দূর অগ্রসর হউক, অতীন্দ্রিয় পদার্থ বুঝিবার শক্তি তাহার হউক, তাহার পর ধর্ম্ম ও নীতির সূক্ষ্ম শিক্ষা দেওয়া যাইবে। অনেক কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্রাহ্ম পিতা মাতাও এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ হারাইয়াছেন। বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিয়া পরে সেই সময় খুঁজিয়াই পান নাই যখন সন্তানের ধর্ম্ম শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারেন। আমি অনেক নমস্য ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি, যাহা বালক বালিকারা সম্যক বোধগম্য করিতে পারে না, তাহাদিগকে সেই সকল বিষয় বিশ্বাস করান ও সত্যরূপে গ্রহণ করান যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু যাহা প্রতি নিয়ত জীবনের সঙ্গে মিশিয়া আমাদের বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহার সম্বন্ধে কোনো না কোনোরূপ ধারণা তাহারা করিবেই করিবে। আকাশে গ্রহণ দেখিলে তাহা অপর গ্রহের ছায়া ইহা শিখাইতেই হইবে, নতুবা তাহারা শিখিবে রাহু দৈত্য সূর্য্যকে গ্রাস করিতেছে। তাহাদের চিত্ত কোন দিনই অলিখিত কাগজের ন্যায় বর্ণহীন থাকিবে না। যখন বালকের মনে প্রশ্নের উদয় হইবে পৃথিবীর আকার কিরূপ তখন বলিতেই হইবে পৃথিবী বর্ত্তুলাকার। দেখিবার বিষয় এই যে প্রশ্নটী তাহার মন হইতে আসিতেছে কি না। বয়স্কের পক্ষেও বিজ্ঞান দর্শন শিক্ষার ও এই প্রণালী। জগতের নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহের ব্যাখ্যার জন্য যে মূলসূত্র প্রথম গ্রহণ করা হয় তাহাও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্ম ও নীতিতেও এই প্রণালী ভিন্ন গতি নাই —আবশ্যক হইলে ভবিষ্য জীবনে বাল্য শিক্ষার ভুল সংশোধন করিয়া লইতে পারে। কিন্তু বাল্যকাল অশিক্ষার অবস্থায় রাখাই উৎকৃষ্ট পরামর্শ নহে। তবে শিক্ষককে বুঝিতে হইবে যে নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন কথা শিখাইবেন না যাহাতে শিক্ষকের বিশ্বাস গাঢ় হয় নাই।

যখন হইতে শিশুর জিজ্ঞাসা উদয় হইবে, তখন হইতেই ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার আরম্ভ হইবে এবং সাধারণ বস্তু জ্ঞান হইতে অভিন্ন ভাবেই এই শিক্ষা দিতে হইবে।

নীতি বিষয়ে পিতামাতা সন্তানের ন্যায়ান্যায় বোধের উন্মেষের অপেক্ষা করিতে পারেন না। বিড়ালকে যে মারিতে হইবে না তাহা দুবৎসরের শিশুকেও বলিতেই হইবে বরং ঐ ভাবেই তাহার ন্যায়ান্যায় বোধ উদ্রিক্ত হইবে। সুতরাং আমি যদি বলি দুই বৎসর হইতেই নীতি শিক্ষার আরম্ভ তাহা হইলে কেহ বিস্মিত হইবেন না। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে সাধারণ শিক্ষা ইহারও কম বয়সে আরম্ভ হয়। আমাদের দেশের কচ্ছ

এই যে "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি"। সাধারণতঃ ইহার অর্থ হইয়াছে যে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আদর দিয়া শিশুর শরীর পোষণ করিবে এবং এই কাল পর্য্যন্ত শিশুর মন যে বিকশিত হইতেছে সে বিষয়ে বাহির হইতে হস্তার্পণ করিও না। কিন্তু একথা যে ঠিক নহে, পাঁচ বৎসরের শিশুরও যে সংসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আছে তাহা পিতা মাতাকে বুঝাইতে হইবে না এ যাবৎ যাহা বলিলাম তাহার মধ্যে আমার বক্তব্য কথা দুটী—নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা অতি শৈশবেই আরম্ভ করিতে হইবে এবং এই শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে একত্রে হইবে। ইহা পুস্তকের শিক্ষা নহে, বস্তু জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে ঈশ্বরের কথা আসিয়া পড়ে এবং জীবনের কার্য্যের মধ্যে যেখানে নীতির স্থান রহিয়াছে তাহা ধরিয়াই এই শিক্ষা চলিবে। এই বয়সের জন্য এ দেশে বিদ্যালয় নাই, সুতরাং একাজ পিতা মাতা ভিন্ন কেহ করিতে পারেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে কি ব্রাহ্ম সমাজে, কি অন্যত্র, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার গুরুভার পিতামাতাকে করিতে হইবে। অতি শৈশব হইতে বাধ্যতা কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা দয়া-প্রবণতা প্রভৃতি মানবচিত্তের মূলীভূত সদ্‌গুণ সমূহকে অঙ্কুরিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যিনিই পিতা মাতা হইয়াছেন তিনিই যে এ বিষয়ে যোগ্য, তাহা বলা যায় না। প্রত্যেক পিতা মাতাকে সাহায্য করিবার জন্য সমাজের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কতকগুলি পুস্তিকা দ্বারা এ বিষয়ের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। আমাদের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে জীবন চরিত ও ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়—পদার্থবিদ্যা ও ভূগোল অবলম্বনে, ঈশ্বরতত্ত্ব শিশুদের নিকট অবতারণ করা যায়।

এইখানে একটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। গত একশত বর্ষে ব্রাহ্ম সমাজে যে সকল সাধুব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সরল ভাষায় শিশুদের উপযোগী করিয়া তাঁহাদের জীবনী অতি সত্বর প্রকাশ করা আবশ্যক। হয়ত প্রত্যেকের জীবন সম্বন্ধে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তকের মত উপকরণ নাও থাকিতে পারে এবং হয়ত তাহা মুদ্রাঙ্কণের অর্থ পুস্তকবিক্রয় দ্বারা নাও পাওয়া যাইতে পারে এই জন্য ছেলেদের নীতিও ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য এক এক স্থানের মণ্ডলীর অনেকগুলি ব্রাহ্ম সাধুর জীবনী একত্রে ছাপাইয়া পিতামাতার হস্তে দেওয়া আবশ্যক। এবৎসর ঢাকার ভক্তগণের, মৈমনসিংহের ভক্তগণের, বরিশালের ভক্তগনের ও কুমিল্লা চট্টগ্রামের ভক্তগণের জীবনী সম্বন্ধে ৪।৫ খানা এইরূপ পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত। সমাজ হইতে একাজ করার অনেক ব্যাঘাত আছে, কয়েকজন লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কাজ হাতে লইলে ভাল হয়।

৫।৬ বৎসর বয়সের পর বালক বালিকাদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রশ্ন আরো দুরূহ। আজ কালকার সরকারী শিক্ষা প্রণালীর সঙ্গে যোগ না রাখিয়া স্কুল চালান কঠিন হয়। ভক্তিভাজন রবীন্দ্রনাথও বোলপুরে ধীরে ধীরে সেই সরকারী ছাঁচের মধ্যেই আসিয়া পড়িতেছেন। ভক্তিভাজন গুরুচরণ মহলানবিশ ব্রাহ্ম বালক শিক্ষালয় যে আদর্শ লইয়া স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যক্ষেত্রে রহিল না। ঢাকার ইষ্টবেঙ্গল ইনষ্টিটিউসন সম্বন্ধেও সেই একই কথা। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার মনে হয়, ব্রাহ্ম পিতা মাতা দশবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সন্তানকে সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন না। বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত যাহা পড়ান হয় তাহা শিখাইবার জন্য ও তৎসঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য কোনওরূপ বন্দোবস্ত করা প্রত্যেক স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের কর্ত্তব্য। আমাদের প্রত্যেক মন্দিরের সঙ্গে এইরূপ একটী স্কুল থাকা আবশ্যক। শ্রদ্ধেয় অমর বাবুর স্কুলটীতে প্রথম পরীক্ষা হইতে পারে। যাঁহারা আচার্য্যের কাজ করেন তাঁহারা এবং প্রত্যেক পরিবারের ২।১ জন মহিলা ইহাতে বিনা বেতনে কাজ করিবেন। বড় বড় কেন্দ্রে ২।১ জন বেতনভোগী শিক্ষকও রাখা যাইতে পারে। আমার মনে হয় এই প্রণালীটী সুচারুরূপে চালাইলে সাধারণ শিক্ষাও উৎকৃষ্টতর হইবে।

দশবৎসর বয়সে যখন ব্রাহ্ম বালক বালিকারা সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবে তখন তাহাদের জন্য ছাত্র সমাজ ও রবিবাসরীয় স্কুল ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। এইরূপ অল্পবয়স্কদের জন্য শনিবারে যে ছাত্র সমাজ হইবে তাহা বর্ত্তমান ছাত্রসমাজ হইতে ভিন্ন হইবে—সেখানে তাহাদের উপযোগী উপাসনা প্রার্থনা পাঠ আলোচনা প্রভৃতির বন্দোবস্ত হইবে। এখন বড় বড় সহরে যে ছাত্রসমাজ হয় তাহা কলেজের ছেলেদের মধ্যে ধর্ম্মভাব বিস্তারের জন্য। পুত্রকন্যা স্কুলেই পড়ুক বা কলেজেই পড়ুক সেখানে নীতি বা ধর্ম্মশিক্ষা এদেশে কবে যে সম্ভব হইবে তাহা বলা যায়না। অনেক পিতামাতা এইটুকু সতর্ক থাকেন যে সন্তান সেখানে মন্দ কিছু শিখিতেছেনা—নীতি বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছে না। অনেকে এটুকুও করেন না। কিন্তু ব্রাহ্ম পিতামাতার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট নহে। ভাল যাহা তাহা শিখাইতে না পারিলে মন্দ যাহা তাহা আপনি আসিয়া পড়ে। বাড়ীতে পুত্রকন্যার সঙ্গে উপাসনা প্রার্থনা না করিতে পারিলেও দিনের মধ্যে কতক সময় তাহাদের লইয়া বসিতে ও সদগ্রন্থ পাঠ করিতে ও তাহার আনুসঙ্গিক যে বিষয় আসিয়া পড়ে তাহা ধরিয়া আলোচনা করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। পিতামাতার সন্তানকে নীতি ও ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে তাঁহাদের নিজের জীবন ও চিন্তাকে ধর্ম্মানুমোদিত ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। যেদিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক পরিশেষে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের উপরেই বালক বালিকাদের চরিত্র গঠন নির্ভর করে। কাজেই আমরা বয়স্কদের জন্য কি আয়োজন করিতে পারি তাহাই আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। ইহার জন্য পাঁচটি উপায়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহা এই।

(১) পাঠ, (২) ব্যক্তিগত উপাসনা ও প্রার্থনা (৩) সামাজিক উপাসনা (৪) সঙ্গত (৫) আশ্রম স্থাপন। আপনারা দেখিতেছেন ইহার একটিও আমি নূতন বলিতেছিনা। কিন্তু আমরা ইহার উপকারিতা জানিয়াও ইহার কোনওটীই যথাযথরূপে ব্যবহার

করিনাই। যাঁহারা সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে আক্ষেপ করেন তাঁহাদেরও মনের কথা এই। কেহ এরূপ মনে করেন না যে আমাদের উপায় জানা নাই কিন্তু সকলেরই ক্ষোভের কারণ এই যে সেগুলি কেন সুচারুরূপে অবলম্বিত হয় না। মানুষ সকল বিষয়েই অভ্যাসের দাস। বাল্যকাল হইতে নীতি ও ধর্ম্মের দিকে মনের একটু ঝোঁক না জন্মিলে সামাজিক উপাসনা সঙ্গতাদিকে সামান্ত বিষয় কার্য্যের উপলক্ষ করিয়াই মানুষ বর্জ্জন করে। যাঁহারা সঙ্গতাদিতে উপস্থিত হন তাঁহারা ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠের অভাবে ইহার আলোচনা মনোজ্ঞ করিয়া তুলিতে পারেন না। সেকারণেও অনেকে দু একবার আসেন মাত্র পরে ইহাতে তাঁহাদের অনুরাগ থাকেনা। সঙ্গত ভাঙ্গিয়া যায়। ব্রহ্মানন্দের সময়ে সঙ্গত কেমন মনোহারী ছিল। আজকাল কার মানুষ যে সেকালের অপেক্ষা মূলতঃ নিকৃষ্ট শ্রেণীর তাহা নহে। তবে সেকালে যে সকল সামাজিক বিষয়ের আলোচনা হইত বর্ত্তমানে তাহার অনেকের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এখন চাই, প্রত্যেক কেন্দ্রে দুএক জন একনিষ্ঠ সাধক, যাঁহারা অপরকে হাত ধরিয়া ধাপে ধাপে উচ্চ ভূমিতে তুলিয়া লইতে পারেন। মতের অপেক্ষা ব্রহ্মস্থিতি ও চরিত্রের মহত্বের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সমাজিক উপাসনা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া থাকে উহার বিষয়ে আমি কিছু বলিবনা। যদি স্থানে স্থানে আমরা সাধনাশ্রম স্থাপন করি তাহা হইলে তাহাকে অবলম্বন করিয়া সঙ্গত ও গড়িয়া উঠিবে।

ব্যক্তিগত উপাসনা প্রার্থনাতে উদাসীনতার কারণ মানসিক বিক্ষেপ। সময়ের অভাব বাস্তবিক কারণ নহে যেহেতু বেশী সময় লাগিয়াও উপাসনা প্রার্থনা হইতে পারে। ইহা সময় দেওয়ার কথা নহে চিত্ত দেওয়ার কথা। মানুষ নিজের দিকে চাহিয়া দেখে যে সে অন্য বিষয়ে এমনই আসক্তচিত্ত রহিয়াছে যে তাহার উপাসনা প্রার্থনা সে সময়ে মৌখিক ভিন্ন আর কিছু হইবেনা। এই জন্যই ইহাতে শিথিল প্রযত্ন হয়। এই সময়ের ঔষধ ভক্ত চরিত ও বাণী পাঠ। আমার বিশ্বাস এই বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক সংখ্যা প্রচুর নহে। পূর্ব্বে একবার ব্রাহ্ম-ভক্তদের জীবনীর কথা বলিয়াছি আবারও বলি এ বিষয়ে অবহিত হওয়া আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজী সাধনসহায় গ্রন্থ হইতে আরো সংগ্রহ বাঙ্গালায় হওয়া আবশ্যক। ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন যে এইরূপ পুস্তক পাঠ করিতে করিতে অবাধ্য মন প্রশান্ত হয় এবং প্রার্থনা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। এই সংগ্রহও ব্রাহ্ম ভিন্ন কেহ ভাল করিবেনা; কিন্তু যিনিই করুন ইহাদ্বারা বঙ্গ ভাষার গৌরব ও বৃদ্ধি হইবে।

সমাজে একটী আধ্যাত্মিকতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সমবেত ভাবে আমরা কি করিতে পারি তাহা বিবেচনা করিতে গেলে সামাজিক উপাসনার পরেই সঙ্গত ও আশ্রম স্থাপন দিকে দৃষ্টি পড়ে। যেখানে আশ্রম স্থাপন সম্ভব সেখানে সঙ্গত আশ্রম একত্রই হইতে পারে। কিন্তু যেখানে কয়েক ঘর মাত্র ব্রাহ্মআছেন সেখানে সঙ্গতের বন্দোবস্ত করাই প্রথম প্রয়োজন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিয়াছিলেন যে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজকে সবল ও সরস রাখা সম্ভব নহে। ইহার কার্য্যছিল সাধক ও প্রচারক প্রস্তুত করা। কিন্তু এখন অনেকে অনুভব করিতেছেন যে প্রচারের ব্যাকুলতা বশতঃ অনেক অপরিপক্ব সাধককেই প্রচারক্ষেত্রে পাঠান হইয়াছে। তিনি সাধনাশ্রমকে রান্নাঘর বলিতেন সুতরাং তাঁহার ভাষায় বলিতে হয় যে ক্ষুধার আধিক্য বশতঃ অর্দ্ধ সিদ্ধ অন্নই পরিবেশন করা হইয়াছে। তাঁহার উপায়ান্তর ও ছিলনা। অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে দেশ বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইত, কাজেই উৎসব ও পারিবারিক অনুষ্ঠানাদির জন্য অপরিপক্ব সাধকদিগকেই প্রচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইত। ব্রাহ্মসমাজ স্বাবলম্বী সমাজ। কতকগুলি লোক ধ্যান ধারনাদির দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতেছে অতএব তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লওয়া যাউক এ ভাবটী হিন্দুসমাজে আছে কিন্তু আমাদের মধ্যে ইহা বদ্ধমূল হয় নাই। সাধনাশ্রমের বর্ত্তমান অধ্যক্ষের সুবিবেচনার উপর আমার বিশেষ আস্থা আছে। তিনি কলিকাতাতে যদি সুদৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন এবং মফঃস্বলের বড় বড় ব্রাহ্ম কেন্দ্র ও যদি সেই উৎসাহ সংক্রামিত হয় তাহা হইলে নূতন শতাব্দীতে আমরা নব বল পাইতে পারি। ঢাকা বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ইহা অপেক্ষাকৃত সহজেই সাধিত হইতে পারে।

ব্রাহ্মদের মধ্যে মিলিত ভাবে যেখানে যে চেষ্টা হইতেছে তাহা প্রায়ই পুরুষদের মধ্যেই আবদ্ধ আছে। সমাজের ও গৃহের আধ্যাত্মিক হাওয়া বদলাইতে হইলে মহিলাদিগকেই বিশেষ ভাবে প্রয়োজন ইহা বুঝিয়াও কার্য্যতঃ বেশী কিছু করা হয় নাই। তাঁহাদিগকে কোনও স্থানে সমবেত করিতে হইলে যান বাহনে ব্যয় হইয়া পড়ে। ইহা এক অন্তরায়। এখন কলিকাতার মত স্থানেও এবিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন সর্ব্বত্রই সাহস করিয়া তাঁহারা পদব্রজে চলিতে পারেন। যেখানে যে উপাসনা, সংগত বা পাঠাদি হয়, তাহাতে পুরুষের ন্যায় মহিলাগণও বহুসংখ্যক উপস্থিত হয়েন এবং সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সমাজের রবিবাসরীয় উপাসনাতে মহিলাগণ অধিকতর সংখ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিতে যাহাতে প্রস্তুত হন তাহারও চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কি গৃহে বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলারা যতদিন ব্রাহ্ম বালক বালিকার শিক্ষার ভার গ্রহণ না করিতেছেন, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক হাওয়া পরিবর্ত্তন হওয়া সুদুষ্কর।

অর্থ সম্বন্ধে মানুষ যখন স্বার্থপর হয় তাহার মার্জ্জনা আছে কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধক যদি স্বার্থপর হয় সেটা তাহার আত্মহত্যার তুল্য হয়। যেমন ব্যক্তি সম্বন্ধে একথা সত্য তেমনি দশজনের মিলিত চেষ্টা সম্বন্ধেও ইহা সত্য। ব্রাহ্মসমাজের দেশময় যতগুলি কেন্দ্র আছে সকলে যদি পরস্পরকে বলীয়ান্ করিতে চেষ্টা না করে তাহা হইলে সমগ্র সমাজ যে দুর্ব্বল হইবে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এই বিষয় ভাবিবার কথা। কিন্তু আমার মনে হয়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ভক্তিভাজন নবদ্বীপচন্দ্র দাস বা শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু একাকী এই কার্য্যের জন্য যতটা

ভাবিতেন, কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে যতটা ব্যথিত হইতেন এখনকার সমগ্র কমিটীও ততটা করেন না। লোকে বলে যাহা দশের কাজ তাহা কোন ব্যক্তিরই কাজ নহে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভাতে বসিয়া আমার এই কথাই মনে হইয়াছে। যে মৈমনসিং এক সময়ে প্রজ্বলিত হোম কুণ্ডের স্থায় ছিল আজ তাহা নির্ব্বাণ প্রায়। চট্টগ্রাম তুচ্ছ গৃহ বিবাদে মলিন। ফরিদপুর কুমিল্লার পূর্ব্ব গৌরব নাই। ঢাকা কলিকাতার কাছে পুনঃ পুনঃ একজন আচার্য্য চাহিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। বরিশাল কয়েকজন রুগ্ন ভগ্ন কর্ম্মীর উপর নির্ভর করিয়া কথঞ্চিৎ বাঁচিয়া আছে। এব্যথার ব্যথী হইবার কে আছেন? একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় পূর্ব্ববঙ্গই কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নব শতাব্দীর বিশেষ কার্য্য হইবে এই পূর্ব্ববঙ্গকে সবল ও গৌরবান্বিত করা।

নব শতাব্দীর অপর প্রচেষ্টা প্রচার। যিশু তাঁহার প্রথম উপদেশেই শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে আলোক জ্বালিয়া কেহ ঢাকা দিয়া রাখে না বরং উচ্চস্থানে স্থাপন করে যাহাতে চতুর্দ্দিক তদ্বারা আলোকিত হয়।

ব্রাহ্মসমাজ যিশুর এ উপদেশ মান্য করিয়াছেন। প্রথম হইতেই ব্রাহ্মসমাজ বলিতেছেন যে প্রত্যেক ব্রাহ্মই অল্পাধিক প্রচারক। আমরা শতাব্দীর উৎসব আরম্ভ হইতে হইতেই চতুর্দ্দিকে প্রচারকদল প্রেরণ করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের বাণী দেশ বিদেশে বহন করা আমাদের বিধাতৃ বিহিত কর্ত্তব্য, পরন্তু ইহা আমাদের জীবন মরণের প্রশ্ন। সুতরাং এবিষয়ে যে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রচার এক প্রকার নিমন্ত্রণের মত—জগতের লোককে ঘোষণা দিয়া ডাকিয়া আনা। তারপর তারা যখন আধ্যাত্মিক অন্নের দাবী করিবে তখন আমাদের ভাণ্ডারে যথেষ্ট আয়োজন দেখা যাইবে ত? পূর্ব্বেও আমরা যত লোককে ডাকিয়াছি তত লোকের আত্মাকে তৃপ্ত করিতে পারি নাই। এদেশ গুরুকরণের দেশ। এখানে ধর্ম্মসমাজে আসিয়া লোক এমন সকল সাধুর আশ্রয় লইতে চায় যাঁহাদের উপর সচ্ছন্দচিত্তে নির্ভর করিতে পারে। একদল ডাকিতে বাহির হইয়াছে—এখন সকলের কর্ত্তব্য আগন্তুকদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা; অথবা যিশুর দৃষ্টান্ত ধরিয়া বলা যায় যে আলোক ও উচ্চস্থানে স্থাপিত হইল কিন্তু তাহাকে সমভাবে উজ্জ্বল রাখার জন্য নিয়ত তৈল সংযোগ করার বন্দোবস্ত চাই। অনেক সময়েই দেখিয়াছি মানুষ কর্ম্মের চটকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হয়—খুব বড় বড় লোক এক এক সময়ে এই কারণে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়াছেন। তারপর যখন উৎপীড়নের সময় আসিল তখন তাঁহারা এই বলিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন যে প্রাচীন সমাজে থাকিয়া কর্ম্মকরাই সুবিবেচনার কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজ ইহাদিগকে ধর্ম্মের সুস্বাদ দিতে পারেন নাই। বাড়ীর ছেলে পিলে পাঠাইয়াও নিমন্ত্রণ করা চলে কিন্তু আয়োজনের সময় কর্ত্তাকে চাই, পরিবেশনের সময় গৃহিণীকে চাই। আমি যদি আজ প্রত্যেক ব্রাহ্মকে একজন করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষার্থী দিই এবং বলি যে আপনি ইহার অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপন করিয়া ও ভক্তি সিঞ্চন করিয়া বর্দ্ধিত করুন। কত জন এই কার্য্যে সাহসী হইবেন? প্রচারের উৎসাহ খর্ব্ব করা আমার অভিপ্রায় নহে কিন্তু প্রচারের দায়িত্ব যেন আমরা সকলে অনুভব করি।

উপসংহার—আমি এতটা সময় লইলাম কিন্তু আমার বলিবার বিশেষ কথা ৩।৪ টী মাত্র। প্রথম সকলকে অনুভব করিতে বলি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এ যুগের এবং ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বর প্রেরিত বিধান, দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিবার জন্য ভগবান আমাদিগকে যেটুকু করিতে দিয়াছেন, ব্রাহ্মপরিবারে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে তাহা সুসিদ্ধ হইবে না।

তৃতীয়ত বালক ও যুবকদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন হইলে, বয়স্কদিগের মধ্যেও খাঁটি ব্রাহ্মের সংখ্যা কম হইবে। বাল্যকালের উদাসীনতার অভ্যাস যৌবনে বা প্রৌঢ়কালে সহজে সংশোধিত হইবে না। এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, সঙ্গত ও সাধনাশ্রম স্থাপনের প্রতি আরো মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

ধর্ম্মাবহ পিতা, আমাদের সকলের বুদ্ধিকে আলোকিত করো, আমাদের ইচ্ছাকে অধিকার করো, আমাদিগকে কর্ত্তব্য পথে বলীয়ান ও নির্ভয় করো, তোমাতে ভক্তি ও মানবে অকপট প্রীতি আমাদের অন্তরে জাগ্রত রাখো। ইহ পরকালে এই ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বাস গৃহ, ইহা জানিয়া ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা আমাদিগকে প্রেরণা দাও। আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করো।

ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিকী ও পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী

ঢাকা নগরীতে বিগত ২০এ অক্টোবর হইতে ২৪এ অক্টোবর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিক উৎসব ও পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সম্মিলনীর অষ্টাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার নেপালচন্দ্র রায় সম্পাদক ছিলেন। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ সম্মিলনীর স্থায়ী সম্পাদক। কলিকাতাতে যে আগষ্ট মাসে ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়, তাহার পরই তিন দল প্রচার যাত্রী নানা স্থানে গমন করেন। একদল বিগত ১৮ই রাত্রিতে ঢাকা পৌছেন। অন্য একদল ২১এ তারিখ সন্ধ্যায় ঢাকা পৌছান। ২০এ তারিখ সন্ধ্যায় ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান, প্রতিনিধি ডাঃ ড্রামণ্ড, তাঁহার পত্নী, শ্রীমতী উড্‌হাউস্ ও অপর একজন মহিলা ঢাকাতে পৌছান। তাঁহাদিগকে ও সভাপতিকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনার জন্য সেচ্ছাসেবকগণ সেখানে উপস্থিত থাকিতেন। অন্য প্রতিনিধি গণকে ষ্টেশনে স্বেচ্ছাসেবকগণ অভ্যর্থনা করিয়াছে। ষ্টেসন মাষ্টার রায় সাহেব প্যারীমোহন দাস অভ্যর্থনার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইষ্ট বেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসন

গৃহ মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; পুরুষগণের জন্য জগন্নাথ কলেজের হষ্টেল গৃহ কর্ত্তৃপক্ষগণ দয়া ক'রে দিয়াছিলেন। সমাজের গ্যালারিতে ও প্রচার গৃহেও অনেক লোক ছিলেন। নিউ বালিকা স্কুলের একটী বাড়ীতে সাহেবদিগকে রাখা হইয়াছিল। অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়ের পরিচালনে একদল মহিলা ও পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক যাত্রীগণের সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যাত্রীগণের মধ্যেও কোন কোনও মহিলা ইঁহাদের সাহায্য করিয়াছেন। এদিকে সম্মিলনীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ প্রভৃতি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান্ রণেন্দ্র নাথ দাসের নামও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রায় দুই শত পুরুষ ও মহিলা কলিকাতা, পাটনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কালীকচ্ছ, ফরিদপুর, ময়মনসিং, বরিশাল, কাওরাইদ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি নানা স্থান হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ ও হিন্দু মুসলমানগণও উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে;— ডাঃ ড্রামণ্ড, তাঁহার পত্নী, শ্রীমতী উড্ হাউস্ অপর একজন ইংরেজ মহিলা, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, তাঁহার পত্নী, শ্রীযুক্তা জয়াবতী চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী সান্ত্বনা রায়, শ্রীযুক্তা কুসুমমালা দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর দাস, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সেন (শ্রীহট্ট) শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত তড়িৎমোহন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য। প্রতিদিনই প্রাতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্তের নেতৃত্বে উষাকীর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমদিন উয়ারীতে স্বর্গীয় গোপীকৃষ্ণ সেনের বাড়ীতে কীর্ত্তন হয় ও তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রার্থনা করেন। কিছুদিন হইল এই গৃহে শোকের ছায়া পড়িয়াছে; বাবু দেবেন্দ্রমোহন সেন, হঠাৎ পরলোক গমন করেন। সেই জন্যই এই গৃহেই কীর্ত্তন ও প্রার্থনা দ্বারা উৎসব আরম্ভ হয়। অন্যান্য দিনও নগরের নানাদিকে উষাকীর্ত্তন হয়। একদিন বৃষ্টির ভিতরেও বাংলা বাজার, দিগবাজারে কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

২০এ অক্টোবর শনিবার উৎসব আরম্ভ হয়; ঐদিন প্রাতঃকালে উয়ারীতে কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনদল মন্দিরে আসিলে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করেন। ঐদিন সন্ধ্যার সময় উৎসবের উদ্বোধন হয়; প্রথম কীর্ত্তন, তৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস উপাসনা করেন। ২১এ তারিখ রবিবার, প্রাতঃকালে বৃষ্টির মধ্যে উষাকীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। উপাসনান্তে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। বেলা আড়াইটার সময় সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন। প্রথমে সঙ্গীত হইলে ডাঃ ড্রামণ্ড ইংরেজীতে প্রার্থনা করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র নাগ অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ হইতে ডাঃ ড্রামণ্ড প্রমুখ বিদেশী অতিথিগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। তদুত্তরে ডাঃ ড্রামণ্ড ও শ্রীমতী উড্হাউস্ কিছু বলেন। অতঃপর ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ শেষ করিতে পারেন না। রাত্রিতে তাঁহাকেই উপাসনা করিতে হইবে, এই জন্য ৫ টার সময়ই সভা স্থগিত হয়। রাত্রিতে প্রথমে কীর্ত্তন, তৎপর শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য উপাসনা করেন। ২২শে তারিখ সোমবার ভোরে মন্দিরে বসিয়াই উষাকীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী উপাসনা করেন। ৯ টার পর সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ শেষ করিলে সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন, তাহা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতির প্রস্তাবে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া বাবু নবকুমার সমাদ্দার, বাবু নলিনীকুমার দত্ত, বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরীর পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করেন ও তাঁহাদের পরিবার বর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। ঐ দিনই ২ টার সময় মন্দিরে বালক বালিকা সম্মিলন হয়; শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; বালক বালিকাগণ সঙ্গীত ও আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও সভাপতি মহাশয় উপদেশ দেন। তৎপর বালক বালিকাদিগকে লইয়া ইষ্টবেঙ্গল ইনষ্টিটিউশনের প্রাঙ্গনে যাওয়া হয়। সেখানে সহর ও মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মগণের প্রীতি সম্মিলন হয়। বালক বালিকাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকীর উপহার পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। সকলের চিত্ত বিনোদনের জন্য আবৃত্তি, বেহালা ও সেতার বাজনা হয়। জলযোগেরও ব্যবস্থা ছিল। রাত্রিতে ডাঃ ড্রামণ্ড ধর্ম্ম সম্বন্ধে বর্ত্তমানের কয়েকটি সমস্যা বিষয়ে ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। এতলোক হইয়াছিল যে মন্দির ও তাহার বারেন্দায় স্থান সঙ্কুলন হয় নাই। ২৩শে অক্টোবর, মঙ্গলবার ভোরে নগরে উষাকীর্ত্তন; তৎপর ডাঃ ড্রামণ্ড ইংরেজীতে উপাসনা করেন। প্রায় ৯ টার সময় সম্মিলনীর কার্য্য আরম্ভ হয়। সাধন সম্বন্ধে আলোচনা হয়; জীবন গঠন সম্বন্ধে বিশেষতঃ নীতি দ্বারা জীবনের গোড়া পত্তন যাতে হয়, তৎবিষয়েই আলোচনা হলো। শ্রীযুক্ত সতীশ চক্রবর্ত্তী আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ১১টা পর্য্যন্ত আলোচনা চলিল। ২ টার সময় যুবকদের সম্মিলন; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমান বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত ও শ্রীমান রণেন্দ্রনাথ দাস প্রবন্ধ পাঠ করেন; শ্রীমান মুনীন্দ্রনাথ রায় কিছু বলেন; তৎপর ডাঃ ড্রামণ্ড, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, ও সভাপতি মহাশয় উপদেশচ্ছলে কিছু কিছু বলেন। ৪ টার সময় মহিলাদের সম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য করেন। কয়েকটী মহিলা প্রবন্ধ পাঠ করেন;

ডাঃ ড্রামণ্ড, তাঁহার পত্নী ও শ্রীমতী উড্‌হাউস্ কিছু কিছু বলেন; তাহা বাঙ্গলাতে অনুবাদ করে বলা হয়। মহিলাদের পক্ষ হইতে অভ্যাগতদিগকে যে অভিনন্দন করা হয়, তাহারও ইংরেজী করে সতীশ বাবু বলেন। এদিকে ৪ টার পরই নগর-কীর্ত্তন বাহির হয়। দুই দলে কীর্ত্তন হয়, অগ্রে অগ্রে বালকের দল পশ্চাতে প্রবীনের দল। বালকের দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শ্রীযুত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমান প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র; প্রবীনের দলে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী খোল বাজান। সঙ্কীর্ত্তনের দল উৎসাহের সহিত গাইতে গাইতে বাংলা বাজার, সূত্রাপুর, লক্ষীবাজার, দিগবাজার হইয়া ৬॥ টায় মন্দিরে পৌছেন। সেখানেও কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হয়; তৎপর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। ২৪এ অক্টোবর বুধবার সকালে উষাকীর্ত্তন; তৎপর শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত উপাসনা করেন। প্রায় ৯ টার সময় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়, ধর্ম্মসাধন ও অন্যান্য বিষয়ে অনেকগুলি প্রস্তাব ধার্য্য হয়। অবনত শ্রেণীর মধ্যে কার্য্য করিবার জন্য একজন প্রচারক নিযুক্ত করার কথা হয়; তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে চাঁদা তোলা হয়; এক বৎসরের জন্য যে টাকা প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহাতে মাসে ৪৩ টাকা উঠিবার কথা। অপরাহ্ণ ৩ টার সময় প্রথমে যুবক সম্মিলনীর স্থগিত অধিবেশন হয়। তাহাতে যুবক সম্মিলনীর কয়েকটি নিয়ম প্রণয়ন হয়; আগামী বৎসরের জন্য শ্রীমান রণেন্দ্রকুমার দাস সম্পাদক ও একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। তৎপর সম্মিলনীর শেষ অধিবেশন হয়। অনাথ ধন ভাণ্ডারের জন্য শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর পুনরায় সম্পাদক নিযুক্ত হন। সমাজের কল্যাণের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব ধার্য্য হয়। অনাথ ধন ভাণ্ডারের জন্য ৫ শতাধিক টাকা প্রতিশ্রুত হয়। আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ পুনরায় সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমান নীহারচন্দ্র রায় সহকারী সম্পাদক ও একটী কমিটি নিযুক্ত হয়। কীর্ত্তনান্তে রাত্রিতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন।

এই ভাবে উৎসব শেষ হইল। অভ্যর্থনা কমিটির সভাগণ বিশেষতঃ স্বেচ্ছাসেবকগণ অভ্যাগত গণের জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া ছিলেন। উৎসবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঈশ্বরারাধনা করিয়া ও তাঁর নাম করিয়া সকলেই ধন্য হইয়াছেন; ঈশ্বরের করুণা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৬শে অক্টোবর মিঃ সতীশরঞ্জন দাস অল্পদিন রোগে ভুগিয়া ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। পত্নীও বিলাত হইতে আসিয়া দেখিবার অবসর পাইলেন না। মিঃ দাস অতি মহৎ অন্তঃকরণের লোক ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার অভাবে দেশের গুরুতর ক্ষতি হইল।

বিগত ১৯শে অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেনের পত্নী শ্রীমতী গিরিজা পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ২৮শে অক্টোবর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। এক ভগিনী ও দেবর জীবনী সম্বন্ধে কিছু পাঠ করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

ছাত্র ও ছাত্রীদের কৃতিত্ব—বিগত এম, এ পরীক্ষাতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অরুণকুমার অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান ও দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী শান্তিবালা ইংরাজী সাহিত্যে দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ীর পুত্র শ্রীমান অমিয়কুমার এম, এস্‌সি পরীক্ষায় ব্যবহারিক রসায়ণ শাস্ত্রে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী সাহিত্যে দ্বিতীয় বিভাগে শ্রীমতী শান্তি দাস ও শ্রীমতী অরুণা মুখার্জি তৃতীয় বিভাগে শ্রীমান ক্ষেত্রমোহন পোদ্দার, বাঙ্গলা ভাষায় তৃতীয় বিভাগে শ্রীমতী হৃদয়বালা চৌধুরী, অর্থনীতি শাস্ত্রে দ্বিতীয় বিভাগে শ্রীমতী সুষমা সেন গুপ্ত, দর্শন শাস্ত্রে দ্বিতীয় বিভাগে শ্রীমতী শান্তা চৌধুরী এবং এম্ এস্‌সি পরীক্ষাতে পদার্থ বিজ্ঞানে তৃতীয় বিভাগে, শ্রীমান সরোজকুমার চক্রবর্ত্তী উত্তীর্ণ হইয়াছেন; ইহাও আনন্দের বিষয়।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব নারায়ণগঞ্জ—বিগত ২৬এ অক্টোবর, শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ প্রমুখ কীর্ত্তনের দল এবং আরও অনেক ব্রাহ্ম এই উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ গমন করেন। মন্দিরটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সকালে কীর্ত্তন হয় ও শ্রীযুক্ত অমৃত লাল গুপ্ত উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে নারায়ণগঞ্জেই প্রীতি ভোজন হয়। অপরাহ্নে ২॥ টার সময় শত বার্ষিক উৎসবের উপকারিতা ও কি ভাবে উৎসব সম্পন্ন করিতে হইবে, তৎবিষয়ে আলোচনা হয়; শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আলোচনা উত্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ প্রভৃতি আলোচনায় যোগদান করেন। ৪ টার পর নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। ৬ টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন প্রার্থনা করেন। কীর্ত্তনান্তে উৎসব শেষ হয়।

গেণ্ডারিয়া—বিগত ২৯শে অক্টোবর সোমবার, সন্ধ্যার সময় গেণ্ডারিয়াতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনপ্রতিষ্ঠিত উপাসনা মন্দিরে সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার

দত্ত প্রমুখ কীর্ত্তন দল কীর্ত্তন করেন। অনেক বাহিরের লোকও যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস উপাসনা করেন। রাজকুমার বাবুর বাড়ীতে প্রীতিভোজন হয়।

উদার দান—ইতি পূর্ব্বে পিঠাপুরের মহারাজা শত-বার্ষিক মহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কমিটির হস্তে ১০,০০০ দশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি অন্ধ্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ কয়েক জন ট্রাষ্টীর হস্তে একলক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই টাকার সুদ হইতে প্রচার কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। মহারাজার এই শুভ অনুষ্ঠানের উপর মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

শুভ বিবাহ—বিগত ১৬ই অক্টোবর বানীবন গ্রামে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায়ের কনিষ্ঠা ভগিনী কল্যানীয়া লীলা ও শ্রীমান অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৮ই অক্টোবর পরলোকগত বেচারাম মল্লিকের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যানীয়া শেফালিকা ও পরলোকগত বিপিন-মোহন সেহানবিশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিবেকমোহনের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার মাতা ব্রহ্মমন্দিরের জন্য পাখা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বিগত ১৯শে অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরীর কন্যা কল্যানীয়া অলকানন্দার ও রায় বাহাদুর লক্ষীনারায়ণ চৌধুরীর পালিত পুত্র শ্রীমান বিনয়কুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পাতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

কটক ব্রাহ্মসমাজে শতবার্ষিক উৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বিগত ২৬শে অক্টোবর হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত কটকে শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বারিপদা (ময়ূরভঞ্জ) হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালেশ্বর হইতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পণ্ডা তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনের দলসহ, এবং গঞ্জাম (মাদ্রাজ) হইতে শ্রীযুক্ত জয়মঙ্গল রথ, কলিকাতার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস এবং বালেশ্বরের স্বর্গীয় পদ্মলোচন দাসের পত্নী শ্রীমতী উমাদেবী এই উৎসবে যোগদানার্থ তথায় গমন করেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। মহিলারা বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত কয়েকটী সঙ্গীত করেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যায় কটক টাউন হলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা হওয়া স্থির ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত লোক সমাগম হওয়ায় উক্ত হলের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনে উক্ত সভা হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি রাজার জীবনের স্থূল কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিশেষত্ব প্রদর্শন করেন এবং রাজাকে বর্ত্তমান ভারতের পথপ্রদর্শকরূপে বর্ণনা করেন। তৎপরে শ্রীমতী ইন্দুমতী সেনাপতি, বি, এ, ইংরাজীতে শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী, বি, এ, বাঙ্গলাতে, এবং কুমারী সুপ্রভাকর বি, এ, উড়িয়াতে রাজার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা এবং সময় সঙ্কেপনিবন্ধন অন্যান্য বক্তাগণের বক্তৃতা হইতে পারে নাই; কেবল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যায় আলোচনা সভা; শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় স্থির হয় যে উড়িষ্যাতে প্রতি বৎসর এক এক স্থানে ব্রাহ্মসম্মিলনী হইবে এবং উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কিভাবে হইতেছে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত জয়মঙ্গল রথকে এই সম্মিলনীর নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর—প্রাতে শ্রীযুক্ত বিশেশ্বর গুহ উপাসনা করেন। বৈকাল কটক টাউন ভিক্টোরিয়া হলে সামাজিক সম্মিলনী হয়।

৩০শে সেপ্টেম্বর—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রাও আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন।

অপরাহ্নে নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। স্বর্গীয় মধুসুদন রাও মহাশয়ের বাটীতে নগর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং ব্রহ্মমন্দিরে শেষ হয়। বাঙ্গলা, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষায় গান হয়। সহরের সকল শ্রেণীর লোক বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে এই কীর্ত্তনে যোগদান করেন। সন্ধ্যায় উপাসনা। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম এই যে মহাপুরুষেরা প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং এই বিরোধের সমাধানও করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন হিন্দু সমাজের বিরোধিতা করেন এবং এই বিরোধ দূরীকরণের জন্য নব আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সমাজ মানবাত্মার সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছে এবং মানবকে তাহার মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনের সমুদায় কার্য্যে প্রেরণা দিতেছে। এই দিনও মন্দিরে মহিলারা সঙ্গীত করেন এবং বিশেষ লোক সমাগম হয়।

এতদ্ভিন্ন উৎসবের সময় প্রাতঃদিন উষাকীর্ত্তন হইয়াছিল এবং উৎসবের শেষে রায় বাহাদুর ডাক্তার জয়ন্ত রাও হাঁসপাতাল সংলগ্ন বাগানে ও তাঁহাদের নিজ ভবনে এবং শ্রীযুক্ত নীলমণি সেনাপতি, আই, সি, এস, এর বাগানে সন্ধ্যায় বিশেষ ভাবে কীর্ত্তনাদি হয়। উষাকীর্ত্তন ও নগর কীর্ত্তনের ফলে নগর-বাসীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় এবং একদিন সন্ধ্যায় ভদ্রলোকদের অনুরোধে স্বর্গীয় উকীল বিশ্বনাথ সিংহের বাটীতে কীর্ত্তন হয়।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১লা অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ১৫শ সংখ্যা।	১লা অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯ 17th November, 1928.	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

প্রভু, তোমার দয়া কি কখনও ভুলতে পারি! আমি কোথায় ছিলাম, কোন ভাগাড়ে প'ড়ে ছিলাম, তুমি আমাকে তু'লে আন্‌লে, কত আশ্বাস বাণী শুনালে, কত আশা ও আনন্দ দিলে। জীবনে দুঃখ অনেক এসেছে, ব্যর্থতা অনেক এসেছে, বন্ধুজনের উপেক্ষাও অনেক এসেছে, তার মধ্যে তোমার স্পর্শ পেয়েই ত বেঁচে আছি, তোমার আশ্বাস বাণী শু'নেই ত খাড়া আছি। এখনও কত পাপ, কত মলিনতা; প্রাণ এক একবার দ'মে যায়; আমার চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যায়; আমি এক এক সময়ে সংগ্রাম কর্‌তে কর্‌তে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি; ইচ্ছা হয়, স্রোতে গা ঢেলে দেই। তখন তুমিই আবার এসে আশা দাও; সংগ্রামে বল দাও; তুমিই বল, ভয় নাই, সব দুঃখ ঘুচে যাবে, সব সংগ্রাম থেমে যাবে; তোমার অযাচিত করুণা, তোমার স্নেহের বাণীই আমাকে সজীব রেখেছে। হে প্রভু, তোমার মতন ভালবাস্‌তে আর কে পারে? তোমার মত আপনার জন আর কে আছে! কত অপরাধ কর্‌লাম, কতবার দূরে চলে গেলাম, তবুও তুমি ছাড়্‌লে না; সর্ব্বদা কাছে কাছে আছ, সর্ব্বদা শান্তি ও সান্ত্বনা দিচ্ছ, সর্ব্বদা প্রাণে বল সঞ্চার কর্চ্ছো। তোমার এই যে প্রেম, পাপীর প্রতি, অপরাধীর প্রতি এই যে স্নেহ, ইহার তুলনা নাই। তাই তোমার মুখের দিকে চেয়েই আমি বেঁচে আছি, তোমার প্রেম পেয়েই সুখে রয়েছি। তোমার স্পর্শ পেয়েই দুঃখ বেদনা সংগ্রামের মধ্যেও আনন্দ লাভ কর্চ্ছি। হে প্রভু, হে স্বামিন্, যদি এত দয়াই করেছ, তবে সম্পূর্ণ রূপে তোমার ক'রে নাও। তোমার চরণে প'ড়ে থাকি।

নিবেদন।

চিত্ত শুদ্ধি—ঈশ্বরকে লাভ কর্‌তে হ'লে চিত্ত শুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। কলুষিত হৃদয়ে তাঁহার প্রকাশ হয় না; মলিন মুকুরে প্রতিবিম্ব পড়ে না। কেবল কুকাজ হ'তে বিরত থাকলেই চিত্ত শুদ্ধ হয় না; কুকাজ হ'তে ত বিরত থাক্‌তে হবেই, কুচিন্তা হ'তে বিরত হ'তে হবে। কেবল তাহাও নয়, কুচিন্তার সম্ভাবনাও থাক্‌বেনা। কুচিন্তা, কুকার্য্যে সুখ পাই, কিন্তু কর্ত্তব্য বোধে মনকে কঠিন শাসনে তা হ'তে বিরত রাখি; এ সংগ্রামের অবশ্য প্রয়োজন আছে; এ সংগ্রামের ভিতর দিয়েইত যেতে হবে। কিন্তু এ সংগ্রাম যাতে না থাকে, কুচিন্তা কুকার্য্যে যাতে সুখও উৎপাদন না করে, কুৎসিৎ যাহা তাহা কুৎসিৎই বোধ হবে, তাতে বিরক্তি উৎপাদন কর্‌বে, পবিত্র যাহা, সুন্দর যাহা, তাতেই মন মগ্ন থাক্‌বে, এরূপ ভাব আসা চাই। কেবল ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হ'তে মুক্ত থাক্‌লেই চিত্ত শুদ্ধ হলো না; সত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে; অসত্য ভাব চিন্তা বাক্য ও কার্য্য আসবেনা। অভিসন্ধি বিশুদ্ধ থাক্‌বে; স্বার্থ প্ররোচনায় কোনও কার্য্যে প্রবৃত্তি হবে না। কারও প্রতি অপ্রেম ভাব আস্‌বে না। কারও অনিষ্ট কামনা আসবে না। আঘাত পেয়েও কাহারও অনিষ্ট কামনা আসবে না। এই হলো চিত্ত শুদ্ধির পথ। এই পথে অগ্রসর হ'তে হবে। যেমন এক দিকে সাধন চাই, চেষ্টা চাই, তেমনি অপর দিকে প্রভুর চরণে প্রার্থনা চাই। নিজের শক্তিতে কুলায় না; তাঁর করুণা ভিক্ষা কর্‌তে হবে। তিনি প্রেম সলিলে ধৌত ক'রে চিত্ত নির্ম্মল, পবিত্র, শুদ্ধ ক'রে দিবেন।

এত আঘাত নয়, আলিঙ্গনের টান— বঙ্কিমবাবুর "মৃণালিনী" গ্রন্থে আছে, রাজপুত্র হেমচন্দ্র অনেক দিনের পর মৃণালিনীকে পেয়ে ঘাটলায় বসে কত কথা বল্‌ছিলেন; হঠাৎ মৃণালিনীর কোন কথাতে হেমচন্দ্রের মনে কি ভাব এলো; তিনি উঁহাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চ'লে গেলেন। মৃণালিনী মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়লেন, মস্তক ক্ষত হলো, রক্ত ধারা পড়তে লাগল; সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে মৃণালিনী জিজ্ঞাস করলেন, রাজপুত্র কোথায়? পরিচারিকা হেমচন্দ্রের ব্যবহারে খুব বিরক্ত হয়েছিল; সে বল্‌ল, আবার রাজপুত্র! যার জন্য তুমি পাগল, সে তোমাকে কি আঘাত কর্‌ল, দেখ, ক্ষত দিয়ে রক্ত ধারা পড়্‌ছে? মৃণালিনী বল্লেন, কৈ, আঘাত? তিনি আমাকে কখন আঘাত কর্‌লেন? হেমচন্দ্র যে তাঁকে আঘাত করেছেন একথা মৃণালিনীর মনেই এলনা। প্রেম মানুষকে এমনই অন্ধ করে। প্রিয়জন আঘাত কর্‌লেও তা মনে থাকেনা। যেখানে প্রকৃত প্রেম সেখানে আঘাতও আঘাত বলে মনে হয় না। অনেক লোক আছে, প্রিয়জনের আঘাতে তারা বিরক্ত হয়, ক্রুদ্ধ হয়, প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে; সেখানে প্রেম আরম্ভই হয় নাই। অনেকে আঘাত পেয়ে, কষ্ট অনুভব করে বটে, কিন্তু প্রেমের খাতিরে তাহা অম্লান বদনে সহ্য করে। আবার আর এক উচ্চ শ্রেণীর প্রেমিক আছে, তারা প্রিয়জন যে আঘাত কর্‌ল, তা মনেই কর্‌তে পারেনা; মৃণালিনীরও সেই অবস্থা। ইহা অপেক্ষাও উচ্চ অবস্থা আছে; প্রিয়জনের যে আঘাত, তাহাযে তার প্রেমেরই আলিঙ্গন। তুমি যদি ঈশ্বরকে ভালবাস, সংসারে যে দুঃখ বেদনা পাও, তাতে ত অভিযোগ কর্‌বে না; এই দুঃখ বেদনাও তাঁর প্রেমের দান, তাঁরই প্রেমের আলিঙ্গন রূপে আনন্দে বরণ ক'রে যে নিতে পারে, তার প্রেমই প্রকৃত প্রেম। দুঃখকে দুঃখ ব'লেই মনে হবেনা, এযে আনন্দের রূপ, প্রেমের আলিঙ্গন, প্রিয়তমের সান্নিধ্য।

তিক্ততা—তোমরা সামান্য সামান্য বিষয় ল'য়ে বড় কোলাহল কর, একটু তোমার মনের মত কাজ না হ'লেই বিরক্ত হ'য়ে উঠ। আজ চাকর যথা সময়ে আসেনাই, মেথর ভালক'রে ঝাঁট দেয় নাই, পাচক ভাল করে রান্না করে নাই, পিয়ন যথা সময়ে চিঠি দেয়নাই; এসব ছোট ছোট অসুবিধায় মনকে চঞ্চল ক'রে তোল। আজ রাম কি বল্‌ল, শ্যাম কিরূপ ব্যবহার কর্‌ল, হরি এখনও এলনা, মন তিক্ত হ'য়ে উঠল। তোমরা তাহলে কেমন ক'রে প্রভুর চরণে বসবে! এই ভাব নিয়ে যখন প্রভুর চরণে বস, দশদিক হতে দশ চিন্তা এসে মনকে বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে; দশজনের ত্রুটি এসে মনকে তিক্ত ক'রে তোলে। অথচ তাঁর চরণে বস্‌তে হ'লে, তাঁর ধ্যান কর্‌তে হলে, মনকে শান্ত করা দরকার। তাই বলি, যদি তাঁকে চাও, তবে মনকে খুঁটি নাটির উপরে তোল। এই নিম্ন দেশে কত মেঘ বৃষ্টি, কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত। একবার উপরে উঠ দেখি, মেঘরাজ্যের উপরে যাও দেখি, সেখানে আলোক রাশি ছড়িয়ে রয়েছে। মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, ঝড় নাই; ক্ষুদ্রচিন্তা, স্বার্থের ভাবনা, আরাম স্পৃহা, তাহার উপরে উঠ; বাসনাকে সংযত কর; ছোট ছোট অসুবিধাকে অগ্রাহ্য কর; মনকে বিক্ষোভ হতে মুক্ত কর; ছোট ছোট বিষয় উপেক্ষা করতে শেখ; ভগবানের উপর ভার দাও; তিনি মঙ্গল করেন। তাতে বিশ্বাস কর, মন তিক্ততা হতে মুক্ত হবে। প্রিয়তমের সৌন্দর্য্য দেখ, তাঁতে ডোব, তাঁতে মুগ্ধ হও, বাহিরের অসুবিধায় মন বিক্ষিপ্ত হবেনা।

সম্পাদকীয়।

ভাল মানুষ ও খাঁটি মানুষ—যাঁরা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, তাঁদের মধ্যে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে; এক শ্রেণীর মানুষকে ভাল মানুষ বলা যায়, আর এক শ্রেণীর মানুষকে খাঁটি মানুষ আখ্যা দিতে পারা যায়। সংসারে ভাল মানুষ অনেক আছেন, কিন্তু খাঁটি মানুষ খুব কমই পাওয়া যায়। ভাল মানুষ যাঁরা, তাঁরা সকলের প্রিয় হ'তে চান, কাহাকেও তাঁরা অসন্তুষ্ট করিতে চান না; একদিকে তাঁরা যেন সাতেও নাই, পাঁচেও নাই; কোনও সংগ্রামের ভিতর তাঁরা যাইতে চান না, কোনও রূঢ় বাক্য তাঁরা বলেন না; কাহাকেও ব্যথা তাঁরা দেন না; সব গোলমাল হ'তে মুক্ত থাকিতে চান; আপনাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে চান। কিন্তু তাঁদের প্রধান দোষ এই, তাঁহারা কখনও "না" বলিতে পারেন না; যে যাহা বলে, তাতেই তাঁরা সায় দিতে প্রস্তুত হন। সুতরাং তাঁহাদিগকে সহজে মানুষ ভ্রান্ত পথে লইয়া যাইতে পারে। একজনে আসিয়া দুইটা তাঁর মনের মত কথা বলিয়া মন ভুলাইল, তারপর তাঁহাকে যেখানে যাইতে বলিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাতে "না" করিতে পারিলেন না; আবার আর একজন আসিয়া অন্যরূপ বুঝাইল, অমনি তার কথাতেও সায় দিলেন। ইহাঁরা যে প্রশংসা প্রিয়তার জন্যই এইরূপ করেন, তা নয়; অবশ্য প্রশংসাপ্রিয়তা হইতেও এই ভাব অনেক সময়ে আসে। কিন্তু এক এক জন লোকের প্রকৃতিই এইরূপ; তাঁহারা যে প্রশংসা প্রিয়, তাহাত নয়, তথাপি কাহাকেও অসন্তুষ্ট করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক সময়ে বুঝিতেও পারেন, যে এই লোকটা আমাকে ভুল বুঝাইয়া গেল, আমাকে বিপথে লইয়া যাইতেছে; কিন্তু তবুও আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন না। লোকে বলে, মানুষটি বড় ভাল; প্রাণটা বড় উদার; কাহাকেও দুঃখ দিতে চান না। উদারতা সম্বন্ধে বড়ই ভ্রান্ত ধারণা আছে; সকলের সকল মতে সায় দেওয়া, সকলের সঙ্গে সকল কাজে যাওয়া, ইহাই নাকি উদারতা। এই ভ্রান্ত উদারতাতে অনেক লোক বিপথে যায়, এবং তাহা দ্বারা দেশের ও দশের অকল্যাণ করে। কিন্তু এক একজন লোক আছেন, তাঁরা ভাল লোক ত নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁরা খাঁটি লোক। লোককে দুঃখ দেওয়া তাঁদেরও ইচ্ছা নয়; যার যতটুকু উপকার করা যায়, যাকে যতটুকু সুখী করা যায়, তাহা প্রাণপণে তাঁরা করেন। কিন্তু তাঁদের জীবনের একটা আদর্শ আছে, সেই আদর্শ অনুসারে তাঁরা চলিবেন। যদি কেহ আসিয়া আদর্শচ্যুত

করিতে চায়, তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে কুণ্ঠিত হন না। অবশ্য তাঁহাকে যে রূঢ় ব্যবহার করিতে হইবে, তাঁহার নিকট যে অন্যায় প্রস্তাব করে, তাহাকে যে অপ্রিয় ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা নয়; কিন্তু বিনীত ভাবে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা "না" বলিতে সমর্থ। তাঁহারা জানেন, যে আদর্শ অনুসারে আমাকে চলিতে হইবে; এই আদর্শ প্রতিষ্ঠাতে আমার কল্যাণ ও মানবের কল্যাণ; এই আদর্শ অনুসারে চলিতে যাইয়া, এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে যাইয়া আমাকে হয়ত লোকের অপ্রিয় হইতে হইবে, লোকে আমাকে হয়ত নিন্দা করিবে, নির্য্যাতন করিবে, তবুও আমাকে আদর্শ ধরিয়াই চলিতে হইবে। কারও প্রতি অপ্রেম করিব না, অপ্রিয় ব্যবহার করিব না, কিন্তু ঠিক খাঁটি পথ ধরিয়া চলিব; তাতে যদি লোক ক্ষুব্ধ হয়, বেদনা পায়, আমারত উপায় নাই। প্রহ্লাদ এই জন্যই পিতার কথা অনুসারে কাজ করিতে পারেন নাই; পিতাকে রূঢ় কথা বলেন নাই, কিন্তু তাঁর বাক্যও শুনিয়া চলিতে সম্মত হন নাই। জগতের মহাজনগণ আদর্শ ধরিয়াই চলিয়াছেন; আদর্শের জন্য বাঁচিয়াছেন, আদর্শের জন্য মরিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সংসারে এই খাঁটি মানুষ অতীব বিরল। কিন্তু এই খাঁটি মানুষেরই প্রয়োজন খুব বেশী। একটি খাঁটি মানুষ হইলে দেশ কত উপরে উঠিয়া যায়। একজন খৃষ্ট, একজন বুদ্ধ, একজন রামমোহন, একজন বিদ্যাসাগর, মানুষকে কত উন্নীত করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই বলি, খাঁটি মানুষ হইতে হইবে, আদর্শের নিকট খাঁটি হইতে হইবে, সত্যের নিকট খাঁটি হইতে হইবে, নিজের নিকট খাঁটি হইতে হইবে, ঈশ্বরের নিকট খাঁটি হইতে হইবে। এই কথা মনে রাখিয়া সকলে কর্ম্মপথে অগ্রসর হউন।

অন্যে কিরূপ দেখে—আমরা ধর্ম্মজীবন গঠন পক্ষে আত্মপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুব অনুভব করি। সংসারের স্রোতে ত আমরা অনেকে ভাসিয়া চলিতেছি। ঘটনার পর ঘটনা কোলাহলের পর কোলাহল আসিতেছে যাইতেছে। আমরা ঘটনার স্রোতে কোথায় যে যাইয়া পড়ি, তার ঠিকানা নাই। সুতরাং মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাবিতে হয়, আমরা কোথায় চলিতেছি, কোন পথে যাইতেছি, কোন লক্ষ্য সন্ধানে ছুটিয়াছি। আমাদের গম্য স্থানই বা কি, এবং চলিতেছিই বা কোথায়। এই আত্ম পরীক্ষা, খাঁটিভাবে সত্য অবস্থা জানিবার জন্য যে আত্ম পরীক্ষা, তাহার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সময় সময়, অন্যে আমাদিগকে কিরূপ দেখে, অন্যে আমাদের সম্বন্ধে কিরূপ ভাবে, তাহাও ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। সকল সময়ে আমরা আত্ম পরীক্ষা দ্বারাও আপনাদের অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হই না। অবশ্য অপরে যে নিন্দা বা প্রশংসা করে, তাহার মধ্যে অনেক সময়ে অনেক ভুল থাকে; তারা ত আমাদের অন্তরের সংগ্রাম জানে না, অথবা কি কারণে, কোন অবস্থাতে কি কার্য্য করি, তাহাত তাহারা বোঝে না; সুতরাং তাদের মতামতের মধ্যে অনেক ভুল থাকিতে পারে। তাহা [illegible] তাহারা কি বুঝে, তাহা বিরক্তির সহিত উপেক্ষা করা উচিত নয়। হয় ত একটু কঠোর ভাবে আমাদিগকে দেখিয়াছে, হয়ত আমাদের প্রতি অবিচার করিয়াছে; তবুও আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, তাহাদের কথার মধ্যে কতটা সত্য আছে। আমাদের সম্বন্ধে তাহারা নিন্দাই করুক আর প্রসংসাই করুক, তাহার মধ্যে সত্য কতটুকু তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে আমরা আমাদের ত্রুটি দেখিতে পাই না; অন্যে তাহা দেখিতে পারে। অথচ যে ভাল ভাবেও আমাদের ত্রুটি দেখাইয়া দেয়, তাহাদের উপর আমরা সন্তুষ্ট হইনা; আমরা যেন বলি, আমার আর সকল দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু তুমি যে দোষটির কথা বলিলে, ঐটি আমার নাই। এই রূপে অনেক সময় আমরা আত্ম প্রবঞ্চিত হই। এই ভাবে যে কেবল আমরা নিজেদেরই অনিষ্ট করি, তাহা নহে; আমাদের পুত্র কন্যাদেরও অনেক সময়ে অতর্কিত ভাবে অনিষ্ট করি। অবশ্য আমাদের পুত্র কন্যাগণকে আমরা দেখি, তাদের দোষগুণ আমরাই বেশী জানি; অন্যের জানিবার সুবিধা কোথায়? তবুও তারা যখন একটু বড় হয়ে উঠে, বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করে, নানা স্থানে একাকী গমন করে, তখন এমন অনেক কাজ তারা করিতে পারে, যাহা অন্যে দেখিতে পায় কিন্তু পিতা মাতা দেখিতে পান না। তখন যদি কোনও লোক সেই কথা পিতা মাতাকে জানান, তাহাতে অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। হয়ত তিনি সহানুভূতির সঙ্গে কথাটা বলেন নাই; তবুও তাঁহার কথাতে কোনও সত্য আছে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, অনুসন্ধান করা উচিত। এমনও দেখা যায়, পিতা মাতা যে দোষের জন্য নিজেরা সন্তানকে ভৎর্সনা করিতেছেন, সেই দোষের দৃষ্টান্ত যদি অপরে দেখাইয়া দেয়, তবে সেই পিতা মাতাই অসন্তুষ্ট হন। এরূপ হওয়া উচিত নয়। আমাদের প্রত্যেককেই আত্ম পরীক্ষা করিতে হইবে; আমাদের সন্তানগণ কিরূপ ভাবে চলে, কিরূপ আচার আচরণ করে, কাহাদের সঙ্গে মেশে, কোথায় যায়, তাহা দেখিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে অপরের সাহায্যও একান্ত প্রয়োজন। অপরে আমাদিগকে কি বলে, কি ভাবে দেখে, আমাদের সন্তানগণ সম্বন্ধে তাঁরা কি বলে, তাহাও আগ্রহের সহিত জানিতে চেষ্টা করা উচিত। তাহা যদি না করি, আমরা স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিব। সংশোধনের উপায় যখন আর থাকিবেনা, তখন নূতন নূতন কথা জানিয়া ব্যথিত হইব। সুতরাং অন্যে আমাদিগকে কিরূপে দেখে, আমাদের সন্তানগণ সম্বন্ধে কিরূপ বলে, তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত জানিতে চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন।

ব্রাহ্মসমাজের শক্তি, সম্পদ ও সহায়।*

একজন ব্যক্তিকে ভাল করিয়া জানিতে গেলে অথবা বুঝিতে হ'লে প্রথমেই তিনটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়ে।

---

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশৎবর্ষের উৎসবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ২৭শে চৈত্র রাত্রিকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম অবলম্বনে লিখিত।

তিনটি বিষয় এই—এই মানুষের শক্তি কি, সম্পদ কি, এবং সহায়ইবা কাহারা। শক্তি দিয়াই মানুষের বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য, সম্পদ দিয়া তাহার বাহিরের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সহায় দিয়াই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি সূচিত হইয়া থাকে। এই তিনটির যে কোন একটা না থাকিলেই মানুষ দুর্ব্বল এবং অপূর্ণ। কিন্তু মৌলিক শক্তিই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ। এই শক্তি বলিতে শারীরিক শক্তি নহে, মানসিক এবং আত্মিক শক্তিকেই বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে।

একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে এই তিনটী যেমন সত্য, পারিবারিক হিসাবেও তেমনি সত্য। কোন পরিবার সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে কিম্বা ভাবিতে হইলেও তাহার শক্তি, সম্পদ এবং সহায় কাহারা, এই বিষয়গুলি জানিবার জন্য মানুষ বিশেষ ভাবে অনুসন্ধিৎসু হইয়া থাকে। ব্যক্তি লইয়া যেমন পরিবার, তেমনি কতকগুলি পরিবার লইয়াইতো সমাজের সৃষ্টি। সুতরাং সমাজ সম্বন্ধেও সমাজের শক্তি, সম্পদ্ এবং সহায় কাহারা তাহা একান্তই বিচার্য্য।

আমাদের চারিদিকে বিপুল হিন্দুসমাজ, মুসলমান সমাজ এবং খ্রীষ্টীয় সমাজ রহিয়াছে। সে সকল সমাজের বিষয় আজ আলোচনা করিবনা। পঞ্চাশৎ বৎসরের উৎসবে আজ অসাম্প্রদায়িক এবং নব আদর্শের ব্রাহ্মসমাজের বিষয়েই আলোচনা করিব। ধর্ম্মকেই মূলে রাখিয়া সকল সমাজের প্রতিষ্ঠা আদি কালে হইয়া থাকিলেও ধর্ম্ম গৌণ হইয়া জন বল ও ধন বলের উপরেই যেন সমাজের উন্নতি অবনতির হিসাব চলিতেছে। লোক সংখ্যার অধিকাই যেন সমাজের মুখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ধর্ম্মসমাজের প্রকৃত শক্তি ধনে নয়, জনে নয়, জ্ঞানেও নয়। শক্তি ত্যাগে। ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত, বুদ্ধদেবের ত্যাগে বৌদ্ধ সমাজ, খৃষ্টের ত্যাগে খ্রীষ্টীয় সমাজ, চৈতন্যের ত্যাগে বৈষ্ণব সমাজ প্রথম কালে কি অপার্থিব শক্তিরই না পরিচয় দিয়াছিল! কালের গতির সঙ্গেই ত্যাগের শক্তি হ্রাস হইয়া সকল সমাজকেই দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ এক অভিনব সমাজ। এ সমাজের প্রত্যেক নরনারী, এক মহাশক্তির উৎস যিনি, সেই পরব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়াইতো শক্তিলাভ করিবে, ইহাইতো মূল কথা। ব্রাহ্মসমাজ একজনের ত্যাগে নয়, সকলের ত্যাগেই শক্তি লাভ করিবে। ব্রাহ্মসমাজে অর্থবান লোক কি নাই? আছে। সুরম্য সুশোভন অট্টালিকা কি নাই? তাও আছে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণেরও অভাব নাই। জ্ঞানী, পণ্ডিত, কর্ম্মী, কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইঁহাদের সংখ্যাই বা কমকি? বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞ, আইনজ্ঞ এরও একান্ত অভাব দেখিনা। কিন্তু ধর্ম্ম সমাজের যে শক্তিতে সকল শক্তিকে নিষ্প্রভ ও অকিঞ্চিৎকর করিয়া দেয় সে শক্তি এই সকলের ভিতরে নিছক ভাবে পাওয়া যাইবেনা। ঐ একমাত্র ত্যাগেই সে শক্তির জন্ম। ঋষিরা এই জন্যই বলিয়াছিলেন, একমাত্র ত্যাগেই কেবল অমৃতত্ব লাভ সম্ভব হয়।

এই ত্যাগেরও হেতু অথবা কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। বিনা হেতুতে, বিনা কারণে কোন কার্য্য হইতে পারেনা। ত্যাগ একটা বড় কার্য্য। তাহার মূল কারণ অনুসন্ধানে এক প্রেম বস্তুকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। জগতে যত কিছু মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তার গোড়ার কথাই হইল "প্রেম"। মানুষে এ প্রেম অর্পিত হইলে মানুষের জন্য মানুষের অদেয় কিছুই থাকেনা। মানুষ আত্ম বিসর্জ্জনে নাস্তানাবদ হইয়া ফকির হইয়াই এক অজেয় শক্তি লাভ করে। ইহাকেই বলে প্রেমের শক্তি। পার্থিবতার নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর অকিঞ্চিৎকর বস্তু সকলের বিসর্জ্জনেই মানুষ নির্ভীক হয়, নিশ্চিন্ত হয়। পার্থিবতার ভিতরে মানুষ যতক্ষণ, ততক্ষণই সে ভীত ছোট। প্রেম আছে, ত্যাগ নাই, ইহা কখনো প্রমাণিত হয় না। ইহা অদার্শনিক কথা। মানুষ সাক্ষাৎ ভাবেই হউক, আর গৌণ ভাবেই হউক, তাহার কোন না কোন রূপে প্রেমের সঞ্চার হইলেই বুঝিতে পারিবে, সে ভগবৎ প্রেমের দিকেই চলিয়াছে। কেননা প্রেমের পরিচয়ই বিসর্জ্জনে, ত্যাগে এবং আত্ম বিলোপে।

এক প্রেম বস্তুকে আমরা বুঝিতেও ভুল করি। ইহার মূর্ত্তি বা রূপ অসংখ্য। জীবনে জীবনে, গৃহে গৃহে, জনসমাজে ইহার বিচিত্র রূপের লীলাই চলিয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই প্রেমের রূপ চারিটী মূর্ত্তিতে যেন প্রকাশ করা হইয়াছে। মনে হয় সে শাস্ত্রে উচ্চ অঙ্গের সাধন সোপান রচিত হইল এই চারিটী স্তরে, প্রথম করুণা ২য় মৈত্রী ৩য় মুদিতা ৪র্থ উপেক্ষা। ইহার এক একটী ধরিয়া আলোচনা করিতেছি।

প্রথম করুণার কথা বলা হইল কেন? জীব মাত্রই করুণায় লালিত পালিত। নিষ্ঠুর নির্দ্দয় হিংস্র যে পশু পক্ষী, তাদের ভিতরেও সময়ে সময়ে এই করুণার অপূর্ব্ব প্রকাশ দর্শন করা যায়। মানুষ যতই নির্দ্দয় পাষণ্ড হউক না কেন, ঘটনা বিশেষে তার ভিতরেও আশ্চর্য্য ভাবে এই করুণার প্রকাশ দেখা সম্ভব হয়। বুঝিতে হইবে বিশ্ববিধাতা করুণার উৎস; তাঁর সন্তান হইয়া একেবারে নিষ্করুণ হইবার সাধ্য কাহারই নাই। সঙ্গীতে গাহিয়া থাকি—

করুণায় জীবন ধরি করুণাহীন হয় কেমনে?
অশ্রুদেখি অশ্রুপড়ে, হৃদয়ে হৃদয় টানে।
বিশ্বের পালক যিনি, করুণা নিধান তিনি,
তাঁহার করুণা পেয়ে নিদয় কে হবে ভুবনে?

করুণার অধিকারী কে? যে আর্ত্ত, দুঃস্থ, দুঃখী, তাপী, পাপী সেই। যে জন প্রাণবান্, হৃদয়বান্ দয়ার্দ্রচিত্ত, সেই করুণা বিতরণে ক্ষমবান্। করুণা করাই তাহার স্বভাব। খৃষ্ট জগতের, বৌদ্ধ জগতের চিত্রগুলি স্মরণ করিলে, করুণার কত নিদর্শন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। দুঃস্থ ও পতিত জনকে উদ্ধারের জন্য, কত প্রতিষ্ঠান, কত আশ্রম, তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্যক্তিগত জীবনেই এই করুণা প্রকাশিত হইয়া এই বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই করুণার ভিতর দিয়াই প্রেমের প্রথম প্রকাশ। এখানে এই করুণার ভিতর দিয়াই মানুষ, সেবা করে রাত্রি জাগে, রোগীর মল মূত্র মুক্ত করে, অর্থদান করে। আরো কত প্রকারেই তো ত্যাগধর্ম্মে শক্তি লাভ করে। ব্রাহ্মসমাজের অতীতের ইতিহাস করুণার সাক্ষ্যে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট জনেরাইতো কত পতিতকে পবিত্র করিলেন, কত পতিতাকে [illegible]

দিলেন, কত নিরাশ্রয়ের অন্নসংস্থান, কত রোগীর ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থাবিধান, কত পথভ্রষ্ট জনকে সুপথে আনয়ন করিলেন, নিষ্পেষিত হীন জাতি বলিয়া যাহারা সমাজে ও দেশে ছোট হইয়াছিল, তাহাদিগকেও উচ্চাসনে বসাইলেন। আসামের কুলীকাহিনীর করুণ ইতিহাস কি সকলে ভুলিয়া গেলেন? সঞ্জীবনী সম্পাদক করুণার বীর কৃষ্ণকুমারের লেখনীর বাণী, সর্ব্বত্যাগী রামকুমার বিদ্যারত্নের আসাম ভ্রমণ ও কুলীদিগের উন্নয়নচেষ্টার ইতিহাস এদেশ কি ভুলিয়া গিয়াছে? এই করুণার ইতিহাস মধ্যে প্রেমেরই অস্ফুট প্রকাশ। এই প্রকাশেই ত্যাগ-ধর্ম্মের সৃষ্টি। এখানেই ব্রাহ্মসমাজ শক্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছিল। অতীতের ব্যক্তিগত ব্রাহ্মজীবন করুণার সাধনকে স্বতঃই সহজে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সে প্রভাব মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে বলিলে অসত্য হইবেনা। এখন জনহিতসাধন, পতিতের উদ্ধার, বন্যা পীড়িতের রক্ষা, দুর্ভিক্ষে অন্নাভাবমোচনকার্য্যও চলিতেছে কিন্তু তাহা যেন অনেকটা বিচারবুদ্ধি ও সভাসমিতির নির্দ্দেশ সাপেক্ষ। যাই হউক, জনহিতসাধন একটা বড় কার্য্য, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্ম্মসমাজে ইহাপেক্ষাও বড় কার্য্য ব্যক্তিগত জীবনে করুণার সাধন এবং তাহার স্বতঃস্ফুরণ। ইহাতেই আত্মোৎকর্ষ এবং আত্মশক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই শক্তি লাভই ধর্ম্ম জীবনের লক্ষ্য বস্তু। ত্যাগে তাহার প্রকাশ মাত্র।

এই প্রসঙ্গে এই কথাই আসিয়া পড়িতেছে। প্রেমধর্ম্মের সাধনপথে করুণার সোপানে একটা দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন করুণার সাধনে সাধকজীবনে আমিত্বের, কর্ত্তৃত্বের, একটা স্থান আছে। অপর দিকে করুণার পাত্রের প্রতি একটা কৃপা অথবা দয়ার ভাব, যাতে নিজের অপেক্ষা একটু হীন ভাবের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে, এজন্য এই করুণার ভিতর দিয়া মানুষের প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং অহঙ্কারেরও সূচনা হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম জীবনে ইহাকে নিম্নস্তরের অবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ইহার উপরের স্তরে মৈত্রীর কথা বলা হইয়াছে। মৈত্রী মিত্রতা, বন্ধুতা অর্থাৎ সমভাব, আপনার ন্যায় যেখানে ভাল বাসা, এক ভাব, এক কার্য্য; এ জন্য কাব্য শাস্ত্রে বলা হয় "এক ক্রিয়া ভবেন্মিত্র"—এই অবস্থার ভিতরে প্রেমের অতি উন্নত ভাবের অবস্থা দৃষ্ট হয়। প্রেমের এই অবস্থার ভিতরে কর্ত্তৃত্বের স্থান নাই। ছোট বড় বিচার নাই। এখানে প্রেমের সমভাবের আদান প্রদান হইয়া থাকে। রাজাদিগের মধ্যেও কতকগুলি অধীন রাজ্য এবং মিত্ররাজ্য আছে। রাজায় রাজায় যেখানে সমঅবস্থার আদান প্রদান, সেখানে তাঁহারা পরস্পর মিত্ররাজ্য বলিয়া শাসন পালন করিয়া থাকেন। প্রেমের রাজ্যে মিত্র ভাবটী বড় মধুর, বড়ই সুন্দর এবং অতীব শ্রেষ্ঠ। করুণার ভিতরে দাস্য ভাবের ছায়া আছে, মৈত্রীর ভিতরে তাহা নাই, প্রভু ভাবও নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মের পঞ্চরসের ভিতরে সখ্য অথবা মিত্র ভাবের স্থান অতি উচ্চ। উপনিষদেও এ ভাবটার স্থান পরমেশ্বরের সঙ্গে অতি উন্নত স্তরে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ব্যক্তিগত জীবনে এভাবের স্মরণে জীবন মধুময় হইয়া উঠে। মিত্র ভাবের বিস্তার আদান প্রদান, দর্শন স্পর্শন ও আলিঙ্গন প্রভৃতি রস মাধুর্য্যে জীবন সাম্যরসে ভরপুর হইয়া যায়; সাধক জীবনে এই ভাব যখন উদার ভূমি প্রাপ্ত হয়, তখন করুণার স্তর ছাড়িয়া সকলকে বন্ধুরূপে, মিত্র রূপে দেখিতে ইচ্ছা হয়। এই ভাব আসিলেই প্রভুত্ব কর্ত্তৃত্ব এবং আমিত্বের লোপ হইয়া আইসে। কারুর প্রতি আর তাচ্ছিল্য অবহেলার অবসর আইসেনা। এই মৈত্রী হইতেই সাম্যের সৃষ্টি হয়। সর্ব্বত্রই সকলের ভিতরেই নিজকে দর্শন করিয়া অপূর্ব্ব প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। তখন সেবা প্রেমের পথে কত সহজ হইয়া উঠে।

দয়ায় সকল স্তরের ভিতরেই কর্ত্তৃত্ব এবং সম্ভ্রম সম্মানের ভদ্রতা সৌজন্যের কতকগুলি রীতিনীতি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মৈত্রীর ভিতরে তাহা নাই। এ ভাব প্রাণে উদিত হইলে ক্ষুদ্রকে ভাই সম্বোধনে তার কথা লিখিলে সেখানে স্বর্গ অবতীর্ণ হয়। একবার বিখ্যাত ঋষি টলষ্টয় রাজপথে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। পথপার্শ্বস্থ এক ভিখারী তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করে। টলষ্টয় পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন পকেটে কিছু নাই। তখন সমবেদনায় কাতর হইয়া ভিখারীকে বলিলেন "ভাই! তোমাকে আমি কিছু দিতে পারিলাম না—আমার পকেটে কিছুই নাই।" তখন ভিখারী অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে বলিল "আপনিতো আমাকে অনেক দিয়েছেন?" টলষ্টয় বলিলেন, "কোথায়? কিছুতো দেই নাই।" ভিখারী আবার বলিল, "এই যে কত মিষ্ট 'ভাই' সম্বোধন করিলেন! এমন করিয়া আর তো কেহ সম্বোধন করে না? ইহাতেই প্রাণ শীতল হইয়াছে"!

প্রথম যুগের ব্রাহ্মসমাজে এই মিত্র ভাবের আশ্চর্য্য স্ফুরণ হইয়াছিল। জাতির বন্ধন, মানের বন্ধন, উচ্চ পদের বন্ধন, সকল বন্ধনইতো শিথিল হইয়া গিয়াছিল। কি অপূর্ব্ব সাম্য আসিয়াছিল! কি বান্ধবতার চিত্রই প্রকাশিত হইয়াছিল! এই মিত্রভাবের প্রভাবেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গত সভায় বন্ধুদের সম্মিলনে সকলের অজ্ঞাতে মধুর প্রসঙ্গে রজনী প্রভাত হইয়া যাইত। এক জন অপর জনকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই মৈত্রী ভাব লইয়া ভিন্ন ভিন্ন এক এক সাধক-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র, প্রতাপ চন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, অঘোর নাথ, কান্তি চন্দ্র, ত্রৈলোক্য নাথ, উমানাথ, শিবনাথ, আনন্দমোহন, দুর্গামোহন, কালী নাথ, উমেশ চন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, নগেন্দ্র নাথ, নবদ্বীপ চন্দ্র, কৃষ্ণকুমার, হেরম্ব চন্দ্র, দ্বারকা নাথ, সীতা নাথ, আদিত্য কুমার, ক্ষেত্রমোহন, বিপিনচন্দ্র, মথুরামোহন, চণ্ডীচরণ, গিরিশচন্দ্র সর্ব্বানন্দ, কালীমোহন, শ্রীনাথ, অমরচন্দ্র, শরৎ চন্দ্র, জগদ্বন্ধু, রজনীনাথ, নব কান্ত প্রভৃতি সহর ও মফঃস্বলের কত ব্রাহ্ম যে এই মিত্র ভাবে আবদ্ধ হইয়া কত শত লোককে বন্ধু করিয়াছিলেন, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কত প্রাণযোগে যে সজ্ঞবদ্ধ হইয়া সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত, সেবা চলিত, নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইত। আজ কত চিত্রই মনে হইতেছে। স্বর্গীয় গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় বাড়ী বাড়ী গিয়া সকালে সন্ধ্যায় রোগীদের খবর লইতেন। মফঃস্বলের বন্ধুরা আসিলে তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। স্বর্গীয় নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাধু সদাত্মা শয্যাগত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়,

কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় (পণ্ডিত মহাশয়) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বন্ধুভাবে, কত যে সেবা কত যে যোগ জিজ্ঞাসা, কত যে তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। আজ সে চিত্র স্মরণ করিলে ব্রাহ্মসমাজ এই প্রেমধর্ম্মের স্তরে কত নিম্নে পড়িয়াছে। আজ তেমন প্রেমের হস্ত আছে কি? আজ সেই মৈত্রীর ভূমি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে কি? কত স্বর্গীয় দৃশ্য, কত মধুর চিত্র ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বত্র দর্শন করিয়াছি, আজ আর কত কথা বলিতে পারি? অতীতের সে কথা বলিতে কত সুখ! শুনিতে কত সুখ—ভাবিতেও প্রাণ পুলকিত হয়। সে যে অফুরন্ত চিত্র, অফুরন্ত কাহিনী!

প্রেমের তৃতীয় স্তরে মুদিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে। মুদিতা কি?—অপরের সুখে সুখী হওয়া—অপরের অভ্যুদয়ে ও আনন্দে আনন্দিত হওয়া। অপরের দুঃখে দুঃখ হইতে পারে, অশ্রু মুচান সহজ হইতে পারে, নিজের প্রিয় বস্তু অর্পণ করিয়া নিজেকে বিপন্ন করিয়া অপরকে উদ্ধার করাও সম্ভব হইতে পারে; যাহাকে ভালবাসি তাহাকে অদেয় কিছু না থাকিতেও পারে। কিন্তু একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুও যখন কৃতিত্বগুণে, যশে, মানে কীর্ত্তিতে বড় হইয়া উঠিল, মানুষ তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে না, সুখী হইতে পারে না। এজন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মে মুদিতা এক বড় সাধন। এখানে প্রেমের এক বড় পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় বহু প্রেমিক এজগতে পরাজিত হইয়াছেন। আবার স্বাভাবিকভাবে জগতে এক শ্রেণীর লোক এই মুদিতা গুণ লাভ করিয়া প্রেমের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগে এই মুদিতার স্থান অতি উচ্চে ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঋষি রাজনারায়ণ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং ভক্ত বিজয়কৃষ্ণকে কিরূপ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, অভ্যুদিত ও অভিনন্দিত করিয়াছিলেন! পরবর্ত্তীকালে স্বর্গীয় দুর্গামোহন, শিবনাথ এবং আনন্দমোহন এই ব্যক্তি বর্গের ভিতরে কি অপূর্ব্ব মুদিতা ধর্ম্ম প্রভাবান্বিত হইয়াছিল! তাহার পরেও অনেক প্রাচীন ব্রাহ্ম প্রেমাস্পদ বন্ধুর কৃতিত্ব অভ্যুদয় যশমান খ্যাতি প্রতিপত্তি দর্শনে আশ্চর্য্যভাবে আনন্দিত ও সুখী হইয়াছেন। আজ সে মুদিতার প্রভাব ও প্রকাশ তেমন দেখিতেছি না। এই মুদিতা-সাধনে মানবে দেবত্বের প্রকাশ ও প্রভাব দর্শন করিতে হইবে।

প্রেমের চতুর্থ প্রকাশ উপেক্ষায়। উপেক্ষা অর্থ তাচ্ছিল্য নহে। অপেক্ষাও নহে, ঘৃণাও নহে। উপেক্ষা অর্থ অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছনীয় ব্যবহার ও ঘটনাগুলির উপরে অপ্রেম জাগিতে না দিয়া ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব পরিহার করিয়া ঘটনা ও কার্য্যকে উর্দ্ধে তুলিয়া দেখা। ইহাতে চিত্তের নির্ব্বিকার মুক্ত শান্ত ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। নিন্দা, ভৎর্সনা, প্রতিকূলতা, প্রতিবাদিতা, হিংসা, বিদ্বেষ যাহা কিছু কর্ম্মক্ষেত্রে আসুক না কেন, সমস্তই শুভ্র বস্ত্রের ধূলির মত মানুষ ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে। মনে বা চিত্তে কিছুমাত্র দাগ পড়িতে পারে না। বড় বড় অট্টালিকার উপরে লৌহ শিকগুলি মাথা উচু করিয়া যেমন বজ্র বিদ্যুৎকে অপসারিত করিয়া দেয়, উপেক্ষার সাধক প্রেমিক পুরুষদিগকেও তেমনি ভাবে সংসারের দুর্জ্জয় বজ্র বিদ্যুৎকে অপসারিত করিতে দেখা গিয়াছে। স্বচক্ষে ব্রাহ্মসমাজ-ক্ষেত্রে অভাবনীয়রূপে অনেক ব্রাহ্মসাধককে এই উপেক্ষা সাধন করিতে দেখিয়াছি। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ, সেবক সর্ব্বানন্দ, আচার্য্য গিরিশচন্দ্র, শান্ত সাধক ইন্দুভূষণ রায় প্রভৃতির উপেক্ষার দৃষ্টান্তগুলি প্রাণে জাগিতেছে। আরো কত জীবনে এই উপেক্ষার অপূর্ব্ব প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে, তাহা অনেকেরই চক্ষে ভাসিতেছে। এই উপেক্ষার সাধনে ব্রাহ্মসমাজ আজ কত নিম্নে দাঁড়াইয়াছে! আজ ৫০ বৎসরের ইতিহাসের পর্য্যালোচনায় সকলেরই তাহা ভাবিবার বিষয়। এ বিষয়ে আর অধিক কথা বলা সম্ভব নহে।

এতক্ষণ শক্তির কথা বিশদ করিয়া বলিয়াছি। এখন ব্রাহ্মসমাজের সম্পদের কথা বলা প্রয়োজন। স্থূল চক্ষে সাধারণ লোকেরা ধন ঐশ্বর্য্য, বিত্ত বিভব, যশ মান, খ্যাতি প্রতিপত্তি, পদ গৌরবকেই সমাজের সম্পদ বলিয়া মানিয়া লয়। কিন্তু ধর্ম্মসমাজের সম্পদ কি তাই? কখনো নহে। যেখানে পার্থিবতা, সাংসারিকতা, ধন মানের হিসাব, সেখানে ধর্ম্মের স্থান নাই। ধনের প্রয়োজন আছে; যশ-মানও বর্জ্জনের বস্তু নহে, তাহা সাধু কর্ম্মের ও কৃতিত্বের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার। অর্থের প্রভাব সংসারে যথেষ্ট আছে। কিন্তু অর্থ যখন বড় হয়, তাতে অনর্থ অবশ্যম্ভাবী। এজন্য লোকে বলে অর্থই অনর্থের মূল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে সংসার ধর্ম্মের সামঞ্জস্যে ভিতরে পরমার্থকে লইয়াই অর্থকে ব্যবহার করিতে হইবে। তাতে অর্থে আর অনর্থ ও অমঙ্গল আসিতে পারে না। সুতরাং পরমার্থ-সম্পন্ন ব্যক্তিরা এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই ধর্ম্ম-সমাজে বড়। তাদের হাতেই অর্থ ব্যবহৃত হইবে। তা হইলে ধর্ম্ম-সমাজে ধর্ম্মের স্থানই উপরে দাঁড়ায়। ধনের স্থান নিম্নে। অতএব এই কথাই বড় কথা যে, ধর্ম্ম-সমাজে অথবা ব্রাহ্মসমাজে ধনের ও সম্পদের প্রয়োজন থাকিলেও পার্থিব ধন ও বিত্ত-বিভবই সম্পদ নহে। ব্রাহ্মসমাজে আজ বহু লোকেরই পার্থিব ধন সম্পদ-সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, বিলাস বিভব, এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং উচ্চপদ লাভের দিকে একটা প্রবল গতি দেখা যাইতেছে। সত্য কথা বলিতে কি, বাস্তব পক্ষে ব্রাহ্মগণ এজন্য কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। এই বাহিরের ধন সম্পদের দিকে যিনি যে পরিমাণে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, তিনি অধ্যাত্ম রাজ্যে সেই পরিমাণে দুর্ব্বল ও সাহসহীন হইয়া ধর্ম্মের অমোঘ দুর্জ্জয় বীর্য্য হারাইয়া ফেলিতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজের পুত্র কন্যাগণের উত্তরাধিকার-সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের অতীতের ও বর্ত্তমানের সাধুভক্ত বিশ্বাসী, ত্যাগী ধার্ম্মিক পুরুষগণের এবং পরাবিদ্যার অধিকারী জ্ঞানীগণের জীবনই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ সম্পদ লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ নাই। উদার জাতিত্ব! সকলেরই সমান অধিকার। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র, ত্যাগী শিবনাথ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ, যোগী অঘোরনাথ, জ্ঞানী ভক্ত নগেন্দ্রনাথ, চিরকুমার নবদ্বীপচন্দ্র, সাধক প্রকাশচন্দ্র, শান্ত সাধক ইন্দুভূষণ, আচার্য্য গিরিশচন্দ্র, সেবক সর্ব্বানন্দ,

গৃহস্থ যোগী উমেশচন্দ্র, ভক্ত কালীনারায়ণ, যোগী আনন্দ চন্দ্র, জ্ঞানযোগী কালীনাথ, চিরকুমার ভুবনমোহন, ভক্তিমান রজনীকান্ত প্রভৃতি সাধু, বিশ্বাসী ভক্তগণের জীবনগুলি ব্রাহ্ম-সমাজের কত বড় সম্পদ! আরো কত মহাজন এই ব্রাহ্ম-সমাজের বক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া এই শতাব্দীর ভিতরে ৫০ বৎসরে কি অপূর্ব্ব জীবন সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম-পুত্রকন্যাগণ আজ তাহা গভীররূপে অনুভব করুন—তাঁরা কত বড় সম্পদের অধিকারী!

সম্পদ্ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই, দেশের ভিতরে এই ৫০ বৎসরের মধ্যে বহু বিজ্ঞ জ্ঞানীর আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার লাভ করিয়া বহু ব্যক্তি আজ সমাজের সম্পদরূপে বর্ত্তমান। তাঁহাদিগকে ভুলিলে, উপেক্ষা করিলে আমরা সম্পদ-হীন হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িব। তত্ত্ববিদ্যায় ভূষিত হইয়া ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ, প্রতাপচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, আদিত্যকুমার, কালীনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ, জীবিতদিগের ভিতরে ডাঃ পি. কে, রায়, তত্ত্বভূষণ সীতানাথ, জ্ঞানযোগী ব্রজেন্দ্রনাথ, সুপণ্ডিত হীরালাল, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র, চিরকুমার প্রফুল্লচন্দ্র, শাস্ত্রযোগী জগদীশ, বিপিনচন্দ্র, তত্ত্বজ্ঞ প্রাণকৃষ্ণ, কৃষ্ণকুমার, সত্যানন্দ, সতীশচন্দ্র, ধীমান সুবোধচন্দ্র, পণ্ডিত রজনীকান্ত, তীক্ষ্ণধী ধীরেন্দ্র-নাথ, এবং তৎপরবর্ত্তী প্রবীণ ও জ্ঞানী যুবকগণের জ্ঞান চর্চ্চার জীবন বাস্তবিকই ব্রাহ্মসমাজের কত বড় সম্পদ! এই দুই প্রকারের গৌরবময় শক্তিসম্পন্ন অক্ষুণ্ণ জীবন সম্পদের প্রতি আস্থা রাখিয়া পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম পুত্রকন্যাগণকে সম্পদশালী হইতেই হইবে। এদিকে দৃষ্টিহীন হইয়া সংসারের কৃতিত্ব, উচ্চপদ, তেতালা বাড়ী, মোটর-কার, প্রমোদ-উদ্যান, পাশ্চাত্য বিলাস বিভবের দিকে গতি মতি রাখিলে সে সকল ধর্ম্ম সমাজের সম্পদের বিষয় হইবে না। তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্ম সমাজের বিনাশ সাধন করিবে। সকলে স্মরণে রাখুন, প্রাচীন ধর্ম্ম-সমাজের সকলের সম্পদ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের জীবন ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই সকল ধর্ম্ম-সমাজে যখনি ধার্ম্মিক জীবনকে অবহেলা করিয়া, অতিক্রম করিয়া ধনীর স্থানই উচ্চে উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে তখন হইতেই ধর্ম্ম-সমাজ সম্পদহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞান-প্রধান, বিচার-প্রধান, স্বাধীন বিচারের সমাজ, আদর্শ-সমাজ; এ সমাজ ধর্ম্মজীবনকেই চিরদিন শ্রেষ্ঠ সম্পদ জানিয়া তাঁহারই সাধন, তাঁহারই বৃদ্ধির জন্য একান্ত ভাবে লাগিয়া পড়িয়া রহিবে, ইহাই বড় আদর্শ ও সাধনা।

সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মের সংখ্যা ৫ হাজারের অধিক নহে। ৩০ কোটির ভিতরে ৫ হাজারের স্থান অতি সামান্য, ভাবিতেও দুঃখ এবং লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় ৫ হাজার লোক কি অপরের সহায়তা বিনা বাড়িতেছে? এই ৫ হাজারের পশ্চাতে সহায়রূপে যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত উদার ও বিচারশীল ব্যক্তি এবং একনিষ্ঠ উপাসকদল বর্ত্তমান রহিয়াছেন। চারিদিকের আবেষ্টনের প্রতি আজ উদার নেত্রে দৃষ্টি পাত করিতেই হইবে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের নব অভ্যুদয়। হিন্দুর শাস্ত্র এবং হিন্দু-শক্তির ভিতর দিয়াই ইহার প্রথম প্রকাশ। এজন্য বহু কারণে দলে দলে লোক আসিয়া আজ যোল আনারূপে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় নিতে পারেন নাই অথবা বহুলোক স্বতন্ত্র সমাজ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন না। কিন্তু তাঁহারা আট আনা, দশ আনা, কেহবা বার আনা রূপে এই ধর্ম্মের ও সমাজের সঙ্গে প্রাণ যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অর্থ দিয়া, চিন্তা দিয়া, নিষ্ঠা ভক্তি পূর্ণ উপাসনায় যোগ দ্বারা কতরূপে সমাজকে সাহায্য করিতেছেন। আজ এই মন্দির পূর্ণ করিয়া যাঁহারা বর্ত্তমান, তাঁদের ভিতরে ব্রাহ্ম অপেক্ষা সহানুভূতিকারক সহায়ের সংখ্যা কত যে অধিক, তাহা কি একটা বড় দর্শনীয় বিষয় নহে? মাঘোৎসবের বিপুল উৎসবে, নগরে নগরে, সাপ্তাহিক উপাসনায় মন্দির পূর্ণ করিয়া কাহারা আমাদিগকে সবল করিয়া তুলিতেছেন? নগরে নগরে মন্দির নির্ম্মাণে, উৎসবের অর্থ সংগ্রহে, কীর্ত্তনে গানে, সর্ব্ব প্রকার হিতসাধনে এই অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণকে তুচ্ছ করিলে ব্রাহ্মসমাজ কত দুর্ব্বল, কত সহায়হীন! ইঁহাদের বিনা ব্রাহ্মসমাজ শুকাইয়া যায়। কত দুর্ব্বল! ব্যক্তিগত ভাবে আপদে বিপদে ইঁহারা ব্রাহ্ম বন্ধুদের জন্য যাহা করেন, অনেক ব্রাহ্মনামধারী বন্ধুগণ তাহা করিতে পারেন নাই, অথবা পারিবেন না।

এই দলের লোকদিগকে লইয়া এবং দেশের নানা বিধ হিত সাধনে যাঁহারা জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছেন, নিরাকার উপাসনার প্রবর্ত্তন চেষ্টা করিতেছেন, বিপন্নের উদ্ধারে চেষ্টিত হইতেছেন, সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইতেছেন, রাজ-নৈতিক আন্দোলনে যাঁহারা নগর ধর্ম্মের সন্ধান দিতেছেন—এই সমস্ত শ্রেণীর লোকই ব্রাহ্মসমাজের সহায়। আমি ইঁহাদের নাম রাখিয়াছি, বড় ব্রাহ্মসমাজ। ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বৃত্ত পরিধিতে থাকিয়া কেন্দ্রে অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শের দিকে আসিবেন, ইহাই তাঁদের সাধনার বিষয়। আর মুষ্টিমেয় আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদল কেন্দ্র অর্থাৎ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশের সকলকে কেন্দ্রের দিকে, ষোল আনা ব্রাহ্ম জীবন লাভের দিকে টানিয়া আনিবেন, ইহাই হইল ব্রাহ্মগণের কর্ত্তব্য। সুতরাং সকল সমাজের এই যে নবজাগরণ এসেছে, আদান প্রদান, বিনিময় ও সাহচর্য্যের ভাব এসেছে—তাহা অতি মঙ্গলজনকই বলিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে এই যুগে সকলেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। ব্রাহ্ম-সমাজ এই দিনে তাঁদের উদার আদর্শকে উদার প্রাণে গ্রহণ করিয়া সকলকেই সহায় রূপে গ্রহণ করিবেন। ইহাতেই ব্রাহ্ম সমাজ অসাম্প্রদায়িক—এবং সার্ব্বজনীন নামের যোগ্য! কত আনন্দ হয় ভাবিতে জগতের নরনারী ব্রাহ্মসমাজের আজ কত বড় সহায়! সাবধান থাকিতে হইবে ব্রাহ্মসমাজকে—যেন তাঁদের অসাম্প্রদায়িক সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হারাইয়া না যায়। তাঁদের উন্নততর সাধনা হইতে—ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মনাম-রসপানের অধিকার কিছুতেই খর্ব্ব না হইয়া পড়ে।

উপসংহারে আবারো বলি—ব্রাহ্মসমাজের ভাই ভগিনী, ভবিষ্যতের আশা ভরসার স্থল ব্রাহ্ম পুত্র কন্যাগণ—ত্যাগ-মাহাত্ম্যে শক্তি লাভ কর, আমাদের বাহিরের সম্পদকে আশ্রয় না জানিয়া ঐ উজ্জ্বল অতীতের এবং বর্ত্তমানের সাধু ভক্ত, ত্যাগী,

যোগী বিশ্বাসী শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক পুরুষগণের জীবনকেই সম্পদ জ্ঞান করিয়া তাহার অনুরূপ জীবন গঠনে প্রকৃত সম্পদশালী ও সম্পন্ন হও। আর দেশের ও বিভিন্ন সমাজের লোকদিগের যে উদার সহানুভূতি ও সাহচর্য্য পাইতেছ, কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহা গ্রহণ করিয়া, স্বীকার করিয়া—তাঁহাদিগকে আপন জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণে ষোল আনা আপন করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধ শতাব্দীর স্বর্ণ জুবিলি উৎসব সার্থক হইবে। আজ এই মহোৎসবের অন্তঃভাগে গুরুজন-দিগকে প্রণাম করি। সমবয়স্ক সাধক সাধিকাগণকে নমস্কার, পুত্র কন্যাগণকে স্নেহাশীষ অর্পণ করি। ধন্য হউক, তাঁর নাম, ধন্য হউক তাঁর নাম।

ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অভিভাষণ।

আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ, আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! প্রতি বৎসর এই সময়ে আমরা অনেকগুলি ভাই বোন সমবেত হইয়া কি আনন্দে দয়ালের দয়ার গুণগান করিয়া থাকি! বৎসরান্তে এই সঙ্গ লাভ করিবার জন্য আমাদের মন তৃষিত হইয়া থাকে। এই বৎসরটি আবার আমাদের এই মিলনোৎসবের একটি বিশেষ বৎসর। ব্রাহ্মসমাজের এক শতাব্দী পূর্ণ হওয়াতে যে-বিশেষ আনন্দ ও যে-বিশেষ কৃতজ্ঞতা আমাদিগের হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার পরিবেষ্টনের মধ্যে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর এই বিশেষ অধিবেশনটি হইতেছে।

আমি কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতার বড় পক্ষপাতী। ধর্ম্মসাধনে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাকে অনেকে luxury অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। এই দুই বস্তু ধর্ম্মজীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের এই নিন্দা শোনা যাইত যে ইহারা দুঃখবাদী ও অতি ক্রন্দনশীল; ইহাদিগের নিকটে বসিলে মানুষের মন বিষাদে পূর্ণ হইয়া যায়। সম্প্রতি আবার কিছুকাল হইতে যেন ব্রাহ্মসমাজের এই লক্ষণ হইয়াছিল যে ইহারা একটা হতাশ, নিরুদ্যম, আপনাতে বিশ্বাস-হারা মানুষের দল। কেন তাহা হইবে? সেণ্ট পল্ বলিয়াছেন, ঐশ্বরিক ভাবের প্রবাহ যখন মানবজীবনে কার্য্য করে, তখন তাহার ফল হয়, প্রেম আনন্দ ও শান্তি, সহিষ্ণুতা কোমলতা ও সহৃদয়তা, বিশ্বাস বিনয় ও সংযম। তিনি ঈশ্বরানুপ্রাণনের বিবিধ ফলের মধ্যে প্রেম ও আনন্দকে প্রথম দুই স্থান দিয়াছেন। ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার একটি অমূল্য উপদেশে বলিয়াছেন, ধর্ম্মজীবনের ফল, আশা আনন্দ ও বল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস তো দয়ালের দয়ার প্রবাহের ইতিহাস। তবে আমরা কেন হতাশ নিরানন্দ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকিব? রামমোহন, যিনি এত প্রতিকূলতা ও সংগ্রামের মধ্যেও নিজ দেশের উপরে, নিজ যুগের উপরে এমন আশা স্থাপন করিয়া-ছিলেন, যিনি ভবিষ্যতের এমন উজ্জ্বল ছবি নিজ মানসপটে অঙ্কিত করিয়াছিলেন,—দেবেন্দ্রনাথ, যিনি আজীবন আনন্দ-রূপমমৃতমের সাধক ছিলেন,—কেশবচন্দ্র, যিনি হাস্যময়ী মায়ের ও আনন্দময় শ্রীহরির উপাসক ছিলেন,—তাঁহাদের ঘরের মানুষ হইয়া আমরা কেন বিষণ্নমুখে থাকিব? ব্রাহ্মগণ যেন কিছুকাল যাবৎ কৃতজ্ঞ ও প্রফুল্ল হইতে ভুলিয়া যাইতেছিলেন। শতাব্দী-উৎসব আসিয়া তাঁহাদিগের এই ভাব আবার পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছে।

কৃতজ্ঞতা ও আনন্দই শতাব্দী-উৎসবের প্রধান কথা। আমরা কি-কথা বলিবার জন্য, কি-গান গাহিবার জন্য, এই উৎসবে নানা স্থানে যাইতেছি? আমাদের কীর্ত্তিকথা কীর্ত্তিগাথা নয়। ব্রাহ্ম-সমাজ যে এদেশের মধ্যে একটি খুব শ্রেষ্ঠ সমাজ, এবং আর সকলে যে ইহার অপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ, এই কথা নয়। কিন্তু পরম দয়ালের দয়ার কথাই স্মরণ করিতেছি, স্বীকার করিতেছি, পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এক শতাব্দী পূর্ব্বে মানুষ তাহার অন্তরবাসী ঈশ্বরকে চিনিত না, তাঁহাকে বাহিরে খুঁজিত; এখন তিনি নিজ করুণায় আমাদের পিতারূপে মাতারূপে আমাদের অন্তরে দর্শন দিয়াছেন। এক শতাব্দী পূর্ব্বে পরিবারের পুত্র কন্যাগণ পিতামাতার যথেচ্ছ ব্যবহারের পাত্র ছিল, পিতা-মাতার সম্মুখে তাহাদের কোন স্বাধীনতা কোন অস্তিত্ব ছিল না; এখন দয়াল পিতা আমাদের বিবেককে ও আমাদের সন্তানদের বিবেককে যুগপৎ আলোকিত করিতেছেন; আমাদের সন্তানদের অন্তরে আমরা এমন একটি বস্তু দেখিতে পাইতেছি যাহার নিকটে আমরা শ্রদ্ধায় মস্তক নত করি। এক শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রায় কত কঠোর কৃত্রিম বন্ধন ছিল; পতি পত্নী দিবাভাগে সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না; এখন দয়াময় পিতা সেই সকল কৃত্রিম বাধা ঘুচাইয়া দিয়া আমাদের পরিবারগুলিকে কত পবিত্র প্রভাবের কেন্দ্রস্থল ও কত পবিত্র সুখের আধার করিয়া তুলিয়াছেন। এক শতাব্দী পূর্ব্বে পুরুষ ছিল নারীর পীড়ক ও প্রভু; এখন বিধাতা পবিত্রতর নব আদর্শের দ্বারা পুরুষের মস্তককে নত ও হৃদয়কে কোমল করিয়া, পুরুষকে নারীর সেবক ও বন্ধু হইতে শিক্ষা দিয়া, নারীর প্রভাব ও নারীর সাহচর্য্যকে পুরুষের পক্ষে পবিত্র ও মধুময় করিয়া দিয়াছেন। এক শতাব্দী পূর্ব্বে সমাজ ছিল সমাজপতিগণের ও পুরোহিতগণের পক্ষে আধিপত্য পরিচালনের ক্ষেত্র, এবং অপর সকলের পক্ষে অন্ধভাবে বশ্যতা স্বীকারের ক্ষেত্র; এখন আমরা এমন এক ধর্ম্মমণ্ডলীতে স্থান পাইয়াছি, যেখানে সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া এক দয়ালের জয়গান করিতেছি, এবং উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে পরস্পরের চরিত্র হইতে সাধুতার ও মহত্ত্বের প্রভাব নিজ আত্মাতে সংক্রান্ত করিয়া লইতেছি। ভগবানের এই সকল করুণার জন্য প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, তাই আমরা নানা স্থানে উৎসব করিয়া বেড়াইতেছি।

ব্রাহ্মদিগকে বলিতে ইচ্ছা হয়, হে ব্রাহ্মগণ, ভাল করিয়া আনন্দ কর ও কৃতজ্ঞ হও। হতাশ নিরুদ্যম নিস্তেজ ভাব ঘুচাও। এই স্বভাবকে পরিবর্ত্তিত কর। নতুবা আমাদিগকে ঘোর অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। প্রথমতঃ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে

আমরা অপরাধী হইব। কারণ, ঈশ্বর রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তেজঃস্বরূপ। যদি ব্রাহ্মদের ভাবগতিক ইহার বিপরীত হয়, তবে লোকে বুঝিবে যে ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর নিরানন্দ, এবং যে-ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইহারা মানুষকে আহ্বান করে, তাহা একটি প্রাণহীন রসহীন বস্তু। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের প্রতি আমরা অপরাধী হইব। কারণ, জনসাধারণ পুস্তক পাঠ করে না; অতীত যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে ও বর্ত্তমান যুগের অবস্থা সম্বন্ধে তাহারা সম্মুখের মানুষগুলিকে দেখিয়াই একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লয়। যদি ব্রাহ্মদের ভাবগতিক জনসাধারণের মনে এই অসত্য ধারণা জন্মাইয়া দেয় যে ব্রাহ্মসমাজ অতীত যুগে কিছু করে নাই অথবা বর্ত্তমান যুগে কিছু করিতেছে না, তবে তাহাতে ঘোর অপরাধ হয়। তৃতীয়তঃ, ভারতের চক্ষুষ্মান্ সমজদার লোকদের বিরুদ্ধে আমরা অপরাধী হইব। জনসমাজে কোন্ বস্তুটি সারবান্ ও কোন্ বস্তুটি অসার ইহার প্রকৃত বিচার যাঁহারা করিতে সমর্থ, ভারতের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মসমাজের মূল্যটি যাঁহারা যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ, এমন মানুষ এদেশে অনেক রহিয়াছেন। তাঁহারা সংবাদপত্রে বহু-ঘোষিত মানুষের তালিকাভুক্ত নহেন, কিন্তু তাঁহারাই প্রকৃত দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন মানুষ। তাঁহারা যখন ব্রাহ্মদের মধ্যে এই নিরুদ্যম ও হতাশ ভাবটি লক্ষ্য করেন, তখন তাঁহারা বিস্মিত হইয়া ভাবেন, "এরা কি-অন্ধ যে এমন অধিকার লাভ করিয়া আপনারাই তাহার মর্য্যাদা বুঝিতেছে না।" চতুর্থতঃ, আমাদের পরস্পরের প্রতিও আমরা অপরাধী হইব। কারণ মানুষে মানুষে তুচ্ছ ভেদবুদ্ধি ও কলহ বিবাদ ভাসাইয়া দিবার ও ধৌত করিয়া দিবার পক্ষে উচ্ছলিত কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতা যেমন শক্তি ধরে, এমন শক্তি আর কিছুতে নাই।

এই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার ভাবে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া, হে বিদেশাগত বন্ধুগণ, আপনাদিগকে আমি আজ শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা করি। কত দূর দূর স্থান হইতে কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া আপনারা এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। সুদূর ইংলণ্ড হইতে য়ুনিটেরিয়ান এসোসিয়েশন ভারতের ব্রাহ্মসমাজের সহিত হৃদয়ের গভীর প্রীতিযোগ অনুভব করিয়া তাঁহাদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের পবিত্র প্রেমধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, কেমন করিয়া দেশের ব্যবধান, ভাষার পার্থক্য, পূর্ব্বশিক্ষা ও সভ্যতার বৈষম্য, সব অতিক্রম করিয়া মানুষে মানুষে একাত্মতা সৃষ্টি করে, তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা এই শতবার্ষিক উৎসবে বার বার দেখিতে পাইতেছি। এই য়ুনিটেরিয়ান বন্ধুগণকে আমাদের আর বিদেশী মানুষ অথবা বিজেতা জাতির মানুষ বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের সঙ্গে এমন মনের মিল ও এমন সৌহার্দ্দ হইয়া গিয়াছে যে ইঁহাদিগকে ঘরের লোক বলিয়াই মনে হয়। ইঁহারা দেখিতে পাইবেন যে আমরা ইঁহাদের আহার বিহারের রীতি নীতি বিষয়ে ভালরূপ অভিজ্ঞ না হইলেও, আমাদের হৃদয় আমরা ইঁহাদিগকে দিয়া রাখিয়াছি। ইঁহারা দেখিতে পাইবেন যে আমাদের রামমোহন ও কেশবচন্দ্রকে, আমাদের বার্ত্তাবহনকারী আরও কত সেবককে, ইঁহারা যে-সমাদর ও যে-সহায়তা করিয়াছেন, আমাদের প্রেরিত ছাত্রদিগকে ইঁহারা যে-যত্ন ও স্নেহ করিয়াছেন, সর্ব্বোপরি, আমাদের প্রতি ইঁহারা যে আত্মীয়তা ও ভালবাসা অনুভব করেন, তাহা আমাদের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি আপনাদের পরিচর্য্যার জন্য যথাশক্তি পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিলেও, কত ভুল ত্রুটির, কত স্খলন বিচ্যুতির আশঙ্কা তাঁহাদের মনে সর্ব্বদাই জাগিয়া রহিয়াছে। আপনারা যদি নিজ ঔদার্য্যগুণে ভাই বোন বলিয়া তাঁহাদের সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন। সেই অভ্যর্থনা সমিতি আজ আপনাদিগকে তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিবার ভারটি আমাকে দিয়াছেন। কেন এই ভার আমাকে দিলেন তাহা জানি না। কারণ এই স্থানের অধিবাসী হইলেও, আমি তাঁহাদের পরিশ্রমের ভাবনার বা দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু আনন্দ-উৎসবে অনেক স্থানে দেখিতে পাই, মাল্যচন্দন দিয়া অভ্যাগতগণকে সংবর্দ্ধনা করিবার ভারটি দেওয়া হয় শিশুদিগকে, যাহারা অন্য কোন কাজ করে না, যাহারা অন্য কোন কাজের যোগ্য নয়, কিন্তু যাহারা এই ভারটি পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তেমনি, আমার হৃদয়ের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাই বুঝি আমার এ কাজের যোগ্যতা।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দুই যুগের ছবি।

যে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই সম্মিলনীর জন্ম, যাহার মন্দিরে আজ আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি, তাহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছে। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ কিছুকাল নির্জ্জীব অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। দেবেন্দ্রনাথ যোগদান করিয়া যখন তাহাতে নবজীবন সঞ্চার করিলেন, তাহার অত্যল্পকাল পরেই ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের সজীব যুগের সহিত এই ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ প্রায় সমবয়স্ক। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপদ্ধতিতে ও মানুষের প্রকৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ উভয়েরই কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সেই সকল বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় ঢাকার এই ব্রাহ্মসমাজও ৮২ বৎসর ধরিয়া নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছেন, এবং এই দীর্ঘকালে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার রীতি-নীতিতে পারিবারিক সম্বন্ধসকলের আদর্শে ও সমাজশৃঙ্খলায় বিপুল পরিবর্ত্তন সকল দর্শন করিয়াছেন।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে তিনটি যুগ-বিভাগ সুস্পষ্ট। প্রথম, দেবেন্দ্রনাথের ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রভাবের যুগ; দ্বিতীয়, কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথের প্রভাবের যুগ; এবং তৃতীয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পর্কের যুগ। প্রথম দুই যুগের দুই প্রধান পুরুষের, অর্থাৎ স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের, জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই দুই জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া আমি দুই যুগ সম্বন্ধে আমার নিজের কয়েকটি চিন্তা আপনাদের কাছে নিবেদন করিব। এই দীর্ঘ ৮২ বৎসরে

অনেক ভক্ত ত্যাগী কর্ম্মী এই ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন, এবং স্বীয় স্বীয় চরিত্রের ও ধর্ম্মজীবনের ছাপ ইহার জীবনে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের উল্লেখ করা এস্থলে সম্ভব নহে। তাঁহাদের অনেকেরই জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইবার যোগ্য। প্রসঙ্গতঃ ইহা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী শীঘ্র প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রথম যুগের নামে আমি দেবেন্দ্রনাথের সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নামও যুক্ত করিতেছি কেন? তাহার কারণ আছে: এই পত্রিকাপ্রকাশ বঙ্গদেশের একটি যুগপরিবর্ত্তনকারী ঘটনা। বঙ্গদেশের শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাসের একটি যুগ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যুগ" বলিয়া চিহ্নিত হইবার যোগ্য। কলিকাতায় এই পত্রিকাখানি একদিকে হিন্দুকলেজের শিক্ষাভিমানী স্বেচ্ছাচারপ্রিয় মানুষগুলির শ্রদ্ধা সবলে আকর্ষণ করিয়া লইল, ও তাঁহাদিগকে সংযত হইতে শিক্ষা দিল; অপর দিকে দেশাভিমানী রক্ষণশীল মানুষগুলির সম্মুখে ভারতের প্রকৃত সম্পদ যে বেদ ও উপনিষদ তাহাকে উচ্চ করিয়া ধরিল, ও তাঁহাদিগকে ব্রহ্মোপাসনার প্রতি সম্মান দান করিতে বাধ্য করিল। ইহা লঘু প্রকৃতির সংবাদপত্রসকলকে ভদ্রলোকের পাঠাগার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। ইহা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ দেশহিতব্রত চরিত্রবান্ মানুষদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া বঙ্গাকাশে যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা অভ্যুদিত করিল, এবং তাঁহাদিগের প্রভাব ও শক্তিকে শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিল। মফঃসলে এই পত্রিকাখানি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে নব আলোক বিকীর্ণ করিতে লাগিল; ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য উন্মুখ মানুষ যিনি যেখানে পড়িয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিল ও পরস্পরের সহিত যুক্ত করিয়া দিল; এবং অনেকগুলি ব্রাহ্মসমাজের জন্মের হেতুভূত হইল। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের জন্ম এইরূপেই হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতাদিগের অগ্রণী ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় বয়সে দেবেন্দ্রনাথের অপেক্ষা তিন বৎসরের মাত্র ছোট ছিলেন। কি সূত্রে তিনি নবধর্ম্মের বার্ত্তা প্রথম অবগত হন, তাহা এখন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহার এবং তাঁহার বন্ধুগণের চিত্তকে বিশেষ ভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে তাঁহাদের প্রধান সহায় ও অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছিল।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অন্যূন বিংশতিটি ব্রাহ্মসমাজের জন্মদাতা। এই একখানি পত্রিকা সে যুগে যাহা করিয়াছিল, উত্তরকালে কোনও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক তাহা করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। দেবেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠবের প্রতি তাঁহার জাগ্রত দৃষ্টি ইহাকে এমন শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। আর, আমরা আমাদের সাহিত্য ও পত্রিকাদির বিষয়ে যে কিরূপ উদাসীন ও শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছি, কিরূপ লঘুভাবে তাহা আরম্ভ করি, কত সামান্য প্রস্তুতি ও পরিশ্রম করিয়া তাহা পরিচালন করি, তাহার উৎকর্ষ বিষয়ে আমাদের মনের আদর্শকে আমরা কত যে ছোট করিয়া লইয়াছি, তাহা ভাবিলে মনে গভীর লজ্জার উদয় হয়।

এই প্রথম যুগের মানুষগুলির জীবনের ছবি ও তাঁহাদের সংগ্রামের ছবি কালের কুয়াসায় ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। জীবনী-গ্রন্থের পত্র হইতে সে ছবি দেখিতে আমার বড় ভাল লাগে। এই যুগে বহুদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মগণ গ্রামের সহিত ও একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের পরিবারটি একটি বিশাল একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল। সে পরিবার যেন দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি হৃদয়গুণের বিহারভূমি ছিল। তাহাতে রক্তের সম্পর্কিত মানুষের সংখ্যাই কত, তার উপরে গ্রামবাসী প্রজাগণও প্রায় পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রজসুন্দরের তেজস্বিনী ও উদারহৃদয়া বিধবা জননী এই বিপুল রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী ছিলেন। এইরূপ একচ্ছত্র প্রভুত্বের ভালটুকু (অর্থাৎ এতগুলি আশ্রিতের সুশৃঙ্খল সেবা), এবং মন্দটুকু (অর্থাৎ বয়স্ক পুত্রদের দাম্পত্যজীবনের সুখশান্তির বাধা), উভয়ই এই পরিবারে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মহামনা ব্রজসুন্দর এই কল্যাণটুকুর দিকে চাহিয়া সব সুখ শান্তি ও স্বাতন্ত্র্য, এক কথায় ধর্ম্ম বিনা আর সমুদয়, বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই আত্মসুখপরায়ণতার যুগে সেই অপূর্ব্ব আত্মবিলোপের ছবিটি দেখিতে বড়ই ভাল লাগে। যুবক ব্রজসুন্দর, বিবাহের পরেই নব পরিণীতা বালিকা পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া, আজীবনের জন্য এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতেছেন যে, আমাদের সংসারে আমরা মাতাকেই কর্ত্তৃত্ব করিতে দিব, নিজেরা কোন অধিকার চাহিব না; উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, দেশবিদেশে সম্মানিত উপার্জ্জক পুত্র ব্রজসুন্দরের ও তাঁহার পত্নীর যে-পরিবারে কর্ত্তা ও কর্ত্রী হইবার কথা, সেই পরিবারেই তাঁহারা দাস ও দাসীর ন্যায়, আমরণ কত ক্লেশ লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে আপনাদের সেই মহৎ সঙ্কল্প রক্ষা করিয়া চলিতেছেন; ব্রজসুন্দরের অবলম্বিত নবধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাঁহার অন্তরে এই কঠোর প্রতিজ্ঞা পালনে বল সঞ্চার করিতেছে,—এই দৃশ্য দেখিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ হই, উপকৃত হই। পৃথিবীতে চিরদিনই নবদম্পতী পারিবারিক জীবনে স্বাতন্ত্র্যের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হন। মানবচিত্তের ইহা স্বাভাবিক স্পৃহা। এদেশে পূর্ব্বে সে স্বাধীনতা নবদম্পতীর প্রাপ্য ছিল না; উত্তরকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে তাহা দান করিয়া আমাদের পারিবারিক সুখকে কত বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কিন্তু কল্যাণের জন্য যখন প্রয়োজন হইয়াছে, তখন সে সুখকেও বিসর্জ্জন দিতে এই ব্রাহ্মধর্ম্মই একদিন মানুষকে শক্তি দিয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিয়া আজ আমরা গৌরব অনুভব করি।

নবধর্ম্মের ও তাহার নব আদর্শের অভ্যুদয়ে এই সকল পরিবারে কি আশ্চর্য্য বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল! ব্রজসুন্দর, মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া স্বীয় বালিকা কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা দিলেন। মাতা, ব্রজসুন্দরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া সেই কন্যাকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অল্পদিনের মধ্যে সেই কন্যা বিধবা হইল। তখন ব্রজসুন্দর তাহাকে ঢাকার আবাসবাটীতে লইয়া গিয়া তাহার পুনর্বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ব্রজসুন্দরের মাতা সংবাদ পাইবামাত্র নৌকা করিয়া গ্রাম হইতে ঢাকায় আসিলেন; কন্যার মাতাকে পদাঘাত করিলেন, যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন; এবং গভীর রাত্রিতে সেই কন্যাকে গোপনে লইয়া গিয়া নিজ নৌকায় তুলিলেন। শেষরাত্রিতে, কন্যাকে কে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ব্রজসুন্দর কন্যার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, নদীতীরে ছুটিয়া গেলেন। নৌকা তখনও ছাড়ে নাই; তিনি নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করাতে তাঁহার বিপুলকায় মাতুল দাদা তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বচসা ও কলহ করিতে করিতে সকলে তীরে উঠিলেন। তীরে উঠিয়াই ব্রজসুন্দরের মাতা নিজের গলায় দড়ি দিলেন। তাঁহাকে অনেক করিয়া বাঁচান হইল। ত্বরিতের মধ্যে এত ঘটনা ঘটিয়া গেল!

দ্বিতীয় যুগে যখন কেশবচন্দ্রের আদর্শে যুবকদল সমাজসংস্কারে ও সত্যের অনুসরণে আরও অগ্রসর হইলেন, তখন এ সকল সংগ্রাম আরও ঘনীভূত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তখনও ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ব্যক্তিগণ গ্রামের সহিত ও একান্নবর্ত্তী বিশাল পরিবারসকলের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন না। সাধু প্রকৃতির একটি লক্ষণ এই যে তাহা সাংসারিক সম্পদ ও ধর্ম্মসম্পদ উভয়ই আত্মীয়গণের সঙ্গে বাঁটিয়া ভোগ করিতে চায়। নবকান্ত-প্রমুখ যুবকগণ যেমন বিশাল বংশে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাদের বিশাল মনও ছিল। তাঁহাদের এক এক জনের সুদূরপ্রসারী ভালবাসার শিকড়, কত জনকে নিজের সঙ্গে বাঁধিয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছে। তাঁহারা কত অসহায়া বিধবাকে, এবং বীভৎস বহুবিবাহের যূপকাষ্ঠে বলিদানের জন্য আবদ্ধ কত কুলীনকুমারীকে, দুর্গম গ্রামে গ্রামে গোপনে পরিত্রাণের বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন, অভয় দান করিয়াছেন, এবং অবশেষে তথা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছেন। চুরি করিয়া মানুষ উদ্ধার করিবার সেই সকল দুঃসাহসিকতার কাহিনী, সেই অন্ধকার রাত্রিতে নদী ও খালে সাঁতার দিয়া নৌকায় আরোহণ, সেই ষোল দাঁড়ের নৌকায় রাতারাতি দেশ হইতে দেশান্তরে গমন,—এ সকল কাহিনী স্মরণ করিলে এখনও আমাদের ধমনীতে রক্ত বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। বীরপ্রসবিনী নদীবহুলা বিক্রমপুরভূমি কঠোর জননীর ন্যায় তাঁহার সন্তানদিগকে বাহিরের উত্তাল তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সমাজসংস্কারের উত্তাল তরঙ্গের সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

নবকান্ত ও তাঁহার সঙ্গিগণের ধনবল ছিল না, জনবল ছিল না; ছিল কেবল ধর্ম্মের জন্য একান্ত আত্মোৎসর্গের ভাব। তাঁহারা যে-প্রহার, নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা, পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বহিষ্কার ও রাজদ্বারে দণ্ড নিজ নিজ জীবনে সহ্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণ ব্রাহ্মসমাজের ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। উত্তরযুগে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক কৃতী যশস্বী সন্তান, ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের ইতিহাসকে স্বর্ণমাণিক্যে খচিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু, সেই স্বর্ণরত্নসমান উন্নত প্রকৃতির ও উন্নত ধাতুর মানুষগুলিকে কোন্ খনিতে পাওয়া গিয়াছিল? সুখসমৃদ্ধিময় নগরে নয়; যেখানে মানুষ দুঃখে বর্দ্ধিত হয়, ও আত্মবিলোপে অভ্যস্ত হয়, সেই পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য পরিবার সকলে। মানুষ বড় হয় দুই রকমে। কেহ বড় হয় ঘটনার ও সুবিধার যোগাযোগে, কেহ বড় হয় বড় মনের ও প্রতিভার জোরে। চিরকালই প্রথমটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় সহরে; সে যুগে দ্বিতীয়টি খুঁজিয়া আনিতে হইত গ্রাম হইতে। গ্রামের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা, মানুষের সঙ্গে পুরাসম্বন্ধ সহজে ছিন্ন করিয়া না ফেলা,—ইহা পূর্ব্ববঙ্গের সে যুগের ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ গৌরব ছিল।

বিগত শতাব্দীতে সমাজরীতির পরিবর্ত্তন।

আর এ কাহিনীকে দীর্ঘ করিব না। তৃতীয় যুগের কথা আমি কিছুই স্পর্শ করিব না। আমার উদ্দেশ্য ইতিহাস আলোচনা করা নয়, নিজের দু একটি চিন্তাকে ব্যক্ত করা মাত্র। বিগত শতাব্দীর মধ্যে সমাজ-রীতির কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! একদিন ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় কন্যার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন; আর এখন হিন্দুসমাজ, এমন কি মুসলমান সমাজ পর্য্যন্ত, নারীদিগের শিক্ষা বিষয়ে কত অগ্রসর হইয়া যাইতেছেন! একদিন সমবিশ্বাসী জালালউদ্দীন মিঞার সহিত যুবক ব্রাহ্মগণ আহার করাতে এই নগর তোলপাড় হইয়া গিয়াছিল; আর এখন আহার বিষয়ে জাতিভেদ তো লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। পুরোহিতের আধিপত্য এখন আর প্রায় নাই। বাল্যবিবাহের অনিষ্ট সকলেই বুঝিতেছেন। বালবিধবার পুনর্বিবাহের সংগ্রামের একটি চিত্র আপনারা দেখিলেন। বিধবা স্বর্ণময়ী ও সুদক্ষিণার উদ্ধারের জলন্ত কাহিনীও এই ব্রাহ্মসমাজেরই ইতিহাসের সহিত জড়িত। সে দিন এখন আর নাই, বিধবার পুনর্বিবাহ এখন কত সহজ। কুলীনকুমারী বিধুমুখীর উদ্ধারের রোমহর্ষণ কাহিনী এখন অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হইয়াছে; কৌলীন্য প্রথার এখন মুমূর্ষু অবস্থা। একান্নবর্ত্তী পরিবার এখন আর অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। নারীর অবরোধ ক্রমশঃ দূর হইতেছে। কে এ সকল চিন্তার পরিবর্ত্তন, আদর্শের পরিবর্ত্তন, সমাজরীতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে? কোন্ শক্তির নিকটে, কোন্ প্রয়াসের (movementএর) নিকটে এ সকল পরিবর্ত্তনের জন্য বঙ্গদেশ ঋণ স্বীকার করিবেন? কেহ বলিবেন, এ সকল ঘটিতেছে কালবশে; কেহ বলিবেন, ইংরাজী শিক্ষার গুণে; কেহ বলিবেন, ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায়। কেহ হয়তো বলিবেন, প্রাচীন সমাজ স্বয়ং ধীরে ধীরে আপনাকে পুনর্গঠিত করিতেছেন। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে কার কতখানি হাত আছে তাহা নির্ণয় করা, সকলের প্রাপ্য প্রশংসা সকলকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিভাগ করিয়া দেওয়া,—ইহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কাজ। সেই প্রশংসা, ভবিষ্যৎ ইতিহাসের নিকট হইতে ঋণস্বরূপ অগ্রিম চাহিয়া লইয়া নিজের হিসাবে জমা করিতে ব্রাহ্মসমাজ ব্যস্ত নহেন।

যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকে একেবারেই অস্বীকার করিতে চাহেন, তাঁহাদের উপযুক্ত উত্তর ব্রাহ্মসমাজ অনেকবার দিয়াছেন। সম্প্রতি আবার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ মহাশয় অখণ্ডনীয় যুক্তির অস্ত্রে সে মিথ্যাজাল ছিন্ন করিতেছেন। যাহা হউক, যাহার গুণেই হউক, হিন্দুসমাজ যে এখন চলিষ্ণু, ইহা আমাদের পরম আনন্দের বিষয়। যাঁহারা এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের এঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের নিজের এঞ্জিন হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু নিরাপদে এবং সুপথে চলিতে হইলে, ভাল করিয়া রাস্তা বাঁধিতে হয়, বুঝিয়া লাইন ফেলিতে হয়। তার জন্য চাই সতর্ক নৈতিক দৃষ্টি; তার জন্য চাই অগ্রসর হইবার সাহস; তার জন্য চাই বাধা বিপত্তিতে দৃঢ়তা, ও ত্যাগের শক্তি; এবং তার জন্য সর্ব্বোপরি চাই কল্যাণের একটি বিমল ও বিশাল আদর্শ। উন্নত উদার ধর্ম্ম বিনা কে এ সকল মানব-অন্তরে সঞ্চার করিতে পারে?

ধর্ম্মের কল্যাণরক্ষিণী শক্তি, ও অতীতের প্রাণসম্পদ্

যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক পরিবর্ত্তন সংঘটন বিষয়ে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের বিচারের জন্য ব্যস্ত নহেন। কারণ, এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য অথবা প্রধান কার্য্য নহে। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজ। ধর্ম্মের কাজ কেবল কাল ও যুগকে পরিবর্ত্তিত করা নয়; কেবল চল' চল' বলিয়া সমাজকে ত্বরা দেওয়া নয়। ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সমুদয় শাশ্বত কল্যাণকে রক্ষা করাও ধর্ম্মেরই কাজ। সমাজকে অগ্রসর হইতে কে বলে? ধর্ম্মই বলে। এবং সমাজকে, যাহা কিছু কল্যাণকর তাহা রক্ষা করিতে কে বলে? তাহাও ধর্ম্মই বলে। বঙ্গসমাজ যদি স্বয়ং চলিষ্ণু হন, তবে হয়তো ব্রাহ্মসমাজ নব শতাব্দীতে ধর্ম্মের এই রক্ষণমূলক কার্য্যে অধিক মনোযোগ দিবার অবসর পাইবেন। আমার মনে হয়, এদিকে দৃষ্টি দিবার সময় আসিয়াছে। ধর্ম্মই মানবসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল কল্যাণরক্ষিণী শক্তি। ব্রাহ্মধর্ম্মকে যে-সময়ে ভারত সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল কল্যাণরক্ষিণী শক্তি হইয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে, সেই সময় আসিয়াছে।

ব্যক্তিগত চরিত্রে ও সমাজ-সংস্থিতিতে যে সকল প্রাণসম্পদ্ (soul-wealth) নিহিত থাকে, তাহাকে রক্ষা করা, তাহার বিকাশ করা, তাহার দ্বারা বহুমানবকে প্রভাবিত করা, ইহাতেই ধর্ম্মের কল্যাণরক্ষিণী শক্তির প্রকাশ। ব্যক্তিগত জীবনে এই প্রাণসম্পদ থাকে চরিত্রে, কীর্ত্তিতে নয়। সমাজের জীবনে এই প্রাণসম্পদ থাকে তাহার আদর্শে, রীতিতে নয়। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ প্রভৃতি, নিজ নিজ কার্য্যের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ও দেশের ইতিহাসে যে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার স্মরণে আমাদের মন মাতে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মজীবন পুষ্ট করিবার উপকরণ তাহাতে নহে, তাহা অন্যত্র। ধর্ম্মজীবন পুষ্ট হয়, তাঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্বের সংস্পর্শে; তাঁহাদের ঈশ্বরভক্তি ও বিবেকপরায়ণতার, ত্যাগ ও উদারতার, ধৈর্য্য ও কোমলতার সংস্পর্শে; ধনীর ও পদস্থের

প্রতি তাঁহাদের নির্ভীক অনাস্থায়, [illegible] ও প্রতিপত্তির প্রতি তাঁহাদের সতেজ অবজ্ঞায়, উক্তি ও আচরণের সামঞ্জস্যবিধানের জন্য তাঁহাদের প্রবল ব্যাকুলতায়, ত্রুটি ও বিচ্যুতির স্থলে তাঁহাদের সরল অনুতাপে। ঢাকা নগরীতেও তেমনি, ব্রজসুন্দর ও নবকান্ত প্রভৃতি মানুষের দ্বারা এখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, এখানে বিবিধ সংস্কারমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তদুৎপন্ন বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম, এই ব্রাহ্মসমাজের মতের বিশুদ্ধতা রক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের অনিদ্র তৎপরতা, এ সকলের চিত্ত-উন্মাদকর কাহিনী অপেক্ষাও আমাদের ধর্ম্মজীবনের পক্ষে অধিক মূল্যবান্ তাঁহাদের বড় মন, তাঁহাদের উদার প্রেমে সুদূর জ্ঞাতিবর্গকে ও গ্রামবাসীকে আলিঙ্গন, দুঃখীর অশ্রুমোচনের জন্য তাঁহাদের ব্যাকুলতা, তাঁহাদের বিত্তে নিঃস্পৃহতা ও সুখলালসার প্রতি অবজ্ঞা, ধর্ম্মের জন্য ও লোকহিতের জন্য তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ। তাঁহাদের কার্য্যকে নয়, কার্য্য অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে তাঁহাদের উন্নত চরিত্রকে মানুষের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য।

এই প্রাণসম্পদ্ সঞ্চয়ের জন্য আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে হয়। লৌকিক ভাষায় বলিতে গেলে, আমাদের শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার নিঃস্পৃহতা পাইয়াছিলেন বিদ্যাসাগর হইতে, ধনী ও পদস্থের প্রতি অনাস্থা ও ভ্রূক্ষেপহীনতা পাইয়াছিলেন নিজ পিতা হরানন্দ হইতে, মহানুভাবতা পাইয়াছিলেন মাতামহী ও মাতুল হইতে। লৌকিক ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহার চরিত্রের এমন সকল মহৎ উপকরণ আসিয়াছিল ব্রাহ্মসমাজের বাহির হইতে, প্রাচীন হিন্দুসমাজ হইতে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, মানব অন্তরের মহত্ত্ব যত আকারে যত স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সবই আমার আপনার। সবই আমার গ্রহণীয়, রক্ষণীয়, সাধনীয়। কোনোটির প্রতি উদাসীন থাকিলে ঘোর প্রত্যবায় হয়। বিদ্যাসাগরে যে বিত্তে নিঃস্পৃহতা ছিল, তাহা ব্রাহ্ম চরিত্রেরই একটি উপাদান। যে-চরিত্রে ইহা যে-পরিমাণে দুর্ব্বল, তাহা সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম আদর্শ হইতে হীন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা সহ্য করিতে পারেন না যে, নিবৃত্তি, নিঃস্পৃহতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি প্রাণসম্পদ, ব্যক্তিগত জীবনে ও পরিবারে সঞ্চার করিতে থাকিবেন হিন্দুসমাজ, এবং ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারকার্য্যে মত্ত হইয়া সে-সকলের প্রতি উদাসীন থাকিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে প্রত্যেক ব্রাহ্ম, শিবনাথের ন্যায়, চতুষ্পার্শ্বের সকল মহত্ত্ব শোষণ করিয়া, আকর্ষণ করিয়া, আত্মস্থ করিয়া লউন।

তেমনি, ব্রাহ্মধর্ম্ম, অতীতের সমাজসংস্থিতির মধ্যে যে-সকল কল্যাণ, যে সকল প্রাণসম্পদ নিহিত ছিল, তাহা ফেলিয়া দিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন না। পূজার পুরাতন প্রাণহীন মন্ত্রকে ছাড়িয়া আসা যায়, বর্ত্তমান যুগের অযোগ্য পুরাতন সমাজরীতিকে ফেলিয়া চলিয়া আসা যায়, কুসংস্কার ও দুর্নীতিকে তো নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়াই আসিতে হয়; কিন্তু প্রাণসম্পদ ফেলিয়া আসা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, বহুদেববাদ ও মূর্ত্তিপূজা, তোমরা দেশ হইতে চলিয়া যাও; কিন্তু দেখিও, ধর্ম্মে নিষ্ঠার আদর্শটি দেশমধ্যে আমিই অম্লান রাখিব। ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব, তুমি অপসারিত হও; কিন্তু জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকের সম্মান, এবং ধনপূজা ও সুখপূজার প্রতি সতেজ অবজ্ঞার আদর্শটিকে ভারতে আমিই চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিব। বর্ণভেদ, তুমি নব ভারতের পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াও; কিন্তু স্বীয় অধিকার অপেক্ষা স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি অধিক দৃষ্টির আদর্শটিকে ভারতের লোকচরিত্রে পূর্ব্ববৎ আমিই সঞ্চারিত করিতে থাকিব। কৃত্রিম আশ্রম-ভেদ, তুমি তো এখন স্মৃতিমাত্রে জীবিত আছ, তুমি যাও; কিন্তু চিরদিন যাহাতে এদেশে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মানবের যৌবন পবিত্র ও দৃঢ় হয়, এবং নিবৃত্তির দ্বারা মানবের পরিণত বয়স ধর্ম্মশ্রী-যুক্ত হয়, তাহার জন্য আমি প্রাণপণ করিব। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা, তুমি চলিয়া যাইতেছ, তুমি যাও; পরিবারের দুর্ব্বল মানুষেরাও নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে শিখুক; কিন্তু সাংসারিক জীবনে আত্মসুখ অপেক্ষা পরসেবাকে, অর্থ-সঞ্চয় অপেক্ষা মনের বিশালতাকে অধিক মূল্য দিতে মানুষকে আমিই শিখাইব। প্রাচীন সমাজ-সংস্থিতির মধ্যে যে সকল কল্যাণ ছিল, তাহা মানবের শাশ্বত প্রাণসম্পদ। এই প্রাণ-সম্পদ্ রক্ষা করাও ব্রাহ্মধর্ম্মেরই কাজ।

স্বর্গীয় আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বিলাতের ডায়েরীতে এক স্থানে নিজ চিন্তার মধ্যে এই ভাবের কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন যে, "যদি কোনও মাতা একটি বা দুটি সন্তানকে ফেলিয়া রাখিয়া আর কয়েকটিকে লইয়া কোথাও ভ্রমণে বহির্গত হন, তবে প্রায়ই দেখা যায় যে তাঁহাকে থামিয়া ও ফিরিয়া আসিয়া, আবার সেই পরিত্যক্ত সন্তানদের সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়।" সেইরূপ, ব্রাহ্মসমাজ যদি পথ চলিতে গিয়া দেখেন যে একটি দুটি প্রাণসম্পদ্ ফেলিয়া আসিয়াছেন, তবে তাহা কুড়াইয়া আনিবার জন্য তিনি নিশ্চয়ই আয়োজন করিবেন। কোনও প্রাণসম্পদ্ ফেলিয়া আসা চলে না।

নব প্রাণসম্পদ্ অর্জ্জন।

প্রাণসম্পদ লইয়াই ধর্ম্মের প্রধান কাজ। প্রাণসম্পদকে বাঁচানো, তাজা রাখা, হারাইয়া গেলে তাহা কুড়াইয়া আনা, এ সকলই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কাজ। তেমনি নব নব প্রাণসম্পদ সঞ্চয় করাও ধর্ম্মেরই কাজ। ভারতে মানবপ্রকৃতিতে ও সমাজসংস্থিতিতে যে সকল প্রাণসম্পদ ছিল ও আছে, আমি শ্রদ্ধার সহিত তাহার কয়েকটিকে এখানে স্মরণ করিলাম ও আপনাদের নিকটে নিবেদন করিলাম। কিন্তু যাহা ছিল না ও হয় নাই, তাহা ভারতে মানব-প্রকৃতিতে সঞ্চার করাও ব্রাহ্মধর্ম্মেরই কাজ। ভারতের বেদ বেদান্তে সত্যের সত্য পরম সত্য একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মের ভাব অতি উজ্জ্বল। ভারতের ভক্তিশাস্ত্রে ও মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনে, ভক্তের সহায় লীলাময় ভগবানের ও প্রেমময় পরমসখার ভাব অতি উজ্জ্বল। কিন্তু ঈশ্বর যে মানুষের বিবেকের অধিপতি, কর্ত্তব্য-প্রশ্নে তিনিই যে মানবের নেতা ও পথ-প্রদর্শক, তাঁহার প্রসন্নতা অর্জ্জন করা ও তাঁহার আদেশ বহন করাই যে মানবের পরম পুরুষার্থ, তাঁহার প্রেমালোকে জীবিত থাকাই যে মানবজীবনের পরম আনন্দ, এ ভাবটি ভারতে উজ্জ্বল নয়। এ বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। এই সম্পর্কে একটি তুলনা আমার মনে অনেক সময়ে উদয় হয়। অমসৃণ অবয়বহীন প্রকাণ্ড একখানি পাথরের চাপ আপনার সম্মুখে রাখিয়া নিপুণ ভাস্কর মননের দ্বারা তাহার মধ্যে একটি সুন্দর দেবমূর্ত্তির সম্ভাবনা দেখিতে পান, ও দীর্ঘকালে স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা সেই অন্তর্নিহিত মূর্ত্তিকে খুদিয়া বাহির করিয়া আনেন। তেমনি, ভারতসন্তানের অন্তর-পাথরে বিবেকের অধিপতি পরম পিতার মূর্ত্তি নিহিত আছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা দিব্য নেত্রে দেখিতে পাইতেছেন। নিপুণ ভাস্করের ন্যায়, সহিষ্ণু শ্রমের দ্বারা মানব অন্তরের সেই দেবমূর্ত্তিকে কুঁদিয়া বাহির করা,—নব শতাব্দীতে ইহাই তাঁহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

বন্ধুগণ, আমার কথা শেষ হইল। আবার আমি আপনাদিগকে এই সম্মিলনীক্ষেত্রে সাদর অভ্যর্থনা জানাই। আসুন, আমরা আনন্দে পরস্পরের সহিত মিলিত হই, আনন্দে পরমপিতার জয়গান করি, এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণরক্ষিণী শক্তি কিসে বর্দ্ধিত হয়, আনন্দে ও উৎসাহে সেই আলোচনায় নিযুক্ত হই।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—বিগত ১৩ই অক্টোবর ঢাকায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ দাসগুপ্তের আহ্বানে পরলোকগত বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অভয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। অনুষ্ঠান কর্ত্তা এই উপলক্ষে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে এক টাকা দান করেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৩ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ

Registered No 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধৰ্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ১৬ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

১৬শ সংখ্যা। 2nd December, 1928. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

অন্তর-দেবতা, অন্তরে থেকে তুমি কি লীলাই কচ্ছো! ক্ষুদ্র আমরা, মলিন আমরা, আর তুমি অনন্ত মহান্, পুণ্যময়; তবুও তুমি আমাদিগকে কত স্নেহে পালন কর্চ্ছো, কত প্রেম ঢেলে দিচ্ছ! আমরা বিপথে যাই, তবু ডেকে আন; আমরা দূরে যাই, তুমি আমাদের সন্ধানে ছোট। জীবনের কত সুখ দুঃখ, কত আশা নিরাশা, কত ঘাত প্রতিঘাত! তার মধ্যে তোমার প্রেমের পরিচয় পেতেছি। একটি ঘটনা বৃথা নয়, এক ফোঁটা চোখের জল বৃথা নয়—তুমি সব দেখ্‌ছ, সব জান্‌ছ, সব বিধান কচ্ছো। তুমি আমাদের প্রত্যেকের জন্য কত ব্যস্ত! আমাদের প্রত্যেকের মনে হয় তুমি আমাকেই ভাল বাস, আমার সঙ্গেই চিরদিন আছ। আমরা নীরবে ব'সে কাঁদি; কত দুঃখ আসে, বেদনা আসে, মনে হয়, আমাদের আর কেহ সহায় নাই—বন্ধু যে, সেও দূরে চ'লে যায়। তখন তুমিই কাছে এসে চোখের জল মুছিয়ে দাও, তখন তুমিই প্রাণে আশার কথা বল; তোমার মতন আপনার জন আর কেহ নাই। তাই তোমার চরণে এসেছি। জান প্রভু, কত আঘাত পেয়েছি, কত বেদনা অনুভব কচ্ছি, কত উপেক্ষায় পীড়িত হচ্ছি। এই দুঃখ বেদনা দূর হোক, এ প্রার্থনা করি না; প্রার্থনা এই প্রভু, সব যেন তোমার মুখের দিকে চেয়ে সইতে পারি, তোমার চরণে যেন সব সমর্পণ কর্‌তে পারি, তোমার প্রসন্ন মুখ দেখে যেন সকল দুঃখ বেদনার মধ্যেও প্রফুল্লচিত্তে চলিতে পারি। তুমি আমাদের জীবন-নাথ, তোমার প্রেম যেন অনুভব কর্‌তে পারি; তোমার দিকে চেয়ে, তোমাকে প্রাণে রেখে যেন জীবনপথে অগ্রসর হ'তে পারি। হে প্রিয়, হে অন্তরতম দেবতা, তুমি আমাদের অন্তরে যে আছ, তাহা যেন সর্ব্বদা অনুভব কর্‌তে পারি।

নিবেদন

তোমার হাতে—আমার জীবনের সব সুখ এবং দুঃখ, সব আশা এবং নিরাশা, সব কৃতকার্য্যতা ও ব্যর্থতা, তোমারই হাতে অর্পণ করিলাম। আমি আর নিজের ভাবনা ভাব্‌তে পারি না; আমি আর সংগ্রাম কর্‌তে পারি না। আমি একলা কত দুর্ব্বল, তুমিত দেখ্‌ছ। কত আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগে, পূর্ণ হয় না। কত দুঃখ আসে, ব্যর্থতা আসে—যাদের আপনার বলি, তারাও পর হ'য়ে যায়; যাকে প্রেমে আলিঙ্গন কর্‌তে যাই, সেও প্রত্যাখ্যান করে; যার কল্যাণ কর্‌তে যাই সেও ফিরিয়ে দেয়। আমি আর পারি না। এবার তোমার হাতে সব দিলাম; তুমি যা দিতে হয়, দিবে; যা কর্‌তে হয়, কর্‌বে। আমি তোমার দিকে চেয়ে চল্‌ব; তোমার প্রেমে নির্ভর ক'রে দিন কাটাব; তোমার হাতে জীবনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। আজ আমি তোমার হাতে সব সঁপে দিয়ে কেমন হাল্‌কা হয়েছি! কোনও ভাবনা নাই, কোনও উদ্বেগ নাই। আমি বেশ আনন্দে আছি।

চেয়ে আছি—তোমার আসার আশায় আমি চেয়ে আছি; নিশিদিন আমি পথ পানে চেয়ে আছি। তোমার মধুর স্বর শুন্‌লাম, তোমার সাদর আহ্বান শুন্‌লাম, তাইত সব ছেড়ে এসেছি। যদি তুমি না আস্‌বে, তবে ডাক্‌লে কেন? তবে মন মাতালে কেন, তবে প্রাণ আকুল কর্‌লে কেন? এই দীর্ঘ জীবনপথে তোমার সন্ধানে ছুটেছি; বাল্য গেল, যৌবন গেল, জীবনের এই সন্ধ্যাকালে তোমার আশাতেই ব'সে আছি। এক একবার একটু আভাস দিয়েছ; এক একবার একটু আলোক দেখিয়েছ; এক একবার সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করেছ; তাইত বেঁচে আছি। কিন্তু এতটুকুতে ত প্রাণে তৃপ্তি পাই না। চিরদিন

কি আশায় বুক বেঁধে ব'সে থাক্‌ব? চিরদিনই কি অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত কর্‌বো? এবার প্রভু, এস; প্রাণ মন এসে পূর্ণ কর। এবার তোমাকে প্রাণ ভ'রে দেখি। অন্তর-দেবতা, জীবন-নাথ, হৃদয়স্বামী তুমি; তোমাকে প্রাণে পেয়ে তৃপ্ত হই। তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই; যেদিকে তাকাই তোমারই মধুর প্রকাশ দেখে তৃপ্ত হব। প্রভু, আর যে আমার চলে না। তুমি তবে এস।

চি'নে লও—তিনি যে কত বার এলেন, এসে তোমাকে দেখা দিতে চাইলেন, তোমার প্রাণ মন পূর্ণ ক'রে বস্‌লেন, তুমি তাঁকে বরণ ক'রে নিলে না! তুমি তাঁকে চিন্‌তেই পার্‌লে না! কত পাখীর গানে, নদীর কুল কুল ধ্বনিতে, বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর শব্দে, তাঁর সুর বেজে উঠে! কত প্রভাতকিরণে, চন্দ্রের বিমল আভায়, নিবিড় মেঘমালায়, পত্র পুষ্পের সৌন্দর্য্যে তাঁর রূপ ফুটে উঠে! কত সুখে, আনন্দে, প্রিয়সম্মিলনে তাঁর আনন্দ জেগে উঠে; কত দুঃখ বেদনায়, শোকের তীব্র যন্ত্রণায়, অনাদর উপেক্ষার মর্ম্মভেদ পীড়াতে, তাঁর স্নেহের স্পর্শ অনুভূত হয়! অন্তর-দেবতা কত ভাবে, কত রূপে, কত ঘটনার ভিতর দিয়া প্রাণ এসে স্পর্শ করেন, আপনাকে প্রকাশ করেন! তুমি এখন তাঁকে চিন্‌তে পার না,—তাঁকে কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দাও। এবার কাণ খাড়া ক'রে থাক, অনিমেষ নয়নে পথপানে চেয়ে থাক, এবার এলে তাঁকে যেন চিনে নিতে পার; এবার যেন তাঁকে ফিরিয়ে দিও না। প্রাণের দেবতা তিনি; তিনি আসেন আর তুমি চিন্‌তে পার না, এ কি কলঙ্কের কথা! এবার এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাক, তিনি এলে তাঁকে বরণ ক'রে নিবে।

সম্পাদকীয়।

অনুষ্ঠানে উপাসনা—ব্রাহ্মধর্ম্মে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে ধর্ম্ম ও সংসারের মধ্যে একটা কৃত্রিম সীমরেখা নাই—এই ধর্ম্ম, আর এই সংসার, এরূপ ভেদ এখানে নাই। সমগ্র জীবনে ধর্ম্মের অধিকার, ঈশ্বরপ্রীতি দ্বারা জীবনের সকল কর্ম্ম অনুপ্রাণিত কর্‌তে হবে। তাই সকল কর্ম্মে, সকল প্রচেষ্টায়, সকল অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের উপাসনা, তাঁর সঙ্গ অনুভব, তাঁর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা প্রয়োজন। তাই আমাদের সকল অনুষ্ঠানে ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠ স্থান রহিয়াছে—উপাসনা না করিয়া কোনও অনুষ্ঠানই হইতে পারে না। জাতকর্ম্মে উপাসনা, নামকরণে উপাসনা, দীক্ষায় উপাসনা, বিবাহে উপাসনা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপাসনা, শ্রাদ্ধে উপাসনা। কিন্তু সকল সময় আমরা উপাসনার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া চলি না। ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইলে যেরূপ শান্ত ভাব থাকা উচিত, যেরূপ শ্রদ্ধা প্রাণে জাগ্রত হওয়া উচিত, সকল সময় সেরূপ দেখা যায় না। এ কথা ঠিক, সকলে সকল সময়ে উপাসনার ভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারেন না। এ কথাও ঠিক যে, নানা কারণে অনুষ্ঠানে এমন সকল লোককে নিমন্ত্রণ করিতে হয়, যাহারা হয়ত ব্রহ্মোপাসনাতে যোগ দিতে অভ্যস্ত নহেন। অনুষ্ঠানের সঙ্গে আহারের ব্যবস্থা থাকিলে চিত্ত বিক্ষোভ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। অনেককে আহারের বন্দোবস্তের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়; আহারের বন্দোবস্তে কোলাহলে উপাসনায় যাঁরা যোগ দিতে চান তাঁদেরও অসুবিধা ঘটে। আমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধে উপাসনা খুব শ্রদ্ধা সহকারে গম্ভীর ভাবেই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজে মৃত্যুভয় যেমন অনেকটা দূর হয়েছে, মৃত্যু যে অমৃতের সোপান, এই জ্ঞানটা যেমন অন্তের মধ্যে, এমন কি অল্পবয়স্ক বালক বালিকার মধ্যেও, জাগ্রত হইয়াছে, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধের উপাসনাতেও সেইরূপ শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্য্যের ভাব বিশেষ ভাবে রক্ষিত হইতেছে। যাহারা ব্রহ্মোপাসনাতে যোগ দিতে অভ্যস্ত নহেন, তাঁহারাও এই সময়ে শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনাক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন। অনেক স্থলেই শ্রাদ্ধের সময় আহারের বন্দোবস্ত থাকে না; কিন্তু কোনও কোনও স্থলে আহারের ব্যবস্থা থাকে। সেই জন্য সময় সময় চাঞ্চল্যের যে সৃষ্টি হয় না, তাহা নহে। শ্রাদ্ধে আহারের বন্দোবস্ত না থাকিলেই ভাল হয়, থাকিলেও অন্য সময় কি অন্য দিন হইলে ভাল হয়। বিবাহানুষ্ঠান জীবনের একটি প্রধান অনুষ্ঠান; বর ও কন্যা এক নূতন পথে যাত্রা করিবে; এক অজ্ঞাত রাজ্যের প্রজা হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। যদি ব্রহ্মোপাসনার কখনও বিশেষ প্রয়োজন হয়, এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ কখনও একান্ত আবশ্যক হয়, যদি ব্যাকুল ভাবে ঈশ্বরচরণে বসিবার কখনও দরকার হয়, তবে তাহা এক দীক্ষার সময়, আর এক বিবাহের সময়। পূর্ব্বে বিবাহানুষ্ঠানেও খুব গাম্ভীর্য্য ও শ্রদ্ধা সহকারে সকলে যোগদান করিতেন। বর ও কন্যা এবং তাদের পিতা মাতা বিবাহের অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ঈশ্বরচরণে বসিতেন, বিবাহানুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হইতেন। কিন্তু এখন অন্য প্রকার দেখা যাইতেছে। বিবাহে উপাসনা হয়; কিন্তু তাতে শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায় না; উপাসনার গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হয় না। উপাসনা একটা কর্‌তে হয়, তাই উপাসনা হয়। এটা যেন পুরোহিতের একটা কাজ, পুরোহিত আসিয়া করিয়া যাইবেন। এখনত সাধারণতঃ উপাসনা সঙ্গীত বিবাহের মন্ত্রপাঠ, উপদেশ প্রভৃতিতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। কিন্তু তাহাতেও যে অনেকে বিরক্ত হন। অভ্যাগতগণ সকলে ত উপাসনায় যোগ দেনই না, বরং উপাসনাক্ষেত্রে গল্প করিয়া অন্যের উপাসনায় ব্যাঘাত উৎপাদন করেন। অনেক সময়ে উপাসনাক্ষেত্রে উপাসনার অব্যবহিত পূর্ব্বেও পান চুরটের ব্যবস্থা থাকে। এ কথা সত্য, বিবাহে অনেক লোক নিমন্ত্রণ করিতে হয়, যাঁহারা উপাসনাতে অভ্যস্ত নহেন। বিবাহের সময় দুইটি স্থান করা উচিত, একস্থানে উপাসনা হবে; যাঁরা উপাসনাতে যোগ দিতে চান, তাঁরাই সেখানে যাইবেন, অন্যদের বরং আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হবে। বৌভাতের সময়ও উপাসনার মর্য্যাদা সকল স্থলে রক্ষিত হয় না। উপাসনা আরম্ভ হইবার কথা হয়ত ৯টার সময়, আচার্য্য যাইয়া বসিয়া আছেন, কে তার কথা শোনে! উপাসনা আরম্ভ হলো ১১ টার সময়। উপাসনা যদি অনুষ্ঠানের জন্য একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে যথা সময়ে শ্রদ্ধায় সহিত উপাসনা করা প্রয়োজন। ব্রহ্মোপাসনা আমাদের একমাত্র সম্বল; ব্রহ্মোপাসনা

করিয়াই সকল অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সুতরাং সকল অনুষ্ঠানে উপাসনা যাহাতে গাম্ভীর্য্য ও শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হয়, তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও দীক্ষা—দীক্ষা জীবনের একটি প্রধান অনুষ্ঠান; উহাকে সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান বলিলেও অতিরঞ্জন করা হয় না। দীক্ষার প্রকৃত অর্থ এই যে, এই দিন হইতে প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন আরম্ভ হইল, নিয়মিত রূপে ঈশ্বরের উপাসনা, ধ্যান ধারণা, ধর্ম্মসাধন আরম্ভ হইল। এই দীক্ষা কথাটা সাধারণতঃ আর এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষ যখন কোনও ধর্ম্মমত গ্রহণ করে, তখন সেই ধর্ম্মের সত্য সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাস লোকসমক্ষে স্বীকার করাকেও দীক্ষা বলে; ইংরাজীতে ইহাকে Declaration of faith বলে। আমাদের সমাজে যে ভাবে দীক্ষা অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহাকে দীক্ষা না বলিয়া এই ধর্ম্মমতস্বীকার—Declaration of faith—বলিলেও চলে। কারণ, দীক্ষা বলিতে যে ধর্ম্ম সাধনের আরম্ভ বুঝা যায়, আমাদের দীক্ষা সেরূপ ভাবে হয় না। হয়ত আচার্য্যের সঙ্গে সেরূপ প্রাণের যোগও নাই, অথচ অনেক লোক এই ভাবে দীক্ষিত হইতেছেন। এইরূপ দীক্ষার এখন ততটা প্রয়োজন আছে কি না জানি না; এক সময়ে খুবই প্রয়োজন ছিল। যখন হিন্দুসমাজ আর ব্রাহ্মসমাজে অনেক পার্থক্য ছিল, প্রতি পদে একজন ব্রাহ্মধর্ম-বিশ্বাসী লোককে হিন্দুসমাজে বাধা প্রাপ্ত হইতে হইত, তখন প্রকাশ্য ভাবে, ঈশ্বর ও মানবের সমক্ষে আপনার ধর্ম্ম মত, সামাজিক মত ঘোষণা করা প্রয়োজন ছিল; তাহাতে নৈতিক বলেরও প্রয়োজন হইত। কিন্তু যে কারণে ব্রাহ্ম হইলে সমাজ নির্য্যাতন করত, সে কারণগুলি অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। প্রথম সময়ে ব্রহ্মোপাসনার জন্য নির্য্যাতন হইলেও পরিশেষে তাহার জন্য ততটা সমাজে আপত্তি হইত না, আপত্তি হইত সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আহার বিহার, অসবর্ণ বিবাহ এই সব কারণে। এখন হিন্দুসমাজ এই সকল বিষয়ে শিথিল হইয়াছে; সুতরাং এখন ধর্ম্মমতঘোষণার খুব একটা প্রয়োজন আছে, তাহা বলিতে পারি না। সেই জন্যই, অনেকে ব্রাহ্ম হন, কিন্তু দীক্ষিত হইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না—সমাজের সভ্য হইতে হইলেই ঐরূপ মত স্বীকার করা হয়। কিন্তু যাহাকে প্রকৃত দীক্ষা বলি, দিন দিনই তাহার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। যাহারা অন্য সমাজ হইতে আসিবেন কেবল তাহাদেরই নয়, ব্রাহ্মসমাজে জন্ম যাহাদের তাহাদেরও দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ধর্ম্ম পৈত্রিক সম্পত্তি-রূপে পাওয়া যায় না; উহা অর্জ্জন করিতে হয়। ব্রাহ্মের পুত্র কন্যা যে ব্রাহ্মই হইবেন, বা ঈশ্বরবিশ্বাসী হইবেন, তা ত নাও হইতে পারে। সুতরাং যাহারা ব্রাহ্ম হইতে চান, অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন করতে চান, তাদের জীবনে একটা সময় আসা উচিত, যখন তাঁহারা নিয়মিত-রূপে সাধন আরম্ভ করিবেন। হিন্দুসমাজে যেমন মন্ত্র-দীক্ষার একটা সময় আছে, ব্রাহ্মসমাজেও সাধন আরম্ভের একটা সময় থাকা উচিত। ব্রাহ্মপরিবারের কোনও তরুণ তরুণী সম্বন্ধেই হউক কিম্বা বাহির হইতে যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের সম্বন্ধেই হউক, ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণদের মধ্যে যাঁহার সঙ্গে তৎ তৎ পরিবারের বা তৎ তৎ ব্যক্তির একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ আছে, যাহাকে তাহারা ভক্তি করে, তাঁহার সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। তাঁহার কাছে ইহারা যাইবে, তিনিও ইহাদের কাছে আসিবেন; ইহাদিগকে কি গ্রন্থ পড়িতে হইবে, কি ভাবে উপাসনা করিতে হইবে, কি ভাবে চলিতে হইবে, কি ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, তৎপক্ষে উপদেশ দিবেন। কিছু দিন এই ভাবে যাইবে, তিনি ইহাদিগকে দেখিবেন, ইহাদের জীবনগঠনে সহায়তা করিবেন; পরে উপযুক্ত সময়ে বিশেষ উপাসনার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনে দীক্ষা প্রদান করিবেন। এই দীক্ষা দিয়াই ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না। তার পরও ইহাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিবেন, এবং সাধন ভজন, গ্রন্থপাঠ, সংযম অভ্যাস, চাল চলন প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। এইরূপে ১৬ বৎসর বয়সে দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপ ভাবে দীক্ষার ব্যবস্থা হইলে ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সমাজের মঙ্গল হইবে, আশা করা যায়।

প্রেরণা।

এক ভদ্র লোকের দুটি ছেলে ছিল। একটির বয়স ১৪।১৫ বৎসর, অপরটির বয়স ১৫।১৬ বৎসর। একদিন বড় ছেলেটি তাঁর কাছে এসে বল্লে "বাবা, আমার এক খানা বই দরকার হয়েছে, সে বই খানা আমি কিনব, আমাকে টাকা দেবে?" তখন তিনি ভাবতে লাগিলেন যে এদের এখন বয়স হয়েছে, এদের হাতে কিছু টাকা পয়সা দেওয়া উচিত, এরা টাকা পয়সা ব্যবহার করতে শিখুক। এই ভেবে তিনি বড় ছেলের হাতে দশ টাকা দিলেন এবং বল্লেন "এই টাকা নাও, বই কেন এবং আবশ্যক মত খরচ ক'রো।" তার পর তিনি ভাবলেন যে ছোট ছেলেকেও কিছু দেওয়া উচিত, সেও তো নেহাত ছোট নয়। সুতরাং ছোট ছেলেকেও ডাকলেন এবং তার হাতে ১০টি টাকা দিয়ে বল্লেন "তুমি ইচ্ছামত খরচ করো।"

বড় ছেলে সেই টাকা পেয়ে বই তো কিনল; কিন্তু যা বাকি রইল তা দিয়ে বন্ধুদের নিয়ে খেলা দেখতে গেল, গাড়ী ক'রে বেড়াল, হোটেলে গিয়ে বন্ধুদিগকে খাওয়ালে, এই ক'রে দুদিনে সব খরচ ক'রে ফেল্লে। ছোট ছেলেটি তার পছন্দ মত এক খানা বই কিনেছে, আর যাহা কিনেছে তার হিসাব রেখেছে। একদিন তার বোন বল্লে, "এই সন্দেশ খেতে বড় সুন্দর।" সে চুপে চুপে সেই সন্দেশ কিনে এনে তার বোনকে দিয়ে বল্লে "এই সন্দেশ খাও।" একদিন তার মা বল্লেন "ওমুক জায়গায় এমন সুন্দর মাটির তৈরি ফল বিক্রি করতে এনেছে, মাটির জিনিষ এমন সুন্দর কখন তো দেখি নাই, ওই ফল কয়েকটা কিনতে হবে।" সে কিছু না ব'লে সেই মাটির ফল কিনে এনে মাকে দিলে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক ১লা অক্টোবর, ১৯১০, সাধনাশ্রমে বিবৃত উপদেশ।

সকলের তা দেখে কত আনন্দ! এ ছাড়া সে ভাল কাজে কিছু দানও করেছে।

মাসের শেষে তাদের বাবা তাদিগকে আবার ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, তারা টাকা নিয়ে কে কি ক'রেছে। বড় ছেলে সব কথা বল্‌তে পারে না, বল্লে "সে সব খরচ হয়ে গিয়েছে!" কিন্তু ছোট ছেলে তাঁকে তার সমস্ত হিসাব দেখালে—বই কিনেছে, বোন্‌কে খাইয়েছে, মার জন্য মাটির ফল কিনেছে, ভাল কাজে দান করেছে প্রভৃতি। এই হিসাব দেখিয়ে বল্লে, "তিন টাকা আমার হাতে আছে, এমাসে ৭ টাকা দিলেই আমার দশটাকা হবে।" বাবা উভয়ের কথা শুনে বড় ছেলেকে বল্লেন "তুমি টাকার সদ্ব্যবহার কর নাই, এমাসে তোমাকে ৫৲ টাকা মাত্র দিব।" ৫৲ টাকা দিয়ে সাবধান ক'রে দিলেন, এবং ছোট ছেলেকে আবার ১০ টাকা দিয়ে তার উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন। বড় হ'লে, ছোট ছেলেকেই বিষয়ের ম্যানেজার করিলেন, কাজ কর্ম্মে তাকে সঙ্গী ক'রে নিলেন। এই স্বাভাবিক।

মহাত্মা যিশু তাঁর উপদেশে বলেছেন—যে ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করে, ঈশ্বর তাকে প্রেরণা দেন, তার মনে একটা Idea, একটা ভাব দেন। সেটাকে যদি সে রক্ষা করে, তার অনুসরণ করে, সেই প্রেরণার পথে যায়, তবে তিনি আরও দেন। কিন্তু তাঁর বাণী শুনেও যদি আমরা তাতে সমগ্র মন প্রাণ না দিই, সেই বাণী শুন্‌তে শুন্‌তে আর কিছু শুনে যদি তার পশ্চাতে ছুটি, তবে তাঁর করুণা আমাদিগকে ছেড়ে যায়। তিনি যে পথ দেখান যাঁরা সেই পথ ধরেন, তিনি তাদের পথের সহায়। কিন্তু তাঁর নির্দ্দিষ্ট পথ ধরাই যথেষ্ট নয়। অনেক সময় আমরা ঠিক পথে চলি, কিন্তু সেই পথে চল্‌তে চল্‌তে কি শুন্‌লাম, কি দেখ্‌লাম, তাতেই ভুল্‌লাম; তাঁর সহায়তা হ'তেও বঞ্চিত হইলাম। এরূপ কত হয়েছে।

এই আশ্রমের ভাব প্রথমে তিনিই দিয়েছিলেন। দুর্ব্বল অসহায় জেনে তাঁর চরণে পড়ে গেলাম, তিনি ভাব দিলেন, বলিলেন "এই রাস্তা ধর"। সেই পথ ধরেছি, সে পথে চলেছি; চল্‌তে চল্‌তে কখন অন্য মনস্ক হয়েছি; যেই অন্যমনস্ক হয়েছি বা অন্য ভাব প্রাণে এসেছে, অমনি তাঁর শক্তি গিয়েছে। এই নিয়ম।

দেখেছি ব্রাহ্মগণ আগুনের ন্যায় প্রচার করেছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির কি বক্তৃতাশক্তি, কি বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই তেমন ছিল না; অথচ অদ্ভুত কায করেছেন; স্থানে স্থানে আগুন জ্বেলেছেন; গরমের সময় আগুন লাগে। সময় সময় এমন হয় যে একটী ঘর নিবাতে নিবাতে আর একটী ঘরে ধরে, সামলাতে আর পারা যায় না। তেমনি তাঁদের কথায় তাঁদের সংস্পর্শে এক জনের মধ্যে বা একটি পরিবারে যে আগুন জ্বলিত, অপর সকলে সেই আগুন সামলাতে না সামলাতে, আর এক জনকে যেয়ে ধরিত। এক জন ধর্ম্মের নামে ক্ষেপিল, একটি পরিবারে আগুন জ্বলিল, সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল, "থামা, থামা"; ওই আর একটি পরিবার ক্ষেপে উঠ্‌ল।

সেই সব মানুষই রয়েছে, সেই শক্তি নাই কেন? কারণ, সেই ভাব গিয়েছে। কেন গিয়েছে? আমাদের কোন অপরাধ হয়েছে; আমাদের মধ্যে বিষয়বুদ্ধি ঢুকেছে, নির্ভর ও বিশ্বাস নাই। ধর্ম্ম প্রচার কর্‌ছি ব'লে আত্মপ্রতারিত হ'লে কি হবে? সেই ব্যাকুল আত্মসমর্পণের ভাব নাই। সেই ভাব যদি না থাকে তবে কিছুই নাই, প্রাণ নাই। সুতো দেয় নাই, অথচ মাকু চালাচ্ছে, তাতে কি কাপড় হয়? মাকুচালানর পরিশ্রম হয়, মাকুও চলে; কিন্তু তা হ'তে কাপড় বেরোয় না। তেমনি আমরা পরিশ্রম করছি, প্রচার করছি, কিন্তু কাজ হচ্ছে না! বিশ্বাস, প্রেম, নির্ভর প্রচারের সুতো। আমরা মাকু চালাচ্ছি, কিন্তু এই সুতো নাই, তাই পরিশ্রম হচ্ছে কিন্তু কাপড় ওৎড়াচ্ছে না। সেই ব্যাকুলতা, আত্মসমর্পণ, বিশ্বাস, নির্ভর আমাদের নাই। অথচ আমরা ভাবি বেশ আছি। যখন আলোচনা হয়, তখন দেখি তাদের বিশ্বাস নাই, ওদের নির্ভর নাই, এদের এই নাই; এই কেবল মনে হয়, নিজের যে কিছু নাই তা আর মনে হয় না। ঈশ্বর আমাদিগকে এখন বল্‌ছেন "তোমাদিকে দিয়ে তো দেখ্‌লাম, কই তোমরা তো ব্যবহার কর না।" তিনি দিয়েছেন আমরা ব্যবহার করি নাই। আমাদের অপরাধ হ'য়েছে। তিনি কৃপা করুন; এদিকে যেন আমাদের চোক থাকে।

পরলোকগত ত্রৈলোক্যনাথ দেব।

মহাপুরুষেরা যে বাণী তাঁহাদের জীবনের পশ্চাতে রাখিয়া যান, তাহা সকল দেশের সকল যুগের মানুষের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া যায়, দিকে দিকে তাঁহার বাণী বহুকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হয়, সকলকে তাহা মনুষ্যত্বের ক্ষুরধার দুর্গমপথে আহ্বান করে। কিন্তু যাঁহারা দেশের ও জগতের বৃহত্তর গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম্মের সুমহান্ বাণী প্রচার করিতে পারেন নাই, দেশের ও দশের কাছে মহাপুরুষ আখ্যা লাভ করেন নাই, তাঁহারাও এক এক সময় পরিবার ও সমাজের ক্ষুদ্রতর সীমার মধ্যে তাঁহাদের জীবনে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের ভাব ও চিন্তার ছাপ এমন করিয়া মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া যান, তাঁহার আদর্শ এত উচ্চ, তাঁহার জীবনের সাধনা এত সুকঠিন, এবং সমস্ত জীবনের দান এত প্রচুর যে তাহা তাঁহার সমাজ ও পরিবারের সকলের সম্মুখে চিরকালের জন্য একটা মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যায়, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎবংশীয় সকলকে মনুষ্যত্বের পথে, সত্যের পথে, কর্ত্তব্যের পথে, কল্যাণের পথে আহ্বান জানাইয়া যায়। পৃথিবীর সকলের কাছে, দেশের ও দশের বৃহত্তর গণ্ডীর মধ্যে তাহার প্রচারের কোনো প্রয়োজন হয় না, 'বহুজনহিতায়'ও হয়তো তাহা নয়, বিশিষ্ট পরিবারের ও সমাজের যাহারা খুব ঘনিষ্ঠ, যাহারা খুব প্রিয় তাহাদের জীবনমাত্রকেই যদি তাহা স্পর্শ করিয়া যায়, তবেই সেই বাণী অমর হইয়া যায়, তাঁহার জীবন অনন্তকালের জন্য সেই সমাজ ও পরিবারে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে।

আমাদের স্বর্গগত পিতৃদেব তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ কথা ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া এমন একটি বাণী আমাদের কাছে রাখিয়া গিয়াছেন, যে বাণী আমাদের

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত।

পরিবারস্থ সকলকে ও আমাদের আত্মীয়বর্গকে চিরকাল সত্যের পথে, মনুষ্যত্বের পথে আহ্বান জানাইবে। আজ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে, এই বিশেষ দিনে, তাঁহার জীবনের কাহিনীর মধ্য হইতে সেই বাণীটিকে আমরা হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব, এবং তাঁহার জীবনের সুকঠিন সাধনার মর্ম্মটি জানিবার প্রয়াস করিব। আজ তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়-দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত নাই বলিয়া দুঃখ করিব না; তিনি যে সমস্ত মিথ্যা সংস্কারের জাল এড়াইয়া অবিদ্যার বন্ধন কাটাইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া গিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন, অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় মহান্তপুরুষকে জানিয়া মানব জীবনের চরমতম সত্যকে লাভ করিয়াছেন, এই কথাটি উপলব্ধি করিয়াই সমস্ত শোক দুঃখের উপর জয়ী হইতে চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শক্তি দান করুন।

ব্যক্তিগত দুঃখ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, পারিবারিক দুর্গতি তাঁহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় নাই—যে সত্যটিকে তিনি জানিয়াছিলেন সমস্ত অভাব অভিযোগ দুঃখ দুর্গতির ভিতর দিয়া আজীবন তিনি সেই সত্যের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। জীবনে ধর্ম্মকে তিনি অনুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করেন নাই—ভগবানের প্রসাদ বলিয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন; একটা সহজ বিশ্বাস ও সারল্য তাঁহার সমগ্র জীবনকে সরস ও সজীব করিয়া রাখিয়াছিল। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে আমাদের পরিবারের, আত্মীয় স্বজনের, সকলের কল্যাণের জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথায় সহজ ভাষায় এই একান্ত নিভৃত জীবনের কাহিনীটি আমরা আজ এই বিশেষ দিনে ভক্তির সহিত পাঠ করিয়া তৃপ্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিব।

আমার সংক্ষিপ্ত জীবন স্মৃতি

"আমার সংক্ষিপ্ত জীবনস্মৃতি আমার পুত্র পৌত্র কন্যা দৌহিত্রী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে জানাইবার জন্য লিখিতেছি। তাহারা ইহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে অতি দুঃখের অবস্থায় মানুষ ভগবানের উপর নির্ভর করিলে ভবিষ্যতে কত শান্তি, আনন্দ ও বিশ্বাস উপভোগ করিতে পারে, এই ব্রাহ্মসমাজে আমার জীবনে জানিতে পারিবে। সেই জন্য আমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে বলিয়াই সামান্য কিছু লিখিয়া রাখিলাম। "তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক"

"আমার পূর্ব্বপুরুষ বৃত্তান্ত, বাল্যাবস্থা ও বিদ্যাশিক্ষা"

আমি আন্দাজ ১৮৪৭ সালে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারুইপুর থানার অধীন সুবুদ্ধিপুর গ্রামে দে (সরকার উপাধি) বংশে ফাল্গুন মাসে জন্মগ্রহণ করি। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ অন্য স্থান হইতে কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। আমি বাল্যকালে গ্রামস্থ পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট হইতে প্রাথমিক বাঙ্গলা লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করি। তৎপরে বারুইপুর বাঙ্গলা স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করিয়া, গৃহে কিছু ইংরাজী শিক্ষা করিয়া বারুইপুর ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া সেখানে কয়েক বৎসর শিক্ষা করিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করি।

"ইংরাজী শিক্ষার বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি কথা। আমার ইংরাজী শিক্ষার হাতে খড়ি আজ প্রায় ৭০ বৎসরের কথা—তখন বারুইপুরে খৃষ্টীয় প্রচারকগণ গিয়া খুব ধুমধামের সহিত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। দুইজন সাহেব এবং একজন বাঙ্গালী প্রচারক ছিলেন। মেয়েদের এবং ছেলেদের স্কুল করিয়াছিলেন; আমি সেই স্কুলে বাঙ্গালা পড়িতাম। বাঙ্গালী প্রচারক শ্রীকালীচরণ নাথ আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার বাঙ্গলাটি রাস্তার ধারে ছিল। তিনি একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি ইংরাজী পড়িতে পারো?" আমি বলিলাম "আমি শুধু বাঙ্গলা পড়ি, ইংরাজী আজও শিখি নাই।" তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন Murray's spelling book বলিয়া পুস্তকখানি কিনিয়া আনিও, আমি তোমাকে অমনি পড়াইব। ইহাতে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে বই কোথায় পাওয়া যায় জানি না, আমার বাবা নাই, আমি বড় গরীব, পয়সা কোথায় পাইবো? তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে বই কিনিয়া দিব, তুমি আসিয়া আমার কাছে পড়িয়া যাইও।" আমরা সেই পুস্তকের নাম বলিতাম "মার্চ্চ স্পেলিং বই"—তখনও প্যারীচরণ সরকারের First book বাহির হয় নাই। সেই সদাশয় প্রচারক আমার সহায় হইয়া আমার ইংরাজী শিক্ষার হাতে খড়ি দিয়াছিলেন। ইহাতে কি ভগবানের করুণা আমার জীবনে প্রকাশিত হয় নাই?

"ইতিপূর্ব্বে আমার পিতৃদেবের পরলোক প্রাপ্তি হয়। ইহাতে সাংসারিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। মাতৃদেবী অতি কষ্ট করিয়া আমাদিগকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। এমন কি তিনি ভিক্ষা করিয়া আমাদের আহারাদি যোগাড় করিতেন। আমার পিতৃদেব অনেক বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে আমরা সকলে নাবালক ছিলাম। আমাদের তিনটি খুড়া ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পিতৃদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। জ্ঞাতি যে কি শত্রু তাহা অগ্রে জানিতাম না। তাঁহাদের ব্যবহারের কথা আজ লিখিয়া তাঁহাদের দোষ কীর্ত্তন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপা যখন মানবজীবনে প্রকাশিত হয় তখন অসম্ভবও সম্ভব হয়—তাহা আমার জীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল—সেইগুলি লিখিয়া আমার পুত্র পৌত্রদিগকে জানাইব বলিয়া লিখিতেছি। বড় আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার সেই সময় আমার জীবনে সংঘটিত হইয়াছিল। যেমন প্রাতঃকালের সূর্য্য উদয়ের আভাস পাইয়া নিদ্রিত পক্ষীগণ আনন্দে জাগ্রত হইয়া কুহুধ্বনি করিতে থাকে, সেইরূপ আমার দুঃখ কষ্টময় জীবনের অবসান হইবার জন্য শুভক্ষণে সেই সময় ব্রহ্মকৃপার একটু আভাস আমার উপর প্রকাশিত হইয়াছিল।

"আমার একটি ধার্ম্মিক সদাশয় পরোপকারী, নিরীহ-স্বভাব বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ জেঠতুতো ভাই ৺ কৈলাশচন্দ্র দে—যিনি

আমাদিগকে লালন পালন করিয়াছিলেন—তাঁহার একটি মাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া ঘরজামাই রাখিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। নানা চেষ্টার পর ঘটনাক্রমে ৺ উমেশচন্দ্র দত্তের একটি সম্পর্কিত আমার সহিত ঐ কন্যাটির পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। এই পরিণয়ই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের আশা ও সম্পদ ক্রমে ক্রমে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতা আমার মনে পড়িল। বিশেষতঃ আমার জীবনের প্রত্যেক কথার সহিত ইহার মিল আছে—

"কারে কি যে কর জানহে ঈশ্বর
ভেবে চিন্তে কবি হতবুদ্ধি প্রায়!"

এই পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার কিছু অগ্রে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় হরিনাভি স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম যে তিনি বাল্যাবস্থা হইতেই ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিবাহের পর তিনি আমাদের বাটীতে যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন। হরিনাভি হইতে আমাদের বাটী তিন মাইল পথ। তিনি বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। আমাদের বাটীতে আসিয়া সকলকে লইয়া সংগীত করিতেন, না হয় প্রার্থনা করিতেন। এই প্রকারে আমাদের হাওয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন আমাদের ওখানে কোন রেলপথ হয় নাই, তিনি হাঁটিয়াই আসিতেন এবং হাঁটিয়াই যাইতেন।

আমার জেঠতুতো ভায়ের জামাতার নাম ছিল জয়কৃষ্ণ ঘোষ। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিশ্বাসী ছিলেন। তাহাতে আমার পড়াশুনা করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহাও এক ভগবানের করুণা। উমেশচন্দ্র সপ্তাহে একদিন করিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন। আমি তখন বালক ছিলাম, উপাসনাতত্ত্ব ভাল বুঝিতাম না। তবে যে সঙ্গীত হইত তাহা আমার বড় ভাল লাগিত; কারণ, ইহা আমার পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। আমার মাতৃদেবী এই উপাসনায় যোগ দিতেন। তাঁহার এই সকল কথা শুনিতে ভাল লাগিত। একদিন আমি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গীত করিতেছি, তৎপরে উমেশচন্দ্র আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোথায় পড় এবং কি কি বই পড়? এই দিন হইতে করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় উমেশচন্দ্রের স্নেহ ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমার বাল্যকালে যিনি দেখিতেন তিনিই ভালবাসিতেন। কিন্তু জ্ঞাতিগণের ব্যবহারে ও দরিদ্রতার নিষ্পেষণে আমার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ বিলোপ হইয়াছিল।

"এই ঘটনা হইবার পর, আমার ঠিক মনে নাই আমার মাতাঠাকুরাণী কি সাধু উমেশচন্দ্রের ইচ্ছায়, আমাকে বারুইপুর স্কুল হইতে হরিনাভি স্কুলে ভর্ত্তি করা হইল। হরিনাভি স্কুল আমাদের বাটী হইতে ৩ মাইল পথ, এই ৩ মাইল পথ যাওয়া আসা করা কি কষ্টকর তাহা আর কি লিখিব। সাধু উমেশচন্দ্র আমার স্কুলের মাহিনা নিজে দিতেন। আমি বারুইপুর স্কুল ছাড়িয়া হরিনাভি স্কুলে আসিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। তখন খুব উৎসাহের সহিত পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। এইরূপে বৎসরাধিক কাল ৩ ক্রোশ পথ যাওয়া আসা করিয়া যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম তখন দয়াপ্রবণ উমেশচন্দ্র আমার আসা যাওয়া বন্ধ করিয়া আমাকে তাঁহার নিকট রাখিলেন। হরিনাভি যদু সান্যালের বাটীতে তিনি আহার করিতেন, আমিও সেখানে আহার করিতাম। আজ এই সকল কথা লিখিতেছি আর ভগবানের করুণা স্মৃতিপথে উদয় হইয়া আনন্দ হৃদয় মনকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছে। সেই দুঃখের অবস্থা হইতে সুখের অবস্থা এখন আমার মনে উদয় হইতেছে। আমরা সকলেই স্কুলের বাটীতে থাকিতাম। স্কুলে সকলকে লইয়া উমেশচন্দ্র উপাসনা করিতেন। চিনু বৈদিক নামক এক বৈদিক ব্রাহ্মণ রামমোহন রায় রচিত সঙ্গীত করিত।

কিছুদিন অতিবাহিত হইলে সকলের সহিত আমার পরিচয় হইলে, আমিই সেখানে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াছিলাম। আমাকে সকলেই ঠাকুর দাদা বলিয়া ডাকিত। এইরূপে দুইবৎসর কাল থাকিয়া আমি প্রথম শ্রেণীতে উঠিলাম। ভগবান উমেশচন্দ্রকে কেবল দয়া দ্বারা গঠিত করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের দয়ার কথা আর কি লিখিব? আমাতেই তার পরিচয়, বাহিরে তার অনুসন্ধান করিতে হইবে না। সেই সময় আমার অনেকগুলি সহপাঠী ছিলেন, তাহারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসী ছিল।

ইতিপূর্ব্বে ভক্ত উমেশচন্দ্র, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী কেদারনাথ দেবের বসতবাটীর সংলগ্ন একটু জমির উপর একটী খড়োঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সাপ্তাহিক উপাসনা গ্রামস্থ সকল বিশ্বাসীকে লইয়া সম্পন্ন করিতেন। আমিও সেখানে গিয়া উপাসনায় যোগ দিতাম। প্রতি সপ্তাহে উমেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া কেশবচন্দ্র সেনের বাটীর উপাসনায় যোগ দিতেন এবং ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় যোগ দিয়া সোমবার প্রাতে হরিনাভি আসিতেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে আসিতাম। সেই সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রেম ও ভক্তির উন্মাদিনী শক্তি বঙ্গদেশে এরূপ বিস্তারিত হইয়াছিল যে সকল সাধুব্যক্তিই আত্মহারা হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা উপবীত পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কেহ বা অসবর্ণ বিবাহ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ের ব্যাপার বর্ণনা করিতে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। বাংলাদেশের হিন্দুসমাজকে ব্রহ্মানন্দ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সকল হিন্দুরা তাঁহাদের সন্তানদিগকে লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, পাছে তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এই হরিনাভি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মাতা উমেশচন্দ্রকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন এবং নিজের বাটীতে রাখিয়া আহারাদি দিতেন। উমেশচন্দ্রের চরিত্র প্রভাবে রাজপুর, হরিনাভি, কোদালিয়া, চাংড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামসকলের আবালবৃদ্ধ-বনিতা জাতি নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে ভক্তি করিত। এই সকল গ্রামগুলির অধিকাংশ বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ইতিমধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। এই সংবাদ হরিনাভি প্রভৃতি গ্রাম সমূহের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিস্তারিত হইয়া

পড়িল। গ্রামের লোকসকল কানাঘুষি করিতে লাগিল। জমিদার নবীনচন্দ্র ঘোষের বাটীর সকলে একত্রিত হইয়া স্থির করিল যে, উমেশ বাবুর পরামর্শানুসারে শিবনাথ উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং আর কোন ব্রাহ্মশিক্ষক স্কুলে রাখা হইবে না। এই বলিয়া একখানি দরখাস্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় উমেশচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। উমেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ Resignation পত্র তাঁহাকে অর্পণ করিলেন এবং কর্ম্ম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলেন।

এই সময়ে আমার অবস্থা যে কি প্রকার হইয়াছিল তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব ? আমি মনে করিয়াছিলাম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় একটী চাকরী জোগাড় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব ; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরকম ছিল বলিয়া আমাকে আবার দুঃখের অবস্থায় ফেলিলেন। উমেশচন্দ্র আমাকে ডাকিয়া ঠিক এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন "আমি কলিকাতায় যাইব, তুমি আমার কাছে থাকিবে। তোমার লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" শেষে এই কথা বলিলেন "আমি যদি খাইতে পাই তুমিও খাইতে পাইবে, তুমি আমার সঙ্গে চল।" ইহাতে আমি আশ্বাসিত হইয়া বলিলাম যে একবার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। বাটীতে গিয়া মাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তাহাতে তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখনই যাও, তোমার মঙ্গল হইবে।" এদিকে বাটীর সকলে বিরোধী হইয়া মাকে বলিলেন "এ কাজ করিও না, ছেলেটার জাত যাইবে।" মাতা কাহারও কথা না শুনিয়া আমাকে উমেশচন্দ্রের চরণে সমর্পণ করিয়া দিলেন। আমি বাটী হইতে হরিনাভি আসিলাম। উমেশচন্দ্রের সঙ্গে কলিকাতা আসিলাম উমেশচন্দ্রের টাকা আমার কাছে থাকিত। তিনি টাকা রাখিতেন না। কলিকাতায় আমাদের থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। আজ এক যায়গায় কাল আর এক যায়গায় থাকিতাম। উমেশচন্দ্রের কত বন্ধু! আজ এখানে কাল ওখানে আহার করিতেন। এইরূপে যে কয়টী টাকা ছিল তাহা ফুরাইবার উপক্রম হইল। মহাচিন্তায় পড়িলাম। আবার আমি দুঃখে কষ্টে পড়িলাম। বর্ত্তমান সময়ে যেখানে নিউমার্কেট হইয়াছে সেখানে শম্ভু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে একটা একতালা বাড়ীতে হোটেল ছিল। সেখানে দুইবেলা দশ পয়সা দিয়া আহার করিতাম। উমেশচন্দ্র চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই চাকুরী আর জোগাড় হইল না। সমস্ত টাকাগুলি ফুরাইয়া গেল। উমেশচন্দ্র আমার জন্য অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইলেন। একবেলা আহার করিতাম ; পয়সার অভাবে দুইবেলা আহার জুটিত না। এমন দিনও গিয়াছে যখন দুই পয়সার মুড়ি খাইয়া সমস্তদিন কাটিয়াছে।

আমার কষ্টের ভিতর আমি একদিনের জন্যও অবিশ্বাসী হই নাই। প্রচারক মহাশয়দের আর্থিক কষ্ট এত দেখিয়াছিলাম যে আমার এ কষ্ট কিছুই বোধ হইত না। প্রচারকেরা সকলেই আমাকে স্নেহ করিতেন; বিশেষতঃ স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় সর্ব্বদা আমার খোঁজ লইতেন। আমি যাহাতে ধর্ম্মবিশ্বাসী হই সেই প্রকার উপদেশ দিতেন। আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহার সহিত দেখা হইলে তিনি সস্নেহে আলিঙ্গন করিতেন।

আমাদের কলিকাতায় আসিবার কয়েকমাস পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার কলুটোলার বাটীতে সকলকে লইয়া উপাসনা করিতেন। আমিও সেখানে উমেশচন্দ্রের সহিত গিয়া যোগ দিতাম। কী মধুর উপাসনা! সেখানে বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা হইত না। আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতে হইত।

যাক্, একথা পরে লিখিয়া কিছু জানাইব। এখন লেখাপড়ার কথা কিছু সংক্ষেপে লিখিতেছি। উমেশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে ঝামাপুকুর নিবাসী সদাশয় গোপালচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের এক আত্মীয়ার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহের ঘটক ছিলেন আদি সমাজের হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। গোপালবাবু বড় পরোপকারী ছিলেন। উমেশচন্দ্র তাঁহাকে আমার লেখাপড়ার কথা বলায় তিনি আমাকে বিদ্যাসাগর স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎকালীন হেডমাষ্টার প্রসন্ন কুমার রায়কে বলিয়া আমাকে বিনা মাহিনায় প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এইজন্য পরোপকারী গোপালচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তারপর উমেশচন্দ্র নানা চেষ্টা করিয়া পরিশেষে হরনাথ বসু মহাশয়ের শ্বশুরবাটী দরজিপাড়াতে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ভুবনমোহন ঘোষ নামক একটী ব্রাহ্ম ভদ্রলোক সেখানে থাকিতেন। তাঁহার কাছে গিয়া থাকিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিলাম। এই বাটীটি তিন মহল, বাহিরে একতলায় আমি থাকিতাম। এই বাটীর সন্নিকটে একটি দুঃখিনী বিধবার বাটীতে আহার করিতাম ও মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া দিতাম। ইতিমধ্যে উমেশচন্দ্র কোন্নগর স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। এই সময় আমারও একটি প্রাইভেট টিউশন যোগাড় হইল। হেদুয়ার ধারে বিশ্বাসদের বাটীতে দুইটি ছেলেকে পড়াইতে হইত, মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া দিত।

করুণাময় পরমেশ্বরের করুণায় এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হইল। আমার জীবনে ইহা একটি বিশেষ আশ্চর্য্য ঘটনা। স্কুলে পড়িবার সময় যজ্ঞেশ্বর সান্যাল নামক একটি সরলপ্রকৃতি পরোপকারী সহপাঠীর সহিত শুভক্ষণে আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সে যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিল। আমার মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত থাকিত। সে আমাকে তাহার বাসায় লইয়া আসিল। সেখানে থাকিয়া আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার টেষ্ট দিলাম ; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি অঙ্ক ও ইতিহাসে পাশ করিতে পারিলাম না। সুতরাং প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে না পারায় হতাশ হইয়া পড়িলাম। কি করিব এই চিন্তায় অস্থির হইলাম এবং মাষ্টার মহাশয় (উমেশচন্দ্র) কি বলিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি চিন্তা ও ভাবনা করিলে কি হইবে ? চিন্তামনি যিনি স্বয়ং চিন্তা করিয়া আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রাখিয়া ছিলেন। নচেৎ যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব স্থাপন করিবেন কেন ? আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কেরাণী গিরি কার্য্য লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। কিন্তু ইহা ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। আমি বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া অখিল মিস্ত্রী লেনে যজ্ঞেশ্বরের বাসায় আসিলাম। সেই বাসায় শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় নামক এক যুবক আর্টস্কুলে ড্রইং শিক্ষা করিত। যজ্ঞেশ্বর তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাকে আর্টস্কুলে ভর্ত্তি করিতে উদ্যোগী হইল। আমি তাহাকে বলিলাম যে অগ্রে উমেশবাবুর অনুমতি লইয়া পরে ভর্ত্তি হইব। আমি যজ্ঞেশ্বরকে যোগী বলিয়া ডাকিতাম। যোগী নাছোড়বান্দা হইয়া আমাকে নিজে টাকা দিয়া তথায় ভর্ত্তি করিয়া দিল। ইহাতে আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। যিনি আমাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহের সহিত লালন পালন ও লেখা পড়া শিখাইয়াছেন তাঁহাকে না বলিয়া এই কার্য্য করিলাম, এই চিন্তাতেই অস্থির হইয়া পড়িলাম।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় তখন আমার প্রাণে একটি কথা কে যেন জাগ্রত করিয়া দিল—মাতার আশীর্ব্বাদের কথা। দুঃখিনী মাতা যখন আমাকে উমেশচন্দ্রের চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন তখন "তোর মঙ্গল হইবে" এই কথা বলিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। সেই কথা তখন আমার প্রাণে উদয় হইল এবং আমি আশ্বস্ত হইলাম। নির্ভয়ে উমেশচন্দ্রের নিকট গিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। সদাশয় উমেশচন্দ্র বলিলেন "বেশ করিয়াছ।" ভগবানের করুণা কত সময় আমাকে রক্ষা করিয়াছে এ জীবনে তাহা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এদিকে যজ্ঞেশ্বর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। পরে এল এম এস পাশ করিয়া ডাক্তার হইয়াছিল। আমার সংসার পথের সহায় পরোপকারী পরম বন্ধু যজ্ঞেশ্বর এখনও জীবিত আছে। আমার এমন কিছু নাই যাহা তাহাকে অর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাই।

"ইতিপূর্ব্বে উমেশচন্দ্র কয়েকটি বন্ধু লইয়া স্ত্রী-শিক্ষার জন্য "বামাবোধিনী পত্রিকা" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। আমার উপর তাহার কার্য্যনির্ব্বাহের ভার পড়িয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রতিমাসে একটি করিয়া প্রবন্ধ দিতেন। আমি প্রতিদিন তাঁহার কলুটোলার বাড়ীতে গিয়া তিনি প্রবন্ধটী বলিতেন আমি লিখিয়া লইতাম। ভগবানের করুণাতে ব্রহ্মানন্দের আমার প্রতি স্নেহ ও ভালবাসার এক আশ্চর্য্য প্রভাব আমার এই ক্ষুদ্রজীবনের উপর নিপতিত হইয়াছিল। উমেশচন্দ্র স্ত্রী-শিক্ষার জন্য এই প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকার কার্য্যনির্ব্বাহের ভিতর ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত ছিল বলিয়া ব্রহ্মানন্দের স্নেহের পাত্র হইয়াছিলাম।

"এদিকে আর্টস্কুলে শিক্ষা করিতে লাগিলাম। ৺অন্নদা-প্রসাদ বাগ্‌চী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং লক্ সাহেব প্রিন্‌সিপ্যাল ছিলেন। বাগ্‌চী মহাশয় আমাকে সস্নেহে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপে বৎসরাধিক কাল শিক্ষা করিয়া আমি তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম। তৎপরে তাঁহার আদেশানুসারে আমি এনগ্রেভিং কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলাম। কালীচরণ কর্ম্মকার আমাদের মাষ্টার ছিলেন। তিনি আমার কার্য্যের ক্রমোন্নতি দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। আমি বৎসরাধিক-কাল এনগ্রেভিং শিক্ষা করিয়া বাহিরের কার্য্য করিবার জন্য স্কুল ছাড়িয়া দিলাম। আরও কিছুদিন থাকিলে আরও ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে পারিতাম; কিন্তু অবস্থার জন্য তাহা পারিলাম না। তজ্জন্য এখনও আমি কষ্ট অনুভব করি। লেখা পড়া ছাড়িয়া আমি যে এ কার্য্য শিক্ষা করিলাম, ভবিষ্যতে আমার যে কি হইবে তাহা ভগবান ভিন্ন কেহ জানিত না। আমি কাষ্ঠের উপর খোদাই কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলাম। এ কার্য্য অনেকটা সূত্রধরের কার্য্য। অনেকে মনে করিবেন এ নীচ কার্য্য কেন শিক্ষা করিল; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় নানা প্রকার ঘটনার মধ্যে পড়িয়া তাঁহারই ইচ্ছায় আমি এই কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমার সে সময় বিচার করিবার শক্তি ছিল না। আমি যখন এ কার্য্য শিক্ষা করি তখন কলিকাতায় অন্য কোনও এনগ্রেভার ছিল না। সুতরাং আমার পসার একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম ও ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।

উমেশচন্দ্রের দয়া ও রক্ষকৃপা সম্বল করিয়া আমি ব্রাহ্মসমাজে উৎসাহের সহিত যোগ দিলাম। সেই সময় প্রচারকগণের আত্মত্যাগ ও উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার বিশেষ আমার জীবনে স্মরণীয় বিষয়। এদৃশ্য আমি কখনও ভুলিব না। বিশেষতঃ সাধারণ উপাসকমণ্ডলীর ভিতর একটা ব্যাকুলতা এবং সাধন ভজনের একটা প্রবল স্পৃহা জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন।

ক্রমশঃ

নীরব সাধকের নিভৃত চিন্তা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(৪৮)

একটী ব্যাধিই জীবনের সঙ্গী হইয়া অহরহ বাস করিতেছে। তাহার হাত আর এড়ান গেল না। সে হচ্ছে মনের অস্থিরতা বা চঞ্চলতা। কবে যে এ রোগ প্রাণে স্থান পাইল, তা কে জানে? কিন্তু দেখিতেছি এ আর যায় না। ইহাকে আর তাড়ান যায় না। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, ইহার প্রভাব হইতে আর কোন মতেই নিস্তার নাই। যখনই মনে হয় কোন উদ্বেগের কারণ নাই, বাহিরের কোন বাধা নাই. শান্ত হইয়া সমাহিত হইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত হই, সেই ভাবে সেই সংকল্প লইয়া বসা গেল, দেখি মন কোথায় কোথায় উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাকে আর কোন মতেই সত্য-সুন্দরে নিমগ্ন রাখা যায় না। অনাবশ্যক অতি লঘু ভাবের চিন্তায় সে মগ্ন, আর চির-সুন্দর চির-আনন্দময়ে সে মগ্ন হইতেছে না,—হইতে পারে না। এই সাংঘাতিক ব্যাধির হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? কে লইয়া যাইবে গভীরতর গভীরতম প্রদেশে, যেখানে আর বাহিরের ঝড় ঝঞ্ঝা নাই, কোলাহল নাই। কে আছে এমন সুহৃদ যে এই শুভকার্য্যে সহায় হইয়া সিদ্ধি প্রদান করিবে?

হে প্রভু, তোমার এ দীন সন্তানকে শিখাইয়া দেও তোমাতে ডুবিয়া মৃত্যু ভয়ের, শোক দুঃখের, অতীত হইতে।

(৪৯)

জাতিভেদ কি ভীষণ শত্রু!! ইহার কি ভীষণ প্রতাপ!! কত দিন কত মহাজন ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন, কত প্রকারে ইহাকে নির্মূল করিবার জন্য কত বিধ চেষ্টা আয়োজন হইয়াছে হইতেছে, কিন্তু এ শত্রু আর মরে না! ব্রাহ্মসমাজ যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন, সে ত বর্ণভেদ। তাহার পরাক্রমও কম নহে। তাহার অনিষ্টকারিতা লোকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। তবে মনে হয় লোকে বাধ্য হইয়াই ইহা পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু মনের মধ্যে যে ভেদ বিচার রহিয়াছে, দুঃখী দরিদ্রের, শিক্ষিত অশিক্ষিতের যে ভেদজ্ঞান রহিয়াছে, তাহা বাহিরে তেমন প্রবল না হইলেও মন হইতে ত তাহা যায় না! মলিন-বেশ গরিবকে, সামান্য কাজে নিযুক্ত অজ্ঞানকে ত আর আলিঙ্গন করা যায়, না! তাকে ত আপনার ভাই বলিয়া সমাদর করা যায় না! এই রূপে গূঢ়ভাবে ঐ জাতিভেদরূপ শত্রু আমাদের প্রাণকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। তাহার পর দেশভেদ-জনিত যে জাতিভেদ, যাহা উত্তম সাজ পোষাকে সজ্জিত হইয়া, জাতীয়তার মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া, সর্ব্বত্র আপন জাল বিস্তার করিতেছে, যাহা পরিহার করা উচিত ছিল তাহাই মোহনরূপ ধরিয়া সকলকে অধিকার করিতেছে, স্বার্থের বংশীরব শুনাইয়া জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলকেই বিমোহিত করিতেছে। তাহার প্রভাব কত!! এমন বীর ত দেখা যায় না যে, এই মহাপ্রতাপান্বিত শত্রুর সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে। যাহারা ভ্রাতৃত্বসাধনরূপ ব্রতকে জীবনের লক্ষ্য করিয়াছেন, এ ভীষণ আবিল মন্ত্রে তাঁহাদিগকেও অভিভূত করিতেছে! কে রক্ষা করে ধর্ম্মসাধনার্থীকে, ভ্রাতৃ-সাধনার্থীকে কে রক্ষা করে?

(৫০)

সেই রোগই সাংঘাতিক ও অতিশয় ভীষণ যাহা আমাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করে, অথচ সে যে অতি সাংঘাতিক, অতিশয় ভীষণ তাহা বোধগম্য হয় না, সে যে কি ক্ষতি করিতেছে তাহা জানিতে দেয় না। রোগ আছে তাহার যাতনাবোধ নাই, ইহাপেক্ষা সংকটজনক অবস্থা আর নাই। রোগী যখন কঠিন বিকার-গ্রস্ত হয়, তখনই সে রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া সুস্থের মতন হাসিতে পারে। তখনই তার নিকটে উত্তম যাহা, সুস্বাদু যাহা তাহা নীরস ও মন্দ বলিয়া মনে হয়। আমাদের অনেকের সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। পাইবার কত আছে, অভাব কত আছে, দীনতার পরিমাণ কত! কিন্তু সে সব না পাইয়াও অতি দীনদশাপন্ন হইয়াও আমরা এমন ভাবে বিচরণ করি যেন আমাদের অভাব কিছু নাই। এমন ভাবে আমোদ প্রমোদে ব্যাপৃত হই যেন আমাদের দুঃখ দৈন্য নাই। দীন দুঃখীরা ত এমন করে না, তারা যেমন করিয়াই হউক পথে বাহির হয় এবং কিছু অর্জ্জন করে; তবেই তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসিতে সময় পায়। আমরা দীন হইয়াও যে ধনীর মত ভাণ করি, ইহাই সাংঘাতিক অবস্থা। শারীরিক প্রয়োজনে লোকে যেমন হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, আমাদের সেইরূপ করাই উচিত; কিন্তু আমরা তাহা পারি না। হে প্রভো, এ সংকটে তুমি রক্ষা কর।

(৫১)

এ দেশের সংবাদপত্রসকল বেশ জোরের সহিত বড় গলায় আমাদের গবর্ণমেণ্টের শাসননীতিতে, আইনাদিতে, জাতিবৈষম্যের কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এ দেশের বড় শাসন কর্ত্তা জাতিবৈষম্য যাতে না থাকে, সেরূপ চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সংকল্প জানাইয়াছেন; আর ইহাও বলিয়াছেন যে এ দেশের শাসনপদ্ধতিতে জাতিবৈষম্য থাকিতে পারে না—তাহা এক প্রকার নাই। তাই সংবাদপত্রে তাহার বিরুদ্ধে নানা কথা লিখিত হইতেছে। এ দেশের সংবাদপত্রসম্পাদকেরা বোধ হয় ভাবেন না, এ দেশে কিরূপ জাতিবৈষম্য আধিপত্য করিতেছে। যদিও চাপে পড়িয়া সামান্যরূপে লোকে জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে কিছু কিছু করিতে সুরু করিয়াছে, তথাপি বাস্তব ব্যাপারে তাহা অক্ষুণ্ণই আছে। এ দেশের উচ্চবংশীয়েরা অনেক লোককে আপনার গৃহে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন না। একাসনে বসা, আদান প্রদান প্রভৃতিতে কত পার্থক্য রহিয়াছে! কিন্তু সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা কেবলই গবর্ণমেণ্টের নিকট সাম্য চাহিতেছেন। নিজেদের এ বিষয়ে যাহা করিবার আছে তাহা করিবার দিকে মন নাই। যাহা অন্যের বেলায় দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা ত নিজের বেলায় দূষণীয়ই হইবে। এদিকে যদি লোকের দৃষ্টি না পড়ে, তবে সরকারের নিকট তাহা চাহিবার কি অধিকার আছে?

ব্রাহ্মসমাজ।

দীক্ষা—বিগত ২৬শে নবেম্বর কলিকাতা সাধনাশ্রমে শ্রীমান অতুলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। আমরা নবদীক্ষিতকে সাদরে বরণ করিতেছি। করুণাময় পিতা তাঁহাকে দিন দিন পবিত্রধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২০শে নবেম্বর, কলিকাতা নগরীতে প্রবীণ ব্রাহ্ম কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাকে সকলে "পণ্ডিত মহাশয়" বলিয়াই ডাকিত। আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া তিনি লোকসেবা করিতেন। কত দুঃস্থ ব্রাহ্মছাত্র ও পরিবারকে তিনি ভিক্ষা করিয়া সাহায্য করিতেন! সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের কার্য্যে তিনি অক্লান্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। গত ২৫শে নবেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস]

আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু কর্ত্তৃক একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু ও শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ৫৲ ও দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ফণ্ডে ৫৲, সর্ব্বশুদ্ধ ১০৲ টাকা দান করেন।

বিগত ২রা ডিসেম্বর পরলোকগত মিঃ সতীশরঞ্জন দাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ধ্রুবরঞ্জন প্রার্থনা করেন। সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতও সতীশ বাবুই পাঠ করেন।

কিছু দিন হইল খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্ম কর্ম্মী মথুরায় কলেরা রোগে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নানারূপে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ২৩শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত কালীনারায়ণ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহিত শ্রীযুক্ত রাধামাধব রায়ের কন্যা কল্যাণীয়া রেবার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই নবেম্বর পাটনা নগরে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাসের কন্যা শ্রীমতী সতীর সহিত শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ২৭শে নবেম্বর পাটনা নগরীতে পরলোকগত চারুচন্দ্র মল্লিকের কন্যা কল্যাণীয়া ইন্দিরা ও উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালীক্রমে গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ২১শে অক্টোবর প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য বাবু কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস। ২২শে অক্টোবর প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য বাবু সত্যরঞ্জন খাস্তগীর। সন্ধ্যায় বক্তৃতা মিঃ ডি এন মুখার্জি, বিষয় "ধর্ম্মমত এবং ধর্ম্মজীবন।" ২৩শে প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য—ডাঃ বি রায়। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য বাবু উমেশচন্দ্র নাগ

ব্রিষ্টলে রামমোহন স্মৃতিসভা—লণ্ডন হইতে শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দাস, বি এ, কোনও আত্মীয়ের নিকট লিখিয়াছেন :—

"২৭শে সেপ্টেম্বর আমরা ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিতে যাই। ট্রেণ হ'তে নামতেই Rev. Tudar Jones এসে আমাদের নিয়ে টাউন্ হলে যান। সেখান হ'তে যে গির্জ্জাতে রাজা উপাসনা করতে যেতেন সেখানে যাই। যে জায়গায় ব'সে রাজা উপাসনা করতেন, তা দেখ্‌লাম। গির্জ্জাটি খুব সুন্দর। সেখান হ'তে একটি হোটেলে গিয়ে খেয়ে রাজার সমাধিতে যাওয়া হয়। সেখানে প্রায় দুই হাজার লোক জমা হয়েছিল। সমাধিতে প্রথমে ফুল দেওয়া হয়। তারপর রেভাঃ টিউডার্ জোন্‌স্ কিছু বলে' প্রার্থনা করেন। তারপর মিঃ গুরুদয় দত্ত কিছু বলার পর টিউডার্ জোন্‌স্ আবার প্রার্থনা করেন। সেখান হ'তে মেরী কার্পেণ্টারের বাড়ী দেখে, যে বাড়ীতে রাজা দেহত্যাগ করেন সেখানে যাই। রাজার সমাধি মেরামত করবার জন্য ও গির্জ্জায় একটি টেব্‌লেট্ লাগাবার জন্য চাঁদা তোলা হচ্ছে।"

শুভাঢ্যা গ্রামে শতবার্ষিক উৎসব—ঢাকা সহর হইতে দুই মাইলের মধ্যে, বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণে, শুভাঢ্যা গ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রাম ডাঃ পি কে রায় মহাশয়ের জন্মস্থান গত ১১ই নভেম্বর, রবিবার, ঢাকা শতবার্ষিক মহোৎসব কমীটির উদ্‌যোগে ও উক্ত গ্রামবাসী ব্রহ্মোপাসক শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার দত্তের আমন্ত্রণে ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রমুখ একদল ব্রাহ্ম (দশজন) তথায় গমন করেন। গ্রামবাসী কতিপয় পুরুষ ও মহিলা অশ্বিনী বাবুর গৃহে সমবেত হইলে, উৎসবকারিগণ দুইটি সঙ্কীর্ত্তন করেন। তৎপরে অমৃত বাবু স্তোত্রাদির দ্বারা সংক্ষেপে উপাসনা করিয়া, দুইটি ধার্ম্মিকা নারীর আখ্যায়িকা অবলম্বনে সংসারসুখের অনিত্যতা, জীবনের পরিবর্ত্তন, ভগবদ্‌ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশে শ্রোতৃবর্গের, বিশেষতঃ মহিলাদিগের, হৃদয় অতিশয় দ্রব হইয়াছিল। পরে উৎসবকারিগণ আর একটি সঙ্কীর্ত্তন করেন। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কয়েকজন অপর একটি সঙ্কীর্ত্তন করিলে কার্য্য শেষ হয়। শতবার্ষিক মহোৎসব সম্পর্কীয় ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কয়েকখানা পুস্তিকা উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দিগের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বালক-বালিকাদিগের মধ্যেও তাহাদের উপযোগী একখানা সুন্দর পুস্তিকা বিতরিত হয়। সর্ব্বশেষে অশ্বিনী বাবু অতিথিদিগকে জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

ফিরিবার কালে উৎসবকারী দল হাঁটিয়া নদীতীর পর্য্যন্ত আগমন করেন ও পরে নৌকায় নদী পার হইয়া আসিয়া মন্দিরে উপাসনায় যোগদান করেন।

মফঃস্বলে শতবার্ষিক উৎসব—ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে :—

২৭শে আশ্বিন—প্রচারযাত্রীদল কালীকচ্ছ পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় প্রাতে ৭ ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী উপাসনা করেন। প্রচারযাত্রীগণ পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় পৌঁছিবার পর নৌকাযোগে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাড়ীতে উপস্থিত হন। সেখানে পারিবারিক ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় বক্তৃতা (কালীকচ্ছ ব্রহ্মমন্দিরে) বক্তা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। রাত্রিতে প্যারীবাবুর বাড়ীতে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দীর কনিষ্ঠ

ভ্রাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ নন্দী এবং স্বর্গীয় রাজচন্দ্র চৌধুরীর আত্মার কল্যাণের জন্ম প্রার্থনা হয়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। ২৮শে আশ্বিন—প্রাতে উষাকীর্ত্তন; তৎপর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ। পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় প্যারীবাবুর পিতামাতার নূতন স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন এবং প্যারীবাবু পিতামাতার জীবন চরিত পাঠ করেন। দ্বিপ্রহরে প্যারীবাবুর বাড়ীতে প্রীতিভোজন হয়। সন্ধ্যায় উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। ২৯শে আশ্বিন—প্রাতে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দীর বাড়ীতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী; উপাসনান্তে ঐ বাড়ীতে জলযোগ। অপরাহ্নে নৌকাযোগে নগর সংকীর্ত্তন; গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দিরে আসিলে পর সন্ধ্যায় মনোমোহন বাবু উপাসনা করেন এবং শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রচারকগণকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং এই গ্রামে ব্রাহ্ম-সমাজ ও ধর্ম্মের জীবন্ত প্রভাবের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। ৩০শে আশ্বিন—প্রাতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে মনোমোহন বাবু, রাজকুমার বাবু ও রজনীবাবুর দ্বারা শতবার্ষিক উৎসবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ চারিটী বৃক্ষ রোপিত হয়। অতঃপর প্রচারকগণ কিশোরগঞ্জ যাত্রা করেন। সময় সময় বারিবর্ষণ ও নানা দুর্য্যোগের মধ্যেও উৎসবের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সত্যের, ধর্ম্মের, ও ভগবৎ প্রেমের প্রবাহ জীবন্ত ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব।—১৮ই সেপ্টেম্বর প্রচারযাত্রীদল চাঁদপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৯শে তারিখে যখন ষ্টীমার মেঘনা নদীতে উপস্থিত হয়, তখন যাত্রীদল কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্ত অমৃত লাল গুপ্ত প্রার্থনা করেন, অনেক যাত্রী কীর্ত্তন শুনিবার জন্য উপস্থিত হন এবং কয়েকজন একত্রে বসিয়া প্রার্থনা ও কীর্ত্তনে যোগদান করেন। বেলা ১টার সময় চাঁদপুর ষ্টীমার-ঘাটে উপস্থিত হইলে উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন এবং ডাকবাঙ্গলায় থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় Commercial Club এ সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা ও কীর্ত্তন হয়। ২০শে প্রাতে ডাকবাঙ্গলা হইতে উষাকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া নগরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ক্লাবে উপস্থিত হইবার পর প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যায় মিঃ সিন্হে ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "অমৃতের সন্ধান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনেক গণ্য মান্য লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা যাত্রীদিগকে অতি সমাদরে নিজ বাটীতে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ দিবস রাত্রিতে যাত্রীদল চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিয়া ২১শে তারিখ প্রাতে সেস্থানে উপস্থিত হন। ষ্টেশনে স্থানীয় অনেক ব্রাহ্মবন্ধু তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন এবং সকলে একত্রে মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরের রাজপথ দিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অসুস্থ হইয়া পড়েন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় মিঃ সিন্হে "ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষ" বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন। ২২শে তারিখে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত যাত্রীদিগকে তাঁহার বাটীতে আহ্বান করেন; তথায় উপাসনা ও কীর্ত্তন হয়; শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ উপাসনা করেন। ইহার পর তাঁহারা বিভিন্ন ব্রাহ্মপরিবারে যাইয়া দেখা সাক্ষাৎ করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় লালদিঘী হইতে নগর কীর্ত্তন বহির্গত হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৩শে তারিখ প্রাতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ উপাসনা করেন; মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন ও সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৪শে প্রাতে শ্রীমতী হেমলতা দেবী মন্দিরে উপাসনা করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর দাসের গৃহে উপাসনা ও কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় মিঃ সিন্হে মন্দিরে "ব্রাহ্মসমাজের বাণী" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২৫শে প্রাতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস এবং সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৬শে প্রাতে মিঃ সিন্হে হিন্দিতে উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় প্রচারযাত্রীর দল স্থানীয় নববিধান সমাজে আহূত হইয়া উপাসনা ও কীর্ত্তন করেন। মিঃ সিন্হে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৭শে প্রাতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ মন্দিরে এবং অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বীররুদ্র রায়ের পুত্রের মৃত্যুদিন উপলক্ষে কীর্ত্তন ও উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় রাজা রামমোহন-স্মৃতিসভায় মিঃ খাস্তগীর ও পরে রাজকুমার বাবু সভাপতি হন। মিঃ সিন্হে, এক জন ইংরাজ পাদ্রি, একজন স্থানীয় উকীল, দুই জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও একটী যুবক বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ ও কবিতা-পাঠ করেন। অনেক গণ্য মান্য লোক ও মহিলায় মন্দির পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ২৮শে তারিখ প্রাতে শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র সেন ও সন্ধ্যায় মিঃ সিন্হে মন্দিরে উপাসনা করেন। ২৯শে প্রাতে প্রচার যাত্রীদল কক্সবাজার যাত্রা করেন। সমুদ্রে পড়িবার পূর্ব্বে ষ্টীমারে সকলে একত্র হইয়া কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করেন। বহুলোক মুগ্ধভাবে যোগ দেন। এখানকার উৎসবের বিবরণ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

৩রা অক্টোবর প্রচারযাত্রীদল বরমায় উপস্থিত হন। তথায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও রমেশ বাবুর বাড়ীতে যাত্রীদল আতিথ্য গ্রহণ করেন; রাত্রিতে মিঃ সিন্হে মন্দিরে উপাসনা করেন। ৪ঠা প্রাতে উষাকীর্ত্তন; গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কাজ করেন। বেলা ৩॥০ ঘটিকায় টি. এম্ স্কুলে মিঃ সিন্হে, রাজকুমার বাবু এবং রমেশবাবু ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকায় স্বর্গীয় যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের পুত্রগণ যাত্রীদিগকে তাঁহাদের বাড়ীতে সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হয়, মিঃ সিন্হে আচার্য্যের কাজ করেন ও পটিয়ার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বিশ্বাস প্রার্থনা করেন। ৫ই প্রাতে প্রচারযাত্রীদল বরমা পরিত্যাগ করেন এবং বেলা ১১টার সময় চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। রাত্রি নয় ঘটিকায় ফেণী উপস্থিত হন। ত্রিপুরা রাজষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত তড়িৎ-মোহন গুপ্ত, অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার এবং স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক ষ্টেসনে আসিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা ত্রিপুরার রাজবাড়ীতে তড়িৎ বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ৬ই অক্টোবর প্রাতে রাজবাড়ী হইতে উষাকীর্ত্তন বাহির হইয়া সহরের অধিকাংশ স্থান ঘুরিয়া আসে; স্থানীয় অনেক লোক কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। পরে রাজ-বাড়ীতে প্রাতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কাজ করেন। অপরাহ্নে সেই স্থানে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে মিঃ সিন্হে ও রাজকুমার বাবু বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় কলেজে মিঃ সিন্হে The Higher Life সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এ সি রক্ষিত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু হিন্দু মুসলমান ছাত্র এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ৭ই প্রাতে প্রচারযাত্রী দল নোয়াখালী অভিমুখে যাত্রা করেন। ট্রেন সোণামুড়ি ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহারা কীর্ত্তন আরম্ভ করেন এবং ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে "তুমি এত প্রেমময় এত মধুময়" এই সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করেন। নিকটস্থ বাজার ও পল্লী হইতে অনেক লোক কীর্ত্তন শুনিবার জন্ম গাড়ীর চারিদিকে ভিড় করিয়া—

দাঁড়ায়। নোয়াখালী ষ্টেশনে বেলা ১১ টার সময় উপস্থিত হন। রায় বাহাদুর রাধাকান্ত আইচ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র আইচ তাঁহাদিগকে সাদরে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যান। সন্ধ্যায় মন্দিরে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কাজ করেন। ৮ই প্রাতে ৭ ঘটিকায় মন্দিরে কীর্ত্তন ও পরে মিঃ সিংহ উপাসনা করেন। বেলা ২॥০ টার সময় তাঁহারা কুমিল্লা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং রাত্রি ৭॥০ ঘটিকায় সেখানে পৌঁছেন।

স্বর্ণলতা দাস বৃত্তি।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িবার জন্য আপাততঃ আগামী জানুয়ারী মাস হইতে এক বৎসরের জন্য একটি গরীব ছাত্রীকে মাসিক ৫৲ পাঁচটাকা হারে স্বর্ণলতা দাস বৃত্তি প্রদান করা হইবে। অনুন্নত শ্রেণীর বালিকার দাবী অগ্রগণ্য হইবে। "শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, ১৩।২ বি বেনেটোলা লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোঃ" এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক মহোৎসব।

পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসব কমীটী শতবার্ষিক মহোৎসবের এই আদর্শটি মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেছেন। কেহ নিজের জন্য বা বিতরণ জন্য ইহা পাইতে ইচ্ছা করিলে, "শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩৬নং রেঙ্কিন ষ্ট্রীট, উয়ারি, ঢাকা" এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

মহোৎসবের উদ্দেশ্য—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে এই ধর্ম্মকে মাথায় তুলিয়া ধরা; এবং এই উপায়ে ইহার দাতার চরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

মহোৎসবের সময়—শততম ভাদ্রোৎসব হইতে শততম মাঘোৎসব পর্য্যন্ত দেড় বৎসর; অর্থাৎ ১৩৩৫ সালের ১লা ভাদ্র হইতে ১৩৩৫ মাঘের শেষ দিন পর্য্যন্ত।

মহোৎসবের স্থান—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, এবং ডিব্রুগড় ও রেঙ্গুন হইতে পেশোয়ার ও বোম্বাই পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি।

মহোৎসবের পূজা-মন্দির—(১) সমগ্র ভারতে ব্রহ্মোপাসনার জন্য যত মন্দির আছে, সকল মন্দির; (২) সমগ্র ভারতে যত ব্রাহ্মধর্ম্মাশ্রিত ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী পরিবার আছেন, তাঁহাদের গৃহ; (৩) সমগ্র জগতে ব্রাহ্মোপাসক ও ব্রাহ্মউপাসিকা আছেন, তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়।

মহোৎসবের পূজারী—(১) যে-কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রিত; (২) যে-কেহ ইহা হইতে উপকৃত; (৩) যে-কেহ ইহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্; যে-কেহ ইহা হইতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা জাতীয় জীবনে কল্যাণের আশা করেন। এক কথায় যে-কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য বিধাতার চরণে কৃতজ্ঞ।

মহোৎসবের পূজার প্রকৃতি—(১) ব্রাহ্মধর্ম্মকে নিজ জীবনে অধিকতর জয়ী করা; (২) পরিবারে ইহাকে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত করা; ব্রাহ্মসমাজে ইহার প্রভাব বৃদ্ধির ও জগতে ইহার প্রচার বৃদ্ধির জন্য অধিকতর চেষ্টা করা। এ সকলের জন্য ত্যাগ-স্বীকার ও শ্রম-স্বীকার।

মহোৎসবের পূজার প্রণালী—(১) নিখিল-ভারতীয় উৎসব—কলিকাতাস্থ কমীটি কর্তৃক পরিচালিত; (২) মফস্বল সমাজ-সমূহের উৎসব—প্রত্যেক সমাজকর্ত্তৃক স্বাধীনভাবে নির্ব্বাহিত; (৩) পারিবারিক উৎসব—প্রত্যেক পরিবার কর্ত্তৃক সম্পাদিত; (৪) ব্যক্তিগত উৎসব—প্রত্যেক উপাসক-উপাসিকা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত।

মহোৎসবকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উপায়—

(ক) সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে—(১) দেশ-বিদেশের নানা সম্প্রদায়ের ভক্তগণ মিলিত হইয়া এক সঙ্গে ব্রহ্মোৎসব করিতে করিতে ভারত পরিভ্রমণ; (২ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বাচার্য্যদিগের উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল পুনর্মুদ্রণ; (৩) ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজের নানাবিধ কার্য্য চালাইবার উৎকৃষ্ট প্রণালী নির্ণয়; (৪) ভবিষ্যতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অধিকতর শক্তির সহিত প্রচার করিবার জন্য স্থায়ী ফণ্ড প্রতিষ্ঠা; ইত্যাদি।

(খ) স্থানীয় মণ্ডলীতে—(১) স্থানীয় সমাজের মুদ্রিত ইতিহাস না থাকিলে, তাহার সঙ্কলন ও প্রকাশ; স্থানীয় মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবনী প্রকাশ; (৩) মহিলাদিগের, যুবকদিগের ও বালকবালিকাদিগের জন্য বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান না থাকিলে, তাহার প্রতিষ্ঠা; ইত্যাদি।

(গ) পরিবারে—(১) প্রাত্যহিক বা অন্ততঃ সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা না থাকিলে, কোনও নির্দ্দিষ্ট দিন হইতে নিষ্ঠাপূর্ব্বক তাহা আরম্ভ করা; (২) পারিবারিক উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ না থাকিলে, সম্ভব হইলে তাহার ব্যবস্থা করা; (৩) পরিবারের পরলোকগত প্রিয়জনদিগের সমাধিচিহ্ন স্থাপনের স্থান থাকিলে, ও তাহা এ পর্য্যন্ত করা না হইয়া থাকিলে, এই উপলক্ষে করা; (৪) পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকিলে, পারিবারিক উৎসব সহকারে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ; (৫) কোনও পরলোকগত প্রিয় ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার জন্য স্থায়ী ফণ্ড প্রতিষ্ঠা; (৬) ব্রাহ্মসমাজের কোনও বিশেষ বিভাগের কার্য্যের জন্য এককালীন দান বা স্থায়ী ফণ্ড প্রতিষ্ঠা; (৭) 'Centenary' নাম যুক্ত স্কুল, হাসপাতাল, নৈশবিদ্যালয়, ব্রহ্মমন্দির বা অপর কোনও লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত।

(ঘ) ব্যক্তিগত জীবনে—(১) প্রতিদিন নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনার অভ্যাস না থাকিলে, তাহা ব্রতরূপে গ্রহণ; (২) কোনও পাপ বা কু অভ্যাস থাকিলে, অন্ততঃ একটি পাপ বা কু-অভ্যাস এই উপলক্ষে জন্মের মত পরিত্যাগ। (৩) ব্রাহ্ম যুবক ও কন্যাদিগের সাধন-দীক্ষা গ্রহণ; (৪) অন্য সমাজের যে সকল যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রকাশ্যে এই ধর্ম্ম গ্রহণ; (৫) যাঁহাদের পক্ষে সম্ভব, পরমেশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ—ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় আপনাকে নিয়োগ করা; ইত্যাদি।

মহোৎসবের ফল—(১) ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কর্ত্তব্য পালন দ্বারা ইহার দাতা করুণাময় পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ; (২) ত্যাগ-স্বীকার ও শ্রমস্বীকারের ফলে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি। (৩) ব্রাহ্মসমাজে নব জাগরণ; (৪) দেশের সেবায় ব্রাহ্মসমাজের অধিকতর আত্মনিয়োগ; (৫) দেশে ধর্ম্ম ও নীতির গৌরব বৃদ্ধি। ইত্যাদি। ওঁ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২২শে অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ।
১৮শ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ, সোমবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯

31st December, 1928.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

হে প্রেমময় উৎসব-দেবতা, তুমি তোমার অসীম স্নেহে ও দয়ায় নিয়ত নানা ভাবে আমাদিগকে তোমার মহোৎসবের জন্য আহ্বান করিতেছ। কিন্তু আমরা যে তাহার জন্য বিশেষ কোনও আয়োজন ও চেষ্টা করিতেছি না, এক প্রকার আলস্য ও উদাসীনতাতেই দিন কাটাইতেছি! জীবনের অভিজ্ঞতায় ত দেখিয়াছি, আপনাদিগকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত না করাতে কত উৎসব আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে—তাহা হইতে আমরা যথোচিত উপকার লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। তবু কেন যে আমাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না, জানি না। তুমি ত আমাদিগকে বুঝিতে দিয়াছ যে, উৎসবে একটু সাময়িক আনন্দ ও উৎসাহ পাইলেই যথেষ্ট হইল না, নূতন জীবন, নূতন গতি, নূতন শক্তি লাভ করিতে হইবে, জীবনের একটা স্থায়ী পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে, তোমার হইয়া যাইতে হইবে। হে হৃদয়দর্শী দেবতা, তুমি ত আমাদের অন্তরের সকল ক্রটি দুর্ব্বলতাই দেখিতেছ, আমরা যে তাহার জন্য বিশেষ কিছুই করিতেছি না তাহা জানিতেছ। তুমি ভিন্ন আর কে আমাদিগকে এই দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবে? আমাদের এই মহা মোহ ও মৃত ভাব দূর করিবে? কিসের আবেশে যে আমরা এই ভাবে দিন কাটাইতেছি বুঝিতেছি না। আমাদের দুঃখ তাপের ত অন্ত নাই। তবু আমরা নিশ্চিন্ত ভাবেই জীবন যাপন করিতেছি, নিশ্চেষ্ট ভাবেই কাল কাটাইতেছি, তোমার শরণাপন্ন হইতেছি না। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করিয়া না লইলে যে আমরা আপনা হইতে কোনও আয়োজনই করিতে পারিতেছি না। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে তোমার অনুগত করিয়া লও, আমাদের সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া দেও। তুমিই জীবনে তোমার মঙ্গল-ইচ্ছাকে জয়যুক্ত কর, আমাদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে চূর্ণ কর।

নিবেদন।

খবর না দিয়েই আস্‌বেন—যে জন ভালবাসে তার আসার কি আর সময় অসময় আছে? সে যখন তখনই এসে উপস্থিত হয়; সে ডাক্‌বার অপেক্ষা রাখে না, নিমন্ত্রণ পায় নাই ব'লে অভিমান করে না। কখন সে আস্‌বে, সব সময় তার খবরও দেয় না। তুমি ব'সে আছ, কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত, সে এসে উপস্থিত হলো; গভীর নিশীথে তুমি ঘুমিয়ে আছ, এসে ডেকে ঘুম ভাঙ্গাল। তুমি বিপদে পড়েছ, খবর দিতে সুযোগ পাও নি, সে কার মুখে শু'নে ছুটে এসে উপস্থিত হলো। আমার প্রিয়তম যিনি, তিনিও ত যখন তখন আসেন; আমি চাইলেও আসেন, না চাইলেও আসেন। আমি তাঁকে ভুলে থাকি; তবুও তিনি আসেন। আমি ঘুমিয়ে থাকি, তিনি এসে স্নেহভরে জাগিয়ে তোলেন। আমি বিপদে প'ড়ে কূল কিনারা পাই না, তিনি এসে আশা ও বল দেন। তাঁর আস্‌বার সময় অসময় নাই। আহ্বান করার প্রয়োজন হয় না। পতিত কলঙ্কিত যে, তাকেও তিনি আদর ক'রে নরক হ'তে তোলেন। তিনি যে ভালবাসেন! আমাকেও না হ'লে তাঁর যে চলে না! তাই তিনি এলে যাতে চিন্‌তে পারি, সেই জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

"ফিরবে জীবনের গতি"—একবার ব্রহ্মে তোমার মতি হোক, ব্রহ্মচরণে একবার বস, তাঁর দিকে তাকাও, তাঁর স্পর্শ পাবার জন্য ব্যাকুল হও, তোমার জীবনের গতি ফিরে যাবে। যে মুখ ছিল সংসারের পানে, যে মন ছিল সুখের

লালসায়, যে দৃষ্টি ছিল ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি, তা যে বদ্‌লে যাবে, প্রেম পুণ্য সেবার প্রতি অনুরাগ জান্মবে। যাকে কুৎসিৎ দেখেছিলে সে সুন্দর হবে; যার প্রতি বিরাগ ছিল তার প্রতি প্রেম জন্মিবে। ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তাতে মগ্ন ছিলে, এখন প্রাণ উদার হবে, অপরের সুখবিধান ক'রেই আনন্দ হবে, সর্ব্বত্র সত্যং শিবং সুন্দরম্ এর প্রকাশ দেখে ধন্য হবে। এতদিন "আমি" "আমি" ব'লে অস্থির ছিলে—আমার সুখ, আমার স্বার্থ, আমার আরাম, আমার পদ মান, এই সব নিয়েই ব্যস্ত ছিলে। এবার তাঁর স্পর্শ যদি পাও, তখন আপনাকে বিলিয়েই সুখ পাবে; অপরের জন্য আত্মদানেই আনন্দ হবে। প্রভুর নামরসপানে মগ্ন হবে, তাঁর আদেশপালনে সুখ পাবে। তোমার মতি বদ্‌লিয়ে যাবে—ব্রাহ্ম মতি হবে, দৃষ্টি নূতন হবে, নূতন আশা আনন্দ ও বল পাবে।

ক্ষুদ্র তুমি ?—এই অসীম সংসারে তুমি ত ক্ষুদ্র বিন্দু, ধূলিকণা মাত্র। তোমার কি শক্তি আছে? তুমি কি করতে পার? জগতের শক্তিপুঞ্জ তোমাকে পিষে মারতে পারে। অনন্ত বিশ্বচরাচর; এই অনন্ত অসীম বিশ্ব-সমুদ্রে তুমি একটি বুদ্বুদ মাত্র। কিন্তু ভেবে কি দেখেছ, অনন্ত শক্তি সমূহের সঙ্গে তোমার যোগ রয়েছে? অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও শক্তির প্রস্রবণ যিনি, তাঁর সঙ্গে তোমার জীবন-স্রোত মিলিত রয়েছে। ঐ যে ক্ষুদ্র স্রোতটি প্রবাহিত হচ্ছে, উহা অতি ক্ষীণ; মনে হয় এখনই শুকিয়ে যাবে; কিন্তু উহা ত শুকায় না। চির তুহিনরাশির সঙ্গে যে ওর যোগ রয়েছে; সেই অফুরন্ত উৎস হ'তে যে জলধারা আসে! ঐ যে ক্ষুদ্র বীজটি, উপরে রাখ, এখনত শুকিয়ে যাবে; কিন্তু মাটিতে পোত দেখি, ধরণীবক্ষ হ'তে অফুরন্ত রস-ধারা এসে উহাকে জীবিত রাখবে, বর্দ্ধিত করবে, পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত করবে। তুমি যখন নিজের শক্তিতে দাঁড়াতে চাও, আর কাকেও যখন দেখতে পাও না, তখন বাস্তবিকই তুমি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য; তোমার কোনও কাজেরই শক্তি থাকে না। যে টুকু কাজ কর, তাহাও বিস্মৃতি-জলে ডুবে যায়। কিন্তু যখন সেই অনন্ত প্রেম-সমুদ্রের সঙ্গে জীবনের স্রোত যোগ ক'রে দাও, যখন শক্তির উৎস যিনি, তাঁর সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয়, তখন অফুরন্ত জ্ঞান প্রেম পুণ্য ও শক্তির ধারা তাঁহা হ'তে নেমে আসে। তখন তুমি আর ক্ষুদ্র নও; তুমি অনন্ত দেবতার ক্রোড়ে নির্ভয়ে বিচরণ কর। নেপোলিয়ান, সিজার, আলেকজাণ্ডার হ্যানিবলের প্রভাব ও রাজত্ব কোথায় ভেসে গেল? বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, তাঁদের প্রভাব মানবপ্রাণে স্থায়ী হ'য়ে রয়েছে।

সম্পাদকীয়।

উৎসবের আয়োজন—আমাদের জীবনে কত উৎসব আসিয়াছে ও গিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন্ উৎসব কেন সফল বা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা যদি আমরা একটু পর্য্যালোচনা করি, তবে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আয়োজন করা কত আবশ্যক। কিন্তু আমরা সেরূপ বিশেষ কিছু যে করিতেছি তাহার কোনও লক্ষণ ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। উৎসবের আহ্বান ত নানা ভাবে নানা দিক হইতে আমাদের নিকট আসিতেছে। নিয়মিত আয়োজনও যে কিছু না হইতেছে, এমন নহে। কিন্তু তাহার ফলে সাধারণ ভাবে যাহা হইয়া যাইতেছে তদতিরিক্ত কোনও স্থায়ী জীবনপ্রদ শুভ ফল লাভের আশা করা যায় না। কয়েক দিনের একটা ধুমধাম উৎসাহ উচ্ছ্বাসে বিশেষ কোনই লাভ নাই। তাহাতে বাহিরের লোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু জীবনের কোনও কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। তাহা নিজেরও নয়, অপরেরও নয়, কাহারও জীবনকেই একটু অগ্রসর করিতে পারে না। জীবনপথে যদি আমরা একটু অগ্রসরই হইতে সমর্থ না হইলাম, যেখানকার সেখানেই পড়িয়া রহিলাম, অথবা পশ্চাৎগামী হইতে থাকিলাম, তাহা হইলে যে সবই বৃথা হইল, সে কথা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। অথচ এই সহজ কথাটাই আমরা অধিকাংশ সময় ভুলিয়া থাকি। সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টিটা বাহিরের একটা ক্ষণিক আড়ম্বর ও ধুমধামের, অথবা ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে—লোকের বাহবা অর্জ্জন ও সাময়িক তৃপ্তির অনুভবই আমাদের নিকট যথেষ্ট লাভ বলিয়া গণ্য হয়। যাহাদের দৃষ্টি বাহির ছাড়িয়া অনেকটা অন্তরের দিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহারাও অনেক সময়, উৎসব সম্বন্ধে ভুল ধারণা বশতঃ, প্রকৃত ফললাভে বঞ্চিত হয়, বহু পরিমাণে কল্পনার রাজ্যেই বিচরণ করিয়া থাকে। যাহারা উৎসবের আনন্দকেই প্রধান লক্ষ্যস্থানে গ্রহণ করে, আনন্দের দ্বারাই উৎসবের সফলতা বিচার করে, তাহাদিগকে অনেক সময় মহা ভ্রমে পড়িতে হয়। উৎসবে যে আনন্দ যথেষ্টই আছে, আনন্দ যে উহার একটা প্রধান অঙ্গ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ আনন্দ বলিতে যাহা বুঝি, সকল সময়ই যে তাহা থাকে, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। অনেক সময় গভীর দুঃখ বেদনাই সত্য উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহার দ্বারাই উৎসবের প্রকৃত সফলতা সূচিত হয়, তাহার দ্বারাই উহার বিচার করিতে হয়। নতুবা কাল্পনিক আনন্দের দ্বারা বিচার করিতে গেলে মহাভ্রমে পড়িতে হয়। এই দুঃখ বেদনার সঙ্গে যে প্রকৃত আনন্দ না থাকিতে পারে, এমন নহে; দুঃখ বেদনার মধ্যে ব্রহ্মের জীবন্তলীলা ও অপার করুণা অনুভব করিয়া প্রকৃত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই। পুণ্যস্বরূপের প্রকাশে মলিন জীবনে দুঃখ বেদনা অনুতাপের উদয় অনিবার্য্য। তাহার পরিবর্ত্তে সেখানে যদি শুধু আনন্দেরই উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে উহা নিতান্তই কাল্পনিক, কিছুমাত্র সত্য নহে। সেখানে প্রকৃত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের একান্ত অভাব। এমন কি উচ্চতর আনন্দকে প্রধান লক্ষ্যস্থানীয় করিতে গেলেও ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা আছে। যদি আমরা "শুধু ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ-রসপানকেই" প্রধান লক্ষ্যস্থানে রাখি এবং একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান ও আনন্দরসের দ্বারাই সিদ্ধি ও সফলতার

বিচার করিতে যাই, তাহা হইলেও আমাদের ভ্রমে পতিত হইবার, কল্পনার রাজ্যে অবস্থিতি করিয়া আত্ম-প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। লোকে যে এরূপ প্রতারিত হইয়াছে, সাধকজীবনের ইতিহাসে তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। যদি সাক্ষাৎ সত্য ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, ব্রহ্মধ্যানে যথার্থতঃই নিমগ্ন হওয়া যায়, এবং প্রকৃত ব্রহ্মানন্দরসপানে হৃদয় ভরপুর হয়, তবে সেরূপ তৃপ্তির ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আত্মা কখনও আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না—তাহার মধ্যে একদিকে জ্ঞান প্রেম পুণ্যের যে অপূর্ব্ব লীলা উপস্থিত হয়, এবং তৎসঙ্গে অপরদিকে প্রখর আত্মদৃষ্টিবশতঃ যে অনুশোচনা ও দুঃখবেদনা হৃদয়ে জাগে, তাহা তাঁহার জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে, তাহার আত্মাকে সকল দিকে বিকশিত করিয়া জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে ব্রহ্মানুগত্যে ভূষিত করে, ক্ষুদ্রতা মলিনতা ও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেয় না। জীবনে এই পরিবর্ত্তন ও বিকাশ কিছুমাত্র লক্ষিত না হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মস্পর্শ, লব্ধ হয় নাই—তাহার ব্রহ্ম-জ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দরসপান শুধু কল্পনাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, উহা মোটেই সত্য নহে। অবশ্য এই পরিবর্ত্তন ও বিকাশের তারতম্য আছে—কেহই এক মুহূর্ত্তে চরম সীমায় উপস্থিত হইতে পারে না, পতনেরও অতীত হইতে পারে না। দুর্ব্বল মানুষকে দীর্ঘকাল উত্থান পতনের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু এরূপ জীবনে কখনও সংগ্রামের বিরাম ঘটে না, নিয়ত সংগ্রাম চলিতে থাকে। এই সংগ্রামই জীবনের লক্ষণ, গতিহীন তৃপ্তি মৃত্যুরই পরিচায়ক। সুতরাং উৎসবের মধ্যে যদি আমরা শুধু আনন্দ ও তৃপ্তিই খুঁজিতে যাই, তবে আমাদের পক্ষে উৎসব ব্যর্থই হইবে। উৎসবের মধ্যে এই জীবনের পরিবর্ত্তনটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য স্থানে রাখিতে হইবে। উৎসবের মধ্যে প্রেমময়ের স্নেহের দান অজস্র ধারেই বর্ষিত হয়। তাহা যদি আমরা হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ না করি, এবং জীবনগঠনে নিয়োগ না করি, তবে সে সমস্তই যে আমাদের সম্বন্ধে ব্যর্থ হইল, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উৎসবে কিছু পাওয়ার সঙ্গে হওয়াটা অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, যাহা পাইব তাহাকে আত্মস্থ না করিতে পারিলে, তদনুরূপ না হইলে, পাওয়ার কোনই মূল্য নাই। এই জন্যই হওয়ার গুরুতর দায়িত্ব হইতে আমরা কিছুতেই মুক্ত হইতে পারি না। প্রকৃত উৎসব সম্ভোগে অভিলাষী হইলে আমাদিগকে এই জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমাদিগকে যে জ্ঞান প্রেম পুণ্যের জীবন যাপন করিতে হইবে, প্রথমতঃ সেই আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে জাগ্রত করিতে হইবে; তৎপরে সে পথে যে সকল বাধা আছে তাহা দূর করিবার জন্য সাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে। আমরা যেরূপ আছি সেরূপই থাকিব, যে ভাবে চলিতেছি সেই ভাবেই চলিব, এরূপ মন লইয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিলে আমরা কিছুতেই প্রকৃত উৎসব সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব না। উৎসবের অপর যত আয়োজনই করি না কেন, তাহার মধ্যে এই আয়োজনই সর্ব্বপ্রধান। অথচ ইহাকেই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপেক্ষা করিয়া থাকি। আমরা এমনই চিন্তাবিহীন ভাবে চলি। এখন হইতে এই চিন্তাহীনতা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে গভীর ভাবে আত্মচিন্তায় ও আত্ম-পরীক্ষায় নিযুক্ত হইতে হইবে। তৎসঙ্গে আমাদের সঙ্কল্পকেও দৃঢ় করিতে হইবে। আমরা এ বিষয়ে বড়ই দুর্ব্বল ও চঞ্চল। আমরা কোনও ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহাতে লাগিয়া থাকিতে পারি না। সাময়িক স্রোতে নানা দিকে ভাসিয়া বেড়াই। ব্রতগ্রহণ দ্বারা আপনাদিগকে সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ না করিলে, এই দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব না। প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও সুদৃঢ় সঙ্কল্প থাকিলে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার বল আসিবে। অবশ্য সকল বাধা বিঘ্নই যে আমরা আপনার বলে অতিক্রম করিতে পারিব, তাহা বলিতে পারি না। কেন না, এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেই আমরা দেখিতে পাইব যে কত অসংখ্য অভ্যাসের শৃঙ্খলে আমরা আপনাদিগকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। সে সকল কঠিন শৃঙ্খল ছিন্ন করা এখন আমাদের সাধ্যাতীত হইয়াই পড়িয়াছে। কিন্তু আপনার চেষ্টাতে তাহা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিতে না পারিলেও যে আমরা অনেকটা শিথিল করিয়া দিতে পারি, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এ প্রকার চেষ্টাদ্বারা আমাদের অক্ষমতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যখন আমরা আকুল প্রাণে বলদাতার নিকট বল প্রার্থনা করি, তখন সে প্রার্থনা যে ব্যর্থ হয় না, তাহার শক্তিতে সকল শৃঙ্খল যে চূর্ণ হইয়া যায়, সকল বন্ধন যে টুটিয়া যায়, তাহাও কাহারও অবিদিত নহে। তাহার পরিচয় ত আমরা অনেক সময় প্রাপ্ত হইয়াছি। অহঙ্কারদ্বারা চালিত হইয়া আপনার শক্তিতে নির্ভর করিতে গেলে আমাদিগকে পরাজিত হইতে হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে নির্ভর রাখিয়া, তাঁহার বলে বলীয়ান হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আমাদের দুর্ব্বল শক্তিও যে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জয়মণ্ডিত হইতে পারে, তাহাও আমরা বিশেষ ভাবে অবগত আছি। সুতরাং আমরা যদি প্রকৃতভাবে উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হই, তবে কখনও আমাদের পক্ষে উৎসব একেবারে ব্যর্থ হইবে না। নিশ্চয়ই উৎসব আমাদের পক্ষে সফল হইবে। আমরা যেন সকলে আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, যথার্থভাবে উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হই। করুণাময় পিতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি ও যথোপযুক্ত শক্তি প্রদান করুন। আমাদের ত্রুটিতে যেন আর উৎসব পণ্ড না হয়। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য।

যীশু তাঁহার মনের আদর্শটিকে "স্বর্গরাজ্য" এই নামে চিহ্নিত করিয়াছিলেন। মানবসমাজে সেই স্বর্গরাজ্য কোন্ পথ দিয়া আসিবে? প্রথমে তাহা ব্যক্তিগত জীবনকে নূতন করিয়া গড়িবে, না, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাসকলের সংস্কারে তাহার আরম্ভ হইবে? এ বিষয়ে আজ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

মানবসমাজ বিধাতার এক অপূর্ব্ব বিধান। ইতর জীবকুল হইতে মানব শ্রেষ্ঠ বলিয়াই মানুষ "সমাজ" সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। অন্যান্য জীবগণের মধ্যে দেখা যায় যে, একদল প্রাণী যে-পরিমাণে একই অভাবের তাড়না ও একই বাসনার প্রেরণা অনুভব করে, সেই পরিমাণে তাহারা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত ও দলবদ্ধ হয়। ইতর জীবগণের ন্যায় মানুষও অভাবের তাড়নার ও বাসনার প্রেরণার অধীন, এবং এই কারণে মানুষেরাও পরস্পরের প্রতি নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই নির্ভরের ভাবকে মানুষেরা শত প্রকার বিনিময়ের প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া গভীরতর ও দৃঢ়তর করিয়া লয়। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাই, ইতর প্রাণিগণ সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে গিয়া দলের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী তাহারই অনুসরণ করে ও তাহারই অধীন হয়। উহাদের মধ্যে দৈহিক শক্তিই শাসনশক্তি। কিন্তু মানবসমাজে দেখিতে পাই, শক্তির অতিরিক্ত "অধিকার" "ধর্ম্ম" প্রভৃতি কতকগুলি আদর্শ বিদ্যমান। এই আদর্শসকলই মানবসমাজের নিয়ামক ও পরিচালক। আরও একটি কথা এই যে, মানবসমাজে মিলন ও দলবন্ধন কেবল স্বার্থমূলক অন্ধ বাসনার চালনে হয় না; কিন্তু নিজ ইচ্ছায় অপরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জনের ও আত্মোৎসর্গের ভাবটিও, একের সহিত একের মিলন, এবং অনেকে মিলিয়া দলবন্ধন, এই উভয় বিষয়ে মানবকে পরিচালিত করে। আমরা মানবসমাজকে বিধাতার অপূর্ব্ব বিধান বলিয়া কেন অনুভব করি? ইহার কারণ এই যে, নিঃস্বার্থ প্রেমই ইহার প্রধান বন্ধন; যাঁহাদের বাসনাসকল সুশৃঙ্খলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত এমন সাধু সজ্জনেরাই ইহার প্রধান রক্ষী ও প্রহরী; অলিখিত অথচ প্রত্যেক হৃদয়ে উপলব্ধ শত শত সংযমের আদর্শই ইহার রাজবিধি; যুগ যুগান্তর হইতে আগত ইতিহাস-সূত্রে প্রাপ্ত বীরত্বের ও মহত্বের দৃষ্টান্ত-সকলই ইহার প্রধান প্রেরণা-শক্তি। মানবসমাজে প্রেম, পবিত্রতা ও উন্নতির জন্য এই যে একটি চিরন্তন গভীর আকাঙ্ক্ষা লক্ষিত হয়, ইহা বিধাতার বিশ্বজগৎব্যাপী অমোঘ শাসনেরই প্রতিবিম্বস্বরূপ।

কিন্তু মানবসমাজের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাসকল এইরূপ উন্নত হওয়া সত্ত্বেও, যখন আমরা ইহার বিভিন্ন স্তরের মানুষগুলির জীবন ও জীবনের আবেষ্টনসকলকে পরীক্ষা করি, তখন নানা কারণে হৃদয় গভীর দুঃখে পরিপূর্ণ হয়। দেখিতে পাওয়া যায়, কত রোগের বীজ মানবসমাজের ভিতরে লুক্কায়িত রহিয়াছে, ও ইহার স্বাস্থ্য গোপনে হরণ করিতেছে। প্রায় সকল দেশের ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়, সামাজিক বন্ধন ও রাষ্ট্রীয় শাসন যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, ততই প্রতিভাসম্পন্ন ও শক্তিশালী লোকদিগের জন্য জীবনের নানা উজ্জ্বল পথ ও নানা প্রকার প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত হইতে থাকে; কিন্তু দুর্ব্বল ও দরিদ্রদিগের জন্য উপযুক্ত আশ্রয় রচিত হয় না। সমাজের উন্নতিতে তাহারা যেন তাড়িত হইয়া এমন এক ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে, যেখানে তাহাদের পরাজয় ও মৃত্যু নিশ্চিত। মানবসমাজের যে-কোনও অংশকে পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে দাসরূপে, অন্ত্যজ জাতিরূপে, জীবিকাহীন শ্রমজীবীরূপে, ভিক্ষুকরূপে, অকর্ম্মণ্য রোগী রূপে, কোনও না কোনও আকারে, সমাজের অধিকাংশ লোকের অনাদৃত, সবলের পেষণে চূর্ণ, এক শ্রেণীর মানুষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানবসভ্যতার ইতিহাস লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, ধনী ও দরিদ্র, অভিজাত ও অবজ্ঞাত, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, প্রভৃতি দুইটি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন দল অপরিহার্য্যরূপে সৃষ্ট হইতেছে, এবং সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উভয় দলের মধ্যে ব্যবধানও ক্রমাগত অধিক বিস্তৃত হইতেছে। মনে হয় যেন মানবসমাজের একপ্রান্ত বৃদ্ধি পাইতেছে, অপর প্রান্ত পরিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। হিন্দু, গ্রীক, রোমান, স্যারাসেন, ও য়ুরোপের মধ্য যুগের খ্রীষ্টিয় সভ্যতা,—এ সকলের প্রত্যেকটির প্রসারের সময়ে কত প্রতিভাসম্পন্ন বক্তা, কত রাজনীতিবিৎ পণ্ডিত, কত কবি, আপন আপন চিহ্ন মানবসমাজের উপরে স্থায়ী ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন; কত শিল্পীর চিত্র ও কারুকার্য্য সেই সেই যুগে রচিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত মানবের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের রচিত কাব্য ও শিল্পের দ্বারা যে সকল নগরকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা পরীক্ষা করিলে কি দেখিতে পাই? ঐশ্বর্য্যভূষিত রাজসভায়, জ্ঞানমন্দিরে, এমন কি দেবমন্দিরে পর্য্যন্ত, কত প্রচ্ছন্ন পাপ; সুশোভিত দীপালোকিত রাজপথের পশ্চাতে কত মলিন দরিদ্রপল্লী, যেখানে মানুষ প্রায় পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে। অতীত যুগেই এইরূপ ছিল; এখন কলকারখানার যুগে এই অবস্থা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের রাজধানীসকল কেবল প্রতিভা ও মহত্বেরই জন্ম দান করে না, কিন্তু সে সকল কত অভাবনীয় দারিদ্র্য, কত অশ্রুতপূর্ব্ব পাপ, কত অচিন্তনীয় নিষ্ঠুরতা, ও কত অভিনব রোগেরও জননী।

মানবসমাজের এই অসামঞ্জস্য, ইহার শীর্ষদেশে বিকশিত পুষ্পস্তবকবৎ জ্ঞানী গুণী কবি শিল্পী ভক্ত ও মহাপ্রাণ মানবগণের উজ্জ্বল ও শোভাময় জীবন, এবং পাদদেশে কদর্য্য বিশীর্ণ মূলরাজির ন্যায় দরিদ্র অজ্ঞ নীতিহীন প্রজাকুল,—এই অসামঞ্জস্য যুগে যুগে মানবহিতৈষিগণের চিত্তকে ব্যথিত করিয়াছে। জনসমাজ হইতে, বিশেষতঃ তাহার নিম্নতর স্তরসকল হইতে, অজ্ঞানতা দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও পাপ কিসে নিবারিত হয়, যুগে যুগে মানবহিতৈষিগণ তাহার উপায় চিন্তনে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সকল অকল্যাণ হইতে মুক্ত আদর্শ মানবসমাজের যে ছবি তাঁহাদের অন্তরে জাগিয়াছে, তাহা তাঁহারা জনসাধারণের মনেও অঙ্কিত করিয়া দিতে যত্নশীল হইয়াছেন। এইরূপেই প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী (republic), আয়ে ব্যয়ে একীভূত মণ্ডলী (communism) কল্পিত সুখরাজ্য (Utopia), স্বর্গরাজ্য (Kingdom of Heaven), প্রভৃতি নানা নামে, নিষ্কলঙ্ক মানবসমাজের নানা আদর্শ মানব হৃদয়ে অভ্যুদিত হইয়াছে।

এই অসামঞ্জস্য দূর করিয়া নিষ্কলঙ্ক মানবসমাজ গঠন করিবার জন্য প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ আমাদিগকে কি করিতে হইবে? আলোচনার আরম্ভে যে দুইটি পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি তন্মধ্যে সমাজব্যবস্থার সংশোধনকে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। বোধ হয় গ্রীসদেশে এই চিন্তাপ্রণালীর সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এক শ্রেণীর গ্রীক পণ্ডিতের

যারা ঈশ্বরের কাজ করিবার ভার কিছু না পাইয়া থাকি, যদি ব্যক্তিগত জীবনে স্বর্গরাজ্যের ছাপ না পড়িয়া থাকে, যদি হৃদয়ে সে সৌন্দর্য্য, সে শুভ্রতা, সে করুণা না লাভ করিয়া থাকি, তবে সকলই বৃথা হইল, বৃথা হইল! অপর দিকে, যতক্ষণ আমি নিঃস্বার্থ ভাবে পূর্ণ হইয়া, করুণায় আর্দ্র হইয়া, সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া, একটি সামান্য সেবার কাজও করিতে পারি, যতক্ষণ আত্মত্যাগের আহ্বান প্রাণে একবারও শুনিতে পাই, যতক্ষণ ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য আপনাকে আহুতি দিবার ভাব গোপনে প্রাণে একবারও উদিত হয়, ততক্ষণ বিশ্বাস ও আশা করিব যে আমিও স্বর্গরাজ্যের দ্বারস্বরূপ, পথস্বরূপ, বাহনস্বরূপ হইয়া পৃথিবীতে দণ্ডায়মান হইতে পারি। শুধু তাই নয়, আমার অন্তরে উদিত ঐ শুভভাব আমাকে এই বিশ্বাস ও আশায় প্রদীপ্ত করিবে যে, এখনও প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবের সময় চলিয়া যায় নাই, এখনও ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিবার যুগ চলিয়া যায় নাই। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মজীবন যে একদিন স্বর্গীয় উদ্দীপনায় পূর্ণ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মবিধানকে যুগবিপ্লবে পরিণত করিবে, এ ভক্তিধারা যে একদিন পূর্ণ বেগে প্রবাহিত হইয়া ভারতকে পুনরায় ভাসাইয়া, সিক্ত করিয়া, ব্রহ্মসাগরসঙ্গমে ছুটিবে, তাহার সম্ভাবনা চলিয়া যায় নাই। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "তুমি তোমার একার জীবনের অনুপ্রাণনের উপরে এত অধিক নির্ভর কর? তুমি তোমার দুর্ব্বল জীবনের দুর্ব্বল ও চঞ্চল (fugitive) শুভভাবসকলের উপরে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের গৌরবময় ভবিষ্যতের আশার ভিত্তি স্থাপন কর?" তবে আমি তাঁহাকে বলি, "হাঁ, নিশ্চয়ই করি। বিধাতার বিধান জয়যুক্ত হইবে কি না, তাঁহার স্বর্গরাজ্য আসিবে কি না, এ বিষয়ে আমি যতটুকু বিশ্বাস করিব, আমি যতটুকু আশার দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎকে দেখিব, তাহা আমার আত্মদানের উপরেই নির্ভর করে। আমি তাঁহার হাতে প্রাণ দিলে, আমি তাঁহার ভাবে একবার পূর্ণ হইলে, তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারি যে, সেই মহান্ প্রভু তাঁহার স্বর্গরাজ্যের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, স্বর্গরাজ্য-নির্ম্মাণের একখানি ইষ্টক পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন।" কেহ যেন না বলেন যে এই বিংশ শতাব্দীতে organisationই সব করিবে, মানুষের দলবদ্ধ প্রচেষ্টাই সব করিবে।

আমরা নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের আহ্বান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে শত শত বার অবমাননা করি বলিয়াই জীবনে অনুপ্রাণন ও স্বর্গীয় উত্তেজনা অনুভব করি না। আমরা সভ্যতার আচ্ছাদনে দয়াকে চাপিয়া রাখি; আমরা লজ্জার খাতিরে দুঃখীদের কাছে বসি না; আমার একার হৃদয় যেখানে গোপনে কাঁদে সেখানে তৎক্ষণাৎ অপরের নিরপেক্ষ হইয়া দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হই না। এই সকল কারণেই আমরা অনুপ্রাণনবিহীন হইয়া পড়ি। স্বর্গরাজ্যের আহ্বান প্রতি হৃদয়ে আসিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে আসিতেছে, অতি সংগোপনে আসিতেছে। সে আহ্বানের অনুসরণ করাই ধর্ম্মজীবন; সে আহ্বানের অনুসরণ সকলে মিলিয়া করিলেই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আগমন করে।

আত্মদৃষ্টিবিহীন, আত্মসংশোধনে পরাঙ্মুখ, সাধনায় অলস মানুষ যখন নব যুগের দোহাই দিয়া নব যুগের উপরে ভরসা করিয়া বসিয়া থাকে, তখন বড়ই দুঃখ বোধ হয়। ব্রাহ্মগণ অনেক সময়ে বলিয়া থাকেন যে, এই নবীন যুগে সকলই যখন উন্নত ভাব ও বিশুদ্ধ সংস্কারসকলের বিস্তারের পক্ষে অনুকূল, তখন আর ভাবনা কি? তখন স্বর্গরাজ্য তো আপনা আপনি আসিবে। যুগের প্রভাবে মানবের সমষ্টিগত চেষ্টা আপনি সেদিকে যাইবে। কিন্তু তাহা হইবার নয়। এদেশের প্রাচীন হিন্দু যুগে সমাজের ব্যবস্থাপকগণই রাজার মন্ত্রী ছিলেন; রাজশক্তি পূর্ণ ভাবে ধর্ম্ম-নিয়মের ও শাস্ত্রকারগণের অধীন ছিল। এত অনুকূল অবস্থার মধ্যেও ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনে অনুপ্রাণন ছিল না, প্রেম ভক্তি যেন শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল। তাই প্রাচীন ব্যবস্থাসকল অগ্রাহ্য করিয়া যুগে যুগে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল, আন্তরিক ধর্ম্মজীবনকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য নব নব ধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আমরা সেই হিন্দু যুগ অপেক্ষা অধিক অনুকূল অবস্থা পাই নাই। আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, মার্জ্জিত সংস্কার ও সুসংস্কৃত রীতিনীতি,—এ সকলি শুষ্ক হইয়া যাইবে, যদি ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনে অনুপ্রাণন না থাকে।

আমরা তবে নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করি। স্বর্গরাজ্য বিস্তার করিবার জন্য তুমি আমি প্রত্যেকে দায়ী। ব্রাহ্মধর্ম্মবিধান যাহাতে শুষ্ক হইয়া না যায়, যাহাতে ইহার মধ্যে পূর্ব্বতন ধর্ম্ম-বিধান সকলের ন্যায় মানুষকে নবজীবন দিবার শক্তি থাকে, যাহাতে ইহার সুশীতল ছায়াতলে আসিয়া দুঃখীরা সান্ত্বনা পায়, পাপীরা নির্ম্মল হইতে পায়, যাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র দুঃখী পাপী ও শোকার্ত্ত জন ইহার দিকে আশার সহিত তাকাইতে পারে, তাহার জন্য তোমাকে আমাকে কিছু হইতে হইবে। তোমাকে আমাকে উন্নত হইতে হইবে, শুদ্ধ হইতে হইবে, করুণায় পূর্ণ হইতে হইবে, স্বর্গীয় অনুপ্রাণনে উদ্দীপ্ত হইতে হইবে। আমরা বিলম্ব করিতে পারি না। কবে ভাল ব্যবস্থা হইবে, কবে সমাজের constitution ভাল হইবে, দেশের লোকের মতিগতি আরও ভাল হইবে, কবে অপরেরা তাহাদের কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিবে, কবে রাজার আইন কানুন আরও উন্নত হইবে, এ সকলের দিকে চাহিয়া বিলম্ব করিবার অধিকার আমাদের নাই। স্বর্গরাজ্যের দূত যাঁহারা, বর্ত্তমানই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত যুগ, এবং যেখানে তাঁহারা পদার্পণ করেন সেখানেই তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র।

ঈশ্বর করুন, নীরবে যখন মনে দয়া আসিয়া আঘাত করে, একাকী পথে চলিতে চলিতে যখন দুঃখীর বেদনা হৃদয়কে ক্লিষ্ট করে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যখন যেখানে যেভাবে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের আহ্বান আসিয়া হৃদয়কে আন্দোলিত করে, তখনই ও সেখানেই যেন আমরা সে আহ্বান স্বীকার করি, ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন হইয়া জগতে তাঁহার স্বর্গরাজ্যের আগমনের জন্য অপেক্ষা করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(বাঁকিপুর, রবিবার, ১৯ এপ্রিল, ১৯০৩)

ধর্ম্ম

(১)

তবে কি সকলি মিথ্যা দয়া, ধর্ম্ম, নীতি ?
অসত্যেরে সত্য বলা মানুষের রীতি ?
প্রেম নাই, পুণ্য নাই, নিত্যকাল ধরি,
অধর্ম্মই আছে শুধু বিশ্ব পূর্ণ করি ?
রাক্ষসী হিংসাই তবে যুগ যুগান্তর,
মানুষের উষ্ণ রক্তে ভরিবে উদর ?
জগতে রহিবে সদা পাপ অত্যাচার,
পশুত্ব করিবে তার প্রভাব বিস্তার ?

(২)

না প্রভু, এ মিথ্যা কথা! লক্ষ বর্ষ ধ'রে,
ধর্ম্ম না থাকিলে, বিশ্ব রয়েছে কি ক'রে ?
তুমি আছ, ধর্ম্ম আছে, কোটি বিশ্ব নর,
ন্যায়ের শৃঙ্খলে বাঁধা ধর্ম্মের ভিতর।
এ শৃঙ্খল ছিন্ন হ'লে কে থাকে কোথায় ?
তাই নিরন্তর এই বিচিত্র ধরায়,
রত্নমণি-খচিত মুকুট শিরে ল'য়ে,
নৃপতি ধর্ম্মের কাছে আছে নত হ'য়ে।
দুরন্ত দুর্ব্বৃত্ত নর পাষণ্ড যে জন,
সেও শির পাতি লয় ধর্ম্মের শাসন!

(৩)

হে দেব, তুমিই ডেকে শুনাও মানবে,
অধর্ম্ম বিনাশ হবে, ধর্ম্ম শুধু রবে।
কালের যে ইতিহাসে অই লেখা আছে,
অযুত মানব এই বিশ্বে আসিয়াছে;
করেছে সদর্পে কত পাপ-অভিনয়;
কোথা তারা? কালগর্ভে হয়েছে বিলয়।
কিন্তু এ জগতে ভক্ত এসেছিল যারা,
প্রেমিক, পুণ্যাত্মা, ত্যাগী ধর্ম্মে আত্মহারা;
ধর্ম্মই অমর করি' রেখেছে তাঁদের;
অধর্ম্মই ডেকে আনে মৃত্যু মানবের।

(৪)

হায় নাথ, মৃত্যুভয়ে ভীত নরনারী,
নিরথ তবুও তারা ধর্ম্মপথ ছাড়ি,
প্রবৃত্তির মোহে সদা ঘুরিয়া বেড়ায়,
কোথা জুড়াবার ঠাঁই খুঁজিয়া না পায়।
কে দিবে তাদের শান্তি ? ধর্ম্ম না হইলে,
সুখেতে ধরায় কভু সুখ নাহি মিলে।
তুমি তবে কর দয়া, দেহ দিব্যজ্ঞান,
ধর্ম্মেতে আসুক ফিরে মানুষের প্রাণ।
অধর্ম্ম, অপ্রেম হিংসা যা'ক জগতের,
আসুক এ মর্ত্তে, নেমে আনন্দ স্বর্গের।
থেমে যা'ক সংসারের আকুল ক্রন্দন,
তোমার প্রেমেতে হোক বিশ্বের মিলন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

নীরব সাধকের নিভৃত চিন্তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫৫)

পৃথিবীর নানা স্থানে লোকের মনে নানা প্রকার সাধুভাব প্রেমর জন্য, তাহার প্রকাশরূপে সাধু সাহিত্য ও কবিতা এবং সাধু উক্তি প্রভৃতির সমাদর সকলে করিয়া থাকে। উত্তমের সমাদর করা, উত্তমের সহিত পরিচিত হওয়া, তাহার আস্বাদন গ্রহণ করা, মানবের জন্য একান্ত আবশ্যক। তাহা যদি সে না করে তবে তাহাতে সে ক্ষতিগ্রস্তই হয়। এজন্য উদার ভাবে সর্ব্বদেশের সাহিত্যাদির সহিত পরিচিত হইতে সকলেই প্রয়াসী হয়। যাহারা সেরূপ করে না, তাহাদের আত্মাদর, আত্ম-সম্মানবোধ, যখন তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া ফেলে, তখনই তাহারা উদার ভাবে সর্ব্বত্র হইতে উত্তমের আস্বাদন করিতে বিমুখ হইয়া থাকে। তাহাতে তাহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হয়। সে ক্ষতির পরিমাণ সামান্য নহে। লোকে এদিক দিয়া এ সকল উত্তমকে বরং গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু ব্যবহারের বস্তু সম্বন্ধে এরূপ উদার ব্যবহারে প্রায়শঃ অনিচ্ছা হইয়া থাকে। এস্থলে অনুদার অর্থনীতি আসিয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে। আমাদের পক্ষে এরূপ সংকীর্ণতার পরিচয় দেওয়া অতি ক্ষতির কারণ—ধর্ম্ম-হানির কারণ, উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রতিকূলতাচরণ। প্রভু, আমাদিগকে এ উৎপাত হইতে রক্ষা কর।

(৫৬)

প্রভো, তোমার পূজা লক্ষ লক্ষ লোকে প্রতিদিন করিতেছে। তুমি এই সব লোকের পূজা চাও কি? লোকের স্তব স্তুতিতে তোমার কি প্রয়োজন? তোমার ত কিছুতেই আবশ্যক নাই। তোমার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই। তবে তোমার এ সব স্তব স্তুতিতে কি প্রয়োজন আছে? তোমার কোন অভাবও নাই, প্রয়োজনও নাই; কিন্তু আমাদের প্রয়োজন আছে তোমার পূজা করিয়া সুস্থ ও সুখী হই। তোমার স্মরণ মনন ও নামকীর্ত্তন প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিলে আমরাই সুন্দর হইতে পারি, সুখী হইতে পারি। সুন্দর হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের আশা, রুচি, প্রবৃত্তি সবই তোমার স্মরণ মননেই সমুন্নত হয়—পরিশুদ্ধ হয়। তাই তোমার পূজা করিতেই হইবে। তোমার তাতে কিছুই হ্রাস বৃদ্ধি না থাকিলেও, তোমার সন্তানদের তাতে কল্যাণ হয়, সুতরাং তোমারও তাতে প্রয়োজন আছে। আশীর্ব্বাদ কর, সকলেরই তোমার পূজায় মতি হউক।

(৫৭)

সংগীতে আছে "অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না কর যদি ক্ষমা।" এখানে হওয়া উচিত ছিল "অপরাধ যত করিয়াছি পদে না কর যদি ক্ষমা"। কারণ, অপরাধ করে নাই এমন কে আছে? অপরাধী আমরা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই। সুতরাং ইহাই বলা উচিত—"অপরাধ যাহা করিয়াছি পদে না কর যদি ক্ষমা

মধ্যে এক সময়ে এই বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল যে সমাজকে ও রাজ্যকে আদর্শ সমাজে ও আদর্শ রাজ্যে পরিণত করিতে হইলে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ শাসনকর্ত্তাদিগকে জ্ঞানী হইতে হইবে, অথবা পণ্ডিতদিগকে শাসনকর্ত্তার পদে বরণ করিতে হইবে। তাঁহাদের যুক্তি এই ছিল যে, যতক্ষণ না সমগ্র সমাজ ও সমগ্র জাতি নব প্রণালীতে ও নব নিয়মে গঠিত হয়, ততক্ষণ কোনও একজন ব্যক্তির পক্ষে উন্নত ও সুখী হওয়া অসম্ভব। তাহারা সমাজের গঠনপ্রণালীর দোষকেই মানুষের সকল দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্ব্বলতা, অজ্ঞানতা ও পাপের মূল বলিয়া স্থির করিলেন, ও তাহার সংশোধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "যাহারা কিছু জানে না, তাহারাই শক্তি পরিচালন করিতেছে, যাহারা স্বয়ং ধর্ম্মের অধীন নয়, তাহারাই ধর্ম্মাধিকরণে বিচারাসনে বসিয়াছে; এজন্যই মানব-সমাজে স্বার্থপর হইবার পক্ষে প্রলোভন এত প্রবল, এবং নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের জন্য প্ররোচনা এত ক্ষীণ। এ প্রণালী পরিবর্ত্তিত কর। যাহারা পুরুষোচিত বল স্বাস্থ্য ও আত্মশাসনশক্তিতে সম্পন্ন, ও যাহারা সমাজের সমবেত স্বার্থের জন্যই জীবনধারণ করিতে প্রস্তুত, এমন লোকদিগকে সমাজের নেতৃস্থানে প্রতিষ্ঠিত কর। বাল্যাবধি মানুষকে কঠোর শাসন ও সংযমমূলক শিক্ষা দিয়া, এবং আত্মবলিদানের দৃষ্টান্তসকলকে সমাজমধ্যে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া, মানুষের অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ববুদ্ধিকে (individualism) ও স্বার্থরক্ষিণী বুদ্ধিকে নষ্ট কর। পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য, পারিবারিক জীবন, শুধু আপন সন্তানসন্ততি লইয়া পিতামাতার আবদ্ধ থাকা,—এ সকল প্রথা লুপ্ত কর। তাহা হইলে মানবসমাজ যন্ত্রের মতন সুশৃঙ্খল ভাবে চলিবে, কারণ কোনও ব্যক্তিই তখন আর সমগ্র সমাজের উন্নতির পরিপন্থী হইতে পারিবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ লোপ পাইলে সমাজের অন্তর্ভূত প্রত্যেক মানুষ আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য লইয়া ও আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট অধিকার প্রাপ্ত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে।" এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণের চিন্তাপ্রণালীর পশ্চাতে এই ভাবটি বিদ্যমান ছিল যে, মানুষ তাহার পরিবেষ্টনকারী নিয়ম প্রথা শিক্ষা দীক্ষা ও দৃষ্টান্তসকলের এত অধীন যে, সে-সকলকে পরিবর্ত্তিত করিলেই প্রত্যেক ব্যক্তি আপনা-আপনি উন্নত হইবে। অগ্রে সমাজকে নূতন ব্যবস্থাদ্বারা ও নব নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপকের দ্বারা পরিবর্ত্তিত কর; ব্যক্তিগত জীবন শুদ্ধ ও সুখী নিশ্চয়ই হইবে।

ভারতের সংহিতাকারগণের ব্যবস্থাপ্রণালীর মূলেও এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা ঐ গ্রীক পণ্ডিতগণের ন্যায় ব্যক্তিগত জীবনকে সমাজের স্বার্থের নিকটে নিঃশেষে বলিদান করিবার উদ্যোগ করেন নাই বটে। কিন্তু গ্রীক পণ্ডিতগণ তাঁহাদের মতামত কেবল পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন; ভারতীয় সংহিতাকারগণ নিজ ব্যবস্থা অনেক পরিমাণে জনসমাজে প্রচলিত করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। সত্য বটে, তাঁহারা ধর্ম্মচিন্তা ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মভাব বিষয়ে ব্যক্তিগত জীবনে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন; মানুষ শাক্ত শৈব বৈষ্ণব দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী, যাহা ইচ্ছা হউক, সে বিষয়ে তাঁহারা কিছুই বলেন নাই। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যসকলকে তাঁহারা যেমন করিয়া নানা নিয়ম দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, বর্ণাশ্রমভেদে নানা কর্ত্তব্যের ও নানাবিধ সংস্কার (অনুষ্ঠান) প্রভৃতির ব্যবস্থাকে তাঁহারা যেরূপ অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই বিশ্বাসেরই আভাস পাওয়া যায় যে, সামাজিক ব্যবস্থার উপরেই মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ, (অর্থাৎ পাপ পুণ্য ও সুখ দুঃখ উভয়ই) নির্ভর করিতেছে।

কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা অন্যরূপ। আইন, সমাজরীতি, সামাজিক শাসন,—ইহারা মানুষের কার্য্যকে নিয়মিত করিতে পারে, কিন্তু অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য দেখা যায়, অতি সুব্যবস্থিত মণ্ডলীও ধীরে ধীরে বিশৃঙ্খল হইয়া যায়; নানা অলক্ষ্য সূত্র ধরিয়া তাহার মধ্যে পাপ, দুর্নীতি, এবং দারিদ্র্যের আনুষঙ্গিক অশেষবিধ দুর্গতি প্রবেশ করে। কারণ, মানুষ সুখ দুঃখের অধীন, ও নানা বাসনা কামনার দ্বারা আন্দোলিত জীব। একদল সৈন্যকে সুনিয়মে শিক্ষিত করিয়া সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে রাখিলে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাকে একটি শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সৈন্যদল রূপে রক্ষা করা যায়; কারণ, সৈন্যদলের যুদ্ধশক্তি ও শৃঙ্খলা তাহাদের দেহের কার্য্যের উপরে নির্ভর করে, এবং মানুষের দৈহিক জীবনকে নিয়ম ও শাসনের দ্বারা একান্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব নহে। কিন্তু মানব-সমাজও যুদ্ধক্ষেত্র নয়, এবং মানুষেরাও যন্ত্রচালিত পুতুল নয়। সমাজমধ্যে যে সকল মানুষ বাস করে, তাহাদের সকল কর্ম্মের উৎস তাহাদের অন্তর। অন্তরের সুখ দুঃখকে, অন্তরের বাসনা কামনাকে, কেবল বাহিরের ব্যবস্থাদ্বারা নিয়মিত করা যায় না।

এইজন্য বলিতে হয়, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনয়নের কাজটি প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ আন্তরিক ও ব্যক্তিগত কাজ। বর্ত্তমান যুগে আমরা 'ধর্ম্ম' বলিলে কেবল কতকগুলি সমাজনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বুঝি না। বুঝি, প্রত্যেক ব্যক্তির সেই ঈশ্বরমুখীনতা, যাহা প্রথমতঃ তাহার অন্তরকে, এবং তৎপরে তাহার কার্য্যকে, পরিবর্ত্তিত করিবে। মানব-অন্তরকে নূতন করিয়া দেওয়া,—ইহাই ধর্ম্মের প্রধান কার্য্য, এবং ইহাই স্বর্গরাজ্যের পথ। এই জন্য আমাদের মনে হয়, মানবসমাজকে নূতন করিয়া গঠন অথবা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন, এ কার্য্যটি যত পরিমাণে সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক উন্নতি, প্রভৃতি জনসমাজের দলবদ্ধ চেষ্টার উপরে নির্ভর করে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনের ও চরিত্রের উপরে নির্ভর করে; যত পরিমাণে ব্যবস্থাপকগণের ও সর্ব্বসাধারণের নয়নগোচর মানুষদিগের (public men) উপরে নির্ভর করে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তোমার আমার উপরে, লোকচক্ষুর অগোচর ব্যক্তিদিগের (private men) উপরে নির্ভর করে। এ কার্য্যটি করিবার ভার ঈশ্বর মানব-উদ্ভাবিত ব্যবস্থাযন্ত্রের হাতে সমর্পণ করেন নাই, ব্যক্তিগত ধর্ম্মের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন।

জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনের (অর্থাৎ চরিত্র ও আচরণের) নব আদর্শের বার্ত্তা লইয়াই অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। জনসমাজকে সংশোধন অথবা নবভাবে গঠন করিবার বিষয়ে তাঁহারা ব্যবস্থাযন্ত্রের উপরে

নির্ভর করেন নাই। বুদ্ধদেব কোনও নূতন পূজার প্রণালী কিংবা নূতন যজ্ঞ শিক্ষাদান করিলেন না; তিনি প্রাচীন ব্যবস্থাপকদিগের বিধি ও নিষেধ সকলের সমর্থনও করিলেন না, বিপক্ষতাও করিলেন না। কিন্তু দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা দ্বারা তিনি ধীরে ধীরে নূতন একটি আদর্শ প্রচার করিলেন; তাহা একান্তভাবে মানবের মনন ও আচরণ বিষয়ক আদর্শ। অধিকাংশ মানুষের মন যখন বাহ্য পূজার আড়ম্বর, দৈহিক শুচিতার ব্যবস্থা, এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার লইয়া ব্যস্ত, তখন বুদ্ধদেব বলিলেন, এ সকল তুচ্ছ কথা, মানুষের সম্যক্ চিন্তা ও সম্যক্ আচরণই শ্রেষ্ঠ বিষয়। মানুষের মন পূর্বে যাহা লইয়া মাতিয়া থাকিত, ও তিনি তাহাকে যাহা লইয়া মাতিয়া থাকিতে শিখাইলেন, উভয়ের পার্থক্য, যেন লৌহখনিতে স্বর্ণ-রেখার ন্যায়, উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হইয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। তিনি শিক্ষা দিলেন যে, শুদ্ধ চরিত্র, সংযত বাসনা, ও কারুণ্যপূর্ণ ব্যবহারই সকল সুখের হেতু, সকল দুঃখের ঔষধি ও সকল পাপের বিনাশক। প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়কে আত্মসম্বন্ধে সংযত ও অপর সম্বন্ধে করুণাপূর্ণ করিয়া দিয়া তিনি যাবতীয় সামাজিক সমস্যার সমাধান করিলেন। তাঁহার শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে, ঐ দেখ, নূতন এক দল মানুষ জন্ম গ্রহণ করিল; তাহারা আত্মসুখে নিঃস্পৃহ, পরদুঃখে কাতর, জীবহিংসায় বিরত, ও আর্ত্তসেবায় নিরত। যতক্ষণ না মানুষ এই সত্যটি উপলব্ধি করে যে, সমাজের ব্যবস্থা-দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যসকলের অতিরিক্ত, মানবমনের দয়া, প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি ভাবসকলের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আরও এক শ্রেণীর কর্ত্তব্য আছে, ততক্ষণ মানুষ স্বার্থপরতার অপেক্ষা উন্নততর স্তরে উঠিতে পারে না, সমাজকেও উন্নত করিতে পারে না। তুমি কেমন করিয়া দুঃখীর সেবা করিবে, কেমন করিয়া তাপিত হৃদয়ের তাপ দূর করিবে, কেমন কোমল স্বরে ব্যথিত ও শোকার্ত্ত জনের সঙ্গে কথা কহিবে, কিরূপ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রোগজীর্ণ মুখের দিকে তাকাইবে, এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রের কোনও নির্দ্দেশ নাই, মনুর কোনও ব্যবস্থা নাই, দর্শনশাস্ত্র ইহার পথপ্রদর্শনে অসমর্থ, সমগ্র ব্রিটিশ আইন ও মিউনিসিপ্যাল বিধিতে এ বিষয়ের কোনও ধারা নাই। কল্পনাও করিতে পারি না যে, কোনও দেশের বা সমাজের রাজনীতি বা সামাজিক ব্যবস্থাতে এ সকলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোনও নিয়ম প্রণীত হইবে। অথচ, এই সকলের উপরে যত পরিমাণে মানবসমাজের কল্যাণ সৌন্দর্য্য সুখ ও শান্তি নির্ভর করে, এমন আর কিছুরই উপরে নির্ভর করে না। যদি পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য কোনও দিন আসে, তাহার জন্য ব্যক্তিগত জীবন ও অন্তরের জীবনকেই সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত করিতে হইবে। ভাল ব্যবস্থা (perfect organisation) ইহার পরে আসিলেও চলিবে।

ভারতের পক্ষে বুদ্ধদেব যাহা করিলেন, জুডিয়া দেশে যীশুও তাহাই করিলেন। তিনি স্বর্গরাজ্য বলিতে কোনও নূতন ব্যবস্থাদ্বারা গঠিত সমাজ মনে করেন নাই। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়কে স্বতন্ত্র ভাবে ও সাক্ষাৎ ভাবে স্পর্শ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। যে-মানুষ যে-অবস্থায় অবস্থিত থাকুক ও যেমন কার্য্যে রত থাকুক, তাহার হৃদয় ও ইচ্ছাকে ঈশ্বরের সহিত মিলিত করিয়া দিবার জন্যই তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক মানুষের আত্মাকে তাহার অন্তরবাসী ঈশ্বরের চরণে স্থাপন করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহার পতিতোদ্ধারপ্রণালীর আকার ছিল ব্যক্তিগত, দলবদ্ধ নহে। তাঁহার অনুবর্ত্তী শিষ্যদিগের প্রত্যেকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেবদূতের ন্যায় দুঃখী ও আর্ত্তকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সেই পুরাতন দেশ, সেই দুঃখী ও পতিত ইস্রায়েল, সেই চিরলাঞ্ছিত পরপদানত ভূমি, জগতে এক অপূর্ব্ব আদর্শ প্রচার করিল। দেশে রোমকশাসন তখনও রহিল, সমাজে ফরীশীদিগের প্রতাপ তখনও অক্ষুণ্ণ রহিল; তাঁহারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না,—কোনও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বা সংশোধনের জন্য একদিনও অপেক্ষা করিলেন না। কিন্তু আপনাদিগের জীবনে এমন এক আদর্শ ধরিলেন, আপনাদিগের চরিত্রে এমন এক নূতন ভাব পাইলেন, আপনাদিগের হৃদয়ে দুঃখীর জন্য এমন এক উচ্ছ্বসিত সহানুভূতি ও করুণ বেদনা অনুভব করিলেন, তাহারই দ্বারা তাঁহারা স্বর্গরাজ্য দর্শন করিলেন, ও সমগ্র জগৎকে স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইহাই স্বর্গরাজ্যের আগমনের প্রণালী। প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ই সেই দ্বার, যে দ্বারে স্বর্গরাজ্য আসিয়া প্রথম আঘাত করেন। দেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে নহে, ব্যবস্থাপকদিগকে নহে, অনেক শক্তি যাহাদের হাতে ও অনেক লোক যাহাদের অধীন তাহা-দিগকে নহে, কিন্তু তোমাকে আমাকে বিধাতা ভার দিয়াছেন যে জগতের মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত করিয়া দাও, পুণ্যরাজ্য আনয়ন কর, দুঃখীর দুঃখ মোচন কর। তিনি ব্যবস্থার দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "স্বর্গরাজ্যরচনার ভার তোমাদেরই উপরে, এবং তাহার ক্ষেত্র তোমাদেরই **জীবনে**।" আমাদের হৃদয় কি তাঁহার এই বাণীতে নির্ভর করিতেছে? আমরা কি ভাবে আর্ত্তসেবার কাজ কিংবা ব্রাহ্ম-সমাজের সেবার কাজ করিতে অগ্রসর হই? আমরা আমাদের **হৃদয়কে** তাহার জন্য প্রস্তুত করিতে ব্যাকুল হই, না, মস্তিষ্ক ও হস্তকে তাহার জন্য শিক্ষিত (trained) করিতে ব্যাকুল হই? আমাদের দৃষ্টি কোন্ দিকে ধাবিত হয়?

জগতে এই দুই ধারায় বিধাতার কাজ চিরদিন চলিয়াছে,—প্রথম, বাহিরের অবস্থা ও ব্যবস্থাকে উন্নত করা, এবং দ্বিতীয়, ব্যক্তিগত জীবনকে শুদ্ধ ও মহৎ ভাবে পূর্ণ করিয়া, তাহার দ্বারা চারি দিকে প্রেম ও করুণা, মাধুর্য্য ও সান্ত্বনা, বিস্তার করা। এক ধারা অন্তররাজ্যে ও এক ধারা বহির্জগতে প্রবাহিত। এই দুই কার্য্যের ভার ঈশ্বর প্রায়ই বাঁটিয়া দিয়া থাকেন; দুইয়ের ভার একই হাতে সাধারণতঃ পড়ে না। হয় তো আমরা প্রথম প্রকারের কাজের ভারও কিছু কিছু পাইয়াছি; হয় তো আমাদের হাতে নূতন বিধি ও ব্যবস্থা গড়িবার ভারও কিছু কিছু পড়িয়াছে; হয় তো আমরা সমাজসংস্কারের, সমাজের কার্য্যপদ্ধতি (constitution) গঠনের, নাগরিক কার্য্যের, রাজব্যবস্থার, কিংবা দেশশাসনের কিছু কিছু ভার পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য বলিয়া অনুভব করিতেছি। কিন্তু যদি হৃদয়ের দ্বারা, অন্তরের দ্বারা, ব্যক্তিগত জীবনের নীরব স্পর্শের

তবে পরাণপ্রিয় দিও হে দিও বেদনা নব নব।” তোমার হাতের বেদনা পাইয়াই সুস্থ হইব, নিরাপরাধ হইব। এবং তোমার সন্তানের যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ হইয়া ধন্য হইব।

(৫৮)

লভিতে চাহরে যদি সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম।
যদ্যপি জানিতে ইচ্ছা সার সত্য মর্ম্ম॥
কাট তবে স্বার্থ-পাশ জাতিত্ব বিকৃত।
যাহার প্রভাবে তব নয়ন আবৃত॥
“পিতা নোঽসি” মহাবাক্য কর প্রণিধান।
এক পিতা সবার, লও এই জ্ঞান॥
ঈশ্বরের পিতৃভাব ভ্রাতৃত্ব মানবে।
সাধিবে যদ্যপি, ছাড় মোহমন্ত্র তবে॥
দেশপ্রীতি প্রার্থনীয় মহামূল্য ধন।
বিকৃত হইলে তাহা রোধে দুনয়ন॥
না দেয় সত্যের জ্যোতি দেখিতে মানবে।
অপ্রেমের মোহবাক্যে মুগ্ধ করে সবে।
অতএব কর প্রীতি সর্ব্ব নারী নরে।
দেশ-জাতি ভেদ ছাড় চিরদিন তরে॥
ভেদরূপী আচরণ ঘুচে যাবে যবে।
সু-উদার ধর্ম্ম লভি ধন্য হবে ভবে॥

(৫৯)

লয়ে যাওগো ভিতরে অমৃত নিকেতনে,
অতিশয় পাই ব্যথা সংসার-আলোড়নে।
বাহিরে ঝড় তুফান, আঘাত আন্দোলন,
না দেয় সুস্থির হ'তে, চলছে নিত্য রণ।
সাধ কি হয় না মাগো তোমার গৃহে পশি,
শান্ত হ'য়ে শুনি বাণী চরণপ্রান্তে বসি'।
হ'তে চাহি ধীরচিত্ত প্রেমের আস্বাদনে,
নিরুদ্বেগে করি বাস তোমার সম্মিলনে।
প্রার্থনা গ্রহণ করি' লওগো কোলে তুলে,
কাটায়েছি বহু দিন শান্তির ক্রোড় ভু'লে।
সহে না যাতনা আর, শুন কাতর বাণী,
চিরতরে রাখ মন্দ সন্তান জানি'।
হাসিব নাচিব গাব তোমার সন্নিধানে,
উৎসাহ ঢালিয়া তুমি দিবে গো উদ্দীপনে।

(৬০)

যদি লভিতে চাও উদার প্রেমের ধর্ম্ম।
যদি জানিতে চাও সরল ধর্ম্মের মর্ম্ম॥
তবে ছাড় তোমার সুবিধার মোহমন্ত্র।
বিকৃত দেশ-প্রীতি অপ্রেমের ষড়যন্ত্র॥
ক্রোধেরে কর জয় অক্রোধের তীক্ষ্ণ শরে।
দিয়ে সাধুতা লভ জয় অসাধু উপরে॥
ঘাতের বিনিময়ে ঘাত হানিবে না কভু।
জয় দিবেন তাতে(ই) তোমার পরম প্রভু॥
ভ্রাতৃত্ব সাধনের এই মূল মন্ত্র সার।
সাধিয়া লহ তুমি ধর্ম্ম পরম উদার॥
সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের এই সু-উদার বাণী।
ধন্য হউক জন্ম তব, শুভ তত্ত্ব মানি'॥

(৬১)

এবার লও হে তোমার ক'রে লও।
(আমি বেঁচে যাই, তোমার হ'য়ে যাই)
জীবন লভি' ডুবে যাই সুধাসাগরে।
জল-তলে মীন-প্রায় আমারে ডুবাও।
অনেকের সেবা ক'রে রয়েছি জীয়ন্তে ম'রে।
(এখন) তোমার সেবায় রেখে আমারে বাঁচাও।
শুনেছি যা ঋষি হ'তে, প্রিয় তুমি পুত্র হ'তে।
বিত্ত হ'তে, আর আর সকল হ'তে।
তাহা এবার সত্য ক'রে দাও।

(৬২)

মন, শুন সার তত্ত্ব শিব সমাচার।
যাহার প্রসাদে যাবে মোহের আঁধার॥
না করিবে প্রতি পাপ পাপকারী প্রতি।
সাধু আচরণে পাপে পরম সম্প্রতি॥
জানিবে কল্যাণ যাহা তারে না ত্যজিবে।
সদা তাহাতেই তুমি নিযুক্ত থাকিবে॥
সাধু কাজে মন প্রাণ সঁপি' অনুক্ষণ।
হও শান্ত বিগতভীঃ অচঞ্চল মন॥

(৬৩)

ভয়ে অভিভূত হইয়ে সন্তান।
কাঁদিয়ে যখন লয় ভূমে স্থান॥
তখন জননী যদি লন তু'লে।
শিশুরে আদরে নিরাপদ কোলে॥
তখনি তাহার শোক দুঃখ ভয়।
মাতার পরশে হ'য়ে যায় লয়॥
তেমনি জননী, এ শিশু তোমার।
ভয়াকুল হ'য়ে কাঁদে বার বার॥
কোলে যদি কর তুমি হ'তে তু'লে।
সান্ত্বনা পাইব, যাব দুঃখ ভু'লে॥
অভয় পাইয়ে নিরাময় হ'য়ে।
লভিব আরাম তোমার আশ্রয়ে॥

পরলোকগত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় (১)

(শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু কর্ত্তৃক পঠিত।

আজ কয়েক ছত্রে, এই শ্রাদ্ধবাসরে, বহুলোকপরিচিত শ্রদ্ধাভাজন পরলোকগত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়দানে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই স্নেহশীল জীবনের সবিশেষ পরিচয়দানে আমি অক্ষম; কেন না, তিনি যে অকস্মাৎ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহা পূর্ব্বে ভালরূপ বুঝিতে সমর্থ হই নাই; নতুবা সেই পরদুঃখ-কাতর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে

পারিতাম। অনেক সময় মনে হইয়াছিল যে, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া সময়ে ছোট একখানি পুস্তক প্রকাশ করিব,—উহা এই সময়েরই বিশেষ উপযোগী হইত। পরিতাপের বিষয়, তাহার জন্য পূর্ব্বে প্রস্তুত হই নাই। সে দুঃখ করিয়া এখন আর কোন ফল নাই।

প্রায় ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে ২৪ পরগনার অন্তর্গত বোড়াল পল্লীতে কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামধন মুখোপাধ্যায়; কেদারনাথ তাঁহার পিতার অষ্টম সন্তান। ইনি অল্প বয়সেই মাতৃহীন হন। শুনিয়াছিলাম, ইঁহার পিতা ছোট ছোট পুত্র কন্যা লইয়া সযতনে তাহাদিগকে লালন পালন করিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা সুরসিক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার মাতাও স্নেহশীলা ও লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন, বলিয়া শুনিয়াছি। কেদারনাথের ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা পৌরহিত্যের কার্য্য করিতেন। এই মুখোপাধ্যায় পরিবার প্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়দিগের পরিবারে পুরোহিতরূপে অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিতেন। এখানে এ বিষয়ে একটী ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে হইতেছে। যখন স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বৈদ্যনাথ-প্রবাসে অবস্থিতি করেন, তখন পণ্ডিত মহাশয় একবার তথায় গমন করেন। সায়ংকালে উপাসনার সময় কেদার পণ্ডিত মহাশয় বসু মহাশয়কেই ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বলাতে তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিলেন, আর বলিলেন, "তুমি যে আমাদের পুরোহিত-বংশের লোক; এ কার্য্য তোমারই। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার ঐ অনুরোধ রক্ষা করিয়া উপাসনা করিলেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি সুন্দর উপাসনা করিলে।

কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত মহাশয় নামেই সুপরিচিত ছিলেন; অতএব আমরা পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াই তাঁহার জীবনের ঘটনা উল্লেখ করিব। পণ্ডিত মহাশয়ের বাল্যজীবন পল্লীগ্রামেই অতিবাহিত হয়; এবং সেই খানেই তাৎকালিক গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ও বঙ্গবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন; তৎপরে তিনি এই বাল্যজীবনেই এখানকার হেয়ার স্কুলে, (তখন ইহার নাম কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল ছিল) কিছুকাল পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি ক্লাসে মেধাবী ছাত্র বলিয়াই শিক্ষকদিগের প্রশংসা লাভ করিতেন; বাৎসরিক পরীক্ষায় ভালরূপেই উত্তীর্ণ হইতেন, এবং মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার গল্পের ভাণ্ড অনেক হাস্যকর ও আমোদজনক গল্পেই পূর্ণ থাকিত। আমরা প্রায় সকলেই জানি, আমাদের সমাজের পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে ভোজের সময় পণ্ডিত মহাশয় নানাবিধ গল্পের দ্বারা আসর জমাইয়া তুলিতেন—তাঁহার গল্পে ও বলিবার ভঙ্গিতে হাস্যের ফোয়ারা উত্থিত হইত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মাবধি তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করিয়া আমাদিগের মনে আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে যে, তাঁহার পিতা বড় সুরসিক পুরুষ ছিলেন; সন্তানের মধ্যে যে সে গুণ কিছু না কিছু থাকিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বাপের প্রকৃতি সন্তানে, ও অশ্বারোহী সেপাইয়ের চালচলন তাহার ঘোড়ার চালচলনে যে কিছু বর্ত্তিয়া থাকে, এ প্রবাদ-বাক্যের সত্যতা আমরা অনেক সময়েই মানবসমাজে দর্শন করিয়া থাকি।

পণ্ডিত মহাশয় দীর্ঘকাল হেয়ারস্কুলে না পড়িলেও, যে কয়েকখানি বাল্যপাঠ্য ইংরাজী বই পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি সামান্যরূপ ইংরাজী বুঝিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালের অধীত ইংরাজী পাঠ্য পুস্তকের অনেক অংশ তিনি বৃদ্ধ বয়সেও আবৃত্তি করিয়া আমাকে শুনাইয়াছিলেন। বঙ্গ ভাষার উপরও তাঁহার ভালরূপ অধিকার ছিল। আমি লিখিবার সময়, স্থল বিশেষে কোন কোন কথা প্রয়োগ বিষয়ে, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সমীচন উত্তরই লাভ করিয়া সুখী হইতাম। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনেক কবিতা তিনি অনর্গল আবৃত্তি করিতেন, শুনিয়াছি।

পঠদ্দশার পর তিনি সুপ্রসিদ্ধ মাহেশ গ্রামে কোন বঙ্গ-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করেন। এবং উহাও দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা যেন বাল্যকাল হইতেই সূচিত হইয়া থাকে। পণ্ডিত মহাশয় যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন, তখন যজ্ঞোপবীত তাঁহার গলে শোভা পাইত, মস্তকে দীর্ঘশিখা লম্বিত হইয়া থাকিত; এবং চন্দন-লেপিত ললাট প্রভৃতি তাঁহার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি প্রবল অনুরাগেরই পরিচয় দান করিত। নব ভানুর উদয়ের সময় তিনি সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, মন্ত্র উচ্চারণে তাঁহার আরাধ্য দেবতার অর্চ্চনায় অধিকক্ষণ সময় অতিবাহিত করিতেন। মাহেশের এই পণ্ডিত মহাশয় যথার্থই একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ ব্যক্তি যে সে সময়ে ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে একটী বিধর্ম্মী সম্প্রদায় মনে করিয়া তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ প্রকাশ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? তৎকালীন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুগত শিষ্য, উপবীতত্যাগী অঘোরকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তথায় অবস্থিতি করিতেন; পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য ভর্ৎসনা করিতেন, উপহাস করিতেন, এবং তাঁহাকে বিশিষ্ট-রূপ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরোধী জানিয়া বীতরাগ প্রকাশে ত্রুটি করিতেন না।

সে প্রায় ৫০ বৎসরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের কথা। ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহের কিছু পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সমদর্শীদল গঠিত হয়; তখন ঐ দলের লোকেরা স্থানে স্থানে সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, ঐরূপ এক সময়ে কোন স্থানে উপাসনার পর টিকিধারী, ক্যাম্বিসের ব্যাগ হস্তে, একজন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোপাসনার প্রতি প্রবল অনুরাগের কথা শ্রবণ করিলাম। তিনি সজল নয়নে যেন বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মোপাসনা বড়ই মধুর; কেবল তাহাই নহে, তাঁহার মুখ হইতে এইরূপ বাক্যও শুনা যাইতে লাগিল, ব্রাহ্মধর্ম্মই ঠিক ধর্ম্ম, ইত্যাদি। তিনি সে সময় কলিকাতার যে বাসায় থাকিতেন, তাঁহার বাসায় যেন একদিন উপাসনা হয়, উপস্থিত ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে সেইরূপ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন কলিকাতার কোন মেসে থাকিয়া ষ্টাম্প বিক্রয় করিতেন। উল্লিখিত ব্যাগটী সেই জন্যই তাঁহার হস্তে ছিল। ইনিই আমাদের পণ্ডিত মহাশয়। অতি শীঘ্রই পণ্ডিত মহাশয় মস্তকের শিখা কর্ত্তন করিলেন, বহুদিনের গলদেশের যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিলেন। এখন মাহেশের নিষ্ঠাবান হিন্দু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম হইলেন।

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মসমাজ।

নবনবতিতম মাঘোৎসব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে নবনবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ব্যাকুল-প্রাণ নরনারীর সম্মিলনের উপরই উৎসবের সফলতা বিশেষভাবে নির্ভর করে সেজন্য উৎসবে সম্মিলিত হইবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে।

২৯শে পৌষ (১৩ই জানুয়ারী) রবিবার—ব্রাহ্মপরিবার সমূহে এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।

১লা মাঘ (১৪ই জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে ব্রাহ্ম পরিবার সমূহে এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা। সন্ধ্যায়—উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র।

২রা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় বক্তৃতা। বিষয়—'রোগ ও তাহার প্রতিকার'। বক্তা—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বেদান্তবাগীশ।

৩রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) বুধবার প্রাতেউপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। সায়ংকালে ইংরাজীতে বক্তৃতা। সভানেত্রী লেডী অবলা বসু। বক্তৃগণ—মিসেস্ উড হাউজ, মিসেস্ ড্রামণ্ড, মিস্ নেটল্-ফোল্ড প্রভৃতি।

৪ঠা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার প্রাতে উপাসনা আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব। বক্তৃতা—বক্তা পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

৫ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) শুক্রবার প্রাতে উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বেদান্তবাগীশ। সায়ংকালে—তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা। বক্তা—ডাক্তার সাউথওয়ার্থ।

৬ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) শনিবার (মহর্ষির মৃত্যুদিন) প্রাতে উপাসনা আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় বালক-বালিকা সম্মিলন। সায়ংকালে ইংরেজীতে উপাসনা। আচার্য্য ডাক্তার ড্রামণ্ড।

৭ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে ব্রাহ্মযুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় যুবকদিগের আলোচনা। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় বরাহনগর শ্রমজীবিগণের নগর সঙ্কীর্ত্তন। সায়ংকালে শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার।

৮ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) সোমবার প্রাতে উপাসনা—আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। সায়ংকালে ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা। বক্তা ডাক্তার ড্রামণ্ড।

৯ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার প্রাতে মহিলাদিগের উৎসব (ও পুরুষদিগের জন্য সিটি কলেজ গৃহে পৃথক উপাসনা।) সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা। (কেবল সভ্য দিগের জন্য)।

১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) বুধবার প্রাতে কলিকাতা উপাসক-মণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য-শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। অপরাহ্ন ১ ঘটিকায় নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় নগর সঙ্কীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য।

১১ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার **সমস্তদিন-ব্যাপী** উৎসব। প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। অপরাহ্ন ১ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু। অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ডাক্তার ড্রমণ্ড। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা। আচার্য্য ডাক্তার সাউথ ওয়ার্থ। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

১২ মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) শুক্রবার প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সায়ংকালে বক্তৃতা বক্তা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ।

১৩ মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) শনিবার প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভাই সীতারাম। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় মেরী কার্পেন্টার হলে রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসব। সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা—ডাক্তার ল্যাথরফ্।

১৪ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। সায়ংকালে উপাসনা আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস।

মাঘোৎসবের উপাসনাদি—প্রাতঃকালে ৭ ঘটিকায় ও সন্ধ্যাকালে ৬৷৷০টায় আরম্ভ হইবে।

শ্রীব্রজসুন্দর রায়,
সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলন—নিম্নলিখিত প্রণালীতে সিটিকলেজ গৃহে একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৭শে ডিসেম্বর প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত

বেণীমাধব দাস। সায়ংকালে সভাপতিদিগের অভিভাষণ। "জয় যুগ আলোকময়" ইত্যাদি সঙ্গীত গীত হইলে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় একটি প্রার্থনা করিয়া প্রতিনিধিবর্গকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন ও তাঁহার অভিভাষণ নিবেদন করেন। তৎপর ডাক্তার হীরালাল হালদারের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ভি গোবিন্দম্, শ্রীযুক্ত রামস্বামী, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার সাউথওয়ার্থ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি তাঁহার অভিভাষণ জ্ঞাপন করিলে অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়। ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতে উপাসনা, ডাক্তার সাউথওয়ার্থ আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালের অধিবেশনে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় বিক্রমপুর অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পরে কলিকাতায় আসিয়া ২২শে অক্টোবর কটক যাত্রা করেন। সেখানে উৎকল ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে চার রবিবার আচার্য্যের কার্য্য করেন। বকসীবাজার প্রাত্যহিক উপাসনা ক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রভাতে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। একদিন কথকতা করেন ও একটী পারিবারিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। কাঁথি গমন করিয়া একটী বিবাহ অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। তথাকার ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য এবং পারিবারিক উপাসনাদি করেন।

নামকরণ—বিগত ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সেনের কনিষ্ঠ পুত্র ও কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালককে কল্যাণকুমার এবং কন্যাকে জ্যোৎস্না ও কল্যাণী নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পিতা প্রচার বিভাগে ৩৲ ও দাতব্য বিভাগে ৩৲ প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলময় বিধাতা শিশুদিগকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শান্তিবালা ও শ্রীমান নরেশচন্দ্র রায়ের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সরকারের মধ্যমা কন্যা কল্যাণীয়া নীহারিকা ও শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত গুহের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অমিতাভের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালী মতে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ইহার দ্বাশীতিতম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করেন—৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে উৎসবের উদ্বোধন হয়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৬ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত "ধর্ম্মের প্রকৃতি ও বিকৃতি" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। প্রেমই ধর্ম্মের প্রকৃতি এবং ইহার অভাবেই ধর্ম্মের সকল প্রকার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে—ইহাই ছিল বক্তৃতার মর্ম্ম। ৭ই ডিসেম্বর, ২১শে অগ্রহায়ণ (পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন) প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যাকালেও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং উপদেশে বলেন—ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই সেদিনকার উৎসবের প্রধান ভাব; এবং এই কৃতজ্ঞতা জীবমাত্রেরই একটি প্রকৃতিগত বৃত্তি এবং ইহা হইতেই প্রেম ভক্তি প্রভৃতি উচ্চতর মানবীয় বৃত্তিগুলি ফুটিয়া উঠে। ৮ই ডিসেম্বর, ২২শে অগ্রহায়ণ (ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন) প্রাতঃকালে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং উপদেশে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণের, বিশেষভাবে স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের ত্যাগ নিষ্ঠা ও কর্ম্মশীলতার উল্লেখ করিয়া ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের একটি ইতিহাস বর্ণনা করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "পরা সম্পদ্ (ভক্তি)" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৯ই ডিসেম্বর, রবিবার প্রাতঃকালে ইষ্ট্ বেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসন স্থাপনের দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং প্রাচীন ব্রাহ্ম শিক্ষক স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির জীবন অবলম্বনে শিক্ষকজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ঐ দিবস মধ্যাহ্নে "মণ্ডলী গঠন" বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আলোচনা উত্থাপন করেন এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। পাঁচ ঘটিকার সময় মন্দিরপ্রাঙ্গণে কীর্ত্তন হয়; তৎপর উপাসনা; শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং যোগবাশিষ্ট হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া "মুক্তির সাধন" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উৎসবের পরেও কয়েকদিন ঢাকায় থাকিয়া প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কোন কোন স্থলে উপদেশ, প্রার্থনা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন এবং বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইলে এবং ব্রাহ্মসমাজকে একটি ধর্ম্মপরিবাররূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রত্যেক ব্রাহ্মনরনারীর সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা ও অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান একান্ত আবশ্যক, এই সম্বন্ধে সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২৯শে পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ১৯শ সংখ্যা।

১লা মাঘ, সোমবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৯
14th January, 1929.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

হে প্রেমময় উৎসবদেবতা, তোমারই অপার স্নেহের আহ্বানে আমরা আবার তোমার উৎসবদ্বারে উপস্থিত হইলাম। আমরা যে কিরূপ আয়োজন লইয়া আসিয়াছি, তাহা তুমি দেখিতেছ। কত দিন ধরিয়া তুমি নানা ভাবে আমাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছ! তথাপি আমরা যে সম্যক্ প্রকারে প্রস্তুত হইতে পারি নাই, যথোপযুক্ত আকুলতা ও দীনতা লইয়া আসিতে পারি নাই, তাহা তুমি দেখিতেছ। আমাদের আলস্য উদাসীনতা যেন কিছুতেই ঘোচে না, জড়তা ও মৃতভাব কোনও প্রকারেই বিদূরিত হয় না। কি মোহে যে আমরা পড়িয়া আছি, অসার সুখে মজিয়া রহিয়াছি, তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারিতেছি না। তাই তোমার এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমরা নিজেরা বিশেষ কোনও আয়োজন লইয়াই উপস্থিত হইতে পারি নাই। আমরা যে কত দীন হীন মলিন, তাহাও যে সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি, এরূপ বুঝিতেছি না। তোমার উৎসবগৃহে তোমার ভক্ত সন্তানদের যেরূপ স্থান আছে, দীনহীন কাঙ্গালদেরও যে সেরূপ প্রবেশাধিকার আছে, তাহা ত, আমরা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দীন হীনদের প্রতি তোমার অপার দয়া, সম্বলহীনদের তুমি চির সম্বল। আমরা যে সেরূপ দীনতা লইয়াও আসিতে পারি নাই! হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদিগকে সে দীনতা দেও, যাহাতে আমরা কাঙ্গালের বেশেই তোমার উৎসবদ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারি—তুমি যদি দয়া করিয়া ভিতরে ডাক তবে সেখানে প্রবেশ করিব, নতুবা বাহিরেই পড়িয়া থাকিব—তুমি যাহা দেও তাহাই মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিব। আমরা আর কিছু চাহি না, তুমি আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত কর, আমাদের জীবনের গতি ফিরাইয়া দেও। আমরা যেন আর এরূপ মৃতের ন্যায় পড়িয়া না থাকি। আমরা যেন নূতন জীবন লইয়া গৃহে ফিরি। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

খোঁচা লাগা—সংসারের দুর্গম পথে চল্‌তে ক্রমাগত গায়ে খোঁচা লাগে। পথ সঙ্কীর্ণ, নিবিড় জঙ্গল; যেদিকে ফিরবে, সেই দিকেই গায়ে আঘাত লাগে। লোকে বলে সংসারে চল্‌তে হ'লে, কোনও কাজ করতে হ'লে, গণ্ডারের চামড়া চাই; সে চামড়া ভেদ ক'রে গায়ে খোঁচা বিঁধ্‌তে পারে না। কিন্তু এই খোঁচা কি কেবল স'য়েই যেতে হবে? এই খোঁচা কি একটা নিয়তির পরিহাস ব'লেই মেনে নিতে হবে? আমি ত দেখ্‌ছি, এই খোঁচাও প্রেমময়েরই প্রেমের লীলা। যে খোঁচা দেয়, সে আমার আপনারই জন; খোঁচা খেয়েও তাকে ভালবাস্‌তে হবে, হৃদয়ে টেনে নিতে হবে। আবার এই খোঁচার ভিতর দিয়াও প্রভু আমায় আপনার পরিচয় দেন; তিনি তাঁর প্রেমের স্পর্শ গায়ে লাগিয়ে দেন। খোঁচা খেয়ে খেয়েই মানুষের জীবন গ'ড়ে উঠে; খোঁচা খেয়ে খেয়েই মানুষ পরা শান্তির আভাস পায়। খোঁচা খেয়ে খেয়েই মানুষ ভালবাসা শিক্ষা করে। দুঃখ, দৈন্য, উপেক্ষা, অপমান, নির্য্যাতন,—সবই ত প্রেমের বিধান; এই সকল খোঁচার ভিতর দিয়াই তিনি আপনার প্রেম-বাহুর আবেষ্টন অনুভব করান। খোঁচা খেয়েই তাঁকে আপনার ব'লে জান্‌তে পারি। তবে আসুক দৈন্য, আসুক লাঞ্ছনা, আসুক অপমান উপেক্ষা, আমার প্রভুর দেওয়া সকলই আমার মাথার মণি; তাঁর দেওয়া ধূলিরাশিও আমার সুগন্ধ চন্দন-লেপন।

আমার প্রেম সম্পদ—তোমরা দেখ আমার কিছুই নাই; আমার ধন নাই, সম্পদ নাই; আমার আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই; আমার আপনার জন কেহই নাই; আমার মান নাই, পদ নাই; আমি গরীব, সংসারের এক কোণে প'ড়ে আছি; দুঃখে জীবন কাটাচ্ছি। তোমাদের দৃষ্টি এখনও খোলে নাই। তোমরা দেখ্‌তে পাচ্ছ না; আমার বাইরের ধন সম্পত্তি নাই; আমার ঘর নাই, সঙ্গে থাকবার লোক নাই; তা ঠিক। কিন্তু আমার ধন ঐশ্বর্য্য যে কত, আমার আপনার জন যে কত, তা তোমরা দেখ্‌তে পাও না। আমার চিত্ত যে সর্ব্বদা প্রসন্ন, আমি যে এই জগতের সকল ঐশ্বর্য্য, সকল সৌন্দর্য্য সম্ভোগ কচ্ছি! প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ প্রাণে কি আনন্দ ঢেলে দেয়; ফল ফুল, লতা পাতা, পাহাড় সমুদ্র নদী,—অতুল সম্পদ, অপার সৌন্দর্য্য, আমার প্রাণে কি আনন্দের সঞ্চার করে! যে যেখানে আছে, সে-ই যে আমার আপনার; যাকে দেখি, তাকেই যে আমি আপনার ব'লে আলিঙ্গন করতে পারি। তবুও বল্‌বে, আমি দীন হীন কাঙ্গাল? জান, আমার এই ঐশ্বর্য্যের মূল কোথায়? আমার প্রাণে যে তিনি এসেছেন, তিনি দৃষ্টি খু'লে দিয়েছেন; তিনি অতুল শোভার ভাণ্ডার বিস্তার করেছেন; অতুল সম্পদ এনে দিয়েছেন। তোমরা দেখ্‌ছ, আমি দীন, গরীব; আমি অনুভব কচ্ছি, কি সম্পদ আমার, কি আনন্দ আমার, কি সৌন্দর্য্য উপভোগ কচ্ছি আমি!

অমর সঙ্গীত—তোমরা বেদ পড়, বাইবেল পড়, কত শাস্ত্র পাঠ কর; কত তত্ত্ব কথা শিখেছ! তোমরা যখন কথা বল আমার তাক লেগে যায়; আমি ভাবি, এসব কথা ত আমি শিখি নাই; আমি ত এমন ক'রে কথাগুলি সাজিয়ে বল্‌তে পারি না! পণ্ডিতে পণ্ডিতে সমস্যার বিচার হয়; আমি অবাক্ হ'য়ে শুনি; কিছুই বুঝ্‌তে পারি না; নিজেকে এক এক সময় ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু এক এক মুহূর্ত্ত আসে, যখন প্রাণের অন্তস্তল হ'তে কে যেন কথা বলে, কে যেন মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ করে। সেই বাণী যখন পাই, সেই সঙ্গীত যখন শুনি, তখন তোমাদের বই পড়া তত্ত্ব আর ভাল লাগে না। আমার সেই অন্তর-দেবতার বাণী, অমর সঙ্গীত তোমাদের বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ, বাইবেল কোরাণ হ'তে শ্রেষ্ঠ। তার একটি বাণী, সাত রাজার মাণিক হ'তে মূল্যবান্। চাই না, আমি তোমাদের ধার করা বিদ্যা, চাই না আমি বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ। আমার প্রাণের ঠাকুর প্রাণে যে কথা বলেন, তার তুলনা নাই। তিনি প্রাণে ঝঙ্কার দিয়ে যে গান করেন, তাতে আমি মুগ্ধ হই, জগৎ মুগ্ধ হয়। তবে হে প্রাণের দেবতা, তুমিই প্রাণে গান কর, তুমিই প্রাণে বীণা বাজাও; আমি সব ছেড়ে, সেই গান শুনি, সেই বাজনা শুনি।

সম্পাদকীয়।

উৎসব-প্রাঙ্গণে—উৎসবদ্বারে উপস্থিত হইলেই যে সে গৃহে প্রবেশ করা যায়, তাহা নহে। আমরা ত জানি কত সময় আমাদিগকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া শূন্যহৃদয়ে দ্বার হইতেই ফিরিতে হইয়াছে, উৎসবগৃহে আর প্রবেশ করিতে পারা যায় নাই। হয়ত বাহিরের নানা কোলাহলের মধ্যে আমরা মনে করিয়াছি, প্রকৃত উৎসবই সম্ভোগ করিয়াছি, ভিতরেই প্রবেশ করিয়াছি. কিন্তু তাহার পর গৃহে ফিরিয়াই দেখিয়াছি প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় নাই, যেরূপ অবস্থা লইয়া গিয়াছিলাম সেরূপই ফিরিয়াছি; কিছুই লইয়া আসিতে পারি নাই, কিছুই পরিবর্ত্তিত হই নাই। আবার তাঁহার কৃপায় কখন কখন সত্যভাবে উৎসব সম্ভোগে যে সমর্থ না হইয়াছি, একেবারে ভিতরে যে প্রবেশ করিতে না পারিয়াছি—এরূপ কথাও বলিতে পারি না। তাহাতে জীবনে সে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, যে নূতন গতি ও শক্তি লব্ধ হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপেই সে অভিজ্ঞতার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। এতদুভয়ের পার্থক্য বুঝিতে কখনও কাহারও কোন প্রকার ভুল হইতে পারে না।. উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে এই কথাটা বিশেষ ভাবেই স্মরণে রাখিতে হইবে; কারণ, তাহা না হইলে আমাদের আত্মপ্রতারিত হইবার, বাহিরের কোলাহল ও জনতার মধ্যে থাকিয়াই উৎসবগৃহে প্রবেশ করিয়াছি মনে করিয়া তৃপ্ত হইবার, সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই আমাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে আমরা সত্য উৎসবগৃহে প্রবেশ করিয়াছি কি না, অভ্যন্তর দেশে উপস্থিত হইয়াছি কি না, শুধু বাহির হইতেই শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া যাইতেছি কি না। উৎসবে আমাদিকে স্থায়ী মূল্যবান কিছু পাইতে হইবে, সত্য কিছু হইতে হইবে। তাহা না হইলে উৎসব কিছুই হইল না, সবই ব্যর্থ হইল। একটু সাময়িক আনন্দ উচ্ছ্বাস, উৎসাহ উদ্দীপনা লইয়াই যদি আমরা তৃপ্ত থাকি, তবে যে উৎসবে আগমন ব্যর্থই হইবে, তাহা ভুলিয়া গেলে আমরা মহা ক্ষতিগ্রস্তই হইব, উৎসবগৃহে আর প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব না; উৎসবে মূল্যবান কিছু লাভ করিতে পারিব না। খাঁটি মূল্যবান জিনিষ চিনিয়া লইতে না পারিলে সর্ব্বত্রই ঠকিতে হয়, বহুমূল্য মণিমুক্তার পরিবর্ত্তে সামান্য কাচখণ্ড লইয়াই, সার বস্তুর পরিবর্ত্তে অসার বস্তু লইয়াই ফিরিতে হয়; সুতরাং পূর্ব্ব অভিজ্ঞতালব্ধ এই জ্ঞানটা এবং উৎসবের প্রধান লক্ষ্যটা সর্ব্বদাই স্মরণে রাখিতে হইবে। কিন্তু শুধু তাহা হইলেই যে আমরা উৎসবগৃহে প্রবেশ করিতে পারিব, এরূপ কথা কিছুতেই বলা যায় না। প্রেমময়ের উৎসবদ্বার সকলের জন্যই অবারিত সন্দেহ নাই; তথাপি সকলে ত সকল সময় সে গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি যে বাছিয়া বাছিয়া তাঁহার ভক্তসন্তানদিগকেই সে গৃহে প্রবেশ করিতে দেন তাহাও নহে; মলিন পাপী যাহারা তাহারাও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে দেখা যায়। তবে কাহারও পক্ষে উৎসব সফল হয়, আর অপর কাহারও পক্ষে তাহা বিফল হয় কেন? কোনও সময় আমরা সে গৃহে প্রবেশ করিতে পারি, আর অন্য কোনও সময়ে পারি না কেন? ইহার মধ্যে কি তাঁহার বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে? তাহা হইলে কি তাঁহার পক্ষপাতিতা প্রকাশ পায় না? অথচ তাঁহার প্রেমে ও ব্যবস্থাতে যে সেরূপ কোনও ত্রুটি নাই,

তাহা ত আমরা নিশ্চয়রূপেই জানি। তবে এরূপ কেন হয়? একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব যে, এখানে আমাদের ভ্রমপূর্ণ উপমার দোষেই উক্ত প্রকার ভুল ধারণা জন্মে। উৎসবগৃহ বলিতে আমাদের মনে হয় উহা যেন বাহিরের একটা ঘর, উহার দ্বার যেন অর্গলবদ্ধ হইয়া আছে, উৎসব-দেবতা সে অর্গল উন্মুক্ত করিয়া যাহাদিগকে সেখানে প্রবেশ করিতে দেন সেখানে তাহারাই যাইতে পারে, অপর কেহ পারে না। প্রকৃত পক্ষে ইহা যে বিন্দু পরিমাণেও সত্য নহে, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই যে সত্য, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। একটু চিন্তা ও অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব, এই উৎসবগৃহটা সম্পূর্ণ রূপেই আমাদের অন্তরে, আর ইহার দ্বার একমাত্র আমরাই অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখি, প্রেমময় উৎসব-দেবতা সে গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তিনি প্রতি হৃদয়দ্বারেই উপস্থিত—তিনি বাছিয়া বাছিয়া কোনও কোনও বিশেষ ব্যক্তির নিকট, গুণী ভক্তদের নিকটই যে উপস্থিত হন, এমন নহে—যাহার দ্বার উন্মুক্ত আছে, বা যে দ্বার খুলিয়া দেয়, তাঁহার গৃহেই তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, আর যাহার দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, যে দরজা খুলিয়া দিতেছে না তাহার ঘরে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন না, তাঁহাকে দ্বারে অপেক্ষা করিতে হয়। তবে এরূপ রুদ্ধ গৃহে যে তিনি মোটেই প্রবেশ করিতে পারেন না, বা কখনও প্রবেশ করেন না, এরূপ মনে করিলেও মহাভ্রমে পড়িতে হইবে। তিনি আপনার শক্তিতে রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারেন, এবং সময় সময় আপনি আমাদের হৃদয়ের বদ্ধ কবাট ভাঙ্গিয়া অন্তরে প্রবেশও করেন। সকল দেশের ও সকল কালের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস ও আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু তিনি সকল সময় এরূপ বলপ্রয়োগ করেন না,—আমরা স্বাধীনভাবে স্বইচ্ছায় দ্বার খুলিয়া দেই, ইহাই তিনি চাহেন, ইহারই জন্য তিনি দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করেন, এবং আমাদের মধ্যে সেরূপ প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য, আমাদের হৃদয়ের গতিকে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য নানা আয়োজনও তিনি করেন। সুতরাং আমরা যদি নিজে দরজা না খুলিয়া দেই, তবে যে দীর্ঘকাল আমাদিগকে তাঁহার প্রকাশ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে, তিনি দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিলেও আমাদের হৃদয়-গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কাজেই আমাদের দোষেই যখন উৎসব আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন যাহাতে সেরূপ না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ভাবেই প্রস্তুত হইতে হইবে। এই প্রস্তুতির অর্থ যে মোটেই আপনার শক্তির উপর নির্ভর নহে, বরং সম্পূর্ণ রূপে আপনার শক্তিতে নির্ভর পরিত্যাগ করা, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অহঙ্কার ও আত্মনির্ভর যে এপথের পরম পরিপন্থী তাহা আমরা বিশেষ রূপেই অবগত আছি। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও করুণাময়ের করুণার উপর একান্ত নির্ভরই সর্ব্বোপরি আবশ্যক। শুধু আকুল আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুল প্রার্থনা থাকিলেই যে হৃদয়দ্বার যথোপযুক্ত ভাবে উন্মুক্ত হয় তাহা নহে। উহা না হইলে কিছুতেই হয় না সত্য। কিন্তু উহা যথেষ্ট নহে; আর, আকুলতার পরিমাণ বা তীব্রতা যত অধিক হইবে তত সংজে যে আমরা তাঁহাকে পাইব, এরূপ কোনও কথা নাই। বরং এই ব্যাকুলতা অস্থিরতায় পরিণত হইলে প্রতিবন্ধকতাই উৎপাদন করে। ইহার সঙ্গে শান্ত নির্ভরের ভাব থাকা একান্ত আবশ্যক। দীনতা বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ ব্যতীত এই শান্ত নির্ভরের ভাব আসিতে পারে না। যতক্ষণ আপনার উপর নির্ভর থাকে ততক্ষণ আত্মসমর্পণ আসিতে পারে না। আর বিশ্বাস ব্যতীতও আত্মসমর্পণ জাগে না। আবার আত্মসমর্পণ ব্যতীত নির্ভর সম্ভবপর নহে। যদি প্রেমময়ের ইচ্ছা ও ব্যবস্থার উপর আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া না দিতে পারি, তবে তাঁহার উপর নির্ভর রাখিয়া চলিব কি প্রকারে? তাঁহার সকল ব্যবস্থা, বিশেষতঃ আমাদের ইচ্ছা ও অভিরুচির বিরুদ্ধ ব্যবস্থা, গ্রহণ করিব কিরূপে? তাঁহার দ্বারা গঠিত ও চালিতই বা হইব কি করিয়া? সেজন্যই সত্য উৎসব সম্ভোগ করিতে হইলে প্রেমময় উৎসবদেবতার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, অনন্যগতি হইয়া তাঁহার শরণ লইতে হইবে। একমাত্র তাঁহারই করুণার উপর নির্ভর করিতে হইবে, তিনি যাহা দেন বা যেরূপ ব্যবস্থা করেন তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে এবং যে পথে চালাইতে চাহেন সেই পথে চলিতে, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগত জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। অন্য কোনও প্রকারে আমরা প্রকৃত উৎসব সম্ভোগ করিতে পারিব না, উৎসব-গৃহে প্রবেশ করিতে পারিব না। ইহা না হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের দ্বার হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমাদের সেরূপ দুর্ম্মতি যেন না ঘটে। করুণাময় পিতা কৃপা করুন আমরা যেন যথার্থভাবে প্রস্তুত হইয়াই উৎসব-দ্বারে প্রতীক্ষা করি এবং তাঁহার দয়ায় উৎসবগৃহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হই। এই উৎসব যেন আমাদের পক্ষে আর ব্যর্থ না হয়। আমরা যেন ইহা হইতে নূতন বল, নূতন আশা, নূতন জীবন লাভ করিয়া নূতন ভাবে জীবনপথে চলিতে পারি। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারই হইয়া যাইতে পারি। একমাত্র তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হউক।

কয়েকটি প্রার্থনা

(পরলোকগত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ডায়ারী হইতে)

প্রভু, বড় কৃপা করিয়াছ, তোমার ধর্ম্ম দিয়াছ। লৌহকে চুম্বকত্ব দিতে হইবে। কাষ্ঠেতে অগ্নি দিয়াছ, ইন্ধন পুড়িয়া ছাই হউক, অগ্নি জ্বলিতে থাকুক। আমরা পুড়িয়া ছাই হই, তুমি তোমার তেজ আমাদিগের মধ্য হইতে বাহির কর। আজ এই প্রার্থনা, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

হে ভগবান্! তোমার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা মিলিত হউক। আমরা বিকশিত হই। আমরা এক একটি কুঁড়ির মত ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছি, অনন্তকাল লাগিবে ফুটিতে; সেই ফোটানতে যেন বিঘ্ন বাধা না দেই, তাহা হইলেই তোমার ইচ্ছা

পূর্ণ হইবে। একটা একটা পাথর গাড়িয়া কারিকরে সুন্দর মূর্ত্তি প্রস্তুত করে। পাথরের উপর কত আঘাত করিতে হয়! তেমনি তুমি আমাদিগকে গাড়িয়া তোল। আঘাত পাইলে আমরা নিশ্চয় কাঁদিব, কিন্তু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

প্রভু, তুমি সম্মুখে থাক, তোমাকে দেখিয়া বিকশিত হই। সকল অবস্থাতে দেখা, এই ত জীবনের কায। দুর্ব্বলতার সহিত সংগ্রাম করিব। তুমি দুর্ব্বলতা দিয়া সৃজিয়াছ। স্পষ্টই তোমার ইচ্ছা বুঝা যাইতেছে যে সংগ্রাম করিয়া আমাকে জয়ী হইতে হইবে। ভাল মন্দ সকলি সম্মুখে রাখিয়াছ, ভাল ও মন্দতে প্রভেদ করিবার শক্তিও দিয়াছ। যখন ভালকে ভাল বলিয়া জানি, তখন তাহাকে ধরিব, মন্দকে পরিত্যাগ করিব। শক্তি পাইয়াছি, উহা হারাইব না। তবে তোমার দিকে না তাকাইলে যে শক্তি পাই না! তুমি সম্মুখে থাকিলে শক্তি বাড়ে, সংগ্রাম করিতে ভয় পাই না। তুমি সম্মুখে থাক। আর, তোমার কাছে বলিতে কি, সময়ে সময়ে পারি না পারি না বলিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ি। তখন তোমার সহায়তার বড়ই প্রয়োজন হয়। আমি বসিয়া থাকিতে চাই না, আমি চেষ্টা করিব, কিন্তু তুমি সহায়তা কর।

Batteryতে তড়িৎ সঞ্চিত হয়, তাহাকে ছুঁইলেই তড়িতের শক্তি অনুভূত হয়। আমাদের প্রাণে তোমার স্পর্শের শক্তি বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাকে ছুঁইতেছি তাহাকে কই ধর্ম্ম দিতে পারিতেছি না! সংসারের কত কথা বুঝাইতে পারিতেছি, কত কায করিলাম, লোকের কত দুঃখ দূর করিলাম, কিন্তু প্রাণের আসল জিনিষ যে তুমি, তোমাকে কত লোককে দিতে পারিলাম? প্রভু, বুঝিতে পারিতেছি, সে শক্তি প্রাণে তেমন সঞ্চিত হয় নাই। সেই জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করি। প্রভু, সে শক্তি বিনা আর কিছুই চাহি না। দেও, দেও, সেই স্পর্শ দেও, উন্মাদ ক'রে দেও। প্রাণ ভরিয়া দেও।

কোন একটা ভাল জিনিস পেলে আপনার নিজ জনকে দিতে ইচ্ছা করে ও সকলে মিলিয়া ভোগ করিলে আনন্দ হয়। তোমাকে পাইয়াছি, মহাসুখে ভোগ করি, ইচ্ছা করে সকলকে এই আনন্দ দিই, সকলকে তোমার নিকট ডাকি। কিন্তু কই, কাহাকেও আনিতে পারি না। এ ত সংসারের সামগ্রী নয় যে আমি দিলেই তাহারা পাইবে বা তাহারা চাহিলেই তাহারা পাইবে। এ ত তোমার উপর নির্ভর করে। তুমি সকলের কাছে প্রকাশিত হও, তুমি সকলকে আশীর্ব্বাদ কর, তুমি সকলকে আপনার কাছে লও। তুমি আমাকে এই সুখ দেও। যাহারা ভক্ত তাঁহাদের সঙ্গে তোমার আনন্দ ধামে যাই। যাহারা যাইতে পারে না তাহাদের লইয়া যাই।

প্রভু, তোমার সহিত মিশিয়া যাইতে চাই। তুমি জড় জগতে, শরীরের দ্বারা তোমার সহিত মিশিব। মনের দ্বারা তোমার সহিত এক হইব। আত্মাকে তোমাতে ডুবাইয়া রাখিব। অন্তরায় নিজত্ব বুদ্ধি, উহাকে দূর করিয়া দেও। আপনাকে ত্যাগ করিয়া তোমাতে মিশিব। শরীর ভাঙ্গিতেছে ভালই; নিরাকার হইয়া নিরাকারে মিশিব, কেবল ভয়ভাঙ্গা কর। ছেলেরা ভয় পেলে মায়ের কাছে শোয়, মার গায়ে হাত দিয়ে ঘুমায়, সেই মত করিব। তোমাকে স্পর্শ করিয়া এ জগতে ঘুমাইয়া পড়িব।

তুমি প্রাণের মধ্যে এস ও প্রাণের সমস্ত ময়লা পোড়াইয়া দেও। অগ্নি যেমন দাহ করে, সেইমত মলিনতা দাহ কর। অগ্নি করিয়া দেও, অগ্নি হইয়া যাই। তোমার শক্তি পাইয়া যেখানে যে পাপ আছে তাহা দগ্ধ করিতে সক্ষম হই।

ভগবন্, সুখ্যাতি অখ্যাতি বুঝি না, তোমার কায করি। তোমার হইতে চাই। ঘাসের ফুল যেমন তোমার মহিমা প্রচার করে, সেইরূপ ক্ষুদ্র আমি, তোমার মহিমা প্রচার করিতে চাই।

প্রাপ্ত

উৎসব-দ্বারে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আসে, যায়, ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনেও কত শত পরিবর্ত্তন হোয়ে যায়! সূর্য্য প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে উঠে, নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে অস্তও যায়—বাগানের ফুলগাছের কুঁড়িগুলিও কতবার ফুটে ঝরে পড়ে যায়; কিন্তু একদিন হয়ত মনটা সজাগ হোয়ে উঠে, এই সূর্য্যের উদয় ও অস্তের পানে এমন কোরে চেয়ে থাকে যেন এটা কী একটা নতুন জিনিস! কী সুন্দর ঐ উষার কপালে লাল সিঁদুরের ফোঁটাটীর মতন তরুণ সূর্য্যের লালিমা! আবার বেলাশেষে পশ্চিমের আকাশ রামধনুর রঙ্গে রাঙিয়ে, গোধূলির সোনালী আলোর মুকুট সবুজ গাছের মাথায় পরিয়ে, কী বিরাট ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে সূর্য্যের বিদায় নেওয়া! আর ঐ সুন্দর গোলাপের কুঁড়িটাই বা কেমন কোরে প্রতিদিন দুর্গন্ধময় মাটী হইতে রস গ্রহণ কোরে নিজের দেহটীকে সুপুষ্ট কোরে ধীরে ধীরে আপনার কোমল পাপড়িগুলি প্রসারিত কোরে সুরভি একটী গোলাপে পরিণত হোচ্ছে! বিচিত্রকলানিপুণ বিধাতা-পুরুষের সৃষ্টিকৌশল এম্নি কোরে দেখলে কত দিক্ দিয়ে দেখা যায় এবং বিস্ময়ে মন আপ্লুত হয়, আর এই বিস্ময় থেকেই কত জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা এবং সাধনা!

আমাদের এই মাঘোৎসব কতবার আসে যায়, একটা ক্ষণিক উন্মাদনায় প্রাণ মেতে উঠে। কত প্রশ্ন, কত চিন্তা এই কয়দিন মনে জাগে, আবার বাইরের সাজসজ্জা, ফুলের মালা, পাতার মুকুটের মতন উৎসবের শেষেই শুকিয়ে যায়।

অতি শিশুকাল থেকে কল্‌কাতার মাঘোৎসবে উপস্থিত থেকে বছরের পর বছর এই আনন্দের আয়োজনে মেতেছি। যখন আমোদ ছাড়া আর কিছু বুঝিনি, তখন একটী প্রশ্ন মনে জাগ্‌ত।

আবার যখন উৎসবের আধ্যাত্মিক গৌরব কিছু অনুভব কোরতে পেরেছি, তখনো সেই একই প্রশ্ন মনকে নাড়া চাড়া দিয়েছে। আর আজ ভারতবর্ষের বাইরে, বঙ্গোপসাগর পার হোয়ে, ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মবন্ধু বিবর্জ্জিত স্থানে এসে ব'সেও, প্রতি বছর উৎসবের সময় সেই অতি পুরাণো প্রশ্নই মনের দ্বারে আঘাত কোরছে। তাই আজ আর চুপ কোরে থাকতে পারছি না। তখন ছিলাম দায়িত্বজ্ঞানহীনা বালিকা—এখন সন্তানের জননী, গৃহের কর্ত্রী। আমার এ প্রশ্ন বা চিন্তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু না থাকতেও পারে। তবু শিশু যেমন তার সব চিন্তা, সব প্রশ্নই মা, বাবা, গুরুজনের কাছে অসঙ্কোচে প্রকাশ করে, তেম্নি আমিও আমার ধর্ম্মসমাজের পিতা মাতা এবং বন্ধুদের নিকট আমার মনের এই প্রশ্নটা উপস্থিত করছি।

মাঘোৎসবের প্রোগ্রামের মধ্যে প্রথম দুই বা তিন দিন পারিবারিক উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোরে দেওয়া হয়। তারপর থেকে উৎসবের শেষ দিন পর্য্যন্ত মন্দিরে দুই বেলা, কোনো কোনো দিন তিন বেলাও কিছু না কিছু কাজ নির্দ্দিষ্ট থাকে। যাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় তাঁরা মন্দিরের সকল কাজেই যোগ দেন এবং দিতে পারলেই লাভ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমাদের ছেলে মেয়েরা এই উৎসবের কি কিছু বোঝে? তারা সারাদিন মন্দিরের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়, যথেষ্ট বন্ধুবান্ধব পেয়ে খেলা ধূলো করে—অনেক সময় মন্দিরের কাজে ব্যাঘাতও করে। তারা উৎসব মানে বোঝে এই—সেজেগুজে মায়ের সঙ্গে গাড়ী চড়ে মন্দিরে আসা আর সারাদিন হৈ চৈ করা। আর যে সব ছেলেমেয়েদের মায়েরা বাড়ীতে রেখে মন্দিরে আসেন, তারা এক বালক বালিকা উৎসবের দিন ছাড়া আর কোনো উৎসবের আনন্দ অনুভব করবার সুযোগই পায় না। উৎসব জিনিসটা কি শুধু সামাজিক? প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব জিনিস নয়? উৎসবটাকে এমন একটা কোনো রূপ দেওয়া যায় না কি, যাতে পরিবারের প্রত্যেকটী শিশু পর্য্যন্ত অনুভব করে যে, এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার?

ছোট বেলায় দেখতাম—অনেক বাড়ী পাতা, ফুল, রঙ্গিন কাগজ, বাতি, লণ্ঠন প্রভৃতি দিয়ে সাজানোর একটা ধুম পড়ে যেতো। বাড়ীর অলি, গলি, কোণ কানাচের যত জঞ্জাল সব পরিষ্কার করা হোতো, কোনো কোনো বাড়ী চুণকাম করা, রং দেওয়াও হোতো। বাড়ীর সবাই নতুন কাপড় পরত, দাস-দাসীরাও নতুন কাপড় পেতো। তখন যেন একটু অনুভব করতাম যে, বছরের এই দিন আমাদের একটা বিশেষ পাওয়া এবং দেওয়ার দিন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন চারদিকে একটা অকাল বার্দ্ধক্য দেখা দিল। বাড়ী সাজানো, নতুন কাপড় পরা, এ সব যেন নিতান্তই একটা লোক-দেখানো ব্যাপার—এ গুলোর যেন কোনো সার্থকতা নেই, এ গুলো শুধুই খোলস, এর কোনো প্রয়োজন নেই, এই ভাবই এসে পড়ল। ফলে পরিবারের শিশু এবং বালক বালিকারা উৎসবের কোনো উৎসাহই প্রাণে অনুভব করে না। এই গুলি যে বাইরের আড়ম্বর, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্দর মহলে প্রবেশ কোরতে হোলে বৈঠকখানা বাড়ী পার হোয়েই কি যেতে হয় না? নিয়ম, নিষ্ঠার ভেতর দিয়েই তো সাধন-জগতে এগোতে হয়।

যখন দেখি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুঘরের বালক-বালিকা প্রতিদিন ভোরে একটী সাজি হাতে বাগানে বাগানে ২।৪টী ফুল সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে—কত সময় গৃহস্থের কাছে কাতর ভাবে দুটী বেলপাতা, দুটো জবাফুলের জন্যে ভিক্ষে চাইছে; "কি কোরবে" জিজ্ঞেস কোরলে বলছে "মা, কিংবা বাবার পুজোর জন্যে চাই"—তখন আমার মনটা বোলে উঠে "কই আমাদের ছেলে-মেয়েরা তো ভোরের বেলা এম্নি কোরে আমাদের উপাসনার জন্য কোনো আয়োজনে ব্যস্ত হয় না?"

প্রতিদিনই পরিবারে এমন কিছু পুজোর ব্যবস্থা থাকা দরকার, যাতে আমাদের সন্তানেরা সেইটী দেখবার বা আয়োজনে সাহায্য করবারও সুযোগ পায়। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত মহাশয়ের "পরিবারে ধর্ম্মসাধন" শীর্ষক চিন্তাশীল প্রবন্ধে তিনি অনেক আলোচনা কোরেছেন। এ স্থলে আর বিশেষ আলোচনা কোরতে চাই না।

প্রাচীন হিন্দুসমাজে বারমাসে তের পার্ব্বণের ব্যবস্থা আছে। নিষ্ঠাবান পরিবারে ব্রত, পুজো প্রভৃতির নানা আয়োজনে ছেলে মেয়েরা ধর্ম্মশিক্ষার সুযোগ পায়, অন্ততঃ পক্ষে ধর্ম্মপালনে নিষ্ঠা জন্মে। আধুনিক ধর্ম্মবিহীন হিন্দু-পরিবারে যেমন সারা বছর পুজো অর্চ্চনার কোনো বালাই নেই, কেবল বৎসরান্তে দুর্গোৎসব উপলক্ষে জাঁকজমক, পোষাক, থিয়েটার, বায়স্কোপ, খাওয়া-দাওয়ার, নাচ-গানের আয়োজনেই ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, আমাদের ব্রাহ্ম-পরিবারেও কি কতকটা সেই রকম হীন আদর্শ দেখি না? অবিশ্যি আমাদের উৎসবের আয়োজনের ত্রুটি আমি বলছি না, মন্দিরের উৎসবে যে টুকু আয়োজন দরকার, যে টুকু গাম্ভীর্য্য দরকার, তার কোনো অভাব নেই। আমার মনে হয়—প্রত্যেক পরিবারে এই মহোৎসবটী এমন ভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত, যাতে পরিবারের প্রত্যেকটী সভ্য যেন অনুভব করে, এটা তার জীবনের একটি বিশেষ দিন। উৎসবের কয়েকদিন প্রতিদিনই এমন একটী সময় থাকা প্রয়োজন যে সময় পরিবারের সকলে মিলে ভগবানের চরণে বিশেষ ভাবে বসবেন এবং ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত আলোচনা এমন সরল ভাবে করা হবে, যা বালক বালিকারা বোঝে। এই উৎসবের সময় পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের কোনো কোনো দিন পারিবারিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করা এবং সাধ্যানুযায়ী তাঁহাদের একত্র লইয়া প্রীতিভোজন করা, সম্ভব হইলে চেষ্টা করা উচিত।

আমাদের দেশী আচার প্রচলিত ছিল, বিশেষ কোনো পর্ব্বের দিনে বাড়ীতে যে কোনো অতিথি আসবে, তাকেই একটু মিষ্টিমুখ করাতে হবে। এই নিয়ম উৎসবের সময়ও থাকলে ভাল হয়। ইহাতে পরস্পরে আত্মীয়তাবৃদ্ধির সহায়তা করে। অতিরিক্ত ব্যয় না কোরলেও সামান্য আয়োজনেও মানুষকে তৃপ্তি দেওয়া যায়। উৎসবের আনন্দের দিনে দুখানা বাতাসা এনে বন্ধুর মুখে তুলে দিলেও কি প্রাণে একটা বিমল সুখ পাওয়া যায় না?

উৎসবের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য এক মাস আগে থেকে উষা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে—এই উষা-কীর্ত্তনে যোগ দেবার জন্য ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন এবং নিজেদেরও যথাসাধ্য যোগ দেওয়া দরকার।

অন্তর্দেবতার পূজোর জন্যে যেমন অন্তর-ক্ষেত্র নির্ম্মল করার প্রয়োজন, উদ্বোধনের প্রয়োজন, তেম্নি বাইরের আয়োজনেরও প্রয়োজনীয়তা কিছু কম আছে বোলে মনে হয় না। সারা বছরের পাপ, তাপ, মলিনতা যেমন চোখের জলে ধুয়ে তাঁর চরণে দাঁড়াতে হয়—তেম্নি সারা বছরের সঞ্চিত আবর্জ্জনা, বিশৃঙ্খলা সংসারের যে কোনো কোণে আছে, তাও সন্ধান কোরে ধুয়ে মুছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোরে, ফুলপাতা দিয়ে, সুন্দর কোরে সাজিয়ে প্রত্যেকটী গৃহ ভগবানের পূজোর বেদীর যোগ্য শুভ্র, পবিত্র ও সুগন্ধময় কোরে উৎসবদেবতার প্রতীক্ষা করা চাই। বাইরের শুচিতাও অন্তরকে পবিত্র কোরে তোলে। এইজন্য ধূপ, ধুনো, চন্দন, ফুল, মালা, আসন, নতুন কাপড় সবই প্রয়োজন আছে—এইগুলিই অন্দরের পথে এগিয়ে দেয়।

উন্নত সাধকের পক্ষে এ গুলি অন্তরায় মনে হোতেও পারে; কিন্তু প্রথম সাধনার্থীর পক্ষে এ গুলির খুবই প্রয়োজন আছে মনে হয়। আমাদের বালক বালিকারা, অনেক যুবক যুবতীরাও, উৎসবের কোনো মাহাত্ম্য অন্তরে অনুভবই করে না, তার কারণ আমার মনে হয়, উৎসবের সময় শুধু মন্দিরের সামাজিক উপাসনা বা বক্তৃতা ছাড়া অন্য কোনো বিশেষত্ব পারিবারিক জীবনে দেখতে পায় না। সমাজের উপাসনা বা বক্তৃতা বোঝবার মতন যোগ্যতা অতি কম ছেলেমেয়েরই হয়; যদি সেই সময় পরিবারে প্রতিদিন কিছু অনুষ্ঠান হয়, যার ভেতর দিয়ে তারা ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ইতিহাস, ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব, ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণের জীবনের ত্যাগের কাহিনী, এ সব সহজ সরল ভাষায় অল্পে অল্পে শোনে এবং উপলব্ধি করে, তবেই ভবিষ্যতে তাদের সামাজিক সকল কাজে মনোযোগী এবং উৎসাহী হবার সম্ভাবনা থাকে। মাঘোৎসবের উৎসবটা বেশীর ভাগ সামাজিক না হোয়ে যদি পারিবারিক উৎসব মনে কোরে, প্রত্যেক পরিবারের জনক-জননী বিশেষ ভাবে চিন্তা কোরে, এমন একটী প্রোগ্রাম করেন, যাতে শিশু হোতে যুবক পর্য্যন্ত সকলেই ইহার আয়োজনে আনন্দ এবং উৎসাহ পায়, নিষ্ঠার সহিত প্রতি বছর এই পারিবারিক উৎসব সম্পন্ন কোরতে পারে, তবেই ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনা এবং বক্তৃতা প্রভৃতির প্রতি স্থায়ীভাবে আকর্ষণ জন্মাবার সম্ভাবনা। নতুবা বছরের পর বছর উৎসব আসবে, যাবে, ব্রাহ্মসমাজের তরুণ জীবনে তার কোনো ছাপ রেখে যেতে পারবে না। এটা কেবল একটা সাময়িক উত্তেজনা, উন্মাদনার বিষয় হোয়ে থাকবে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি এই অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব কোরেছি। এখন সামাজিক উপাসনা বা উৎসবে যোগ দেবার সুযোগ একেবারেই হয় না, অথচ দেখছি পারিবারিক জীবনে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়নি। সন্তানের জননী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ববোধ জাগছে, ভাবছি কি কোরে ব্রহ্মোৎসবের এই বিরাট আয়োজনের স্থান এই ছোট্ট পরিবারে কোরব? আমার ছেলে মেয়েরা তো ব্রহ্মমন্দিরের ভক্ত সাধকের প্রমত্ত কীর্ত্তনের ধ্বনিও শুনবে না, বিশ্বাসী আচার্য্যের প্রাণের আবেগভরা ভাষাও শুনবে না, ব্যাকুলাত্মার নয়নাশ্রুও দেখবে না। তবে কি দিয়ে তাদের সে অভাব পূর্ণ কোরব?

আমাদের মতন এম্নি আরও কত ব্রাহ্মপরিবার আছেন, যারা হয়ত ঠিক আমাদেরই মতন অভাব বোধ কোরছেন। ব্রাহ্মসমাজের নিকটে থেকেও কত রকম অসুবিধার জন্য কত ব্রাহ্মপরিবার মন্দিরের উৎসবে যোগ দিতে পারছেন না। তাঁদের জন্যে কি তবে উৎসবের কোনো আহ্বান, কোনো দান, কোনো আশীর্ব্বাদই নেই?

আমার এ প্রশ্নের মীমাংসা অন্তর থেকে এই পেয়েছি যে,—"এই মহোৎসবকে পারিবারিক উৎসব বোলে গ্রহণ কর"। যাঁরা সামাজিক উৎসবের আয়োজনে যোগ দিতে পারছেন, তাঁরাও পরিবারে যদি আরও প্রসারিত কোরে ইহার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তবে নিশ্চয়ই আরও সুন্দর, আরও সার্থক, আরও পূর্ণরূপে ইহার ফল পাবেন এবং সন্তানেরাও আর ধর্ম্মানুষ্ঠানে এত উদাসীন থাকতে পারে না।

শ্রদ্ধার সহিত বিনীত ভাবে সমাজের শীর্ষস্থানীয়দিগের নিকট এবং বন্ধুবর্গের কাছেও আমার চিন্তার সহায়তা প্রার্থনা করছি।

শ্রীশান্তিময়ী দেবী।

পরলোকগত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় (২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রায় সেই সময়ে যখন কেশবচন্দ্র সেনের অপরিণতবয়স্কা কন্যার কুচবিহারের অপরিণতবয়স্ক যুবরাজের সহিত বিবাহ স্থিরীকৃত হয়, তখন যাহারা উহার প্রতিবাদ করিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, কেদার পণ্ডিত মহাশয় সেই প্রতিবাদ-কারীদিগের মধ্যে বিশিষ্টরূপেই কার্য্য করেন। সে সময়ে তাঁহার যে উৎসাহ আমি দর্শন করিয়াছি, তাহা লেখনীতে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। ধর্ম্মবীর ঈশ্বরানুরাগী শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় স্বার্থত্যাগের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অপূর্ব্ব অনুরাগের যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। নূতন ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মুখে সেই সময়ে পণ্ডিত শাস্ত্রীর মহৎ জীবনের আদর্শ আসিয়া দেখা দিল; তাঁহার জীবন আরো উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিল, শিবনাথের জীবনের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জন্মিল; এবং ব্রাহ্মসমাজের এই নেতাকে তিনি আদর্শ পুরুষরূপেই ধরিলেন। আমি জানি শিবনাথ শাস্ত্রীর যথার্থ অনুগত শিষ্য যদি সেই সময়ে কেহ হইয়া থাকেন, তবে আমাদের পণ্ডিত মহাশয় তন্মধ্যে অন্যতম। শিবনাথের নিন্দা ও তাঁহার মতবিরুদ্ধ কথা কেহ কিছু বলিলে, তাঁহার পক্ষে তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিত, তিনি ক্ষেপিয়া উঠিতেন। এই প্রসঙ্গেই বলি, যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইল, তখন উহার উন্নতিকল্পে তিনি বিবিধ প্রকারে আপনার শক্তি ব্যয়

করিয়া, আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিতেন। সমাজের সভ্য বৃদ্ধি করিতে, ছাত্রসমাজের ও সমাজের উদ্যান-সম্মিলন প্রভৃতি কার্য্যে পণ্ডিত মহাশয়ের হস্ত নিয়তই কার্য্য করিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসার কথা সততই তাঁহার মুখে শুনা যাইত; বহুদিন পর্য্যন্ত এই ব্রাহ্মণ-সন্তান উহার সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন। সমাজের বাল্যাবস্থায়, ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়দিগের প্রচারার্থ বিদেশ ভ্রমনের সময়ে, তিনি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের সহিত বিচরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ ভ্রমণের সময় তিনি ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভগবদ্-বিশ্বাস ও পণ্ডিত শাস্ত্রীর ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধবাদীদিগের সহিত বিচারে জয়লাভের বিষয় আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণে একজনের ভক্তি ও অপরের জ্ঞানশক্তির পরিচয় পাইতাম।

১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটস্থ পূর্ব্বতন ভারত-আশ্রম ভবনে যখন সিটিস্কুল সংস্থাপিত হয়, তখন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নৈশ-বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। দেশপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ে অনেক শ্রমজীবী শিক্ষার জন্য আগমন করিত। সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং একবার সায়ংকালে এই বিদ্যালয় দর্শনার্থ আগমন করিয়া ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যকুমার আগস্তি ও পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতেন। এখানে সত্যের অনুরোধে বলা কর্ত্তব্য, পণ্ডিত মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ হইয়াই কার্য্য করিতেন। উহা যে অনেকদিন চলিয়াছিল, সে কেবল আমাদের স্বর্গগত পণ্ডিত মহাশয়েরই যত্ন ও চেষ্টার ফলে। ১৩নং সিটিস্কুলের বাড়ী তখন আমাদের অনেকেরই বসিবার, বিবিধ বিষয় আলোচনা করিবার ও শয়নের স্থান ছিল; পণ্ডিত মহাশয় ও আমরা অনেকেই তখন ঐ স্থানে শয়ন করিতাম; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমাতে ও তাঁহাতে বেঞ্চি ধরাধরি করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিতাম; এই নগ্ন বেঞ্চোপরি শাস্ত্রী মহাশয় গাত্রের উড়ানী পুঁটুলির ন্যায় করিয়া বালিশরূপে ব্যবহার করিতেন। পণ্ডিত মহাশয় সেই সময় Blair's Sermons ও Thomas A Kempis এর Imitation of Christ সর্ব্বদাই পাঠ করিতেন। Blair's Sermons নামক পুস্তকখানি বেশ বড় বই। সময়ে সময়ে ঐ পুস্তকখানি তাঁহার উপাধানের কার্য্য করিত; এবং অন্যখানি তাঁহার যেন অতি স্নেহের সামগ্রীস্বরূপ তাঁহার বক্ষোপরি স্থান পাইত। ঐ দুই-খানি বই তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং উহাদের প্রশংসায় তাঁহার রসনা বড়ই তৃপ্তিবোধ করিত দেখিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের সংকীর্ণ সীমা তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মত এখন তাঁহাকে সকল ধর্ম্মের সার সত্য গ্রহণে উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের সময়, তাঁহার কেবল যে কার্য্যোৎসাহেরই পরিচয় পাইয়াছি, তাহা নহে, তাঁহার ভগবন্নিষ্ঠার পরিচয়েরও আমরা যথেষ্ট সাক্ষ্য পাইয়াছি।

পণ্ডিত মহাশয় একজন হৃদয়বান লোক ছিলেন। এই কয়েকটী কথাতেই যে তাঁহার হৃদয়ের সব পরিচয় দিতে সমর্থ হইলাম তাহা নহে। পরের উপকার সাধনই তিনি এক মহাব্রত বলিয়া মনে করিয়া, সাধ্যানুসারে সেই ব্রত উদ্‌যাপনে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনাকে ব্রতী করিয়া রাখিয়াছিলেন। পর-দুঃখকাতরতায় তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত; লোকের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত; নয়ন হইতে জলধারা বহিতে থাকিত। তিনি বহু দরিদ্র বালকের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; অনেক নিরাশ্রয় পরিবারের আশ্রয়দাতা-স্বরূপ হইয়া অন্ন বস্ত্রের অভাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে আপনার শক্তি নিয়োগে বিরতি প্রকাশ করেন নাই। এ সকলের জন্য তাঁহাকে দানশীল ধনী ব্যক্তিদিগের নিকট নিয়তই গমন করিতে হইত; অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের অভাবের কথা বলিতে হইত। এইরূপ ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া, তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহারই এই সাহায্যের গুণে ঐ সকল ছাত্রের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। তাঁহার এই মহৎ ব্রতের জন্য তাঁহাকে বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী হইতে হইত; এজন্য তাঁহাদেরও উদার অন্তঃকরণের কথা অনেক সময় তাঁহার নিকট শুনিতে পাইতাম। একবার একটী বালকের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় ফির প্রয়োজন হয়; ছেলেটীর ঐ অর্থ প্রদানের আদৌ ক্ষমতা ছিল না। সে পণ্ডিত মহাশয়কে আসিয়া ধরিল; ছাত্রের এই অভাবের কথা শুনিয়া হৃদয়বান পণ্ডিত মহাশয় কি আর ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? তিনি ঠাকুর বাড়ী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গিয়া পরীক্ষার্থী অভাবগ্রস্ত ছাত্রের কথা উল্লেখ করিলেন। সহৃদয় দ্বিজেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত মহাশয়ের ঐ কথা শুনিয়াই তাঁহাদের কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া, তাঁহার হিসাবে, প্রার্থিত টাকাটি প্রদান করিতে বলিলেন। কর্ম্মচারী বলিলেন, যে তাঁহার হিসাবে অতিরিক্ত টাকাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়াই দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিয়া উঠিলেন, "তা যদি হয়, তবে আমার ছেলের দুধ বন্ধ করিয়া দাও; এবং তাঁহার মূল্য-স্বরূপ টাকা আমায় দাও; একজন পরীক্ষার্থীর ফিটা এখন আমি দিয়া দি।" দ্বিজেন্দ্রনাথের এই কথাতে তাঁহার সহৃদয়তারই পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কর্ম্মচারী এই কথা শুনিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ টাকা আনিয়া দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রার্থিত টাকা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি সজল নয়নেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ দয়ার কথা আমার নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। অধিক দিনের কথা নয়, ভবানীপুরস্থ কোন ভদ্র পরিবার অর্থাভাবে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। পণ্ডিত মহাশয় চারিদিক হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, তাঁহাদিগের অভাবমোচনে বিশেষ-যত্নশীল হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণে তাঁহারা অর্থ কষ্ট হইতে বিশেষরূপে মুক্তিলাভ করেন। যখন মঙ্গলবার প্রাতে পণ্ডিত মহাশয়ের মৃতদেহ নিমে লইয়া যাওয়া হয়, তখন অন্যান্য লোকের মধ্যে আচার্য্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও মৃত ব্যক্তির উপর সম্মানপ্রদর্শনের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। আমি সতীশচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলে,

তিনি ঐ উল্লিখিত ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্ম-পরিবারটীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন 'পণ্ডিত মহাশয় ত চলিয়া গেলেন, এখন ও পরিবারটীর দশা কি হইবে? পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার পরলোকগমনের কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ঐ পরিবারের অভিভাবকরূপে তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই দরিদ্রের মা বাপ ছিলেন।"

আমার কোন ভ্রাতুষ্পুত্রী পণ্ডিত মহাশয়ের শয়নের আরামের জন্ত তোষক, বালিশ, মশারি, প্রভৃতি প্রদান করেন। ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি সকলই নূতন। কিছুদিন পরে দেখা গেল পণ্ডিত-মহাশয়ের সে বালিস, বিছানা, মশারি কিছুই নাই, তিনি পূর্ব্বের স্থায়ই তাঁহার ছেড়া মাছুরে ও তোষকের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন, "কোন দরিদ্র পরিবারের শয়নের কষ্ট দেখিয়া, সেগুলি তাহাদিগকে দিয়া আসিয়াছি"। এ কি সামান্ত হৃদয়ের পরিচয়! পণ্ডিত মহাশয়ের জীবনের এমন অনেক ঘটনা আছে: কিন্তু সে সকলের এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে।

কলিকাতার বাহিরের কোন ব্রাহ্ম বিধবা এক সময়ে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে মাসিক কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমাকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কয়েকছত্র এখানে উল্লেখ করিতেছি;—"পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া গেলেন, তাঁহার সময় হইয়াছে বলিয়া গেলেন। তাঁহার মত পরোপকারী ব্যক্তি খুব কমই আছে। অর্থ থাকিলে অনেকেই সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ত অর্থ ছিল না, তবুও কত লোককে যে তিনি সাহায্য করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা যায় না। ভগবান তাঁহাকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে নিশ্চয়ই স্থান দিয়াছেন।"

এখন এই পরিবারে তিনি যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষেপে সে বিষয়ের কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মের সময় হইতেই তিনি এই পরিবারে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, পরম আত্মীয়েরই স্থায় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের পিতৃদেব রোগ-শয্যায় শায়িত, তখন হইতেই তিনি পরম বন্ধুরূপে আমাদের হিতকল্পে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, পরলোকগমনের পূর্ব্বে পিতৃদেব তাঁহাকে আমাদের দেখিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া যান। পিতা পরলোক গমন করিলে, আমরা আমাদের জননীকে লইয়া ঘোর অর্থকষ্টের মধ্যে নিপতিত হইলাম। সেই দারুণ সময়ে পণ্ডিত মহাশয়ই আমাদিগকে অন্নবস্ত্রের দারুণ কষ্ট হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বিধিমতে যত্নশীল হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নের সময় আহারের বিশেষ ব্যবস্থা নাই, মা উনুন ধরাইতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে পণ্ডিত মহাশয় কোথা হইতে অর্থ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। এখানে একটী বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। পিতৃদেবের পরলোকগমনের পর আমরা দুই ভ্রাতা ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করি, সেজন্ত আমাদের হিন্দুসমাজের আত্মীয়েরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলেই হয়; তাঁহাদিগের সকল প্রকার সাহায্য হইতে সেই বিপন্ন অবস্থায় আমরা একপ্রকার বঞ্চিত হইয়াছিলাম। সেই অবস্থায় পণ্ডিত মহাশয়ই আমাদের প্রকৃত বন্ধুর স্থায় কার্য্য করিয়াছিলেন। আমার স্মরণ আছে, একদিন আমাদের ঘরে উপযুক্ত আহার্য্য বস্তু ছিল না; পণ্ডিত মহাশয় বাহির হইলেন। তৎপর ফিরিয়া আসিলে রন্ধনের আয়োজন হইল। সেদিনকার ঘটনা সম্বন্ধে তিনি এইরূপ আমাকে বলিয়াছিলেন—"তোমাদের জন্ত কোন স্থানে গিয়া প্রার্থী হইয়া যখন কিছু পাইলাম না, তখন আমার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল; ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম, 'প্রভো, আজ কি এই পরিবার অনাহারে থাকিবে?' তৎপর অন্ত একস্থান হইতে, সাহায্য পাইলাম।" তখন হইতেই তিনি আমাদের হইয়া গেলেন; আমরাও তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। মা রন্ধন করিতেন, তিনি আমাদের সঙ্গেই এক পরিবারস্থ লোকের স্থায় আহার করিতেন; এবং পরমাত্মীয়ের স্থায় আমাদের সঙ্গেই বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদেরই হইয়া ছিলেন, আমরাও আপনার লোকের স্থায় তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় হস্ত প্রসারণ করিতে সঙ্কুচিত হই নাই।

তিনি যে কত প্রকারে এই পরিবারের উপকার করিয়া গিয়াছেন, সামান্ত কয়েক ছত্রে তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই পরিবারের ছোট বড় সকলের প্রতিই তাঁহার স্নেহ ধাবিত হইত; কিন্তু তাহা হইলেও, মানব হৃদয়ের স্নেহ ও ভালবাসা স্থলবিশেষ অধিকার করিয়া থাকে। উহার উপর কোন হাত নাই। উহা মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি। এই পরিবারে আমার ভ্রাতা অধরচন্দ্রের তৃতীয়া কন্তা মাধুরিকা নাম্নী কন্তাটীর প্রতি পণ্ডিত মহাশয়ের স্নেহ বিশেষরূপেই নিবদ্ধ হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। পণ্ডিত মহাশয় রোগ-শয্যায় শায়িত হইলে, মাধুরিকা অধরচন্দ্রের টেলিগ্রাফ পাইয়া ছুটিয়া আসিল; এবং অর্থ ও শরীরের শক্তি নিয়োগে, পিতৃ-সদৃশ পণ্ডিত মহাশয়ের অকৃত্রিম স্নেহের ঋণ পরিশোধে যত্নবতী হইল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে নিবারণ করিবে? সকল যত্ন ও চেষ্টার মধ্যেও তিনি আমাদের সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক যাত্রা করিলেন। আমার ভ্রাতৃজায়া ইন্দুমতী পীড়িত হইয়া যখন গিরিধি গমন করেন, তখন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার যেরূপ সেবা করিয়াছিলেন, অনেক পুত্র কন্তাও জননীর সেরূপ সেবা করিতে সমর্থ হন না। ইন্দুমতী তাঁহার ক্রোড়স্থ একটী ছোট কন্তা রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। পণ্ডিত মহাশয় এই ছোট মেয়েটীকে ঐ সময় হইতে বড়ই স্নেহ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই আমার নিকট বলিতেন, আমি বাল্যকালে মাতৃহীন হইয়াছি; এইজন্ত এই মাতৃহীনা কন্তাকে বড়ই ভালবাসি। এই মেয়েটীর প্রতি তাঁহার স্নেহের অনেক নিদর্শন পাইয়াছি।

রক্তের সম্বন্ধ না থাকিলেও মানুষ যে ভালবাসার গুণে কিরূপে অপরকে আপনার করিতে সমর্থ হয়, পণ্ডিত মহাশয় এই পরিবারে তাহার নিদর্শন-স্বরূপ হইয়া থাকিতেন। এই পরিবারস্থ সকলেই তাঁহাকে সকল সময়েই আপনার লোক বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় সকল সময়েই এই পরিবারবর্গের সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে অংশীদার হইয়াই থাক

করিয়া গিয়াছেন। আহা! এমন হিতৈষী, এমন হিতাকাঙ্ক্ষী, এ পরিবার আর কোথায় পাইবে? তাঁহার তিরোধানে, এ পরিবার কেবল নহে, অনেক গরীবের ছেলে, অনেক দুঃস্থ পরিবার তাহাদিগের পরম হিতৈষী হারাইল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একজন কর্ম্মী ও হৃদয়বান লোক হারাইলেন।

তিনি যদি একজন দেশের প্রসিদ্ধ লোক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের অতি ক্ষুদ্রতম ঘটনা পর্য্যন্ত তাঁহার বন্ধুরা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন; তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, নামজাদা নহেন। সহজেই তাঁহার অনেক সৎকার্য্যের বিষয় আমাদের অপরিজ্ঞাত হইয়াই রহিবে।

পণ্ডিত মহাশয়! তুমি যদি ইংলণ্ড বা আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিতে তাহা হইলে, তাঁহারা তোমার হৃদয়ের মূল্য বুঝিয়া, তোমার অনেক কার্য্যের বিষয় লিখিতে ত্রুটি করিতেন না। কেবল তোমার কেন? পুরাণ-প্রিয়, কল্পনা-প্রিয় আমাদের এই মাতৃভূমি বাস্তব জীবনের মর্ম্ম এখনও বুঝিতে সমর্থ হয় নাই—লোকহিতকর মানব-জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতে এখনও অভ্যস্ত হয় নাই।

পণ্ডিত মহাশয়, তুমি চলিয়া গেলে! তোমার দয়া ও স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া, আজ অতি কষ্টেই চক্ষের জল নিবারণ করিতে হইতেছে! তোমার অভাবে আজ অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্র পিতৃহীন হইল, অনেক দুঃস্থ পরিবার অনাথ হইল, আমাদের পরিবারও, সত্য সত্যই, তোমার অভাবে আজ প্রকৃতপক্ষে একজন পরমাত্মীয়, সুহৃদ ও সহায় হারাইল।

সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরেই সকল সাধুকার্য্যের পুরস্কর্ত্তা। তিনিই তাঁহার এই পরলোকগত সন্তানের মস্তকে শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন; তাঁহাকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে রক্ষা করিবেন, এবং তাঁহাকে চিরদিন উন্নতির পথে অগ্রসর করিবেন, এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

দয়াময়, তুমি তোমার এই পরলোকগত আত্মাকে সুখী করিও, আমাদের এই অন্তরের প্রার্থনা। আমাদের এই প্রার্থনা, প্রভো, দয়া করিয়া পূর্ণ করিও। শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রেরিত পত্র

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক নহেন)।

"প্রচার না উৎসব"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১লা পৌষের পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় বন্ধু অমর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রচার না উৎসব বিষয়ে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা গভীরভাবে আলোচনা আবশ্যক মনে করিয়া নিতান্ত অসুস্থ শরীর ও এই দূরদেশ হইতে দুর্ব্বল লেখনীর সহায়তায় আমার বক্তব্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। সম্ভব হইলে ইহা আপনার পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

এক হিসাবে আমাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে; জুবিলি ও শতবার্ষিকী উৎসব উভয় সময়েই বহু জনতা হইয়াছিল এবং উভয় উৎসবেই আমাদের কার্য্য-প্রণালীর দ্বারা আমাদের কর্ত্তব্য আমরা সম্পন্ন করিয়াছি। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে এই উৎসবে কি লাভ করিলাম? এই লাভের একটা ব্যক্তিগত আর একটা সামাজিক দিক আছে। উভয় দিক দিয়াই বিষয়টার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমানে অমরবাবু যে প্রশ্ন করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার মন্তব্য যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে মনে হইতেছে যে তিনি এই প্রণালীতে তৃপ্ত হন নাই। তিনি উৎসবে ও প্রচারে একটা পার্থক্য করিতে চাহিতেছেন। তিনি মনে করিতেছেন যে, উৎসবটা যাহা হইয়াছে তাহা বক্তা ও শ্রোতা লইয়া একটা প্রচারই হইয়াছে। উৎসব অন্তরের জিনিষ, আর প্রচার বাহিরের বস্তু। উৎসবে অন্তরে লাভ করিতে হয় পরমাত্মাকে, আর প্রচার করিতে হয় বাহিরের শত সহস্র লোকের কাছে। এই উৎসবটা হওয়া উচিত ছিল একটা ব্রাহ্মদের পক্ষে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের অবসর। আমাদের দুর্ব্বল শক্তির দ্বারায় ভগবান কত কার্য্য করাইয়া লইলেন, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ ও মধ্যবর্ত্তীবাদ বর্জ্জন করিয়াও মানব আত্মা যে স্বাধীনভাবে কত আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ বিগত শতাব্দীতে তাহা দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। আমাদের এই বাহ্যাড়ম্বর-বিরল ধর্ম্ম যে পরিবার ও সমাজ সংগঠন করিতে পারিয়াছে, তাহার জন্যও বিশেষভাবে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষার প্রচার, নারীর অবরোধমোচন, রাষ্ট্রে ও সমাজে নর নারীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, অনুন্নত জাতির আত্ম-বিকাশের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ যে কত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা আমাদের গৌরবের ও কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের কারণ হইলেও তাহা অবান্তর কথা। ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষ বাণী অন্তরে ব্রহ্মানুভূতির কথা, ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দরসপানের কথা। ব্রাহ্মসমাজে পূজ্যতম আচার্য্য ও গুরুরা এই সকল কথাই বলিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিগত দুই উৎসবে জনগণ-সমাবেশের এবং কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যদিয়া ব্রাহ্মসমাজ কি এই আপন বাণী প্রকাশ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন? আলোচনা করিয়া দেখিবার কথা।

বলিবেন, এ সকল কথা বাহিরে প্রকাশ করা যায় না। আমি সে কথা বিশ্বাস করি না। পূর্ব্বযুগে ব্রাহ্মসমাজ তাহা করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা লোকের আকর্ষণের বিষয় হইয়াছিল। মহর্ষি, ব্রহ্মানন্দ, শাস্ত্রী মহাশয়, বিজয়কৃষ্ণ, নগেন্দ্রনাথ আপন আপন জীবন ও কার্য্যপ্রণালীর দ্বারা ধর্ম্মের এই অন্তর্মুখীনতার কথাই বলিয়া যান নাই কি? এখন আমরা কার্য্যতালিকা ও অনুষ্ঠান বাহুল্য দেখাইয়া লোককে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করি। পূর্ব্বযুগে উৎসব বলিলে কি বুঝিতাম?

বিলাতে আজকাল দুইশ্রেণীর ধার্ম্মিক লোক দেখিতেছি। একদল প্রচার করিতেছেন Mysticism আর একদল প্রচার করিতেছেন Activism—ধর্ম্মের অন্তর্মুখীনতা ও বহির্মুখীনতা।

আমরা কোন দিকটায় জোর দিব? দুঃখীর দুঃখ দূর করা, আর্ত্তের সেবা করা, অজ্ঞানীকে জ্ঞানদান করা ধর্ম্ম বই কি? কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ কি এই ধর্ম্ম দান করার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন? গত একশত বৎসরের ইতিহাসে কি প্রমাণ করিতেছে? গভীরভাবে আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

শ্রদ্ধেয় অমরবাবু প্রচার সম্বন্ধে কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "'প্রচার যাত্রা' বলিয়া বাহির হইলেই স্বভাবতঃ লোকের মনে ভিন্নতাবোধ জাগ্রত হয়; লোকে ভাবে; "আমাদের ধর্ম্ম সরাইয়া দিয়া নূতন ধর্ম্ম দিতে আসিয়াছে।' উৎসবকালে এই ভিন্নতাবোধ জাগাইবার প্রয়োজন কি?" অমর বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপ হইলেও অতি গভীর কথা। প্রচারে ভিন্নতাবোধ জাগে। তাই কি? আলোচনা করিবার বিষয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দুই প্রকার প্রচার প্রণালী আছে। (১) Evengelism (২) Proselytism। এভাঞ্জেলিসমের দ্বারা প্রচারক নিজের জীবনের মুক্তির সংবাদ লোককে দান করেন আর প্রসেলিটিসমের দ্বারা প্রচারক মতপ্রতিষ্ঠা বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা লোকসংগ্রহের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি একখানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের নাম, "The Indirect Effect of Christian missions in India। লেখক মিষ্টার Robert Smith Wilson, এই পুস্তকের জন্য Cambridge University হইতে পুরস্কার পাইয়াছেন। তিনি এককালে এই দেশে ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, এখন ব্যবসায় করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় এই পুস্তকখানা আমাদের সকলের পাঠ করা উচিত। তিনি বলেন লোকসংগ্রহের জন্য যে প্রচার তাহাতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিরোধের সৃষ্টি করে। কেবল সেবার নামে কতকগুলো অনুষ্ঠানের বাহুল্যের দ্বারাও কর্ম্মপটুতা প্রচার হয়, ধর্ম্ম প্রচার হয় না। তাঁহার পুস্তকের এক স্থানে তিনি লিখিতেছেন:—They suspect it is a bait and do not bite! If we were clearly understood to engage in this work for its own sake, I am sure our hospitals and institutions would rise to much higher levels of influence in India"। স্থানাভাববশতঃ অনুবাদ দিলাম না। জলাশয়ে মাছ ধরিবার পূর্ব্বে যে চার দেওয়া হয়, মাছে যদি বুঝিতে পারে যে ইহা কেবল তাহাকে ধরিবার একটা কৌশল মাত্র তাহা হইলে সে আর চারের মধ্যে আসে না, বঁড়শীতে টোপ গিলে না। যখন আমরা ধর্ম্মভাবে সদনুষ্ঠান সকল পরিচালন করি তখন তাহার চেহারাই অন্য প্রকার হয়।

প্রচার ভিন্নতাবোধ জন্মায় কি? সময় বা অবস্থা বিশেষে এই ভিন্নতাবোধ জন্মায়, আবার অবস্থা বিশেষে জন্মায়ও না। আমার প্রচারের মধ্যে কি এমন কোন সাধারণ বিষয় নাই যাহা সকল নরনারীরই অতি আবশ্যকীয় কথা? ভিন্নতা কোথায় নাই? রামে রহিমে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইচ্ছা করিলে রাম ও রহিম উভয়েরই পরস্পরের কথা লইয়া পরস্পরকে খোঁচা মারিতে পারে। আবার রাম রহিমের সাধারণ কথা কি কিছু নাই, যাহা উভয়েরই সমস্যা? বাল্যকালে দেখিতাম Pain সাহেব নামে এক পাদ্রী কালীঘাট অঞ্চলে প্রচার করিতে আসিতেন। একদিন শুনিলাম, তিনি বলিলেন, "তোমরা যে গরুকে পূজা কর আমরা সেই গরুকে খাই" ইত্যাদি। এও এক প্রকার প্রচার বই কি? তোমার ভুল দেখাইয়া দিবার অধিকার আমার নাই কি? শতবার্ষিকী উৎসবের প্রচারযাত্রা উপলক্ষে প্রচার প্রণালী নির্দ্ধারণের জন্য কলিকাতা সাধনাশ্রমে কয়েকদিন সমাজের নেতাদিগের কয়েকটি বৈঠক হইয়াছিল। দু-একদিন তাহাতে যোগ দিতে পারিয়াছিলাম। সেখানেও একদিন শুনিলাম প্রচারকদলের কর্ত্তব্য হইবে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। সিটি কলেজের সরস্বতী পূজার কলহ তখন সকলের মনে জাগ্রত ছিল। কাজেই ঐ প্রকার বিরোধের কথা সে সময় খুব অস্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের মানসিক অবস্থা কি সাময়িক ঘটনারাজির উপরে উঠিবে না? পৌত্তলিকতার ভ্রান্তি আমরা দেখাইব বই কি? কিন্তু কি উপায়ে? নিরাকার উপাসনার সম্ভাবনা এবং তাহার মুক্তিদায়িনী শক্তির প্রাচুর্য্য প্রদর্শন করিয়া না যুক্তি তর্কের শাণিত খড়্গ লোক সমক্ষে প্রদর্শন করিয়া? এই শান্তির পথে বিরোধ না করিয়াও ফল হয়। কিন্তু এ প্রচার whirlwind বা ঝটিকার মত দ্রুতগতির দৌড়াদৌড়ির দ্বারা হয় না। এই শান্ত ভাবের প্রচারপথ কি আমরা অবলম্বন করিয়াছি?

এই প্রচার করিবার জন্য আমাদের অন্তর্মুখীনতা সাধন করা দরকার নয় কি? ভক্তিভাজন ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীতে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে এক প্রকৃত সাধনাশ্রমের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সাধনাশ্রমের যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের মর্ম্মের মধ্যে এই কথাটার গভীর তাৎপর্য্য প্রবেশ করিয়াছে কি না কে জানে? বাহিরের আয়োজন দেখিয়া এত বৎসর কিছু বোধ করি নাই, এখনও কিছু করিতেছি না। অন্তরের কথা অন্তর্য্যামী জানেন। আমাদের মধ্যে এই অন্তর্মুখীনতা সাধন কেন জমিতেছে না, ইহাও সরল ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

কথা উঠিয়াছে প্রচার না উৎসব? আমি বলি ওসব বাইরের কলহ বিবাদ ও প্রচার ঝটিকার দুর্দ্দমনীয় বেগ রোধ করিয়া অন্তরে উৎসব করিবার আয়োজনের কি সময় আসে নাই? বলিবেন এ সব Mysticism এর কথা। আমাদের এই ব্যস্ততা-প্রধান work-a-day জীবনের মধ্যে নীরবতা (Quietism) সাধনের সময় কই? এখানে ক্রমাগতই শুনিতেছি:—

আগে চল, আগে চল, ভাই,
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কি বা ফল ভাই?

বাহিরের চারিদিকে দৌড়াদৌড়ির যে কলরোল উঠিয়াছে, আমরাও তাহার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া গিয়াছি। এই কর্ম্ম-কোলাহলের দ্বারা কি আমরা আমাদের আসল বাণী লোকের কাছে বলিতে পারিব, না, পারিতেছি? আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

বাহিরের জগৎ কোন পথে চলিয়াছে? চারিদিকের এই সব ধর্ম্মহীনতার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের কি কোন বাণী নাই? কেহ কেহ বলেন এসব ধর্ম্মহীনতা এখনকার time-spirit বা যুগভাব; ইহার বিরোধ করিয়া লাভ নাই। তাই কি? একদল লোক will to believe বা will to act প্রভৃতি মতবাদ প্রচার করিয়া ধর্ম্ম বস্তুকে কত তরল করিয়া দিয়াছেন। Freud, Heveloc, Ellis প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদগণ আমাদের প্রবৃত্তি ও বৃত্তি সকলের অভিনব ব্যাখ্যা দিয়া আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানের দায়িত্বটাকে কত নীচে নামাইয়া দিয়াছেন। আবার ইবসেন ও নীটসে প্রভৃতি মনীষিগণ এক Super man (অতি মানব) সৃষ্টি করিয়া আমাদের জীবনের দৃষ্টি কোন পথে প্রধাবিত করিয়া দিতেছেন। গত শতাব্দীর Mill, Spencer প্রভৃতির নাস্তিকতা বা অজ্ঞেয়বাদের যুগ এখন চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার বিরুদ্ধে পুস্তক লেখা বা বক্তৃতা করা আমার মনে হয় হাওয়ার আঁচল বাঁধিয়া ঝগড়া করা মাত্র। এই সব সমস্যার মধ্যে পণ্ডিত হ্যালডেন Humanism প্রচার করিতেছেন। তাহাই কি মীমাংসা? সুপরিচিত লেখক H. G. Wells তাঁহার God the innvisible King নামক সুপরিচিত গ্রন্থে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহা জীবনের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া ব্রাহ্মসমাজ কি প্রকৃত পথ দেখাইবে না? আমরা কোন পথ দিয়া যাইব? একদিকে রোমা রোঁলা, কাউন্ট টলষ্টয় প্রভৃতি পণ্ডিত এক পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন, আর একদিকে Psycho Analystএর দলের লোকেরা আর এক পথ দেখাইতেছেন। কেহ বলেন ত্যাগ, আর কেহ বলেন ভোগ। ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগে ভোগে সামঞ্জস্য করিবেন। কিন্তু কি উপায়ে? ভোগের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া কি? বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মজীবনে এই সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে কি?

আমাদের প্রচারক জীবনের আদর্শ কি? সুখে সচ্ছন্দে স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করিয়া, নিজের ভোগের মাত্রাও অক্ষুন্ন রাখিয়া কি আমরা ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপানের ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেছি? নেতৃস্থানীয় এক প্রচারক একদিন এক প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়া বলিলেন যে বর্ত্তমান যুগে প্রচারকদের কাছে ত্যাগের কথা বলা "চরমের মোহ" মাত্র। যে ব্রাহ্মসমাজে গৌরগোবিন্দ, কান্তিচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ ত্যাগের সিমেণ্ট দিয়া অট্টালিকা গাঁথিলেন, সেই ব্রাহ্মসমাজের নেতাই এখন ত্যাগকে মোহ বলিয়া ঘৃণার সহিত বিতাড়িত করিতে চাহিতেছেন। ইহাঁরা মোহগ্রস্ত না হইয়া ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছেন কি? চারিদিকে কি দেখিতেছি ধর্ম্ম না ভোগ প্রাবল্য?

মহাত্মা গান্ধি এই নব্য-ভারতেই প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে খৃষ্টীয় প্রচারকগণ,—যেমন আহমদনগরের মিষ্টার Winslow সাধু সুন্দর সিং প্রভৃতি বৈরাগ্য মন্ত্র অবলম্বন করিয়াই জনচিত্তের উপর প্রভাব করিতে পারিয়াছেন। কত ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা ধর্ম্মের অন্বেষণে বৈরাগ্য ব্রতধারী লোকের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। চোখে কাপড় বাঁধিয়া অন্ধ সাজিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কি? অপরের দোষ দেখাইয়া তাহাদের নিন্দা করিতে পারি। অপরের মধ্যে নিন্দার কথা অনেক আছে। কিন্তু আমরা কি দোষ দেখাইবার উপযুক্ত? আমরা কি প্রকৃত ধর্ম্মের পথেই অগ্রসর হইতেছি?

প্রবন্ধ অনেক দীর্ঘ হইয়া গেল, সকলের ক্ষমা প্রার্থনা করি। শ্রদ্ধেয় অমর বাবু যে আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন তাহার প্রসার বৃদ্ধির জন্যই এত কথা লিখিলাম। সকলে আলোচনায় যোগ দিলে উপকৃত হইব। ইতি

নিবেদক

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

নবনবতিতম মাঘোৎসব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে নবনবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ব্যাকুল-প্রাণ নরনারীর সম্মিলনের উপরই উৎসবের সফলতা বিশেষভাবে নির্ভর করে সেজন্য উৎসবে সম্মিলিত হইবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে।

৬ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) শনিবার (মহর্ষির মৃত্যুদিন) প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় বালক-বালিকা সম্মিলন। সায়ংকালে ইংরেজীতে উপাসনা। আচার্য্য—ডাক্তার ড্রামণ্ড।

৭ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে ব্রাহ্মযুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য। অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় যুবকদিগের আলোচনা। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় বরাহনগর শ্রমজীবিগণের নগর সঙ্কীর্ত্তন। সায়ংকালে শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার।

৮ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) সোমবার প্রাতে উপাসনা—ছাত্রসমাজের উৎসব। আচার্য্য—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা—ডাক্তার ড্রামণ্ড।

৯ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার প্রাতে মহিলাদিগের উৎসব (ও পুরুষদিগের জন্য সিটি কলেজ গৃহে পৃথক উপাসনা।) সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা। (কেবল সভ্যদিগের জন্য)।

১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) বুধবার প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য-শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। অপরাহ্ন ১ ঘটিকায়

নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। বক্তা—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর সঙ্কীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য।

১১ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার সমস্তদিন-ব্যাপী উৎসব। প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযু বরদাকান্ত বসু। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ডাক্তার ড্রামণ্ড। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা। আচার্য্য ডাক্তার সাউথ ওয়ার্থ। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

১২ মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) শুক্রবার প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মেরী কার্পেণ্টার হলে রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসব। সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ।

১৩ মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) শনিবার প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভাই সীতারাম। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় আলোচনা। সায়ংকালে শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আগত বিদেশী অতিথিদিগের অভ্যর্থনা ও অভিভাষণ।

১৪ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। সায়ংকালে উপাসনা আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস।

মাঘোৎসবের উপাসনাদি—প্রাতঃকালে ৭ ঘটিকায় ও সন্ধ্যাকালে ৬।।০টায় আরম্ভ হইবে।

বঙ্গে শতবার্ষিক মহোৎসব—৮ই অক্টোবর প্রচারযাত্রীদল সন্ধ্যায় কুমিল্লা পৌছেন। ষ্টেসনে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত রমেশ-চন্দ্র আইচ প্রভৃতি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। তখনি তাঁহাদিগকে মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী তখন মন্দিরে "ব্রাহ্মসমাজের শত বর্ষের সাধনা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। বক্তৃতার পর তাঁহাদিগকে "কৈলাস ভবনে" শ্রীযুক্তা কুসুমমালা দত্ত মহাশয়ার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি তাঁহাদিগকে আদর ও অভ্যর্থনায় একেবারে তাঁহার পরিবারভুক্ত করিয়া লয়েন। ৯ই তারিখ প্রাতঃকালে তাঁহার বাটীতে কীর্ত্তন হইবার পর তাঁহারা মন্দিরে যান এবং মিঃ সিন্হে তথায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় টাউন হলে কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও মিঃ সিন্হে "Work and message of Brahmo Samaj" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বৃহৎ হলটী লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ১০ই তারিখ প্রাতে মন্দিরে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত বিশ্বদাস দত্তের বাটী হইতে নগরকীর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু অতিশয় বৃষ্টি হওয়ায় তাঁহার বাটী যাইয়াও কেহই বাহির হইতে পারেন নাই। সন্ধ্যায় মন্দিরে কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনার কার্য্য করেন ১১ই তারিখ প্রাতে একটী কন্যার পারলৌকিক অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। বেলা ১০টার সময় তাঁহারা কুমিল্লা ত্যাগ করেন। এইস্থান হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রচার-যাত্রীদিগের সহিত মিলিত হন এবং মিঃ সিন্হে কারসিয়াং যাত্রা করেন। ব্রাহ্মণ বেড়িয়া—১১ই বেলা ২টার সময় অতিশয় দুর্য্যোগের মধ্যে তাঁহারা এইস্থানে উপস্থিত হন। ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত মেঘনাদ চৌধুরী তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ত্রিপুরা রাজার কাছারি-বাটীতে লইয়া গিয়া সেইস্থানেই তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর মন্দিরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। ১২ই অক্টোবর প্রাতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ মন্দিরে উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে এই স্থানের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু যাত্রীদিগকে তাঁহার বাটীতে আমন্ত্রণ করেন এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় হাইস্কুলে "ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষ" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন। অনেক লোক এবং ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন রাত্রি ১২ টার সময় তাঁহারা ব্রাহ্মণ বেড়িয়া পরিত্যাগ করিয়া কালীকচ্ছ গমন করেন। তথাকার বিবরণ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। কিশোরগঞ্জ—কালীকচ্ছ হইতে নৌকাযোগে মেঘনা নদী পার হইয়া বেলা ৩।। টার ট্রেণে ভৈরব বাজার ষ্টেসন হইয়া ৬।। টায় তাঁহারা এই স্থানে পৌছান। ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকিশোর বিশ্বাসের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। এখানে কোন ব্রহ্মমন্দির না থাকায় দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে উপাসনাদি হয়। স্থানীয় হাইস্কুলে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, অনেক ভদ্রলোক ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। ১৭ই প্রাতে সহরের কতক অংশে উষাকীর্ত্তনের পরে উপাসনা হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ এবং রাত্রে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। ১৮ই প্রাতে বাটীতে উপাসনা শেষ করিয়া শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী অপরাহ্ণে ময়মন সিং এবং যাত্রীদল ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। ঢাকার বিবরণও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। A Hand book of Brahmoism, its principles and history by Abinash chandra Lahiri B.A.—মূল্য ।।০ ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ ইংরাজী পুস্তকের বিশেষ অভাব রহিয়াছে। অবিনাশ বাবু ইহা প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছেন। আমরা আশা করি বাঙ্গালা ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। সংক্ষেপে সকল বিষয়ই লিখিত হইয়াছে। মোটামুটি জ্ঞানলাভের পক্ষে ইহা যথেষ্ট। একটু তাড়াতাড়িতে লেখা হইয়াছে মনে হইল। তাই তারিখ সম্বন্ধে একস্থানে একটু ভুল হইয়াছে। দুই এক স্থানের ভাষাও কিছু পরিবর্ত্তিত হইলে ভাল হইত। যাহা হউক, ইঁহার দ্বারা একটি অভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইবে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

A Century of service (1828 —1928) by Upendranath Ball M. A. পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য ।৵০। ইহাতে বিগত শতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজ যে কাজ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা প্রকাশ করিয়া উপেন্দ্র বাবু ও লাহোর ব্রাহ্মসমাজ অতি ভাল কাজ করিয়াছেন। এরূপ একখানা পুস্তকের বিশেষ অভাবই ছিল। আমরা ইহা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। আশা করি ইহা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৬ইমাঘ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

অসতো মা সদগময়,

তমসো মা জ্যোতির্গময়

মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ।
২০ম সংখ্যা

১৬ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ

29th January, 1929

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা

হে করুণাময় উৎসবদেবতা, উৎসবের মধ্যে তোমার অপার প্রেম ও স্নেহের দান তুমি প্রচুর পরিমাণেই বর্ষিত করিয়াছ। তুমি দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি কর নাই। তোমার কত আকুল-প্রাণ ভক্ত সন্তানদিগকে দূর দূরান্তর হইতে আনিয়া মিলিত করিয়াছ! নিরাশ প্রাণে কত আশার সঞ্চার করিয়াছ, অবসন্ন মৃতপ্রায় হৃদয়ে কত উৎসাহ জাগাইয়াছ, অন্তরের অন্তরে কত শুভ সঙ্কল্পের উদ্রেক করিয়াছ! তোমার সে সকল দান আমরা কতটা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিব জানি না। আমরা যাহা পাই, অনেক সময়ই তাহা হারাইয়া ফেলি—ধরিয়া রাখিতে পারি না। হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প জাগে, অতি সহজেই তাহা ম্লান হইয়া যায়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। অল্পদিনের মধ্যেই সংসারস্রোতে গা ঢালিয়া পূর্ব্ব পথে চলিতে থাকি। সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিয়া তোমার পথে চলিতে সমর্থ হই না। হে অন্তর্দর্শী দেবতা, আমাদের অন্তরের ত্রুটি দুর্ব্বলতা সকলই তুমি জান। তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আমরা যে কত দুর্ব্বল, তাহা ভাল করিয়াই তুমি জান। তোমার করুণা ভিন্ন আমাদের আর কোনও সম্বলই নাই। হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদের হৃদয়ে সেই বল প্রদান কর, যাহাতে আমরা এবার সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া তোমার পথে চলিতে পারি, তুমি যাহা দিয়াছ তাহা হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি এবং তদ্দ্বারা আমাদের জীবনকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারি। তোমার কৃপাতে উৎসবের ফল আমাদের জীবনে স্থায়ী হউক। তোমার শুভ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউক।

নবনবতিতম মাঘোৎসব

করুণাময় পিতার অপার কৃপায় নবনবতিতম মাঘোৎসব ও ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব অতি সুন্দর ভাবেই সম্পন্ন হইল। শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে সকল বিদেশীয় বন্ধুগণ ইতিপূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নানাস্থানে বেড়াইয়া এই সময় এখানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তাহা ব্যতীত উৎসবের মধ্যে এমেরিকা হইতে আরও তিনটি বন্ধু আসিয়া মিলিত হন। দুঃখের বিষয় অপর দুইজন পথে অসুস্থ হওয়াতে যথাসময়ে আসিয়া মিলিতে পারেন নাই। সুদূর বর্ম্মা ও ভারতবর্ষের নানা দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও বহু ভ্রাতা ভগিনী উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাদের নানা ক্লেশ স্বীকার ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিয়াছেন, পরস্পরের সাহচর্য্য হইতে বিশেষ লাভবান হইয়াছেন। আমরা যাহাতে ইহার ফল জীবনে ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহার জন্য সকলকেই বিশেষ সচেষ্ট এবং আকুল প্রার্থনায় নিযুক্ত হইতে হইবে। উৎসবের প্রকৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নয়। তাই আমরা শুধু বাহিরের কিছু বিবরণ প্রদান করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত প্রমুখ কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে ও যত্নে সমগ্র পৌষ মাস নগরের বিভিন্ন অংশে উষা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। প্রতিদিন সকলে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্মিলিত হইয়া প্রার্থনান্তে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন এবং নগরের সেই অংশের দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিয়া অপর কোনও নির্দ্দিষ্ট গৃহে উপাসনা প্রার্থনাদি করিয়া কার্য্য শেষ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে এক দিবস সহরের বাহিরে নিমতা[illegible] কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

২৯শে পৌষ (১৩ই জানুয়ারী) রবিবার—ব্রাহ্মপরিবার এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসসমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণপ্রার্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই উপলক্ষে অনেক গৃহ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিতও করা হইয়াছিল। মন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর উপাসনাতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করেন তাঁহারাও স্বভাবতঃই বিশেষভাবে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবার কথাই বলেন।

১লা মাঘ (১৪ই জানুয়ারী) সোমবার—অদ্যকার প্রাতঃকালও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণপ্রার্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। আজও অনেক গৃহে উক্ত প্রকার প্রার্থনাদি হইয়াছে। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন :—

ক্ষমাশীলতা লইয়া উৎসবদ্বারে প্রবেশ করিতে হয়। লর্ড মেওর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাঁর সন্তানগণ টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন "ঈশ্বর আমাদের পিতৃহন্তাকে ক্ষমা করুন।" আজ আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমার একজন পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু তাতানগরে পুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন; তিনি ছেলের নির্দ্দম নিষ্ঠুর ব্যবহারে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন "আমি তাকে ক্ষমা না করিলে পরমেশ্বর আমাকে ক্ষমা করিবেন কেন?" ঈশার উপদেশ—আমরা অপরাধীকে ক্ষমা না করিলে আমরা কেমন করিয়া ক্ষমা লাভ করিব? আমি পরলোকগত আচার্য্যদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং উপস্থিত সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। বিনীত ভাবে সর্ব্বলের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, সকলেই যেন আমাকে ক্ষমা করেন, যাঁহার কাছে যে দোষ করিয়াছি তাঁহারা যেন সমস্ত ক্ষমা করেন।

আমাদের আজ এই প্রথম চিন্তা। দ্বিতীয় চিন্তা, ব্রহ্মের নিকট ক্ষমাভিক্ষা। আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তিনি আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হউন। অন্তর-প্রেরণা আমাদের মধ্যে আসুক। যিনি আচার্য্য, যিনি গায়ক, যাঁরা অতিথিরূপে আসিবেন, যাঁরা তাঁহাদের সেবাতে নিযুক্ত, তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে তাঁহার প্রেরণা আসুক। ব্রহ্ম যে কাজ আমাদিগের দ্বারা যেমন ভাবে করাইবেন সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যেন আমরা সকল কাজ করি, নিজেদের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যেন কাজ করিতে পারি! ভগবান্ তাঁহার রূপজ্যোতি চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন—বৃক্ষলতা, পত্রপুষ্পে অপরূপ সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছেন; কিন্তু তারা ভাবে না; তাহাদের সৌন্দর্য্য কেহ দেখিল কি না। সেইরূপে আমরা ডুবি। আমরা কাহারও দিকে না তাকাইয়া নিজের মধ্যে ব্রহ্ম যেমন প্রেরণা দেন সেই ভাবে চলি, যাহা বলাইবেন তাহাই যেন বলি, নিজের দিকে দৃষ্টি যেন না থাকে। আমাদের প্রত্যেকেরই সেই প্রেরণা চাই। প্রথমে ক্ষমা, দ্বিতীয় ক্ষমাশীলতা, প্রার্থনা, তৃতীয় ব্রহ্মের শরণাপন্ন হওয়া চাই। আমি যখন আপনাদের দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হই, তখন আমি গিরিডিতে আপনাকে কিরূপ অসহায় জানিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া ছিলাম তাহা কেহ জানেন না; কিন্তু ব্রহ্মের বাণী শুনিলাম, অন্তর-প্রেরণা পাইলাম। সেই বাণী শুনিয়া বিদেশে যাত্রা করিলাম। আজ সেই ব্রহ্মের নিকট প্রেরণা ভিক্ষা করি—হে পরম জ্যোতি, তুমি জ্যোতির জ্যোতি, তুমি যাহাতে গৌরবান্বিত হও, কেবল সেই একমাত্র লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া আজ তোমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি; তোমার পূজাতে প্রবৃত্ত হই। তোমার পূজায় তুমি পুরোহিত; যাহা কিছু আয়োজন তুমি করিয়াছ তাহাই দিয়া, তোমার করুণা ভিক্ষা করিয়া, তোমার পূজাতে আমরা প্রবৃত্ত হই।

উপাসনান্তে তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন—

পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদের একমাত্র ভিক্ষার বস্তু, তিনিই আমাদের একমাত্র প্রার্থনার বস্তু। যদি আমরা কোন বিষয়ের গৌরব করিতে চাই, তাহা হইলে যেন এই বলিয়া গৌরব করিতে পারি যে তিনিই আমাদের পরম ধন। যদি কিছু লইয়া আমাদের আনন্দ করিতে হয়, তবে তিনিই একমাত্র আনন্দ করিবার বস্তু। এবার আমাদের প্রিয় মাঘোৎসবে যেন এই সত্য আমাদের মধ্যদিয়া প্রচারিত হয়। যদি আমরা জগতের সমক্ষে কোন আনন্দবার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তিনি আমাদের হৃদয়ে আসীন আছেন ইহাই যেন প্রচার করিতে পারি।

প্রচার নানা ভাবে ও নানা প্রকারে হইতে পারে। কিন্তু ইহাই সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি জীবনে, চরিত্রে ও হৃদয়ে তাঁহার জ্যোতি একবিন্দুও থাকে তাহা হইলে নীরবে ও একাকী বাস করিয়াও তাঁহার সত্য প্রচার করা যায়। বাহিরে দশজনের সমক্ষে তাঁহার বাণী বলিতে হইবে সত্য; কিন্তু একাকী থাকাও যে আবশ্যক, ইহাও সত্য। তিনিই যে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, এই ভাব সর্ব্ব প্রথমে আমাদের অর্জ্জন করা আবশ্যক। সংসারে চলিতে চলিতে নানারূপ দুর্ব্বলতা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে বটে, কিন্তু তিনি তাহা ক্ষমা করেন।

অন্তরের স্নিগ্ধতাও একটী আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। যাঁহারা তাঁহার প্রতি পরমবিশ্বাসসম্পন্ন তাঁহারা তাঁহার সেবাতেই নিযুক্ত ও তাঁহারই অনুগত। তাঁহার সান্ত্বনা তাঁহাদের জীবনে নিত্য প্রকাশিত। ঘোর আঁধারে থাকিয়াও তাঁহারা তাহা লাভ করেন। প্রকৃত ভক্ত যাঁহারা তাঁহারা একমাত্র তাঁহার আনুগত্য ভিন্ন অন্য কিছুই ভিক্ষা করেন না।

সমাজে বাস করিতে হইলেই প্রথমে আনুগত্য চাই। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি কেন? সমাজের সকলকে আপনার জন করিতে পারা যায় কি না? যাঁহারা একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া সংসারে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত একত্ববোধ লাভ করা যায় কি না? কিন্তু তৎপূর্ব্বে স্মরণ করিতে হইবে যে, যতই তুমি প্রেমে অগ্রসর হইবে ততই তোমাকে সংসারের ব্যথা সহ্য করিতে হইবে। সমাজে বাস করিতে হইলেই জীবনে এমন দিন আসিবেই আসিবে, যেদিন তোমাকে সংসারের নানারূপ দুঃখ বরণ করিয়া লইতে হইবে, কেবল নিজের জন্য নয়, সমাজের, জন্য, তোমার সমবিশ্বাসীদিগের জন্য। তাঁহার অনুগত

হইতে হইলে তাঁহার আদেশ মান্য করিতেই হইবে। তিনি যে প্রেমময় ও কৃপাকল্পতরু; অতএব তাঁহার সন্তান হইয়া আমরা জগতের কাহাকেও পর জ্ঞান করিতে পারি না। যদিও ইহা অতি কঠিন ব্যাপার, তথাপি এই উৎসবে ইহাই আমাদের একমাত্র সাধনের বিষয় হউক।

নিজেকে যদি অতি দীনহীন বলিয়া মনে করি তবে তাহাতেও আমার লাভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ষ্টাডজের একটী সভায় অনেক সুপণ্ডিত বন্ধু উপস্থিত আছেন, নানা বিষয়ের আলোচনা হইতেছে; এমন সময় আমি আমাদের ভক্তিভাজন বন্ধু ডাক্তার পি কে রায়কে বলিলাম, "আমি তো এই সকল বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিলাম না, তাহা হইলে আমায় এখানে উপস্থিত থাকিয়া কি লাভ?" তিনি বলিলেন, "আপনার ignorance (অজ্ঞতা) কতখানি তাহা তো বুঝিতে পারিলেন, এই-ই লাভ।"

আমরা প্রেমে কতজনকে আপনার করিয়াছি, এই বিষয় যখন চিন্তা করি, তখনই নিজেরা যে কত হীন তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। তবে আমার অহঙ্কার করিবার কি আছে? এই উপাসকমণ্ডলীর সকলে যে আমরা একপরিবার এবং তিনি যে কৃপাকল্পতরু, যতদিন না এই ভাব প্রাণে ধারণ করিতে পারি, ততদিন আমি কিছুই নই। এবার এইটীই আমাদের সাধন করিতে হইবে।

যদি তাঁর প্রকাশ প্রাণে লাভ হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব-ভুবনকেই বুকে ধারণ করিতে ইচ্ছা হয়। অনেক দিন পূর্ব্বে একবার এই মাঘোৎসবের সময় আমি ঢাকাতে ছিলাম। একদিন প্রত্যূষে ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া দেখিলাম, তখন কেবলমাত্র চারিজন উপাসক মন্দিরে উপস্থিত! তাঁহাদের দেখিয়াই আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তাঁহাদের সকলকে আলিঙ্গন করিলাম। যাহাকে দেখি তাহাকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি এই ভাব দিলেন এবং তিনি যে প্রেমস্বরূপ ও প্রেমকল্পতরু তাহা বেশ উপলব্ধি করিলাম। Fenelon বলিয়াছেন, "Mine and thine"—"আমারও তোমার"—এই ভাবটী ক্ষুদ্রাশয়তার পরিচায়ক।

কোন্ উচ্চ বস্তুর জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব? "Thy kingdom come"—(তোমার স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হউক) এই প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুতেই যে তৃপ্তি নাই। এ বৎসর এই উৎসবের ভিতর দিয়া তিনি আমাদের দ্বারা এই ভাবটী সাধন করাইয়া লইবেন।

অল্প কয় দিনের মধ্যে আমাদের সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা শুনিতে হইল, যাহাতে দারুণ ক্ষোভে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল সমাজের গতি কোন্‌দিকে চলিয়াছে? কাহারও প্রাণে নিষ্ঠা নাই, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই। কেন এ রকম পরিবর্ত্তন হইল? তখনই মনে হইল, যাঁহারা প্রেমিক তাঁহারা প্রাণে ব্যথা লইয়াই সমাজের সেবা করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে চৈতন্য এক সাধুকে দেখিলেন—তিনি বলিতেছেন "জগতের সকল লোকের ব্যথা আমার প্রাণে আসুক।" কি প্রেমের কথা! এই ব্যথার দ্বারাই লোকের সেবা করিতে হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত কত শুনিয়াছি ও পাঠ করিয়াছি; কিন্তু জীবনে যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিতেছি। স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কি ভাবে সমাজের সেবা করিয়াছেন? একদিন একব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল যে, তাহার স্ত্রী অতি অসুস্থ, ডাক্তার কড্‌লিভার অয়েল খাইতে বলিয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার সংস্থান হইতেছে না। তিনি জানিতেন যে লোকটী প্রতারণা করিতেছে। কিন্তু তাহা জানিয়াও স্থির থাকিতে পারিলেন না, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। একেই বলে প্রেমের ব্যথা। কবি কাউপার ক্রীত দাসদিগের দশা স্মরণ করিয়া তাঁহার "The Castaway" কবিতাতে কি ভাবে তাঁহার অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করিয়াছেন! বেদনার মধ্যদিয়াই তো সেবা সার্থক হইয়া উঠে। Savonarola ফ্লোরেন্সবাসিগণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের ভালবেসে ক্লেশেতেই আমার জীবন গেল।" অবশেষে ফ্লোরেন্সবাসীর জন্য সেই খানেই জীবন দিলেন;—তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইল। ব্যথাতেই প্রেমের প্রকাশ। প্রেমের পথে কেবল ব্যথা। কার্লাইলের তিরস্কারে ইংলণ্ডের লোকে তাঁর বই কিছুদিন পড়া বন্ধ করিয়া দিল। কার্লাইল ইংরাজ জাতির অধোগতি দেখে ব্যথিত হইয়া কত তিরস্কার করিয়াছিলেন; তাঁর সেই বই কেহ কিছুদিন পড়িল না। St. Paul শিষ্যদের বলিলেন, "তোমাদের পাপাচারে দগ্ধ হইতেছি।" প্রেমিকগণ এইরূপই ব্যথা ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রতি নিয়তই প্রাণে এই সঙ্কল্প জাগ্রত হয় "সাধ্যমত জগতের কল্যাণ সাধন করিব।"

ফরাসী বিপ্লবের সময় য়ুরোপ ও আমেরিকাতে কি আশাই না জাগ্রত হইয়াছিল! কিন্তু উত্তর কালে তাহার কি ঘোর পরিণাম! স্বাধীনতার নামে কি দারুণ কাণ্ড সংসাধিত হইল। তাহাতে কত মহৎ লোকের প্রাণ দারুণ মর্ম্মবেদনায় পূর্ণ হইল!

আমাদের এই ক্ষুদ্র সমাজের কথা যখন চিন্তা করি, তখন দারুণ ব্যথা আসিয়া প্রাণকে অধিকার করে। তবুও এই সমাজের সেবা করিতে হইবে ও প্রার্থনা করিতে হইবে "প্রভু, সকল নরনারীর মন তুমি পরিবর্ত্তিত করিয়া দাও।"

আমাদের সমাজ শোকের অনলে অরণ্যে পরিণত হইতেছে। প্রেমের পথে চলিতে হইলে শোকের আগুন প্রাণে ধারণ করিতেই হইবে। ব্যথা লইয়াই সমাজের সেবা করিতে হইবে। যদি তাহা না পারা যায় তাহা হইলে উপাসনা কি হইল? ক্যাসাবিয়াঙ্কার মত চতুর্দ্দিকের অগ্নি তুচ্ছ করিয়া পিতার আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। যদি মৃত্যুও হয় তাহাও ভাল, তবু পিতার আদেশ ব্যতীত চলিব না। সেণ্ট পল, সাবোনা রোলা (Savonarola) আর যে সকল সাধু ব্যক্তিকে চক্ষে দেখিয়াছি তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করি,—উদরে অন্ন নাই, কিন্তু জগতের সেবায় প্রেমের উৎস অন্তরে প্রবাহিত, স্বয়ং শোকে দগ্ধ অথচ আনন্দে পরিপূর্ণ, তাপে সন্তাপিত অথচ স্নিগ্ধ। তাঁহাদের স্মরণ করি, আর কৃপাকল্পতরুকে ডাকি। ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদে মত্ত হইয়া আমরা কিসের অহঙ্কার করিতে পারি? আজ এই উৎসবে ঋষি রাজনারায়ণের সেই বাক্য চিন্তা করি—"বড় বড় জিনিষ চুরি হইয়া গেল,

তোমাদের সেদিকে দৃষ্টি নাই।" যদি তাঁহাকে লাভ করিয়া আনন্দ করিতে পারি করিব, তাহা না হইলে দুঃখেতেই তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। আমাদের এই সমাজে দেখিয়াছি সেই আচার্য্যদের—যাঁদের প্রাণে এমন এক অমৃতের উৎস উৎসারিত যে, তাঁরা শোক তাপে তাপিত হইয়াও ব্রহ্মসহবাসের অপূর্ব্ব আনন্দের সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। আমরা জানিয়াছি কি? জানতে হবে আমাদের দীনতার কথা। আমাদের দীনতার কথাই আজ আমি উৎসবের দিনে বলিতেছি, আমি আনন্দের কথা আজ বলিতে পারি না। আমার যাহা আছে তাহাই বলিতেছি। রাজনারায়ণ বসুকে দেখিয়াছি দুঃসহ শোক তাপের মধ্যে দিনপাত করিয়াও কোন দিন খেদের কথা বলেন নাই। তাঁহার মুখে খেদের কথা শুনিতে পাই নাই, মৃত্যুশয্যাতেও খেদ নাই, কেবল আনন্দের কথাই তাঁর মুখে। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি?

আজ আমরা তাঁহার চরণে এই ভিক্ষা করি, এই ক্ষুদ্র-মণ্ডলীভুক্ত সকলে আমরা একপরিবার এই জ্ঞান উজ্জ্বল করিয়া দাও, আমাদের অন্তরে একবিন্দু প্রেম দাও, আমরা সংসারের সমস্ত সহ্য করিয়া আনন্দে তোমার চরণে মিলিত হইয়া আমাদের উৎসব সার্থক করি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন, "তোমরা প্রার্থনা করিতে জান না, **দিতেই হবে** এই বলিয়া তাঁহার চরণে পড়ে থাক।"

আমরাও এই ভাবে তাঁহার নিকটে প্রেমের শক্তি ভিক্ষা করি। তিনি আমাদের এই উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে প্রকাশিত হউন। তাহার চরণে সুখ, দুঃখ, জীবন ও মরণের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই। তিনি এই উৎসবে আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যাউন। যদি তাঁহাকে লইয়া গৌরব করিতে পারি করিব, নচেৎ দুঃখেই জীবন অতিবাহিত হউক, এই ভাব যেন আমরা আয়ত্ত করিতে পারি। তিনি যে আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে আমরা তাঁহারই চরণে ভিখারী হইয়া, নিজের নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া, মণ্ডলীস্থ সকলকে প্রেম দান করিয়া, প্রেম-স্বভাব প্রাপ্ত হই। তিনি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

সেই কৃপা কল্পতরুর কাছে প্রার্থনা করি যেন সকল অবস্থাতে আনন্দ নিয়ে তাঁহার কাছে যাইতে পারি। প্রেমের শক্তি ভিক্ষা, জগজ্জনকে আপনার করিয়া লইবার শক্তি ভিক্ষা, আর সর্ব্বোপরি তাঁহার করুণা ভিক্ষা করি, আজ এমন দিনে তাঁহাতে আশা রাখি। তাঁহার এই কৃপা ভিক্ষা করি যেন আমরা তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিতে পারি, জীবন মরণে তাঁহার দাস হইয়া থাকিতে পারি। আর তাঁহার প্রকাশ ভিক্ষা করি। যখন তিনি আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছেন তখন আর ভয় কি? উৎসবদ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, আর হৃদয়ে ক্ষমাশীলতা লইয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হই। এই উৎসবের সকল আয়োজন যেন অমৃত-স্বরূপের সঙ্গ লাভের সহায় হয়

২রা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার— প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

বাল্যকালে যে স্থানে বাস করিতাম সেখানে গুরুচরণ নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। সে করাতির কার্য্য করিত। সামান্য কাজ করিলেও গুরুচরণ একজন ভক্তিমান ও প্রেমিক লোক ছিল। তার জীবনে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল, যে জন্য তাহার পরলোকগমনের পর তাহার জীবনী প্রবাসী পত্রিকার একটী প্রবন্ধের বিষয় হইয়াছিল। গুরুচরণ দিবসের অধিকাংশ সময় করাতির কাজ করিত। প্রত্যূষে ও সন্ধ্যার পর অতিশয় মনোযোগের সহিত কিয়ৎকাল পাঠ করিত। পাঠ করিত শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ। পাঠ আবার তার নিজ বাড়ী বসিয়া বড় একটা হইত না। যে বাড়ী দেখিত আরও দুই একটী বালক পাঠ করিতেছে, সেথা তাহাদিগের নিকট তাহার প্রথম ভাগ ও একখানি শ্লেট ও একটী পেন্সিল হাতে লইয়া গিয়া উপস্থিত হইত এবং তাহাদের পাশে বসিয়া সুর করিয়া 'ক' আর 'র' 'কর', ক আর র 'কর' পড়িতে থাকিত। যে বাড়ীর বালকদিগের নিকট একটু সদয় ব্যবহার পাইত, গুরুচরণ তাহার কোন বাড়ী গিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠে রত হইত। গুরুচরণের হাতে সেই প্রথম ভাগ খানি আর একখানি শ্লেট পেন্সিল সর্ব্বদাই দেখা যাইত। তাহাকে দেখিলে মনে হইত তার পাঠে বড়ই অনুরাগ। কিন্তু কি জানি কেন গুরুচরণের প্রথম-ভাগ পড়া সমাপ্ত হইত না। আমি যখন তাহাকে প্রথম পড়িতে দেখি তখন আমার বয়স ১১ বৎসর। আর আমার ৩১ বৎসর বয়সে যখন আমি তাহার দেশ হইতে অন্যত্র গমন করি, এই ২০ বৎসর গুরুচরণকে বরাবরই ঐ প্রথম ভাগই পড়িতে দেখিয়াছি। আত্মপরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে ধর্ম্মজগতে আমাদের অনেকের অবস্থা সেই গুরুচরণের মত। অন্ততঃ আমার তো বটেই। বরং গুরুচরণ তার প্রথম ভাগ খানি যেরূপ অধ্যবসায় ও অনুরাগের সঙ্গে পড়িত, তাহা আমাদের সকলের পক্ষেই বড় স্পৃহণীয়। মনোযোগী ছেলে অল্পদিনেই প্রথম ভাগ শেষ করে। ক্রমে দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ, তার পর কত বড় বড় বই পড়ে; ক্রমে একজন বিদ্বান হইয়া উঠে। অমনোযোগী ছাত্র সেই প্রথম ভাগ লইয়াই পড়িয়া থাকে। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় অধিকাংশ লোকেই অল্প মূলধন লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে তাহা নাড়া চাড়া করিয়া কেহ লক্ষপতি কেহ ক্রোড়পতি হ'য়ে পড়ে। সামান্য মূলধনকে খাটিয়ে খাটিয়ে বাড়াতে হয়। যে মূলধনকে খাটিয়ে বাড়াতে জানে না সে কখনও লক্ষপতি হ'তে পারে না, তার দারিদ্র্য ও ঘোচে না। ধর্ম্ম-জগতেও সেই নিয়ম। মূলধন সামান্য লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়। খাটাতে পারিলে ক্রমে ধনী হওয়া যায়। বাল্যকালে যখন আমার পিতা আমাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসেন, তখন তাঁহার এক প্রধান কাজ ছিল আমার মাতৃদেবীকে ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষাদান এবং তাঁহাকে ব্রহ্মোপাসনা ধরান। আমার পিতা যখন আহারান্তে তাঁহার কর্ম্মস্থলে যাইতেন, আমার জননী তখন স্নানান্তে একখানি ব্রহ্মসঙ্গীত লইয়া উপাসনায় বসিতেন। "কর সদা দয়াময় নাম গান" এই সঙ্গীতটী

তাঁহাকে অনেক সময় করিতে শুনিতাম। এই সঙ্গীতে একটী পদ আছে "রসাল দয়াল নাম অমৃত সমান।" ইহার অর্থ বুঝিতাম না। মা'র নিকট অর্থ বুঝিতে চাহিতাম। তিনি অনেক ক'রে বুঝাতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর বোঝাবার চেষ্টা ও আমার বুঝবার চেষ্টা দুইই ব্যর্থ হইয়া যাইত। ঈশ্বরের নাম যে আবার কি ক'রে অমৃতের মত মিষ্ট হয়, তাহা কিছুতেই বুঝতে পারতাম না। এখনও যে ঠিক বুঝেছি তাহা বলতে পারি না। গুরুচরণের প্রথম ভাগ পড়িতে কুড়ি বৎসর লাগিয়াছিল। কিন্তু আমি দেখিতেছি ৫০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, দয়াল নাম যে "অমৃত সমান" তাহা আমার এখনও ভাল ক'রে বোঝা হইল না। যদি হইত, তবে কি আর এখনও অসার ও অনিত্য বিষয়ে মন যাইত? সেদিন উষাকীর্ত্তনে শুনিলাম ভাইসকল গাহিতেছেন "ব্রহ্মনাম-প্রেমসুধা"। শুনিয়া মনে হইতেছিল ব্রহ্মনাম যথার্থই সুধা। এই সুধা পান করিলে যথার্থই আত্মার ক্ষুধা দূরে যায়। কিন্তু যথার্থ বোঝা হইল কই? যদি হইত, তবে কি আর সংসারের হলাহলপানে মন যাইত? এখনও কি সুধা ফেলে গরল-পানে রুচি হইত? মানুষের নিকট যাহা মিষ্ট বোধ হয়, সে তাহার জন্যই অধিক লালায়িত হয়। আত্মপরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই, ঐ ব্রহ্মনাম, দয়াল নাম, এখনও অমৃতের মত মিষ্ট বোধ হয় নাই। যদি হইত তবে এই কণ্ঠে ঐ নাম মিষ্ট হ'য়ে উঠিত এবং নামের মধ্যে যে 'নামী' বর্ত্তমান তিনিও আমাদের নিকট সব চেয়ে অধিক মিষ্ট হইতেন। ভক্ত গাহিলেন "এ রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ"। বলিতে কি পারি সেই রসের স্বাদ পেয়ে, অপর সকল সাধ চ'লে গিয়েছে? যদি না গিয়ে থাকে, তবে কি ক'রে বলব সে রসের স্বাদ পেয়েছি? এই রসের কথাই বলতে গিয়ে ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় গাহিয়াছেন "সেই রসে না রসিক হ'লে মানব-জনম ফাঁক রে।" যথার্থই কি বুঝতে পেরেছি যে সেই রস না পেলে মানবজনম ফাঁক? যদি বুঝতাম, তবে কি এমন নিশ্চেষ্ট উদাসীন হ'য়ে থাকতে পারতাম? বুঝেছিলেন চৈতন্য; যিনি বলিলেন

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে।"

"গোবিন্দবিরহে আমার নিমেষ-কাল যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় চক্ষু হইতে বারিধারা পতিত হয় এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হয়।"

তিনি যথার্থ বুঝেছিলেন ব'লেই ঈশ্বরবিরহে অধীর হ'য়ে দেয়ালে মুখ ঘ'সে রক্তাক্ত করতেন। আমরা কি করি? তাঁর অদর্শনে কি আমরা জগৎ শূন্য বোধ করি? আহার নিদ্রা ত্যাগ করি? প্রিয়জনের বিচ্ছেদে মানুষ আহার নিদ্রা ত্যাগ করে এমন শোনা যায়। ঈশ্বর কি আমাদের কাছে তেমন প্রিয় হয়েছেন? বুঝেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বর বিরহে যাঁহার নিকট দ্বিপ্রহরের সূর্য্যকিরণ কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। বুঝেছিলেন ভক্ত বিজয় কৃষ্ণ, যিনি সেই রসের জন্য পাগল হ'য়ে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিলেন। আর কত জনের নাম করব? যাঁরা বুঝেছিলেন তাঁরা জন্মের মত ডুবে গেলেন, আত্মহারা হ'য়ে গেলেন। তাঁরা সকল ছেড়ে সেই নিত্য ধনকেই সার করলেন।

আর একজন ভক্ত বললেন "Taste and see how sweet the Lord is!" পারি কি অন্তরের সঙ্গে বলতে ঈশ্বর কেমন মিষ্ট? এক এক দিন হয়তো, দয়ালের দয়া গুণে একটু তাঁর স্পর্শ পেয়ে কৃতার্থ হ'লাম। কিন্তু সব সময়তো সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসে না। এমন ক'রে তো তাঁকে পাওয়া হ'ল না, যাহাতে সকল তিক্ততা ঘুচে গিয়ে জীবন মধুময় হ'য়ে যায়। কি মধু আস্বাদন ক'রে ভক্ত অশ্বিনীকুমার গেয়েছিলেন—

"শুনিতে শুনিতে, গলিতে গলিতে, প্রাণ মধু হ'য়ে যায়;"
"তখন সকলি মধু তুমিও মধু, আমিও মধু,
তখন বাক্য মধু, চিন্তা মধু, সকলি মধু।"

বাল্যকালে দেখিয়াছি, একজন সরল ব্রহ্মোপাসক স্বহস্তে খোল বাজাইয়া গান করিতেন, "পান কর আর দান কর রে।" এই গান করিতে করিতে তিনি নিজে মাতিয়া উঠিতেন, অপর সকলকেও মাতাইতেন। কবে আমরা তেমন হ'য়ে পান করিতে ও দান করিতে পারিব? সঙ্গীতে আছে "সুচতুর সেই সাধু, প্রাণ বিনিময়ে, লভেন তোমার প্রেম দীন দাস হ'য়ে।" ব্রহ্ম যাঁর নিকট যথার্থই মিষ্ট হয়েছেন, তিনি তো তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তাই দেখা গেল এই ব্রাহ্মসমাজে একজন সংসারের হিসাবে দরিদ্র ব্যক্তি পুত্রকে ধনোপার্জ্জনে মনোযোগী দেখিয়া বলিলেন, "টাকা, টাকা ক'রে প্রাণটা দেও, তাহা চাই না, ঈশ্বরের জন্য প্রাণটা দেও, এই চাই।" কোন্ পিতা পুত্রকে এমন কথা বলেন? যার নিকট ঈশ্বর যথার্থই মিষ্ট হয়েছেন, যিনি বলতে পারেন প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।" আমরা কি বলতে পারি? গুরু চরণ ২০ বৎসরে প্রথম ভাগ শেষ করতে পারে নাই। আমি দেখতেছি সঙ্গীতের যে পদটী ৫০ বৎসর পূর্ব্বে শুনেছিলাম তাহাও ভাল ক'রে আয়ত্ত করা হ'ল না। মূলধন পাওয়া যায় নাই তাহাতো বলতে পারা যায় না। কিন্তু মূলধনকে যেমন করে খাটাতে হয়, সেটীর অভাব। তাই দারিদ্র্য ঘুচতে চায় না। উপরে যে সঙ্গীতটীর কথা উল্লেখ ক'রেছি, তাহার আর একটী পদ এই—"বিষম সঙ্কটকালে দয়াময় ব'লে ডাকিলে, ভয় তাপ যায় চ'লে দুঃখ হয় অবসান।" মা বুঝিয়ে দিলেন যে ঈশ্বর দয়াময়, বিপদে প'ড়ে তাঁকে ডাকলে দুঃখ দূর হয়। এ কথাটী শুনে বড় ভাল লাগল। মনে হ'ল, এ বেশ কথা। যে কোন বিপদে পড়ব, দয়াময় ব'লে ডাকব, আর বিপদ কেটে যাবে। এ তো বেশ সঙ্কেত পাওয়া গেল। ইহার অল্পদিন পর, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘাসের উপর খেলতে খেলতে একটী ক্ষুদ্র দু-আনি হারিয়ে গেল। ঘোর বিপদ! মা'র নিকট হইতে চাহিয়া দু-আনিটী লইয়াছিলাম। কত ক'রে কোমরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। সেটীকে হারিয়ে বড়ই ম্রিয়মাণ হইলাম। অমনি মনে মনে "দয়াময়" "দয়াময়" ডাকতে লাগলাম। আর অবশ্য সেই সঙ্গে সঙ্গে খুঁজিতে ছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে দু-আনিটী পাওয়া গেল।

আর আনন্দের সীমা নাই। মাকে গিয়া ছুটিয়া বলিলাম "মা, তোমার সঙ্গীতের কথা ঠিক। দয়াময় ব'লে ডাকতে ডাকতে আমার হারাণ ডু-আনিটী পাওয়া গিয়াছে।" মনের মধ্যে একটা ছাপ প'ড়ে গেল। সেই হ'ল হাতে খড়ি। সেই হ'ল মূলধন। কিন্তু তারপর ৫০ বৎসর চ'লে গেল। সেই গুরুচরণের অবস্থা। আজও তো ডাকতে শেখা হ'ল না। এ জীবনে কতবার দেখলাম, তাঁকে ডাকলে সব পাওয়া যায়, যত হারাণ ধন সব পাওয়া যায়, কিন্তু তবুও তো আজও ডাকতে শিখলাম না। সেই বাল্যকালে সাধু দ্বারকা নাথ সেনের মুখে সর্ব্বদাই শুনতাম "প্রার্থনা কর" "প্রার্থনা কর।" তখন মনে হ'ত একই পুরাতন কথা। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এখনও তাহা ভাল ক'রে শেখা হ'ল না। বাইবেলের New Testament খানা বাল্যকালেই পড়া গিয়াছিল। মহর্ষি ঈশার উক্তি "Ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you" পড়তে বড় ভাল লাগত। পড়তে পড়তে প্রাণে এক আনন্দরচনায় আশার সঞ্চার হইত। গুরুচরণ যেমন ক'রে 'ক' আর 'র' "কর" মুখস্থ করত, আমিও তেমনি ক'রে এই সব উক্তি মুখস্থ করতাম। জীবনেও কতবার দেখেছি, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি যে এই সকল উক্তি সত্য। কিন্তু আজও তো চাহিতে শিখলাম না, ডাকতে শিখলাম না। ডাকলে যে পাওয়া যায়, চাইলে যে পাওয়া যায়, তা তো বুঝতে বাকী নাই। কিন্তু ডাকতে ও চাইতে শেখা যে আজও হ'ল না! মূলধন পেয়েও খাটাবার অভাবে দৈন্য ঘুচিল না। তাইতো উৎসবে বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে আসতে হয়েছে।

বিষাদের কারণ রয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ স্মরণ করি 'দয়াময়' নামের মহিমা। স্মরণ করি যে 'দয়াময়' ব'লে ডাকলে সকল দুঃখ দূর হয়। এই উৎসবে যার যে দুঃখের কথা, অভাবের কথা, দৈন্যের কথা, সেই দয়াময়কে জানাই। যাকে ডাকলে সকল দুঃখের অবসান হয় তাঁকে ডাকি। আজ স্মরণ করি সেই গুরুচরণের অধ্যবসায় ও অনুরাগের কথা। সেই সাহস্ফূর্ত্তা ও অনুরাগ লইয়া দয়াময়ের চরণে প'ড়ে থাকি। উৎসব অনেক এসেছে, কত আশা, কত আনন্দ, কত সংকল্প জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাহা ধরিয়া রাখা যায় নাই। তাই জীবনের দৈন্য দূর হয় নাই। কিন্তু তথাপি আমরা নিরাশ হইব না। "দয়াময়" "দয়াময়" ব'লে যেন ডাকতে পারি। ডাকতে ছাড়ব না, চাইতে ছাড়ব না। শিশু যেমন শক্ত ক'রে মায়ের অঞ্চল ধরে, আমরা যেন তেমনি ক'রে মাকে জড়িয়ে ধ'রে থাকতে পারি, মনে যেন রাখতে পারি আমাদের গ্রহণ করিবার জন্য তাঁর প্রেমবাহু প্রসারিত রহিয়াছে।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "রোগ ও তাহার প্রতীকার" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৩রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) বুধবার— প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অনুরোধে শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মের সাধ্যবস্তু ও সাধন সম্বন্ধে জানিবার জন্য রায় রামানন্দের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রামানন্দ বলিলেন বিষ্ণু-ভক্তিই সার এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই ভক্তি লাভ করা যায়। চৈতন্য তখন বলিলেন—এহ বাহ্য আগে কহ আর। ইহা ত বাহিরের কথা অন্তরঙ্গ সাধনের কথা কি? রায় রামানন্দ মনে করিলেন যে চৈতন্য মহাজ্ঞানী, সাধনে জ্ঞানের স্থান না দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তখন রামানন্দ বলিলেন—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও ভক্তগণের অবিরত সঙ্গই সার। ইহাতেও চৈতন্য বলিলেন—ইহা বাহিরের কথা, ইহার পরের কথা কি? তখন রামানন্দ প্রেম ভক্তি এবং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি প্রেমসাধনের ধারার বিষয় উল্লেখ করিলেন। চৈতন্য তখন দেখাইলেন যে দাস্য ও বাৎসল্য ভাব সাধনায় সংকোচ ও দূরত্ব থাকিয়া যায়, সখ্যভাবেও সমতা ও সকল ভাব পরিস্ফুট হয় না, মাধুর্য্য ভাবেও অভাব ও ব্যবধান থাকে। তখন রামানন্দ বলিলেন যে প্রেমের সার মহাভাব। মহাভাবই সাধ্যবস্তু, ইহার পর উচ্চ সাধন আর নাই।

ঈশ্বরের চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, ঈশ্বরে পরাভক্তি ও বিশ্বে প্রেম ব্যাপ্ত করিয়া যে জীবনরস স্ফুরিত হইয়া উঠে উহাই মহাভাব। মহাভাবে আত্মভাব লোপ পায় এবং কেবল পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হইতে থাকে। গীতাকার ইহাকে অন্য ভাষায় বলিয়াছেন—ব্রহ্মে স্থিতি।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। ২।৭২
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্-পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি। ২।৭১

এই শ্লোকে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত জীবন কিরূপ হইবে তাহার আদর্শ গীতায় বলা হইয়াছে।

মহাভাবের ভাবুক হইলে, ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে, মানুষ নিস্পৃহ অর্থাৎ স্বার্থপ্রণোদিত কামনা বাসনাশূন্য, নির্ম্মম অর্থাৎ মায়া মমতাবিহীন আসক্তিশূন্য, ও নিরহঙ্কার অর্থাৎ আত্মশক্তির অহংকারবির্জ্জিত ঈশ্বরের শক্তিতে নির্ভরশীল হইয়া উঠে। কিরূপে মানবজীবন ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইবে, কি উপায়ে জীবনে মহাভাব ফুটিয়া উঠিবে, নিত্য তাঁর রূপ দেখব ও তাঁর স্পর্শ অনুভব করব? যাঁহাদের জীবন ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাঁহাদের জীবনে দেখা যায় যে তাঁহারা প্রথমে ঈশ্বরের রূপ বা প্রকাশ দেখেছিলেন। এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের রূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হলেন। শ্মশানে ভগবানের যে রূপ মহর্ষি দেখলেন তাহাতে মগ্ন হইবার জন্য তিনি আজীবন সাধনা করিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তখন হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সংসারের অভাব তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকায় তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিজেকে অর্পণ করিতে না পারায় অন্তরে সংগ্রাম করিতেছিলেন। একদিন অপরাহ্নে স্কুল হইতে প্রত্যা-

বর্ত্তনকালে দেখিলেন যে তাঁহার শিশু কন্যা দেয়ালে ভর দিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়াছে এবং শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এই দৃশ্যে শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকট ভগবানের যে রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার উপর নির্ভর করিলে কোন ভাবনা থাকে না। রূপের অন্তরালে সৌরভ থাকে। যে সকল মক্ষিকা পুষ্পের উজ্জ্বল বর্ণে আকৃষ্ট হয় না, তাহারা সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যে মানবজীবন রূপ বা আদর্শের সন্ধানে রত থাকে তাহারা সৌরভ অনুভব করে। রূপ আদর্শ জাগায়, সৌরভ আশা আনন্দ দেয়, মত্ততা আনে, প্রাণকে উদ্দীপ্ত ও জাগ্রত করে। পূর্ণ আদর্শের মধ্যে যখন নিজেকে অর্পণ করা যায় তখন সৌরভ অনুভূত হয়, ব্রহ্মের সহিত যোগে যুক্ত হওয়া যায়। যোগ যখন গাঢ় হয়, সান্ত মানবের সহিত অনন্তের মিলনে রসের উৎপত্তি হয়। পরমাত্মার সহিত যোগানন্দরসে দৃষ্টি অন্য রকম হয়, ভাব ও অনুভূতি খুলে যায়। তখন সাধক দেখেন তিনিই সব, তাঁহাতেই সব। জীবন-রস কিরূপ তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাসের জীবনে দেখিয়াছি। গীতায় যেমন বলা হইয়াছে নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার—ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মসমাজের নবদ্বীপচন্দ্র দাস। শতবার্ষিক উৎসবে আমাদের জীবন ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হউক, তাঁর রূপ দেখি, তাঁর স্পর্শ লাভ করি, তাঁর সৌরভে নিজেদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করি, জীবনকে ধন্য করি।

সায়ংকালে মহিলাদের কার্য্য সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা। লেডি অবলা বসু সভানেত্রীর কার্য্য করেন। মিসেস সাউথওয়ার্থ ও মিসেস্ ড্রামণ্ড বক্তৃতা এবং শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রবন্ধ পাঠ করেন। এবং মিসেস কামিনী রায় ধন্যবাদ প্রদান করিতে উঠিয়া কিছু বলেন।

৪ঠা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—
প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশিত হইবে:—

সায়ংকালে তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে ডাক্তার এফ্ সি সাউথওয়ার্থ 'যিশু ও বুদ্ধ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৫ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) শুক্রবার—
প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি বলিয়াছেন—'স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়'। লোকসকলের ভঙ্গনিবারণের জন্য ব্রহ্ম সেতুস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। সেতু শব্দটির দুই বিভিন্ন অর্থ। সেতু দুই বিচ্ছিন্ন পদার্থকে এক করে—যেমন নদীর উপরের সাঁকো দুই বিচ্ছিন্ন ভূমিখণ্ডের একত্ব সম্পাদন করে। ব্রহ্ম জগতের পদার্থনিচয়কে একত্র করিয়া এই সুশৃঙ্খল ধারায় (cosmos) জন্ম দিয়াছেন। নতুবা কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্বন্ধ থাকিত না, যেমন বায়ুমণ্ডল না থাকিলে কাহারও কথা কেহ শুনিতে পাইত না এবং সমষ্টিবদ্ধ জীবন সম্ভবপর হইত না। সেতুর অন্য অর্থ ইহার বিপরীত—যাহা পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, যেমন ক্ষেত্রের 'আইল'। আইল তুলিয়া লও, এক ক্ষেত্র অন্য ক্ষেত্রের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে—মানুষ এই ব্যক্তিত্ব হারাইলে সমষ্টি জীবন সম্ভবপর হয় না। সমাজ অর্থই ব্যক্তির সমষ্টি—ব্যক্তিত্ব না থাকিলে সমষ্টি হইবে কি লইয়া? আমার ব্যক্তিত্ব যে আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গুলাইয়া যায় না তার কারণ ব্রহ্ম সেতুস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন, আমাদিগের ব্যক্তিত্বকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন—মা যেমন প্রত্যেক সন্তানের বিশেষ খাদ্য ও পরিচ্ছদাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাখেন; নতুবা পরস্পরের মধ্যে বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে একত্ব তিনিই রক্ষা করিতেছেন, তাই সৃষ্টি চলিতেছে এবং সমষ্টিগত জীবন সম্ভবপর হইতেছে। সমষ্টি ব্যষ্টির সমাবেশ হইলেও একটা যোগসূত্র চাই; এই যোগসূত্র ব্রহ্ম স্বয়ং। তাঁর অনিমেষ দৃষ্টি কেমন জাগ্রত ভাবে আমাদের প্রতিজনের উপর রহিয়াছে তাহার পরিচয় এইখানে পাওয়া যাইতেছে। আমরা সকলে তাঁরই মধ্যে আছি, তবুও খণ্ডাকাশসকল মহাকাশে বিলীন হইয়া যাই না কেন? জাগ্রত অবস্থায় না হয় ভাবিলাম আমার আমিত্বের রেখা আমাকে আর সকল হইতে স্বতন্ত্র রাখিতেছে, আমার জাগ্রত (conscious) আমিত্ব যে আমার 'আমি'র এক নগণ্য অংশ মাত্র তা না হয় এখানে উল্লেখ নাই করিলাম। কিন্তু সুষুপ্তিতে অবস্থা কি দাঁড়ায়? ঋষি বলেন "স যথা সোম্য বয়াংসি বাসো বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ-সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে। পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ" ইত্যাদি। প্রশ্ন ৪.৭,৮ জীব বলিতে যা কিছু বুঝি তা সবই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে আমরা পরস্পরের মধ্যে গুলিয়ে যাই না কেন? মায়ের সচকিত দৃষ্টিতে যেমন সন্তানদের বিশিষ্টতা রক্ষা পায়। ব্রহ্মের চির জাগ্রত প্রেম-দৃষ্টিই তেমনি আমাদিগের ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করে। তিনিই দিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করিয়াছেন—অনন্তকাল রক্ষা করিবেন। এইখানেই আমাদের অমৃতত্বের আশা ও দাবী। প্রেমের উপর দাবী চলে। অবান্তর হইলেও কথাটা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

আমাদের ভরসা এই প্রেমস্বরূপ, এই শিবস্বরূপের উপর। তিনি সত্যং শিবং সুন্দরং। সত্যস্বরূপের স্পষ্ট ধারণা না হইলে শিবসুন্দরকে গ্রহণ করা যায় না। ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বিতীয় সত্তা, এ জ্ঞান ভারতীয় ব্রহ্মবাদেরই বিশেষত্ব। এখানে যেমন তাঁর অনন্তত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, পূর্ণত্ব, পরিস্ফুটরূপে স্বীকৃত, এমন আর কোথায়ও নয়। যদি অন্য কিছুর অস্তিত্ব ঘুণাক্ষরেও স্বীকৃত হয়, তবে অনন্তত্ব পূর্ণত্ব ব্যাহত হইল। ইহুদী ধর্ম্মে এবং আদিতঃ উক্ত ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত খৃষ্টীয় ও ইস্লাম ধর্ম্মে আরও একটা কিছুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় (The Evil one), যাহা মানুষকে ভগবানের নিকট হইতে দূরে লইয়া যায়। সেই জন্য ভগবানকে পূর্ণ মঙ্গলরূপে ধরার বাধা জন্মে। মানুষ ঋষির সঙ্গে কখনও মনে করিতে পারে না, সে একদিন

ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হবে। শেষ দিনে স্বর্গে যাব কি নরকে যাব তার নিশ্চয়তা শেষ পর্য্যন্ত হয় না! উহা চিরদিন ভয়ের ধর্ম্মই থাকিয়া যায়, ভক্তির ধর্ম্মে পরিণত হয় না। মঙ্গলের রুদ্র রূপই চক্ষে পড়ে, তাঁর শিবরূপ চক্ষের অগোচরেই থাকিয়া যায়, অথচ পূর্ণ শিবস্বরূপ প্রকাশিত না হইলে ভক্তির অঙ্কুর উদ্ভূত হইতে পারে না। ভগবান্ সর্ব্বদাই দণ্ডধর, যেমন রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জায় যীশুর মূর্ত্তি—মূর্ত্তি না বানাইলেও ভাবে প্রোটেষ্টাণ্টেরাও দণ্ডধরেরই উপাসক। দণ্ডধর ভয় উৎপন্ন করেন, ভক্তি আকর্ষণ করেন না। সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে অগ্রসর—কখন বা সয়তানের বেড়াজালে পড়িয়া যাই—সেই মন্ত্র তন্ত্র পূজা পদ্ধতি যেমন বাড়িয়া যায়, ভগবদারাধনার দিকে তেমন মন যায় না। Orthodox খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে ভগবানের আরাধনা, ভগবানের জন্য ভগবানকে সম্ভোগ করিবার ভাব, তেমন ফুটে নাই, সুতরাং ভক্তিও গজায় নাই। খৃষ্টীয় mystic বা মুসলমান সুফিদিগের মধ্যে যে ফুটিয়াছে তাহার কারণ তাঁরা orthodox পন্থা মানেন নাই, সুতরাং নানা প্রকারে অত্যাচারিত হইয়াছেন—ভক্তির পথ অন্বেষণ করিতে যাইয়া আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছেন।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহাই উদার শিবসুন্দরের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। এ জগৎ ব্রহ্মময়। ব্যক্তিগত জীবনের সকল ঘটনা, পারিবারিক জীবনের সকল সম্বন্ধ, সামাজিক জীবনের সকল অবস্থা—সকলই ব্রহ্মের লীলা। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর ভাব সকল অন্বেষণ করিবার জন্য আমাকে বৃন্দাবন, জুডিয়া, আরবের মরুভূমিতে ছুটিতে হইবে না—তিনি এখনই, এখানেই, এই সকল লীলায় প্রকট হইতেছেন। চক্ষু খুলিলেই দেখিতে পাইবে। চক্ষুটি খোলা চাই। নতুবা পুরাণ ইতিহাস ঘাঁটিয়া কোন লাভ নাই। ইতিহাসের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে যখন সন্দেহ আসিবে—এবং সে সন্দেহ দিন দিনই গাঢ়তর হইতেছে—তখন রসের জায়গায় আসিবে মরুভূময় শুষ্কতা। আমার জীবনই ভগবানের লীলাক্ষেত্র—নানা ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া তিনি আমার সঙ্গে লীলা করিতেছেন—আমার জীবনের আদি অন্ত মধ্য সকলই তাঁহার লীলা-ক্ষেত্র, এখানে আর কিছুর স্থান নাই; আমার ভুল ভ্রান্তি সকলের মধ্য দিয়াও তিনিই আমাকে তাঁহার কোলে টানিয়া লইতেছেন; কেবল "একজন সরস রসাল লইয়া যতনে দিতেছে আর সবারে" নয়, কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গেই সকল উপভোগ করিতেছি—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (তৈত্তি, ২।১)—কেবল মিষ্ট রস নয় তিক্ত রসও। মনে পড়ে সে দিনের কথা যেদিন রুগ্ন সন্তানকে কুইনাইন খাওয়াইবার জন্য মা একটু মুখে দিয়া বলিলেন, তিক্ত নয়, খা—এইরূপে ব্রহ্মকে সর্ব্ববিষয়ে সাধের সাথী জানিয়া অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেবল মাত্র এই দৃষ্টিই মানুষকে ভক্তির পথে আনিতে পারে, অন্য উপায় নাই।

সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ "ভক্তি-সাধন—বৈদিক পৌরাণিক ও আধুনিক" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৬ ইমাঘ (১৯শে জানুয়ারী) শনিবার— অদ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু দিন। প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করা যায়। তাঁহার কথা ভাবিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার কথা মনে আসে। যাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবল, তাঁহার সকল কার্য্যে সংযম শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে শ্রদ্ধার এই সকল ফল উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রদ্ধার আর একটি ফল, অবকাশসৃষ্টি। একজন সঙ্গতিশালী ইংরেজ যখন নিজের জন্য বাড়ী তৈয়ারী করে, তখন সে বাড়ীর চারিদিকে প্রাঙ্গণ বাগান প্রভৃতির জন্য প্রশস্ত স্থান রাখে। সে সবটা স্থানকে নিঃশেষে কর্ম্মস্থানরূপে ব্যবহার করে না। কারণ, সে নিজ অন্তরের পত্নীপ্রেম, সন্তানস্নেহ, প্রভৃতি ভাবকে শ্রদ্ধা করে। সে-সকলের চর্চ্চার জন্য যথেষ্ট অবকাশ এবং যথেষ্ট অবসর সে রাখিতে চায়। কিন্তু একজন ধনী মাড়োয়ারী যখন বাড়ী করে, সে ফুটপাথের গা ঘেঁষিয়াই বাড়ীর ভিত্তি তোলে। কারণ, তাহার জীবনযাত্রায় শ্রদ্ধার বস্তু প্রায় কিছু সে দেখিতে পায় না। প্রয়োজনসাধনের জন্য অবকাশ না হইলেও চলে, শ্রদ্ধাই অবকাশ অন্বেষণ করে।

আমাদের এই মন্দিরের আশেপাশে যত অল্প ব্যবধান রাখিয়া আমরা বাড়ীর উপর বাড়ী তুলতেছি, তাহার মধ্যে আমি যেন এই শ্রদ্ধার পরিচয় দেখিতে পাই না।

মহর্ষি যখন তাঁহার পার্কষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিতেন, তখন আমরা মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। দেখিতাম, তিনি তাঁহার ঘরটিতে একা বসিয়া আছেন। দরজায় প্রহরী দণ্ডায়মান, যেন কেহ আসিয়া হঠাৎ তাঁহার নির্জ্জনতা ভঙ্গ না করে। সম্মুখে শ্বেত পাথরের ক্ষুদ্র একটি টেবিল, তাহাতে কয়েকটি শ্বেত পদ্ম ও তাঁহার ঘড়ি। ঘরে আর কোন বস্তু নাই; দেয়ালেও কিছু নাই। প্রশস্ত ঘরখানির মাঝখানে তিনি বসিয়া আছেন, চারিদিককার আসবাবহীন অবকাশ যেন শূন্য নয়, তাহা যেন ব্রহ্মের প্রভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে অনেকখানি স্থানের মধ্যে সংসারের প্রবেশাধিকার রহিত,—এইভাবে নিজের চারিদিকে একটি অবকাশ সৃষ্টি করিয়া লইয়া মহর্ষিদেব তাহার মধ্যে বাস করিতে ভালবাসিতেন।

তাঁহাকে সংসারের কাজও করিতে হইত। হিসাবপত্র দেখিতে হইত, বিষয় বিভাগ সম্বন্ধে আত্মীয়গণের বিবাদনিষ্পত্তিও করিতে হইত। তিনি কি প্রণালীতে এই সমুদয় কাজ করিতেন? আগে সংসারকে সরাইয়া দিয়া, দেহ মনের চারিদিকে প্রশস্ত অবকাশ সৃষ্টি করিয়া লইয়া, ব্রহ্মে মগ্ন হইয়া, ব্রহ্ম-সহবাসের অবস্থায় এই সমুদয় কাজ করিতেন।

যাঁহারা কোনও গ্রামের পুকুরে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারা কোন কোন সময়ে দেখিয়া থাকিবেন যে, স্নানার্থীকে পুকুরের জলে ভাসমান পানা দুই হাতে সরাইয়া দিয়া, নিজের চারিদিকে প্রশস্ত অবকাশ সৃষ্টি করিয়া লইয়া, তারপর ডুব দিতে হয়।

এতখানি স্থান পরিষ্কার করিয়া লইতে হয় যে, যেন ডুবিয়া থাকিবার সময়টুকুর মধ্যে, অথবা মাথা তুলিবার সময়ে, পানা আসিয়া গায়ে না ঠেকে। প্রকৃত ব্রহ্মসাধকও তাহাই করেন। সংসারকে দেশে, কালে, ও মনে একটু ঠেলিয়া দিয়া, একটু দূরে সরাইয়া রাখিয়া, ডুবিবার অবকাশ সৃষ্টি করিয়া লন। আমরা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপাসনায় বসি, এবং তার পরেই আবার উঠিয়া ছুট্ দি। ইহাতে প্রকাশ পায় যে উপাসনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নাই।

আজকাল দ্রুত কাজের ও দ্রুত পাঠের যুগ। সেলাইয়ের কল হইয়াছে, লিখিবার কল হইয়াছে। আজকাল প্রায় সকল গ্রন্থেরই চুম্বক মুদ্রিত হইয়া যায়। সংবাদপত্রের স্তম্ভশীর্ষে স্থূল অক্ষর কয়টির উপর দিয়া চক্ষু বুলাইয়া গেলেই এক পলকে পৃথিবীর সব সংবাদ জানা যায়। কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গ তো এমন করিয়া লাভ করা যায় না। মানুষ খুব চেষ্টা করিলে না-হয় চিন্তাকে দৌড় করাইতে পারে। কিন্তু একজন পুরুষের সঙ্গ-রসে মন প্রাণ নিমগ্ন করার কাজটি,—এমন করিয়া মগ্ন করা যে চিন্তা ভাব কামনা মেজাজ সব তাহাতে অভিষিক্ত হইয়া যায়, দেহ ও আত্মার অস্থি মজ্জা পর্যন্ত তাহাতে রসিয়া যায়,—এ কাজটি কি ঐ প্রকারে সম্ভব হয়? প্রকৃত ব্রহ্মসাধককে সর্ব্বদাই অবকাশ সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়।

জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ কাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে কালের অবকাশ গ্রহণ করিতেন। তিনি সম্ভবতঃ ১৮৩৭ সালে উপনিষদ্ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এগারো বৎসর পাঠ করিবার পরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৪৮ সালে ঐ গ্রন্থের প্রথম ভাগের মন্ত্রগুলি একত্রিত হয়। ইহার পর আরও এগারো বৎসরে ১৮৫৯ সালে তিনি এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত করেন। ইহার ব্যাখ্যা অনুবাদ ও তাৎপর্য্যের প্রত্যেকটি বাক্যের উপরে, তাঁহার সুদীর্ঘ কালের শ্রদ্ধাপূর্ণ সযত্ন চিন্তার ও বিবেচনার চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে।

উপনিষদের এক একটি বচনকে তিনি অগ্রে বহু বৎসর নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, ও নিজ চিন্তায় আলোড়ন করিয়াছেন; তৎপরে তিনি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কত বচনে যেন মহর্ষির গায়ের উত্তাপ আমরা অনুভব করিতে পারি। অনেকক্ষণ একটি রত্নমালা নিজ কণ্ঠে ধারণ করিয়া যদি কেহ তাহা বন্ধুর কণ্ঠে পরাইয়া দেয়, বন্ধু বলেন, "তুমি সারাদিন এটিকে এমন ক'রে প'রেছ যে তোমার গায়ের তাপ এতে আমি অনুভব ক'রতে পারছি।" আমরা যখন 'পিতা নোঽসি' মন্ত্রটি পাঠ করি, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি' মন্ত্রটি কণ্ঠে ধারণ করি, তখন যেন তাহাতে মহর্ষির অঙ্গের উত্তাপ অনুভব করিতে পারি। কত সুদীর্ঘ বৎসর উপনিষদের এক একটি মন্ত্রকে নিজ কণ্ঠে ধারণ করিয়া তার পরে তিনি তাহা ব্রাহ্মদিগের গলায় পরাইয়া দিয়াছেন। 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব,' এবং 'ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্' এই দুটি মহাবাক্য মহর্ষির নিজের রচিত। নিজ হৃদয়ে বহু বৎসর ধারণ করিয়া, নিজ সাধনায় উত্তাপের গূঢ় শক্তি ইহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, ব্রাহ্মদিগের গলে তিনি এই দুই রত্নমালা পরাইয়া দিয়াছেন।

বলিতে কি, মহর্ষির জীবনে 'সাধন।' কথার অর্থই যেন এক একটি সত্যকে বহু বৎসর ধরিয়া অন্তরে আলোড়িত করা; এক একটি সত্যের চারিদিকে বহু বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা দিক হইতে তাহাকে দর্শন করা; এক একটি সত্যকে বহু বৎসর ধরিয়া নিজ অধ্যয়নের ও নিজ জীবনের অনুভূতির সহিত জড়িত করা। 'সত্যম্' এই মন্ত্র বলিতে বলিতে তাঁহার মাথার চুল দাঁড়াইয়া উঠিত। কেন এরূপ হইত? তিনি অন্তরে বহু বৎসর এই মন্ত্রকে নিজ চিন্তায় আলোড়ন করিয়াছিলেন, তিনি নানাদিক হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই মন্ত্রকে দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তিনি নিজের সকল অধ্যয়নের সহিত এই মন্ত্রকে জড়িত করিয়াছিলেন।

তাঁহার তিনটি প্রিয় অধ্যয়নের বিষয় ছিল উপনিষদ্, জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ববিদ্যা। উপনিষদ্ বলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা। ব্রহ্মই দেশের দেশ,—'এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ'। ব্রহ্মই কালের কাল, 'জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিৎ যঃ'। মহর্ষির সত্যম্-সাধনায় উপনিষদের এই সকল তত্ত্ব জড়িত হইয়াছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্র বলেন, কোটি কোটি যোজন দূরবর্ত্তী নক্ষত্রে, সুদূরতম নীহারিকায়, সেই একেরই সৃষ্টি, একেরই লীলা। মহর্ষি নিজ সত্যম্-সাধনায় এই তত্ত্বকেও জড়িত করিয়া লইয়াছিলেন। ভূতত্ত্ব-বিদ্যা বলেন, কোটি কোটি যুগ ধরিয়া পৃথিবীতে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কত নব নব ভূধরের ও সাগরের অভ্যুদয় ও বিলয় হইয়াছে। এই দুরবগাহ কাল-সাগরের সকল ঘটনার নিয়ামক সেই এক পরব্রহ্ম। মহর্ষি মনশ্চক্ষে সেই দুরবগাহ অতীতের চিত্রসকল দর্শন করিয়া নিজ সত্যম্-সাধনার সহিত তাহাকেও জড়িত করিয়া লইয়াছিলেন। তাই তাঁহার চুল দাঁড়াইয়া উঠিত।

মহর্ষিদেবের ধর্ম্মসাধনায় যে এইরূপ সুবিস্তৃত কালের অবকাশ থাকিত, তাহার একটি ফল, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রথম ভাগের কতকগুলি মিশ্র বচন। আমি তন্মধ্যে তিনটি মাত্র বচনের উল্লেখ করিতেছি। (১) 'অসতোমাসদ্গময়' ইত্যাদি প্রার্থনাটি। (২) "শৃণ্বন্তু বিশ্বে" হইতে আরম্ভ করিয়া 'নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' পর্য্যন্ত বচনটি। (৩) 'যশ্চায়মস্মিন্নাকাশেতেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ' ইত্যাদি বচনটি। ইহার কোনটিই উপনিষদে এই আকারে বর্ত্তমান নাই। নানা স্থান হইতে সংগৃহীত বচন-খণ্ড একত্রিত হইয়া এই বচনসকল প্রস্তুত হইয়াছে। কিরূপে তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ভূতত্ত্বের একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা হয়। একখণ্ড গ্রাণাইট প্রস্তর পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণীকৃত প্রস্তরকণায় রচিত। ভূগর্ভের উত্তাপ ও প্রবাহিত জলধারার বেগ, দীর্ঘ যুগে, পৃথিবীর আদিম শৈলমালা হইতে শিলাখণ্ডসকলকে খসাইয়াছে, আলোড়িত ও চূর্ণীকৃত করিয়াছে, আবার তাহাকে স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়াছে, ও জলমিশ্রিত নানা মসলার সংযোগে একত্র বাঁধিয়াছে। এইরূপে নূতন প্রস্তর রচিত হইয়াছে। এই নব-রচিত প্রস্তর কেমন সুদৃঢ় ও কেমন সুমসৃণ! তেমনই উপনিষদের আদিম তত্ত্বশৈলের খণ্ডসকল দেবেন্দ্রনাথের ব্যাকুলতার অনলে ও তাঁহার

সাধনার ধারায় পতিত হইয়া, দীর্ঘকাল তদ্দ্বারা আলোড়িত চূর্ণীকৃত ও সজ্জিত হইয়া, তাঁহার চিন্তার ও ভাবের মসলায় একত্র গ্রথিত হইয়া, প্রস্তরবৎ সুদৃঢ় ও সুমসৃণ নব নব বচনের আকার ধারণ করিয়াছে। এখন আর সে সকল বচনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করে, কাহার সাধ্য!

মহর্ষির অন্তরের প্রকৃতি এবং তাঁহার সাধনার প্রণালী উভয়ই এইরূপ শক্ত বাঁধুনির পক্ষে অনুকূল ছিল। আজকাল বাড়ী তৈয়ারী করিবার সময়ে লোকে তাড়াতাড়ি কাজ সারিবার দিকে দৃষ্টি রাখে, স্থায়িত্বের প্রতি তত দৃষ্টি রাখে না। আজকালকার মসলা ও প্রাচীন মসলায় কত তফাৎ! মহর্ষির প্রকৃতিতে ও সাধনার প্রণালীতে যেন ছিল সেই মসলা, যাহা দিয়া প্রকৃতিদেবী প্রস্তর রচনা করেন,—the slow cement of the ages that builds rocks; তাই এমন সুন্দর সুদৃঢ় মিশ্র বচনসকল দীর্ঘকালে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইয়া তাঁহার অন্তরে পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত ছিল। এবং তাই মহর্ষি "তিন ঘণ্টার মধ্যে সহজে, সতেজে," ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রথম ভাগ মুখে মুখে বলিয়া রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই তিন ঘণ্টার পশ্চাতে যে এগারোটি বৎসর আছে, ইহা যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের কাছে ঐ গ্রন্থ রচনা অলৌকিক ও অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন আলোচনা করিলে আর একটি চিন্তা আমার মনে উদিত হয়। ধর্ম্ম মানুষের মনকে যে যে প্রণালীতে অনুপ্রাণিত করেন, তাহার মধ্যে দুইটি পরস্পর হইতে বিভিন্ন। (১) ব্রহ্মের শাশ্বত প্রকাশের অনুপ্রাণন; (২) মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলার অনুপ্রাণন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবন প্রথম ধারায়, এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও তৎপরবর্ত্তী ব্রাহ্ম নেতাগণের ধর্ম্মজীবন অনেক পরিমাণে দ্বিতীয় ধারায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মের শাশ্বত প্রকাশ দর্শন করিবার দুই ক্ষেত্র। প্রথম বিশ্বপ্রকৃতি; এবং দ্বিতীয়, নানা সুখ দুঃখের ও ঈশ্বরের বিচিত্র করুণার লীলাভূমি, মানবের সাধারণ জীবন। আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মের শাশ্বত প্রকাশ অনুভব করিতেন। তাঁহারা এমন স্থানে বাস করিতে ভাল বাসিতেন, যেখানে চক্ষু খুলিলেই ব্রহ্মের এই শাশ্বত প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং চক্ষু মুদ্রিত করিলেও মনের সম্মুখে তাহার ছবি সহজে উদিত হয়। ব্রহ্মের যে শাশ্বত প্রকাশ তাঁহারা দর্শন করিতেন, আমরাও একবার চিন্তানেত্রে তাহা দর্শন করিতে প্রয়াসী হই।

হিমালয়ের অথবা তাহার পাদশৈলমালার ক্রোড়ে বাস করিয়া সেই ঋষিগণ দেখিতেন, উর্দ্ধেও জলের খেলা, নিম্নেও জলের খেলা। নদীসকল নিম্নের জল। সপ্তসিন্ধুকে অর্থাৎ সাতটি প্রবাহিত নদীকে তাঁহারা দেখিতেন, ও মনে মনে চিন্তা করিতেন। শ্বেত পর্ব্বতসকল হইতে কোন নদী পূর্ব্বগামিনী হইয়া, কোন নদী বা পশ্চিমগামিনী হইয়া উৎসারিত হইতেছে, 'প্রাচ্যোহন্যা নদ্যঃস্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহন্যাঃ,' ইহা তাঁহারা দেখিতেন। কৈলাস পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী যে স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্বদিকে ও সিন্ধু পশ্চিম দিকে ধাবিত হইতেছে, সেই স্থানের সুগম্ভীর দৃশ্য দেখিতে এখনও কত পরিব্রাজক গমন করিয়া থাকেন। এ যুগে Sven Hedin তথায় গমন করিয়া তাহার চমৎকার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নের এই জলসকলকে ঋষিরা কখনও বা চক্ষে দেখিতেন, কখনও বা ব্রহ্মচিন্তার সময় মনে মনে ভাবিতেন। মেঘসকল ছিল তাঁহাদের উর্দ্ধের জল। মেঘ দেখিতে ঋষিরা বড়ই ভাল বাসিতেন। ঋগ্বেদ মেঘের বর্ণনায় পরিপূর্ণ বলিলেই হয়। আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ সজ্জিত হয়। এক এক সময়ে সমগ্র আকাশ মেঘের সাগরে পরিণত হয়। এই মেঘসাগরের নাম ছিল, "সমুদ্র অর্ণব"। আবার কখনও বা আকাশের এক প্রান্তে অনেকগুলি কালো মেঘ দেখা দেয়। পর্ব্বতের মত তাহারা ঢালু হইয়া আকাশের গায়ে সংলগ্ন, তাই তাহাদের নাম "পর্ব্বত"। মরুতেরা তাহাদিগকে আকাশের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যায়। ঋগ্বেদের মন্ত্রে আছে, 'য ঈংখয়ন্তে পর্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবম্।' এত রকমের জল সব সময়ে ঋষিদের মনে থাকিত, তাই তখন হইতেই অপ্ শব্দ বহুবচনান্ত। তাই ঋষি গাহিয়াছেন, "যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু।" সূর্য্য একটি সুন্দর পাখীর মত আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে সূর্য্য সেই মেঘসমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুকাচুরি খেলে। আপনি লুকাইয়া থাকিয়াও সে বিশ্বভুবনকে দেখিতে পায়,—'একঃসুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিবেশ, স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে' উপরের সেই মেঘসমুদ্র হইতে বারিবর্ষণই ছিল ঋষিদের নিকটে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘটনা। বর্ষা দেখিয়াই তাঁহারা সংবৎসর গণনা করিতেন। তাঁহাদের ভাষায়, 'সমুদ্র-অর্ণব হইতেই সংবৎসরের জন্ম হইয়াছিল, 'সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো-ঽজায়ত'। বর্ষাকালে ওষধি সকল জন্মলাভ করে, বনস্পতিসকল সতেজ হইয়া উঠে। ঋষিদের দেখিবার বস্তু, ভাবিবার বস্তু, এই সকল ছিল।

ব্রহ্মের এই শাশ্বত প্রকাশের কাছে এদেশ ওদেশ নাই, এ জাতি ও জাতি নাই। ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, মহাজন মজুর, ইহাদের বৈষম্য নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘাত প্রতিঘাত, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নানারূপ সংঘাত, জাতিতে জাতিতে নানারূপ যুদ্ধ বিগ্রহ, এ সকলের দূরশ্রুত প্রতিধ্বনিও নাই। এ সকল ব্যাপার চক্ষের সম্মুখে ঘটিলেও, ধর্ম্মসাধনের সময়ে সাধকের মনোজগতে ছায়াপাত করিতে পায় না। ব্রহ্মের এই শাশ্বত প্রকাশের মধ্যে মানুষ আছে বটে, কিন্তু সে উন্নত জীব মাত্র। সে অন্যান্য জীব অপেক্ষা অনেক উচ্চে থাকিলেও, ব্রহ্মের মহিমার ও অনন্ততার কাছে মানবের গৌরব-জনিত পার্থক্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাহা দেখাই যায় না। দেখা যায় কেবল বিস্তীর্ণ বিশ্ব প্রকৃতি, যাহা ব্রহ্মের বিশাল প্রকাশ। দেখা যায় কেবল সেই প্রকাশেরই নব নব মূর্ত্তি। দেখা যায় কেবল ঋতুচক্রের আবর্ত্তন, "নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরাঃ" ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে, যাইতেছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও সেই প্রাচীন ঋষিদিগের মত হিমালয়ে

গিয়া মেঘের খেলা দেখিতে, বর্ষার উদয়ে বিলয়ে ঈশ্বরের জলযন্ত্রের ক্রিয়া দেখিতে, সংবৎসরের আবর্তনে সেই অকাল পুরুষের লীলা দেখিতে ভাল বাসিতেন। বিশ্বপ্রকৃতিতে ব্রহ্মের প্রকাশ দেখিয়া তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া যাওয়া, ইহা তাঁহার বড় প্রিয়কার্য্য ছিল। এই জন্য তিনি সূর্য্যোদয় দেখিতে এত ভাল বাসিতেন। এই জন্য কতদিন সারারাত্রি চাঁদ দেখিয়া, চাঁদের জ্যোৎস্না গায়ে মাখিয়া, চাঁদের সঙ্গে কথা কহিয়া কাটাইতেন। এই জন্য তিনি নৌকায় ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিতেন। ধীরে ধীরে নৌকা চলিত, তিনি নৌকার অগ্রভাগে বসিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি দুই পিপাসিত চক্ষু দিয়া পান করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেন।

প্রকৃতিতে ব্রহ্ম দর্শনের সঙ্গে, গৃহীর দৈনিক জীবনে, ব্রহ্মের করুণার অনুভূতিটি মহর্ষি যোগ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার দৈনিক পূজা আমাদের মত বাগ্‌বহুল ছিল না, অনুভূতিবহুল ছিল। কর্ত্তব্যে ঈশ্বরের আহ্বান অনুভব করিয়া, সুখ দুঃখে ঈশ্বরকে একমাত্র নির্ভরের স্থলরূপে দর্শন করিয়া, সংযত সন্তুষ্টচিত্ত নির্লোভ নিরহঙ্কার ও দ্রোহশূন্য জীবন যাপন করিয়া, তিনি আর একভাবে ব্রহ্মের শাশ্বত অনুপ্রাণনের আস্বাদনে স্বীয় জীবনকে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মজগতে অনুপ্রাণনের দ্বিতীয় ধারা মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা দর্শন হইতে নিঃসৃত হয়। বহু মানবের চিন্তা ও কার্য্য যখন একত্রে এক পথ ধরিয়া চলে, বিশেষতঃ যখন তাহারা একটি নব আদর্শের পতাকা ধারণ করিয়া মানুষের বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া চলে, তখন তাহার মধ্যে বিধাতার লীলা দর্শন করিয়া মানুষের মন অনুপ্রাণিত হয়। এই অনুপ্রাণনের পথে আমরা 'ধর্ম্মবিধানের' ভাবটি প্রাপ্ত হই। এই পথ ধরিয়া আমরা **আমাদের** দেশে, **আমাদের** জাতির ইতিবৃত্তে, **আমাদের** ধর্ম্মবিধানের সংগ্রামসকলে ঈশ্বরের নেতৃত্ব দর্শন করি। এই চিন্তার পথ ধরিয়াই মানুষ বলিয়াছে, "যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ"; ঈশ্বরের নাম দিয়াছে "God of Israel"; এই অনুপ্রাণন হৃদয়ে লইয়া আমরাও গাহিতেছি, "জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।"

মানুষের মন যখন মহৎ কর্ম্মের ও মহৎ ত্যাগের জন্য উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে হয়, দেশের অথবা ধর্ম্মের জন্য যখন মানুষের আত্মোৎসর্গ করিবার দিন আসে, তখন আমরা এই দ্বিতীয় অনুপ্রাণনধারার আশ্রয় গ্রহণ করি। দেশের বা সমাজের সঙ্কটসময়ে, জনসঙ্ঘকে মাতাইয়া তুলিবার অথবা নব পথে চালিত করিবার সময়ে, আমরা এই অনুপ্রাণন অন্বেষণ করি। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রভাববশতঃ, তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে, এই ভাবটি ব্রাহ্মসমাজকে সমাজসংস্কারের বিষম সংগ্রামের মধ্যে তেজ ও বীর্য্য প্রদান করিয়াছিল। এই অনুপ্রাণন যেমন ইতিহাস হইতে জন্ম লাভ করে, তেমনি ইহা নব ইতিহাস সৃষ্টিও করে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময়, সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল যুগটি ইহারই সৃষ্টি।

কিন্তু এই দ্বিতীয় ধারাটির বিষয়ে ভাবিবার কয়েকটি কথা আছে। প্রথমতঃ, মানুষের সঙ্গে যাহা কিছু জড়িত, মানুষের কাজের উপরে যাহা আংশিক রূপেও নির্ভর করে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে চঞ্চল ও অনিশ্চিত হইতে বাধ্য। যাঁহারা নিজ ধর্ম্মসাধনে এই ধারাটির উপরে অতিমাত্রায় নির্ভর করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনের সরসতা ও অনুপ্রাণন সকল সময়ে সমভাবে থাকে না। জনসমাজের অধিকাংশ লোক যদি অন্য পথ ধরে, অন্য কথা বলে, অথবা ব্রাহ্মসমাজেরই মানুষেরা যদি মনের মত হইয়া না চলে, তবে তাঁহাদের মনে বিষাদ ও নিরাশা উৎপন্ন হয়। এই সহজ উদ্দীপনা ও সহজ নিরাশার ছাপটি মহর্ষির পরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজে দেদীপ্যমান।

দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে কখনও বা আপনার অথবা আপনার স্বদলের মতামতের দ্বারা, কখনও বা অধিকাংশ মানুষের মনের গতির দ্বারা, ঈশ্বরের ইঙ্গিত ও ঈশ্বরের আদেশ নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে; এবং তদ্দ্বারা জনসমাজে কখনও কখনও ঘোর বিবাদ ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা হয়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

আজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মরণের দিনে আমার মনে হইতেছে যে, ব্রাহ্মসমাজের মানুষের মনের গতি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় প্রথম ধারাটি হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, ও দ্বিতীয় ধারাটি ঘেঁষিয়া চলিতেছে। তাহার ফলে, ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টি ও নির্ভর কখনও কখনও ভুল পথে চলিয়া যাইতেছে। আমরা নীরব ব্রহ্মসঙ্গ, দৈনিক জীবনে ঈশ্বরের আলোকে বসিয়া আত্মপরীক্ষা আত্মসংশোধন ও অনুতাপ, সরল প্রার্থনা কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতা, পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা, সমগ্র জীবনকে ব্রহ্মের সহিত মিলাইয়া লওয়া, এ সকল সাধনের দিকে তত মন দিতেছি না। কিন্তু নির্ভর করিতেছি, কেবল অনেকে মিলিত হইয়া গান, কীর্ত্তন, উৎসব প্রভৃতি উত্তেজক প্রণালীর উপরে। এমন কি, এই অবসরহীনতার যুগে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিবার মত সময় যাহাদের আছে, তাঁহারাও এত বেশী পরিমাণে সেই সময়টুকু এইরূপ সমবেত ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যয় করিতেছেন যে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ধর্ম্মজীবন গভীর উন্নত ও সরস করিয়া লইবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে তাঁহারা আর সময় পাইতেছেন না। আমাদের মন যেন এই ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে যে, কবে আবার একটি আলোড়ন (revival) আসিবে; আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সাধনহীনতা ও শিথিলতাজনিত সমুদয় ক্ষতি হঠাৎ পূরণ হইয়া যাইবে। মনে হয়, কেহ কেহ ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দী-উৎসবকে এইরূপ একটি আলোড়ন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। চিরন্তন অনুপ্রাণনের উৎস যে বিশ্বপ্রকৃতিতে ব্রহ্মের শাশ্বত প্রকাশ এবং মানবের সাধারণ জীবনে ব্রহ্মের সরস সঙ্গ, তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিলে মানুষের মনের এইরূপ দশা হয়।

করুণাময় পরমেশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, ইহার নরনারী, ইহার আশ্রিত পরিবারসকল মধুময় ব্রহ্মসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হউন, এবং তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হউন। ঈশ্বর যে নিত্য প্রাণময়, নিত্য অনুপ্রাণনের উৎস,—তাঁহাকে আমরা প্রাণরূপে নিজ নিজ জীবনে লাভ করিতে শিখি। মহর্ষিদেবের দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যে ফলবান্ হইয়া উঠুক। আমাদের জীবন, আমাদের গৃহ, শ্রদ্ধা শৃঙ্খলা ও শোভার আগার হউক।

অপরাহ্নে বালকবালিকা-সম্মিলন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা করেন। কয়েকটি বালক বালিকা আবৃত্তি করিলে পর মিসেস উড্‌হাউজ, মিসেস্ সাউথওয়ার্থ ও শ্রীমতী অবন্তী দেবী বালক বালিকাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। (ইংরাজী বক্তৃতা সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।)

সায়ংকালে ইংরাজীতে উপাসনা। ডাক্তার ড্রামণ্ড আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রাপ্ত হইলে তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ পরে প্রকাশ করিব।

ব্রাহ্ম সমাজ

কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভাতে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ১৯২৯ সনের

কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন :—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার—সভাপতি, শ্রীযুক্ত সুধাংশু মোহন বসু—ধনাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অনিমেষ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত শৌরেন্দ্র নাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার রায়—সহকারী সম্পাদক। এবং নিম্নলিখিত রূপে অধ্যক্ষ সভা গঠিত হইয়াছে :—কলিকাতা—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর দে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায়, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন, শ্রীমতী সান্ত্বনা রায়, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম, ডাঃ এস্ কে মিত্র, শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুশীলা বসু, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রায় পি কে দাস-গুপ্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চন্দ, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দত্ত, শ্রীমতী প্রভাবতী মজুমদার, শ্রীযুক্ত কালামোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস-গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র সাধুখাঁ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থি। মফঃস্বল—শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী—খাসিয়া হিল্‌স্, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত—ঢাকা, ভাই সীতারাম—লাহোর, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—বরিশাল, শ্রীযুক্ত ভি আর সিন্ধে,—পুনা সিটি, কাজি আবদুল গফফর—খাটুরা, মিঃ জে দে,—বাঁকুড়া, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর, কটক, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ—ময়মনসিং, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী—পাতিয়ালা, মিঃ জি বি ত্রিবেদী—বোম্বাই, শ্রীমতী ললিতা রায়,—সিমলা পাহাড়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস—বরিশাল, শ্রীযুক্ত দেবব্রত মল্লিক,—কুমিল্লা, শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত—লাহোর, শ্রীযুক্ত অমিতাভ গুহ—পাটনা, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ—ঢাকা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত—লাহোর, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ—হাজারিবাগ, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—ময়মনসিং, শ্রীমতী শান্তিময়ী দত্ত—মৌলমেন, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ঢাকা, মিঃ এন কে বসু—রেঙ্গুন, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন—চট্টগ্রাম, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস—গাইবান্ধা, শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত—ঢাকা, শ্রীযুক্ত মুকুন্দানন্দ আচার্য্য—ডেরাডুন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন—চট্টগ্রাম, শ্রীযুক্ত মধুসূদন জানা—কাঁথি, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পোদ্দার,—পাটনা। প্রতিনিধি—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়—কুমারখালি, শ্রীযুক্ত অর্পণাচরণ ভট্টাচার্য্য—আন্দুল, রায় মহেন্দ্রকুমার গুপ্ত বাহাদুর—শিলং, শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত—রাঁচি, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত—চট্টগ্রাম, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ,—শান্তিনিকেতন আদিব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়—ইষ্টবেঙ্গল ঢাকা, শ্রীযুক্ত এ সি, রায়—বাকুড়া, শ্রীযুক্ত এস্ মিত্র—ডেরাডুন, শ্রীযুক্ত হরকালী সেন—দিনাজপুর, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস—বরিশাল, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—হাজারিবাগ, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল—উল্টাডাঙ্গা, শ্রীযুক্ত ইউ মাল্লাপ্পা—ম্যাঙ্গালোর, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ দাস—কাঁথি, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র—ফরিদপুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চন্দ—ময়মনসিংহ, শ্রীযুক্ত জয়মঙ্গল রথ—সুবুলা, শ্রীযুক্ত পি এন দত্ত—গিরিডি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন গুহ—বাঁকিপুর, রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস—ধুবড়ি, শ্রীমতী সুরমা সেন—বাণীবন, শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র—টাঙ্গাইল, শ্রীমতী বিরাজমোহিনী রায়—চেরাপুঞ্জি, শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র—নংপিয়াই, শ্রীযুক্ত অতুলভূষণ সরকার—শেলা, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—তোয়া, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাঁ—মৌসমাই, শ্রীযুক্ত অজিতকুমার দাস-গুপ্ত—বরমা, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার রায়—কালিকচ্ছ, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার—কৃষ্ণনগর, শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র সেন—কাওরাইদ, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নিমতা।

দীক্ষা—বিগত ২০শে জানুয়ারী শিয়ালকোট ব্রাহ্মসমাজে লালা উদয়রাম ও তাঁহার পত্নী পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ভাই সীতারাম আচার্য্যের কার্য্য করেন। আমরা নব দীক্ষিতদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। করুণাময় পিতা তাঁহাদিগকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের পথে দিন দিন অগ্রসর করুন।

পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ—পরলোকগত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তৃতীয় বার্ষিকশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রাতে তাঁহার গৃহে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। গৃহে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত ও ব্রহ্মমন্দিরে ভাই সীতারাম আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার পত্নী ও কন্যা কলিকাতার শতবার্ষিক উৎসবে ২৫৲, সিটি কলেজে ২৫৲, লাহোরের শতবার্ষিক উৎসবে ২৫৲, তথাকার মন্দির মেরামতে ১০৲, রামমোহন বালিকা স্কুলে ১০৲ ও শিয়ালকোট ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲ এবং শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা মজুমদার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ৩০৲ টাকা ও লাহোর ব্রাহ্মসমাজের উক্ত কার্য্যে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালীতে নবনবতিতম মাঘোৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে :—

৬ই মাঘ—মহাত্মার স্মৃতি তর্পণ উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস। ৭ই মাঘ—পূর্ব্বাহ্নে উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস। ১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার—প্রাতে কীর্ত্তন ও উৎসবের প্রারম্ভিক উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন, স্বাধ্যায়-আবৃত্তি ও উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র দাস। ১৩ই মাঘ অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাসের বাসভবনে মহিলাদিগের উৎসব। উৎসবে সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। গোলোক বাবুর স্ত্রী উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। জলযোগান্তে উৎসব শেষ হয়।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে নিম্নলিখিত প্রণালী-ক্রমে মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—

১০ই মাঘ প্রাতে স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে উপাসনা। বাবু উমেশচন্দ্র নাগ উপাসনার কাজ করেন। সন্ধ্যায় বক্তৃতা, বিষয়—সংসার ও ধর্ম্ম; বক্তা—মিঃ ডি এন মুখার্জি। ১১ই মাঘ প্রাতে উপাসনা—আচার্য্য বাবু রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য বাবু উমেশচন্দ্র নাগ। ১২ই মাঘ প্রাতে উপাসনা—আচার্য্য ডাঃ বি রায়।

নামকরণ—গত ৭ই মাঘ কলিকাতায় বাবু সিদ্ধেশ্বর দাসের প্রথম সন্তান (কন্যার) নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা হয়। শিশুর পিতামহ বাবু যজ্ঞেশ্বর দাস উপাসনার কাজ এবং পিতা ও মাতুল প্রার্থনা করেন। এতদুপলক্ষে কন্যার মাতামহ বাবু উমেশচন্দ্র নাগ গিরিডি ব্রহ্মসমাজে এক টাকা দান করিয়াছেন। কন্যার নাম দীপিকা ও নিবেদিতা রাখা হইয়াছে। মঙ্গলময় বিধাতা শিশুকে কল্যাণের পথে রক্ষা করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ২০শে জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে কালীকচ্ছ নিবাসী পরলোকগত মনোমোহন নন্দীর কন্যা কল্যাণীয়া লীলা ও পরলোকগত রাধারমণ সিংহের অন্যতম পুত্র সত্যসাধনের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৮ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ১লা ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০০ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

২১ম সংখ্যা। 13th February, 1929. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা, তুমি যেমন এই বিশ্বের অদ্বিতীয় প্রভু ও কর্ত্তা হইয়া ইহাকে নিয়ত কল্যাণের পথে অগ্রসর করিতেছ, তেমনি এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর ও আমাদের প্রত্যেকের নিয়ন্তা ও চালক হইয়া আমাদিগকে তোমার পবিত্র ধর্ম্মের পথে বৰ্দ্ধিত করিতেছ। তুমি তোমার অসীম প্রেমে আমাদিগকে সুন্দর ও মহৎ করিয়া তুলিবার জন্য নিয়ত কত আয়োজন ও ব্যবস্থা করিতেছ! তবুও এখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনাদিগকে সর্ব্বতো-ভাবে তোমার ব্যবস্থার অধীন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে তোমার দ্বারা চালিত না হওয়াতেই যে আমাদের দুর্গতি দূর হইতেছে না, তাহা বুঝিয়াও আমরা অধিকাংশ সময়ই আপনার ভাবে, আপনার পথে, চলি—কেবল আরামই খুঁজিয়া বেড়াই, আলস্যেই দিন কাটাই। তুমি আমাদের নিকট যে সহজ স্বাভাবিক পথ প্রকাশ করিয়াছ, ধীর ভাবে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত তাহা অনুসরণ করিয়া চলিবার উপযুক্ত চেষ্টা ও প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে না। তাই দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, আমরা কিছুই অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমাদের এই আলস্য ও উদাসীনতা যে কি প্রকারে বিদূরিত হইবে জানি না। তোমার করুণা ভিন্ন অন্য উপায় কিছু দেখিতেছি না। হে দুর্ব্বলের বল, তুমি আমাদের এই দুর্ব্বলতা দূর কর, তুমি আমাদিগকে নিষ্ঠার সহিত তোমার পথে চলিবার শক্তি প্রদান কর। আমরা যেন এরূপ ভাবে আর সকল সুযোগ ও শক্তি নষ্ট না করি, আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে অর্পণ করিয়া তোমারই দ্বারা চালিত হইতে পারি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের একমাত্র চালক হউক। তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।—আমরা সকলে তোমারই পথে চলি, তোমারই হইয়া যাই।

নবনবতিতম মাঘোৎসব

৭ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) রবিবার— প্রাতে ব্রাহ্ম যুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। ব্রাহ্মসমাজে ও বাহিরে যুবা বয়সেই যে অধিকাংশ লোক উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন উদ্বোধনের মধ্যে তিনি বিশেষ ভাবে তাহা প্রদর্শন করেন, এবং সমাজের সঙ্গে যোগ রক্ষা না করিলে যে জীবন থাকে না, ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম যুবকগণ কত সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার জন্য তাহাদের কিরূপ কৃতজ্ঞ হইবার ও কত খাটিবার আছে, সে সকল কথা উপদেশের মধ্যে বিশেষভাবে বিবৃত করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সুদীর্ঘ উপদেশের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং তাঁহার নিকট হইতেও আমরা উহা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে "ভিতরে ও বাহিরে আমাদের কার্য্য" বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ প্রভৃতি আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বিডনস্কোয়ার হইতে বরাহনগর শ্রমজীবিগণের নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়। সকলে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর প্রার্থনা করেন। তৎপরে প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে বিডন ষ্ট্রীট, বিডন রো, রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য লেন, হরিঘোষ ষ্ট্রীট, ভীমঘোষ লেন, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ডাফ ষ্ট্রীট, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, মদনমোহন মিত্র লেন, মাণিকতলা স্পার, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, সুকিয়া রো, সার কৈলাশবসু ষ্ট্রীট, ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে কিছু সময় কীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র

সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম আমাদের হস্তগত হইলে পরে প্রকাশিত হইবে।

৮ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) সোমবার— প্রাতে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি ভক্তিমতী মিরাবাইয়ের ঈশ্বরবিরহ ও ঈশ্বর-মিলন-সূচক দুটী সঙ্গীত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, তৎপরে আরাধনান্তে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ দেন :—

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে মহর্ষি উদ্দালক আরুণি নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন, "হে শ্বেতকেতো তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর (অর্থাৎ গুরুগৃহে যাইয়া যথানিয়মে বেদাধ্যয়ন কর)। আমাদিগের বংশে কেহই বেদাধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায় হন নাই।" 'ব্রহ্মবন্ধু' অর্থ জন্ম বা নামে মাত্র ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে। পিতার আদেশানুসারে শ্বেতকেতু দ্বাদশ বর্ষ বয়সে গুরুকুলে যাইয়া আরো দ্বাদশ বর্ষ বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। আরুণি লক্ষ্য করিলেন যে শ্বেতকেতুর বেদাধ্যয়ন তাঁহাকে পাণ্ডিত্যাভিমানী এবং অবিনীত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার কারণ এই যে তিনি বেদের অপরা বিদ্যামাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন; পরাবিদ্যা,—যে বিদ্যা মানুষকে প্রকৃত জ্ঞানী ও বিনীত করে,—তাহা অধ্যয়ন করেন নাই। সম্ভবতঃ তখন পরাবিদ্যার আবির্ভাবই হয় নাই। পরাবিদ্যার আশ্রয় উপনিষদ্ আরুণিপ্রভৃতি মহর্ষিদের উপদেশ হইতেই উৎপন্ন হয়। যাহা হউক, আরুণি পুত্রের অহংকার চূর্ণ করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক চক্ষু খুলিবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি (তোমার উপদেষ্টৃগণকে) সেই আদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহাদ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হয় এবং অজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়?" এরূপ কোন বিদ্যা যে থাকিতে পারে শ্বেতকেতুর সেই ধারণামাত্র ছিল না। আরুণি তাঁহাকে বুঝাইলেন যে যেমন একটী মৃৎপিণ্ডের প্রকৃতি জানিলে মৃত্তিকানির্ম্মিত সমস্ত বস্তুই জানা হয়, একটী সুবর্ণপিণ্ড জানিলে সুবর্ণনির্ম্মিত সমস্ত বস্তুই জানা হয় এবং একটী নরুণকে জানিলে লৌহনির্ম্মিত সমস্ত বস্তুই জানা হয়, বস্তুসমূহের নানা আকৃতি সত্ত্বেও বস্তুর বস্তুত্ব, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ, একই থাকে, তেমনি জগতের মূলবস্তু চৈতন্য বা আত্মা, যাহা সকল বস্তুতে অজ্ঞাতভাবে বর্ত্তমান, তাহাকে জানিলে সকল বস্তুকেই জানা হয়, অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হন। শ্বেতকেতু বলিলেন যে তাঁহার শিক্ষকগণ নিশ্চয়ই এরূপ কোন বিদ্যা জানিতেন না, জানিলে অবশ্যই তাহার উপদেশ দিতেন। শ্বেতকেতু বিদ্যাভিমানী হইলেও একেবারে নষ্ট হইয়া যান নাই, তাই পিতার নিকট পরাবিদ্যার প্রার্থী হইলেন। অধ্যায়টী সমস্তই আরুণির উপদেশে পূর্ণ। আরুণি নানা দৃষ্টান্তদ্বারা শ্বেতকেতুকে বুঝাইলেন যে জ্ঞানরূপী সদ্বস্তুই সমস্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সেই সদ্বস্তুই আমাদের প্রত্যেকের চৈতন্যরূপে বর্ত্তমান, সুতরাং শ্বেতকেতুর প্রতি আরুণির মূল উপদেশ এই,—'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো',—হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই বস্তু, অর্থাৎ মূলে তুমি ব্রহ্মের সহিত এক। এই বাক্য বেদান্তের একটী 'মহাবাক্য'। এই অধ্যায়ের শেষ নয়টী খণ্ডে ইহা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার বিচার আমার অদ্যকার উদ্দেশ্য নহে। আমার বক্তব্য এই যে, এই উপনিষদ্ রচনার সময়ে দেশে শিক্ষার অবস্থা যাহা ছিল, এখনকার শিক্ষার অবস্থা অনেক পরিমাণে তাহার অনুরূপ। যুবক যুবতী নানা অপরা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিদ্যাভিমানী ও অবিনীত হয় এবং মনে করে আর কিছু শিক্ষণীয় নাই। যে বিদ্যা "সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা" তাহাই তাহাদের অজ্ঞাত থাকে। কেবল তাহাই নহে, প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা যাহা, তাহা না পাইয়াও—তাহার ধারণামাত্র না পাইয়াও—তাহারা মনে করে "আমরা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি।" এখনকার শিক্ষাপ্রণালী মানুষের পূর্ণ প্রকৃতি জানে না অথবা জানিয়াও কার্য্যতঃ অস্বীকার করে। এই শিক্ষাপ্রণালী আলোচনা করিলে মনে হয় যেন কেবল জ্ঞানই শিক্ষার বিষয়। কিন্তু জ্ঞান মানবপ্রকৃতির একদেশমাত্র। জ্ঞান যতই মূল্যবান্ বস্তু হউক না কেন, কেবল জ্ঞানশিক্ষাতে মানুষকে অনিবার্য্যরূপেই অল্পাধিক অবিনীত ও অভিমানযুক্ত করিয়া তুলে। জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছা লইয়া মানবপ্রকৃতি গঠিত, সুতরাং পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্মেষ করা, প্রেমভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের উচ্চ ভাবগুলির বিকাশ করা এবং শ্রেয়সাধনে ইচ্ছাবৃত্তিকে বলবতী করা। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী কেবল কতিপয় বিষয়ে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করে, পারমার্থিক জ্ঞানকে একবারেই অগ্রাহ্য করে, এবং হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশকে নিজকার্য্যের মধ্যেই গণ্য করে না। ইহার প্রভাবে অপ্রেমিক, শ্রদ্ধাভক্তিবিহীন এবং উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব ব্যক্তিও "উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত" বলিয়া সম্মানিত হয়। এই মহাভ্রম এবং ইহার ফলস্বরূপ মহানিষ্টের দিকে যুবক যুবতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার অদ্যকার উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মসমাজ এই মহাভ্রম ও মহানিষ্ট প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন এবং এই ভ্রম ও অনিষ্ট নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। যুবক যুবতী অনেক স্থলেই তথাকথিত "উচ্চশিক্ষায়" সন্তুষ্ট হইয়া আছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়। তাঁহারা অপরা বিদ্যায় তৃপ্ত না থাকিয়া পরাবিদ্যা অর্জ্জনে মনোযোগ দেন এবং জ্ঞানমাত্র লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রেম ভক্তি প্রভৃতি উচ্চভাব সাধনে সমত্ন হন এবং দৃঢ় অধ্যবসায় ও ব্যাকুল প্রার্থনার সহায়ে সংযত ও শুদ্ধচরিত্র হইয়া সমাজ ও দেশের সেবায় তৎপর হন, ইহাই তাঁহাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ। এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাধনই একমাত্র "উচ্চশিক্ষা" নামের উপযুক্ত।

ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে অপরাহ্নে সিটিকলেজ-গৃহে একটি সান্ধ্য-সম্মিলন হয় ও সায়ংকালে মন্দিরে ডাক্তার ব্রামণ্ড জগতের বিভিন্ন অংশে উদার ধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। (এবার ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল।)

৯ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে মহিলাদিগের উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীমতী কামিনী রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন ও নিম্ন লিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন:—

ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় শতাব্দীর যাত্রারম্ভে একবার অগ্র পশ্চাৎ চাহিয়া, আমাদের লক্ষ্য, আমাদের সাধনা ও আমাদের সিদ্ধির পথ ভাল করিয়া নির্ণয় করা আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজ যখন তরুণবয়স্ক তখন কেবল কয়েক জন পুরুষ বাহির হইয়াছিলেন। সহানুভাবিনী সহযাত্রিনী সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণীর একান্ত প্রয়োজন থাকিলেও তাঁহাদের মাতা পত্নী ও ভগিনীরা তাঁহাদের সঙ্গে সমানে পা ফেলিয়া চলিতে পারেন নাই, বরং পশ্চাতের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। হয়তো বা সে সময়ে পুরুষেরাও নারীর সাহচর্য্য একান্ত ভাবে প্রার্থনা করেন নাই। সমাজের পুরুষদিগকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাই তাঁহাদের সমস্ত চিন্তা অধিকার করিয়াছিল। কালে যখন ব্রাহ্মসমাজের দল পুষ্ট হইল, তাহার ধর্ম্মসাধনপ্রণালী ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান নির্ণীত হইল, তখন পরিবার ও সমাজের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ নারীর কথা মনে পড়িল। তাহাকে ছাড়িয়া পরিবার, সমাজ, সংসার কিছুই তো চলে না।

এ দেশের নারী বহুদিন অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারাগারে অবরুদ্ধ থাকিলেও, তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণতা, প্রেম ও পবিত্রতা তাহাকে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবার জন্য নূতন আগ্রহ ও উৎসাহে পূর্ণ করিয়াছে। তাই কত নিরক্ষর নারী ঐকান্তিক যত্নে স্বামী বা ভ্রাতার নিকট, অথবা কোন আত্মীয়ের নিকট লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন। পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া কত পত্নী স্বামীর সহিত সচ্চিদানন্দ এক মাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হঠাৎ একদিনেই আজন্মের সংস্কার বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। মনের অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় মর্ম্মান্তিক বেদনা সহিতে হইয়াছে, কতই না অশ্রুমোচন করিতে হইয়াছে; তবু আসিয়াছেন এবং স্বামীর সঙ্গে এক স্রোতে ভাসিয়াছেন। দুঃসহ দুঃখ দারিদ্র্য হাস্যমুখে বরণ করিয়া লইয়াছেন, কতদিন অনাহারে অল্পাহারে কাটাইয়াও ভগবানের করুণার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া চলিয়াছেন। প্রাচীন সমাজস্থ আত্মীয় স্বজনের ঘৃণা ও ক্রোধ স্বীকার করিয়া উচ্চ জাতীয়া নারী নিম্ন জাতীয়ার সহিত একত্র পান ভোজন করিয়াছেন। আজ সেই অবরোধ নাই, জাতিভেদের সে প্রকোপ নাই, শিক্ষার অন্তরায় নাই। কেবল ব্রাহ্মসমাজে নাই তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্তের প্রভাবে প্রাচীন সমাজ হইতেও ধীরে ধীরে এসকল দুর্নীতি বিদূরিত হইতেছে। আজকার কন্যারা পত্নীরা ও মাতারা, তোমরা সে দিনের সেই দুঃখ, সেই সংগ্রামের কথা, কিছুই বুঝিবে না। প্রাচীনপন্থীদের ক্রুদ্ধ অত্যাচারের কোন ধারই তোমরা ধারিতেছ না। কিন্তু ধার তোমাদের অনেক আছে—সে কালের নবীন সংস্কারকদিগের নৈতিক বল, অটল প্রতিজ্ঞা, অকুণ্ঠ কষ্টসহিষ্ণুতা ও প্রগাঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাসের কাছে। এই দুষ্পরিশোধ্য ঋণ শোধ করা কর্ত্তব্য কি না একবার এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ভাবিয়া দেখ। আজ তোমাদের যে অবরোধমুক্ত জীবন, যে জ্ঞানের আনন্দ, যে পারিবারিক সামাজিক সুখ ও সম্মান তোমরা এ সকল কেবল নিজের আগ্রহে, নিজের আয়াসে অর্জ্জন কর নাই। ধনীর সন্তান যেমন পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত অর্থের দ্বারা সমৃদ্ধ, তোমরাও সেইরূপ। যাট পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বের সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ত্তব্যপরায়ণ নবীন ব্রাহ্মসমাজের নিকট—তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের নিকট—তোমরা কত ঋণী তাহা ভুলিও না। তোমাদের জনকেরা হৃদয়রক্ত ক্ষরণ করিয়া, তোমাদের অনেকের জননীরা অশ্রুসিঞ্চন করিয়া, যে মঙ্গলের বীজ বপন করিয়াছেন, আজ তোমরা তাহার ফলভাগিনী। এ কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ কর। যে পাইয়াছে তাহাকে দিতে হয়। কেহ কেহ বলিবে,—সময়ে সব হয়। কিন্তু সময় কি আপনি আসে? সময়কে টানিয়া আনেন কাহারা? প্রাচীন ধর্ম্ম কালক্রমে দূষিত ও পীড়াজনক হইলে তাহার শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার বল রাখেন যাঁহারা তাঁহারা; দেশাচারের কদর্য্যতা দেখিয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী যাঁহারা তাঁহারা। এক কথায় যাঁহারা বিবেককে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপাত করিতে পারেন, তাঁহারাই নব শুভ যুগের প্রবর্ত্তক।

ব্রাহ্মসমাজ যতকিছু মঙ্গলের সূত্রপাত করিয়াছেন তন্মধ্যে নারীর জন্য মানবত্বের পূর্ণ অধিকারস্বীকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা হইতেই তাহার অবরোধমুক্ত সম্মানিত জীবনের আরম্ভ হইল; তাহার জন্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হইল; জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে কুসংস্কারবর্জ্জিত ধর্ম্মাচরণে নূতন দীক্ষা লাভ হইল। সে জানিল এবং অনুভব করিতে লাগিল যে পারিবারিক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কল্যাণব্রতে তাহার সহকারিতার প্রয়োজন; সে যেমন কোন বিশেষ পরিবারের কন্যা বা বধূ বা মাতা, তেমনি সে সমাজেরও অঙ্গ এবং সমাজের, দেশের এবং মানবসাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়ী। যে ছোট ঘরে ছোট চিন্তা, ছোট কথা এবং ছোট আশা লইয়া ছিল, সে এক নূতনতর বিশালতর গৃহ পরিবারের মধ্যে আনীত হইয়া আপনার জীবনকে নূতন গৌরবে মণ্ডিত দেখিল।

বীরের সন্তান বীর হয়, ইহাই মানুষ প্রত্যাশা করে। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের পুত্র কন্যারা ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে পিতামাতার যোগ্য সন্তান হইবেন, ইহাই সকলে আশা করি। ব্রাহ্মসমাজের প্রিয় ভগিনীরা, কল্যাণীয়া কন্যারা, একবার পশ্চাতের দিকে চাহিয়া আবার নিকটে ও সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সর্ব্ব প্রথমে দেখিয়া লও—ঈশ্বরে ভক্তি, তাঁহার কথা শ্রবণ, তাঁহার স্মরণ ও মননে পূর্ব্বের মত যত্ন আছে কি না। তাহার পর দেখ নিজের মত বিশ্বাস ও দৈনিক আচরণে সেই ঐক্য আছে তো? ধর্ম্মের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য, সেই ত্যাগ স্বীকার আছে তো? সমাজের সকলের সঙ্গে সকলের সেই প্রীতির বন্ধন আছে তো? যদি এ সব পূর্ব্বের ন্যায় না থাকে, তবে তো আশঙ্কার কথা; তবে তো ধর্ম্ম ও সমাজ দুই হইতেই সরিয়া পড়িতেছি। এ সম্বন্ধে কি

করা যাইতে পারে চিন্তাপূর্ব্বক, প্রার্থনাপূর্ব্বক, আমাদের প্রতি জনেরই কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে।

পুরুষেরা আমাদের ডাকিয়া আনিয়াছেন, হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়াছেন জ্ঞান ও সৌভাগ্যের পথে। এবার আমরা কি সৌভাগ্যের যোগ্য থাকিতে ও যোগ্যতরা হইতে চেষ্টা করিব না? নারী কেবল পুরুষের ভোগের সামগ্রী হইতে আসে নাই, এ কথা তোমরা এখন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছ। কিন্তু তোমরাই যে পুরুষজাতির মাতা, তাহাদের শৈশবের পালয়িত্রী, শিক্ষয়িত্রী ও চরিত্রের নমনীয় অবস্থায় গঠনদাত্রী, এ কথা কি স্বীকার করিবে না? স্বামীর দাসী না হইয়া, তাহার ক্রীড়নক না হইয়াও যদি তাহাকে ব্রাহ্মসমাজের কোন নারী নিজের ক্রীড়ার পুত্তল করে, তাহাকে ভোগ সুখ জোগাইবার জন্য ভৃত্যরূপে গ্রহণ করে, তাহার কঠিন পরিশ্রমের অর্জ্জিত অর্থ প্রধানতঃ কেবল নিজের বস্ত্র অলঙ্কার ও আমোদ জোগাইবার জন্য ব্যয় করে, তাহাতে সে নারীর কি গৌরব, তাহার স্বামীরই বা কি গৌরব? যদি চরিত্রবল, ধর্ম্মবল, না খুঁজিয়া কেবল পদমর্য্যাদা ও অর্থোপার্জ্জনের শক্তি দেখিয়াই আজ ব্রাহ্ম কন্যারা নাস্তিক অথবা দুর্নীতিপরায়ণ পুরুষকে পতিরূপে বরণ করিতে পারে, সে কি সমাজের পূর্ব্বপুরুষদিগের ও নিজেদের গৌরবের বিষয় হইবে? অথবা যদি শিক্ষিত, গুণবান, ধনবান স্বামী লইয়া শিক্ষিতা, গুণবতী, ধনবতী তোমরা সমাজের হিতাহিত বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, কেবল আপন পরিবারের মধ্যেই সকল চিন্তা ও চেষ্টা আবদ্ধ রাখ, যদি কেবল অর্থকরী শিক্ষাই সন্তানের জন্য একান্ত কাম্য জানিয়া, তাহাকে ধর্ম্মসমাজ হইতে ও সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠান হইতে দূরে রাখ, যদি অতিরিক্ত এবং ভ্রান্ত সন্তানস্নেহে সন্তানকে সুখে রাখিবার জন্য আপনাদিগকে কেবল ধনসঞ্চয়ে রত রাখ এবং দানে কৃপণ হও, তাহাই কি তোমাদের পিতৃগণের চরিত্রানুযায়ী ও বাঞ্ছানুযায়ী কর্ম্ম হইবে?

সকল ধর্ম্ম সমাজের শৈশব ইতিহাসে দেখা যায়, নারী নিরপেক্ষ হইয়া কেবল পুরুষ কোন ধর্ম্মকে সবল করিতে পারে নাই। শিশু ধর্ম্মসমাজের রক্ষণ পোষণ ও বর্দ্ধনে নারীর সহায়তা আবশ্যক। খাদিজা মহম্মদের সর্ব্বপ্রথম সহায় ও শিষ্যা ছিলেন। বুদ্ধের মাতৃস্থানীয়া মহাপ্রজাবতী গৌতমী, বুদ্ধের পত্নী গোপা বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে বহু ধনীর কন্যা এবং বহু বিলাসিনী নারীও ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করেন। সম্রাট্দুহিতা সঙ্ঘমিত্রা দেশ বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের শৈশবে পুরুষ হইতে নারীর সংখ্যা কম ছিল না, বোধ হয় ভক্ত নারীর সংখ্যা অধিকই ছিল। ইঁহারা নানারূপে অত্যাচারিত এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। ধর্ম্মের জন্যই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। সংসারে যেমন দেখি, সন্তানরূপে শিশুর প্রতিপালন এবং বৃদ্ধ স্বামী বা পিতার পরিচর্য্যা নারীই করে, তেমনি ধর্ম্ম সমাজের কেবল শৈশবে নয়, কালের প্রভাবে যখন, আচার অনুষ্ঠান, পৌরোহিত্যাদিদ্বারা কোন ধর্ম্ম দূষিত জরাগ্রস্ত ও পীড়াগ্রস্ত হয়, যখন পুরুষ তাহা অবজ্ঞা করিয়া অমান্য করিয়া চলে, তখনও নারীর শ্রদ্ধা তাহা হইতে স্খলিত হইতে চাহে না। বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টান ধর্ম্ম পুরুষ হইতে নারীর দ্বারাই পূজিত ও অনুশীলিত। নারীর প্রেম ভক্তি ও কল্পনা উন্নত, অপার্থিব কিছু অবলম্বনরূপে ধরিতে চায়। স্থূল লইয়া সে সুখী হইতে পারে না। পার্থিবের মধ্যেও সে অপার্থিব কিছু খুঁজিয়া বাহির করে, যতক্ষণ না করে তাহার প্রাণ শান্তি পায় না।

ব্রাহ্ম সমাজের নারী জড়ের, স্থূলের, ক্ষুদ্রের পূজারিণী হইবে, এ কি হইতে পারে? আত্মার সম্পদের দিকে উদাসীন হইয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বর লইয়া থাকিবে, কেবল দশের সঙ্গে ধর্ম্মের নামে, দেশপ্রীতির নামে, গোলে হরিবোল দিয়া বেড়াইবে, তাহা হইবে না,—তোমরা তাহা হইতে দিবে না। আমি জানি এখানে সুশিক্ষিতা অনেক নারী উপস্থিত, যাঁহাদের হৃদয় নির্ম্মল প্রেমে, মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় ও উজ্জ্বল আশায় পরিপূর্ণ। যাঁহারা সত্য পথে চলিতে, সত্য ধর্ম্ম সাধন করিতে অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল। আজ সেই হৃদয়গুলিকে আমরা সকলে আবাহন করি, অভিনন্দন করি। প্রার্থনা করি, ভগবানের আশীর্ব্বাদ ইঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক, নূতন ভক্তি ও শক্তি ইঁহাদের জীবনে সঞ্চারিত হউক।

উপদেশ কে কাহাকে দিব? কথা কি বালিকা বৃদ্ধা যুবতী আমাদের মধ্যে সকলেই যথেষ্ট শুনি নাই? এখন যে চাই খাঁটি জীবন, জীবন-স্বরূপের কৃপায়। এখন যে পরস্পরের জীবন হইতে জীবনে প্রেরণা দিবার ও লাভ করিবার সময় আসিয়াছে। শোনা কথা কাজে পরিণত করিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বাঁচিবে না। ধর্ম্ম কেবল বলিবার ও শুনিবার জিনিষ নহে। এ যে ভিতরে ভিতরে অনুভব করিবার বিষয়। এ যে জড়ে, নরে, ত্রিভুবন চরাচরে ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া, পাইয়া নূতন হইয়া গড়িয়া ওঠা, অপরের গঠনে সহায় হওয়া। ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার অনুগত হওয়া, সকল জ্ঞান, সকল প্রেম, সকল কর্ম্মেচ্ছা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া সংসার করা। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন সংসারে থাকিয়া, গৃহী হইয়া, ধর্ম্মসাধন হয়, বনে গিয়া সন্ন্যাসী হইবার আবশ্যক নাই। তাই আমরা গৃহে পরিবারে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহার পূজা করিব, সমাজবদ্ধ হইয়া, রাষ্ট্রবদ্ধ হইয়া, মানবসমাজের মঙ্গলে ব্রতী হইব। কিন্তু গৃহে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে ও সর্ব্বত্র তাঁহাকেই একমাত্র উপাস্য করিতে হইবে। সকল জ্ঞান, সকল প্রেম, সকল শক্তি তাঁহা হইতেই আসিতেছে। আমরা তপস্যারত হই, তিনি জ্ঞান প্রেম পুণ্য আমাদিগকে দান করুন। তাঁহার চরণের স্পর্শ পাইয়া আমাদের পতিপ্রেম, সন্তানস্নেহ, দেশপ্রীতি, জনসেবা, জ্ঞানার্জ্জন, শিল্পসাধনা, সৌন্দর্য্যচর্চ্চা সমুদয় সফল হউক, সুন্দর হউক, গৌরবান্বিত হউক। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে আসে আত্মাভিমান, অহঙ্কার, অপ্রেম, অসহিষ্ণুতা। তখন সব পণ্ড হয়, সাধক নাম পাইয়া মানুষ ভণ্ড হয়। আজ আমাদের সকলের জন্য সকলের প্রার্থনা তাঁর চরণে উঠুক, ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হউক।

পুরুষদিগের জন্ম সিটিকলেজ গৃহে পৃথক উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশিত হইবে।

সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন। তাহাতে বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ও হিসাব পঠিত ও গৃহীত হইলে পর সভাপতি শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় তাঁহার অভিভাষণ জ্ঞাপন করেন। সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহার মর্ম্মানুবাদ পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। অনন্তর আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ নিযুক্ত হইলে পর, ভ্রাতৃত্ব জ্ঞাপক ও ধন্যবাদ-সূচক কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়া সভার কার্য্য শেষ হয়। কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণের নাম পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) বুধবার— প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

এই সেই উপাসকমণ্ডলী। ব্রহ্মকৃপাতে এই অপূর্ব্ব উপাসক-পরিবারে আশ্রয় লাভ করিয়াছি। তাঁর কৃপার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত ভক্ত উপাসকের সঙ্গ লাভ করিয়া আমরা তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হইয়াছি; যখন শরীর ও মন ভারাক্রান্ত হয়, তখন এই স্থানেই যে সকল কথা শুনিয়াছি তাহা স্মরণ করিয়া অন্তরে প্রভূত বল লাভ করিয়া থাকি।

তাঁহার পূজার পুষ্পমালা আমরা তাঁহারই কৃপায় গলদেশে ধারণ করিয়াছি। সেই মালো তিনিই আমাদিগকে শোভিত করিয়াছেন। আমাদের দীনতাহীনতা সত্ত্বেও এই বেদী হইতে ভক্তির কত পরিচয়, তাঁহার মিষ্টতার কত পরিচয়ই প্রাপ্ত হইয়াছি! আজ কত সাধুভক্তের উক্তিই মনের মধ্যে উদিত হইতেছে! সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কতবার প্রাণে শক্তি লাভ করিয়াছি! এই স্থান হইতেই ইহলোক ও পরলোকের একতার কত আভাস পাইয়াছি!

যে মণ্ডলীতে প্রবেশ করিলে একটু মানসম্ভ্রম লাভ করা যায় তাহার জন্য মানুষ কত চেষ্টা, কত অর্থব্যয়, করিয়া থাকে! আমার মনে হয়, এরূপ লোকের যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় নাই। যাহার সে জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহার প্রাণকে এ সব আকাঙ্ক্ষা অধিকার করিতে পারে না। মানবের পক্ষে একটী অতি শ্রেষ্ঠ ও মহান্ অধিকার আছে, তাহা এই উপাসকমণ্ডলীর সভ্য হওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁহারা এ উচ্চ অধিকারের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্থায়ীরূপে তাঁহার পূজার আস্বাদ প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া এখনও আমাদের কণ্ঠস্বর কর্কশ, দৃষ্টি স্নেহবিহীন হইয়াই রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও এই উৎসবে তাঁহার কৃপার কথাই অনবরত মনোমধ্যে উদিত হইতেছে। তাঁহার পূজার পুষ্পমালা তিনিই আমাদিগকে দান করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই ইহ পরলোকের একতা সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি। প্রায় ৪০ বৎসর অতীত হইতে চলিল এই বেদী হইতে উচ্চারিত মহাত্মা গোস্বামী মহাশয়ের একটী কথা শুনিয়াছিলাম। আজ তাহা মনে পড়িতেছে—"মন্দিরের এই গাঁদা ফুলের মধ্যেই আমি তাঁহাকে দেখিতেছি।"

সাধু উমেশচন্দ্র ভক্তি ভরে বলিয়াছিলেন, "জগৎ তোমার সাক্ষী, প্রাণ তোমার সাক্ষী, তুমিই আত্মার সেবার ও পূজার বস্তু।" পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি, "তোমাকে দেখতে পেলেও তুমি সত্য, না পেলেও সত্য।" জীবনের অন্ধকারের মধ্যেও যিনি এ কথা বলিতে পারেন তিনিই প্রকৃত উপাসক।

তিনি কখন দেখা দিবেন তাহাতো জানি না। কিন্তু তাঁহার চরণই আমাদের জ্ঞানের ধ্যানের বস্তু। যাঁহারা দেখা না পাইয়াও তাঁহার দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন তাঁহারা ভক্ত। কেবল নামের প্রলোভনে এখানে আকৃষ্ট হইয়া কত ভাবে কত সময়ে কত ভক্ত যে এই মণ্ডলীর মধ্য হইতে আমাদিগকে কত অমূল্য উপদেশ দিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

যদিও আমাদের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁহারা বলিতে-ছেন, "নির্জ্জনেই তাহার সেবা করিব", তবুও পারিবারিক সাহায্য ব্যতীত যেমন দৈহিক জীবন গঠিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না, আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধেও অধিকাংশ লোকের পক্ষে ইহা সত্য যে মণ্ডলীর সাহায্য ব্যতীত তাহা কখনও গঠিত হইতে পারে না। কলিকাতার ক্ষুদ্র মণ্ডলীই যে আমাদের একমাত্র মণ্ডলী বা পরিবার তাহা নহে। ইহার বাহিরেও এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক পরিবার রহিয়াছে। Herbert Spencer, Plato প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞানিগণ ও আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিগণ, সকলেই সেই পরিবারভুক্ত। তাঁহারা সকলে আমাদের ধর্ম্মজীবন গঠনে সাহায্য করিবার জন্য কত উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন! "যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি," প্রভৃতি উক্তিগুলি আমাদের জীবনের এক একটী অমূল্য সম্পদ্।

এই সংসারক্ষেত্রে প্রতি পদেই নিজেদের দীনতা হীনতা উপলব্ধি করিতেছি ও পূর্ব্বগত আচার্য্যদের জীবন ও বাক্য হইতে বুঝিতেছি যে, অসীমের আস্বাদ না পাইলে কিছুতেই প্রাণ তৃপ্ত হইতে পারে না। অসীমই আমাদের চির আকাঙ্ক্ষার বস্তু। "জানিলাম নানামতে, তোমা বিনা এ জগতে কেহ নাই আর আপনার হে।" একটী ভদ্রলোক আমাকে Emersonএর Diaryর কএকটী কাটা পাতা দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে Emerson এক স্থানে বলিতেছেন, "কর্ম্ম যদি খ্যাতি প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষায় কৃত হয় তাহা হইলে আত্মার সমূহ ক্ষতি, পরমযোগেরও ক্ষতি হইয়া যায়।" একটী মূল্যবান্ scientific instrument ভাল রাখিতে হইলে তাহার জন্য কত চেষ্টা করিতে হয়। আর যে মানবাত্মা অতি মূল্যবান্ scientific instrument হইতে অশেষগুণে মূল্যবান্ তাহার কল্যাণের জন্য অনেক অধিক সতর্কতা প্রয়োজন। খ্যাতির আকাঙ্ক্ষায় কৃত কর্ম্ম অকর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। এই মহৎ আদর্শ ধরিয়া চলিতে হইলে মণ্ডলীর পাঁচ জনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। তাহা না হইলে জীবন গঠিত হইতে পারে না।

পারিবারিক জীবনে দেখিতেছি আমার বাড়ীর ভৃত্যটী আমার জন্য কত ব্যস্ত। কলেজের চাপরাসী নিজে রোগে

শোকে কত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তথাপি আমার জন্য কত চিন্তিত। ইঁহাদের সাহায্যে আমার জীবনে কত মঙ্গল সাধিত হইতেছে! আধ্যাত্মিক জীবনেও এইরূপ অপরের সাহায্য চাই। স্বর্গীয় ভুবনমোহন সেন মহাশয়, ঢাকা সমাজে মাঘোৎসবের দিন, "ভুবনবিজয়ী নামে চ'লে যাব শান্তিধামে" এই গান শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন "অতি সত্য কথা"। এই যে বৃহত্তর উপাসকমণ্ডলী, ইঁহার নিকট কত সময় নিরাশার মধ্যে আশা প্রাপ্ত হইয়াছি! প্রভুর কৃপা যখন এক বিন্দু পাইয়াছি, তখনও তাহার সাব এই মণ্ডলী হইতে পাইয়া কত আশ্বস্ত হইয়াছি।

অসীমের যে সৌন্দর্য্য, যাহা চক্ষে দেখা যায় না, এক একটী সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তাহার কেমন সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। Browning প্রেমের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, নির্ম্মল প্রেম "brighter than gem, purer than pearl"—মণি মুক্তা অপেক্ষা উজ্জ্বল। এই সকল কথা অপরের মুখে শুনিয়া আমাদের দুর্ব্বল হৃদয় সবল হয়, আমাদের চঞ্চল চিত্ত পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়।

যখন শোকে অধীর হইয়া আপনার অসহায়তা বুঝিতে পারি, যখন মনে হয় সংসার মধ্যে আমি একাকী, আমি পথহারা, সেই সময়ে কেহ কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে প্রাণে একটু শান্তি পাই। যদি পরমপিতা অন্তরে প্রকাশিত হন তাহা হইলে তো কথাই নাই। যদি এই মণ্ডলীর কাহাকেও কাছে পাই তাহাতেও প্রাণ একটু আরাম পায়। বাল্যকালে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য ও গায়কগণের মুখে যে সমস্ত কথা শুনিয়াছি তখন তাহার অর্থ কিছুই বুঝি নাই, এখন সেই সকল কথা কাজে লাগিতেছে। ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের স্মৃতি আমার নিকটে অতি মিষ্ট। আমার পূজনীয় শিক্ষক শ্রীনাথ গুহ মহাশয়ের মধুর কণ্ঠের গানগুলি অনেক সময়েই মনে পড়ে। তখন তাঁহার মুখে শুনিয়াছি "অন্ধে দেখায়ে দেন স্বর্গের পথ।" এখন সেই কথাগুলি বিষাদপূর্ণ হৃদয়কে আশান্বিত করে, উপাসনার অনেক সাহায্য করে। ধর্ম্মসাধনে সাথী পাওয়া বড় প্রয়োজন। যাঁহারা বহুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মের কৃপার কথা আমা-দিগকে শুনাইয়াছেন তাঁহারা এখন পরলোকবাসী হইয়াও আমাদের সাথী। যাঁহাদিগকে জীবনে কখনও দেখি নাই, তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়াও অন্তরে বল লাভ করি, তাঁহারাও আমাদের সাথী। তাঁহাদের উপদেশ শুনিলেও সৎসঙ্গ লাভের ফল হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ফরিদপুর গিয়াছিলাম, সেখানে পৌঁছিয়াই সমাজে উপাসনায় যোগ দিতে গেলাম; শুনিলাম আচার্য্য "দৈনিক" বইখানি হইতে এক সাধু ব্যক্তির উক্তি পাঠ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন পাপীর নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই, তিনি ব্রহ্মের কৃপায় সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন, পুণ্যভূষণে ভূষিত হইবেন। এই উপদেশটী আমার প্রাণ স্পর্শ করিল, আচার্য্যের অনুরোধে আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। অনেক সময়ে অনুতাপবেদনার মধ্যে অন্তরে এই ভাবটী পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছি—আমাদের পিতা কৃপণ নহেন, তাঁহার অসীম পুণ্যধন তিনি সকল দীনজনকে বিতরণ করেন। ঘরে কেহ একটী সুন্দর ফুল লইয়া আসিলে তাহার সৌন্দর্য্য সেই ঘরখানিকে পূর্ণ করে। অখিলপতির অসীমপুণ্য সৌন্দর্য্য তাঁহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, তাহা নিয়ত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহার চরণ স্পর্শে সকল পুষ্প সৌরভান্বিত, তাঁহার পুণ্য নাম জগতের পাপ ক্ষয় করিতেছে। তাঁহার পুণ্য "aggressive"—পাপদগ্ধ প্রাণে প্রবেশ করিয়া পাপ দূর করে। গিরিডিতে এক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মুখে শুনিলাম "পাপের বেদনা জানিয়াছি, শান্তিও লাভ করিয়াছি।" অপরের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া প্রাণে কত বল পাই। ব্রহ্মসঙ্গই আমাদের নিয়ত প্রার্থনার বস্তু, যাঁহারা তাহা লাভ করিয়াছেন বা তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষিত তাঁহাদের সঙ্গও আমাদের অশেষ কল্যাণের হেতু।

মহৎ লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিলে সাথী বেশী পাওয়া যায় না। Milton এর মত বলিতে হয়—"By darkness and dangers compassed round." "Cut off from the cheerful ways of men"—"চারিদিক আঁধার, চারিদিকে বিপদ," "লোকসমাজের আমোদ প্রমোদ হইতে আমি অনেক দূরে, আমি একাকী"। ধর্ম্মপথে চলিতে গেলে অন্যের সহায়তা দুর্লভ। Cowper বলিয়াছেন, "যদি তোমার বুদ্ধিবৃত্তিসকলের মধ্যে কোন একটাকে ঘসিয়া মাজিয়া চকচকে করিয়া তুলিতে পার তাহা হইলে তুমি জগতে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিবে, কিন্তু তুমি সাধুজীবন যাপন করিতেছ এ জন্য তোমাকে কেহ সম্মানার্হ মনে করিবে না।" কি আক্ষেপের কথা! পবিত্রতার ন্যায় সুন্দর আর কিছুই নাই, তাহা কয়জনে বুঝে? গীতা, উপনিষদ্, Wordsworth, Emerson কয়জনে পড়ে! যে গ্রন্থ যত কদর্য্য তাহা পড়িবার লোক তত বেশী। যত সাধুতা তত লোকসঙ্গের অভাব।

Thomas a Kempis বলিয়াছেন—"Consider not whether men are with you, but whether God is with you"—"লোকে তোমার সঙ্গে আছে কি না তাহা ভাবিও না, পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন কি না তাহাই ভাবিয়া দেখ।" রাজা রামমোহন রায়কে কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে! এই সকল প্রতিকূলতার মধ্যে সত্যের পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইলে এই মণ্ডলীর আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দৈহিক ও সামাজিক জীবনে গৃহ পরিবার যেমন আবশ্যক, আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষার জন্য এই মণ্ডলীতে আশ্রয় লওয়া সেইরূপ আবশ্যক। পুণ্য পরিবারের আভাস, স্বর্গরাজ্যের আভাস, এই মণ্ডলী হইতেই পাইয়াছি। এই মণ্ডলীতে আমরা পরমপিতার প্রকাশে এক এক সময়ে এমন দেশে যাই, যেখানে অহঙ্কারের স্থান নাই, বিনয়েরও স্থান নাই, সকলেই তাঁহার সন্তান, আমরা এক প্রেম পরিবার, সেখানে ছোটবড় নাই। এই অবস্থা আমাদের জীবনে স্থায়ী হউক, মৃত্যুর অন্ধকার দূর হউক, নিরাশার মধ্যে আশা জাগিয়া উঠুক।

অপরাহ্ণ ১ ঘটিকার সময় নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য করেন। সভাপতি

প্রার্থনাপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য (প্রবন্ধ পাঠ), শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মজুমদার, রায় প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত বাহাদুর ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় নগর-সংকীর্ত্তন। সকলে মির্জ্জাপুর পার্কে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর প্রার্থনা করেন। অনন্তর কীর্ত্তন করিতে করিতে তথা হইতে সকলে নগরের রাস্তায় বাহির হন। প্রথমে বালকদিগের দল, তাঁহাদের পশ্চাতে মূল দল অগ্রসর হইতে থাকেন। পথিমধ্যে কলেজস্কোয়ার হইতে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে বালিকাদিগের একদল ইঁহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হন। মির্জ্জাপুর পার্ক হইতে বহির্গত হইয়া অখিল মিস্ত্রীলেন, মির্জ্জাপুর টেম্পলেন, নীলমণি গাঙ্গুলী লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন, মধুগুপ্ত লেন, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, রাধানাথ মল্লিক লেন, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, পটুয়াটোলা লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর লেন, বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীট, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, শঙ্কর ঘোষ লেন, ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইয়া সকলে মন্দিরে উপস্থিত হন। সেখানে কিছু সময় প্রমত্ত ভাবে কীর্ত্তন হইলে পর রাত্রিকালীন উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

প্রাচীন বাইবেল্ গ্রন্থে রাজা দায়ুদ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। দায়ুদ নরপতি কিরূপ ভক্ত ছিলেন সকলেই জানেন। তাঁহার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা হইল পরম সুন্দর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন। সেই আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বহুকাল চারিদিক হইতে নানা স্বর্ণ মরকত পদ্মরাগমণি প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন। মন্দিরের মাল মশলাও সমস্ত যোগাড় হইল। তখন তিনি ভাবিলেন, এই মন্দির কে গড়িবে? উপযুক্ত কারিকর কোথায়? তিনি রাজা, বেগার ধরিলে অনেক লোক পাইতে পারেন, পারিশ্রমিক লইয়া কাজ করিবার লোকও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তিনি মনে করিলেন, প্রাণের টান না থাকিলে কেহ শুধু অর্থের জন্য একাজ করিতে পারিবে না। বেগার ধরিলে কেহ ভাল করিয়া কাজ করিবে না। ঈশ্বরের মন্দির গড়া, ইহা অনুরাগের কাজ, অন্যরূপে এ কাজ হয় না। মানুষ ভুল করে, ভাবে অনুরোধ উপরোধ দ্বারা অথবা অর্থের দ্বারা লোক সংগ্রহ করিলেই কাজ চলে। তাহা হয় না। অনুরাগ-বিহীন লোকের দ্বারা সুন্দর-মন্দির নির্ম্মিত হয় না। এই হেতু তিনি এক দরবার করিলেন, সকলের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—বেগার ধরিলে তাহাদের চেষ্টা থাকিবে কোনও প্রকারে বেগার খাটিয়া মুক্তি পাওয়া; অর্থের দ্বারা লোক সংগ্রহ করিলে তাহাদের দৃষ্টি থাকিবে অর্থের দিকে, সুন্দর করিবার দিকে নয়। এরূপ লোক চাই যাহারা প্রাণের টানে আগ্রহ ও অনুরাগের সহিত কাজ করিবে। তাই দায়ুদ নরপতি বলিলেন Who is then willing to consecrate his service unto the Lord this day?—তবে কে এই মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের কাজে আপনাকে উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক আছে? দায়ুদ অপেক্ষাও অনেক বড় রাজরাজেশ্বর একটি বিশাল মন্দির প্রস্তুত করিতে চাহেন। মানব সভ্যতা যতদূর অগ্রসর হয় ততদূর এই মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। ক্রমে গভীর ও প্রশস্ত হইতেছে, তবু ভিত্তি স্থাপিত হইল না। ইহুদী দেশ ও ভারতভূমি পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া খ্যাত। এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমিতে নূতন মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন হইয়াছে। আজ ভারত নূতন বার্ত্তা শুনিয়াছে। সেই মন্দির নির্ম্মাণের কত আয়োজন চলিয়াছে! ট্রান্সেল্‌ভেনিয়া, জেকোস্লোভিকা, প্রভৃতি কত স্থানে সেই আয়োজন হইতেছে। আফ্রিকা এখনও আসে নাই। আরও কত আয়োজন বাকী আছে! কেবল মাত্র ইষ্টক সংগৃহীত হইতেছে। প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডে লিখিত থাকিবে "ওঁ তৎসৎ"। লাঙ্গুলপাড়ায় রামমোহন রায় সাধনার এক বেদী প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তাহার প্রত্যেক-খানা ইটের উপর 'ওঁ তৎসৎ' নাম অঙ্কিত ছিল। আমরা তাহা দেখিয়াছি। কেহ কেহ তাহার দুই একখানা লইয়াও আসিয়াছিলেন। আর এই যে রাজাধিরাজের মন্দির নির্ম্মিত হইবে, ইহার প্রত্যেক ইষ্টক মানবচিত্ত। প্রত্যেক মানবচিত্ত বলিবে ওঁ তৎসৎ। এই মন্দির গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু কে এই মন্দির গড়িয়া তুলিবে? কাহার দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইবে? তাই আজ বলিতে হয়—Who is then willing to consecrate his service unto the Lord this day? এই বাক্যের মধ্যে তিনটি কথা সকলে বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিবেন—willing (ইচ্ছুক), consecrate (উৎসর্গ), করিতে, এবং this day (অদ্যই, এই মুহূর্ত্তেই)। অর্থাৎ যাহারা এই মুহূর্ত্তেই ইচ্ছা করিয়া আপনাকে উৎসর্গ করিবে তাহারাই এই কাজ করিবার যোগ্য।

জগতে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করা খুব চলিয়াছে—ছোট দেশগুলিকে গ্রাস করিয়া সম্রাট আপনার সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিতেছেন: সম্রাটের সম্রাটও তাহাই করিতেছেন। স্বদেশ-প্রীতি প্রভৃতি ভাব ক্ষুদ্রস্থানে আবদ্ধ। তাহাই অনেকের মন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আর তাহার সঙ্গে বিদেশীর প্রতি অপ্রীতি ও সন্দেহের দৃষ্টি যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাকেই মানুষ চরম চরিতার্থতা মনে করে। ইহা হইতে বড় কিছু যে থাকিতে পারে তাহা ভাবিতেছে না। এইরূপ যতই সীমা টানিতেছে ততই যে প্রেমই সীমাবদ্ধ করিতেছে তাহা কেহ দেখিতেছে না। ইহাতে প্রেম সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া যাইতেছে সে কথাটা কেহ ভাবিতেছে না। যে প্রেম বিশ্বকে প্লাবিত করিবে তাহাকে ছোট ক'রে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোনও প্রকারেই আর প্রেমের স্বরূপ থাকে না। সব সাম্রাজ্য গিয়াছে—প্রাচীন কেল্‌ডিয়া, রোম, ভারত সব গিয়াছে। ক্ষুদ্র গণ্ডী লইয়া যে সাম্রাজ্যের সীমা টানা হইতেছে তাহা দাঁড়াবে না। ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করিতে যাইয়া মানুষ মানুষকেও ছোট দেখিতেছে। পিতা অন্তরদর্শী। তিনি বাহিরের চামড়া দেখেন না। এ আমার আর ও আমার নয়, মানুষ এই চিন্তাটাই বড় করিয়াছে। স্বাদেশিকতার মধ্যে স্বদেশের প্রতি

প্রেম যত না হউক, বিদেশীর প্রতি অপ্রেম বিদ্বেষ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। স্বদেশকে স্বদেশ বলিয়া ভালবাসিলে স্বদেশের অন্ত্যজ-জাতিসমূহকে, স্ত্রী জাতি প্রভৃতিকে কিছুতেই নীচ মনে করিতে পারিবে না। দেশকে ভাল বাসিলে দেশের সব লোককে ভাল বাসিবে। ইহা না করিলে উহা প্রকৃত স্বাদেশিকতা নয়, ভাক্ত স্বাদেশিকতা। মানুষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য 'এক দেশ এক ভগবান' বলে। এক ভগবান্ বলিলে কি বুঝায় ভাবে না। ইহারা শুধু নিম্ন জাতিকেই ছোট ভাবে না, তাহাদের দেবতাকেও ছোট দেখে। নিম্ন জাতিও আবার তাহাদের অপেক্ষা ছোটকে ছোট রাখিতে চায়। কেহই সকলকে সমান দেখিতে চায় না। এই মানসিক বৃত্তি ততদিন দূরীভূত হইবে না যতদিন বিশ্বেশ্বরের মহা মন্দির নির্মিত না হয়। এই মহা মন্দির নির্মাণের জন্য কারিকর চাই। Who then is willing to consecrate his service unto the Lord this day?

অনেক সময় প্রেরণা আসে, শুভ ভাব প্রাণে জাগে। কেহ তখনই কাজে প্রবৃত্ত হই না। আলস্য সুখলালসা প্রভৃতি কাজে প্রবৃত্ত হইতে দেয় না। তাই সে ভাব আর অধিকদিন থাকে না। আমরা সুখলালসার দ্বারাই বেশী সময় পরিচালিত হই। এই হেতু আমরাই শান্তিরাজ্যস্থাপনের পরিপন্থী,—সকলেই চাই নিজের অবস্থা ভাল হউক। দেশে শান্তি স্থাপিত হউক, সকলে সমান হউক, সকলে উন্নত ও সুখী হউক, তাহা কেহ বড় চায় না। দেশের সকলে চায় তাহারা নিজে বড় হউক। সকলেই বলিয়া থাকে "আমার জাত ব্রাহ্মণ, আমরা অমুক ঋষির সন্তান ছিলাম, আমরা কখনও ছোট ছিলাম না, অপরে আমাদিগকে অন্যায়রূপে ছোট করিয়া রাখিয়াছে" ইত্যাদি। সকলেই নিজেকে বড় করিতে চায়, কেহই সকলকে বড় করিতে চায় না। এই জন্যই দেশকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য কেহই খাটে না, দেশও বড় হইতে পারে না।

যুবক সহজে সত্য ও ন্যায়কে বরণ করিতে পারে; কিন্তু যখনই প্রস্তাব আসে তখনই তাহা বরণ করিয়া লইতে হয়। ভগবান যখন আদেশ করেন, তখনই তাহা পালন করিতে হয়। শুভ চিন্তা, শুভ প্রেরণাকে ভগবানের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিলেই ঠিক গ্রহণ করা হয়, আর নিজের চিন্তার ফল ভাবিলে ভুল বুঝা হয়। চিন্তার ফল হইলেও উহা তাঁহারই প্রেরণা। এখন কাজ না করিয়া যদি বলসঞ্চয় করা আবশ্যক হয়, তবে তিনি সেরূপ আদেশই দিবেন। সেই লোকই কাজের লোক হইবে যে যে-মুহূর্ত্তে বুঝিবে সেই মুহূর্ত্তেই আপনাকে তাহাতে নিযুক্ত করিবে। "আমি এই কাজ করিতে বাধ্য নই, সমাজের লোকে অনুরোধ করিতেছে বলিয়া করিতেছি," এরূপ ভাব লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলে হইবে না। 'আমি ইচ্ছা করিতেছি, আমি এই কাজে বাধ্যতা অনুভব করিতেছি, ইহাতে আপনাকে অর্পণ করিতেছি', এই ভাবে কাজ করিতে হইবে। I am willing,—ইচ্ছুক আছি, Consecrate myself—আপনাকে উৎসর্গ করিতেছি, Willingly consecrate myself—স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করিতেছি এবং this day—আজই, এখনই, এই মুহূর্ত্তেই—এই ভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সজাগ থাকিও কখন তোমার আহ্বান আসিবে, প্রেরণা ও আদেশ অনুভব করিবে, তিনি হৃদয় মন্দির আলোকিত করিবেন, ললাট উজ্জ্বল করিবেন, বলিবেন This is my beloved son—এই আমার প্রিয় পুত্র। মহা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে হইলে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। এই রাজ্যে ভেদ নাই, অপ্রেম নাই, বিদ্বেষ নাই।

আজকাল লোকে বলিতেছে, ধর্ম্ম মঙ্গলের পরিপন্থী, জাতীয় উন্নতির মহা প্রতিবন্ধক। ইংরাজীতে একটি কথা আছে Give the dog a bad name and hang it—কুকুরটাকে একটা বদ্‌নাম প্রদান করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাও অর্থাৎ ভাল জিনিষের অনিষ্টাচরণ করিতে হইলে অগ্রে তাহার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতে হয়। ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। ধর্ম্ম কি অপ্রেম, বিদ্বেষ, ঝগড়া বিবাদ প্রচার করে? ধর্ম্মের কথা কি লোকে শুনিতেছে? ভগবান বলেন, সকলকে সমান দেখ, মানুষ ওজর করে, নানা আপত্তি উপস্থিত করে। তিনি যদি বলেন 'অহঙ্কার ছাড়, ধন মানের গৌরব পরিত্যাগ কর', তখন ওজর উপস্থিত হয় 'ধনী হইলে কি ধর্ম্ম হয় না?' হবে না কেন? কাহারও হয়, কাহারও হয় না। কাহার পক্ষে তিনি কি আদেশ করেন তাহা দেখিতে হইবে। সকলের পক্ষে একই আদেশ হয় না। অন্তরের ধর্ম্ম অন্তরের কথা শুনিয়াই ধর্ম্ম সাধিত হইতে পারে, অন্তরের কথা শুনিয়াই চলিতে হইবে। মহর্ষিদেবকে অন্তরের বাণী পাহাড় হইতে ঠেলিয়া নিম্ন ভূমিতে লইয়া আসিল। তিনি নির্জ্জনে ব্রহ্মানন্দরসপানে আনন্দেই ছিলেন। সেখানে থাকিতে পারিলেন না, যতক্ষণ না আসিতে প্রস্তুত হইলেন, হৃদয়ে অসহ্য যাতনা উপস্থিত হইল, কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। যেই সেই আদেশ শুনিয়া চলিলেন, যাত্রার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সকল শান্ত হইয়া গেল। তাহা হইতে কত কল্যাণ প্রসূত হইল!

দেশের কাজ করিবে? পল্লী-সংস্কার করিবে? প্রেম কি আছে? ভেদবুদ্ধি কি ছেড়েছ? অহঙ্কার কি পরিত্যাগ করিয়াছ? তাহা না হইলে কে পল্লী-সংস্কার করিবে? শুধু ইচ্ছা হইলেই হয় না। ঠিক পথ ধরিতে হয়, যাঁহার নিকট হইতে পরামর্শ নিতে হয়, সুপরামর্শ পাওয়া যায়, লোকে তাঁহার নিকট পরামর্শ চায় না,—ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিতে চায় না। তাই ঠিক পথ ধরিতে পারে না, কাজে লাগিয়া থাকিতে পারে না, নানা ওজর করিয়া দুইদিন পরে কাজ ছাড়িয়া দেয়। Consecrate করে না, আপনাকে উৎসর্গ করে না, তাই সহজেই সব ছাড়িয়া দিতে পারে।

সমস্ত গেলেও যোব (Job) বলিয়াছিলেন The Lord gave it and the Lord hath taken it away, blessed be the name of the Lord—প্রভু দিয়াছিলেন, তিনিই আবার নিয়াছেন, তাঁহার নামই ধন্য হউক। প্রভুর হাতে আপনাকে অর্পণ না করিলে কি সকল দুঃখ দুর্গতি বাধা বিঘ্নের মধ্যে স্থির থাকা যায়? আমরা Consecrate করি না, আপনাকে উৎসর্গ করি না, তাঁহার আদেশ চাই না, তাই স্থির ভাবে কাজ করিতে পারি না, আপনাকে ভুলিয়া তাঁহার কার্য্যে লাগিয়া থাকিতে পারি

না। তাঁহার পরামর্শ লইয়া সেবা করিতে গেলেই যথার্থ সেবা করিতে পারিব, তাঁহার আদেশ শুনিয়া কাজে নিযুক্ত হইলেই সকল কাজ সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিব, তাঁহার মন্দির-নির্ম্মাণে সমর্থ হইব।

কাল মহা দিন। আশা করি প্রত্যেক ব্যক্তি কাল এই আশীর্ব্বাদ পাইবেন—This is my beloved son, এই আমার প্রিয় পুত্র। কাল প্রত্যেকে তাঁহার আদেশ শুনিবেন। জেগে যেন দেখি তিনি নিকটে প্রকাশিত। কাণ যেন খাড়া করিয়া রাখি, সকলে যেন তাঁহার বাণী শুনি। এইবার আমাদিগকে জাগাইয়া দেও, প্রভু। যদি ব্যথা দিয়া জাগাইতে হয় তবুও জাগাইয়া দেও। তোমার আশার বাণী শুনি। এই যে মহা সাম্রাজ্য নির্ম্মিত হইতেছে তাহার মধ্যে আমারও যেন একটু স্থান থাকে। আমিও যেন কিছু করিতে পারি। আমরা সকলে যেন তোমার কাজে লাগিয়া ধন্য হইতে পারি। তোমার আশীর্ব্বাদ আমাদের সকলের মস্তকে বর্ষিত হউক। তোমার পবিত্র রাজ্য আমাদের মধ্যে স্থাপিত হউক। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) বৃহস্পতি-বার—অদ্য উৎসবের প্রধান দিন। রাত্রি জাগিয়া যুবকগণ মন্দির পত্র পুষ্পে সুন্দর করিয়া সজ্জিত করেন। উষার বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকুল প্রাণ উপাসকগণ মন্দিরে সমবেত হইতে আরম্ভ করেন এবং সংগীত সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর যথা সময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রথমে মিলিতকণ্ঠে "ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু" ইত্যাদি সংগীত হয়। অনন্তর "জাগো পুরবাসী ভগবত প্রেমপিয়াসী ইত্যাদি গানটি গীত হইলে তিনি নিম্নলিখিতরূপে উপাসনার উদ্বোধন করেন :—

জগতের যিনি পিতা তিনি স্বয়ং মাঘোৎসবে প্রকাশিত হইয়াছেন। যাহাদের দুঃখের সীমা নাই, তিনি তাহাদের দুঃখ মোচন করেন। যাহারা মহাপাপী, তিনি স্নেহে তাহাদের পাপের বন্ধন মোচন করিয়া দেন। জগতের যিনি মাতা তিনি স্নেহে তাঁহার দুঃখী পুত্র কন্যাদের সমস্ত প্রাণকে সুশীতল করিয়া দেন। বিশ্বপতি যিনি, তিনি মাতারূপে প্রকাশিত হইয়া সকলের প্রাণে তাঁহার করুণাধারা বর্ষণ করেন। এই সংবাদ দিগ্ দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছে। সেই কথা শুনিয়া নানাস্থান হইতে কতলোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন। ভারতের পশ্চিম প্রান্ত পঞ্জাবে যাঁহারা আছেন তাঁহারা শুনিয়াছেন, ভগবান আর অদৃশ্য নহেন। তিনি পতিত পাবনরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং পাপীর উদ্ধার করেন। ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে, মাঘোৎসবে বিশ্বপতি করুণাময়ী হইয়া অজস্র ধারায় তাঁহার দয়া বর্ষণ করেন। সমুদ্রের পরপারে ব্রহ্মদেশে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা জানিয়াছেন যে, মাঘোৎসবে কত পাতকী উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। যাহারা বিরস বদনে হতাশায় দুঃখভারে অবসন্ন হইয়া জীবন যাপন করে, জগজ্জননী তাহাদের মুখের দিকে চাহেন—তাহাদের বিরস বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। এই কথা শ্রবণ করিয়া কত আশার সহিত সাগরের পরপার হইতে কতলোক এখানে আসিয়াছেন। এইদেশে ব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন, কত লোকের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছেন। যাঁহারা মরিয়াছিল তাহাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। যাহারা নানা প্রকার পাপের ভারে অবসন্ন হইয়াছিল তাহাদিগকে পুণ্যবান করিয়াছেন। যাহারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়িয়াছিল তাহাদের নিকট জ্ঞান প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়াছেন। এই সংবাদ ইয়ুরোপে প্রচার হইয়াছিল। এই সংবাদ আমেরিকায় প্রচার হইয়াছিল। তাই সেই সকল দেশ হইতে কতিপয় নরনারী দেখিতে আসিয়াছেন, ব্রহ্ম কিরূপে আত্মশক্তি প্রকাশ করিয়া নরনারীদের প্রাণের বেদনা দূর করিতেছেন, পাপ মোচন করিতেছেন এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিয়া দিতেছেন, পরব্রহ্ম কিরূপে জগতের চারিদিকে আপনার শক্তি প্রকাশ করিতেছেন, আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বহুকালের অজ্ঞানতা দূর করিতেছেন।

এই বঙ্গদেশে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতেছে! এই বঙ্গদেশের কতিপয় লোক যাহারা জনবলে প্রবল নয় এবং জ্ঞানবলেও পরমশ্রেষ্ঠ নয় তাহারা বলিয়াছেন যে ব্রহ্মজগতের পিতা, তিনি জগতের ঈশ্বর এবং এক, জগতের সমস্ত নরনারী ভাই এবং ভগিনী। তাহাদের প্রেম জগতের এক কোণ হইতে অপর কোণে প্রসারিত হইতেছে। তাহাদের নিকট মানুষে মানুষে ভেদ নাই। সমুদয় বিশ্ব পরমেশ্বরের ভবন। সেই ভবনে যত লোক বাস করে সব পরমাত্মীয়।

বঙ্গদেশে এ কি বার্ত্তা প্রচার হইয়াছে—পরমেশ্বর মানবের সঙ্গে বাস করেন, তিনি সাথের সাথী, তিনি সকলকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন! এই সংবাদ প্রচার হওয়াতে শত শত লোক মাঘোৎসবে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন তবে একবার যাই, দেখি ব্রহ্ম কি সত্যসত্যই প্রকাশিত হইয়াছেন? মাঘোৎসবে গেলে মানবের মন কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া যায়! মানবের প্রাণের মলিনতা এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যায়।

সাক্ষীসকল উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই বলিতেছেন, যাঁকে লোকে চক্ষুর অগোচর, মনের অগোচর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তিনি আর চক্ষুর অগোচর নহেন। সূর্য্য তাহার সাক্ষী দিতেছে। সূর্য্যের দিকে তাকাইলে ব্রহ্মকে দেখিতে পাই। এই রব প্রাণের অন্তস্তল হইতে উঠিতেছে। সমস্ত ভূমণ্ডল, বাহিরের সমস্ত প্রকৃতি এক সুরে বলিতেছে, ব্রহ্ম বর্ত্তমান। মানুষ দেখিতেছে, আকাশের মধ্যে পরমব্রহ্ম বর্ত্তমান। কেবল তাহাই নহে, তাহারা সাক্ষী দিতেছে অন্তরের অন্তরতম স্থানে পরব্রহ্ম বিদ্যমান, প্রাণরূপে বিদ্যমান। যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা বলিতেছে অন্তরে বাহিরে তিনি পিতারূপে, মাতারূপে, পতিতপাবনরূপে, সকলের সন্তাপহারিণীরূপে প্রকাশিত আছেন। এ কি সংবাদ, এ কি সাক্ষ্য! এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা শুনিয়া বহুলোক এখানে সমবেত হইয়াছেন।

মাঘোৎসবে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি ব্রহ্ম প্রকাশিত। তাঁহার কথা কে বলিতে পারে, কে বর্ণনা করিতে পারে? কণ্ঠ আজ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। ভগবান, ভগবান, তুমি প্রকাশিত হইয়াছ,—ইচ্ছা হইতেছে সব শক্তি প্রয়োগ করিয়া আজ তোমার কথা বলি, সাক্ষ্য দিই তুমি আছ, বিপদে যখন পড়ি তখন তুমি হাত দুখানি ধর।

আজ এখানে শত শত লোক উপস্থিত আছেন। তাঁহারা বলিবেন বিপদে পড়িয়া যখন তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, তিনি হাত দু'খানি ধরিয়াছেন; পাপের মধ্যে পড়িয়া চারিদিকে আর কোন সহায় না দেখিয়া যখন তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, উদ্ধার-কর্ত্তারূপে তিনি আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি এমনি করিয়া ডাকিয়াছেন, আজ মুক্ত কণ্ঠে আমরা সকলে বলিব। তিনি যখন ডাকেন তখন আর কোন বন্ধন থাকে না। এমন কোন শৃঙ্খল থাকে না যাহা আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে! তাঁহার ডাকে সব শৃঙ্খল ছেদন হইয়া যায়।

একজন লোক লেখাপড়া ভাল জানিত না। তাহার বয়স ছিল অল্প। এমন ডাক তিনি ডাকিলেন, সে ডাক সে লোক ভুলিতে পারিল না। বাপ মার শাসনে আর থাকিতে পারিল না। জগতের মধ্যে, ভারতবর্ষে, বঙ্গদেশে এমন ডাক উঠিয়াছে। সে ডাক যে শুনিয়াছে সেই মজিয়া গিয়াছে। কিছুতেই সে ঘরে থাকিতে পারে না। এই সাক্ষ্য দিবার জন্য আজকার মাঘোৎসব।

আমরা দেখিয়াছি, একজন লোক ধনৈশ্বর্য্যে মগ্ন ছিল। তাহার মধ্যে ভগবান তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। ঐশ্বর্য্য তাহার ভাল লাগিল না। ধনের মোহে থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি যেই বলিলেন, যাও যাও, অমনি বজ্র আসিয়া সব ঐশ্বর্য্য দগ্ধ করিয়া ফেলিল। সত্য সত্যই বজ্র আসিল। এমনি করিয়া তিনি কথা শুনান এবং আপনার রূপ দেখান, দেখাইয়া মানবের প্রাণকে তিনি মুগ্ধ করেন এবং সমস্ত বাধা ছেদন করিয়া দেন।

আর একজনকে দেখিয়াছি, কত আমোদ প্রমোদ ভাল বাসিতেন, গান বাদ্য শুনিতে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইত। তাঁহার মধ্যে এ কি প্রকাশ হইল! চক্ষের জলে তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। আমোদ প্রমোদ আর ভাল লাগিল না, কাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন। এই সব কি ব্যাপার!

এক গরীবের কথা বলিব তাঁহার ঘরে কোন কালেই টাকা কড়ি ছিল না। বংশেও ছিল না। বংশের লোকের ইচ্ছা ছিল লোকটা কিছু উপার্জ্জন করিবে, টাকা কড়ি আনিয়া পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবে। ভগবান তাহাকে বলিলেন—না, তুই আমার কাছে আয়। তিনি না যাইয়া থাকিতে পারিলেন না।

এই ব্রাহ্মসমাজে তিনি কত নরনারীকে ধরিয়া বলিয়াছেন, "তোর যাহা কিছু বাসনা সব পুড়িয়া আয়, তোর যত অভিলাষ সব আমার নিকট বলিদান কর। সমস্ত পাপের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া আয়,—তোর প্রাণকে গৌরবান্বিত করিব। তোকে এমন সুন্দর করিব যে সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া জগতের লোক মুগ্ধ হইয়া যাইবে। এই ডাক যিনি শুনিয়াছেন তাঁহার প্রাণের মধ্যে কত ঐশ্বরিক শক্তি প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া লোক আসিয়াছে। ভগবান প্রকাশিত হন কি না, পাপীকে ধরেন কি না, চক্ষের জল মোচন করেন কি না, বিরস বদন প্রফুল্ল করেন কি না,—দেখিতে আসিয়াছে। ভগবান আপনার স্বরূপ আজ দেখাইতেছেন। জীবের সঙ্গে তিনি কিরূপে ব্যবহার করেন, তাহা তিনি দেখাইতেছেন।

এই প্রাতঃকালে কি দেখিলাম! কিরূপে ভগবান প্রাণের মধ্যে প্রকাশিত হন তাহা তিনি দেখাইলেন। নিরাশায় যাহাদের প্রাণ আচ্ছন্ন হইয়াছিল তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়া দিয়াছেন। সে আলোক দেখিয়া তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন ভগবান এখানে আসিয়াছেন আমরা দেখিয়াছি। অনেকে দেখিয়াছেন, ভগবান প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া যাইতেছেন। সকলের প্রাণের মধ্যে এ কি সুগন্ধ প্রকাশিত হইতেছে! তাঁহার প্রকাশে প্রাণের মধ্যে কি সৌরভ অনুভব করা যাইতেছে! যাঁহারা বলিত প্রাণের মধ্যে কত কলুষ, কত পাপ, কত প্রবৃত্তি, কত বাসনা, কেবল দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধ, সে দুর্গন্ধে বাঁচা যায় না, তাঁহারা এখানে আসিয়া বলিতেছেন, মকরন্দের গন্ধ, ব্রহ্মমকরন্দের গন্ধ। কত পাপ তুমি করিবে, কত অবনতি তোমার হইবে? তাহার যে একটা সীমা আছে, কিন্তু তাঁহার সৌরভের যে সীমা নাই। জগৎময় সেই সৌরভ। তাঁর গন্ধ যাহারা পায় নাই তাহারাও পাইতেছে।

এই সব ত বাইরের কথা; কিন্তু চক্ষে দেখা যায় কি? হাঁ, দেখা যায়। ব্রহ্ম অমৃতরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অমৃত খাইতে চাও কি? চিরদিনের মরা যাহারা, অমৃত হইতে কে চাও? তিনি অমৃত দিতে আসিয়াছেন। হাত পাত, প্রাণ পাত। পানে মাতিয়া গিয়াছ,—তাঁহার নামে মাতিতে হয়। ঈশ্বরের নামে উন্মত্ত হইয়া যাইতে হয়। তাহা ঠিক। নামেতেই যদি এই হয়, তবে তাঁহার স্বরূপে কি না হয়। তাঁহার স্বরূপ দেখিয়াছি। কেমন করিয়া দেখিয়াছি? আজ ভিখারীর ন্যায় এই ভাই, এই ভগিনী এখানে আসিয়াছেন, আর তিনি এই অমৃত বিতরণ করিতেছেন, ইহাই দেখিতেছি। জগতের লোক চিরদিন দুঃখে পড়িয়া থাকিবে? পাপ তাপে ক্রন্দন করিবে? জগতে কেবল আর্ত্তনাদ উঠিবে? তাহারা কি কখনও সুখের মুখ দেখিবে না? দুঃখী নরনারীর দুঃখের দিন অবসান হইয়া গেল।

ভগবান প্রকাশিত হইয়াছেন;—তিনি অমৃত লইয়া আসিয়াছেন। নেও নেও কে নিবে নেও। মরা মানুষকে বাঁচাইবার জন্য অমৃত লইয়া তিনি আসিয়াছেন। যাহারা সংসারে বড় নিরাশ্রয় মনে করে তাহাদিগকে বাঁচাইবেন। বাঁচাইবার জন্য আজ এখানে আসিয়াছেন, তাই তাঁহার এই রূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

শত বর্ষের মধ্যে কত লোককে ধরিয়াছেন! আজ আমার হাত, আপনাদের হাত, ধরিয়া কোথায় লইয়া যাইবেন? চল না

তাই যাই। সংসারে আর আছে কি? কোথায় যাব? কোথায় আমাদের প্রাণের তৃপ্তি হইবে? আর ত কোন জায়গা নাই। এইখানে তাঁহার প্রকাশ। এই প্রকাশে আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। জগতের সন্তপ্ত নরনারীর এই যে মা। মার কোলে কে যাইবে? তাঁর কোলে কে বসিবে? আজ তাঁর কোলের মধ্যে আপনাকে ফেলিয়া দিব। চল তবে যাই। তাঁর প্রকাশ হইয়াছে, করুণাময়ী মার প্রকাশ, পতিতপাবনী মার প্রকাশ, দুঃখহারিণী মার প্রকাশ হইয়াছে। তবে আজ কণ্ঠ ছাড়িয়া দাও। কণ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া সকলে তাঁহার গুণ গান কর। মার প্রকাশ হইয়াছে। কেন গান করিবে না?

"শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন" ইত্যাদি সংগীতের পর আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনা। অনন্তর "অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ" ইত্যাদি সংগীতান্তে উপদেশ।

ব্রাহ্ম সমাজ।

দীক্ষা—বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী সাধনাশ্রমের বার্ষিক উৎসবদিবসে কৃষ্ণনগর নিবাসী পরলোকগত অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর পুত্র শ্রীমান সুনীলকৃষ্ণ বাগচী পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। আমরা নবদীক্ষিতকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। করুণাময় পিতা তাহাকে দিন দিন তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা—অধ্যক্ষ সভার বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন:—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার শিশিরকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর দে, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায়, ও শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ রায়। শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ প্রচারকগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

শুভ বিবাহ—বিগত ২৯শে জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুধারাণী ও শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ বসুর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্রের দৌহিত্রী (পরলোকগত বিষ্ণুচরণ ভক্তের দ্বিতীয়া কন্যা) কল্যাণীয়া শান্তিলতা ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান বিমলচন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে যোগেশ বাবু সাধারণ বিভাগে ২৲ ও দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ১৲ দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী

(অষ্টাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কতিপয় নির্দ্ধারণ)

(১) ধর্ম্মসাধন:—

(ক) ব্রাহ্মগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন দৈনিক উপাসনার পূর্ব্বে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট কাল আত্মপরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করেন, চিন্তাদ্বারা, কথাদ্বারা ও কার্য্য দ্বারা কোনও অন্যায় করিয়াছেন কি না। এই আত্মপরীক্ষার পর যেন উপাসনা আরম্ভ করেন; আর প্রার্থনা যেন স্খলনগুলির জন্যই করেন।

(খ) ব্রাহ্ম সাধারণকে, বিশেষতঃ মহিলাদিগকে, অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন সন্তানদের লইয়া প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিছুকালের জন্য সদ্গ্রন্থ পাঠ, সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন।

(গ) ব্রাহ্মবালক ও যুবকগণের সদ্গ্রন্থ পাঠের সুবিধার জন্য, সম্মিলনী আগামী বৎসর বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও দিনাজপুরের নীরব ব্রাহ্ম কর্ম্মীদের অন্ততঃ তিন চার খানা জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। বরিশালের শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, ঢাকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনকে পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। সম্মিলনীর আগামী অধিবেশনের পূর্ব্বে এই কার্য্য সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) রায় প্রসন্নকুমার দাশ গুপ্ত বাহাদুরের প্রস্তাবানুসারে নির্দ্ধারিত হইল যে—"ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ কি?" এই বিষয়ে দুই তিন ফর্ম্মার একখানি পুস্তক প্রকাশ করা হইবে। রায় বাহাদুর উহার ব্যয় বহন করিতে সম্মত হইলেন। শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপর পুস্তক প্রণয়নের ভার দেওয়া হইল।

(ঙ) সম্মিলনী অনুরোধ করিতেছেন—ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যেন সামাজিক উপাসনা এবং সমাজের অনুষ্ঠানাদিতে নিয়মিতরূপে যোগদান করেন।

(চ) সম্মিলনী ব্রাহ্মসমাজসকলকে অনুরোধ করিতেছেন, যেখানে অন্ততঃ তিন চারি জন ব্রাহ্ম আছেন এরূপ প্রত্যেক স্থানে যেন একটি সঙ্গত সভা গঠন করিয়া সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, পাঠ ও আলোচনা দ্বারা উহাকে সরস ও মনোজ্ঞ করিতে চেষ্টা করা হয়।

(২) প্রচার—অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে:—

হরিনারায়ণ সেন মহাশয় অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য মাসিক অন্ততঃ ৪০৲ টাকার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাইলে, সভাস্থলে পাঁচশত টাকার অধিক চাঁদা স্বাক্ষরিত এবং কতক চাঁদা সংগৃহীত হইল। সম্মিলনীর অনুরোধে শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন স্বাক্ষরিত টাকা আদায়ের ও আবশ্যক হইলে আরও সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিলেন। ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এক বৎসরের জন্য প্রচারক মনোনীত হইলেন। প্রচার কার্য্য সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ব্যবস্থানুসারে এবং হরিনারায়ণ বাবুর তত্ত্বাবধানে

সম্পাদিত হইবে। হরিনারায়ণ বাবু সম্মিলনীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার নিকট নিয়মমত আয়ব্যয়ের হিসাব ও মনোনীত প্রচারকের কার্য্যবিবরণ (রিপোর্ট) প্রদান করিবেন।

(৩) নবশতাব্দীতে অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত সদ্ভাব বৃদ্ধি :—

অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য নিম্ন-লিখিত উপায়গুলি নির্দ্ধারিত হইল :—

(ক) সর্ব্বজনীন উৎসব ও প্রার্থনা এবং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর সম্মিলন, (খ) জনহিতকর কার্য্যে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত অধিকতর যোগদান, (গ) প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণিগণের অন্যান্য সমাজের অগ্রণিগণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ দ্বারা এবং পত্র-ব্যবহার দ্বারা ভাবের বিনিময়, (ঘ) বক্তৃতা ও উপদেশাদিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভাবসকলের প্রতি অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ, ইত্যাদি।

(৪) অনাথ-ব্রাহ্মপরিবার-সংস্থান ধনভাণ্ডার :—

(ক) শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনাথ-ধনভাণ্ডারের জন্য চাঁদা প্রার্থনা করিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সভাস্থলে ছয়শত টাকার অধিক স্বাক্ষরিত হইল। কতক টাকা সভাস্থলেই সংগৃহীত হইল।

(খ) সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর মহাশয় পুনরায় অনাথ-ধনভাণ্ডারের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইলেন।

(৫) বিবিধ :—

(ক) সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ পুনরায় সম্মিলনীর সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত নীহারচন্দ্র রায় সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইলেন, এবং নিম্ন-লিখিত এগার জন সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হইলেন। (১) মিসেস পি কে বসু, (২) রায় সাহেব পি এম দাস, (৩) ডাক্তার নেপালচন্দ্র রায়, (৪) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন, (৫) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু, (৬) শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর, (৭) শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রকুমার দাস, (৮) শ্রীযুক্ত সুললিতচন্দ্র সরকার, (৯) শ্রীযুক্ত নীহারচন্দ্র রায়, (১০) শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (১১) শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ।

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সম্মিলনীর Auditor (হিসাব পরীক্ষক) মনোনীত হইলেন।

(খ) সর্ব্বসম্মতিতে স্থিরীকৃত হইল যে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হউক, যেন ১১ই মাঘকে সাধারণ অবকাশের দিন করিবার জন্য তাঁহারা যথোপযুক্ত চেষ্টা করেন।

কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজ—নিম্ন-লিখিত প্রণালী অনুসারে নবনবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—

৯ই মাঘ সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন; আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী। ১০ই মাঘ প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর-কীর্ত্তন, তৎপর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়ের মাতার সমাধি-স্থানে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা; সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিবেকচন্দ্র নন্দী। ১১ই সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব—প্রাতে উষাকীর্ত্তন ও উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী, পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় দেওয়ান বাড়ীর প্রাচীন ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী; অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বালক বালিকা সম্মিলন; সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও উপাসনা আচার্য্য শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী। ১২ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিবেকচন্দ্র নন্দী; অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় মহিলা-উৎসব; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী। ১৩ই মাঘ প্রাতে তারিণী বাবুর বাড়ীর বাগানে কীর্ত্তন ও উপাসনা; তৎপরে প্রীতিভোজন।

প্রচার—ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোণার রং একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। উক্ত গ্রামে কালীমোহন দাশ মহাশয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার ধর্ম্মশীলা পত্নী শ্রীযুক্তা চিন্ময়ী দেবী আপনার বাড়ীতেই একটি বালিকা স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। স্বামীর নামে একটি বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া উহাতে লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রায়ই স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ঢাকা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক এবং ধর্ম্মবন্ধুদিগকে সোণার রং লইয়া গিয়া উৎসাহের সহিত উপাসনা ও বক্তৃতার বন্দোবস্ত করেন। গত ১২ই পৌষ তাঁহারই আহ্বানে ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত এবং আরো কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা সোণার রং গ্রামে গমন করেন। সে দিন রাত্রে চিন্ময়ী দেবীর গৃহে উপাসনা হয়, অনেক মহিলা উপাসনায় যোগদান করেন। ১৩ই পৌষ প্রাতে তাঁহার স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়; গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক পুরুষ ও মহিলা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অমৃত বাবুর দ্বারা অনুষ্ঠানের উপাসনা সম্পন্ন হয়। উপাসনান্তে অনেকেই আহারাদি করেন। এই দিন অপরাহ্ণে কালীমোহন হলে একটি সভা হয়। গ্রামের বিস্তর মহিলা এবং ভদ্রলোক সভায় আগমন করিয়াছিলেন। পুরুষ ও মহিলাগণ প্রকাশ্য স্থানে এক সঙ্গেই বসিয়াছিলেন। কোনরূপ পর্দ্দা ছিল না। একটি সঙ্গীতের পরে অমৃত বাবু "ধর্ম্ম কি?" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি কয়েকটি ভক্তিমতী নারীর জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিয়া খুব সরল ভাষায় ধর্ম্মের অত্যাবশ্যকীয় কথাগুলি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তদ্ভিন্ন অমৃত বাবু বালিকা স্কুলের মেয়েদিগকে গল্প বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

অমৃত বাবু ময়মনসিংহ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন। সেখানে ২৫শে পৌষ উপাসনা ও বক্তৃতাদি হয়। অমৃত বাবু দুই দিন মন্দিরে উপাসনা, "ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষ" বিষয়ে বক্তৃতা, [illegible] বক্তৃতা এবং বালকবালিকা সম্মিলনীতে গল্প বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্র।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত

৫১ম ভাগ।
২২শ ও ২৩শ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ও ১লা চৈত্র শুক্রবার,
১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০০
28th February, and 15th March 1929.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে জীবনদেবতা, তুমি ত আমাদিগকে তোমার হইবার জন্য নিয়তই আহ্বান করিতেছ, নানারূপে নানা ভাবে বুঝাইয়া দিতেছ তোমার হইয়া গড়িয়া না উঠিলে কিছুতেই আমাদের জীবনের সার্থকতা নাই—বহু প্রকার কার্য্যসাধনের ও অশেষবিধ কৃতিত্ব অর্জ্জনের মধ্যেও কোনও কৃতার্থতা নাই। অথচ আমরা সর্ব্বদা বাহির লইয়াই ব্যস্ত থাকি, একটা কিছু করিবার জন্যই অস্থির হই। এবার উৎসবের মধ্যে, নানা জনের মধ্য দিয়া, নানা প্রকারে, এই দিকে বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছ। আমরা যদি তোমারই না হইতে পারিলাম, তোমার প্রেমের ভাব না পাইলাম, তবে যে সবই ব্যর্থ হইল! তোমার কাজে যদি সর্ব্বস্ব দান করি, জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করি, তাহা হইলেও কিছুই হইল না—সমস্ত পণ্ডই হইয়া গেল! জীবনদেবতা তুমি, তুমি শুধু ডাকিয়া ও বলিয়াই ক্ষান্ত হও না, তোমার করিয়া তুলিবার নানা আয়োজনও তুমি করিতেছ। তুমি গড়িয়া পিটিয়া তোমার না করিলে আমাদের আর কোন্ উপায় আছে? আমাদের দুর্ব্বলতা তুমি সকলই জান। হে করুণাময় পিতা, তোমার করুণাই আমাদের একমাত্র আশা। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এবার তোমার করিয়া লও। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নবনবতিতম মাঘোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩১শে মাঘ (১৪ই ফেব্রুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র যে উপদেশ প্রদান করেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

ঈশ্বর অন্ধজনকে চক্ষু প্রদান করেন; লোকে ইহা কল্পনা বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু যথার্থ কথা এই যে, ঈশ্বর অন্ধজনকে চক্ষু দান করিয়া থাকেন। ঈশ্বর করুণামৃতসিন্ধু। করুণার দ্বারা তিনি জগতে অভাবনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। আমরা যে ধর্ম্মরাজ্যে বাস করিতেছি সেই ধর্ম্মরাজ্য কল্পনা নয়, আমাদের বুদ্ধিরচিত কথা নয়। ইহা পরম সত্য যে, একটা ধর্ম্মরাজ্য গঠন করিতে ভগবান অভিলাষ করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ্য গঠন করিয়া জগতের অভাব মোচন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সে কথা আজ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। কেহ ভাবিবেন না—'আমি অজ্ঞান, আমি দুর্ব্বল, আমি ব্যাধিগ্রস্ত, আমি পাপী; সুতরাং ভগবান আমাকে ডাকেন না।' ভগবান পাপীকে ডাকিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ্য গঠন করিতে হইবে। দুর্ব্বল শরীর-দ্বারা যে কিছুই করিতে পারে না তাহাকেও ডাকিয়াছেন, অজ্ঞানীকেও ডাকিয়াছেন। নরনারী সকলকে তিনি ডাকিয়াছেন, সে ভাব আজ স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে।

একশত বৎসরে কি হইয়াছে সকলে তাহা একবার স্মরণ করুন। ঈশ্বর অগোচর পদার্থ নন, তিনি অগম্য নন। তিনি জীবন্ত, জাগ্রত পুরুষ। ভাল করিয়া তাহা আজ আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রথমে প্রকাশিত হইল "ওঁ তৎসৎ", "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" মৃত জাতিকে, মৃত পুরুষ ও নারীকে যদি অমৃত করিতে হয় তবে এই মন্ত্রের প্রয়োজন। রাজা রামমোহন রায়কে এই মন্ত্র প্রচার করিতে তিনি উদ্দীপ্ত করিলেন। রাজা দেখিলেন, এই মৃত জাতির ভবিষ্যৎ যদি তেজোময়, প্রাণময় করিতে হয়, তবে "ওঁ তৎসৎ", "একমেবাদ্বিতীয়মের" উপাসক হইতে হইবে। এই মন্ত্রকে জীবনের উপাস্যরূপে গ্রহণ করিতে তিনি কি না করিয়াছেন! ইহা ত শুধু বাক্য নয়, কিন্তু প্রাণময়। চেয়ে দেখি,—এক সৎ পুরুষ ওতপ্রোত ভাবে যেমন প্রকৃতির মধ্যে তেমন আত্মার মধ্যে বর্ত্তমান আছেন। এই সৎ বহু নন। সমুদয় প্রকৃতি বলিতেছে

এক, সমুদয় মানুষের আত্মা বলিতেছে এক। মানুষ যে সমাজেই বর্দ্ধিত হউক না কেন, সব মানুষ এক, সকলের অধীশ্বর এক।

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্র কি করিয়াছে? দুধের মধ্যে দম্বল দিলে দুধ যেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, ঘন হইয়া যায়, তাহার আগের স্বাদ থাকে না, নূতন স্বাদ হয়, গুণ আগেকার মত থাকে না, নূতন গুণ হয়, তাহাকে চেনা যায় না। সেইরূপ "ওঁ তৎসৎ", "একমেবাদ্বিতীয়ম" মন্ত্র মানবের চিত্তে যদি বপিত হয় তবে তাহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। জনসমাজের মধ্যে যদি বপন করি জনসমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় না কি? একশত বৎসরের মধ্যে এই মন্ত্র কি পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে, ভাবিয়া দেখুন। ধর্ম্মের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আগে দেখুন। ব্রহ্মের উপাসনা, ব্রহ্মের উপাসনা, ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে গিয়া, কত লোক পাগল হইয়া গিয়াছে। এই উপাসনা তাঁহাদের জীবনের কি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, সকলে ভাল করিয়া চিন্তা করুন।

ওঁ তৎ সৎ, আর সৎ কেহ নাই,—এক পরব্রহ্মই সৎ। রামমোহন রায় তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার গায়ে ধূলা দিত, তাঁহাকে গালাগালি দিত, অপমানিত করিত, লাঞ্ছনা দিত, এমন কি তাঁহাকে হত্যা করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল; তবুও ওঁ তৎসৎ তাঁহাকে ছাড়ে নাই। তাঁহাকে ছাড়া জীবন ধারণ করা বৃথা। তিনি ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই। এ কথা রামমোহন রায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল! ইংলণ্ডে গিয়া যখন তিনি ইউনিটেরিয়ানদের সঙ্গে উপাসনা করিতে বসিতেন, তখন তাঁহার চক্ষু দিয়া জলধারা পতিত হইত। একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরম সৎ। তাঁহার উপাসনা করিব, চক্ষে জলধারা পড়িবে না? তিনি যে একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসক ছিলেন। দেশকে তিনি ভুলিতে পারেন নাই, তাই চক্ষের জলে অভিষিক্ত হইতেন। হায় হায়, এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ও ওঁ তৎসৎকে আমাদের দেশের নরনারীগণ ভাল করিয়া জানল না! জীবনের সার মন্ত্র তাহারা বুঝিতে পারিল না! যাহা লাভ করিলে মানুষের জীবন অমৃত হইয়া যায় সেই পথ তাহারা পাইল না! সেই দুঃখে তিনি অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতেন। রাস্তায় যাইতে যাইতে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতেন, আর তাঁহার অশ্রুজল প্রবাহিত হইত। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, আমরা সকলেই পাপী,—পতিতপাবন প্রকাশিত হইয়াছেন। মনের মধ্যে কত কুচিন্তা আছে। তাহার হস্ত হইতে যিনি উদ্ধার করিতে পারেন তিনি ওঁ তৎ সৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁহাকে না জানিলে, তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে না পারিলে কে মানুষকে কলুষ হইতে রক্ষা করিবে?

রামমোহন রায় এই মন্ত্রের যে উপাসনা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাদ্বারা জীবনে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! একমেবাদ্বিতীয়ম্ সমস্ত জগতের এক পিতা। অমুক দেশ অত্যাচারে জর্জ্জরিত, প্রাণটা কেন কাঁদিবে না? অমুক দেশ অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছে, প্রাণটা কেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে না? একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা করিলে জগতের ব্যথায় নরনারীর প্রাণ দুঃখে অভিভূত হয়। জগতের আনন্দে আপনাদিগকে ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা হয়। ইহার উপাসনা করিলে মানবজাতির ও মানব জীবনের সম্যক্ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

দম্বল কি কার্য্য করিতে আরম্ভ করে নাই? ধর্ম্মসমাজের কি পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই—মানুষ মানুষের পর নয়। ইহা মহা পরিবর্ত্তন ঘটায়।

তাহার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর - তিনি কি পাইলেন? তিনি বলিলেন, তাঁকে প্রীতি কর, তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন কর। এই হইল উপাসনা। উপাসনা যে এমন হইতে পারে এ কথা ত আগে কেহ বলে নাই। রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন বটে; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একটা সূত্র রচনা করিলেন যাহা কেহ ভুলিতে পারিল না। তিনি বলিলেন,—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" আজ বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বত্র উহা উচ্চারিত হইতেছে। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে দম্বল কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লোকে বলে, ইহা বেদ বা উপনিষদের মন্ত্র। দম্বল কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ঈশ্বরকে প্রীতি যদি না করিতে পারিলাম উপাসনা হইল না; তাঁহার প্রিয়কার্য্য যদি না করিলাম উপাসনা অসম্পূর্ণ রহিল। ধর্ম্মসমাজে থাকা বৃথা হইল। ঈশ্বরকে ঘরের লোক বলিয়া ভালবাসিব, আত্মীয় বলিয়া ভালবাসিব। একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলিয়া ভালবাসিব। পরব্রহ্ম বলিয়া ভালবাসিব এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিব, এইত আমাদের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা তিনি স্পষ্ট করিয়া জাগাইয়া দিয়াছেন।

তাহার পর মহর্ষি বলিলেন, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলের হৃদয়ে নিহিত আছে। তুমি মুচি তোমার মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি নিহিত আছে। তুমি রাস্তায় ঝাড়ু দাও, তুমি ডোম, তোমার মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি নিহিত আছে। স্ত্রীলোক,—যাহাদের স্বাধীনভাবে কোন ধর্ম্মকার্য্য করিবার অধিকার নাই—তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি নিহিত আছে। জনসাধারণ বলে ব্রহ্ম কোথায় আছেন আমরা জানি না। মহর্ষি বলিলেন, মানুষ তুমি পতিত হও, পুণ্যবান হও, তোমার মধ্যে তিনি আছেন। কি আশার কথা প্রচারিত হইল!

ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ইহাই জীবের পরিত্রাণ। তাহার পর ব্রহ্মরসামৃত পান। এ আবার কি কথা? ব্রহ্মরস,—এ কি আখের রস? এ কি মধুর রস? কোন্ রস? সকল রস অপেক্ষা বড় রস। তিনি জগতের লোককে জাগাইয়া দিয়া তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বলিয়া দিলেন—ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান,—আবার ব্রহ্মরসামৃত পান। ব্রহ্ম রসই বটেন। ব্রহ্মকে রস বলিয়া কত লোক অনুভব করিতেছেন! তাঁকে জানা যায়, ধ্যান করা যায়। রসরূপে উপলব্ধি করা যায়, সম্ভোগ করা যায়, ধ্যান করা যায়। রসরূপে উপলব্ধি করা যায়, সম্ভোগ করা যায়। দেশের পক্ষে এ কি আশার বাণী শুনাইলেন!

তাহার পর কেশবচন্দ্র সেন বলিলেন, দেখ দেখ, অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখ, কত পাপ লুকায়িত আছে। অনুতাপের আগুন জ্বলুক, বিবেক উজ্জ্বল হইয়া উঠুক। পাপ যতদিন থাকিবে, ততদিন তুমি ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে না। অনুতাপের কথা, বিবেক উজ্জ্বল করিবার কথ... ক

তেজের সহিত তিনি বলিয়া গিয়াছেন! তাহার ফলে বিবেক জাগিয়া উঠিল,—পৈতাগুলি বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল। জাতিভেদ মহাপাপ বলিয়া বোধ হইল। নিম্নশ্রেণীর লোককে ঘৃণা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা হইতে, বিবেকের জাগরণ আরম্ভ হইল। পরে কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার ফলে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ আর চলিল না। কত সমাজ-সংস্কারের স্রোত বহিতে লাগিল! তিনি প্রার্থনাদ্বারা পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভের পথ দেখাইয়া দিলেন।

তারপর আসিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। আগে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের ঘরে ধন ছিল, আহারের ক্লেশ ছিল না। শাস্ত্রীর কি ছিল? তিনি বলিলেন দরিদ্রতা আমার পৈতৃক দেবতা। হাঁ,—পৈত্রিক দেবতাই বটে। রুধিরশোষিণী পৈত্রিক দেবতাই বটে। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের কোন লোক অর্থের মুখ দেখেন নাই, ঐশ্বর্য্যসম্ভোগ কাহাকে বলে জানেন নাই। দারিদ্র্যই ছিল তাঁহাদের সম্বল। এই দরিদ্র টাকার মুখ দেখিয়াছিলেন, আরও দেখিতে পাইতেন। দরিদ্র যাহারা তাহারা ভাবে একটা যদি উপায় হয়, টাকা যদি পাই, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি। অন্ততঃ পক্ষে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে কোনরূপে দুই মুঠো অন্ন যেন দিতে পারি। শাস্ত্রী দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। কিছু অর্থও পাইয়াছিলেন। পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছু হইয়াছিল। তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "আয় দরিদ্রতা, পৈত্রিক দেবতা, তোকে বড় ভালবাসি, তুই আয়"। তিনি বলিলেন,

"খাটিতে এসেছি খাটিয়া মরিব,
কপালের ঘাম পায়েতে ফেলিব "

কাহার জন্য খাটিলেন? নিজের স্ত্রীকে সুখী করিতে খাটিতে পারিলেন না। মুখ দেখিবার জন্য তাঁহাকে একখানা আয়না কিনিয়া দিতে পারিলেন না। তিনি জলের মধ্যে মুখ দেখিতেন। জগতের মধ্যে নূতন বার্ত্তা, নূতন সমাচার কি আসে নাই? ব্রহ্মোপাসকগণ নূতন কিছু কি দেখিতে পাইতেছেন না?

"খাটিতে এসেছি খাটিয়া মরিব,
ললাটের ঘাম পায়েতে ফেলিব;
মরণের মাঝে পরাণ ঢালিব,
রচিব জগৎ নূতন ক'রে"।

জনসমাজ, নরনারী সকলকে নূতন করিয়া গড়িব।

প্রাণ ব্রহ্মপদে, হস্ত কাজে তাঁর,
এইরূপে দিন কাটুক আমার।

বাড়ীর লোকেরা খাইবে কি সেই ভাবনা করিলেন না। সম্বল যে ক্রমে জমাট হইতে চলিল! মানবের প্রাণ যে ক্রমে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে লাগিল।

প্রাণ ব্রহ্মপদে, হস্ত কাজে তাঁর—এই এক মহামন্ত্র। একটা জনসমাজকে পরিবর্ত্তন করিতে তাহার প্রয়োজন। ভাই বোনকে জিজ্ঞাসা করি, দেখিতে কি পাইতেছ—ওঁ তৎসৎ,—যাহার অপেক্ষা পরম সত্তা কিছু নাই, তিনি কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। মানবজাতির কল্যাণের জন্য ধর্ম-সমাজকে আপনারা কেমন দেখিতে চান? দশজনের কার্য্য কি হইতেছে না? নিশ্চয়ই হইতেছে।

একটী বালকের কথা বলি—২২ বৎসর বয়সে সে এই লোক হইতে অন্যলোকে গিয়াছে। সে এই সমাজের একটী ছেলে। যখন তাহার ১৬ বৎসর বয়স, সে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াইত, বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার মনে কত ভাব আসিত। সে ভাবিত আমার জীবন বৃথা যাইতেছে। ১৬ বৎসর বয়সের বালকের ভাব দেখুন। সকলে বলিবেন, এখানে ওঁ তৎসৎ একমেবাদ্বিতীয়মের কার্য্য হইতেছে। তিনি কর্ত্তা হইয়া একটা বৃহৎ সংসার পরিচালনা করিতেছেন। কি রকম করিয়া করিতে-ছেন? বালকটী প্রতিজ্ঞা করিল এই ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে—'প্রতিদিন ৫ টায় ঘুম হইতে উঠিব, তার পর পরব্রহ্মের উপাসনা করিব। তারপর ভাল পুস্তক পড়িব। কেবল পড়িয়া যাইব তাহা নহে, উহা মনে গাঁথিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিব। রাত্রিতে দিনের কার্য্য স্মরণ করিব। যে গ্রন্থ পড়িয়াছি, তাহা পুনরায় আবৃত্তি করিব।' এইরূপে ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে সে চেষ্টা করিয়াছিল। বীজ বোপন করিলাম, ফল যদি না হয় বীজ ত বৃথা হইল। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ওঁ তৎসৎ এই বীজের কোন ফল হইয়াছে কি না?

যাহার কথা বলিলাম, কিছুদিন পূর্ব্বে সেই বালকটীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু নয়,—সে অমৃত জীবন লাভ করিয়াছে। এই পৃথিবী হইতে যাওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বে সে তাহার মাকে বলিয়াছিল,—"মা, প্রাণের মধ্যে একটা সংগ্রাম চলিয়াছে; তোমার কোলে থাকিব, না, ভগবানের কোলে যাইব।" কথা শুনিয়া মায়ের প্রাণে খুব ক্লেশ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কয়েক-দিন পরে বালকটী বলিল, 'সংগ্রামটা মিটিয়া গিয়াছে, মার কোল অপেক্ষা ভগবানের কোলই ভাল'। মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবানের কোলে যাব, তোমার আনন্দ হইবে কি না?" মার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বালকটী বলিল, "মা তুমি এখনও নীচে আছ। আমি জানিতাম তুমি খুব উচ্চস্থানে গিয়াছ।" মাকে সন্তান কি বলিয়া গেল?—পরমেশ্বরের কোলে যাওয়া অপেক্ষা অধিকতর স্পৃহণীয় কিছুই নাই। ইহাতে মায়ের আনন্দ হওয়া উচিত। এই মা ব্রহ্মবিশ্বাসিনী ছিলেন, কিন্তু তবুও চক্ষু দিয়া জল পড়িল। কয়দিন যায়, ভগবানের কোলে যাবার সময় নিকট হইতে লাগিল। একদিন কাছে বসাইয়া সে মাকে বলিল, "মা, তোমার মধ্য দিয়া পরম মাকে আমি দেখিয়াছি।" ঠিক, এইত জীবন! এইত বিশ্বাসী সন্তানের জীবন। এইত আমাদের ঘরের সন্তানের উপযুক্ত জীবন। মার মধ্য দিয়া পরমমাতাকে দর্শন করিব। তারপর মৃত্যু সন্নিকট হইতে লাগিল,—সে কেবল বলিল, "ব্রহ্মনাম কি মধুর রে"! কি আনন্দ! কি সুন্দর! সাধারণ লোকে বলে ব্রহ্মনাম কি জানি না। বালক বলিল,—কি মধুর রে! যে চিকিৎসক ভগবানে বিশ্বাস করিতেন না, বালকটীর তাহাকে পছন্দ হইত না। সে একদিন ভগবানের নাম শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, আমাদের পূজনীয় প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যকে ডাকুন না কেন, তিনি আসিয়া একবার ভগবানের নাম করুন। একমেবা-

দ্বিতীয়ম্‌ ওঁ তৎসৎ দলের কি কার্য্য হইতেছে দেখুন। 'ব্রহ্মনাম কি মধুর রে' বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল। ফল কি হয় নাই? মায়েরা সব কাঁদ, চারিদিক অন্ধকার দেখ। উজ্জ্বল আলোক দেখ না কেন? ওঁ তৎসৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ সকলের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হউক।

ব্রহ্ম আমাদের সাথী হইয়া গিয়াছেন। এই কথা বলিতে আমার প্রাণটা কাঁপিতেছে। তিনি যদি আমাদের পিতা, তবে সাথের সাথী হইবেন না? তিনি যদি আমাদের মাতা, তবে সাথের সাথী হইবেন না? আপনাদের কাছে বলিতেছি, এই উপাসকমণ্ডলী যদি না থাকে আমি বাঁচিব না। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এখানে আসিলে ঈশ্বর করুণা করেন, তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। মৃত্যু হইতে অমৃতে,—অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যান। আমরা সকলে তাহার সাক্ষী। এক যুবক, যেদিন ভাল একজন আচার্য্য উপাসনা করিতেন, সেদিন সমাজে আসিত। মনের মত আচার্য্য না হইলে সে সমাজে আসিত না। এখানে যখন উপাসনা হয়, হে ভাই বোন, কে উপাসনা করে ভাবিবেন না। একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা হইবে, অতএব যাইতে হইবে। না গেলে মরিব। যুবকটী একদিন মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিল এমন একজন লোক বেদীতে বসিয়াছেন, যাঁহার উপাসনা ভাল লাগে না; সে চলিয়া গেল। ব্রহ্মপূজা যেখানে হয় তাহার দিকে পিছন দিয়া চলিয়া গেল। ক্রমে অগ্রসর হইবে,—না, পিছন দিয়া বাড়ীতে গেল! ভাবিল একাকীও ত উপাসনা হয়। সে উপাসনায় বসিবার চেষ্টা করিল। দশজন লোক যেখানে ভগবানের উপাসনা করে, হে ভাই বোন, মাঘোৎসবের দিনে বলিতেছি, সেখানে যাইতেই হইবে,—যাইতেই হইবে। কোন কাজের দোহাই দিলে চলিবে না, চলিবে না। যদি অমৃতকে পাইতে চাও তথায় যাইতে হইবে। একাকী ঘরে বসিয়া উপাসনা করিলে হইবে না। এই লোকটী তাহাই করিল। জীবনদাতা যিনি তিনি তাহাকে ত মারিবেন না। তাহাকে তিনি বলিলেন, উঠ। এই বলিয়া প্রাণের মধ্যে ধাক্কা দিলেন। গুরুজন যেমন বলেন এখান থেকে উঠ—পরমেশ্বর সেইরূপভাবে ধাক্কা দিয়া আদেশ করিলেন, উঠ। তাহাকে সমাজে আনিলেন, সে বেঞ্চিতে বসিল। ব্রহ্ম তাহার নিকটে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে এমন শান্তি দিলেন যে, সে কৃতার্থ হইয়া গেল।

আর একজনের কথা বলিব। লোকটা গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিত। আফিসের কাগজ পত্র রবিবারে বাড়ীতে নিয়া আসিত, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিত। বিষয়ের সেবা, বিষয়ের সেবা, বিষয়ের সেবা। যে দিল প্রাণ, যে দিল ধন, তাঁহার সেবা নয়। কেবল বিষয়ের সেবা! মানুষ ত এই করিয়া নষ্ট হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় সে সরকারী কাগজ রাখিয়া দিল। ভাবিল, একটু বাহিরে যাই, মাথাটা ঠাণ্ডা করি। এই বলিয়া রাস্তায় ঘুরিতে লাগিল। একবার ইচ্ছা করিল, যাই সমাজে। তারপর বলিল, না, দরকার নাই। শরীর ক্লান্ত, খোলা জায়গায় গিয়া মাথাটা ঠাণ্ডা করি। অনেকে এইরূপ করেন। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা কি করিয়া হইবে? মাথা ঠাণ্ডা হইল না। একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা করিলে তবে ত মাথা ঠাণ্ডা হইবে। বাতাস ঠাণ্ডা করিবে মাথা? ভগবানের স্পর্শ কি মাথা ঠাণ্ডা করে না? কাহারও কি করে নাই? তিনি যখন স্পর্শ করেন সমুদয় প্রাণ শীতল হইয়া যায়। লোকটী সমাজে আসিয়া উপাসনায় যোগ দিলেন। আসিয়াই শুনিলেন, গান হইতেছে,—"এই নাম নিয়ে বাঁচ কি মর কিছুতে আর ক্ষতি নাই"। কি কথা! ঐ নামে জীবন পাব। নাম না করিলে মরিব। এই পরম সত্য কথা আজ ভাল করিয়া সকলে বুঝুন। বুঝিয়া কণ্ঠহার করিয়া,—জীবনের প্রধান সম্বল করিয়া রাখুন। যদি বাঁচিতে চান আসিতে হইবে। যেমন গান শুনিল—অমনি বলিল ঠিক ত, জীবনের পথ ভুলিয়া মরণের পথে গিয়াছিলাম। সে এখন বিশ্বাসী হইয়াছে। সমাজে না আসিয়া থাকিতে পারে না।

একজন লোকের ৫।৬টী সন্তান ও স্ত্রী ছিল। তাঁহার কোন সম্বল ছিল না। চাকুরী যাহা ছিল তাহাও গিয়াছে। দূরস্থানে একটা চাকুরী জুটিল; সেখানে গিয়া শুনেন, এক মদ্যব্যবসায়ীর দোকানের মুহুরীগিরী করিতে হইবে। মদ বিক্রয় করিতে হইবে না, মদের কাছে যাইতেও হইবে না, মুহুরীগিরি করিতে হইবে। তাহার প্রাণ জাগিয়া উঠিল। ব্রহ্ম কেমন করিয়া সন্তানদের বিবেককে উজ্জ্বল করিয়া দেন! প্রাণকে স্বচ্ছ নির্ম্মল করিয়া দেন, শুনুন। একদিকে অনাহার, স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের উপবাস-ক্লেশ, অপরদিকে কাজটা রাখিব কি না—না, না, রাখা হইবে না। যাহা হয় হউক, মদ্যব্যবসায়ীর মুহুরীগিরী করা হইবে না। তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। দেখুন, দয়াল কিরূপে কাজ করিতেছে। মানবের প্রাণকে কেমন স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ করিয়া দিতেছে! তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন, গ্রাহ্য করিলেন না।

তিনি এক জমিদারের বাড়ীতে চাকুরী করিতে গিয়াছিলেন। জমিদারের মোকর্দ্দমা উপস্থিত। যদি তিনি সত্য সাক্ষ্য দেন জমিদার হারিয়া যাইবেন। তিনি ভাবিলেন, সাক্ষ্য দেওয়া দরকার। মনিবের ক্ষতি হয় হউক। সত্য রক্ষা করিতে হবে। জমিদার তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। এমন লোক দিয়া ত জমিদারের চলিবে না। ব্রাহ্ম হইতে হইলে এমনি সত্যবাদী ও নির্ভয় হইতে হইবে। কি খাইব, কি পরিব, সে চিন্তায় অসত্য পথে যাওয়া চলিবে না। ওঁ তৎসৎএর উপাসকদের জীবনে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে দেখুন।

একজন লোক কোথায়ও চাকুরী করিতেন। তাঁহার যিনি প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি দুশ্চরিত্র ও পরস্বাপহারী ছিলেন। ইনি অধস্তন কর্ম্মচারী, ব্রহ্মবিশ্বাসী ছিলেন। ইনি প্রধান কর্ম্মচারীর সেই কথা মনিবদের জানাইলেন। উচ্চ কর্ম্মচারী তখন তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া তাঁহার প্রাণ বধ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল না। কিন্তু শরীর অবশ হইয়া গেল। তাহাতেও হইল না। এ ব্যক্তি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া উচ্চ কর্ম্মচারী এক মিথ্যা ফৌজদারী মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। ওয়ারেণ্টের দ্বারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া পুলিশ তাঁহাকে দূরবর্ত্তী সহরে লইয়া গেল। তাঁহার স্ত্রী সেখানে পড়িয়া রহিল। উচ্চ কর্ম্মচারী তাঁহার স্ত্রীকে গরুর গাড়ী করিয়া

গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া এক নদীর ধারে পাঠাইয়া দিলেন। রাত্রি সমাগত,—বৃষ্টি পড়িতেছিল, গাড়োয়ান নির্জ্জন স্থানে স্ত্রীলোকটীকে রাখিয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে লাগিলেন। সতীকে রক্ষা করিবার জন্য জগতে কি কেহ নাই? যিনি আছেন তিনি শুনিলেন। নদীর অপর পারে একজনের বাড়ী ছিল। তিনি মাছ ধরিবার জন্য নদীর এই পারে নৌকায় চড়িয়া আসিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া কাছে আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলেন। লোকে বলে আমি অসহায়, আমাকে দেখিবার কেহ নাই। অবিশ্বাসী জন কেন এ কথা বলে? মা যে আছেন। তিনি অসহায় স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবার উপায় করেন। তারপর মোকর্দ্দমা যখন অসত্য প্রমাণিত হইয়া গেল, তখন সকলে বলিল—"উচ্চ কর্ম্মচারী তোমাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, কারাগারে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার নামে মোকর্দ্দমা কর"। তিনি বলিলেন,—"না, সে যাহা করে করুক, আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম।" এমন চরিত্র দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইবে না? একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা দ্বারা এইরূপ চরিত্র বিকশিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন,—ঈশ্বর কি আবার কথা বলেন? ঈশ্বর কি আবার আদেশ করেন? হাঁ, করেন। একজন বিদ্বান লোক বেশ চাকুরী করিতেন। তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কাজে আরও লোক চাই, সেই প্রয়োজন ইনি প্রাণের অন্তস্তল হইতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি প্রার্থনা করিতেন,—"ভগবান, ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য লোক দাও।" যেমন আমরা করিয়া থাকি। ব্রাহ্মসমাজকে যাঁহারা ভাল বাসেন তাঁহারা সকলেই এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। "ভগবান, কৃপাময়, করুণাসিন্ধু, ব্রাহ্মসমাজে লোকের প্রয়োজন, লোক দাও।" তিনিও এইভাবে প্রার্থনা করিতেন। একদিন ভগবান বলিলেন,—"তোকে দিলাম।" তখন প্রার্থনাকারী একটু ভয় পাইলেন। তিনি নানা-প্রকার অজুহাত দেখাইতে লাগিলেন। ভগবানকে বলিলেন, "আমি যোগ্য নই,—আমি কেমন করিয়া যাইব?" অনেকেই এইরূপ কথা বলেন। তারপর বহুদিন চলিয়া গেল, ভগবান ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন,—"তবে তুই যোগ্য হ"। যেমন মানুষ মানুষকে বলে; সে আদেশ তিনি অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। সে কথা মনে স্থান দিলেন না। কয়েক বৎসর চলিয়া গেল, তিনি যেখানে বাস করিতেন, একদিন শুনিতে পাইলেন যে, সেখানকার একজন খুব সম্পত্তিশালী ধনীলোকের মৃত্যুকাল উপস্থিত। তাঁহার লোহার সিন্দুকে কয়েক লক্ষ টাকা ছিল। সে পীড়িত হইয়া সিন্দুকের পাশে তাহার শয্যা রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিল। রোগ-যন্ত্রণায় কখনও কখনও সে অচেতন হইত। যখনই তাহার চৈতন্য হইত অমনি সে সিন্দুকের তালায় হাত দিয়া দেখিত, তাহা কেহ খুলিয়াছে কি না। যিনি নানা অজুহাতে ভগবানের আদেশ পালন করেন নাই, এই ঘটনার ভিতর দিয়া ভগবান তাঁহার প্রাণকে জাগ্রত করিয়া দিলেন। তবে ত সংসারে এই ভাবে থাকিতে হইবে। এই ত সংসার! এই ত বিষয়,—এই ত অর্থ,—এই ত পরিণাম! এমন করিয়াই কি থাকিব? তাঁহার চৈতন্য হইল। আর সহিতে পারিলেন না। তিনি বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বিদ্যা ও শক্তি লইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিবার জন্য কয়েক মাস হইল আসিয়াছেন। ভগবান নিয়ত এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছেন।

একজন লোকের চাকুরী গেল। কি খাইবেন তাহার উপায় নাই। কেহ তাঁহার নিকটে একশত টাকা পাইত, পরের দিন প্রাতে তাহা দিতে হইবে। তাঁহার কিছুই নাই, স্ত্রীর হাতে কিছু টাকা ছিল, স্ত্রীকে বলিলেন, "কাল প্রাতে ঋণ শোধ করিতে হইবে। তোমার হাতের টাকা দাও, পরে তোমাকে দিব।" স্ত্রী বলিলেন,—দিব না। ইহা অপেক্ষা বড় আঘাত আর কি হইতে পারে? ঋণের ভাবনায় সারারাত্রি বড় দুশ্চিন্তায় কাটাইলেন। পরদিন প্রাতে একজন লোক আসিয়া বলিলেন যে, এই একশত টাকা নিন। এইরূপ ঘটনা বহুবার দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি। একজনের চাকুরী গেল, কি খাইবেন উপায় নাই। আর একজন আসিয়া বলিল, আপনি প্রতি মাসে যত টাকা পাইতেন, তাহাই দিব।

বিশ্বাসী পরিবার গঠন করিবার জন্য একমেবাদ্বিতীয়ম্ মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। 'তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ।' 'প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কাজে তাঁর।' ধর্ম্মসমাজ গঠন করিবার জন্য এই সকল বাণী প্রচারিত হইয়াছে। স্বয়ং পরমেশ্বর ধর্ম্মসমাজের ভিতর মানুষের প্রাণ অনুপ্রাণিত করিতেছেন। অবিশ্বাসীর প্রাণে বিশ্বাস জাগাইতেছেন। তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

এক নারী সন্তানের আসন্ন মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া বড় কষ্টে রাত্রি অতিবাহিত করিতেছিল। ভগবান বলিলেন "জীবনের ভার আমায় দিয়ে থাকরে নিশ্চিন্ত হ'য়ে।" এই রকম আশ্বাসবাণী মা শুনিয়াছেন। ভগবান আমাদের নিত্য সঙ্গী, আমাদের হৃদয়স্পর্শকারী। তিনি আমাদের অভাব মোচন করিবার জন্য সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত।

এদেশে বিশ্বাসী দলের প্রয়োজন হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের কয়েকটী বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম বিঘ্ন, ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন, বীতরাগ ও অবিশ্বাসী অনেক লোক দেশের মধ্যে দণ্ডায়মান হইতেছে। ধর্ম্ম যদি যায়, কোথায় থাকে মানুষ, কোথায় থাকে জাতি, কোথায় থাকে দেশ? ধর্ম্ম ভিন্ন রক্ষার উপায় নাই।

দ্বিতীয় বিঘ্ন,—বিষয়াসক্তি, অর্থপিপাসা। মানুষ বিষয়াসক্তিতে ডুবিয়া মরিতেছে। কেবল অর্থের অন্বেষণে ছুটিয়াছে। ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার সময় নাই। অন্নগ্রাসের সময়ও ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করে না। অর্থপিপাসা মানুষকে একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিতেছে।

তৃতীয়তঃ, মানুষ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া একমেবাদ্বিতীয়মকে আর স্বীকার করিতেছে না। পরস্পর স্বার্থের জন্য দেশের মধ্যে মহা অনর্থ ঘটাইতেছে। কে তাহা দূর করিবে? এই যে ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা, বিষয়াসক্তি, অর্থপিপাসা যাহার জন্য নানাপ্রকার অধোগতি,—এই সকলের হস্ত হইতে কে রক্ষা

করিবে? ওঁ তৎসৎএর উপাসকগণ, তোমরাই রক্ষা করিবে। এমন সমাজ গঠন করিবে যেন চারিদিকে বিশ্বাসের আগুন জ্বলিয়া উঠে। ভগবানকে পিতা বলিয়া ডাকিবে। অর্থ-পিপাসা মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়। সম্প্রদায় দ্বারা মানুষকে ছোট করিয়া রাখা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। বিশ্বাসী দল, তবে উঠ। প্রাণের মধ্যে ব্রহ্ম কার্য্য করিতেছেন তাহা দর্শন কর। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'ওঁ তৎসৎ' নামে আপনাদিগকে সঞ্জীবিত করি। দেশের লোককে দেখাও, ধর্ম্ম তোমাদিগকে কিরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। যাহারা ছিল পাপী তাহারা হইয়াছে পুণ্যবান্। যাহারা ছিল অবিশ্বাসী তাহারা হইল বিশ্বাসী। যাহারা ছিল অপ্রেমিক তাহারা হইল প্রেমিক। যাহারা সেবাকে কষ্টকর কার্য্য বলিয়া মনে করিত তাহারা হইল জনসাধারণের সেবক। যাহারা ছিল ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাপূর্ণ, তাহারা হইল আস্থাবান্।

এইরূপ এক ধর্ম্মসমাজ গঠনের আয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা আসেন নাই তাঁহারা আসিয়া এই সমাজকে পরিপুষ্ট করুন। একমেবাদ্বিতীয়ম্-পতাকাতলে দণ্ডায়মান হউন। ওঁ তৎসৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌কে সারমন্ত্র করিয়া ধর্ম্মসমাজকে প্রবল শক্তিশালী করিয়া তুলুন। জগতের মধ্যে এক ঈশ্বর, সমুদয় মানব এক। এই মহামন্ত্র যেদিন ভাল করিয়া দেশের লোক জানিবে সেদিন কি এক আনন্দময় প্রেমের পরিবার হইবে! তাহা দেখিবার জন্য কি সাধ হয় না? যদি হয়, তবে এই জন্য শ্রম করিতে অগ্রসর হউন। ব্রাহ্মদের নিকট মাঘোৎসবে আমার এই প্রার্থনা।

ভগবান, সৎস্বরূপ তুমি! তোমাকে কেবল জানি। তোমাকে কেবল ডাকি। তোমার উপাসনায় আপনাদিগকে নিয়োগ করি। এমন একটী সমাজ তৈয়ারী করিব—"মরণের মাঝে পরাণ ঢালিব" এই ব্যাকুলতা আমাদের প্রাণে হউক। "গড়িব জগৎ নূতন ক'রে" এই সঙ্কল্প আমাদের মধ্যে হউক। "আপনি যাচিয়া ধর্ম্ম পরকে শিখাই," এই নীতি আমাদের হউক। অভাজন আমরা, অধম আমরা; তবু হে বিশ্বপতি, আমাদের মধ্যে তোমার কার্য্য হইতেছে। তোমার দয়া আমরা উপভোগ করিতেছি। তোমার শক্তি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইতেছে। প্রভো, অনেক দয়া করিয়াছ। আজ বারংবার বলি, অনেক দয়া করিয়াছ। সব দয়া স্মরণ করিয়া বলি, আজ প্রাণের ভিতর তোমার পতাকা উত্তোলিত হউক। প্রাণের মধ্যে তোমার পূজা প্রতিষ্ঠিত হউক। সকলের মধ্যে তুমি আরও দৃঢ়রূপে বস। তুমি বলিতেছ "আমার পুত্র কন্যাগণ, আমার কার্য্য যে অপূর্ণ রহিয়াছে। দেশের মধ্যে যে অনেক পাপ তাপ আছে, অনেক দুঃখক্লেশ আছে। পুত্র কন্যা, তোমরা কি আমার ডাক শুনিবে না? তোমরা কি আমার রাজ্যকে বড় করিতে চেষ্টা করিবে না? ভূমণ্ডলে চাহিয়া দেখ, কতলোক আমার ডাক শুনিয়াছে। তাহারা কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তোমরা কি হইবে না? ধর্ম্মসমাজের লোক কি হইবে না?"

আর যেন তোমার তিরস্কার না শুনিতে হয়! তোমার জাগ্রত জীবন্ত করুণার পরিচয় আমরা পদে পদে পাইতেছি। এত করুণা যাহারা পাইল তাহারা কি অকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে? আমরা তোমাকে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিব।

"যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনিয়া চলি তোমারি ডাক"
এই মন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষিত কর। তোমার সেবা করিবার জন্য আমাদের সকল প্রাণকে উদ্দীপ্ত কর। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হইলেও মন্দির একেবারে লোক-শূন্য হয় নাই। কেহ কেহ ব্যক্তিগত ধ্যান প্রার্থনা সংগীতাদিতে নিযুক্ত থাকেন। প্রাঙ্গণে বহু লোক প্রীতিভোজনে যোগ দান করেন। অনন্তর এক ঘটিকার সময় পুনরায় উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

উৎসবের মধ্যে এই কয় দিন আমরা অনেক সুন্দর কথা শুনিলাম, বহু অমূল্য উপদেশ ও তত্ত্ব লাভ করিলাম, আনন্দও যথেষ্টই প্রাপ্ত হইলাম; সর্ব্বোপরি করুণাময় উৎসবদেবতার প্রেম ও করুণাও প্রচুর পরিমাণেই উপভোগ করিলাম। আরও কত পাইব জানি না। কিন্তু ইহাতেই কি যথেষ্ট হইল? উৎসবের সার্থকতা সাধিত হইল? কখনই নয়। এ পর্য্যন্ত ত অনেক শুনিয়াছি ও জানিয়াছি। তাহার কতটা আমরা জীবনে আয়ত্ত করিয়াছি? তদনুরূপ জীবনগঠনে কতটুকু সমর্থ হইয়াছি? তদ্ব্যতীত উহাদের সার্থকতা কোথায়? স্বীকার করিতেই হইবে যে তাহা না হইলে সবই নিরর্থক, নিতান্তই ব্যর্থ। সাধারণতঃ আমরা আনন্দকে উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়াই মনে করি, সন্দেহ নাই। আনন্দ সকলের নিকটই অতি লোভনীয় বস্তু। কিন্তু আনন্দের দ্বারা উৎসবের সফলতা বিচার করিতে গেলে আমরা মহা ভ্রমেই পতিত হইব। উৎসবে যে শুধু আনন্দই সকল সময় পাওয়া যায় তাহা নহে। অনেক সময় গভীর দুঃখ বেদনাও উৎসবের গভীরতা সূচনা করে। যখন অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধবিদগ্ধ হয়, অন্তর হইতে হৃদয়ভেদী ক্রন্দনধ্বনি ও আকুল প্রার্থনা উত্থিত হয় এবং ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়াও আবার উঠিবার জন্য মহৎ সঙ্কল্প প্রাণে জাগে, তখন উৎসব যেরূপ সার্থক ও সফল হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে, আনন্দোচ্ছ্বাসের মহা প্লাবনেও কি সেরূপ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায়? কখনই নয়। আনন্দোচ্ছ্বাস নানা কারণেই হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। অধিকাংশ সময়ই তাহা অতি অল্পকালস্থায়ী হইয়া থাকে—অনেক সময় মন্দির হইতে বাহির হইতে না হইতেই তাহা উড়িয়া যায়। সাধারণতঃ তাহা জীবন-গতিতে কোনও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না। এরূপ আনন্দোচ্ছ্বাসে বিশেষ কোনই লাভ নাই। বাহিরের অনেক কারণেও আনন্দোচ্ছ্বাস উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা ছাড়া শুধু আনন্দই যে প্রেমময়ের কৃপার দান তাহা নহে। দুঃখ বেদনাও অন্ততঃ সমান পরিমাণেই সেই করুণারই দান, এক স্নেহ প্রেমেরই নিদর্শন। তাঁহার সকল দানই সমভাবে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার কত অযাচিত দান ত আমরা প্রতিনিয়তই প্রাপ্ত হইতেছি! অধিকাংশ সময়ই ত তাঁহাকে ভুলিয়াই সে সমস্ত উপভোগ করি। যখন একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করিয়া থাকি তাহাও যে কত গভীর সে কথা কে বলিবে? অথচ যে যে-পরিমাণে কৃতজ্ঞচিত্ত সে সেই পরিমাণেই নূতন দান পাইয়া থাকে। অকৃতজ্ঞ হৃদয় দান সম্যক্ প্রকারে গ্রহণ করিতে পারে না। প্রেমময় যে তাঁহার স্নেহ ও দয়া কোনও প্রকারে সঙ্কুচিত করেন, তাহা নহে। আমাদেরই হৃদয় সঙ্কুচিত হয় বলিয়া আমরা ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, সুতরাং বহু পরিমাণে বঞ্চিত হই। এই হেতু উৎসবকে সফল করিতে হইলে, তাহাদ্বারা প্রকৃতরূপে লাভবান্ হইতে হইলে, সর্ব্বোপরি কৃতজ্ঞচিত্ত হইতে হইবে। এতৎ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কতকগুলি বাক্যযোজনার ব্যাপার মাত্র নহে। বরং উহা বাক্যে প্রকাশিত হউক বা না হউক তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। উহা সম্পূর্ণই হৃদয়ের অবস্থা বিশেষ। হৃদয় যতই কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য দান করিবে, ততই সকল অর্গল খুলিয়া যাইবে, প্রাণ প্রশস্ত হইয়া উঠিবে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দান সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। এই জন্যই পাইতে হইলে কিছু দিতেও হয়। দেওয়া ভিন্ন পাওয়া যায় না—যাহা পাওয়া যায় তাহাও ভাল করিয়া সংগ্রহ করা যায় না। এই দেওয়া বাহিরের কিছু দেওয়া নয়, আপনাকে দেওয়া। আপনাকে না দিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তাঁহাকে সত্যরূপে জীবনে পাইতে হইলে, উৎসব জীবনে যথার্থ রূপে সার্থক ও সফল করিতে হইলে, আপনাকে দিতে হইবে, তাঁহার হাতে আপনাকে অর্পণ করিতে হইবে। এই আপনাকে দেওয়া সহজ নয়, মুখে বলিলেই দেওয়া হয় না। দিতে হইলেই কিছু হইতে হইবে—তাঁহার অনুগত হইতে হইবে, জীবনের গতি ফিরাইতে হইবে—আপনার ভাবে, আপনার পথে চলিলে কিছুতেই হইবে না। চাহিবামাত্রই যে আপনার পথ ছাড়িয়া তাঁহার পথে চলা যায়, অনুগত জীবন লাভ করা যায়, তাহা নহে। জীবনকে সেই ভাবে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতে হয়। ইহা কতকগুলি বাহিরের কাজ নয় যে যে-কোনও প্রকারে করিয়া গেলেই হইল। সত্যভাবে সর্ব্বপ্রকারে অনুগত না হইলে, অন্ততঃ কিছু পরিমাণে নূতন মানুষ না হইলে, এস্থলে কিছু করা সম্ভবপর নয়, কিছুতেই আপনাকে সত্যভাবে দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে হওয়া ব্যতীত দেওয়া যায় না। সুতরাং এই হওয়াটাই উৎসবের সর্ব্বপ্রধান কথা। ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত উৎসব সফল হইয়াছে বলিয়া আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারি না। এই সত্যভাবে তাঁহার হওয়ার গুরুত্বটা আমরা যে কতটুকু অনুধাবন করিতে পারিয়াছি জানি না। বিশেষ দুই একটি বিষয়ে দুই চারি দিনের জন্য তাঁহার হইলেই যথেষ্ট হইল না। সকল বিষয়ে সকল অবস্থাতে সকল সময়ে চিরদিনের জন্য তাঁহার হইতে হইবে। তাহা ব্যতীত জীবনের কৃতার্থতা নাই। গ্রীকদেশীয় "ইয়োলীয়ান হার্প" বা বীণার কথা আমরা অনেকেই শুনিয়াছি। মুক্ত আকাশের তলে বৃক্ষের ডালে ডালে তার যোজনা করিয়া এই বীণা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাই বায়ু যখন অতি মৃদুমন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হয়, তখনও তাহা হইতে স্বতঃই সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে, কখনও উহা সম্পূর্ণ নীরব থাকে না। আর বায়ু যতই প্রবল হইতে প্রবলতর বেগে বহিতে থাকে ততই তাহা হইতে উচ্চ হইতে উচ্চতর, মধুর হইতে মধুরতর, সঙ্গীতের ঝঙ্কার বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব মধুরতায় প্লাবিত করিয়া দেয়—আর ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝাবাত যখন সমস্ত জগতকে তোলপাড় করিয়া তোলে, তখন তাহা হইতে আরও মিষ্টতর গভীরতর প্রবলতর ঝঙ্কারধ্বনি বহির্গত হইয়া অপর সকল কোলাহল ডুবাইয়া দেয়, সমস্ত বিশ্ব অশ্রুতপূর্ব্ব আনন্দে ও মাধুর্য্যে নিমগ্ন করিয়া দেয়, সব মধুময় করিয়া ফেলে। বাস্তবিকই তাঁহার অনুগত জীবন লাভ করিলে, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হইয়া গেলে, এইরূপই সম্পদে বিপদে, জীবনে মরণে, শোকে আনন্দে, সকল অবস্থাতে সকল মুহূর্ত্তে জীবন হইতে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসাগীতের নীরব ও সরব মধুর ধ্বনি স্বতঃই নিয়ত উঠিয়া থাকে। আমাদের জীবনকে এরূপ কৃতজ্ঞতায় জীবন্ত নিদর্শনরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে আমরা সকল ব্যবস্থাই কৃতজ্ঞচিত্তে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারি। কেবল সৌভাগ্য ও আনন্দ খুঁজিলে চলিবে না। কেবল তাঁহার দর্শন পাইলেই উৎসব সফল হয়, এমনও নহে। তাঁহার প্রকাশ বা দর্শন না পাইলেও উৎসব সার্থক হইতে পারে। সর্ব্বোপরি উক্ত প্রকার জীবন আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে। আমাদিগকে সত্য কিছু হইতে হইবে। এই হওয়াটাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। ১০ই মাঘ রাত্রিতে আচার্য্য মহাশয় এরূপ মহা সৌধ নির্ম্মাণের কথাই বলিয়াছিলেন। ইহার জন্য এই মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে নিযুক্ত হইতে হইবে। উৎসবকে সফল ও সার্থক করিতে হইলে অন্য সব ছাড়িয়া ইহাকেই প্রধান লক্ষ্য স্থানে রাখিতে হইবে। করুণাময় পিতা আমাদিকে আশীর্ব্বাদ করুন আমরা তাঁহার হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই, উৎসব আমাদের সকলের পক্ষে সত্যই সফল হউক।

অনন্তর ডাক্তার ড্রামণ্ড ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আবার ৪ ঘটিকার সময় ইংরাজীতে উপাসনা হয়। ডাক্তার সাউথওয়ার্থ আচার্য্যের কার্য্য করেন। কয়েকটি ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা সমস্বরে ইংরেজী সংগীতাদি করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। ইহার পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে এবং সায়ংকালে আবার উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "সত্যংশিবং সুন্দরং রূপভাতি হৃদিমন্দিরে" ইত্যাদি প্রথম সংগীতটি গীত হইলে তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন:—

বৃহত্তর পরিবারের কথা আমরা অনেক বলিতেছি ও শুনিতেছি। ইহা কল্পনাপ্রসূত কথা নয়। প্রেমস্বরূপের কৃপায় তাঁহার চরণস্পর্শে আত্মা তাহার ক্ষুদ্র বাহু প্রসারিত করিয়া জগতকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে। এই পরিবার কেবল ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা সাধু ভক্ত আচার্য্য তাঁহাদের লইয়া নয়। বিদেশীয় জ্ঞানী, পণ্ডিত, সাধু, ভক্ত, ধার্ম্মিক, আচার্য্য, তাঁহাদের লইয়াও নয়। স্বদেশস্থ বিদেশস্থ ইহকালস্থ পরকালস্থ সকলেই এই পরিবারের অন্তর্গত।

আপনারা আমাকে যে কাজের ভার দেন, তাহা বড় সঙ্কোচের

সহিত গ্রহণ করি। এই কাজ করিতে আসিয়া যাঁহাদের মুখে একটু জ্যোতি দেখি, একটু সহানুভূতির চিহ্ন দেখিতে পাই, তাঁহাদের নিকট আপনাকে বড়ই উপকৃত বোধ করি। উপাসনার স্থলে যাহাদের পাই তাঁহারা কেমন করিয়া যে আপনার হইয়া যান, বলিতে পারি না, বুঝাইতে পারি না। আপনা হইতে তাঁহাদের প্রতি প্রাণের প্রীতি ধায়, শ্রদ্ধা যায়। কিন্তু আজ এই ক্ষুদ্র পরিবারের কথা বলিব না। আজ যে বৃহত্তর পরিবারের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহাই ভাবিতেছি। এক প্রাচীন ব্যক্তির কথা স্মরণ হইতেছে। সে ব্যক্তি কে জানি না। David's Psalmsএর (দায়ুদের সংগীতাবলীর) দুই একটা মাত্র Davidএর (দায়ুদের), আর সব কাহার জানি না। সে যাহা হউক, এক একটা কথায় প্রাণের তার বাজিয়া উঠে। সেই দূর দেশের, সুদূর কালের কথা। একটা কথা বিশেষভাবে মনে হইতেছে, কয়েক মাসই মনে হইতেছে—"Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength." (অপোগণ্ড বালক বালিকা ও স্তন্যপায়ী শিশুর মুখ হইতেও তুমি বলাবধানের ব্যবস্থা করিয়াছ।) স্তন্যপায়ী শিশুর মুখে এমন কথা শুনিয়াছি যাহাতে আমার প্রাণে বল পাইয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বেদীতে বসিয়াই কয়েকটি মহিলার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলাম "কি বিশ্বাস! রেখে দাও তোমার বিদ্যাবুদ্ধি।"—"পারবে না তরাইতে তারা, বরং ডুবাইতে পারে রে।" আমাদের এক পরম স্নেহাস্পদ যুবকের পরলোকগমনের কথা প্রাতে শুনিয়াছেন। অনেক সময়ই ইঁহাদের কথা মনে হইয়াছে। দুইজন যুবককে আমরা হারাইয়াছি—একজনের কথা কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় বলা হইতেছিল। মৃত্যুশয্যায় সে বিশ্বাসের যে পরিচয় দিয়াছে তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "আমার এতটা বিশ্বাসের বল নাই।"

আজ আমরা ভিক্ষা করি, অন্তরে সে ভাব হউক যাহাতে প্রাণ হইতে বলিতে পারি "তাঁহার কৃপা ভিন্ন অন্য সম্বল নাই।" তিনি অন্ধকে দিব্যদৃষ্টি দেন। স্নেহের সন্তানকে হারাইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম—তাহাকে হারাই নাই জানিতাম। কিন্তু প্রাণের প্রিয়ধন কেমন আছে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম—তাহার মঙ্গল সংবাদ না পাইলে আমার দিন কাটিতেছে না। পরমপিতা স্নেহের সঙ্গে তিরস্কার করিলেন, "অস্থির হও কেন? তোমার সন্তান আমার কাছে ভালই আছে।" স্নেহের তিরস্কারের মিষ্টতা জীবনে আস্বাদন করিয়াছি। তাঁহার কৃপাধারা অন্তরে নামিয়া আসিল। তিনি যখন কৃপা করেন নিমেষে শান্তি আসে। দেশবাসী শোকে তাপে হায় হায় করিতেছে। আজ তাঁহার কৃপা বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের দৃষ্টি, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার সহিত একীভূত হইয়া যাউক। যাহা অসম্ভব দেখি তাঁহার কৃপাতে তাহা সম্ভব হয় দেখিয়াছি। আজও তাহা দেখি। অন্যের কথা জানি না। আমার কথা ভালরূপে বলিতে পারি। তিনি বলিতেছেন "তোমরা আমাকে ভাল করিয়া ধর। আনন্দ লইয়া যদি না পার, ব্যথা লইয়াই ডাক।" তিনি ভিন্ন আর গতি নাই। এই ভাবটি অন্তরে অনেক সময় আসে যে প্রেমের পথে চলিতে গেলে ব্যথা পাইতেই হইবে। ব্যথার ভয়েই কি প্রেমের পথ ছাড়িব? প্রেমধর্ম্ম-সাধনে ব্যথা আছে; তাহা বরণ করিয়া লইতে হইবে। আমরা ভিক্ষার্থী হইয়া কাতর প্রাণে তাঁহার চরণতলে আসিয়াছি। তিনি আমাদের সকলের নিরাশ প্রাণে আশা দিউন, অন্ধকার হৃদয়ে আলোক দিউন। হে প্রেমস্বরূপ, তুমি আমাদিগকে তোমার চরণভিখারী কর, আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হও। তোমার কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তোমার প্রকাশ-মন্দির আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হউক। আজ আমরা তোমার চরণতলে সকলে সমবেত হই।

"সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি" ইত্যাদি দ্বিতীয় সংগীত হইবার পর আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনা। অনন্তর "দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে" তৃতীয় সঙ্গীতান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

শাস্ত্রী মহাশয়কে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "দেখ শিবনাথ, তোমরা সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং ইত্যাদি বাক্য কি ভাবে উচ্চারণ কর জানি না। আমি কিন্তু উহার এক একটি কথার মধ্যে সাগর দেখি।" তাই আজ এই 'সত্যম্' বাক্যটি সম্বন্ধে দুই একটি চিন্তা যাহা আমার মনে আসিয়াছে আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই।

ব্রহ্মের নাম-মন্ত্রে তুমি তো সাগর দেখিলে না! মহা ধনের, পরম ধনের অভাবে যদি খেদ আসে, তবে সে খেদও ভাল। এই 'সত্যম্' সাধনে জগতের ঋষিগণ কতটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন তাহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। 'সত্যম্' এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারা জগৎকে ভুলিয়া গেলেন। তাঁহাদের নিকটে—"সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম" হইয়া গেল। ঋষি এমার্সন বলিয়াছেন, পরম সত্য যাহা তাহাকেই মানুষ কল্পনা মনে করে। কল্পনা অর্থে ব্রহ্ম ছাড়া আর যাহা কিছু সমস্ত বুঝিতে হইবে। "The world has agreed to accept fact for fiction and fiction for fact". (কল্পনাকে সত্য বলিয়া এবং সত্যকে কল্পনা বলিয়া গ্রহণ করিতে জগত একমত হইয়াছে।) দেখুন উপনিষৎকার ঋষি ও এমার্সন এক যায়গায় মিলিয়া গিয়াছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন "তিনি যদি অন্তরে প্রকাশিত হয়েন তবেই শান্তি"। "প্রাণস্য প্রাণং মনসো মনঃ" এই বাক্যটি যদি সত্য সত্য অস্থিমজ্জাগত করিয়া লইতে পারি, তবে আর পাপ তাপ কোথায় রহিল? প্রাণের উৎস হইয়া তিনি অন্তরে রহিয়াছেন। তিনি যে "well of living waters",—যে জল প্রাণ দেয় সেই জলের নিয়ত প্রবহমান উৎস। তিনি তো আমার অন্তরেই আছেন। সেণ্টপলের মতন ব্যক্তিও পাপের জ্বালায় বলিয়াছিলেন "আমি মরিলেই বাঁচিতাম!" কিন্তু সাধ্বী ম্যাডাম গিয়োঁ বলিলেন—"আর আমার পাপ নাই।" ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কিরূপে নির্য্যাতন করিয়াছেন সকলেই জানেন। এ সব কথা বলি কেন? এই আলোক নিজেদের

চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখা ভাল। তাহাতে যদি আপনাদের দারিদ্র্য বুঝিতে পারি, তবে তাহাতে আমাদের কল্যাণ।

ম্যাডাম গিয়োঁর আর একটি কথা বলি। স্বামী সুন্দর ফুলের বাগান রচনা করিয়াছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বাগান কেমন দেখিলে?" ম্যাডাম গিয়োঁ বলিলেন, "তোমার বাগানের কথা ভাবি নাই, আমি আর একজনকে ভাবিতেছি।" এই কথা শুনিয়া স্বামী অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন! কাল শ্রদ্ধেয় আচার্য্য মহাশয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসম নবদ্বীপচন্দ্রের জীবনী বলিয়াছিলেন। একটি ব্রাহ্ম-পরিবার সুদূর পল্লীতে একাকী আছেন শুনিয়া তিনি ১৭ মাইল গরুর গাড়ী করিয়া যাইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একদিন থাকিয়া আবার চলিয়া আসিলেন, এই কথা আপনারা কাল শুনিয়াছেন। ইহাকেই বলে প্রচার, সেবা। তাঁহার একটী কথা এখন মনে হইতেছে। দারাজিলিং গিয়া একদিন প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তুষারাবৃত পর্ব্বত-মালার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলাম। নবদ্বীপচন্দ্র আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন। আমি কথা না বলিয়া গিরিশৃঙ্গগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বুঝাইলাম তাহাতে ব্রহ্মের মহিমা দেখিতেছি। তিনি বলিলেন, "বুঝিয়াছি, কিন্তু তাঁহাতেই তাঁহাকে দেখিতে হবে।"

আমি যুবক ও যুবতী বন্ধুদের Mrs. Browning এর "The Sleep" কবিতাটি পাঠ করিতে বলি—মধুর কবিতা! ম্যাডাম গিয়োঁ বলিলেন—আমার পাপ নাই। মৃত্যু গেল, ব্যথা গেল, পাপও গেল। কিন্তু তাহাতেও অভাব গেল না। যদি তোমাকে অন্তর মাঝে না পাইয়া থাকি তবে আমি অতি দীন ভিখারী। ধর্ম্মাচার্য্যদের কথা উল্লেখ করিব না, শেলীর সেই কবিতাটি যাহা Palgrave's Golden Treasuryতে—"A Dream of the Unknown"—নামে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই উল্লেখ করি। কতই যত্ন করিয়া পুষ্প চয়ন করিলেন! পুষ্পগুচ্ছ রচনা করিয়া ভাবিলেন "কাহার চরণে দিব?"—'Oh, to whom?" সেই আবতায় রাজরাজেশ্বর ব্যতীত আর আরাধ্য নাই। এমার্সন বলিয়াছেন—"Let the Lord of my castle appear, and I will lay the keys at his feet" (আমার হৃদয়েশ্বর আসিয়া উপস্থিত হউন, আমি আমার হৃদয়দুর্গের চাবি তাঁহার চরণতলে অর্পণ করিব।)

দান্তে (যাঁহার পরলোকে বিয়াট্রীসের সঙ্গে মিলন সম্বন্ধে কার্লাইল বলিয়াছেন যে প্রেমের চিত্র এমন সুন্দর করিয়া আর কোনও কবি অঙ্কিত করিতে পারেন নাই) যখন সকল সৌন্দর্য্যের উৎস যিনি তাঁহাকে দেখিলেন, তখন তিনি বিয়াট্রীসকেও ভুলিয়া গেলেন। অনুতাপে যে পাপী শুদ্ধ হইয়া যায় দান্তে তাহার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতি অপূর্ব্ব। এক একটি পাপী উদ্ধার হইতে লাগিল আর স্বর্গে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। পতিতপাবনকে না দেখিলে আমরা শুদ্ধ হইতে পারি না।

বহির্জগতের সাহায্য লইতে হইবে, সত্য। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—এই গাঁদা ফুলের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতেছি। বর্দ্ধমানের উৎসবে গেলেন, উপাসনা করিলেন, জমাট হইল না। তারপর রাজপথে চলিতে চলিতে দেখিলেন অশোকফুলগুলির চারিদিকে অনেক মৌমাছি গুণ্ গুণ্ করিয়া ফিরিতেছে, অমনি বসিয়া পড়িলেন, ধ্যাননিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মন অসীমের চিন্তনে ডুবিয়া গেল। সেদিন সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেখাইলেন দেবেন্দ্রনাথ বহির্জগতে অনন্তস্বরূপের অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিয়া কেমন করিয়া ডুবিয়া যাইতেন। কিন্তু অন্তরে তাঁহার যে প্রকাশ সেখানেই অসীমের দর্শন প্রকৃত রূপে পান। সে দিন প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় আরাধনায় বলিলেন "প্রাণ-কমলের তুমি মৃণাল।" অতি মধুর কথা। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "বাহিরে আমরা তাঁহার প্রতিরূপ দেখি, অন্তরেই তাঁহার স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়।"

চারিদিকে প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসার অভাব দেখা যাইতেছে। দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত একখানা অপূর্ব্ব গ্রন্থ। কিন্তু তাহা অল্প লোকেই পড়িয়া থাকে। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে একটা intellectual curiosity (জ্ঞানপিপাসা) জাগিল না! লেখা পড়া শিখিয়া তবে কি হইল? দেবেন্দ্রনাথের মত অন্তরে অসীমের প্রকাশ দেখিয়া এ কথা কেন বলিতে পারি না—"আমার চক্ষু গিয়াছে, কাণও গিয়াছে, মনও গিয়াছে, এক অসীমে ডুবিয়া আছি"। যদি অন্তরে তাঁহার প্রকাশ হয় তবে যাঁহার প্রতি ব্রহ্মের এরূপ কৃপা হইয়াছে তাঁহাকে উপনিষদের কথায় বলিতেই হইবে "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।" যে ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে আত্মস্থ দেখিতে পান তাঁহাদেরই শাশ্বত শান্তি, অপরের নহে।

ডাক্তার মার্টিনো বলিয়াছেন—"Do we not know that the things of external nature—trees, grass, houses, hills, other persons, animals, skies—are really our soul's foreign lands, the lands which the mind reaches by journeying away to a distance? The own country of us all, the land in which we habitually dwell, is the internal world of our own thoughts." "The things which are seen are temporal, but the things that are not seen are eternal.") "আমরা কি জানিনা যে এই বহির্জগৎ—বৃক্ষলতা, গৃহ, পর্ব্বত, আকাশ, বাতাস, জীবজন্তু, অপর লোক, সমস্তই প্রকৃত পক্ষে আত্মার বিদেশ, অনেকটা দূরে গিয়াই মন সেই দেশে পৌঁছে। আমাদের সকলের স্বদেশ, যেখানে আমরা সর্ব্বদা বাস করি, সে আমাদের অন্তর-রাজ্য। যে সকল বস্তু চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় তাহা পার্থিব—ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যাহা দেখা যায় না তাহাই চিরন্তন।" অন্তরেই আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারি। আর তাহার উপরেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত। বাহিরে গেলেই দূরে চলিয়া যাইতে হয়, বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। আমাদের সঙ্গীতে আছে—"মন চল নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে

বেদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।" বহির্জগত আত্মার বিদেশ—অন্তররাজ্যই আমাদের প্রকৃত স্বদেশ, "নিজ নিকেতন"। মনে হয় যেন ডাক্তার সাণ্ডার্ল্যাণ্ড এখানে উপনিষদের "তমাত্মস্থং" কথাটিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন! অন্তরতর অন্তরতমের কথাই বলিয়াছেন। শুনিয়া মাথা হেঁট হয়। সেণ্ট লরেন্সকে কটাহে তপ্ত তৈলে ফেলিয়া দেওয়া হইল। কি কষ্ট সহ্য করিতে পারে লোকে যদি তাঁহাকে পায়! সেণ্ট লরেন্স বলিলেন, "এ পাশটা উল্টাইয়া দেও, এদিকটা হইয়া গিয়াছে।" সত্য কথা "অন্তরতর অন্তরতম" এই বাক্যটি সাধন করিতে হইবে। আমাদের আচার্য্যদের এক জনের নাম করিয়াছি। অন্যদেরও দেখিয়াছি। রাজনারায়ণকে দেখিয়াছি। তাই আজ "তমাত্মস্থং" এই ভাবটি অন্তরে লইয়া যাই। ডাক্তার সাণ্ডার্ল্যাণ্ড যে কথাটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই কথাটিই ভাবিতে ভাবিতে আজ সকলে গৃহে যাই।

রাজরাজচরণে মস্তক লুণ্ঠিত হউক। কেবল পাপব্যথাহারী রূপে নয়, কেবল মৃত্যুব্যথাহারী রূপে নয়, যে পূজার আর সীমা নাই সেই চির পূজার মন্দিরে, অখিলপূজিতরূপে তাঁহাকেই চিরধ্যেয় চির অর্চনার পাত্র রূপে দেখি। তোমার অভয়পদে আশ্রয় পাইয়া আমরা জগতে তোমার নাম প্রচার করি, এই ভিক্ষা দাও, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন হইয়া অদ্যকার মহা মহোৎসব শেষ হয়। অনন্তর অনেকে পরস্পর আলিঙ্গনাদি করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

১২ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। আরাধনার পর শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার বসু মহাশয়, সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এখন হইতে ব্রাহ্মসমাজের সেবার কার্য্যে আপনাকে অর্পণ করিবেন, এই সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। সতীশ বাবু তাঁহার এই সঙ্কল্প সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিয়া, তৎপরে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন:—

প্রেমের সেবা।

"If I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I am become sounding brass, or a clanging cymbal. And if I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. And if I bestow all my goods to feed the poor, and if I give my body to be burned, but have not love, it profiteth me nothing." (I. Cor. 13, 1-3. (Revised Version).

আজ সাধনাশ্রমের উৎসব। আজ সাধনাশ্রমের সেবকদলের জন্য আমার কিছু নিবেদন করিবার কথা। কিন্তু সেবার জীবনের অন্তরতম বিষয়সকলে গৃহী ও ঈশ্বরসেবক এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, কি গৃহ পরিবারে, কি ধর্ম্মসমাজের ও দেশের সেবাক্ষেত্রে, উভয় স্থানে, ঈশ্বর মানবমনকে একই ভাবে অনুপ্রাণিত করেন, এবং মানুষে মানুষে প্রেমের ব্যবহারের একই বিমল আদর্শ প্রকাশিত করেন। আমি আজ যাহা নিবেদন করিব, তাহা ঈশ্বরসেবক ও গৃহী উভয়েরই জন্য।

আমি আজ যাহা নিবেদন করিতে চাই, অনেক দিন হইতে আমার মনকে তাহা পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহা আজ বলিব কি না, এ বিষয়ে মনে বড় সঙ্কোচ, বড় দ্বিধা, উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, আমি যাহা বলিব, আমার নিজের জীবন অনেক বিষয়েই তাহার বিপরীত। কয় দিন কয় রাত্রি মনে অত্যন্ত সংগ্রাম গিয়াছে যে আমি এই বিষয়েই কিছু নিবেদন করিব কি না। শেষে মনে হইল, ভগবান তো অনেক সময়ে একজনের বিফলতা দেখাইয়া দিয়াও অন্যকে সতর্ক করেন। হয়তো আমার অক্ষমতা হইতেও অন্যের সাহায্য হইতে পারে।

আমি সাধু পলের যে উক্তিটি পাঠ করিয়াছি, তাহাই আমার আজকার নিবেদনের বিষয়। কোনও সেবাই প্রেম বিনা সার্থক হয় না। বিশেষতঃ ঈশ্বরসেবকের সেবা প্রেম বিনা একেবারে নিষ্ফল। আমার অদ্যকার নিবেদনের বিষয় 'প্রেমের সেবা'।

প্রেমে আত্মোৎসর্গ।

প্রেমের সেবার বিষয়ে ভাবিতে গেলে প্রথমেই আত্মোৎসর্গের কথা মনে আসে। মানুষের জীবনে প্রথম যে দিন এই ভাবটি উদয় হয় যে, আজ হইতে আমি আর আমার জন্য জীবন ধারণ করিব না, আর এক জনের জন্য জীবন ধারণ করিব, সে দিনটি তাহার পক্ষে কি নবজীবনের দিন! শিশুটি ছোট বেলায় খেলা-ধূলা লইয়াই মত্ত থাকে। তখন যেন সে একান্তভাবে আপনার জন্যই জীবিত থাকে। প্রথম যে দিন তাহার হৃদয়কোরক ফুটিয়া উঠে, ও তাহার ইচ্ছা হয় যে আমি এখন হইতে খেলাধূলা ছাড়িয়া মার জন্য, বাবার জন্য, দাদা দিদির জন্য, বা কোন বন্ধুর জন্য জীবন ধারণ করিব, তাঁহাদের খুসী করিয়া আমি সুখী হইব, যে দিন তাহার ক্ষুদ্র জীবনটুকু আর কেবল আত্মমুখীন থাকে না, অন্য একজনকে কেন্দ্র করিয়া অন্য একজনের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়ায়, সে দিনটি তাহার পক্ষে কি শুভদিন! হয়তো তাহার অন্তরে প্রেমের গভীরতা তখনও কিছুই আসে নাই। হয়তো তাহার তখনকার মনের অবস্থাটা 'প্রেম' বা 'ভক্তি' নামে গৌরবান্বিত হইবার যোগ্যই নয়। কিন্তু তথাপি, তাহার আমিত্বের উপরে রাজত্ব করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে একটি নূতন বস্তু আসিল। তাহার আমিত্বকে ঢাকিয়া ফেলিবার, ছাইয়া ফেলিবার জন্য তাহার জীবনে নূতন একজন মানুষের উদয় হইল। হউক না সে নিজেও অতি তুচ্ছ, হউক না সে নূতন মানুষটিও অতি তুচ্ছ,—তথাপি এই ব্যাপার মানব-সংসারের একটি অতি উচ্চ অতি পবিত্র ব্যাপার।

ইহার পরে, যখন ক্রমে ক্রমে মানুষের জীবনে আপনাকে ভুলিবার, আপনাকে হারাইবার ব্যাপারটি প্রেমের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া অভ্যুদিত হয়, তখন তাহা আরও কত পবিত্র, আরও কত

সুন্দর হয়। একজন মানুষ যখন প্রেমে চালিত হইয়া আর একজন মানুষের কাছে আত্মদান করে, জগতে তাহা কি পবিত্র কি মহৎ ব্যাপার! আবার, মানুষ যখন প্রেমেতে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া ঈশ্বরের হাতে নিজ জীবন অর্পণ করে, তখন তাহা আরও কত পবিত্র, আরও কত সুন্দর ব্যাপার!

১৮৯২ সালে ভাই প্রকাশ দেবজী ও ভাই সুন্দর সিংহজী কলিকাতায় আসিয়া সাধনাশ্রমে যোগদান করিলেন। তাঁহারা পঞ্জাব হইতে, ঈশ্বরসেবাতে আত্মসমর্পণের ভাবে প্রদীপ্ত কতকগুলি জ্বলন্ত সঙ্গীত লইয়া আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি সঙ্গীত কুমারী প্রেমদেবীর ঈশ্বরসেবায় আত্মাহুতি দানের অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত ও গীত হইয়াছিল। তাহার একটি কলি এই :—"তুম্‌রে দর্ পর্ ভেঁট ধরা হয় তন্ মন্ ধন্ অওর্ সারী জওয়ানী," অর্থাৎ আমার তনু মন ধন ও সমগ্র যৌবন তোমার দ্বারে উপহারস্বরূপ ধরিতেছি। আমার বয়স তখন ১৮ বৎসর। সেই সময়ে ভাইজীদের মুখে যখন এই উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীতটি শুনিতাম, ও লাহোরের সেই অনুষ্ঠানটির বর্ণনা শ্রবণ করিয়া তাহার ছবি মনে মনে অঙ্কিত করিতাম, মন এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইত।

ধরাতলে স্বর্গ কোথায় দেখা যায়? যেখানে এক জন মানুষ আর এক জনের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করে, সেখানেই স্বর্গ। তাহা দরিদ্রপল্লীর আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধময় মম্বলা গলিতেই হউক, কি উচ্চ রাজপ্রাসাদেই হউক; তাহা একজন বেতনভোগী ভৃত্যের জীবনেই হউক, কি একজন সর্ব্বত্যাগী ভক্ত কর্ম্মীর জীবনেই হউক।

প্রেমে আমিত্ববিলোপ।

প্রেমের জীবনের প্রধান কথা, আমিত্ববিলোপ। আত্মোৎসর্গ হইতেই কি আমিত্ববিলোপ আসে না? প্রেমে চালিত হইয়া আত্মোৎসর্গ করিলেই কি সঙ্গে সঙ্গে আমিত্ববিলোপের সাধনটিও আয়ত্ত হইয়া যায় না? না, তাহা হয় না। আত্মোৎসর্গ ও আমিত্ববিলোপ দুইটি এক বস্তু নয়। সংসারে পুরুষ ও নারীর যে ভালবাসা, তাহার সার্থকতা কখন্ হয়? চিন্তাবিহীন লোক মনে করে যে যখন তাহারা পরস্পরের কাছে আত্মদান করিয়া পরিণীত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই সে প্রণয়ের সার্থকতা। কিন্তু তাহা নহে। সংসারে সার্থক বিবাহ যেমন দেখা যায়, ব্যর্থ বিবাহও তেমনি অনেক দেখা যায়। মনে করুন, একটি পুরুষ ও একটি নারী সতেজ প্রণয়ের আবেগে চালিত হইয়া পরস্পরকে গ্রহণ করিল। বিবাহ অনুষ্ঠানটি একটি সুন্দর অনুপ্রাণনময় অনুষ্ঠান হইল, সকলের প্রাণকে অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ করিয়া দিল। সংসার সেই দম্পতির কাছে কত আশা করিতে লাগিল। মনে করিতে লাগিল যে ইহাদের দাম্পত্য জীবন অতি পবিত্র সুখ শান্তি ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইবে। কিন্তু হায়, ক্রমে দেখা গেল যে, সে বিবাহ তাহাদের দুই জনের পরবর্ত্তী জীবনকে মহৎ ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া দিতে পারিল না; কারণ, নিরন্তর আত্মবিলোপের সাধনায় তাহারা মনোযোগী হইল না। সেই প্রথম দিনের আত্মোৎসর্গের আবেগ তাহাদের জীবনকে কয়েক দিন সরস রাখিল বটে। কিন্তু ক্রমে তাহারা তাহাদের দৈনিক জীবনে নিজের নিজের জন্য সুখ দাবী করিতে লাগিল, আরাম দাবী করিতে লাগিল, আদর দাবী করিতে লাগিল। সেই দাবীর ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়া দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে তাহাদের মধ্যে পরস্পরের জন্য আত্মোৎসর্গের ভাবটিকে ম্লান করিয়া ফেলিতে লাগিল। অথবা হয়তো অর্থোপার্জ্জন, মানসম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, প্রভৃতিকে জীবনে তাহারা এত প্রধান করিয়া তুলিল যে, "আমি তোমার জন্য জীবন ধারণ করিয়া সুখী, খাটিয়া সুখী, আমি তোমাকে হৃদয়ের পূজা জীবনের পূজা দিয়া সুখী," পরস্পরের প্রতি এই ভাবটি তাহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল; চর্চ্চার অভাবে এই ভাবটি একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল। আত্মহারা প্রেমের পবিত্র শোভাটি তাহাদের পরিবারে আর ফুটিতে পাইল না। আত্মোৎসর্গ এক দিনে করা যায়, কিন্তু আত্মবিলোপ সারা জীবনে সাধন করিতে হয়। সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, "প্রভবতি শুচি বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ," অর্থাৎ কোন কোন মানুষের মন যেন স্বচ্ছ মণির ন্যায়, গুরুর উপদেশের আলোর চমৎকার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে, আবার কাহারও মন যেন মাটির ডেলার মত', তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়েই না। ভাই বোন্, আজ এস আত্মপরীক্ষা করি। আমাদের গার্হস্থ জীবনে আমরা কি স্বচ্ছ মণি হইয়া আছি, না মাটির ডেলা হইয়া আছি? আমাদের জীবনে কি সেই প্রেমময় পরম গুরুর প্রেমের জ্যোতির প্রতিবিম্ব ভাল করিয়া খেলে? প্রতিদিনের আমিত্ববিলোপই সেই সাধন, যাহার দ্বারা মাটির ডেলাও ধীরে ধীরে স্বচ্ছ মণিতে পরিণত হইতে থাকে।

ঈশ্বর-সেবকের জীবনেও ইহার অনুরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। যে দিন চাকরী ছাড়িয়া আসিয়া ঈশ্বরের সেবায় আপনাকে অর্পণ করি, অথবা জীবনের আরম্ভেই যে দিন "চাকরীর পথে যাইব না," এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরচরণে আত্মোৎসর্গ করি, সে দিনের সে ব্যাপারটি কি পবিত্র, কি অনুপ্রাণনময়! ইহাও যেন একটি পবিত্র বিবাহানুষ্ঠান; যেন ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে বিবাহ, যেন জনসমাজ ও তাহার একজন ব্যক্তির মধ্যে পবিত্র পরিণয়। কিন্তু শুধু সেই দিনের এই আত্মোৎসর্গ জীবনকে অধিক দূর অগ্রসর করিয়া দিতে পারে না। যদি সারা জীবনে তিল তিল করিয়া আপনাকে মুছিয়া ফেলিবার সাধনাটি না করা যায়, যদি মনের গোপনে এই বিচার এই হিসাব একটুও স্থান পায় যে, "আমায় কে কত ভাল বলিতেছে, আমার দলে কয় জন লোক আসিতেছে, কে আমাকে কোন্ দিন উপযুক্ত আদর সম্মান দিয়াছে বা দেয় নাই",—তবে সেবাতে উৎসর্গীকৃত সেই জীবনের ছবিও ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যর্থ বিবাহের ছবির অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

ধর্ম্মসমাজের সেবাক্ষেত্রে ব্যর্থ সেবাব্রতের ব্যাপার যত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারক্ষেত্রে ব্যর্থ বিবাহের ব্যাপার বোধ হয় তত অধিক ঘটে না। উভয়ের তুলনা করিলে এই তারতম্য কেন লক্ষ্য করা যায়? তাহার কারণ এই যে, সংসারে পিতৃস্নেহ, মাতৃস্নেহ, দাম্পত্যপ্রীতি প্রভৃতি বস্তুকে যেরূপ প্রধান স্থানে রাখা হয়, এবং প্রেমের খাতিরে আমিত্ববিলোপকে যেরূপ মূল্য দেওয়া হয়, ধর্ম্মসমাজের সেবাক্ষেত্রে সাধারণতঃ তাহা

করা হয় না। সে ক্ষেত্রে অনেক সময়ে এই ভুল করা হয় যে ঈশ্বর-সেবকের উজ্জ্বল জ্ঞা-ই বুঝি তাহার শক্তি, কর্ম্মোৎসাহই বুঝি তাহার শক্তি। সেবকের জীবনে আমরা বিশ্বাস বৈরাগ্য প্রভৃতি নানা বস্তুকে প্রধান স্থানে রাখি; প্রেমের স্ব াবকে অপেক্ষাকৃত অপ্রধান স্থানে রাখি। তাই ধর্ম্মসমাজের সেবাক্ষেত্রে আমিত্ববিলোপের সাধনাটি অনেক স্থলে সফল হইয়া উঠে না। তাই সে ক্ষেত্রে এত ব্যর্থ সেবাব্রতের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, ঈশ্বরসেবকের কর্ত্তব্য যে, তিনি ধর্ম্মরাজ্য এবং সংসার, উভয় ক্ষেত্র হইতেই আত্ম-বিলোপের দৃষ্টান্তসকল শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করিবেন, এবং এই উভয় ক্ষেত্র হইতেই নম্র হৃদয়ে এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিবেন।

হে পরিচারক তুমি কি মনে কর যে তুমি জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন আয়ত্ত করিয়াছ, বাগ্মিতাশক্তি আয়ত্ত করিয়াছ, সুকণ্ঠ আয়ত্ত করিয়াছ, কর্ম্মশক্তি আয়ত্ত করিয়াছ বলিয়া এ সকলের দ্বারাই ঈশ্বরের কাজের জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছ? এবং তুমি কি মনে কর যে কেবল তাঁহারাই তোমার গুরু, যাঁহারা তোমাকে ভাল করিয়া **এই সকল** শিক্ষা দিতে পারেন? তাহা নয়, তাহা নয়। পরিচারকের জীবনের আদিতে মধ্যে অন্তে একটি মাত্র সফল সাধনা আছে। তাহা, ভালবাসার দ্বারা আপনাকে মুছিয়া ফেলিবার সাধনা। এ সাধনা যাঁহার হইয়াছে, তিনিই ঠিক প্রস্তুত; নতুবা অপর সকল প্রস্তুতি পূর্ণ মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও তিনি একান্ত অপ্রস্তুত। এই আত্মবিলোপের শিক্ষা যিনি দিতে পারেন, জীবনে তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু।

আমার জীবনে ভগবান্ বহুবার যেন চক্ষে আঙ্গুল দিয়া আমার ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সেবার ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে করিতে যখন মনে শুষ্কতা আসিয়াছে, নিরুৎসাহ অনুপ্রাণনবিহীন অবস্থা আসিয়াছে, তখন আমি মনে করিয়াছি, "ব্রাহ্মসমাজের কাজের বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য কোনও জ্ঞানী মানুষকে পাইলে ভাল হইত, উদ্দীপনা সঞ্চার করিবার জন্য কোনও ভাল নেতার সঙ্গ পাইলে ভাল হইত। কিন্তু হায়, তাহা কোথায় পাইব?" মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন ভগবান্ আমাকে সংসারের মানুষের কাছে লইয়া গিয়া, আমিত্ববিলোপের দেখাইয়া দেখাইয়া, আমার মন ভাল করিয়া দিয়াছেন। বাঁকিপুরে আমাদের স্কুলে একবার লছমন নামে একটি দরোয়ান ছিল। তাহার স্ত্রী কিছুদিন অসুখে ভুগিয়া মারা গেল। আমি নিজেই লছমনকে ডাকিয়া সাত দিনের ছুটি দিলাম। কিন্তু তৃতীয় দিন প্রভাতে দেখি যে সে আসিয়া কাজ করিতেছে। আমি সস্নেহে তাহাকে নিষেধ করিলাম। সে নিষেধ শুনিল না; কিন্তু দেখিলাম, দর দর ধারে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। সে নিরক্ষর, হীন জাতির মানুষ। কিন্তু তাহার পত্নীবৎসলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এইরূপ পরিচয় পাইয়া আমার মন মুগ্ধ হইয়া গেল। বাঁকিপুরে ঐ সময়ে আমি বড় শুষ্কতার অবস্থায় ছিলাম; ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গের অভাবে মনে বড়ই কষ্ট ছিল। ভগবান যেন আমাকে বলিলেন, "এই মানুষটি তাহার মনের কত কষ্ট, তাহার হৃদয়ের কত শূন্যতা লইয়াও নিজ কর্ত্তব্য করিতে আসিয়াছে। ইহাকে দেখিয়া কি তোমার মন ভিজিবে না, অন্তর অনুপ্রাণনে ভরিয়া উঠিবে না?" আমি বলিলাম, "ঠিক, ঠিক, প্রভু! আমি গুরু চিনিতে পারি না, তাই এত একাকী হইয়া, এত বন্ধুহীন হইয়া, এত অনুপ্রাণনবিহীন হইয়া পড়িয়া থাকি।" সেই লছমনের কথা মনে করিয়া আমি এখনও কত উপকার পাই! স্কুলের বারান্দায় ঝাঁটা হাতে সজলনয়নে দণ্ডায়মান তাহার মূর্ত্তিটি আজও আমার মনে কত পবিত্র ভাব সঞ্চার করে!

আমি অন্যের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাকে তো ভগবান্ বার বার আত্মবিলোপের শিক্ষাটি গ্রহণ করিবার জন্য সংসারের দ্বারে পাঠাইয়া দেন। তিনি যেন আমাকে বলেন,"তুমি মনে করিতেছ, তোমার হাতে কত গুরুতর কাজের ভার পড়িয়াছে, সংসার হইতে তাহার জন্য সুবিধাটুকু তোমার আগেই পাওয়া চাই। অথবা, তোমার মনে কত বড় বড় চিন্তা আসিতেছে, সেগুলি যাহাতে নিরুপদ্রবে লিপিবদ্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থাটি আগেই হওয়া চাই। তাহা নয়। ঐ সকল যত বড়ই হউক, তাহার দাবীটাই সর্ব্বপ্রথম নয়। তোমার জন্য কে কতখানি আপনাকে ছাড়িতেছে তাহা তুমি দেখিবে, তোমাকে কাহার জন্য কতখানি আপনাকে ছাড়িতে হইবে, সে বিষয়ে তুমি সজাগ থাকিবে,—ইহাই আগেকার কথা। চারিদিক হইতে আত্মবিলোপ দেখ, ও আত্মবিলোপের শিক্ষাটি লও, তাহার পরে কাজের সুব্যবস্থা। ঐ যে তোমার চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল মেজাজ,—ঐ যে তুমি কখনও তুষ্ট, কখনও রুষ্ট,—তোমার পত্নী তোমার এই সকল আকস্মিক পরিবর্ত্তন মাথায় করিয়া লইয়া নিত্য এক ভাবে তোমার সেবা করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার কাছে নত হইয়া তুমি আত্মবিলোপের শিক্ষাটি গ্রহণ কর। তোমার ছেলেটিকে তুমি আধ ঘণ্টা আগে তাহার দোষের জন্য বকিয়াছ, মারিয়াছ। সে ইহারই মধ্যে নিজের মন হইতে তোমার কঠোরতার চিহ্নটি ধুইয়া ফেলিয়া তোমার কাছে আসিয়াছে, তোমাকে সরল মনে আদর করিয়া আবার 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেছে; ইহার কাছে তুমি আত্মবিলোপের শিক্ষাটি গ্রহণ কর। তোমার চাকরটি, তোমার নিকট হইতে কত অযথা ভর্ৎসনা পাওয়া সত্ত্বেও, তাহার মনুষ্যত্বের কত অবমাননা ও গ্লানি হওয়া সত্ত্বেও, সব মুছিয়া ফেলিয়া হাসিমুখে তোমার সেবা করিতেছে, তাহার কাছে তুমি আত্মবিলোপের শিক্ষাটি গ্রহণ কর।"

হে পরিচারক, তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় গুরু হয়তো তোমার অধীন মনুষ্যেরা। হয়তো তোমার ছাত্র, তোমার পুত্র কন্যা, তোমার দাস দাসী, যাহারা মুখ বুজিয়া খাটিয়া যাইতেছে, যাহারা পদে পদে আপনাদিগকে মুছিয়া ফেলিতেছে। যাহার সম্বন্ধে তুমি মনে ভাবিতেছিলে যে তাহাকে তুমি শিক্ষা দিবে, তাহাকে তুমি তুলিবে, সেই হয়তো তোমার গুরু। তাহারই পায়ে মাথা রাখো। "সংসারকে উদ্ধার করিব," এই স্পর্দ্ধা লইয়া সংসারে অবতীর্ণ হইও না। সংসারে মানবীয় প্রেমপ্রসূত আত্মবিলোপের অজস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সে বিষয়ে তুমি সংসারকেই গুরু বলিয়া বরণ কর। সংসার হয়তো তোমাকে শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান শিখাইতে পারিবে না; কিন্তু সেবার ক খ

যে আত্মবিলোপ, তাহা তোমাকে শিখাইতে পারিবে। সংসার হয়তো তোমাকে ধনত্যাগ, চাকরীত্যাগ শিখাইতে পারিবে না; কিন্তু তাহার অপেক্ষা বড় ত্যাগ যে আমিত্বত্যাগ, তাহা তোমাকে শিখাইতে পারিবে।

প্রেমের স্নিগ্ধতা।

প্রেমের রাজ্যটি স্নিগ্ধতার রাজ্য। প্রেম যে হাওয়াতে বাঁচে, স্নিগ্ধতা তাহার একটি প্রধান গুণ। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে প্রেমের স্নিগ্ধতাকে রক্ষা করিবার বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী হই না। গৃহী ও ঈশ্বরসেবক উভয়েরই পক্ষে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন যে, তাহার দৈনিক কার্য্যতালিকার মধ্যে যেন এমন কাজের অবসর থাকে, যাহা তাহার হৃদয়কে সরস ও সজীব রাখিবে, তাহার স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তির স্নিগ্ধতাকে বাঁচাইয়া রাখিবে। কি সংসারে, কি সেবাক্ষেত্রে, কতকগুলি কাজ প্রয়োজনীয় কাজ। সেগুলি না করিলে সংসার চলে না, এবং ঈশ্বরের কাজ দাঁড়ায় না। আবার কতকগুলি এমন কাজও আছে, যাহা কার্য্য হিসাবে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তির চর্চ্চার জন্য একান্ত প্রয়োজন। যে-মানুষ এমন সকল কাজের জন্য দৈনিক জীবনে একটুও অবসর রাখে না, তাহার জীবন সরস থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে দেখা যায়, এক এক জন মানুষ সারাদিন সংসারের নানা কাজে যেন চরকীর মত' ঘুরিয়া বেড়ান। একবার তিনি দৌড়িয়া গিয়া ঠাকুরঘরে পূজার জন্যও বসেন বটে; কিন্তু সে পূজা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া বাগানে গিয়া সাজি ভরিয়া সেই পূজার জন্য ফুল তুলিয়া আনেন। এমন মানুষকে দেখিয়া আমার অনেক সময়ে মনে হইয়াছে যে, সারাদিনের সব ব্যস্ততার মধ্যে প্রভাতের ঐ ফুলতোলাটুকুই হয়তো উহার হৃদয়কে বাঁচাইয়া রাখিতেছে, উহার জীবনটাকে স্নিগ্ধ রাখিতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের মাতা শেষ জীবনে নিজ হাতে জগন্নাথের মন্দির ঝাঁট দিবার ভার লইয়াছিলেন। কেন লইয়াছিলেন? কোনও প্রয়োজনে নয়, কিন্তু নিজ শ্রদ্ধা ভক্তির চরিতার্থতার জন্য। ডেরাদুনের নিকটবর্ত্তী নালাপানি নামক পাহাড়ে একজন সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে। সেটি অতি মনোরম নির্জ্জন স্থান। পাহাড়ে বনের ভিতরে আশ্রমের কয়েকখানি কুটীর ও প্রাঙ্গণ; একটি বৃক্ষতলে বসিবার জন্য উচ্চ একটি বেদি। মাটি দিয়া লেপিয়া এ সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। আশ্রমধারী সন্ন্যাসীকে যখন আমরা দেখিতে পাইলাম, দেখিলাম যে তাঁহার বহির্ব্বাসের উপরে কোমরে একখানি কাপড় বাঁধা, হাতে ঝাঁটা। তিনি সেই প্রাঙ্গণ ও গাছতলা ঝাঁট দিতেছেন। কাব্যে পড়ি, আশ্রমের মুনি-কন্যারা গাছের গোড়ায় জল সেচন করিতেন, আবার পাখীরা যাহাতে নিঃশঙ্ক হইয়া সে জল পান করিতে পায় সেদিকেও তাঁহারা দৃষ্টি রাখিতেন। এই সকল ছোট ছোট কাজ কেন তাঁহারা করিতেন? সারাদিন ধ্যান ধারণায় যাপন না করিয়া মাঝে মাঝে এই সকল কাজে কেন তাঁহারা সময় ব্যয় করিতেন? হৃদয়কে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য।

আমরা নগরে বাস করি। আমাদের একটুও প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থান নাই। অনেকেরই একটিও প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু রাখিবার সঙ্গতি নাই। কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবনে এমন কিছু কিছু প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজ রাখা অসম্ভব নয়, যাহাতে হৃদয় তাজা থাকে। পূজার ঘর ঝাঁট দিয়াই হউক, কিংবা যাহাকে শ্রদ্ধা করি এমন মানুষের ঘরখানি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া দিয়াই হউক, বাগানে গিয়া গাছের ফুলগুলিকে স্পর্শ করিয়াই হউক, কিংবা মানুষের বাড়ীর ফুল যে শিশুগুলি, তাহাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ সময় যাপন করিয়াই হউক, অথবা কোনও ভালবাসার স্নিগ্ধ স্পর্শের মধ্যে প্রতিদিন খানিক ক্ষণ আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াই হউক, যে ভাবেই হউক, যে কাজের দ্বারাই হউক, জীবনে স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তির স্নিগ্ধতাকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে; নতুবা জীবন শুষ্ক হইয়া যাইবে। শুধু প্রয়োজনীয় কাজে সারাদিনের সময়কে নিঃশেষে ব্যয় করিলে, তাহার ফলে হৃদয়ের জীবন শুষ্ক হইয়া যাইবেই,—সে কাজ সংসারের কাজই হউক, ধর্ম্মসমাজের কাজই হউক, অথবা ধর্ম্মসাধন নামে চিহ্নিত পবিত্র কার্য্যগুলিই হউক। অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে একজন ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ দিবসের অনেক অধিক সময় উত্তেজনাপূর্ণ উপাসনা প্রার্থনা ও কীর্ত্তনাদিতে ব্যয় করিলেন। তাহার ফলে তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী এমন শ্রান্ত ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গেল যে, তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আর নিজ সন্তান বন্ধু ভৃত্য প্রভৃতি মানুষের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করিতে পারিলেন না। এমন পবিত্র কাজ যে ঈশ্বরের উপাসনা, তাহাও যেন তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিল। ঈশ্বর তো এ রকম চান না। তিনি চান যে আমরা আমাদের হৃদয়কে বাঁচাই, প্রেমের স্নিগ্ধতাকে জীবনে সযত্নে রক্ষা করি। ঈশ্বর সজীব হৃদয়ের পথ দিয়াই আমাদের জীবনকে অধিকার করেন। প্রেমের স্নিগ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে যথেষ্ট অবসর চাই; যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজের জন্য সময় ব্যয় করিতে পারা চাই; হৃদয়ের চর্চ্চার জন্য নানা আয়োজন করা চাই, এবং সে-সকলকে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধরিয়া থাকা চাই। ঝাঁট দেওয়ার কাজ, ফুলতোলার কাজ, শিশুদের আদর করার কাজ, বাগানের কাজ, এ সকল হয়তো সব দিন সমান সরস লাগিবে না; বন্ধুর ভালবাসার স্পর্শে হয়তো সব দিন সমান মিষ্টতা পাইব না। কিন্তু তথাপি এ সকলের জন্য নিষ্ঠার সহিত শ্রদ্ধার সহিত সময় দেওয়া চাই। কারণ, স্নিগ্ধতার হাওয়া ভিন্ন প্রেম বাঁচে না।

প্রেমের নির্ভর ও তাহার শান্তি।

প্রেমের শান্তির কথা বলিতে গেলেই বাইবেলের মার্থা ও মেরীর কাহিনী মনে পড়ে। মার্থা ও মেরী নামে দুই বোন ছিল। যীশু মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া বসিতেন। মেরী যীশুর কাছে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতে ভালবাসিত। মার্থার প্রকৃতি ছিল অন্যরূপ। কিসে যীশুর পরিচর্য্যা ভালরূপে সম্পন্ন হইবে, তাহার নানা আয়োজন করিতে মার্থার মন ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িত। সে যীশুর কাছে বসিয়া বিশেষ কিছু স্বাদ পাইত না। তাহার বোন্ মেরী যে যীশুর কাছে এত বেশী সময় বসিয়া তাঁহার বচনসুধা পান করে, তাহাতে মার্থা একদিন

একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিল। বলিল, "এত কাজ পড়িয়া আছে, আমি একা খাটিয়া খাটিয়া হয়রাণ হইতেছি।" তদুত্তরে যীশু মার্থাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, "তুমি এত খাটিতেছ কেন? এত কাজই বা সৃষ্টি করিতেছ কেন? এবং তাহা লইয়া এত ব্যতিব্যস্তই বা হইতেছ কেন? আমার কাছে বসাটাকেই তোমরা প্রধান মনে কর। মেরীই ঠিক পথ ধরিয়াছে।"

মার্থা ও মেরীর এই কাহিনীটিকে কখনও কখনও শ্রম-বিমুখতার সমর্থনের জন্যও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যীশুর উদ্দেশ্য তাহা ছিল না। মনোযোগ পূর্ব্বক বাইবেলের ঐ অংশ পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, যীশু কর্ম্মকে নিন্দা করেন নাই, অতিরিক্ত উদ্বেগকে নিন্দা করিয়াছেন। প্রেমের দৃষ্টি ও প্রেমের নির্ভর যাহার অন্তরে নাই, সে মানুষ কাজ কাজ করিয়া বড়ই ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। প্রভুর সেবা লইয়া সে মানুষ যেন সর্ব্বদাই বিপন্ন। তাহার মুখ কখনও প্রসন্ন হয় না। তাহার ললাট সর্ব্বদাই উদ্বেগে রেখাঙ্কিত। যেন তাহার উপরেই একান্তভাবে সব ভার পড়িয়াছে; যেন তাহার সে ভার সামলাইবার জন্য তাহার উপরে আর কেহ নাই; এবং যেন সেই গুরু ভার বহিতে গিয়া সে ঈশ্বরের আনন্দের দিকেও মন দিতে পারিতেছে না। ব্রাহ্মসমাজের সেবাক্ষেত্রে এইরূপ মনের ভাব অনেক মানুষের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারের কার্য্যক্ষেত্রেও এমন মানুষ দেখা যায়, যাহারা নিজেদের দায়িত্বকে মনে মনে অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াইয়া তোলে, এবং তাহার চাপে যেন পিষিয়া যায়।

আমরা যেরূপ মনের অবস্থা লইয়া ব্রাহ্মসমাজের কাজ করি, এবং কাজ করিতে করিতে যে ভাবে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করি, তাহাতে মার্থা ও মেরীর তুলনা ভিন্ন আরও একটি তুলনা কখনও কখনও আমার মনে উদিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলের মানুষদের সর্ব্বদাই নৌকায় যাতায়াত করিতে হয়। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর এক একখানি নৌকা থাকে। মাঝে মাঝে সেই নৌকা ডাঙ্গায় তুলিয়া, তাহার তক্তাতে গাবের রস মাখাইতে হয়, নতুবা তক্তার জোড় ফাঁক হইয়া গিয়া নৌকাতে জল প্রবেশ করে। যাহাতে ভাল করিয়া গাব দেওয়া হয় নাই, এমন নৌকাকেও কখনও কখনও (হঠাৎ অল্প দূরে যাইবার প্রয়োজন হইলে) জলে ভাসাইতে হয়। কিন্তু তাহার আরোহীরা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়ে। একটা ছিদ্র বন্ধ করিতে করিতে শতটা ছিদ্র দিয়া জল উঠিতে থাকে। আমাদের মনের অবস্থা দেখিলে মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজ যেন একখানি সচ্ছিদ্র নৌকা, আর তাহার কাণ্ডারী ভগবানও যেন এক অন্ধ মাঝি, আর আমরা, আরোহীরা, তাহার ছিদ্র বন্ধ করিতে গিয়া সামাল্ সামাল্ রবে একবার এদিক একবার ওদিক দৌড়িয়া বেড়াইতেছি। কেবলই উদ্বেগ, কেবলই হতাশ ভাব, কেবলই ছুটাছুটি! ঈশ্বরের সেবকের দশা এমন হইলে চলে না। ভগবানও অন্ধ কাণ্ডারী নহেন; তিনি ব্রাহ্মসমাজে আমাদের সচ্ছিদ্র নৌকাতেও বসান নাই; আর আমাদের তিনি কেবল ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া হয়রাণ হইতেও বলেন নাই।

ঈশ্বর তাঁহার সেবকদের বলেন, "এই অতি-ভাবনা ছাড়ো। বিপদ কাটাইয়া ব্রাহ্মসমাজ-তরীকে তাহার লক্ষ্যধামে লইয়া যাইব আমি। তুমি তোমার কাজ কর দেখি! তুমি প্রেমে বিকশিত হও। প্রেমে বিকশিত হওয়াই তোমার কাজ। তোমাকে আমার সেবাক্ষেত্রে কার্য্য করিতে হইবে প্রেমের দ্বারা, চরিত্রসৌরভের দ্বারা, বিকশিত মনুষ্যত্বের স্পর্শের দ্বারা; ব্যস্ততা ও ছুটাছুটির দ্বারা নয়। তোমাতে যে প্রেম ভক্তির বীজ আছে, তোমাতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ আমি দিয়াছি, সে সব তুমি আগে ফুটাইয়া তোল দেখি! আর কিছুর ভাবনা **তোমাকে** ভাবিতে হইবে না।" ঈশ্বরসেবকের জীবনটা চির-উদ্বেগের চিরব্যস্ততার জীবন নয়; প্রেমে ফুটিয়া, প্রেমের সৌরভ বিস্তার করিয়া, মানুষকে আকর্ষণ করিবার জীবন। যাহার প্রকৃতিতে ভালবাসা আছে, এবং ঈশ্বরের ভালবাসা দেখিবার চক্ষু যাহার আছে, সে-মানুষের মন হইতে উদ্বেগ চলিয়া যায়। মেরীর ন্যায় সে প্রেমের নির্ভরে ও প্রেমের শান্তিতে জীবিত থাকে।

প্রেমের আবরণ।

প্রেমের একটি কাজ, মানবজীবনের শ্রম দুঃখ ত্যাগের উপরে একটি পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া। বাহিরের জগৎ হইতে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। মানুষ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে গিয়া, চাষ করিতে গিয়া, পৃথিবীর মাটিকে কাটিয়া তাহাকে শুষ্ক ধূলিতে পরিণত করে। যদি প্রকৃতি নিরন্তর তাহাকে আবার শ্যামল তৃণদলে আচ্ছাদন না করিতেন, তবে পৃথিবী মানবের বাসের উপযোগী স্থান হইত না। প্রেমেরও সেই স্বভাব। সংসার ও ধর্ম্মসমাজ, এই উভয় ক্ষেত্রে, মানুষের পরিশ্রম ও উদ্বেগ হইতে বহু পরিমাণে উত্তাপ উত্তেজনা ক্লান্তি ও বিরক্তি উৎপন্ন হয়। এ সকলকে ঢাকিয়া রাখা, এ সকলকে গোপন করা, এ সকলের উপরে একটি স্নিগ্ধ আবরণ টানিয়া দেওয়া,—ইহা প্রেমের স্বভাব। যদি দেখা যায় যে, কোনও বাড়ীতে কর্ত্তা কিংবা গৃহিণী, পিতা মাতা কিংবা পুত্রকন্যা, মনিব কিংবা দাসদাসী, তাহাদের শ্রম ও ক্লান্তির কথা কখনও ভুলিতে পারিতেছে না, নানা ভাবে নিত্য তাহারই আলোচনা করিতেছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে বাড়ীতে প্রেম নাই, সে বাড়ীর মানুষেরা পরস্পরের ভালবাসাতে কিছু স্বাদ পায় না। প্রেম থাকিলে পরিশ্রমের ও ক্লান্তির অনুভূতি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়।

প্রেমের একটি কাজ যেমন পরিশ্রমের উপরে পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া, তেমনি আর একটি কাজ, সংগ্রাম দুঃখবরণ ও ত্যাগের উপরে পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া। আমরা প্রভুর সেবাক্ষেত্রে আসিয়া কেবলই 'শ্রম শ্রম' ও 'ত্যাগ ত্যাগ' কেন বলিব? আমরা প্রাণ দিয়া নিশ্চয়ই খাটিব, সব দুঃখ নিশ্চয়ই সহিব, চাকরী ও ভোগের পথ নিশ্চয়ই ত্যাগ করিয়া আসিব। কিন্তু সে শ্রমকে সে দুঃখ-বরণকে সে ত্যাগটুকুকে বার বার বলিয়া বলিয়া কেন বাড়াইব? তাহার জন্য কেন গৌরব লইতে যাইব? প্রেমের কাজ তাহা কখনও নয়। প্রেম যেমন শ্রমের অনুভূতিকে গোপন করে, তেমনি সংগ্রাম দুঃখ এবং ত্যাগের অনুভূতিকেও আবরণ করে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুরে আমাদের একজন ডাক্তার বন্ধু হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। কিছুকাল আমরা প্রতিদিন সে বাড়ীতে গিয়া তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনদের লইয়া ভগবানের নাম করিতাম, ও সেই পরিবারের ভবিষ্যৎ বিষয়ে পরামর্শ করিতাম। "ডাক্তার বাবু এমন হঠাৎ চলিয়া গেলেন! একটি মাত্র পুত্র চাকরীতে বসিয়াছে, আর সব ছেলেমেয়েদের এখনও শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় নাই। টাকা কড়ি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পত্নী কিরূপ অসহায় হইয়া পড়িলেন! কি করিয়া তিনি এই গুরু ভার সাম্‌লাইবেন? হায়, উঁহাদের পক্ষে কি দুর্দ্দিনই উপস্থিত হইল,"—আমরা সহানুভূতির সহিত এইরূপ কথা প্রায়ই বলিতাম। ডাক্তার বাবুর পত্নী কয়েক দিন নীরবে আমাদের কথাগুলি শুনিয়া যাইতেন, কিছুই উত্তর করিতেন না। অবশেষে একদিন হঠাৎ তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আপনারা যাহা বলিতেছেন, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমার স্বামী আমাকে ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছেন, এ কথা আমার সম্মুখে আর কখনও বলিবেন না। তিনি আমাকে সারা জীবন অশেষ সুখশান্তিতে রাখিয়াছিলেন, এখনও বেশ ভাল অবস্থাতেই রাখিয়া গিয়াছেন।" সেই নারীর কথায় আমরা লজ্জিত হইলাম। প্রকৃত প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। প্রকৃত প্রেমের স্বভাব এই যে, সে নিজে কখনও দুঃখ সংগ্রামের কথা বলে না; এবং বন্ধুজন সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়া তাহার উল্লেখ করিলে তাহাও সে সহ্য করিতে পারে না।

মানবজীবনে এমন এক অপূর্ব্ব নিগূঢ় শক্তি আছে, যাহা সুখ ও দুঃখ, ভোগ ও ত্যাগ, শ্রম ও আরাম, এই সকল দ্বন্দ্বের উভয়কে আত্মস্থ করিয়া, পরিপাক করিয়া, আত্মার রসরক্তে পরিণত করিতে পারে; যাহা এ উভয়ের দ্বারা আত্মার সৌন্দর্য্য ও শ্রী রচনা করিতে পারে। সে শক্তি প্রেম। প্রেমের শক্তিতে যখন শ্রম দুঃখ ও ত্যাগ কোনও জীবনে আত্মার রসরক্তে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তখন আর তাহা সে জীবনে শ্রম দুঃখ ও ত্যাগের আকারে মানুষের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে পারে না।

প্রেমের জ্যোতি।

শুধু তাহাই নহে। প্রেমিকের জীবনের সেই শ্রম দুঃখ ও ত্যাগ, তাঁহার মনের আনন্দকে, অন্তরের জ্যোতিকে বাড়ায়। সংসারের কোন গৃহিণীর কথা ভাবুন। তাঁহার জীবনে যে শ্রম দুঃখ ও ত্যাগের কোনও বাহ্য প্রকাশ নাই, সে-সকল যে তাঁহার অন্তরে সু-গুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাই কি শেষ কথা? তিনি যে পতির দুঃখ সংগ্রাম পতির সহিত একত্রে বহিতে প্রস্তুত, তিনি যে স্বামীর প্রতি বিশ্বাসবতী, তিনি যে সকল অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তা, ইহাই কি তাঁহার জীবনের চরম কথা? কখনও নয়। যদি তাঁহার অন্তরে পতির প্রতি প্রেম থাকে, তবে তাঁহার মন বলিবে, "সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ, উভয়ই তোমার সঙ্গে আমার প্রেম-বন্ধনকে দৃঢ়তর করিয়াছে, আমার প্রেমানন্দকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে।" পতির সঙ্গে তাঁহার সকল ব্যবহারে, বাক্যের ও কার্য্যের সকল বিনিময়ে, এমন কি পতির প্রতি তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টিপাতে, তাঁহার অন্তরের সেই প্রচ্ছন্ন প্রেমানন্দের আভা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। লতার কোমল অঙ্গে, তাহার পাতায় ফুলে, যেমন তাহার ভিতরের সরসতা ফুটিয়া বাহির হয়, তেমনি, পতির প্রতি তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টিপাতে, তাঁহার সকল আকার ইঙ্গিতে, তাঁহার অন্তরের গূঢ় প্রেমানন্দের আভা ফুটিয়া বাহির হইবে। সাচ্চা মণি হইতে যেমন একটি আভা, একটি effulgence, নির্গত হয়, সুন্দর ব্রাহ্মচরিত্র হইতে তেমনি একটি প্রেমের আভা নির্গত হয়; তাহা তাহার গৃহ পরিবারকে আলো করিয়া রাখে। সুন্দর সেবকচরিত্র হইতে তেমনি একটি প্রেমের আভা নির্গত হয়, তাহা সেবা-ক্ষেত্রকে আলো করিয়া রাখে। অন্তরের সেই প্রেমানন্দের আভা চারিদিকে মানুষের মধ্যে বিস্তার করিতে পারিলে তুচ্ছতম সেবাও সার্থক; না পারিলে শ্রেষ্ঠ সেবাও ব্যর্থ।

এস গৃহী ভাই, এস ঈশ্বরসেবক ভাই, প্রেমের স্বভাবের জন্য প্রার্থনা করি। যেন প্রেমে আমিত্বকে লুপ্ত করিতে পারি; যেন প্রেমে জীবনকে স্নিগ্ধ রাখিতে পারি; প্রেমের যে নির্ভর ও শান্তি, যেন তাহার সাধনা করিতে পারি; প্রেমের পর্দ্দা দিয়া জীবনের শ্রম দুঃখ ত্যাগকে যেন আবরণ করিতে পারি; প্রেমের আনন্দজ্যোতি যেন জীবনে এমন প্রচুর পরিমাণে পাই যে তাহা চোখে মুখে আকার ইঙ্গিতে চারিদিকে ছড়াইয়া যায়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মেরীকার্পেন্টার হলে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের পুরস্কারবিতরণ। ডাক্তার ড্রামণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও মিসেস ড্রামণ্ড পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রার্থনা পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করেন। বালক-বালিকাদিগের আবৃত্তি প্রভৃতি এবং বার্ষিক কার্য্যবিবরণপাঠ ও পুরস্কারবিতরণ হইলে পর মিঃ মরুস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। সতীশবাবু ছাত্রছাত্রী-দিগকে একটু বাহিরে লইয়া যাওয়ার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অর্থসাহায্যের জন্য বিশেষভাবে সকলকে অনুরোধ করেন। তাহাতে নগদে ও প্রতিশ্রুতিতে শতাধিক টাকা সংগৃহীত হয়।

সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ "সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার আয়োজন হইতেছে।

ব্রাহ্ম সমাজ।

কলিকাতা উপাসকমণ্ডলী—কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর বার্ষিক সভার অধিবেশন উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালীতে একটি বিশেষ উৎসব হয়:—

২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার—অপরাহ্ণে সামাজিক সম্মিলন। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার প্রার্থনা করেন ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসু শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মন্দির' নামক কবিতা পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত লাঠী খেলা, ছোরা খেলা, অসি চালনা, পেশীর ব্যায়াম, ঐক্যতান বাদ্য প্রভৃতি আমোদের এবং

জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার—প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকায় "সামাজিক উপাসনা" বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসু দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে উপাসনা; শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী সোমবার সায়ংকালে বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য করেন। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও হিসাব পঠিত ও গৃহীত হইলে পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। অনন্তর আচার্য্যগণ মনোনীত ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ নিযুক্ত হইলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের মাসীমাতা বসন্তকুমারী বসু দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একজন নিয়মিত উপাসিকা ছিলেন ও এক বৎসর কলিকাতা উপাসক-মণ্ডলীর সহকারী সম্পাদিকা ছিলেন। বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য, দেবেন্দ্রবাবু সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও ভোলানাথ বাবু প্রার্থনা করেন।

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত সরকারের কন্যা প্রীতিলতা দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তাহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে নলিনীবাবু দাতব্য ভাণ্ডারে ২৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম নগরীতে প্রবীণ ব্রাহ্ম হরিশ্চন্দ্র দত্ত ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হইবে। বিগত ১৯শে ফাল্গুন (৩রা মার্চ্চ) চট্টগ্রাম নগরীতে তাঁহার আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু শ্যামাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। পুত্র শ্রীমান সুশোভন জীবনী পাঠ এবং কন্যা সাবিত্রীবালা সংক্ষেপে প্রার্থনা করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপ দান প্রতিশ্রুত হইয়াছে:—কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মিশন ফণ্ড—২৫৲ টাকা, অনাথ ব্রাহ্মপরিবার-সংস্থান-ধনভাণ্ডার—১০৲ টাকা, চট্টগ্রাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১০৲ টাকা, চট্টগ্রাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ৫৲ দরিদ্রগণকে চাউল বিতরণের জন্য ১০৲ টাকা। দরিদ্রগণকে বস্ত্র বিতরণের জন্য ১০৲ টাকা (কন্যা মুক্তা কর্ত্তৃক)। উক্ত তারিখে রেঙ্গুন নগরীতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার ও চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী মুক্তা রুদ্র তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ নিয়োগী শাস্ত্রপাঠ, কন্যা জীবনী পাঠ ও পুত্র প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বিভাগে ৫৲ রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ ও চট্টগ্রাম ব্রাহ্ম সমাজে ৫৲ টাকা এবং কন্যা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। সায়ংকালে রেঙ্গুন ব্রহ্মমন্দিরেও বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিগত ৪ঠা মার্চ্চ চট্টগ্রাম টাউন হলে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য চট্টগ্রাম এসোসিয়েসন ও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে এক জনসাধারণের সভা আহ্বান করা হয়। স্থানীয় অনেক হিন্দু ও ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র সিংহ, কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস, চট্টগ্রাম এসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন প্রভৃতি তাঁহার জীবনী আলোচনা করেন এবং দুইজন মহিলা প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় এই মর্ম্ম প্রস্তাব গৃহীত যে, তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি স্থানীয় টাউনহলে রাখা হইবে এবং জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার সুদ হইতে প্রতি বৎসর তাঁহার নামে একটী বৃত্তি ও পদক চট্টগ্রাম হইতে যে বালক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম হইবে তাহাকে দেওয়া হইবে।

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী খুলনা নগরীতে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সাধনা ১১ বৎসর বয়সে দশ দিনের টাইফয়েড রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। খুলনা প্রদর্শনীতে দুশ্চরিত্রা নারীদের নাটকাভিনয়দর্শন হইতে ভদ্রমহিলাদিগকে বিরত রাখিবার অক্লান্ত চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াই বালিকা আপনার জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই সাধু দৃষ্টান্ত সকলের অনুকরণীয়।

বিগত ১০ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত রজনীকান্ত বসুর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য এবং বরদাবাবু ভ্রাতার জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সরযূকুমার দত্তের কন্যা (পরলোকগত শ্রীনাথ দত্তের পৌত্রী ও আনন্দমোহন বসুর দৌহিত্রী) কল্যাণীয়া মীরা ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সমীরেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজের বিল্ডিং ফণ্ডে ৫০৲ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-নিবাস পরিবর্দ্ধন ভাণ্ডারে ৫০৲, ও দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজে ৫০৲ মোট ১৫০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১৬ই জানুয়ারী বরিশাল নগরীতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষের চতুর্থকন্যা কল্যাণীয়া মালতী ও শ্রীমান শঙ্কর নাইডুর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন—বিগত ১২ই জানুয়ারী কটক নগরীতে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মিত্রের প্রথম সন্তানের নামকরণ অনুষ্ঠান মাতামহ শ্রীযুক্ত রঘুনাথ রাও এর গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রাও আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং শিশুকে সাধনা নাম প্রদত্ত হয়। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন বিভাগে ১৩৲, ও দাতব্য বাবদে ২৲, প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী পরলোকগত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর দুই পৌত্রীর (পরলোকগত রণজিৎকুমারের কন্যা) নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুদিগকে যথাক্রমে আরতি ও মঞ্জু এবং অঞ্জলী ও মীরা নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী মহেশগঞ্জ গ্রামে শ্রীযুক্ত অমিয় পাল চৌধুরীর প্রথম পুত্রের (পরলোকগত বিপ্রদাস পাল চৌধুরীর পৌত্র ও রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বসুর দৌহিত্র) অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ২৫০৲, ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নিবাস পরিবর্দ্ধন ভাণ্ডারে ২৫০৲ মোট ৫০০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

মঙ্গল বিধাতা শিশুদিগকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

দান—শ্রীমতী বসন্তবালা হোম পিতা পরলোকগত কালীনাথ দত্তের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস পিতা পরলোকগত দ্বিজদাস বিশ্বাসের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দ্বিজদাস বিশ্বাস ভাণ্ডারে ১০০৲, টাকার একখানা কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দে পিতা পরলোকগত রজনীকান্ত দের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে রজনীকান্ত দে প্রচার ফণ্ডে ১০০৲, টাকার একখানা কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীমতী সুষমা হালদার পিতা পরলোকগত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৩৲, ও দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ২৲ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ৫৲ দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকারের মধ্যমা কন্যা কুমারী শান্তিপ্রভার ৭ম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৩৲ তিন টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসুর পত্নী স্বর্গীয়া ইন্দুমতী বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে পুত্রকন্যাগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ২৲, এবং দাতব্য ফণ্ডে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন!

এই সমস্ত দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল শান্তিলাভ করুন।

তেজপুরে শতবার্ষিক উৎসব—বিগত ১৩ই নভেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও তাঁহার পত্নী এবং শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ প্রভৃতি মোট ৮ জন প্রচারকার্য্যে তেজপুর সহরে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্রও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য স্থানীয় ব্রাহ্ম ভিন্ন আরো দুই এক জন ভদ্রলোক জাহাজ-ঘাটে গিয়াছিলেন। ১৪ই নভেম্বর শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাসের বাড়ী হইতে উষাকীর্ত্তন বাহির হইয়া সহরের কয়েকটী রাস্তা দিয়া আসিয়া ব্রহ্ম মন্দিরে উপস্থিত হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় টাউনহলে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "ব্রাহ্মসমাজের বাণী" বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। ১৫ই নভেম্বরও জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর বাড়ী হইতে উষাকীর্ত্তন বাহির হইয়া অন্য কয়েকটী রাস্তা দিয়া মন্দিরে উপস্থিত হয় ও তৎপর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী উপাসনা করেন। ঐ দিন স্থানীয় টাউন হলে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "ভারতের ধর্ম্মধারা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৬ই নভেম্বরও জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর বাড়ী হইতে উষাকীর্ত্তন বাহির হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হয় ও তৎপর শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ উপাসনা করেন। ঐদিন অপরাহ্ণ ৪ টার সময় মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া সহরের কয়েকটী রাস্তা ঘুরিয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসিলে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ পরম উৎসাহে কীর্ত্তন পরিচালন করেন। প্রতিদিন উপাসনার সময় মিসেস্ চৌধুরী অথবা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার ঘোষ সঙ্গীত করেন। ১৭ই সকালের জাহাজে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ প্রভৃতি কলিকাতার দিকে রওনা হন এবং সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র গৌহাটী রওনা হন। ঐ সন্ধ্যায় মন্দিরে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মন্দিরে উপাসনা করেন, ও ১৯শে নভেম্বর সন্ধ্যায় তিনি ও তাঁহার পত্নী পাবনা রওয়ানা হইয়া যান। ঠিক এই সময় বাণীবনের শ্রীযুক্ত এককড়ি সিংহ রায় তাঁহার জামাতা জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর বাড়ীতে থাকাতে প্রচারকদলের উৎসাহ আরো বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রতি রাত্রিতে মন্দিরের কার্য্যের পর জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর বাড়ীতে এককড়ি বাবুর উৎসাহে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জমাট কীর্ত্তন

হইত। ইহাতেও সহরের কয়েকজন ভদ্রলোক নিয়মিত যোগ দিতেন

পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে নবনবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—

১০ই জানুয়ারী হইতে ১৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রতিদিন উষা কীর্ত্তনের পর এবং সন্ধ্যায় সহরের বিভিন্ন পল্লীতে উৎসবের প্রারম্ভিক উপাসনা হইয়াছে। ৫ই মাঘ উৎসবের উদ্বোধন—আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। ৬ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; সন্ধ্যায় মহর্ষির স্মরণার্থ সভা, সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত, বক্তা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল। ৭ই মাঘ প্রাতঃকালে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। মধ্যাহ্নে ছাত্রসমাজের বার্ষিক সভা; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস। ৮ই মাঘ প্রাতঃকালে মহিলাদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, তৎপর প্রীতিভোজন। পুরুষদিগের জন্য প্রাতঃকালে ইষ্টবেঙ্গল ইনষ্টিটিউসন্ গৃহে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার। সন্ধ্যায় মন্দিরে সঙ্গত সভার উৎসব—সংক্ষিপ্ত উপাসনা, আচার্য্য ভবসিন্ধু দত্ত; তৎপরে সাধন সম্বন্ধে আলোচনা, বক্তা—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ, শ্রীযুক্ত অমর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত। ৯ই মাঘ প্রাতঃকালে যুবক সম্মিলনীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল। সন্ধ্যায় বক্তৃতা—বক্তা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, বিষয়—"ব্রাহ্মসমাজ ও শতবর্ষ"। ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে পরলোকগত আচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের স্মরণার্থ উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়—নগর সংকীর্ত্তন, সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। ১১ই মাঘ—অতি প্রত্যূষে উষা কীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। উপাসনান্তে প্রায় ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রার্থনা, পাঠ ও কীর্ত্তন। তৎপর উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ; তৎপর পাঠ ও আলোচনা। অপরাহ্ণ ৫ই ঘটিকায় কীর্ত্তন। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। ১২ই মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। ২ ঘটিকার সময় ইষ্টবেঙ্গল ইনষ্টিটিউসন-প্রাঙ্গণে দরিদ্রদিগকে চাউল, পয়সা ও কম্বল বিতরণ। সন্ধ্যায় মন্দিরে ইংরাজিতে বক্তৃতা, বক্তা—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, বিষয়—"Evolution in Religion"। ১৩ই মাঘ—প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন। ২ ঘটিকায় বালক-বালিকা সম্মিলন, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বালক বালিকাগণ সঙ্গীত ও আবৃত্তি করিলে পর প্রায় ৫০০ বালক বালিকাকে জলযোগ করান হয়। সন্ধ্যায় বক্তৃতা, বক্তা—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত, বিষয়—"সভ্যতা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য"। ১৪ই মাঘ প্রাতঃকালে—পরলোকগত আনন্দমোহন দাসের গেণ্ডারিয়াস্থিত উদ্যানে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। তৎপর প্রীতিভোজন; সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত।

বরিশালে মাঘোৎসব—প্রেমময় উৎসব দেবতার কৃপায় পবিত্র মাঘোৎসব যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

৫ই মাঘ প্রত্যূষে বগুড়া-পল্লীস্থ কল্যাণ-কুটির হইতে উষা-কীর্ত্তন বাহির হয়। কীর্ত্তনদল ব্রাহ্মশ্মশান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে বাবু রাজকুমার ঘোষ প্রার্থনা করেন। তৎপরে বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরের কয়েকটী দোঁহা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন-উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্য। তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল—উৎসবে "বিষাদ ও ব্যথার সার্থকতা"।

৬ই মাঘ—প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকল্পে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস ছিলেন আচার্য্য। উপদেশের বিষয় ছিল—"মহর্ষি-জীবনে ধর্ম্মের উন্মেষ ও বিকাশ।" সায়ংকালে মহর্ষির স্মরণার্থ সভায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা করিলে, একে একে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ সেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন সেন বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহর্ষির সাধনা বিষয়ে জীবনচরিত হইতে কিছু পাঠ করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

৭ই মাঘ প্রাতে উপাসনা হয়। বাবু রাজকুমার ঘোষ আচার্য্য। নামকীর্ত্তনের অধিকার বিষয়ে উপদেশ দেন। অপরাহ্ণে ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসবে কুমারী স্নেহলতা দাস ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস প্রবন্ধ পাঠ এবং শ্রীযুক্তা সুশীলা দাস উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৫ টায় শ্মশান-ক্ষেত্র হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হইয়া সন্ধ্যায় মন্দিরে কীর্ত্তনদল আসিলে উপাসনা হয়। আচার্য্য মনোমোহন বাবু, উপদেশের বিষয়—"ধর্ম্মজীবন লাভের রহস্য।"

৮ই মাঘ প্রাতে কাউনিয়া-পল্লীস্থ বাবু তরণীকান্ত সেনের ভবনে উৎসব হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্য। বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরের দোঁহা হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রীতি-জলযোগে উৎসব শেষ হয়। সায়ংকালে ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসব। কীর্ত্তনান্তে মনোমোহন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা করেন। সম্পাদক সত্যানন্দ বাবু বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস, এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতির মন্তব্যান্তে আজিকার উৎসব শেষ হয়।

৯ই মাঘ প্রাতে সঙ্গীতান্তে বাবু প্রসন্নকুমার দাস ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ ও প্রার্থনা এবং বাবু ললিতকুমার বসু প্রার্থনা করেন। অপরাহ্ণে ছাত্র সমাজের উৎসবে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন। কুমারী নীহারকণা দাস এবং শ্রীমান কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাবু হেমচন্দ্র ঘোষ, বাবু রসরঞ্জন সেন, বাবু শশিকুমার গুপ্ত ছাত্র-জীবনের আদর্শ ও

কর্ত্তব্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে মনোমোহন বাবু "পরা-সম্পদ্" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১০ই মাঘ—প্রাতে স্বর্গীয় আচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের স্মৃতিকল্পে উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য এবং নবদ্বীপ বাবুর জীবনের বৈশিষ্ট্য বিবৃত করেন। সায়ংকালের উপাসনায় সতীশ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "ধর্ম্মজীবনের আশা ও নিরাশা" বিষয়ে উপদেশ দেন।

১১ই মাঘ—আজ উৎসবের বিশেষ দিন। প্রত্যুষ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইলে উপাসনা আরম্ভ হয়। ১২টা পর্য্যন্ত উপাসনা, উপদেশ এবং সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনে অতিবাহিত হয়। আচার্য্য ছিলেন শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস। "জীবনে দুঃখ দৈন্য ও শোকেরও সাধনা প্রয়োজন" এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদত্ত হয়। কেহ কেহ মনন চিন্তন ও প্রার্থনায় অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় পুনরায় উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাবু রসরঞ্জন সেন এবং বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় জমাট কীর্ত্তনান্তে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত উপাসনা, উপদেশ, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনে অতিবাহিত হয়। আচার্য্য ছিলেন শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল—"অনন্তের অন্বেষণ।"

১২ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা হয়। মন্মথবাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে বালকবালিকা-সম্মিলন-উৎসব সম্পন্ন হয়। মনোমোহন বাবু সভাপতির কার্য্য করেন। প্রায় ৫০০ শত বালকবালিকার সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গীত, কবিতা-বৃত্তি হইলে শ্রীমান কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস গল্পচ্ছলে উপদেশ দেন। কমলা এবং সন্দেশ বিতরিত হইলে এই উৎসব শেষ হয়। সায়ংকালে সত্যানন্দ বাবু "সাধনা" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১৩ই মাঘ—প্রাতে বগুড়া পল্লীতে বাবু প্রসন্নকুমার দাসের গৃহে উৎসব হয়। সত্যানন্দ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরিবারে উৎসবের সার্থকতা বিষয়ে উপদেশ দেন। বাবু নিশিকান্ত বসু প্রার্থনা করেন। প্রীতি-জলযোগে উৎসব শেষ হয়। অপরাহ্ণে মন্দির-প্রাঙ্গণে কাঙ্গালী বিদায় হয়। দানের পূর্ব্বে মনোমোহন বাবু প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশনে মনোমোহন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে, সহ-সম্পাদক বাবু বিনয়ভূষণ দাস বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। তৎপরে আচার্য্য ও কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। গতবারে যাঁহারা আচার্য্য ও কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহারাই পুনঃ নিযুক্ত হন। কেবল সহকারী সম্পাদক তিনজন স্থানে বাবু বিনয়ভূষণ দাস এবং কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী দুইজন নিযুক্ত হইলেন।

১৪ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা হয়। বাবু রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং উৎসবের স্থায়িত্বসাধন বিষয়ে উপদেশ দেন। সায়ংকালে সুহৃদ্-সম্মিলন-উৎসবের উপাসনায় সত্যানন্দ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল—"ভগবানের সম্পর্কে সম্পর্কই বান্ধবতার অচ্ছেদ্য সূত্র।" বন্ধুগণের মধ্যে আলিঙ্গন নমস্কার প্রভৃতি অন্তে প্রীতিভোজনে উৎসব শেষ হয়।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ২৬শে মাঘ বাবু রসরঞ্জন সেনের গৃহে তাঁহার প্রথমা দৌহিত্রীর (শ্রীমান্ সুধীরকুমার দত্তের কন্যা) প্রথম বার্ষিক জন্মদিনে এবং পারিবারিক রোগমুক্তি প্রভৃতি ঘটনার স্মরণে উপাসনাদি হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতি-ভোজনে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ উপাসক বাবু শ্রীচরণ সেনের মাতা ৮১ বৎসর বয়সে ২৮শে মাঘ পরলোক গমন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিগত ৬ই ফাল্গুন সায়ংকালে তাঁহার বাসভবনে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস পারলৌকিক তত্ত্ব পাঠ এবং শ্রীচরণ বাবু প্রার্থনা করেন। প্রীতি-ভোজনে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানকর্ত্তা স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করেন।

১৭ই ফাল্গুন সায়ংকালে কল্যাণ-কুটীরে ব্রাহ্মবন্ধু এবং কতিপয় ব্রাহ্মমহিলা, ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নীকে লইয়া একটী প্রীতিসম্মিলনে মিলিত হন। প্রথমে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিলে, সতীশ বাবু ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটী গুরুতর অভাব ও প্রতিকার বিষয়ে একটী আলোচনা উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস এবং মনোমোহন বাবু আলোচনায় নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। প্রীতি-জলযোগে সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে—সতীশ বাবু সস্ত্রীক ব্রাহ্মবন্ধুগণের বাড়ী বাড়ী গিয়া সাক্ষাৎকারে সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে, বরিশাল ব্রাহ্মিকা-সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ব্রাহ্ম-মহিলাগণ ব্যতীত অনেক হিন্দু-মহিলা ও কন্যা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রীতি-জলযোগে উৎসব শেষ হয়।

বিগত ২৫শে ফাল্গুন সায়ংকালে সর্ব্বানন্দ-ভবনে ব্রাহ্মবন্ধু সভার নূতন বৎসরের প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপতি রূপে মনোমোহন বাবু সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিলে, আগামী বৎসরের জন্য সত্যানন্দ বাবুই সম্পাদক এবং শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ সেন এবং শ্রীমান্ কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী সহঃ সম্পাদকরূপে পুনঃ নির্ব্বাচিত হন। ম্যাডাম গেয়োঁ হইতে সম্পাদক পবিত্রতার আদর্শ এবং চাকল্যের অত্যুচ্চ জীবন প্রভৃতি বিষয় পাঠ এবং সকলে আলোচনা করিলে প্রীতি-জলযোগে সভার কার্য্য শেষ হয়।

রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের (Sunday School) কার্য্য অনেক দিন বন্ধ ছিল। এক মাস হইল কল্যাণ-কুটীরে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য মনোমোহন বাবুর তত্ত্বা-

বধানে আরম্ভ হইয়াছে। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হইবে। কুমারী নীহারকণা দাস, কুমারী লীলাময়ী চক্রবর্ত্তী, এবং কুমারী শান্তিলতা দাস, প্রভৃতি শিক্ষাদান কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

বহুদিন যাবত কল্যাণ-কুটিরে প্রতি মঙ্গলবার সম্মিলিত উপাসনা হইত। নানা কারণে বৎসরাধিক কাল তাহা বন্ধ ছিল। এক মাস হইল মনোমোহন বাবুর ব্যবস্থাক্রমে এইদিনের কার্য্য আবার আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি এই উপাসনা বগুড়া ব্রাহ্ম-পল্লীস্থ প্রতি ব্রাহ্ম পরিবারে পর্য্যায়ক্রমে সম্পন্ন হইতেছে। কাহারো যোগদান করিতে বাধা নাই।

বিগত ১৯শে ফাল্গুন ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনায় আচার্য্য মনোমোহন বাবু চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কর্ম্মী হরিশ্চন্দ্র দত্ত, বরিশালের রায়বাহাদুর মথুরানাথ সেন, পটুয়াখালি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক বাবু রামনাথ দাসের পত্নী এবং খুলনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ডাঃ ফণীভূষণ রায়ের বার বৎসরের কন্যা সাধনার পরলোক-গমনে ইঁহাদের জীবনপ্রসঙ্গ করিয়া বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন। মঙ্গলময় দেবতা উপরত আত্মা সকলের সহায় হউন।

বিগত ২৯শে ফাল্গুন প্রাতে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাসের শ্বশ্রুমাতার পরলোকগমনে বিশেষ উপাসনা হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য, সত্যানন্দবাবু পারলৌকিক তত্ত্বপাঠ এবং মন্মথবাবু উপরত আত্মার জীবনপ্রসঙ্গ ও প্রার্থনা করেন। প্রীতি-জলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে কিছু দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপিত হয়।

আনন্দময়ী দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্য ডাঃ কালীনাথ ঘোষ একনিষ্ঠতার সঙ্গে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৮ সনে এই ঔষধালয় হইতে ৩১৩০ জন নূতন রোগী ঔষধ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে ডোম ও মেথরের সংখ্যা ৪১৭ জন। অনেককে সাগু বার্লি এবং ১৮জনকে পুরাতন ও নূতন বস্ত্র দেওয়া হইয়াছে। ঔষধালয়ে মিউনিসিপ্যালিটি হইতে মাসিক তের টাকা এবং আনন্দময়ী Trust Fund হইতে মোট একশত টাকা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিবিধ অনুষ্ঠান হইতে সহৃদয়তার সাহায্য আসিয়াছে। এখনো অনেক অভাব। এজন্য আমরা সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্য প্রার্থনা করি।

উত্তরবঙ্গে প্রচার—শতবার্ষিকী প্রচার যাত্রিগণ ২রা মার্চ্চ সন্ধ্যায় দিনাজপুর উপস্থিত হন। সেই দিনই সন্ধ্যার কালিতলা হলে ডাঃ সারদাপ্রসাদ রায়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র "ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষের সাধনা ও কার্য্য" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৩রা মার্চ্চ প্রাতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন এবং ব্রহ্মসাধন সম্বন্ধে উপদেশ দেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন; ব্রহ্ম-মন্দির হইতে বাহির হইয়া সহরের পথে পথে নাম কীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যায় উহা মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ, কীর্ত্তন পরিচালনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় আচার্য্যের কাজ করেন এবং ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে উপদেশ দেন। সোমবার প্রাতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ উপাসনার কাজ করেন এবং কি উপায়ে ঈশ্বরের সঙ্গ করা যায় তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যায় কালীতলায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ীতে পাঠ ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ প্রার্থনা করেন। মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় আচার্য্যের কাজ করেন এবং সাধনের সহজ পন্থা বিষয়ে উপদেশ দেন। সন্ধ্যায় পরলোকগত ভুবনমোহন কর মহাশয়ের বাড়ী উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কাজ করেন এবং প্রেম কিরূপে মানব-জীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। বুধবার প্রাতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আচার্য্যের কাজ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস গুপ্তের বাড়ীতে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হয়; শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরদিন বৃহস্পতিবার সমস্তদিন ব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর বাসস্থান কুমার পুর্ণেন্দুনারায়ণ রায়ের বাগানে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কাজ করেন। প্রীতিভোজনের পর অপরাহ্ণে পাঠ ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি হয়।

উত্তরবঙ্গে শতবার্ষিকী প্রচারযাত্রী-দলের প্রচার বিবরণ—প্রচারযাত্রিগণ ২৫শে ফেব্রুয়ারী বগুড়া হইতে রাজসাহী গমন করেন। রাজসাহীতে দুইটী ব্রহ্মমন্দির আছে, একটি রামপুর বোয়ালিয়ায়, অপরটি রাজসাহী কলেজ ও হাসপাতালের সন্নিকটে। রাজসাহীর মন্দির জীর্ণ অবস্থায় উপস্থিত; শীঘ্রই সংস্কারের প্রয়োজন। অর্থাভাবে মন্দির সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। শত-বার্ষিকী উৎসবে শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন ও ব্রাহ্মসমাজের কাজে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বোয়ালিয়া মন্দিরে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। ঈশ্বরে প্রীতি না হইলে ও সমবেত উপাসনায় অনুরাগ না থাকিলে ধর্ম্মজীবন গড়িবে না, ইহাই উপদেশে বিবৃত করিয়াছিলেন। বুধবার সন্ধ্যায় স্থানীয় কলেজের কমনরুমে "ভারতের সাধনা" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রফেসর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ডাঃ সুধেন্দুকুমার দাস, প্রফেসর রামপদ মজুমদার ও গিরিজাকুমার ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভূমার সাধনায় ভারত গৌরবমণ্ডিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজ সেই সাধন পথই নির্দ্দেশ করিতেছেন, ইহাই আলোচিত হইয়াছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজসাহী ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-নাথ মিত্র আচার্য্যের কাজ করেন এবং ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত জীবনের আদর্শ ও লক্ষণ এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় সাধু-গণের জীবনে উহা কিরূপ বিকশিত হইয়াছিল তাহাই উপদেশে বিবৃত করেন। এতদ্ভিন্ন প্রতিদিন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ [illegible] গৃহে প্রাতে উপাসনা ও শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ব্রজলাল দাসের বাটীতে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ১৮ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ।

Registered No 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫১ম ভাগ। ১৬ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৩৫, ১৮৫০ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০০ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

২৪ম সংখ্যা। 30th March 1929. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে চিরন্তন দেবতা, তুমি স্বয়ং নিত্য ও কালাতীত হইয়া তোমার এই বিশ্বকে অনন্ত কালপ্রবাহের মধ্য দিয়া নানা ঘটনা ও পরিবর্ত্তনস্রোতে উন্নতি ও কল্যাণের পথেই নিয়া চলিয়াছ। আমাদের প্রতি জনের ক্ষুদ্র জীবনের কত সুখ দুঃখ, উত্থান পতন, জয় পরাজয়, আনন্দ নিরানন্দ বহিয়া একটি বৎসর চলিয়া যাইতেছে। ইহার প্রত্যেকটি তোমারই মঙ্গল ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—তোমাকে অতিক্রম করিয়া কিছুই আমাদের নিকট আসে না, আমরা যাহাই করি না কেন, যত দূরেই চলিয়া যাই না কেন, কিছুতেই তুমি আমাদের কাহাকেও পরিত্যাগ কর না, বিনষ্ট হইতে দেও না। কাহাকে কোন্ পথ দিয়া ফিরাইতে হইবে, কাহার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক, তাহা তুমিই ভাল জান। তাই আমাদের যাহার বৎসর যে ভাবেই যাউক না কেন, সকলের পক্ষেই উহা তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই সাধন করিয়াছে। কিন্তু অল্পবুদ্ধি ক্ষীণবিশ্বাসী আমরা সকল সময় তাহা বুঝিতে না পারিয়া কত অস্থির হইয়াছি, কত অভিযোগ করিয়াছি! তুমি আমাদিগকে জাগাবার জন্য, বিশ্বাসী করিবার জন্য এবার কত আয়োজনই না করিয়াছ! সে সকল কৃপা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হইতে, সকল বিষয়ে তোমার উপর নির্ভর করিয়া তোমার অনুগত হইয়া চলিতে, তুমি আমাদিগকে শিক্ষা দেও। হে হৃদয়দর্শী দেবতা, তুমি আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা সকলই জান। আমরা যে এখনও তোমার উপযুক্ত সন্তান ও দাস হইতে পারিলাম না! তুমি আমাদের সকলকে, সম্পূর্ণরূপে তোমার করিয়া লও। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

নবনবতিতম মাঘোৎসব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৩ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) শনিবার—

প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উপদেশ পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে বিদেশাগত বন্ধুদিগকে লইয়া প্রীতিভোজন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি বিষয়ে, বিশেষ ভাবে ইংলণ্ডীয় ও আমেরিকান বন্ধুগণের সহিত সহযোগিতা সম্বন্ধে, আলোচনা। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাক্তার সাউথওয়ার্থ, মিসেস্ উডহাউজ, ডাক্তার ড্রমণ্ড, মিঃ কে পুন্নায়া, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর দে, ডাক্তার কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত হরকালী সেন ও সভাপতি বক্তৃতাদি করেন।

সায়ংকালে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপনার্থ সম্মিলন। শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রেয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিদেশ হইতে আগত টেলিগ্রাম ও ডাক্তার সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের পত্র পঠিত হইলে পর ডাক্তার সাউথওয়ার্থ, ডাক্তার রীড (সিঙ্গাপুরে অসুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারেন নাই), মিঃ মক্স, মিসেস উডহাউজ, মিঃ ও মিসেস জ্যাক্‌সন ও সভাপতি মহাশয় সাদর সম্ভাষণাদি জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করেন।

১৪ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) রবিবার—

প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং সত্য গ্রহণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা ও অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় এবং পর দিবস সিনেট হলে বিবিধ ধর্ম্মসমূহের মহা সম্মিলন হয়। তাহার বিবরণ পৃথকভাবে অন্যত্র প্রদত্ত হইল।

সায়ংকালে সংকীর্ত্তন ও উৎসবের শেষ উপাসনা। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন:—

লৌকিক হিসাবে আজ উৎসবের শেষ দিন। কিন্তু উৎসব যাঁরা প্রকৃতভাবে সম্ভোগ করেছেন, উৎসবে অন্তরে ও বাহিরে যাঁরা ভগবানের প্রেমের লীলা দেখেছেন, তাঁদের অন্তরের উৎসব শেষ হয় নাই। চিরদিন তাঁর লীলা চলিবে, প্রেমোৎসব চলিবে। আপনারা তীর্থযাত্রীসকল কত কষ্ট ক'রে নানা স্থান হ'তে এসেছেন, এখানে এসে কত কষ্ট পেয়েছেন! তবুও এই লীলা দেখিবার জন্য এখানে প'ড়ে ছিলেন। কিন্তু আপনারা কি নিয়ে বাড়ী যাবেন? আপনারা কি রিক্ত হস্তে বাড়ী যাবেন?

তীর্থে যাঁরা যায় কত কষ্ট ক'রে যায়!—সমস্ত জীবনের পুঁজি যাহা তাহা খরচ ক'রে আসে, শূন্য হস্তে ফিরে; কিন্তু তারা প্রসাদ নিয়ে আসে,—যে প্রসাদ পেয়ে তারা ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছে তাহা নিয়ে এসে ছেলে পুলে আত্মীয় স্বজনকে বিতরণ করে।

আপনারা কি প্রসাদ নিয়ে যাবেন? আমার জীবনের একটা ঘটনার কথা বলি—সেই ঘটনা যে বৎসর হয়েছিল সেই বৎসরও বলেছিলাম, আজও বলি। লাহোরের কথা— র‍্যাপার হারালো, দাঁতে আঘাত লাগল, Pick pocket এ সমস্ত নিল—৫৩।৫৫ টাকা ও টিকিটখানা (২৮৲ টাকার) গেল, কয়েক আনার পয়সা মাত্র ছিল। অচেনা পঞ্জাবীদের অযাচিত সহানুভূতির ফলে ৩৫ টাকা পাইলাম—ভগবানের কি করুণা! সমস্ত হারাইয়া এই করুণার স্পর্শরূপ প্রসাদ নিয়ে এলাম।

আপনারা অনেক ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করেছেন! আপনারা যখন ফিরে যাবেন তখন যারা বাড়ী রয়েছে তারা জিজ্ঞাসা করবে "আমাদের জন্য কি এনেছ"? তখন কি বলবেন?

তীর্থযাত্রীরা প্রসাদও নেয়, আবার বালক বালিকাদের জন্য খেলার জিনিষ নেয়, বড়দের জন্য কত জিনিষ কিনে নেয়। আপনারা কি কলিকাতা হ'তে খেলার জিনিষ অথবা অন্য জিনিষ নিয়ে যাবেন?

এখানে কি প্রেমের স্পর্শ পান নাই? এখানে কি নূতন সংকল্প জাগে নাই? নূতন উদ্দীপনা আসে নাই? প্রভুর প্রেমে আত্ম-সমর্পণ করিবার ইচ্ছা জাগে নাই? তাঁর প্রীতিসাধন ও প্রিয়-কার্য্যসাধনে প্রাণ মন নিয়োজিত করবার ইচ্ছা জাগে নাই? ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ যে জগতের আদর্শ, এই ধর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও মুক্তি, একথা কি বুঝতে পারি নাই? এর জন্য সব ত্যাগ করা যায়। ত্যাগের ইচ্ছা, ঈশ্বরপ্রেমের জন্য ত্যাগের ইচ্ছা কি জাগে নাই? যদি কিছু প্রসাদ পেয়ে থাকেন, তবে তাই নিয়ে বিতরণ করুন। আজ এখানে ব'সে কি সকল দেশের সকল কালের সাধুভক্তগণের সঙ্গ অনুভব করেন নাই? মণ্ডলী কি বিস্তৃত হয় নাই? আজ তবে তাঁর করুণার লীলা দেখি, প্রাণ তিনি স্পর্শ করুন, তাঁর করুণায় তাঁর নাম ক'রে ধন্য হই।

অনন্তর আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনাদি অন্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

"জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকময়,"

নবরচিত এই উদ্দীপনাময় সঙ্গীতটী গীত হইলে পর, বিগত ভাদ্র মাসে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব আরম্ভ হয়। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত প্রাচীন ভারত-ইতিহাসকে বৈদিক যুগ, মহাকাব্য যুগ, দার্শনিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, পৌরাণিক যুগ, এই পাঁচ যুগে বিভক্ত করিয়া, বর্ত্তমান যুগের "রামমোহন রায় যুগ" আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। এই রামমোহন রায় যুগই আলোকময় যুগ। সুখের বিষয় এবার কলিকাতাতে যে বিরাট জাতীয় মহাসভা (National Congress) বসিয়াছিল, তাহারও প্রথম দিন ২০০ শত কণ্ঠে ঐ "জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকময়" গানটি গীত হইয়াছিল। এই রামমোহন রায় যুগ, এই যুগ, এই ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষ, যে নানা ভাবেই আলোকময় যুগ, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। তবে কংগ্রেস্ যে ভাবে এই যুগকে আলোকময় যুগ বলেন, আমরা তাহা অপেক্ষাও ত ভাবে, উদার-দৃষ্টিতে, আলোকময় যুগ বলিয়া থাকি। কংগ্রেস্ হয়ত বর্ত্তমান যুগকে স্বাধীনতার—রাজনৈতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান, এই দিক দিয়াই দেখিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে কেহ কেহ সামাজিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শ্রমজীবীর অভ্যুত্থান, অবনত শ্রেণীর জাগরণ, এই দিক দিয়াও দেখেন এবং তাহাদের দৃষ্টি হয়ত কেবল ভারতবর্ষেই আবদ্ধ। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ কেবল এই দিক দিয়াই দেখেন না, কেবল এ দেশের কথা ভাবেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম বার্ত্তাবাহক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ঋষি ছিলেন, তিনি ঋষি দৃষ্টিতে ভারতের—কেবল ভারতের নয়, সমগ্র মানবের—সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির একটী আদর্শ দেখিয়া-ছিলেন। তাঁহার উদার প্রাণ ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশায় বিশেষ ভাবে কাঁদিয়াছিল সত্য, ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ, সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কল্যাণকামনা ভারতবর্ষেই আবদ্ধ ছিল না। এই উৎসবে আচার্য্যগণ বার বার বলিয়াছেন, সমগ্র মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি ও কল্যাণই তাঁহার আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজও সেই লক্ষ্য লইয়াই অগ্রসর হইয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় সর্ব্ব-বিষয়ে কল্যাণচেষ্টা, সর্ব্বদিকে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকল প্রচেষ্টার মূল উৎসরূপে, সকল স্বাধীনতালাভের প্রাণরূপে ছিল "একমেবা দ্বিতীয়ম্" যিনি, "ওঁ তৎসৎ" যিনি, তাঁর সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক প্রেম ভক্তি দ্বারা উপাসনা। আমরা এই উৎসবে আচার্য্যগণের মুখে সুমধুর ভাষাতে স্বর্গরাজ্যস্থাপন, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন, প্রেমরাজ্যস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আচার্য্য এই ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের কথা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। এই ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ—এই ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনই নব যুগের সাধনা। স্বর্গরাজ্য অন্তরে, আবার স্বর্গরাজ্য বাহিরে। অন্তরে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহাতে হৃদয়ের সমগ্র প্রীতি ভক্তি অর্পণ করিয়া, তাঁহারই প্রেম-প্রেরণায় মানবের কল্যাণ সাধন করা, সকল অশিক্ষা কুশিক্ষা, দুর্নীতি কুসংস্কার, হিংসা দ্বেষ বৈষম্য দূর করা, মানবের মনুষ্যত্ব-

বিকাশের সুবিধা করা, সকল বিষয়ে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করা, প্রেমবন্ধনে সকল দেশের মানবকে এক করা, ক্ষুদ্র গণ্ডী-সকল ভাঙিয়া দেওয়া, সকলকে একমেবাদ্বিতীয়মের পতাকাতলে আনয়ন করা, ইহাই ত বাহিরে ধরাতে স্বর্গরাজ্য, প্রেমরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন। এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সর্ব্বাঙ্গীণ আদর্শ, ইহাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সুন্দর একটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"। উপাসনাই জীবনের লক্ষ্য, উপাসনা প্রত্যেক মানবের জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—পৃথিবীতে, জনসমাজে "ওঁ তৎসৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করতে হইবে। এই উপাসনা কি? নব যুগে উপাসনার নূতন আদর্শ এসেছে—শুধু পূজা অর্চ্চনা, আরাধনা ধ্যান, পূর্ণাঙ্গ উপাসনা নহে; তার সঙ্গে লোকসেবা করিলেও উপাসনা হয় না। উপাসনাতে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ—সাক্ষাৎভাবে যোগস্থাপন ত চাই-ই, প্রেম ভক্তি দ্বারা তাঁর সঙ্গে প্রীতিস্থাপন, তাঁর নামকীর্ত্তন, তাঁর ধ্যান ত চাই-ই; কিন্তু ইহা হলো উপাসনার এক অঙ্গ। অপর অঙ্গ প্রিয়কার্য্যসাধন,—শুধু জনসেবা, লোকশ্রেয়ঃসাধন করিলে হবে না; লোকশ্রেয়ঃসাধন করিতে হইবে ঈশ্বরের প্রীতিপ্রেরণায়, তাঁর প্রিয় কার্য্য অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া। এই যে প্রীতিসাধন ও প্রীতিপ্রেরণায় তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন, ইহাই প্রকৃত উপাসনা। আর ইহাতেই স্বর্গরাজ্য অন্তরে ও বাহিরে স্থাপিত হইবে।

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" যিনি, "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" যিনি, সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্যের আধার যিনি, সমগ্র হৃদয় মন দিয়া তাঁহাকে প্রীতি কর, আর তাঁর প্রীতিপ্রেরণায়, তাঁর প্রিয় কার্য্য বোধে, দুঃখীর দুঃখ বিমোচন, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, নিপীড়িতের সাহায্য, পাপীদের হাত ধ'রে তোলা, মানবের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিচেষ্টা—সকল বিষয়ে স্বাধীনতার প্রচেষ্টা, ঈশ্বরের চরণে তাঁহার আধ্যাত্মিক পূজাতে সকলকে ডাকা, ইহাই প্রিয়কার্য্যসাধন। এই উপাসনাতে, এই সর্ব্বাঙ্গীণ, পূর্ণাঙ্গ উপাসনাতে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেশ, মানবসমাজ, ততটাই স্বর্গরাজ্য স্থাপনের পথ পরিষ্কার হইয়াছে, যুগ আলোকময় হইয়াছে। মানুষের কত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, কত বন্ধন শিথিল হইয়াছে, দৃষ্টি কত উদার হইয়াছে! এক ঈশ্বরের দিকেও মানুষের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাই আমাদের ব্রাহ্মসমাজের এই এক শতাব্দী এ দেশের পক্ষে, কেবল এ দেশের পক্ষে নয়, সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে "আলোকময় যুগ"। তাই আমরা আনন্দে আবেগভরে গান করিয়াছি "জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকময়"।

এই স্বর্গরাজ্য ধরাতে স্থাপন করিবার জন্য প্রত্যেক মানবেরই দায়িত্ব আছে। অপরের কি দায়িত্ব, কি কর্ত্তব্য, তাহা বলিবার আমাদের সম্প্রতি প্রয়োজন নাই। আমাদের এই মহোৎসবের শেষ দিনে আমাদের দায়িত্বের কথাই আমরা চিন্তা করি। আমরা ত দুই এক দিনের মধ্যেই নানা স্থানে গমন করিব; তাই আজ এই উৎসবের বহিরঙ্গের শেষ দিনে আমাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য একবার চিন্তা করি।

এই ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের জন্য ভগবান্ আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; অন্যকেও আহ্বান করিয়াছেন কি না আমি জানি না। তোমাকে আমাকে তিনি ডেকেছেন। জীবনের উষাকালে কি এক আলোক দেখিয়া, কি এক মহান্ মুক্তিপ্রদ আলোকময় আদর্শের আভাস পেয়ে, আমরা এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি। অনেকে কত দুঃখ, কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছি, অনেকে কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি! জননীর অশ্রুজল, সমাজের নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও কত জন ছুটিয়া আসিয়াছেন! আগুন দেখিলে পতঙ্গ যেমন এসে ছুটে পড়ে মরিবার জন্য, আমরা অনেকেও আলোক দেখিয়া, ব্রহ্মপ্রেমাগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্য, এই জীবন পোড়াইয়া নব জীবন লাভ করিবার জন্য—ভারতে, জগতে, নব জীবন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ছুটিয়া এসেছি। সুতরাং ভগবান আমাদিগকে ডাকিয়াছেন তাঁরই আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্য। ভগবান ছোট বড়, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, পাপী পুণ্যবান, সকলকেই ডেকেছেন—তাঁর উপাসনাতে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" যিনি তাঁর উপাসনাতে ডেকেছেন, জগতে ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন করতে ডেকেছেন। ব্যক্তিগত জীবন প্রেমময় হইবে, পুণ্যময় হইবে, সুগন্ধময় হইবে, সেবাময় হইবে, মানবমণ্ডলী সত্যের পথে, স্বাধীনতার পথে, পুণ্যের পথে অগ্রসর হইবে, অপ্রেম থাকবে না, ব্রাহ্মণ শূদ্র, শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণবর্ণে ভেদ থাকবে না, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ থাকবে না, নারীজাতি অবনত হ'য়ে প'ড়ে থাকবে না।

'নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার"।

এই মুক্তির বার্ত্তা যাহা ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা জীবন্তভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। আমাদের এই মহাকার্য্যে তিনি ডেকেছেন। তিনি যেন প্রত্যেককে বলছেন,—This is my beloved son, This is my beloved daughter—তোমরা এস আমার কাজে, ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার কাজে, আলোকময় যুগপ্রতিষ্ঠার কাজে এস। আমাদের জন্য যেন এই বাণী আসছে।

Who then is willing to consecrate his service unto the Lord this day? ঐ আদর্শ, ঐ আলোকময় যুগ, ঐ স্বর্গরাজ্য উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে। কে আছ তোমরা, এখনই, এই মুহূর্ত্তেই, ঈশ্বরের কাজে, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে, জীবন মন, ধন জন সময় ও শক্তি সমর্পণ করতে ইচ্ছুক আছ? দেরী করলে চলবে না; তাঁর কাজ করতে হবে, ধর্ম্মরাজ্য, প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, জগতে মুক্তির বাণী ঘোষণা করতে হবে, অপ্রেম বিদ্বেষ দূর করতে হবে, অসাম্য দূর করতে হবে, আলোক বিকীর্ণ করতে হবে। কে আছ, কে আছ তোমরা, ঈশ্বরের এই কাজে—দেরী সহিবে না—এখনই, এখনই আত্মা মন, জীবন যৌবন সমর্পণ করতে, কে প্রস্তুত আছ? আপনার সুখ আরাম বিসর্জ্জন দিয়া তাঁর কাজে অগ্রসর হবার ডাক এসেছে। তোমরা ত সে ডাক শুনেছ—সে ডাক শুনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেছ। ভুলে কি গেছ সেই বাণী? সংসারের আশ্রয় পেয়ে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়কে কি ভুলে গেছ? সংসারের মধুর কুহকমন্ত্রে তাঁর বাণী কি ভুলে গেছ? নিরন্তর তাঁর বাণী আসছে, অ'

নূতন ক'রে তাঁর বাণী এই উৎসবে, এই শতবার্ষিক উৎসবে আসছে—

সে বাণীর পরশ পেয়ে, নরনারী আসে ধেয়ে,
সঁপিবারে জীবন যৌবনরে॥

সে বাণী শুনেই রামমোহন এসেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ এসেছিলেন, কেশবচন্দ্র এসেছিলেন, শিবনাথ এসেছিলেন; সব ত্যাগ ক'রে, সব সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে কত জন এসেছিলেন! তোমারও যদি শু'নে থাক, এখনই, এই মুহূর্ত্তেই, এস!

এই ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে—জগতে নূতন আলোকময় যুগের প্রবর্ত্তনে অনেক কাজ আছে। চারিদিক হইতে কর্ম্মের আহ্বান আসছে—এই ভারতবর্ষেই কত কর্ম্ম, কত অশিক্ষা কুশিক্ষা, কত রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য, কত পাপ ও কুসংস্কার, কত অত্যাচার উৎপীড়ন, কত হিংসা বিদ্বেষ, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, শ্বেত কৃষ্ণে বিদ্বেষ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ!—এক জাতি অপর জাতিকে শৃঙ্খলে বেঁধে রাখ্‌তে চায়, এক জাতি অপর জাতির শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস কর্‌তে চায়। ধর্ম্মে ধর্ম্মে ভেদ—উপাস্য দেবতাতে উপাস্য দেবতাতেও যেন বিদ্বেষ! কোটী কোটী লোক অস্পৃশ্য হ'য়ে রয়েছে; নারীজাতি শিক্ষা স্বাধীনতার অধিকারে বঞ্চিত হ'য়ে রয়েছে! কত দিকে দুঃখের করুণ কাহিনী, অত্যাচারিতের আর্ত্তনাদ, পীড়িতের বেদনার কাতরোক্তি, শোকের মর্ম্মন্তুদ বেদনা, পাপের করুণ অনুশোচনা! তোমার প্রাণ ত পাষাণ নয়, তোমার প্রাণ যে কেঁদে উঠ্‌বে। তুমি যে কর্ম্মের আহ্বানে ছুটে চল্‌লে, তোমার প্রাণ যে আর বাধা মানে না। ঠিক কথা—কর্ম্মে যেতে হবে—সেবাতে আত্মনিয়োগ কর্‌তে হবে। স্বর্গের আলোক, প্রেমের আলোক জগতে বিস্তার কর্‌তে হবে, সব দুঃখ শোক রোগ অত্যাচার দূর কর্‌তে হবে, সব শৃঙ্খল ভেঙ্গে দিতে হবে, মানুষকে আলোকময় রাজ্যে নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং এখনই, এই মুহূর্ত্তেই যদি তোমার কর্ম্মপ্রেরণা আসে, তবে তাহা ত অন্যায় নয়, অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু একটি কথা—তাহাদের দুঃখ দূর কর্‌তে হ'লে তাহাদিগকে শক্তি দিতে হবে, তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা শিক্ষা দিতে হবে। তাহাদিগকে সকল শক্তির উৎস যিনি সেই দেবতাতে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' যিনি তাঁহাতে, আগে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হবে। তাই সেদিন আচার্য্য বলিয়াছেন, লোকের সেবা নিশ্চয়ই কর্‌তে হবে, কিন্তু সকল সেবার থেকে শ্রেষ্ঠ সেবা লোককে ঈশ্বর-চরণে আনা। শক্তির উৎস যিনি, প্রেমের প্রস্রবণ যিনি, পুণ্যের আধার যিনি তাঁর চরণে নিয়ে এস, তবে অন্য অভাব আপনিই দূর হবে। Seek ye first the kingdom of God and every thing shall be added unto you—সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর সব আপনিই আস্‌বে। দেশের দুঃখ দৈন্য দূর কর্‌তে হবে বৈ কি। শিক্ষা বিস্তার কর্‌তে হবে, স্বাধীনতার পথে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু মানুষকে যদি সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরপ্রীতি শিক্ষা না দাও, তারা অধিকার পেয়েও তাহা রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। লোকে বলে ধর্ম্মই যত বিবাদ বিসম্বাদের মূল। মানুষ ধর্ম্মের মূল যা—ঈশ্বরপ্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন, "মামেকং শরণং ব্রজ" এই মন্ত্র—তাহা ভু'লে অনুষ্ঠানকে—অবান্তর ক্রিয়াকলাপকে—ধর্ম্ম মনে ক'রে বিরোধের সৃষ্টি করে। ধর্ম্মকে দূর কর্‌তে হবে না। ধর্ম্মের নামে যে কতকগুলি বাহিরের খোসা প্রধান স্থান পেয়েছে, সেই অবান্তর বিষয়গুলি দূর ক'রে দাও, ঈশ্বরে প্রেম কর ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যবোধে মানবের সেবা কর, এই ধর্ম্মের সার কথা। ব্রাহ্মধর্ম্মের—ধর্ম্মের—মূলসূত্র যাহা তাহা লোকের কাছে প্রচার কর। ধর্ম্ম প্রেম জাগ্রত কর্‌বে,—সকল জাতিগত, বংশগত, বর্ণগত, ধর্ম্মগত, অর্থগত বৈষম্য দূর ক'রে দিয়ে ধরায় স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবে। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্ম যাহা, সার ধর্ম্ম যাহা, প্রেমের ধর্ম্ম যাহা, আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম যাহা,—"একমেবাদ্বিতীয়মের পূজা"—তাহা মানবকে দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল দুঃখ দৈন্য, অত্যাচার উৎপীড়ন দূর করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ কর্‌তে হবে।

কিন্তু এই যে কর্ম্ম কর্‌তে যাবে, এর প্রাণ কোথায়? উৎস কোথায়? কর্ম্মকে তাঁর প্রিয়কার্য্য অনুভব কর্‌তে হবে; নতুবা ঐ কর্ম্ম ত উপাসনাতে পরিণত হবে না—ঐ কর্ম্ম নূতন বন্ধন সৃষ্টি কর্‌বে। তা হ'লে ত স্বর্গরাজ্যস্থাপন কর্‌তে পার্‌বে না। কর্ম্ম কর্‌তে যেয়ে, দশজন একই সেবার কাজ কর্‌তে যেয়ে, কলহ কর্‌বে। কর্ম্মে যখন ক্লান্তি আস্‌বে, যখন ব্যর্থতা আস্‌বে, যখন লোকে বাধা দিবে, নিন্দা কর্‌বে, উৎপীড়ন কর্‌বে—তুমি অমৃতভাণ্ড ল'য়ে দ্বারে দ্বারে গিয়াছ, তারা তা বুঝ্‌তে না পেরে তোমাকে বিষ দান কর্‌বে, তুমি প্রেম বিলিয়ে যাচ্ছ, তারা তোমায় উপেক্ষা কর্‌বে, তুমি দশের কল্যাণে ক'রে যাচ্ছ, তারা তোমায় প্রত্যাখ্যান কর্‌বে, সমাজ বিদ্বেষী হবে, রাজশক্তি বিরোধী হবে, বন্ধু বান্ধব ঠেলে ফেলে দিবে—তখন কে প্রাণে আশা আনন্দ বল দিবে? কোন্ উৎস হ'তে নিরন্তর আনন্দ আশা ও শক্তির স্রোত তোমার প্রাণে প্রবাহিত হবে? আগে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার প্রীতির যোগ স্থাপন করা চাই। ঈশ্বরে প্রীতি রেখে যখন মানবের দিকে তাকাবে, দেশের দিকে তাকাবে, পৃথিবীর দিকে তাকাবে, সমগ্র মানবসমাজ নূতন আকার ধারণ কর্‌বে, নূতন প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হবে—তোমার হৃদয় প্রসারিত হবে, দৃষ্টি কোমল হবে। তোমার প্রেম কেবল পরিবার, সমাজ, ও দেশে আবদ্ধ থাক্‌বে না, সমগ্র মানব-সমাজে প্রসারিত হবে! তোমার মণ্ডলী এই কয়েকটি ব্রাহ্মেতে নিবদ্ধ থাক্‌বে না, বৃহত্তর মণ্ডলী হবে—সমগ্র ঈশ্বরবিশ্বাসী মানব—কেবল তাহাও নয়, সমগ্র মানবসমাজ—তোমার সাধনার মণ্ডলীতে পরিণত হবে। এই প্রীতিসাধনের উপায় ও প্রণালী সম্বন্ধে এই উৎসবের সময় আচার্য্যগণ নানা ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। সেই সকল উপদেশবাক্য অতীব মধুর। তাঁরা সাধনা দ্বারা যাহা লাভ করিয়াছেন তাহা বলিয়াছেন। সকল কথা বলিবার আমার সুবিধা নাই, দুই চারিটি কথা বলিব।

ভক্ত কবি সঙ্গীতে বলেছেন—

"প্রেমভরে নাম সাধন কর, আর জীবে কর প্রেমদানরে,
জীবনের এই মহাব্রত কররে সমাধান রে।"

ইহাই ত সার কথা—ইহাই ত ব্রাহ্মজীবনের আদর্শ। এই

যে বাষ্পরাশি সমুদ্র নদী তড়াগ হ'তে উর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়, উহা আকাশে যেয়ে ঘনীভূত হ'য়ে মেঘ হয়। সেখানেই এর শেষ নয়; উহা আবার বৃষ্টিধারারূপে পৃথিবীতে পড়িয়া মানবের অশেষ কল্যাণসাধন করে; তাহাতেই বাষ্পজীবনের সার্থকতা। তোমার আমার হৃদয়ের প্রেমও উর্দ্ধদিকে ঈশ্বরচরণে উত্থিত হইবে; সেই প্রেমধারা ভগবানের চরণ ধৌত করিয়া সেবার ধারারূপে মানবসমাজে প্রসারিত হইবে। তাহাতেই প্রেমের সার্থকতা, জীবনের কৃতার্থতা। তাই ভক্তগণ, সাধুগণ, আচার্য্যগণ আগে ঈশ্বরপ্রীতিসাধনের কথাই বলেছেন। এই সাধন নির্জ্জনে, একান্তে করিতে হইবে—তাঁর চরণে বস্‌তে হবে। আবার সজন সাধনও কর্‌তে হবে, দশ জনের সঙ্গেও ঈশ্বরচরণে আত্মনিবেদন কর্‌তে হবে। আমরা যে মলিন, আমরা যে অভাবে দুর্ব্বল, আমরা পরস্পর হাত ধ'রে চল্‌ব। তাই মণ্ডলীর প্রয়োজন, ঈশ্বরনিষ্ঠ ভক্তমণ্ডলীর প্রয়োজন। কিন্তু সকল সাধনার মূলে মনে থাকে যেন আমরা ঈশ্বরকে চাই, ব্যাকুলভাবে তাঁকে চাই, তাঁর প্রেমস্পর্শ চাই, তিনি ছাড়া আমার আর গতি নাই। তিনি সত্যং শিবং সুন্দরং, তিনি সর্ব্বময়, তিনি Well of living waters—তিনি অন্তরতর অন্তরতম। তাঁকে আমি চাই, সেই "রসাল দয়াল নামে" মগ্ন হ'তে চাই। "সেই রসে না রসিক হ'লে, মানব জীবন ফাঁকরে" এই মনে ক'রে তাঁকে পেতে চাই।

"তুমি মধু, তুমি মধু,"। তাঁকে পেলে জগৎ মধুময় সৌন্দর্য্যময় হয়, জীবন সরস হয়। এই ভাবে য'তে তাঁতে মগ্ন হ'তে পারি, অন্তরে তাঁকে দেখ্‌তে পারি, বাহিরের সকল দৃশ্যে তাঁর সৌন্দর্য্য দেখি, সকল সুরে তাঁর সঙ্গীত শুনি, সকল স্বাদে, রসে, গন্ধে স্পর্শে যেন তাঁকে অনুভব কর্‌তে পারি, এই জন্য যেমন নির্জ্জনে একান্তে তাঁর ধ্যান করা চাই, সেইরূপ সজনে দশজনের সঙ্গে, সমসাধকের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তাঁর চরণে বসা চাই। এই জন্যই মণ্ডলীর প্রয়োজন। "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণরে।" আমরা সকলেই দুর্ব্বল, তাই সাধনপথে, সংগ্রামের সময়, প্রলোভনের সময়, দুঃখ বেদনার সময় আমাদের বল দেয়, উৎসাহ দেয়, এমন লোক চাই, ধর্ম্মবন্ধু চাই, মণ্ডলী চাই। কেবল যে এইখানে যাঁরা আছেন তাঁরাই আমাদের মণ্ডলী, যাঁরা ইহলোকে আছেন, কি ব্রাহ্মসমাজের লোক যাঁরা, তাঁরাই আমাদের মণ্ডলীভুক্ত তা নয়। মণ্ডলী ক্রমে বিস্তৃত হবে, প্রেম যত বিস্তার লাভ কর্‌বে মণ্ডলীও তত বিস্তৃত হবে—ইহলোকবাসী পরলোকবাসী সকল ভক্ত, ব্যাকুল আত্মা সবই আমাদের মণ্ডলীভুক্ত। অজ্ঞেয়বাদী স্পেন্সারও আমাদের মণ্ডলীভুক্ত। কেহই ত আমাদের পর নহে। ঈশ্বরের মন্দিরে অনেক গৃহ আছে—In my father's house there are many mansions. সকলেই আমাদের। থাকুক বহিরাবরণে প্রভেদ, থাকুক অনুষ্ঠানে প্রভেদ, থাকুক নানা বিষয়ে প্রভেদ, তবুও তারা আমাদেরই, তারাও ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে সহায়—আমার ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবন গঠনে সহায়। সুতরাং সকলকেই হৃদয়ে গ্রহণ কর্‌তে হবে। দশজনে মিলে, শতজনে মিলে ব্যাকুলভাবে তাঁর প্রসঙ্গ, তাঁর অর্চ্চনা, তাঁর নামকীর্ত্তনে প্রাণে বল আসে, কর্ম্মশক্তি আসে, নিরাশায় আশা আসে।

তারপর এই ব্রহ্মপ্রীতিসাধনে যেমন প্রেম আসে, মানবের প্রতি প্রেম আসে, তেমনি আবার প্রীতিসাধন কর্‌তে হ'লেও আগে প্রেম চাই। যীশু বলেছেন, যদি "নৈবেদ্য নিয়ে ঈশ্বরচরণে এসে থাক, আর তখন মনে পড়ে, কারও সঙ্গে তোমার মনোমালিন্য আছে, তবে নৈবেদ্য রেখে দাও, আগে তার সঙ্গে মিলন ক'রে এস, তবে তোমার নৈবেদ্য গৃহীত হবে। ঠিক কথা—কারও প্রতি অপ্রেম লইয়া ঈশ্বরচরণে যাওয়া যায় না। ঈশ্বরচরণে বস্‌তে হ'লে ক্ষমা চাওয়া চাই, ক্ষমা করা চাই, সকল অপ্রেম-ভাব দূর করা চাই। তাঁর চরণে আত্মনিবেদন, জীবন মন অর্পণ ক'রে তাঁর প্রেমের স্রোতে আপনাকে ঢেলে দিব, তিনি যে দিকে নিয়ে যাবেন তাতে বাধা দিব না, এই ভাব হওয়া চাই। মানবের প্রতি যত প্রেম বাড়িবে, তত বেদনাও বাড়িবে। প্রেমে বড় ব্যথা আসে, সকলের দুঃখ ভার নিজের মস্তকে বহন কর্‌তে হয়। এই যে দুঃখভার বহন করা, এতেই আমার সাধনা, এতেই আমার কল্যাণ। অনেকের এই ব্যথার দ্বারাই অনেক সময় পূজা কর্‌তে হবে; তাতেই ক্রমে আনন্দ আস্‌বে, শান্তি আস্‌বে। প্রার্থনা কর্‌তে হবে সকল দুঃখ, সকল বেদনা যেন তাঁর জন্য সইতে পারি।

তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের সখা, তিনি আমাদের জীবনস্বামী, তাঁর সঙ্গে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক। তিনি কেবল মহান্ ঈশ্বর দূরে রয়েছেন, দূর হ'তে তাঁর অর্চ্চনা কর্‌ব, তাঁর আদর্শে চল্‌ব, তা ত নয়। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক—তিনি সঙ্গে আছেন, পিতা, বন্ধু, সখা, স্বামী হ'য়ে সঙ্গে আছেন। এই ভাবে জীবনের সকল কর্ম্মে তাঁকে স্বামী ব'লে দেখ্‌তে হবে, পিতা ব'লে দেখ্‌তে হবে। তিনি শিবং; জীবনে কেবল যে সুখ আছে, আনন্দ আছে, মিলন আছে, তা ত নয়; জীবনে দুঃখ আছে, শোক আছে, মৃত্যু আছে, বিচ্ছেদ আছে, প্রিয়জনের উপেক্ষা আছে। তখনও তিনি শিবং, এইটি উপলব্ধি কর্‌তে হ'লে তিনি যে সর্ব্বময় দেবতা, এই ভাবে তাঁকে দেখ্‌তে হবে, গ্রহণ কর্‌তে হবে। আমার দৃষ্টি ক্ষুদ্র, তিনিই আমার সমগ্র জীবন—ভূত ভবিষ্যৎ—দেখ্‌ছেন। তাই তিনি কখনও সুখ, কখনও দুঃখ বেদনা দিয়া, কল্যাণের পথে নিয়ে চলেছেন। তিনি সর্ব্বময়—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ভাবে না দেখ্‌লে তাঁকে মঙ্গলময় ব'লে ধরা যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা তাঁতে মগ্ন থাক্‌তেন। নির্জ্জন পথে চল্‌তেন, দেখ্‌তেন তাঁর অনিমেষ আঁখি চেয়ে রয়েছে, সারারাত হয়ত আকাশের দিকে চেয়ে আছেন, অথবা পদচারণা কচ্ছেন, প্রাতঃকালে সূর্য্যের উদয় দেখ্‌ছেন, তাঁর প্রকাশ দেখ্‌ছেন, তাঁর অনিমেষ আঁখি যে চেয়ে আছে তা অনুভব কচ্ছেন; বন্ধুগণের সঙ্গে যে সম্পর্ক তার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রীতির সম্পর্ক অনুভব কচ্ছেন। তাঁর একনিষ্ঠ সেবক হ'য়ে, তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে, আপনার সকল সুখ ঐশ্বর্য্য ছেড়ে দিয়ে, কাঙ্গাল হ'তে চল্‌লেন। তিনি এক প্রকৃতির সাধক ছিলেন।

তিনি এক একটি সত্য—সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রভৃতি এক একটি ঋষিবাক্য—স্থিরভাবে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, ধ্যান কর্‌তেন। তিনি বল্‌তেন, তোমরা সত্যং জ্ঞানমনন্তং বল, ইহাতে

কি বুঝ্‌তে পার জানি না, আমি ওর এক একটির মধ্যে সাগর দেখি"। সত্যং বল্‌তে তাঁর সমগ্র বেশ খাড়া হ'য়ে উঠ্‌ত। তিনি স্থানের ও সময়ের অবকাশ খুঁজিতেন, ধড় ধাকায় চলা তাঁর প্রকৃতি নয়। আকাশে মেঘের খেলাতে, সূর্য্যের উদয় অস্তে, গিরি নদীতে তাঁর লীলা দেখ্‌তেন, অন্তরে তাঁর স্বরূপ,—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং—বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সাধন কর্‌তেন। এই ভাবে সাধন করা প্রয়োজন।

ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হ'তে হবে। মহর্ষি ব্যাকুল হ'য়েই সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। যে সৌন্দর্য্য একবার দেখ্‌লেন, যে আলোকের আভাস পেলেন, তাহা চ'লে গেল। তিনি ব্যাকুল হ'লেন। খাওয়া পরা মনে থাক্‌ত না, সূর্য্যরশ্মি কৃষ্ণবর্ণ দেখাত। মীরা বাই বলেছিলেন "হে প্রিয় এসে দেখা দাও, তোমাবিনা আমি থাকতে পারি না; জল বিনা পদ্ম, চাঁদ ছাড়া রজনী থাকতে পারে না, তেমনি তোমাছাড়া আমি থাক্‌তে পারি না। আমি আকুল ব্যাকুল হ'য়ে রাত দিন ঘুরে বেড়াই, বিরহে ব্যাকুল হই, দিনে ক্ষুধা নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই, মুখ দিয়ে কথা বাহির হয় না, আমার বিরহ-অগ্নি নির্ব্বাণ কর। আমি জন্মে জন্মে তোমার পায়ে প'ড়ে থাকি।" এইভাবে তাঁর সন্ধান কর্‌তে হয়। চৈতন্য এইরূপ ব্যাকুল হয়েছিলেন; সকল সাধকই বিরহে ব্যাকুল হন। আর ভগবান্ ব্যাকুল ক্রন্দন শোনেন—তিনি দর্শন দেন। তাই আর একজন সাধক বলেছেন—তাঁকে লাভ ক'রে বলেছেন—"আমি রামরতনকে পেয়েছি, যাঁর জন্য আকুল ব্যাকুল হয়েছিলাম তাঁকে পেয়েছি; এ ধন সংসারের ধনের মতন নষ্ট হয় না, দিন দিন বেড়ে চলে। জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, এত বড় যে ধরণী তা ধর্‌তে পারে না।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ব্যাকুল ভাবে সাধনার পর তাঁকে পেয়ে বলেছিলেন "ন দিবা ন রাত্রি শিবং শিবং হি কেবলং, শিবং শিবং হি কেবলম্।" তিনি করুণা করেন, দেখা দেন। সেন্টপল বলেছেন ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি faith, hope, charity—বিশ্বাস—ভগবানের করুণায় বিশ্বাস, আশা—তিনি দেখা দিবেনই এই আশা, আর প্রেম—ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং মানবের প্রতি প্রেম। ঈশ্বরে প্রেম জাগিলেই মানবে প্রেম হয়। প্রেম কত সহিষ্ণু, প্রেম কত দুঃখ বরণ করে! প্রেম না থাকলে জীবনই বৃথা। তোমার জ্ঞান থাক্‌তে পারে, বক্তৃতা-শক্তি থাক্‌তে পারে। তোমার ধন ঐশ্বর্য্য থাক্‌তে পারে, কিন্তু হৃদয়ে যদি একটু প্রেম না থাকে তবে সবই বৃথা, সবই বৃথা। প্রেম প্রিয়জনের জন্য সকল সইতে, সকল বেদনা বইতে সমর্থ করে। যে উপেক্ষা করে তাকেও প্রেম কর্‌তে হবে; যে অনিষ্ট করে তারও কল্যাণচিন্তা, কল্যাণচেষ্টা কর্‌তে হবে; এই প্রেম সাধন কর্‌তে হবে। আশার সঙ্গে বিশ্বাসের জন্য প্রতীক্ষা কর্‌তে হবে। তিনি আস্‌বেন, কবে আস্‌বেন, কোন পথে আস্‌বেন, কি ভাবে আসবেন, জানি না। প্রতীক্ষা কর, দিন রাত তাঁর চরণে প'ড়ে থাক; যখন আস্‌বেন, তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে মোহিত হবে।

তুমি মনে কর, তুমি পাপী, তুমি কত অপরাধে অপরাধী, তুমি মলিন, কেমন ক'রে তাঁর প্রকাশ দেখ্‌বে। মনে থাকে যেন, তিনি পরম দয়াল, তাঁর চরণে প'ড়ে থাক্‌লে অনন্ত করুণাময়, প্রেমময় কৃপা কর্‌বেন। "তোমার পাপ যদি শোণিতের মত লাল হয়, তবুও তা ধু'য়ে মু'ছে বরফের মত শাদা হ'য়ে যাবে।" অন্য বাসনা ছেড়ে, তাঁর মুখের অমৃতময়ী বাণী শুন্‌বার জন্য, আশার সহিত, সহিষ্ণুতার সহিত, প'ড়ে থাক। দীন হীন হ'য়ে, কাঙ্গাল হ'য়ে, 'আমার শক্তি নাই, তুমি করুণা কর', এই প্রার্থনা নিয়ে প'ড়ে থাক; তিনি তোমার সব পাপ তাপ ধৌত ক'রে দিবেন। ভক্তগণের কত বাণী শুনেছ, এই বেদী হইতে কত সুন্দর সুন্দর মিষ্ট কল্যাণপ্রদ বাণীসকল উত্থিত হয়েছে, সেই সকল পূজার মালা যত্ন ক'রে গলায় পর। আর কিছু না পার, সেই বাণীসকল স্মরণ কর। Pray in the darkness if there be no light—যদি আলোক না দেখ, আঁধারে ব'সেই প্রার্থনা কর। কি সুমিষ্ট ভক্ত বাণী! গোস্বামী মহাশয় বলেছিলেন এই গাঁদা ফুলের মধ্যে কি সুন্দর প্রকাশ। এই সকল বাণী পূজার মালা, কণ্ঠহার। তাই বলি, যদি মণ্ডলীর উপাসনাতে এস, দশজনের সঙ্গে একত্রে ব্রহ্মচরণে বস—কেবল এই ক্ষুদ্র মণ্ডলী নয়, বৃহত্তর মণ্ডলী, দূর দেশের ভক্ত, পরলোকের ভক্ত, সকলের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ঈশ্বরচরণে বস—তবে তাঁদের সংস্পর্শে আশা আস্‌বে, নব জীবন আস্‌বে, এক একটি বাণী মণির মতন হ'য়ে থাক্‌বে।

তিনি করুণা ক'রে আমাদিগকে কত দেন! ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা ক'রে কত পাই! কিন্তু কেবল পেলেই ত চলে না, যাহা পাই তাহা আত্মস্থ কর্‌তে হবে; একটি সত্য তিনি দিলেন, একটি ভাব তিনি জাগালেন প্রাণে, তাহা রক্ষা করা চাই, তাহা কাজে লাগান চাই। একটি দানের মর্য্যাদা না রাখ্‌লে দাতা আর যে দান করেন না। সুতরাং সাধনা দ্বারা ঈশ্বরের কৃপায় যে সত্যটি লাভ হবে, তাহা কাজে লাগাতে হবে, তদনুসারে চল্‌তে হবে—কেবল পাওয়া নয়, হওয়া চাই। তা'হলে তিনি নূতন নূতন সত্য দিবেন।

তিনি সত্যং, তিনি সর্ব্বময়, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'; তাঁর নামে পাপ যায়, তাপ যায়, মৃত্যুভয় চ'লে যায়। তিনি যে অনন্ত! অনন্ত না হ'লে কি চলে? তা হ'লে যে ফুরিয়ে যায়; তাঁর চরণে চিরদিনের মত ডুব্‌তে হবে: তাঁর চরণে আত্মনিবেদন কর্‌তে হবে।

Let the Lord of my castle appear and I shall lay the keys at his feet. ভূমা যিনি, মহান্ যিনি, প্রভু যিনি, আমার জীবনদুর্গের অধিস্বামী যিনি, তিনি আসুন, আমার জীবনের চাবি তাঁর চরণে রেখে দিব, আমার জীবনটি খুলে তাঁর কাছে রাখ্‌ব। কেবল বাহিরে নয়, অন্তরে তাঁকে দেখ্‌ব—অন্তরতর অন্তরতম তিনি।

তবে বলি—সত্যং শিবং সুন্দরং তিনি; তিনি আকাশে, তিনি অন্তরে, এই বিশ্ব চরাচর তাঁরই প্রকাশ। তাঁর প্রেমে আত্মসমর্পণ কর্‌তে হবে, তাঁর জন্য পাগল হ'তে হবে, সহিষ্ণুতার সহিত প্রতীক্ষা কর্‌তে হবে, নির্জ্জনে একান্তে তাঁকে প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে দেখ্‌তে হবে, দশ জনের সঙ্গে মিলে তাঁকে ডাক্‌তে হবে, ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা কর্‌তে হবে, তাঁর অনিমেষ আঁখি আমার উপর রয়েছে তা অনুভব কর্‌তে হবে। তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ কর্‌তে হবে। কেবল আত্মসমর্পণ নয়—

একেবারে আত্মবিলোপ করতে হবে। আত্মসমর্পণ একদিনে হ'তে পারে, কিন্তু জীবনব্যাপী আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়। আমার সুখ দুঃখ, মান অপমান চাই না, প্রভু তুমি যা বল তাই করব, যেভাবে রাখ আনন্দে তাই থাকব। নানা কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে যাতে সরসতা থাকে, স্নিগ্ধতা থাকে, তার অবকাশ রাখতে হবে। কেবল ব্যস্তভাবে কাজ ক'রে গেলে চলে না, তাঁর চরণে বসতে হবে, প্রেমের মাধুর্য্য অনুভব করতে হবে, তাঁর মুখের বাণী শুনতে হবে। তিনি প্রেমের প্রস্রবণ; তবে ব্যস্ততা কেন? উদ্বেগ কেন? স্থিরভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু বসতে পার না? যিশু বলেছিলেন Martha, Martha, thou art troubled about many things, but one thing is needful and Mary hath chosen that good part that shall not be taken away from her. ঐ মেরীর মত প্রভুর চরণে বসতে হবে, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হবে, তাঁর বাণী শুনে আনন্দ লাভ করতে হবে। সংসারে অনেক দুঃখ পাবে, তাঁর সেবা করতে যেয়ে বেদনা আসবে, লোকে নিন্দা করবে, কত নির্য্যাতন করবে, তা নীরবে সইতে হবে। প্রিয়তমের জন্য সয়েছ, তার আবার বড়াই কি? মা ছেলের জন্য কত কষ্ট সহ্য করেন, পত্নী পতির জন্য কত বেদনা সহ্য করেন—মুখে কথা নাই, তা নীরবে সয়ে যান। কেবল নীরবে সহ্য করা নয়, তাহাতে আনন্দ—আমি প্রিয়তমের জন্য এই দুঃখ যে সইতে পারি, তিনি যে আমাকে এই সংগ্রাম পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন, তাতেই যে আমার আনন্দ, এ যে আমার সৌভাগ্য! ওগো জীবনস্বামী, তুমি এই দুঃখ দিয়ে তোমার আপনার ক'রে নিয়েছ, এই বেদনা দিয়ে তুমি আমাকে আলিঙ্গন করেছ, আমি ধন্য, আমি কৃতার্থ, আজ আমার প্রেম সফল হইল।

এই ভাবে নির্জ্জনে ও সজনে তাঁর প্রেমসাধন, প্রীতিসাধন করতে হয়। আর এই প্রেমের সাধন, সকলকেই করতে হবে, বাল্যকাল হ'তেই আরম্ভ করতে হবে। হে বালক বালিকা, হে তরুণ তরুণী, হে প্রবীণ প্রবীণা, হে বৃদ্ধ বৃদ্ধা, তোমরা এই প্রেমের সাধনে প্রবৃত্ত হও। আজ এই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁর চরণে বস, আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণ কর, তাঁর নাম গান কর; তাঁর প্রেমের স্রোতে গা ঢেলে দাও। তাঁতে প্রীতি রেখে, তাঁর প্রিয়কার্য্য অনুভব ক'রে, মানবের সেবায়, জগতের সেবায়, প্রেমরাজ্যস্থাপনে, পৃথিবীব্যাপী তাঁর মন্দিরনির্ম্মাণে আপনাকে ঢেলে দাও!

আবার শাস্ত্রের ভাষাতে বলি, Who then is willing to consecrate his service unto the lord this day?

স্বর্গরাজ্য, প্রেমরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করতে হবে। রাজর্ষি রামমোহন যে দৃশ্য, যে আদর্শ দিব্য জ্ঞানে দেখেছিলেন, ধরাকে স্বর্গে পরিণত করতে হবে! প্রেম পবিত্রতা, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা জগতে, মানবসমাজে, দেশে আনতে হবে। অন্যেরাও চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাদের দৃষ্টি ক্ষীণ, তাঁরা সকলে ব্রহ্মের নামে জাগ্রত হন নাই। তাঁরা দেশের কল্যাণের জন্য, অস্পৃশ্যতা নিবারণ করতে চা'ন, নারীজাতির উন্নতি করতে চা'ন। তোমাদের কাছে ব্রহ্মের বাণী এসেছে—মহান্ প্রভুর্ বৈ পুরুষঃ যিনি, একমেবাদ্বিতীয়ম্ যিনি, ওঁ তৎ সৎ যিনি, তাঁর ডাক তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁর প্রেমে প্রেমিক হ'য়ে, তাঁর প্রিয় কার্য্য অনুভব ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও! কেবল দেশের কল্যাণের জন্য নয়, স্বরাজসাধনে নিম্নশ্রেণীর সাহায্য প্রয়োজন, নারীর সাহায্য প্রয়োজন, হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রয়োজন, এ ভাবে নয়। সকলে যে তোমার পিতার সন্তান, সকলে তোমার ভাই বোন, সকলের মধ্যে ব্রহ্ম রয়েছেন, সুতরাং সকলকে ডেকে আন। তাই তোমরা ঘোষণা করেছ, ব্রহ্মের সন্তান ব'লে ঘোষণা করেছ—

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার"

তাই ব্রহ্মের নামে দুঃখ দৈন্য দূর করতে, অশিক্ষা কুশিক্ষা দূর করতে, অমৃতের অধিকারী যাঁরা তাঁদের অমৃতধামে নিয়ে যেতে, সকল বন্ধন হ'তে মুক্ত করতে, সত্য প্রেম পবিত্রতাতে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাতে উদ্বুদ্ধ করতে, ভগবানের চরণে হাত ধ'রে নিয়ে আসতে, যে দূরে গিয়েছে তাকে নিকটে ডাকতে, যে প'ড়ে গিয়েছে তাকে তু'লে ধরতে, পতিত জাতিকে উন্নীত করতে, স্বাধীনতা ও পুণ্যের পথে নিয়ে যেতে, তোমরা ব্রহ্মের নামে অগ্রসর হও। কেবল এ দেশ নয়—রাজা রামমোহন সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণচিন্তা করতেন, দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হ'তেন। অপর জাতিকে হীন ক'রে তোমার যে স্বাধীনতা তাহা তোমার লক্ষ্য নয়, ব্রহ্মসন্তানের এই লক্ষ্য হ'তে পারে না। তোমার দেশের কল্যাণ করতে হবে, দেশের স্বাধীনতা আনতে হবে. দেশকে প্রেমে পুণ্যে, শৌর্য্যে বীর্য্যে উন্নত করতে হবে, কিন্তু প্রেম সকল মানবে ছড়িয়ে পড়িবে। এই যে মহান্ আদর্শ, এই যে ধরাকে স্বর্গে পরিণত করা, এইজন্য তোমাকে আমাকে ঈশ্বর ডেকেছেন।

Who then is willing to consecrate his service unto the Lord this day? কে তবে, ভাই বোন সকল, কে তবে আজ এই মুহূর্ত্তে, এই উৎসবান্তে বিদায়ের দিনে, পরব্রহ্মের সেবাতে, ধরায় প্রেমরাজ্যস্থাপনে, তার সময় শক্তি অর্থ, তন মন প্রাণ, নিবেদন করতে ইচ্ছুক। সকলে একভাবে কাজ করবে না, শরীরের রক্ষার জন্য চক্ষুর কার্য্য আছে; কর্ণের প্রয়োজন আছে, হাত পা'রও কর্ত্তব্য আছে। চক্ষু যেন বলে না, কর্ণ তুমি দেখতে পাও না, তোমার প্রয়োজন নাই, নাসিকা যেন বলে না, চক্ষু তুমি ঘ্রাণ নিতে পার না, তোমার প্রয়োজন নাই। যে যেটুকু পারে, ঈশ্বরে প্রীতি রেখে তাঁর প্রিয়কার্য্যে, তাঁর ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে নিযুক্ত থাকবে। সকলকে প্রেমের সহিত গ্রহণ করতে হবে, ভাই বোন সকলে হাত ধরা ধরি ক'রে অগ্রসর হ'তে হবে। আজ এই আশা নিয়ে, এই সঙ্কল্প নিয়ে, এই ব্রত নিয়ে,—ঈশ্বরের প্রীতিসাধন ও তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন, লোকশ্রেয়ঃসাধন, ধরায় স্বর্গরাজ্যস্থাপন—এই ব্রত নিয়ে উৎসবমন্দির হ'তে গমন কর। ঈশ্বরে প্রেম, সেই প্রেম মানবে ছড়িয়ে পড়ুক। দৃষ্টি নবীন হউক, জীবন মিষ্ট হউক, ব্রহ্মের সন্তান ব্রহ্মের চরণে আসুক, সকলে মিলে এক প্রাণ হ'য়ে জয় ব্রহ্মের জয় গান করি। "জয় যুগ আলোকময়" অনুভব করি। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন।

অনন্তর অনেকক্ষণ কীর্ত্তনাদি হইয়া এই বৎসরের উৎসব শেষ হয়। সকলে আলিঙ্গনাদি করিয়া পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। উৎসবের অঙ্গরূপে একদিন কাঙ্গালী-বিদায়ও হইয়াছিল।

আমরা জানি কত অকিঞ্চিৎকর ও অসম্পূর্ণভাবে আমরা উৎসবের বিবরণ দিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাদের শক্তি ও আয়োজন অতি সামান্য। তবুও করুণাময়ের কৃপায় যেটুকু করিতে পারিয়াছি তাহার জন্যই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। এবং আমাদের ত্রুটির জন্য সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

পরলোকগত হরিশ্চন্দ্র দত্ত।

(শ্রাদ্ধবাসরে পুত্র শ্রীমান্ সুশোভন দত্ত কর্ত্তৃক বিবৃত)

আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব বিগত ৩রা ফাল্গুন ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার অদেহী মুক্ত আত্মা বিশ্বাসীর চির ঈপ্সিত 'ভগবানের মহিমা-লোকে' বিরাজ করিতেছে। জানি না সে-লোক ও এ-লোকের ব্যবধান কত দূর! কিন্তু আমাদের অন্তরের দৃঢ়বিশ্বাস অকরুণ বিধির দেওয়া এ দূরত্বের অশেষ ব্যবধান ব্যহত ক'রেও আমাদের প্রাণের গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি আজ তাঁর চরণে পৌঁছাবে।

আজ বাবার শ্রাদ্ধবাসরে আমরা তাঁর সংগ্রাম ও কর্ম্মবহুল জীবনের একটী ধারাবাহিক পরিচয় দিতে যাব না। তাঁর জীবনের সকল সংগ্রাম ও কর্ম্মের মধ্যে যে যে জায়গায় তাঁর অন্তরের বিশেষ বিশেষত্বগুলি ফুটে উঠ্‌ত, আজ তাই বেশী করে স্মরণ কর্‌ব।

অলোকসামান্য প্রতিভা কিম্বা অসাধারণ মানসিক শক্তি না থাক্‌লেও মহাপুরুষ হওয়া যায় না কি না জানি না। কিন্তু জীবনের আরম্ভে একটী পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুট আদর্শ অবলম্বন ক'রে সে আদর্শ পালন কর্‌বার জন্য সংগ্রামে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত দেহ মনের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করার মধ্যে যদি মহত্ব কিছু থাকে, তা হ'লে বাবা সত্যই মহাপুরুষ ছিলেন। বাহিরের জগতের বিস্ময় আকর্ষণ কর্‌তে পারার মত বিরাট কোনও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাবার সুযোগ বাবার জীবনে হয়তো ঘটে নাই, কিন্তু তাই ব'লে স্বীয় জীবনের আদর্শ পূর্ণভাবে রক্ষা করার জন্য যখন যেখানে যেটুকু স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন এসেছে বাবা তা' কর্‌তে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নি। তাঁর জীবনের প্রভাব হয়তো বহুদূরে দেশে বিদেশে বিস্তৃত হ'য়ে পড়েনি—কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে এসে এবং তাঁরই ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জীবনের গভীর অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটেছে, এ রকম সাক্ষ্য দেওয়ার লোকের অভাব এ অঞ্চলে হবে না। তাই মনে হয়, বাবা সত্যিই তাঁর খ্যাতির চাইতেও অনেক বড় ছিলেন।

১২৬৬ বাংলা (১৭৫৯ খৃঃ অব্দে) ১১ই শ্রাবণ, চট্টগ্রামের অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে সম্মানিত ও নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারে বাবার জন্ম হয়। তাঁর পিতা ন্যায়নিষ্ঠ, স্বাধীনচেতা, এবং সৎ ও উন্নত চরিত্রের লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অন্ধভাবে কোনও শাস্ত্র বা মত মানিয়া চলা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। মাতা বিশ্বাসী, ধর্ম্মপরায়ণা ও ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁহাদের সন্তান পিতামাতার এ সমস্ত সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হন। বাল্যকালে বাবা পূর্ণ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে সকল প্রচলিত হিন্দু আচার ও অনুষ্ঠান মানিয়া চলিতেন, এমন কি বহুকাল তিনি ব্রাহ্মণের পাদোদক পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে একটী স্মরণীয় ঘটনার কথা বাবা বলিতেন। একবার কোনও এক ব্রাহ্ম প্রচারক তাঁহাদের বিদ্যালয়ে আসিয়া বক্তৃতা করেন। তখনও বাবা ব্রাহ্মসমাজের নামও শোনেন নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় যোগ দেওয়ার ফলে বাবা সেদিন প্রতিজ্ঞা করেন যে, জীবনে কখনও সত্যকে লঙ্ঘন করিবেন না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি এই মহৎ সঙ্কল্প পালন করিয়া গিয়াছেন।

চট্টগ্রাম জিলা স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি ভক্তিভাজন বিজদাস দত্ত মহাশয়কে শিক্ষকরূপে পান। দীর্ঘকাল তাঁহার সংস্পর্শে থাকিয়া বাবা সামাজিক ও অন্যান্য নানা বিষয়ে উদার মতাবলম্বী হন। চট্টগ্রাম কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাবা বি এ পড়িতে কলিকাতা চলিয়া যান। উচ্চশিক্ষালাভের এবং স্বাধীন চিন্তাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত সামাজিক হিন্দু আচার, অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিকতায় তিনি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাচার তাঁহার নিকট পৌঁছে এবং পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত প্রভৃতি দু'একজন ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত পরিচিত হইয়া তিনি ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট ও যুক্ত হইয়া পড়েন। কাহারও ব্যক্তিগত প্রভাবে বাবা ব্রাহ্মসমাজে ঝাঁপ দিয়া পড়েন নাই। দীর্ঘকাল স্বাধীনচিন্তা ও সংগ্রামের ফলে তিনি এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে বাবা কলেজের অধ্যয়ন শেষ করিয়া দেশে ফিরেন। বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন ও ভাল সরকারী চাকুরী প্রাপ্তির সুযোগ তাঁহার যৌবনকালে ছিল। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল পূর্ব্বে চট্টগ্রামে ইংরাজীশিক্ষিতের সংখ্যা বেশী ছিল না; স্বভাবতঃই তাঁহার নিকট কয়েকটী কাজের জন্য আহ্বানও আসিয়াছিল; কিন্তু কোনও কাজই তিনি গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা তাঁহার কোনও দিন ছিল না। মাতৃভূমির এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল পাইলে সন্তুষ্ট থাকিবেন, এই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। এ সম্বন্ধে নিজে লিখিয়াছেন—"নিজের জীবিকার প্রশ্ন মনে হইলে শিক্ষকতা করিয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিব বলিয়াই মনে করিতাম। অল্পদিনের জন্য গ্রামে একটী শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সেখানে সুবিধা হইল না। সে কাজ পরিত্যাগ করিয়া সহরে চলিয়া আসিলাম। সহরের পথে নৌকায় বসিয়া ভাবিতেছিলাম, আমার কিরূপে দিন চলিবে? এখানে আমার থাকিবার গৃহ নাই, আহারের সংস্থান নাই, সঞ্চিত অর্থ নাই এবং কাজের সহায়তা করিবারও কেহ নাই। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ আমার চক্ষু মুক্ত আকাশে পতিত হইল—দেখিলাম, অনেকগুলি পাখী

আকাশে উড়িয়া যাইতেছে। ইহাদের সঞ্চয় নাই, সংস্থান; কিন্তু ইহারা প্রতিদিন আহার পায়—অনাহারে মরে না। যিনি বিশ্বপালক তিনি কি তোমার অন্নজলের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না? এই বাণী আমার শঙ্কিত প্রাণকে শান্ত করিল, আমার হৃদয়ে বলদান করিল। আমি অগ্রসর হইলাম।"

সহরে আসিয়া তিনি একটী ভাড়াটীয়া বাটীতে দুইজন সহকারী এবং মাত্র সাতজন ছাত্র লইয়া একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় খুলিলেন। এইরূপে তাঁহার স্বাধীন জীবনের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার মধ্যে তাঁহার অসীম আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া এবং সরকারী শিক্ষা বিভাগের অশেষ বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও, অল্পকাল মধ্যে তিনি তাঁহার বিদ্যালয়ের স্থায়ী affiliation পান এবং ভবিষ্যতে Sir A. Croft প্রভৃতি শিক্ষা বিভাগের বহু উচ্চতন কর্মচারী তাঁহার শ্রম চেষ্টা, এবং সাফল্যের প্রশংসা করিতে এবং তাঁহার বিদ্যালয় য চট্টগ্রামের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর লোকের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের প্রভূত সহায়তা করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কেবলমাত্র নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটীকে গড়িয়া তোলেন এবং ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল পরিচালনা করেন। কোনও কালে সরকারের অথবা সাধারণের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। সাতজন ছাত্র লইয়া তিনি যে বিদ্যালয় আরম্ভ করেন, উত্তরকালে সেই বিদ্যালয়ে একত্রে সাত শত ছাত্রও অধ্যয়ন করিয়াছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটীকে উপলক্ষ করিয়া তিনি স্বীয় মাতৃভূমির সেবার আকাঙ্ক্ষা কতক পরিমাণে চরিতার্থ করিয়াছিলেন। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল, অপেক্ষাকৃত দরিদ্রগণের উপযোগী বিদ্যালয় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সময়ে তিনি এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কয়েক সহস্র দেশবাসীর শিক্ষালাভ সম্ভব করিয়া দেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রভূত সহায়তা করেন। অর্থাভাবে শিক্ষালাভ হইতেছে না, এইরূপ শত শত ছাত্রকে তিনি বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিতেন—কাহাকেও ফিরাইয়া দেন নাই। আবার ছাত্রগণকে শুধু পরীক্ষা পাশ করাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট নানা হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবদ্বারা বহু ছাত্রের জীবনে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও কল্যাণসাধন করেন।

বাবার জীবনের প্রধান কাজ ব্রাহ্মসমাজের সেবা। কলেজের অধ্যয়ন শেষ করিয়া চট্টগ্রামে আসিয়া প্রার্থনাসমাজে যোগ দেওয়ার দিন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজের কথা এক নিমেষের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই।

চট্টগ্রামের জনসাধারণ ও বিদেশীয় ব্রাহ্মগণ সকলেই তাঁহাকে চট্টগ্রাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্তম্ভস্বরূপ জানিতেন। তিনি এই দীর্ঘকাল কোন সমাজের নিযুক্ত প্রচারক ছিলেন না। ভগবানের নিয়োগপত্র পাইয়াই তিনি চট্টগ্রামে জ্ঞান ধর্ম্ম ও নীতির আলোক বিস্তার করিয়াছেন। চিরকাল যৌবনের উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে ব্রাহ্মসমাজের সুসমাচার চট্টগ্রামের জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই অক্লান্ত সেবার পশ্চাতে তাঁর যে বিরাট ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনের আভাস পাওয়া যায় তারই একটু পরিচয় দিই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলেজে অধ্যয়নকালে নিজের স্বাধীন-চিন্তাদ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। চট্টগ্রামে আসিয়া উৎসাহ-সহকারে প্রার্থনাসমাজের কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রথম যোগস্থাপনের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে ১৮৯১ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় প্রার্থনা-সমাজের উৎসব উপলক্ষে চট্টগ্রাম আসেন এবং সে সময় তাঁর কাছে বাবা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

দীক্ষা সম্বন্ধে বাবা লিখিয়াছেন—"আমার প্রভুর মঙ্গলহস্তই আমার জীবনের পরিচালক। আমার শৈশবের সংস্কার, আমার যৌবনের আবেষ্টন, আমার পিতামাতার দৃষ্টান্তের প্রভাব, আমার সমাজের বন্ধন—এ সকলকে পরাজিত করিয়া যিনি আমার প্রাণে ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছিলেন, অর্থসম্পদের প্রলোভন, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভিলাষ হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাকে দারিদ্র্যের সংগ্রামে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যিনি আরাম এবং আমোদের পথ হইতে নিন্দা ও নিপীড়নের পথে আমাকে টানিয়া আনিয়াছিলেন, তিনিই একদিন যখন হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের দুই নৌকায় দুই পা দিয়া দণ্ডায়মান আমাকে দেখিলেন, আমার অজ্ঞাতসারে ধাক্কা দিয়া আমাকে এক নৌকায় তুলিয়া দিলেন এবং অন্য নৌকা ডুবাইয়া দিলেন। এইরূপে আমি দীক্ষিত হইলাম।"

সেই সময়ে আত্মীয় স্বজনের প্রতিকূলতা, সমাজের নির্য্যাতন ও জনসাধারণের নিন্দা তাঁহাকে অনেক সহিতে হইয়াছিল। তাঁহার এক আত্মীয় দীক্ষামন্দিরে আসিয়া বলিয়াছিলেন—"হরিশের শ্মশানানলে সপ্তকাষ্ঠ দিতে আসিয়াছি।" তাঁহার সঙ্গে দুই এক জন আত্মীয় ও কয়েকটী ছাত্র বাস করিতেন—সকলেই ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। একমাত্র অনুগত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত তাঁহাকে কোনমতেই ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না; আত্মীয়গণের মধ্যে কেবল তিনিই তাঁহার সঙ্গে রহিলেন এবং পরে ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন।

তাঁহার খুল্লতাত আশৈশব পুত্রবৎ স্নেহযত্নে তাঁহাকে পালন করেন এবং পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এ সময় তিনিও ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করার জন্য কিছুকাল ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিবার পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। বাবা সকল আঘাত নির্ব্বিকারচিত্তে সহিয়া গেলেন। নিজে যাহা সত্য ও ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলেন তাহা উপেক্ষা করিয়া সমাজকে ধরিয়া রহিলেন না। এইরূপে প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণের পর হইতে যেমন তিনি অক্লান্তভাবে ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিয়া আসিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই নিজ জীবনে উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম পালন ও সাধন করিয়া আসিয়াছেন। ভগবানে অবিচলিত বিশ্বাস, প্রার্থনাপরায়ণতা ও ব্রহ্মানুগত্য তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। তাঁহার ধর্ম্মভাব এত প্রবল

ছিল যে জীবনে একদিনের জন্যও ধর্ম্মে ঔদাসীন্য আসিতে পারে নাই। দেশপ্রচলিত পৌত্তলিকতায় আস্থাহারাগণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজ জীবনে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার এই দীর্ঘ কর্ম্মবহুল জীবনের প্রতিদিন প্রায় চারি ঘণ্টাকাল সজনে ও নির্জ্জনে ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, আলোচনা, উপাসনা ও প্রার্থনাদিতে কাটাইতেন। সুস্থাবস্থায় কখনও তাঁহাকে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে দেখি নাই। জীবনের সকল কার্য্যের পশ্চাতে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সকল শোভার মধ্যে তিনি ভগবানের মঙ্গল হস্ত প্রত্যক্ষ করিতেন। জীবনের সকল অবস্থায় এবং সকল সংগ্রামের মধ্যে তিনি ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—"প্রার্থনা করিয়া আমি প্রাণে আরাম পাইয়াছি, শান্তি পাইয়াছি, বল লাভ করিয়াছি, আলোক লাভ করিয়াছি। জীবনের সকল পরীক্ষার মধ্যে তিনি তাঁর জীবনবিধাতার ইচ্ছা এবং ইঙ্গিতের দ্বারা পরিচালিত হইতেন। এইরূপ ভগবদ্বিশ্বাসী, প্রার্থনাপরায়ণ ও ব্রহ্মানুগত জীবন তিনি যাপন করেন। আবার চট্টগ্রামে একটী সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ও মণ্ডলীগঠনের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান স্বর্গীয় যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া এবং স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ, ডাঃ ভি রায়, মিঃ ডি এন্ মুখার্জ্জি প্রভৃতি কতিপয় বিদেশীয় ব্রাহ্মবন্ধুর সহানুভূতি ও সাহায্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য জমি খরিদ করিয়া মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন। এই মন্দির-নির্ম্মাণের পর হইতে তিনি কখনও ভৃত্যরূপে, কখনও সম্পাদক-রূপে, কখনও সভাপতিরূপে এবং সর্ব্বদা আচার্য্য ও উপদেষ্টা-রূপে দীর্ঘকাল এই সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামে দুই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন, জনসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ছাত্রগণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসমাচার দান, ব্রাহ্ম বালকবালিকাগণের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা, ধর্ম্মালোচনা দ্বারা নিজের ও মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করা প্রভৃতি তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজসেবার অঙ্গ ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে বাবার বিপুল উৎসাহ ছিল। চট্টগ্রামের ১৫ লক্ষ নরনারীর কর্ণে ব্রহ্মধ্বনি শোনাইবার ব্যাকুল আগ্রহ তাঁহার ছিল। সরলবিশ্বাসী পল্লীগ্রামবাসীদিগের নিকট ভগবানের মহিমা প্রচার করিয়া তিনি প্রাণে আনন্দ লাভ করিতেন। এ বিষয়ে তিনি শিক্ষিত ও নিরক্ষরের এবং উচ্চ ও নীচের প্রভেদ মানিতেন না। সকলের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তিনি বলিতেন—"সত্য প্রচারে জাতিভেদের স্থান নাই।"

তাঁর প্রভাবে একদিকে যেমন স্বনামধন্য স্বর্গীয় যাত্রামোহন সেনের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ লোক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তেমনই তিনি অন্যদিকে অশিক্ষিত দরিদ্র অনেক লোককেও ব্রাহ্মসমাজে টানিয়া আনিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু ও সহধর্ম্মীদের লইয়া তিনি একটী ব্রাহ্মপল্লী প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সহরের মধ্যস্থলে অথচ নাগরিক কোলাহল হইতে মুক্ত স্থানটী বাছিয়া লইয়া তিনি এই পল্লী পত্তন করেন। মণ্ডলীর সকলের সুখে দুঃখে, রোগে শোকে এবং বিপদে তিনি সাধ্যমত সহানুভূতি ও সহায়তা করিতেন। বিপন্ন ও আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিতে, দরিদ্রের অন্ন ও বাসস্থানের সংস্থান করিয়া দিতে নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয়িত করিতেন। একবার বাবা স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিতে একজন লোক এখানে রাখিতে বলিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় উত্তরে বলিয়াছিলেন—"চট্টগ্রামের জন্য ত তুমি নিজেকে দিয়েছ ভগবান তোমাকে এ কাজের ভার দিয়েছেন। দেখ, প্রাণটা দিতে পার কি না।" বাবা সত্যই এ কাজের জন্য প্রাণটা দিয়াছেন।

কেবল ব্রাহ্মসমাজের সেবাতেই বাবার কর্ম্ম সীমাবদ্ধ ছিল না। চট্টগ্রামের জনহিতকর সকল অনুষ্ঠানেই তিনি আত্ম-নিয়োগ করিতেন এবং অগ্রণী হইয়া দেশের অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামের সুসন্তান স্বর্গগত যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের প্রধান পরামর্শদাতা ও সহকর্ম্মীরূপে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল তিনি চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক এবং সামাজিক সকল আন্দোলনের মূলে ছিলেন। চট্টগ্রামে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা। স্বর্গীয় কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের উৎসাহে, বাবার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় এবং স্বর্গীয় যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের সহায়তাতে চট্টগ্রাম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সরকার হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আর একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দুই সহস্র টাকা দেওয়া হইবে, এ সংবাদ পাইয়া তিনিই চট্টগ্রামের পক্ষ হইতে আবেদন প্রস্তুত করিয়া সরকারের নিকট পাঠান—এমন কি, অন্যত্র যাইয়াও ডিরেক্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। এই বিদ্যালয়স্থাপনের দিন হইতে তিনি ইহার উন্নতির জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন এবং মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তিনি পরামর্শদাতারূপে এই বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন।

চট্টগ্রামের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এতদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম এসোসিয়েসনের সহিত যুক্ত থাকিয়া মাতৃভূমির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা করেন। তিনি কিছুকাল চট্টগ্রাম এসোসিয়েসনের সভাপতি ছিলেন এবং চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসকমিটীর সহঃ সভাপতি ছিলেন। তিনি পুর্ব্বাপর সাহিত্যপরিষদ, হিন্দুসভা প্রভৃতি সকল সদনুষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। চট্টগ্রামে যখনই কোন সৎকাজের জন্য লোকের আবশ্যক হইত, তিনিই সকলের আগে অগ্রসর হইতেন। চট্টগ্রামে সাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশনে তাঁহাকেই সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কতবার দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য তাঁহাকে মফঃস্বলে যাইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এ সকল দেশ-সেবায় তাঁহার কোনও দিন ক্লান্তি ছিল না।

বাবার জীবনে জাতীয় ভাব বড় প্রবল ছিল এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। তাই কর্ম্ম-জীবনের আরম্ভে কাহারও অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া স্বাধীন ভাবে বিদ্যালয় আরম্ভ করেন এবং সে বিদ্যালয়কে "National Institution" নামে অভিহিত করেন। স্বদেশী আন্দোলনের

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশে যখন জাতীয় ভাবের বিন্দুমাত্রও উদ্বোধন হয় নাই, সে সময় হইতেই তাঁহার মনে কি প্রবল জাতীয় ভাব ছিল, ইহা তাহারই পরিচয় দেয়। কূট রাজনীতি-চর্চ্চা করার অবসর তাঁর ছিল না। তবুও তাঁর আন্তরিক প্রবল জাতীয় ভাব ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা তাঁহাকে রাজনৈতিক জীবনে চরমপন্থীদের দলে টানিয়া লইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে এই আন্দোলনে যোগ দান করেন এবং এই দেশব্যাপী ভাবস্রোতকে ভগবানের আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি চট্টগ্রামের অন্যতম নেতারূপে এই অঞ্চলে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন এবং দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন। আবার জীবনসায়াহ্নে অসহযোগ আন্দোলনের স্রোতে দেশ যখন ভাসিয়া গেল, তখনও তিনি নিজেকে এ আন্দোলন হইতে বিযুক্ত রাখিতে পারেন নাই। চট্টগ্রামে দেশবিখ্যাত যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে তিনিও অগ্রণী হইয়াই এ আন্দোলনে পূর্ণ ভাবে যোগ দেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও শত শত সভা হইতে সভাপতি অথবা বক্তারূপে তিনি দেশবাসীর নিকট দেশ-প্রেমের মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। স্বদেশসেবায় তিনি রাজরোষ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। সরকারের আদেশ অমান্য করিয়া যে শোভাযাত্রা বাহির করার জন্য যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি কারারুদ্ধ হন, তিনি সে শোভাযাত্রার পুরোভাগে যতীন্দ্রমোহনের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া সে শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়াছিলেন। এইরূপে যতদিন তিনি কার্য্যক্ষম ছিলেন, ততদিন কায়মনোবাক্যে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

বাবার পারিবারিক জীবনের একটু পরিচয় না দিলে তাঁর জীবনকাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বাবা আদর্শ গৃহী ছিলেন। ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা তাঁহার কোনদিন ছিল না। কর্ম্মজীবনের আরম্ভে তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত অনেক সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আত্মসম্মান-জ্ঞান এত তীব্র ছিল যে, কখনও কাহারও নিকট এক কপর্দ্দক, সাহায্য গ্রহণ করা ত দূরের কথা, ঋণগ্রহণ পর্য্যন্ত করিতেন না। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছিল; কিন্তু তখনও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অনাড়ম্বর বিলাসিতালেশ-বর্জ্জিত জীবন যাপন করিতেন। শেষ জীবনে তাঁহার নানাবিধ অবস্থাবিপর্য্যয় ও পারিবারিক বিভ্রাট ঘটে। কিন্তু সকল অবস্থার মধ্যে ধীর স্থির সন্তুষ্টচিত্ত থাকিয়া তিনি সুশৃঙ্খলার সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন এবং যথাসম্ভব পরিবারের সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

এই দীর্ঘ দিন বাবার স্নেহক্রোড়ে পালিত হইয়া তাঁহার কোমল অন্তরের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছিলাম, আজ তাহা দিয়াই এ বিবৃতি শেষ করিব। বাবার অন্তর বড় স্নেহপরায়ণ ছিল। তিনি একাধারে আদর্শ পতি, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পিতৃরূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত ছিলেন। জীবনের প্রত্যেক কথার এবং কাজে-পত্নীর সম্মানকে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেন। সংসারের সকল কাজে তিনি আমার মাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। মৃত্যুশয্যায় পুত্রকে শেষ উপদেশ দেওয়ার সময়ও তিনি জননীর সুখ এবং সম্মান পরিবারে অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি চির কাল অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। শুনিয়াছি গ্রামের লোকে রামলক্ষ্মণের সহিত আমার বাবার ও কাকার ভ্রাতৃপ্রেমের তুলনা করিত।

সন্তানপালনের অতি উচ্চ আদর্শ তিনি নিজ জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। সন্তানগণকে প্রহার করা ত দূরের কথা, কখনও জোরে শাসন পর্য্যন্ত করিতেন না। চিরজীবন অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসা উপদেশ দিয়া এবং নিজ চরিত্রের প্রভাব দিয়া সন্তানগণের চরিত্র গঠন করিতে প্রয়াস পাইতেন।

পরিবারের কাহারও অসুস্থতায় অক্লান্তভাবে বাবাকে সেবা করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু নিজে তিনি কাহারও নিকট এত টুকু সেবাগ্রহণেও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন। যতক্ষণ দেহে এক বিন্দু শক্তি বা সামর্থ্য থাকিত ততক্ষণ তিনি কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। অসীম ধৈর্য্য ও স্থির প্রকৃতির দৃষ্টান্ত তিনি নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে নানা অশান্তি ও দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু সকল দুঃখ, সকল অশান্তিকে, তিনি ধীর স্থির শান্তভাবে সহ্য করিয়া গিয়াছেন। রোগশয্যায়ও তাঁহার আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার পরিচয় পাইয়াছি। বহুদিন তিনি দুরারোগ্য রোগে ভুগিতে-ছিলেন; কিন্তু বাবাকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অপরিসীম সহিষ্ণুতার সহিত অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণাও অম্লানবদনে সহ্য করিতে দেখিয়াছি।

বাবা চ'লে গেছেন। তিনি আমাদের জন্য অনেক অর্থসম্পদ রেখে যেতে পারেন নি—সে ক্ষোভ আমাদের নেই। জীবনের প্রারম্ভে যে অমর ঐশ্বর্য্যের আভাস পেয়ে তিনি পৃথিবীর ধনমান সম্পদের লোভ ছেড়ে এসেছিলেন, সত্য ন্যায় ও ধর্ম্মানুগত জীবন যাপন ক'রে এবং ভগবদ্‌প্রেম বিশ্বাস ও সাধনবলে তিনি যে অমর ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন—আমরা তাঁর বংশধরেরা যেন সে অতুল বিভবের উত্তরাধিকারী হ'তে পারি।

ওগো রাজরাজেশ্বর! ভবপারাবারের কাণ্ডারী! তোমার যে সন্তানটীকে তুমি পরপারে নিয়ে গেছ, তাঁকে আজ জানিয়ে দাও—তাঁর এ পৃথিবীর দিনগুলি বিফলে যায় নি। ভবের কূলে চল্‌তে চল্‌তে তাঁর পথের দু'ধারে যে সব ফুল ফুটেছিল তা দিয়ে তিনি যে মালা গেঁথেছিলেন আজ তা তোমারই কণ্ঠে দুলছে।

২

(শ্রাদ্ধবাসরে চতুর্থকন্যা শ্রীমতী মুক্তা রুদ্র কর্ত্তৃক পঠিত।)

* * * আমরা তাঁহার ভাগ্যহীন অক্ষম সন্তান অন্তিম কালে সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলাম না, রোগশয্যায় কাছে থাকিয়া সেবা করিতে পারিলাম না, বিদায়ের সময় পায়ের ধূলি মাথায় লইতে পারিলাম না। তিনি অনেক দিন হইতে বার্দ্ধক্যজনিত নানা রোগে জর্জ্জরিত হইয়া-ছিলেন, ও মহাপ্রয়াণের জন্য মন প্রস্তুত করিয়া সেই শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরাও বুঝিতেছিলাম তাঁহার যাইবার সময় হইয়াছে, আর বেশীদিন তাঁহাকে ধরিয়া

রাখিতে পারিব না। কিন্তু শুধু যে বাহিরে তাঁহাকে মিথ্যা ভুলাইবার চেষ্টা করিতাম, তাহা নহে; নিজের মনেও কখনও স্বীকার করিতে চাহি নাই যে, এত শীঘ্রই আমরা তাঁহাকে হারাইব। আজ বাস্তবিক যখন তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি, বুঝিতেছি এই অবস্থার জন্য কত অপ্রস্তুত আমরা ছিলাম। আজ এই বিশেষ দিনে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে চোখের জলে শোক-সন্তপ্ত প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে আসিয়াছি। কি বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের আজিকার মনের ভাব প্রকাশ করিব, জানি না। আজ মনের ভাণ্ডার শূন্য, ভাষা মূক, কণ্ঠ স্তম্ভিত। * * * দেওয়ান চৌধুরী নন্দরাম রায়ের বংশে পিতার জন্ম হয়। নন্দরাম চৌধুরী তৎকালীন বাদশার দেওয়ান ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইনিই গন্ধদ্বীপ গ্রামে বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেশে তাঁহার নামেই আমরা পরিচিত। তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী, বহুল অর্থ ও বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার নামে নির্ম্মিত রাস্তা, তাঁহার অর্থে খোদিত দীর্ঘিকা, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নানা বংশ, তৎকর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট দেবত্র ও ব্রহ্মত্র আজও দেশে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সম্ভবতঃ তিনিই এই গ্রামের মালিক ছিলেন। অন্যান্য গ্রামেও তাঁহার জমিদারী ছিল। আমাদের পিতামহ গৌরমোহন এই নন্দরামের প্রপৌত্রের পৌত্র ছিলেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্মানিত সম্ভ্রান্ত ও সৎলোক ছিলেন। নানা ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর জমিদারীর আয় খুব বেশী ছিল না। তবু তাঁহারা দেবদ্বিজের সেবা পূজা করিয়া, পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ করিয়া, গরীব দুঃখীকে দানধ্যান করিয়া সুখে সম্মানে এবং স্বাচ্ছন্দ্যচিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কখনও অভাবের মুখ দেখেন নাই। * * *

আমার পিতা পরিবারের একমাত্র পুত্র সন্তান ও সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। সেজন্য অধিকাংশ স্থলে যেমন দেখা যায়, তিনি শিশুকালে অতিরিক্ত আদর আব্দারে মানুষ হইয়াছিলেন। ছোট বেলায় তাঁহার ইচ্ছায় কেহ বাধা দিত না, তিনি যাহা চাহিতেন সাধ্যমত অবিলম্বে তাঁহাকে তাহা দেওয়া হইত। কিন্তু তাহা তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্যগঠনের প্রতিকূলতা করে নাই। যে কোমলতার প্রস্রবণে তাঁহার জীবনের গোড়া আর্দ্র হইয়াছিল, যে স্নেহ-নির্ঝরধারায় তাঁহার জীবনের ভিত্তি স্নাত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী সময়ে তাহাই তাঁহার মানসিক বৃত্তিসমূহকে সরস ও কমনীয় করিয়াছিল। সেই যে রস প্রবাহ তখন তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহা স্নেহ প্রেম ও ভক্তির ত্রিধারায় পরিবার পরিজন, আত্মীয় বান্ধব, দেশ ও দশকে প্লাবিত করিয়াছে।

অত্যধিক আদরের ফলে লেখাপড়া আরম্ভ করিতে তাঁহার অনেক দেরী হইয়াছিল। শুনিয়াছি ১২ বৎসর বয়সে গুরু-মহাশয়ের পাঠশালে তাঁহার 'হাতে খড়ি' হয়। তখনকার দিনে সে সব গ্রামে কাগজ কলমের আমদানী হয় নাই। পিতার কাছে শুনিয়াছি পাঠশালের এক কোণে একটী মাটীর হাঁড়িতে বালি ভরা থাকিত। ঘরের মেঝেতে সেই বালি বিছাইয়া তাহাতে আঙ্গুল দিয়া দাগ কাটিয়া অক্ষর লিখিতে শিখিতেন। এবং দেড় বৎসর ধরিয়া শুধু এই চর্চ্চাই করিয়াছিলেন।

আমার পিতার পূর্ব্বে এই বংশে কাহারও ইংরিজী শিক্ষা হয় নাই। ইংরেজী শিখিবার জন্য তিনি সহরে আসিয়াছিলেন। * * * তিনি যখন কলিকাতায় পড়া সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরেন, রাজ সরকার হইতে উচ্চ বেতনে সম্মানিত চাকুরী তাঁহাকে একাধিকবার দিয়াছিল; কিন্তু কাহারও অধীন হইয়া কাজ করা তাঁহার স্বভাব এবং মতবিরুদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি সে সমস্ত অর্থের প্রলোভনকে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। Commissioner's office এ চাকুরী দিয়া Court of Wardsএর Manager তাঁহাকে গ্রামের বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া ডাকেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই চাকুরী করিয়া বহু অর্থের মালিক হইতে পারিতেন। এবং বৃদ্ধকালে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন, পরমুখাপেক্ষা সহ্য করিতে পারিতেন না। নন্দরামের পরবর্ত্তী আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণ কেহই রাজসরকারে কাজ করে নাই। সকলেরই স্বাধীন জীবিকা ছিল। ইহাতে আমার পিতা গর্ব্ব অনুভব করিতেন এবং নিজেও চিরকাল স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

দেশের ডাক তিনি শুনিয়াছিলেন, মায়ের দারিদ্র্য, অভাব তাঁহার বুকে বাজিয়াছিল। তিনি ধর্ম্ম ও দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন। তিনি অল্পকাল পটীয়া স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তারপর চট্টগ্রাম সহরের উপর নিজে একটী স্কুল স্থাপন করেন।

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
মঙ্গল্য বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
হিতায় লোকস্য, তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।"

ঋষির এই প্রার্থনাটীকে তিনি নিজ জীবনের আদর্শ করিয়াছিলেন। নিজেকে তিনি পরমাত্মার অংশ বলিয়া অনুভব করিতেন, আপনার মধ্যে বিশ্বপ্রাণের সত্তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কাজের মধ্যে তিনি ভগবানের প্রেরণা অনুভব করিতেন। অজ্ঞানান্ধকার দেশে তিনি জ্ঞানের আলো বিতরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেক পরিমাণে সফলকাম হইয়াছেন। তিনি মনে করিতেন, নিজে যে জ্ঞানামৃত লাভ করিয়াছি দেশবাসী ভাই ভগিনীদিগকে তাহার সন্ধান বলিয়া, সকলের অন্তঃকরণে তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ করা উচিত। যে জ্ঞানালোক তাঁহার মধ্যে দীপ্ত পাইয়াছিল তাহাকে তিনি নিঃশেষ বিকীরণ করিয়াছিলেন—অজ্ঞানতার গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া একজন পথিকেরও পথ যদি কিছু সুগম করা এই আশায়।

* * *

তাঁহার দেশপ্রীতি সাময়িক ছিল না, আপেক্ষিক ছিল না। তাঁহার দেশপ্রীতি স্থির, গভীর ও আন্তরিক ছিল। হুজুগে মাতিয়া খেয়ালের বশে তিনি কিছু করিতেন না, কাহারও বাহবা পাইবার অপেক্ষা তিনি রাখিতেন না।

প্রায় ৩৩ বৎসর অনেক ঝড় ঝঞ্ঝার প্রতিকূলতার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার স্কুলটি বাঁচিয়া ছিল এবং দেশের লোককে জ্ঞান দান করিয়াছিল। এই স্কুল তাঁহার জীবনের প্রিয় সঙ্গী ও একমাত্র জীবিকা ছিল। সুতরাং ইহার পুষ্টিসাধনে তিনি প্রাণ পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্যোগে পড়িয়া একদিন তাঁহার সাধের তরণী ডুবিয়া গেল। তিনি ধীর স্থিরভাবে ইহার তিলে তিলে মৃত্যু দেখিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণে পুত্রবিয়োগের শোক হয়। সঙ্গে সঙ্গেই অন্নচিন্তা। আয়ের একমাত্র পথ বন্ধ হইয়া গেল। পরিবারপ্রতিপালনের চিন্তা তাঁহার মন জুড়িয়া বসিল। কি পরীক্ষা! বার্দ্ধক্য তখন ভিতর বাহির ছাইয়া ফেলিয়াছে। শরীরে এমন শক্তি নাই যে খাটিয়া উপার্জ্জন করেন। অথচ সংসার চারিদিক হইতে কেবল হাত পাতে, কেবল অভাবের অভিযোগ, টাকা না হইলে সংসার চলে না। পৈতৃক জমীজমা বিক্রয় করিয়া কয়েক বৎসর পরিবার প্রতিপালন করেন। তারপর পুরাতন স্কুলবাড়ীর ভগ্নাবশেষ নাড়িয়া চাড়িয়া সেই জায়গায় কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসগৃহ তৈয়ারী করাইলেন এবং সেগুলি ভাড়া দিয়া কোন মতে জীবনের শেষ ভাগ কাটাইলেন। কিন্তু এজন্য তাঁহার মনে কোন খেদ হয় নাই। তিনি ইহার মধ্যেও দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের করুণা অনুভব করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হইতেন। তিনি বলিতেন, দুঃখ আঘাত পাইলে অভিযোগ করিও না। সুখ দুঃখ সবই করুণাময়ের দান। সমুদ্রের গুপ্ত পর্ব্বতের চূড়ায় আহত হইয়া জাহাজ চুরমার হইয়া ডুবিয়া যায়, সেও ইচ্ছাময়ের লীলা, কিন্তু তিনিই আবার সেই ভগ্ন জাহাজের কাষ্ঠখণ্ড দ্বারাই নিমজ্জমান আরোহীকে কূলে তুলিয়া দেন। আমার নিজের জীবনে এই অবস্থা আসিয়াছে এবং আমি তাঁহার এই করুণা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ জীবনে তাঁহার অনেক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়াছে, অনেক শুভচেষ্টা বিফলপ্রযত্ন হইয়াছে, অনেক আকুল আগ্রহ প্রতিকূল আঘাতে নিষ্ঠুর ভাবে আহত হইয়া মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু সকল ব্যর্থতার ক্ষোভকে ছাপাইয়া নিগূঢ় ভক্তি-অমৃতের-স্রোত তাঁহার সমস্ত জীবনে বিস্তৃত হইয়াছিল; উহা তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মে বলদান করিত, আনন্দ কল্যাণ ও তৃপ্তিতে তাঁহার মনকে স্নিগ্ধ করিত।

এক মুহূর্ত্তের জন্যও জগতে প্রভুর প্রতি অবিশ্বাসের ভাব তাঁহার মনে আসে নাই। তিনি সকলকে ডাকিয়া দাতা দয়ালু পিতার দানের কথা বলিতে বলিতে ভাবে গদগদ হইতেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার দুই চোখে ধারা বহিত। দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম। প্রতিহত হইয়া, দুঃখ পাইয়া তাঁহাকে কখনও নিরাশ হইতে দেখি নাই। তিনি প্রার্থনাময় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিদিনের আহার্য্য তিনি ভগবানের কাছে চাহিয়া লইতেন। তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও নিশ্চিন্ত নির্ভর দেখিয়া কত সময় আশ্চর্য্য হইয়াছি।

তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন আচার্য্য ছিলেন। ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মপূজা তাঁহার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার দৈনন্দিন উপাসনায় তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, সংসারে যতকাল যে ভাবে রাখ আমি সন্তুষ্ট চিত্তে রহিব, এবং আমার সব কাজে তোমার নাম প্রচার করিব। যেদিন পরপার হইতে ডাক আসিবে, মহানন্দে "মা মা" বলিয়া মৃত্যুর দ্বার অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইব। জীবনের শেষ প্রহর যেন তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া বৃথা কাজে অন্যমনে কাটিয়া না যায়, এজন্য তিনি অত্যন্ত হুঁশিয়ার হইয়া ব্রহ্মনাম আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। শয়নে স্বপনে নাম জপ করিতেন। গভীর নিশীথে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিয়াছি বিছানায় বসিয়া ব্রহ্মনাম করিতেছেন। রাত্রি শেষে তাঁহার "ওঁ ব্রহ্ম" নামোচ্চারণের গম্ভীর আওয়াজে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। আমি যতদিনের কথা স্মরণে আনিতে পারি, প্রতিদিন দুইবেলা দেখিয়াছি, ক্ষুধার সময় আহার্য্য সম্মুখে আসিলেই ঝর ঝর করিয়া তাঁহার চোখের জল গড়াইয়া পড়িত।

ইদানীং দু'এক বৎসরের মধ্যে তিনি তিন চারবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন ও প্রতিবারই মুমূর্ষু হইয়াছিলেন। সে সময় দেখিতাম অসহ্য রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া স্থির নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি অহর্নিশি "আনন্দরূপমমৃতম্" জপ করিতেন, নিমীলিত নেত্রে, শান্ত মনে, 'আনন্দময়ের' সত্তা উপলব্ধি করিতেন।

ভগবানের নামে তিনি নূতন বল পাইতেন। অসুস্থ অবস্থায় যখন ঘরের ভিতর চলাফেরা করিতে ক্লান্তি অনুভব করেন, একটু জোরে কথা কহিলে বা এক পৃষ্ঠা বই পড়িলে পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়েন,—এমন সময় যদি শুনিতেন, আজ মন্দিরে উপাসনা করিবার আচার্য্যের অভাব, তাঁহাকে কেহ ঘরে রাখিতে পারিতাম না। হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া মন্দিরে উপাসনা করিয়া আসিতেন। আমরা অনেক সময় তর্ক করিয়াছি—"আচ্ছা বাবা, একবেলা মন্দিরে উপাসনা না হইলে কি ভগবান অসন্তুষ্ট হইবেন? তিনি তো মন্দিরবাসী নন, তিনি তো অন্তরবাসী দেবতা। মনে মনে যে তুমি অহরহ পূজা কর্‌ছ তা তিনি দেখ্‌ছেন। অসুস্থ শরীরের উপর অত্যাচার করা কেন? একবেলা মন্দিরে সজন উপাসনা না হ'লে কি ভগবানের খোরাক বন্ধ হবে?" কিন্তু তিনি আমাদের এসব বালসুলভ চপলতা গ্রাহ্য কর্‌তেন না। রবিবারে দুইবেলা মন্দিরে উপাসনা যাহাতে নিয়মিত থাকে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আরাধনা ও উপদেশ এত মর্ম্মস্পর্শী ও চিত্তাকর্ষক হইত যে, চট্টগ্রাম উৎসবে বিশেষ বিশেষ দিনে তাঁহাকে উপাসনা করিতে সকলেই অনুরোধ করিতেন। অসুস্থতার সময় যদি আমরা উপাসনার ভার লইতে নিষেধ করিয়াছি, তবে তিনি বলিয়াছেন, "ভগবানের ইচ্ছা, তাঁর দেওয়া মুখ দিয়া তিনি তাঁর নাম প্রচার করাইতেছেন। অস্বীকার করিবার অধিকার আমার কোথায়? আমার মুখে ভগবানের নাম শুনিতে লোকের ইচ্ছা হইয়াছে, সে তো আমার সৌভাগ্য; এই আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করিব কিসের অহংকারে? তোমরা বাধা দিও না। আমার মুখের ব্রহ্মনাম যদি একটী হৃদয়কেও স্পর্শ করে, তবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।" গত ১১ই মাঘ তিনি যখন 'উপাসনার ভার লইলেন, ঘরের লোকে আপত্তি করিয়াছিল, বলিয়াছিল, উপাসনার সময় তোমার উত্তেজনা হয়, শরীর এত দুর্ব্বল, শেষে কি বেদী থেকে প'ড়ে প্রাণ হারাবে?' তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "সে মৃত্যু

তো আমার কাম্য। ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে ব'সে ব্রহ্মনাম কর্ত্তে কর্ত্তে যদি চ'লে যেতে পারি তার চাইতে সুখের আর কিছু নাই।"

গিয়েছেন, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আদরের ডাক আর শুনিব না, তাঁহার স্নেহের স্পর্শ আর অনুভব করিব না। পৃথিবীর এককোণে একটী প্রেমময় ক্রোড়, একটী স্নেহময় বক্ষ, একটি উৎকণ্ঠিত চিত্ত দুইহাত বাড়াইয়া আমাদের আর কোন দিন ডাকিবে না। তিনি নাই—একথা যত নিদারুণ, তত সত্য। তাঁহার শেষ দৃষ্টি, তাঁহার শেষ কথা শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের কাতর প্রার্থনা, আমাদের আকুল ক্রন্দন তাঁহাকে ফিরাইতে পারিবে না। স্ত্রী পুত্রের মায়া, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ, বন্ধুবান্ধবের প্রেমালিঙ্গন, আজীবনের সুখদুঃখময় হাসিকান্নায়ঘেরা আপন আবাসের মমতা, কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বয়সের জীর্ণপথ শেষ করিয়া মৃত্যুর তোরণ পার হইয়া গিয়াছেন ভাষার অতীত তীরে,—আমাদের ব্যাকুল আহ্বান ব্যর্থ হুতাশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শূন্যে মরিয়া যায়, আমাদের ব্যথাতুর দৃষ্টি অতদূরে পৌঁছায় না, অতল আঁধারে পথ হারাইয়া ফেলে। তিনি চলিয়া গিয়াছেন—সর্ব্বত্র তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন ছড়াইয়া রহিয়াছে। ঘরে বাহিরে ছোট বড় সকল জিনিষে তাঁহার স্পর্শ মাখানো। বাগানের প্রতিটী গাছ লতা-পাতার মধ্যে আগাগোড়া তাঁহার হাত। মন তো বুঝিতে চাহে না যে তিনি নাই। কাল পর্য্যন্ত যে এক সত্য, এত স্পষ্ট ছিল, যার সুখ সুবিধার জন্য এতগুলি মন এত ব্যস্ত থাকিত, আজ সে নাই। এক মুহূর্ত্তে সব শেষ! এত বড় মিথ্যা, এত বড় প্রবঞ্চনা বিশ্ব সহিবে কি? কিন্তু হায়, যতদূর চাই, নাই, নাই, সে পথিক নাই।

আজ আমরা পিতৃহারা। আমাদের সান্ত্বনা নাই,—আছে অনুতাপ। আমরা ঘরের লোকে তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারি নাই। যে আদর্শ এতদিন জীবন্ত মূর্ত্তিতে সম্মুখে দেদীপ্যমান ছিল, আজ যাঁহার স্মৃতিকে ভক্তি প্রণতি জানাইতেছি, সময়ে তাঁহাকে পূজা করি নাই। অনন্ত শিক্ষা পাইয়াছিলাম, আপন সলিতাটী ধরান হয় নাই। তাঁহার পাদমূলে বসিয়া অনেক শিখিবার ছিল, আপন বুদ্ধির অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কত সময় তাঁহার উপদেশ অমান্য করিয়াছি, তাঁহার সৎপরামর্শ শুনি নাই। বাহিরের লোকে সে অমৃতের খনির সন্ধান পাইয়া লুটিয়া নিয়াছে। কতজন তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার উদ্দীপনায় নবপ্রাণ লাভ করিয়াছে! তাঁহার নিকট উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিয়া কত পথহারা জীবন আপন পথ পাইয়াছে, কত নিঃস্ব জীবন পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছে।

দুস্থ ও শোকার্ত্ত পরিবারের বন্ধু ছিলেন আমার পিতা। যাহার মনে সংগ্রাম বাঁধিয়াছে, যে মন আঘাত পাইয়াছে, নিরাশা আসিয়া যাহার অন্তরে বিশ্বাসের আসন নাড়া দিয়াছে, শোকে যে মন মুহ্যমান, আমার পিতা দিনের পর দিন গিয়া তাঁহাকে বিশ্বাসের বাণী শুনাইয়াছেন, আনন্দের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন, আশা দিয়াছেন, শান্তি দিয়াছেন, বল দিয়াছেন। তাঁহার অভাবে আজ তাহাদের সকলের প্রাণেই ব্যথা বাজিয়াছে।

অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ একজন ধর্ম্মবন্ধু ও ভক্ত সেবক হারাইয়াছেন। তিনি নীরব কর্ম্মী এবং অক্লান্ত কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। সমাজের কাজকে তিনি নিজের কাজ মনে করিতেন। সেজন্য অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া কাজ ডাকিয়া লইতেন। বৃদ্ধবয়সে জরাজীর্ণ হইয়াও তিনি প্রচারকার্য্যের ভার লইয়াছিলেন, এবং মহানন্দে দেশে দেশে নাম প্রচার করিয়াছিলেন।

* * *

তিনি নিজে যথাসম্ভব দেশী জিনিষ ব্যবহার করিতেন এবং মুখের কথায় ও কাজের দৃষ্টান্তে সকলকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন।

সাহিত্যের সেবায়ও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে তিনি ভাল বাসিতেন এবং দিনের অনেকখানি সময় এই কাজে ব্যয় করিতেন। আমাদেরও সাহিত্যচর্চ্চা করিতে খুব উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার রচিত কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত, ও কতগুলি ধর্ম্ম-বিষয়ক কবিতা আমরা পাইয়াছি। তিনি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে মুদ্রিত করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার দুঃখ ছিল। তিনি চট্টগ্রাম সাহিত্য-পরিষদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কিছুকাল তাহার সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন।

এ সব তাঁহার চরিত্রের বাহিরের দিক। কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি পিতারূপে। পরিবারের কর্ত্তা হিসাবে তিনি দৃঢ় প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি অন্য পাঁচ জনের পরামর্শ শুনিতেন, কিন্তু নিজের বিবেকানুমোদিত না হইলে গ্রহণ করিতেন না। কল্যাণকামনা করিয়া সন্তানদের কঠোর শাসন করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু একই সময় তাঁহার মধ্যে দণ্ডদাতা পিতা ও স্নেহময়ী মাতার রূপ দেখিয়াছি। যখনই পিতা হইয়া, শাসনকর্ত্তা হইয়া শাস্তি দিয়াছেন, তখনই একটী কোমল মাতৃহৃদয় তাঁহার ভিতর লুকাইয়া কাঁদিয়াছে। যত গুরুতর শাসন করিয়াছেন, ততই গভীর স্নেহে বুকে টানিয়া লইয়াছেন। শুনিয়াছি, আমার পিতামহী অত্যন্ত স্নেহশীলা কোমলপ্রাণা ছিলেন। পিতা যখন কলিকাতায় পড়িতে যান দুই দিন অবিশ্রাম অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন, রাত্রিতে চক্ষে ঘুম ছিল না। বিদায়ের মুহূর্ত্তে নয়নের মণি, অঞ্চলের নিধিকে ইষ্ট-দেবতার চরণে সমর্পণ করিতে গিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ স্নেহাতুর হৃদয় আমার পিতার মধ্যে দেখিয়াছি। পৌরুষের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার প্রবল অপত্যস্নেহ সমস্ত পরিবারকে সুধাসিক্ত করিত। শেষ বয়সে শাসনের কঠোরতা লোপ পাইয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে প্রচণ্ড অভিমান আসিয়া ভিতরে বাসা বাঁধিয়াছিল এবং সময়ে অসময়ে অল্প আঘাতেই প্রবল উচ্ছ্বাসে বাহির হইয়া আপনার জনের মনের দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিত। আমাদের গায়ে তিনি কখনও হাত তোলেন নাই, ভৎসনাও তাঁহার নীরব হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে কখনও রূঢ় ব্যবহার করেন নাই। বরং মায়ের শাসনে যখন আমরা ক্লিষ্ট হইয়াছি, তিনি সমস্ত আদর ঢালিয়া দিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন! কিন্তু

তাঁহার চরিত্রের এমন একটী প্রভাব আমাদের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, কখনও কোনও সামান্য কাজেও প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস পাই নাই। আমাদের কোনও অন্যায় দেখিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইলেই আমাদের যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। তাঁহার মন চাহিত পুত্রকন্যা আত্মীয় বান্ধব সকলের সহিত একত্র বাস করেন। কিন্তু সকল সময়ে তাহা সম্ভব হয় না। এজন্য তিনি মনে বড় ব্যথা পাইতেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমার যে দিদির বিবাহ হইয়াছে, এখনও সে যতবার পিতৃগৃহে আসে এবং যতবার নিজ সংসারে ফিরিয়া যায়, পিতা কাঁদিয়া আকুল হন। এবার আমার আসার দিন ঠিক হওয়ার পর হইতে আর বাবার মনে শান্তি ছিল না। আমার যাত্রার তিনদিন আগে হইতে তিনি লুকাইয়া কাঁদিয়াছেন। যখন তখন আসিয়া জড়াইয়া ধরিতেন, আর বলিতেন, "ওমা, এই যে যাচ্ছ, ফিরে এসে তো আর বাবাকে দেখ্‌বে না" "ওমা, আমি মর্‌বার সময় তো তোমায় দেখ্‌তে পাব না, মা"। বড়দাদা বহুদিন হইতে দূর প্রবাসে পড়িয়া আছেন, এই কষ্ট তাঁহার বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল এবং অন্তিমকালে তাঁহাকে কাছে পাইবেন না, এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। শেষ দিনও মৃত্যুর দ্বারে পা দিয়া এই বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়াছেন, 'মণি আর তার বাবাকে দেখ্‌ল না।"

স্বাবলম্বন, চিন্তাশীলতা, নির্ভীকতা, মিতব্যয়িতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কয়েকটী বিশেষ গুণ তাঁহাকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দিয়াছিল। তিনি স্বাবলম্বনপ্রিয় ছিলেন। নিজের প্রয়োজন যথাসাধ্য নিজেই সম্পন্ন করিতেন, কাহারও অনুগ্রহ বা সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না। তিনি শিশুকাল হইতে স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ছিলেন। হঠাৎ কোন কাজ করা তিনি পছন্দ করিতেন না। সকল বিষয়ই স্বাধীনভাবে ও ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন, এবং বিবেকের আদেশানুসারে কাজ করিতেন

নির্ভীকতা আর একটী প্রধান গুণ। ভয় ও স্বার্থচিন্তাই কাপুরুষতার বীজ। তাঁহার মধ্যে ঐ দুইটীরই অভাব ছিল, সুতরাং কাপুরুষতাও তাঁহার নিকট স্থান পায় নাই। শুনিয়াছি, মনের বল অনেকাংশে শরীরের বলের উপর নির্ভর করে। সে বিষয়েও আমার পিতা হীন ছিলেন না। আমার পিতার শরীর সুস্থ, সুগঠিত, সবল এবং সুন্দর ছিল। তাঁর বর্ণ গৌর, মুখশ্রী ধীর গম্ভীর ও শোভন ছিল। যৌবনকালে তিনি শরীরে এত বল রাখিতেন যে আস্ত নারিকেল পায়ের চাপে ছাড়াইতেন, কখনও হাতে ধরিতেন না। শরীরের বল যখন চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না, ছুটিয়া গিয়া সুপারী গাছে কনুইয়ের ধাক্কা মারিয়া জোর ফলাইতেন। তিনি অনেক সময় দুঃখ করিয়া বলিতেন, "আমার একটী ছেলেরও আমার মত শরীর হল না।"

তিনি নিজে মিতব্যয়ী ছিলেন এবং সকলকে মিতব্যয়ী হইতে উপদেশ দিতেন। একারণে অনেকে তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করিত। কিন্তু নিন্দা অপবাদকে তিনি ভয় করেন নাই। মিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়াই জীবনে অনেক সংগ্রাম করিয়াও সংসারে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। কয়েকটি ছোট খাট ঘর সংসারের কাজ হইতে তাঁহার মিতব্যয়িতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের বাড়ীতে অনেকগুলি নারিকেল গাছ আছে। সেই সব গাছের ডাল যখন কাটান হইত, পাতাগুলি তিনি ফেলিতে দিতেন না। অবসর সময় নিজ হাতে পাতার ভিতর হইতে শলাটী চাঁছিয়া বাহির করিতেন ও বাড়ীর চাকরকে দিয়া ঝাঁটা তৈয়ারী করাইতেন। নিজের লিখিবার খাতা প্রায়ই তিনি নিজের হাতে তৈয়ারী করিতেন; বই বাঁধাইবার দরকার হইলে সেও নিজেই করিতেন। ছোট খাট মিস্ত্রীর কাজ করিতে তিনি ভালবাসিতেন এবং বেশ সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন।

তিনি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। দুঃখ বিপদ সব জীবনেই অতিথি হয়। কিন্তু এমন অবাঞ্ছনীয় অতিথির যথোচিত সৎকার করিতে পারে কয়জন? দুঃসময়ে তাঁহাকে কখনও বিচলিত হইতে দেখি নাই। সন্তোষের সিংহাসনে রাজা হইয়া সহিষ্ণুতার কবচ পড়িয়া আত্মরক্ষা করিতেন। আমাদের প্রতিদিন উপদেশ দিয়াছেন, বিপদে অধীর হয়ো না। মৃত্যুশয্যায় তিনি সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গে ছোট ছোট ফোঁড়া তাহার উপর ৫টী curbancleএর যন্ত্রণা। curbancleএর বিকটাকৃতি ঘা দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। Hospitalএর dresser আসিয়া ঘা ধুইবার সময় প্রতিদিন পচা মাংস কাটিয়া ফেলিত। কষ্ট দেখিয়া, ঘায়ের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া, শুশ্রূষা করিতে যাহারা কাছে থাকিত তাহাদের বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইত; কিন্তু পিতার কি অসীম ধৈর্য্য, কি আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা, এত যন্ত্রণার মধ্যেও সেই dresserএর সঙ্গে 'বাবা' ছাড়া কথা কহিতেন না—বলিতেন, "বাবা, আমায় বেশী কষ্ট দিও না, বাবা।" এর বেশী অস্থিরতা তিনি প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুর পাঁচ মিনিট পূর্ব্বেও যে দেখা করিতে আসিয়াছে তাহাকেই নমস্কার জানাইয়াছেন, বসিতে বলিয়া সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন। সকলেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছে যে, তিনি প্রশান্তভাবে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু পৃথিবীতে অনেক অশান্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমর আত্মা শান্তিধামে চিরশান্তিতে ডুবিয়া থাকুক, এই প্রার্থনা।

এই দু'দিনের পান্থশালা পৃথিবীকে আমরা চিরদিনের আবাস মনে করিয়া বড় যত্নে ঘর সাজাই, আত্মীয় বান্ধবকে ঘিরিয়া মায়ার জাল বুনি। কিন্তু নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানানুসারে বিচ্ছেদব্যথা সহিতে হয়। তাহার হাতের বেদনার দান এড়াইয়া কেহ মুক্তি পায় না। সেজন্য শোক করা বৃথা। আমাদের সৌভাগ্য যে এমন পিতার সন্তান বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারি। আমাদের সৌভাগ্য যে এমন উদার চরিত্র, এমন মহৎ প্রাণের সংস্পর্শে আমরা প্রতিপালিত হইয়াছি। তাঁহার জীবনে যদি কোনখানে দুর্ব্বলতা ঘটিয়া থাকে, যদি কোন বিষয়ে অসমাপ্তি রহিয়া থাকে, তাহার জন্য প্রভুর চরণে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া লইব। ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার প্রিয় সন্তানকে অনন্ত উন্নতির পথে রক্ষা করুন। তাঁহার বিদেহী আত্মার সকল ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হউক।

ব্রাহ্ম সমাজ।

বর্ষশেষ ও নববর্ষোৎসব—নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে বর্ষশেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব সম্পন্ন হইবে। সকলে যোগদান করিয়া বাধিত করেন, এই প্রার্থনা।

৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল) শনিবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন। সায়ংকালে "যুগান্তর সংঘটন" বিষয়ে বক্তৃতা, বক্তা শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম।

১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল) রবিবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়। অপরাহ্ণ ৪½ ঘটিকায় আলোচনা; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নিখিলবিশ্বধর্ম্মমহাসম্মিলন—২৭শে জানুয়ারী রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট গৃহে ধর্ম্ম মহাসম্মিলনের অধিবেশন হয়। তাহাতে শতবার্ষিক উৎসব কমিটির আহ্বানে বিভিন্ন দেশ হইতে নানা ধর্ম্মের প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হন। বর্ত্তমানে ধর্ম্ম বিষয়ে যে উদাসীনতা দেখা যায় তাহার কারণ ও উহা দূর করিবার উপায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মিলিত কণ্ঠে "যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে" ইত্যাদি বেদগান গীত হইলে প্রার্থনা পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়া অসুস্থতা নিবন্ধন চলিয়া গেলে, ডাক্তার ড্রামণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ আর্কার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। অনন্তর আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে মহা মহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ডাক্তার সাউথওয়ার্থ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাক্তার আর্কার্ট, আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মিঃ দৌলত আহাম্মদ খাঁ, মিঃ এইচ্ ডবলিউ মরেনো বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণে দ্বিতীয় অধিবেশন। তাহাতে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ সভাপতির কার্য্য করেন। "ভুবনবাসী তাঁরে গাও" ইত্যাদি সঙ্গীত হইলে কোরাণ ও বাইবেল হইতে কিছু পাঠ করা হয়। রেভারেণ্ড ডাঃ মিচেল, নানকপন্থী জনৈক বক্তা, পার্শী সম্প্রদায়ের অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা, ডাক্তার কার্টিজ রীজ, ডাঃ বি এম্ বরুয়া প্রভৃতি বক্তৃতা করিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সভা ভঙ্গ হয়। ২৮শে জানুয়ারী সোমবার অপরাহ্ণে সভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। তাহাতে ডাক্তার সাউথওয়ার্থ সভাপতির কার্য্য করেন। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" ইত্যাদি সঙ্গীতটি গীত হইলে পর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রার্থনা করেন। সভাপতি ডাক্তার আনিবেশান্ত ও পরলোকগত আব্দুল বাহার পৌত্রের পত্র পাঠ করেন। "কিরূপে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে" ইহাই এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল। ডাক্তার ড্রামণ্ড, অধ্যাপক আবদুল কাদের, অধ্যাপক আর কিমুরা, স্বামী বিজয়ানন্দ, বাহাই সম্প্রদায়ের অধ্যাপক প্রীতম্ সিং, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, ডাক্তার কার্টিজ রীজ, ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্ন লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়—"বিশ্ব ধর্ম্ম-সম্মিলনের এই বিশ্বাস যে, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, সংঘাত ও দ্বন্দ্ব ধর্ম্মনীতিবিগর্হিত কাজ। সুতরাং এই সম্মিলন প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ নর নারীকে এই অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা সকলে এক জগৎপিতার সন্তান, এই মনে করিয়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিখিল মানবের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত ঐকান্তিক চেষ্টা করেন।" সভাপতির বক্তৃতা অন্তে তাঁহাকে ও প্রতিনিধিবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। অনন্তর সঙ্গীতান্তে রাত্রিতে সভার কার্য্য শেষ হয়।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৯শে মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মহলানবীশের মাতা প্রাচীনতমা ব্রাহ্মিকা রুক্মিণী মহলানবীশ মহাশয়া দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ৯২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। এক সময়ে অনেক লোক তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইয়া তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি নিষ্ঠার সহিত নিত্য উপাসনাব্রত পালন করিতেন ও স্বামী পরলোকগত গুরুচরণ মহলানবীশ মহাশয়ের সমাজসংস্কার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ৩০শে মার্চ্চ তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে পরিবারবর্গ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ২০শে মার্চ্চ দার্জ্জিলিং সহরস্থ মিঃ পি এন চৌধুরীর পত্নী প্রভা চৌধুরী ঢাকায় অল্প কয়েক দিনের জ্বরে পরলোকগমন করিয়াছেন,

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়-স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ—২রা ও ৩রা মার্চ্চ হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের ঊনষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে—২রা শনিবার অপরাহ্ণে নগর-কীর্ত্তন পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র রায়ের বাটী হইতে আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনের নেতা শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে। কীর্ত্তনান্তে মন্দিরে উপাসনা হয়; আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ। ৩রা রবিবার প্রাতে উষাকীর্ত্তন, ৮॥০ ঘটিকায় সমাধিক্ষেত্রে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী। ১০ ঘটিকায় মন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ৩ঘটিকায় মন্দিরে প্রতি রবিবার নিয়মিতরূপে উপাসনার ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা। ৫ঘটিকায় উপাসনা,আচার্য্য শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষের বাটীতে মহিলা সম্মিলনে শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু বক্তৃতা করেন। ৬ ঘটিকায় আলোকচিত্রের সাহায্যে "ভারতের ধর্ম্মধারা ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২৭শে চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি, এ